ভূ-পঞ্জর।

চতুর্থ যুগ বা বর্ত্তমান কাল।

তৃতীয় যুগের শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া এখন পর্য্যন্ত চতুর্থ যুগ চলিয়া আসিতেছে। দুএকটি বিশেষ স্থানীয় ঘটনা ছাড়া পৃথিবীর সার্ব্বভৌমিক বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন এযুগে দৃষ্ট হয় না। বন্যা এবং হিমশৈলের কার্য্যই এ যুগের বিশেষ লক্ষণ, এবং ইহা অপেক্ষাও এ যুগের আর একটি বিশেষ লক্ষণ মনুষ্যের উৎপত্তি। এই যে তিনটি বিশেষ ঘটনা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ হইতে এই যুগটি ভিন্ন তাহাদের পর্য্যায় এইরূপ —

প্রথম -ইয়োরোপীয় বন্যা;

দ্বিতীয়—হিমশৈলের কার্য্য;

তৃতীয়—মনুষ্যের উৎপত্তি এবং আসিয়ার বন্যা;

চতুর্থ যুগের এই ঘটনাত্রয় বর্ণনা করিবার অগ্রে ইয়োরোপীয় বন্যার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের প্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। ভূবেত্তাগণ চতুর্থ-যুগকে দুইভাগে ভাগ করেন, প্রথম প্লায়োসিনের পরবর্ত্তী বা চতুর্থ যুগের প্রারম্ভকাল; দ্বিতীয় আধুনিক কাল।

চতুর্থ যুগের শেষাংশ আধুনিক কালেই পূর্ব্বোক্ত তিনটি ঘটনার জন্ম।

প্লায়োসিনের পরবর্ত্তী কাল।

(Post Pliocene Period)

এই সময়ের উদ্ভিদের কথা বলা এখন বাহুল্য। চতুর্থ যুগের প্রারম্ভের ও আধুনিক সময়ের উদ্ভিদের মধ্যে বিশেষ জাতিভেদ লক্ষিত হয় না। জন্তু সম্পর্কেও সাধারণতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে। তখনকার তিনচারি জাতীয় জীব মাত্র এখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত; এবং পরে শীতাতপ বৈষম্য হেতু স্থান বিশেষের জন্তু বিশেষ লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল জাতীয় জন্তু পৃথিবীর অন্যত্র বর্ত্তমান।

চতুর্থ যুগের প্রারম্ভেও ইয়োরোপ যে, সিংহ ব্যাঘ্র, হস্তী, মহিষ প্রভৃতি গ্রীষ্ম দেশীয় জন্তুর নিবাস ভূমি ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ধীবরেরা শুক্তি সংগ্রহ করিতে গিয়া কেবল মাত্র নরফোক (Norfolk) তীরে আঠার হাজারেরও অধিক হাতীর কষের দাঁত উঠাইয়াছিল। হস্তীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে যেরূপ সময় সাপেক্ষ তাহাতে এই বহু সংখ্যক দন্ত জমিতে নিশ্চয়ই বহু সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়াছে।

আমেরিকাতে চতুর্থ যুগের প্রারম্ভে মিগেথেরিয়াম (১) মিগেলনিকস্ (২) মাইলডন (৩) গ্লিপটোডন (৪) বলিয়া যে সকল জন্তু ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের ঐরূপ পুরাতন লুপ্ত জন্তুর কঙ্কাল যদিও আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই তথাপি বোধ হয় এখানেও ঐরূপ অনেক পুরাতন জাতির লোপ হইয়াছে। মকর বলিয়া আমরা পুরাতন গ্রন্থে যে জলজন্তুর উল্লেখ পাই, উহা যে কেবল মাত্র কল্পনা-সম্ভূত জীব তাহা কে নিশ্চয় বলিতে পারে? হয়তো সত্য সত্যই ঐরূপ কোন প্রকার জীব পুরাকালে এদেশে বর্ত্তমান ছিল।

মামথ বলিয়া একরূপ হস্তী এই সময় পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই ছিল, তাহারা এখন লোপ পাইয়াছে; ইহা আধুনিক বৃহত্তর হস্তী হইতেও প্রকাণ্ড! দন্তের গঠন প্রভেদ হেতুই মাশ্‌টডন হইতে মামথ ভিন্ন। মামথের দন্ত বিন্যাস আমাদের হস্তীর ন্যায়। এই হস্তীর কঙ্কাল পুরাতন কালে কেহবা দেবতা কেহবা রাক্ষস দেহাবশেষ বলিয়া মনে করিত। গ্রীকগণ এই হস্তীর একটা জানুর অস্থিকে গ্রীকযোদ্ধা এজ্যাক্সের (Ajax) জানু-অস্থি ভাবিয়াছিল এবং এইরূপ কোন অস্থি হইতেই এজকস্‌পুত্র অ্যাসটেরিয়াস্ (Asterius) এবং আরো সহস্র সহস্র প্রকাণ্ড শরীরী মনুষ্যের গল্প নির্ম্মিত।

ইয়োরোপীয় ইতিহাসের মধ্য-যুগে (Middle ages) রচিত Gigantology বলিয়া প্রকাণ্ড শরীরীদিগের যে বিবরণ পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য অদ্ভুত গল্প সন্নিবেশিত; সে সকলই যে এইরূপ হস্তী-কঙ্কাল হইতে উৎপন্ন তাহার আর সন্দেহ নাই। স্পেনের ইতিহাসেও এইরূপ অনেক গল্প পাওয়া যায়। ক্রিষ্টফার নামক সেণ্টের একটি দাঁত বলিয়া ভেলেন্সের গির্জায় যে অস্থি রক্ষিত আছে তাহা ঐ হস্তীর কষের দাঁত। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে বৃষ্টি কামনায় সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট গির্জ্জার পাদরিরা যে একটা কল্পিত রাক্ষসের হাত স্কন্ধে করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ প্রকাণ্ড হস্তীর পার্শ্বাস্থি (Femur) মাত্র। ফ্রান্সেও এইরূপ অনেক গল্প প্রচলিত।

১৮ শ শতাব্দীতে মামথ হস্তীর কঙ্কাল ইয়োরোপের নানা স্থানে পাওয়া যায়। প্রথমে লোকেরবিশ্বাস ছিল ইহা আধুনিক হস্তী কঙ্কাল। কোন কোন বিদ্যাভিমানী বলিতেন হানিবল, ইটালি আক্রমণ কালে, এই সকল হস্তী কার্থেজ হইতে লইয়া আসেন। ইহার ভ্রম সপ্রমাণ করিতে কুভিয়ের অল্পই প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ইয়োরোপ আমেরিকা আসিয়া ও আফ্রিকার সকল স্থানেই এইরূপ হস্তী কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়।

সেনানদীর মোহানার নূতন সাই-

১ Megatherium অর্থাৎ প্রকাণ্ডজীব।
২ Megalonyx অর্থাৎ লম্বনখর।
৩ Mylodon অর্থাৎ জাঁতাদন্ত।
৪ Glyptodon অর্থাৎ খোদিতদন্ত।

বিরিয়া ও লাচো দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ-স্থানে বালি তুষার ও হস্তী দন্তময়। প্রত্যেক ঝড়ে সমুদ্র তরঙ্গাঘাতে যে সকল মামথ হস্তী-দন্ত তীরে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা দ্বারা তদ্দেশবাসীদের লভ্যজনক বাণিজ্য চলে। প্রত্যেক গ্রীষ্ম কালে অসংখ্য যাত্রী, নৌকা পথে এই অস্থি-দ্বীপাভি-মুখে গমন করে এবং প্রত্যেক শীতকালে অসংখ্য কুক্কুর-শকট হস্তী-দন্ত-পূর্ণ করিয়া প্রত্যাগমন করে। এক একটি দন্তের ওজন ৫০ হইতে ১০০ মন পর্যান্ত। ৫০০ বৎসর ধরিয়া চীনেরা এই দ্বীপ পুঞ্জ হইতে বানিজ্যের নিমিত্ত হস্তী-দন্ত আহরণ করিতেছে। এবং ১০০ বৎসর ধরিয়া ইহা ইয়োরপে ও অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইতেছে তথাপি ইহার এখনো শেষ নাই। এই অপরিমেয় অস্থি রাশি স্তূপীকৃত হইতে কত অসংখ্য অসংখ্য বৎসরই লাগিয়াছে!

সাইবিরিয়-ভাষা হইতেই এই হস্তীর নাম মামথ হইয়াছে। বিখ্যাত রুসিয়ান পণ্ডিত প্যালাশ যিনি প্রথমে মামথের রীতিমত বর্ণনা করেন তিনি বলেন তাতারেরা পৃথিবীকে মামা কহে, এই মামা হইতে মামথ উৎপন্ন, মমথ অর্থাৎ পৃথিবী-বিবর-বাসী। অন্য মতে, আরবিক মেহিমথ হইতে মামথ উৎপন্ন, মেহিমথ অর্থাৎ অসাধারণ আকার। আশ্চর্য্যের বিষয়, চীনের মধ্যেও এই সকল জন্তু বিবর-বাসী বলিয়া প্রবাদ, চীনে ইহাদের নাম টিয়েনসিউ অর্থাৎ যাহারা মাটীতে লুকায়।

এই সময়ে উৎপন্ন হিমালয়ের নিম্ন স্তরে কয়েকটি কচ্ছপদেহ পাওয়া গিয়াছে তাহার উদর-নিম্নস্থ কঠিনআচ্ছাদনী-অস্থি বার ফুট লম্বা ও ছয় ফুট চওড়া; এবং ইহার পায়ের হাড় গণ্ডারের ন্যায় দৃঢ় ও প্রকাণ্ড।

এই সময়ের নানা প্রকার স্তন্যপায়ী জন্তু-কঙ্কাল ইংলণ্ডের ইয়র্ক সায়ারস্থ বিখ্যাত কার্কডেল গহ্বরে এবং ডিবন্ সিয়ারে টর্কির নিকটস্থ কেণ্ট গহ্বরে পাওয়া গিয়াছে। এই গহ্বর আবিষ্কৃত কঙ্কাল-রাশি হইতে কত অনুমানই উত্থিত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই। সাধারণত এই বিশ্বাস ইহা কোন মাংসাশী পশুর গহ্বর এবং সেই মাংসাশী পশু কর্ত্তৃক আনীত অন্যান্য পশুদের দ্বারা গহ্বর পূর্ণ। কেহ কেহ আবার বলেন রুগ্ন অসামর্থ্য পশুগণ শত্রুর হাত এড়াইতে এই ভয় শূন্য গুহায় আসিয়া মরিত; অপর কেহ বলেন বন্যাতে মৃত পশু কঙ্কাল ভাসিয়া এই গুহায় আসিয়া জমিয়াছে। যে অনুমানটিই সত্য হউক না কেন ইহা নিশ্চয় যে চতুর্থ যুগের প্রারম্ভে এই সকল পশু ইংলণ্ডের অধিবাসী ছিল। গ্রীষ্ম প্রধান আফ্রিকা দেশে এখন যেরূপ বৃহৎ জল হস্তী আছে সেইরূপ জল হস্তী, দ্বি-খড়্গী-গণ্ডার, নানা জাতীয় হরিণ, বৃষ, মহিষ, ঘোড়া, গাধা, ভল্লুক, সিংহ, হায়েনা বিবর প্রভৃতি যে সকল জন্তুর মধ্যে অধিকাংশই এখন ইংলণ্ডে নাই তাহা তৎকালে ইংলণ্ডের অধিবাসী ছিল। তখন ম্যাক্যাইরডশ্ (Machairodus)

নামে ভল্লুক জাতীয় একরূপ হিংস্রক জন্তু ছিল তাহা সিংহ ব্যাঘ্র হইতেও ভয়ানক। এখন জিজ্ঞাস্য এই ইয়োরোপস্থ চতুর্থ যুগের এই সকল পশু কেমন করিয়া হঠাৎ লোপ পাইল ?

কুভিয়ে এবং পুরাতন ভূবেত্তারা বলেন হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা দ্বারা একেবারে এই সমস্ত পুরাতন জন্তু বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক ভূবেত্তাগণের মতে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন দ্বারাই এই সকল জাতি বিলুপ্ত হইয়াছে, হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা বশতঃ নহে। ক্রমশ শীতের আধিক্যই এই বিনাশের প্রধান কারণ।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে ইয়োসিন অন্তর যুগে ইয়োরোপে তাল, নারিকেল ইত্যাদি গ্রীষ্ম দেশীয় বৃক্ষ প্রচুর দেখা যায়। মায়োসিন অন্তর যুগে ইয়োরোপ গ্রীষ্ম প্রধান দেশ থাকিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে এস্থানে শীতের আধিক্য বৃদ্ধি হইয়াছিল; পরে প্লায়োসিন অন্তর-যুগে আরো শীতল হইয়া সেই সময় চতুর্থ যুগের ভাবী শীতের লক্ষণ দেখা দিল। এইরূপে ক্রমশই ইয়োরোপের উত্তাপ হ্রাস হইয়া ভীষণ শীত-প্রভাবে চতুর্থ যুগে ক্রমে হিমশৈলের কার্য্য আরম্ভ হইল।

হিমশৈলের পূর্ব্বে ইয়োরপে যে মহাবন্যা হইয়াছিল, সেই সমুদ্র বন্যায় ধৌত নানা স্থানের ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকা দ্বারা ইয়োরোপের স্থানে স্থানে যে স্তর সংস্থিতি হইয়াছে সেই স্তর সংস্থিতির পরে ইয়োরোপের উত্তাপ একেবারে কমিয়া একটি ভয়ঙ্কর শীতকাল আসিয়া পড়িল, সেই শীতকালকেই হিমশৈল কাল বলা যায়। এই সময় ব্রিটিস দ্বীপ পুঞ্জের অধিকাংশ এবং সম্ভবতঃ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশও একটি ঘন হিমশৈল আবরনে আবৃত হয়। ইংলণ্ডে ব্রিশটল চ্যানেলের দক্ষিণে একটি ভূখণ্ড এবং টেমশ নদীগর্ভ মাত্র তখন জলের উপরিভাগে ছিল। ইংলণ্ডের উত্তরাংশ এবং ব্রিটেনের উচ্চভাগ ও আয়ারলণ্ড এই হিমশৈল চালনে পেষিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই সুদূরব্যাপী বন্যা প্রভাবে টেমশ নদীর উত্তর দিক যে সেই সময় হইতে ক্রমশ সমুদ্র গ্রস্থ হইতে আরম্ভ হইল ইহার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। র‍্যাম্‌জে প্রমাণ করেন ভীষণ শীতের প্রারম্ভে ইয়োরোপের স্থল ভাগ এখনকার অপেক্ষা অধিক ছিল; তাহার পর, বন্যা আসিয়া ইয়োরোপের অধিকাংশ সমুদ্র মগ্ন করিয়াছিল, পরে আবার তাহা সমুদ্র হইতে উঠিয়া হিমশৈল আবৃত হইল।

আধুনিক কাল।

চতুর্থ যুগের শেষ ভাগ—বর্ত্তমান কাল—তিন ভাগে বিভক্ত। (১) ইয়োরোপের বন্যা, (২) হিমশৈলকাল (৩) মনুষ্যের জন্ম ও আসিয়ার বন্যা।

ইয়োরোপীয় বন্যা।

ইয়োরোপের অনেক স্থানে তৃতীয় যুগেয় স্তরের উপরে নানা জাতীয় মৃত্তিকামিশ্রিত স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইয়োরোপ সন্নিহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মৃত্তিকাই

এই স্তরে প্রচুর। ইয়োরোপস্থ পাহাড়-নিম্নের ক্ষয়-গ্রস্থ খোদিতও বিস্তৃতউ পত্যকা ভূমি এবং স্থানে স্থানের স্তরীভূত মসৃন গোলাকার কঙ্কর রাশি দেখিলে তাহার উপর অনরবত জল ঘর্ষণ-কার্য্য লক্ষিত হয়। এই সকল কঙ্কর রাশি প্রবল বন্যা প্রভাবে ধৌত ও স্থান ভ্রস্ট হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইহা দেখিলে মনে হয় সমুদ্রের একটি মহা তরঙ্গ স্থল-পৃষ্ঠে পড়িয়া সমস্ত চুরমার করিয়া দূর দূরান্তরে নিক্ষেপ করিয়াছে। এই ভীষণ বন্যা নিক্ষিপ্ত পদার্থ রাশির স্তরকে বন্যা সম্ভূত স্তর বলা যায়।

সহসা এই ভয়ঙ্কর বন্যা স্রোত আসিয়া ইয়োরোপ আক্রমন করিল কেন? সম্ভবতঃ ইয়োরপের সমুদ্র গর্ভে কিম্বা এই সমুদ্র সন্নিহিত ভূগর্ভের আভ্যন্তরিক অগ্নির কার্য্য বশতঃ কোন ভূখণ্ড উচ্চ হইয়া উঠিবার সময় সমুদ্র-আন্দোলন দ্বারা এই রূপ বন্যার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই ভূখণ্ড উঠিবার সময় তরঙ্গিত সমুদ্র জল রাশি ভূ পৃষ্ঠে পড়িয়া দেশ, মহাদেশ, উপত্যকা, ছারখার করিয়া দেয়। অগ্নি-সম্ভূত (volcanic) পর্ব্বত কিম্বা পর্ব্বত মালা যেমন হঠাৎ নির্ম্মিত হয়, এই বন্যা তেমনি সহসা হইয়াছিল; একবার হইয়াই ইহা ক্ষান্ত হয় নাই, এইরূপ বন্যা যে এক সময়ে একের অধিকবার ইয়োরোপ আক্রমন করিয়াছিল এই মহাদেশের অনেক স্থানের স্তর সংস্থিতি তাহার সাক্ষী।

এই স্তর সংস্থিতিই যে ইয়োরপের বন্যার কেবল মাত্র সাক্ষী এমন নহে, স্বস্থান বিচ্যুত আকরিক পদার্থের চাপড়াও এই বন্যার একটি বিশেষ প্রমান।

চতুর্থ যুগের এই বন্যার পূর্ব্বে অন্যান্য যুগে ও যে এইরূপ অনেক বন্যা হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ হ্রাস বশতঃ ভূগর্ভ শীতল হইয়া হ্রস্বায়তন হইলে ভূপৃষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া সকল যুগেই প্রায় পর্ব্বত ও পর্ব্বত মালা উৎপন্ন হইয়াছে। ঐরূপ পর্ব্বত সৃষ্টি হইবার সময় প্রত্যেকবার ভূগর্ভ আন্দোলন হেতু সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া বন্যা উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ যুগের বন্যার যেরূপ প্রত্যক্ষ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এমন আর কোন যুগের নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চতুর্থ যুগে দুই সময়ে দুইটি বন্যা হয়, প্রথম, ইয়োরপীয় বন্যা, দ্বিতীয়, আসিয়ার বন্যা। ইয়োরপ এক সময়ের মধ্যে দুইবার বন্যাক্রান্ত হয়। নরওয়ের পর্ব্বতমালা সৃস্ট হইবার সময় ইয়োরপের প্রথম বন্যা আরম্ভ। স্কানডিনেভিয়ায় বন্যা উত্থিত হইয়া সুইডেন নরওয়ে ইয়োরপ-রুসিয়া এবং জার্ম্মানির উত্তরের সমস্ত স্খলিত মৃত্তিকা একত্রে জল-মিশ্রিত হইল।

ভূগর্ভের অগ্নির প্রভাবে এই জল মধ্য দিয়া নরওয়ের পর্ব্বতমালা উঠিতে লাগিল। মেরু সন্নিহিত বন্যাজল-রাশি হিম শৈলাকার ধারণ করিল, বন্যা-তরঙ্গ সেই হিম-শিলার স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া কর্দ্দম কঙ্কর ইত্যাদির সহিত অন্যত্রে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সেই হিম শিলার দারুণ আঘাতে

মৃত্তিকা আরো সবলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল।

উত্তর ইয়োরপের সম-ভূমি ও নিম্ন ভূমিতে যেরূপ বিপর্যাস্ত স্তর সমূহ দেখা যায় তাহাই উত্তর ইয়োরপের এই বন্যার প্রাকৃতিক প্রমাণ। এই লণ্ড ভণ্ড মৃত্তিকা স্তরে (Uustratified Doposits) যে সকল চাপড়া (Block) পাওয়া যায় তাহা সাধারণত বৃহদায়তন। যে বন্যা ভঙ্গ গ্রেনিট চাপড়ার উপর রুসিয়ার সেণ্ট পিটরসবর্গে পিটরের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান তাহা অত্যন্ত প্রকাণ্ড।

জর্ম্মনি পোলণ্ড এবং ব্রিটেনের ভিন্ন জাতীয় মৃত্তিকার মধ্যে নরোয়েদেশ উৎপন্ন প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড দেখিয়া বোধ হয় তাহারা নিশ্চয়ই বন্যা দ্বারা আনীত।

উত্তর প্রুসিয়ায় ৬৪০ টন ওজনের একটি এই জাতীয় গ্রেনিট চাপড়া পাওয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত প্রকাণ্ড প্রস্তর নরোয়ে হইতে উক্ত সকল দেশে আনিতে কতই নাজানি বলের আবশ্যক হইয়াছিল!

আল্প পর্ব্বত শ্রেণীর কোন কোন অংশ উঠিবার সময় ইয়োরোপের দ্বিতীয় বন্যা হয়। আলপের চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ যথা, ফ্রান্স, ইটালি, জারমানির উপত্যকা ভূমি এই বন্যা নিক্ষিপ্ত পদার্থ রাশিতে পূর্ণ। পূর্ব্বোক্ত বন্যা হইতে ইহা যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সময়ের তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পর্ব্বত শ্রেণীর পূর্ব্বাংশে প্রাণী দেহ সঙ্কুল প্রথম যুগের স্তর এবং ওয়োলাইট ক্রিটেসস, এবং তৃতীয় যুগেরও স্তর দেখা যায়—কিন্তু মধ্য আলপে এ সকল কিছুই দেখা যায় না, এস্থানে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইয়োসিন মৃত্তিকার অনেক স্থান রূপান্তরিত দেখিয়া মনে হয় এ সময়ে ক্রমাগত ভূগর্ভ হইতে নূতন নূতন উৎপাৎ বশতঃ নূতন মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই উৎপাৎ বশতই ইয়োরোপে বন্যার দ্বিতীয় সংস্করণ।

হিমশৈল কার্য্যকাল।

প্রাণী-জগত যখন উন্নতির শেষ সোপানে উঠিতে যত্নবান তখন সহসা উপরি উপরি পূর্ব্বোক্ত দুই বন্যা দ্বারা সমস্ত ইয়োরোপ জলমগ্ন হইল; সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী জগতেরও উন্নতির পদে কণ্টক পড়িল; এই বিপদ না সামলাইতে সামলাইতে আর একটি বিপদ আসিয়া ইয়োরপের পুরাতন প্রাণীদের আর উঠিতে দিল না।

স্কান্‌ডিনেভিয়া হইতে ভূমধ্যসাগর ও ড্যানুব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড অর্থাৎ মধ্য ও উত্তর ইয়োরপে সহসা একটি অভূতপূর্ব্ব অসাধারণ প্রচণ্ড শীতকাল দেখা দিল, মেরুপ্রদেশের শীত সহসা ইয়োরপে উপস্থিত। ইয়োরোপের গ্রীষ্মদেশীয় সুন্দর বৃক্ষাদি দ্বারা সজ্জিত শ্যামল ক্ষেত্র, যাহাতে আসিয়া ও আফ্রিকার বৃহৎ হস্তী, গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব প্রভৃতি পশু বিচরণ করিত সেই সকল ক্ষেত্র সহসা দারুণ শীতে হিমশৈলাবৃত হইয়া পড়িল। বহমান নদীর পরিবর্ত্তে জমাট

নীহার রাশি বহিতে লাগিল। বেগে বহমান এইরূপ নীহারনদীর ঘর্ষণে চতুপার্শ্বস্থ মৃত্তিকা কি ভয়ানক রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল তাহা অনুভব করাও দুষ্কর। এই দারুণ শীতের অখণ্ডনীয় কারণ এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই।

শীত গ্রীষ্ম ঋতু পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ সূর্য্যোত্তাপ, সেই নিমিত্ত সহসা সূর্য্যের উষ্ণতার হ্রাস না হইলে আর ওরূপ শীত আসিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখন কেবল মাত্র সূর্য্যের উপরেই পৃথিবীর উত্তাপ নির্ভর করিত না, ভূগর্ভ তখনও প্রচুরপরিমাণে পৃথিবীকে উত্তাপ দিত।

তবে ইয়োরোপীয় সমুদ্রের উত্তাপের কারণ ঔপসাগরিক উষ্ণ স্রোত কি হঠাৎ বিমুখে বহমান হইয়া ইয়োরপকে দারুন শীতে মগ্ন করিয়া ছিল? এরূপ অনুমানেরও কোন কারণ নাই।

এই প্রচণ্ড শীতকাল সম্বন্ধে যে জ্যোতিষিক কারণ অনুমানিত হইয়াছে তাহাই কেবল অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ।

বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে শীতকালের সময় পৃথিবী নিজের অয়নমণ্ডলের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের সন্নিকটস্থ তথায় উপনীত হয়। সেই হেতু অর্থাৎ পৃথিবীর সূর্য্য সান্নিকট্য হেতু উত্তরার্দ্ধে এখন শীতের প্রাদুর্ভাব কম, শীত কালে যে পরিমানে হিমশিলা জন্মে গ্রীষ্ম কালে তাহার অধিকাংশ দ্রবীভূত হয়। কিন্তু পৃথিবীর অয়নমণ্ডল চিরকাল এক ভাবে নাই। পৃথিবীর এমন একটি মৃদুগতি আছে যাহার দ্বারা পৃথিবীর অয়নমণ্ডল অল্পে অল্পে ক্রমশ দিন দিন সরিয়া যাইতেছে। এই গতি হেতু ২৫৮০০ বৎসরে (কাহারো কাহারো মতে ২১০০০ বৎসরে,) পৃথিবীর অয়নমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়া যায়, তখন উত্তরার্দ্ধের পরিবর্ত্তে দক্ষিণার্দ্ধ বৎসরের মধ্যে শীতকালে সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটে আসে, উত্তরার্দ্ধ বৎসরের মধ্যে শীতকালে সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে পড়ে। এই ২৫৮০০ বৎসরে একবার পৃথিবীর দক্ষিণ একবার পৃথিবীর উত্তর সূর্য্যের সন্নিকটস্থ হয়। ক্রমে আবার অল্পে অল্পে সরিতে থাকে। যে ভাগ শীতকালে সূর্য্য হইতে দূরে থাকে সেইভাগে শীতের ভীষণ প্রভাব বৃদ্ধি ও উত্তাপের হ্রাস হেতু শীতকাল উৎপন্ন সমস্ত হিমশিলা গ্রীষ্মকালে দ্রবীভূত না হইয়া উত্তরোত্তর জমিতে থাকে। এখন পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধ শীতকালে সূর্য্য হইতে দূরে থাকে বলিয়া, সেখানে শীতের প্রভাব অধিক, কিন্তু উত্তরার্দ্ধ শীতকালে সূর্য্যের নিকটস্থ হয় বলিয়া অপেক্ষাকৃত শীত কম। দক্ষিণে অধিকাংশ স্থান চিরতুষারাবৃত; হিমশৈলের কার্য্য দক্ষিণে অধিক বলবান। সুমেরু পৌছিবার আমাদের আশা আছে, কুমেরু পৌছিবার আশা নাই। পৃথিবীর উপরোক্ত গতি দ্বারা উত্তরার্দ্ধ সূর্য্য হইতে তখন দূরে পড়িয়া ক্রমশঃ ভীষণ শীতাক্রান্ত হইয়াছিল—এই যুক্তি ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কোন যুক্তি এখনো পাওয়া যায় নাই।

ইয়োরোপের এই প্রচণ্ড শীতে জীব জগতে বিনাশ আরম্ভ হইল, সমস্ত নদ নদী, হ্রদ সমুদ্র, হিমশৈলাকারে জমাট বাঁধিয়া গেল। মূর্ত্তিমান মৃত্যু সমস্ত ইয়োরোপকে অধিকার করিল। শত শত হস্তী গণ্ডার ইত্যাদি জীব একেবারে যে লোপ পাইল আর ইয়োরপে সে জাতি জন্মাইল না। কতদিন ধরিয়া এই দারুণ শীত ইয়োরোপের অধিকাংশস্থান হিমশৈলাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল নির্দ্ধারিত করা অসম্ভব।

ক্রমশঃ

কে জানে কি।

ভাল কি সে বাসে মোরে?—
ভাল সে কি বাসে মোরে?—
ঈষৎ বিষাদ মাখা
মুখেতে সুধীর কথা,
ডাগর নয়ন দুটি ক্লান্ত ভাব ভরে।
সবে ফোটা ফুল-বালা
সমীরে করিবে খেলা;
কেন গো?—কিসের এত বিষাদ তাহার?—
হয়ত প্রাণের কাছে
আমারি প্রতিমা আছে,
হয়ত আমারি কথা জাগিছে হৃদয় ভরা—
তাই কি, এমন হবে?
ভাল কি বাসিবে তবে?
বাসিবে কি ভাল তবে—বাসিবেকি ভাল?
হয়ত আপন ফুঁয়ে
পাপড়ি পড়েছে নুয়ো,
হয়তো আপন ছায়া ফেলেছে মনের আলো।
হৃদয় যাহারে চায়
তাহারে নাহিক পায়
তাই বুঝি নম্রমুখী ফুল-কুল-রাণী?
হয় তো গো দুখ নাই,
বিষাদ বুঝিনা তাই
ছায়া প্রায় আসে যায়—কি হোলো কি জানি—
দুখের অভাবে বুঝি দুখী ফুলরাণী।
ভাল কি সে বাসে মোরে?—
হয়ত বাসে না ভাল—
আমার লুকান কথা
জানিয়ে হয়ত ব্যথা
লাগিয়াছে বালিকার কোমল অন্তরে।
তাই বা বিষাদ মাখা
মুখেতে সুধীর কথা
ডাগর নয়ন-দুটি ক্লান্ত ভাব ভরে—
তাই গো বুঝিবা এত বিষাদ বালার—
হয়ত বাসে না ভাল—
তাই কি? বাসে না ভাল?—
কি দিলে জানিতে পারি হৃদয় তাহার।

পারিবারিক দাসত্ব।

সম্প্রতি স্বাধীনতা নামক একটি শব্দ আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু একথাটা আমাদের সাহিত্যের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। এমন নহে যে, স্বাধীনতা বলিয়া একটা ভাব আমাদের হৃদয়ে আগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, পরে আমরা যথা নিয়মে তাহার নামকরণ করিয়াছি; বরঞ্চ স্বাধীনতা বলিয়া একটা নাম আমরা হঠাৎ কুড়াইয়া পাইয়াছি, ও সেই নামটাকে বস্তু মনে করিয়া ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিতেছি। অল্প দিন হইল সংবাদ পত্রে দেখিতেছিলাম যে, দাক্ষিণাত্যের অশিক্ষিত কৃষকদের য়ুরোপ হইতে আনীত কতকগুলি বাষ্পীয় হল যন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সেগুলি ব্যবহার না করিয়া অলৌকিক দেবতা জ্ঞানে পূজা আরম্ভ করিয়া দিল; আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য কৃষীগণ "স্বাধীনতা" নামক ঐরূপ একটি বাষ্পীয় হল যন্ত্র সহসা পাইয়াছে, কিন্তু না জানে তাহা ব্যবহার করিতে, না তাহা ব্যবহার করিতে অগ্রসর হয়। কেবল দিবানিশি ঐ শব্দটার পূজাই চলিতেছে। কাগজে, পত্রে, পুঁথিতে, সভাস্থলে মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক স্বাধীনতা শব্দের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হইতেছে। "স্বাধীনতা স্বাধীনতা" বলিয়া ঢাকের একটা বোল তৈরি হইয়া গিয়াছে, এবং কবিবর, মহাকবি, ও সুপ্রসিদ্ধ কবি নামক যত বড় বড় সাহিত্য ঢাকীগণ ঐ বোলে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিতেছি না কি বড় মিঠা বাজিতেছে, এবং সেই তালে তালে নাকি অধুনাতন বঙ্গ-যুবক-কলের-পুঁতুলগণ (ঈষৎ কল টিপিয়া দিলেই যাঁহারা নাচিয়া উঠেন, এবং নাচা ব্যতীত যাঁহারা আর কিছু জানেন না) অতিশয় সুদৃশ্য নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা যাহা হইতেছে তাহা অতিশয় সুদৃশ্য ও সুশ্রাব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক হৃদয়বান্ ব্যক্তি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, যে, স্বাধীনতা শব্দ "তাধিনতা" শব্দের অপভ্রংশ নহে, ঐ শব্দটি লইয়া যে কেবল মাত্র নৃত্যের ও ঢাকের বোল প্রস্তুত হয় তাহা নহে; ঐ হল-যন্ত্র চালনা না করিয়া কেবল মাত্র পূজা করিলে কোন প্রকার ফসলই জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বাধীনতা ও অধীনতা কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আমরা সকলে ঠিকটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। যে ভাব আমরা ভাল রূপে অনুভব করিতেই পারি না, সে ভাব হৃদয়ঙ্গম করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। সাধারণতঃ আমরা সকলে মনে করি যে, আমরা অধীন, কেননা ইংরাজেরা

আমাদের রাজা, তাহারা আমাদের রাজা না থাকিলেই আমরা স্বাধীন। এরূপ কথা নিতান্তই লঘু। এই কথাটি সর্ব্ব-সাধারণ্যে চলিত থাকাতে ফল হইয়াছে এই যে যাঁহারা দেশ-হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিতে চান, তাঁহারা দেশ-হিতৈষী হইবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। সেটি আর কিছু নয়, ইংরাজ জাতিকে যথেচ্ছা গালাগালি দেওয়া! তাঁহারা এই কথা বলেন, যে, আমরা যে পরাধীন ইংরাজ জাতিই তাহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ রূপে দায়ী! কাঁঠাল বৃক্ষ যদি তাহার শাখাজাত ফলগুলির উপর মহা রাগ করিয়া বলিয়া উঠে, যে, "আঃ, এই ফলগুলা যদি না থাকিত তবে আমি আম্র বৃক্ষ হইতে পারিতাম," তবে তাহাকে এই বলিয়া বুঝান' যায় যে, তুমি কাঁঠাল বৃক্ষ বলিয়াই তোমাতে কাঁঠাল ফলিয়াছে, তোমার শিকড় হইতে পাতা পর্য্যন্ত কাঁঠাল ফলিবার কারণে পরিপূর্ণ। আমাদের সমাজের শিরায় শিরায় অধীনতার কারণ সঞ্চারিত হইতেছে। ইংরাজেরা আছে, কারণ আমরা অধীন জাতি। ইংরাজ-রাজত্ব কাঁঠাল ফল মাত্র। আমাদের পক্ষে ইহা বড় কম সান্ত্বনার বিষয় নহে যে, আমরা যে পরাধীন, ইংরাজেরাই তাহার কারণ, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ইহা সত্য নহে। প্রকৃত কথা এই যে, সম্প্রতি আমরা স্বাধীনতা ও অধীনতা নামক দুইটা শব্দ হাতে পাইয়াছি, এবং হঠাৎ-ধনীর ন্যায় তাহার যথেচ্ছা অযথা-প্রয়োগ করিতেছি। যদি স্বাধীনতা কথাটা যথার্থ আমাদের হৃদয়ের কথা হয়, তবে যে, আমরা কতকগুলি অসঙ্গত ব্যবহার করি তাহার অর্থ কে বুঝাইয়া দিবে?

আমরা সংবাদ পত্রে মহা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকি, যে, ইংরাজেরা ভারতবর্ষকে যথেচ্ছা-তন্ত্রে শাসন করিতেছেন। ভারতবর্ষের আইন ভারতবর্ষীয়দের মতামত অপেক্ষা করে না। দুই চারিটি ব্যক্তি মিলিয়া যাহা কিছু নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়, আমরা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাহা চুপচাপ করিয়া পালন করি। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে আমরা অধীন জাতি। এবং কেতাবে পড়িয়াছি অধীনতা বড় ভাল দ্রব্য নহে, তাহা যদি হয় তবে দেখিতেছি আমাদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়! তাহা যদি হয় তবে আমাদের বিলাপ করা নিতান্তই কর্ত্তব্য। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া আমরা আজ কাল যে সকল শূন্যগর্ভ বিলাপ আরম্ভ করিয়াছি, তাহা আমরা কর্ত্তব্য কাজ সমাধা স্বরূপে করিতেছি মাত্র! কিন্তু একথা আমরা কবে বুঝিব যে, যত দিনে না আমাদের হৃদয়ের অস্থিমজ্জাগত দাসত্বের ভাব দূর না হইবে, ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার ভাব হৃদয়ের শোণিত স্বরূপে হৃদয়ে না বহমান হইবে ততদিন আমরা দাসই থাকিব। আমরা যে প্রতি পরিবারে এক একটি করিয়া দাসের দল সৃষ্টি করিতেছি! আমরা যে আমাদের সন্তানদের—আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের শৈশব কাল হইতে চব্বিশ ঘণ্টা দাসত্ব শিক্ষা দিতেছি! বড় হইলে

তাহারা যাহাতে এক একটি উপযুক্ত দাস হইতে পারে, তাহার বিহিত বিধান করিয়া দেওয়া হইতেছে; বড় হইলে যাহাতে কথাটি না কহিয়া তাহারা তাহাদের প্রভুদের মার ও গালাগালি গুলি নিঃশেষে হজম করিয়া ফেলিতে পারে, এমন একটি অসাধারণ পরিপাক শক্তি তাহাদের শরীরে জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে! এইরূপে ইহারাও বড় হইলে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া একটা তুমুল কোলাহল করিতে থাকিবে, অথচ অধীনতাকে আপনার পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহাকে দুধ কলা সেবন করাইবে! প্রাণের মধ্যে অধীনতার আসন ও রসনার উপরে স্বাধীনতার আসন। অমন একটা নর্ত্তনশীল আসনের উপরে স্বাধীনতাকে বসাইয়া আমরা দিবানিশি ঐ শব্দটার নৃত্যই দেখিতেছি। বড় আমোদেই আছি!

বঙ্গদেশের অনেক সৌভাগ্য ফলে আজ কাল দেশে যে সকল মহা মহা জাতীয়-ভাব-গদ্গদ আর্য্য-শোণিত বান্ তেজিয়ান্ দেশহিতৈষীগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, স্বাধীনতার মন্ত্র যাঁহারা চীৎকার করিয়া জপ করেন, নিজের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদের অপেক্ষা যথেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তা হয়ত অতি অল্পই পাইবে। ইহাই এক প্রধান প্রমাণ যে, স্বাধীনতার ভাব তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব নহে।

যাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতার ভাব আছে, আমাদের দেশের পরিবারের মধ্যে জন্মাইলে রুদ্ধ বায়ুতে তাহাদের হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা আজ্ঞা করিবার জন্য সততই উন্মুখ, অবসর পাইলেই হয়। অনেক গুরুজন গুরুজনের আর কোন কর্ত্তব্য সাধন করেন না, কেবল আজ্ঞা করিবার ও মারিবার ধরিবার সময়েই তাঁহারা সহসা গুরুজন হইয়া উঠেন। তাঁহারা "হ্যাঁরে" করিয়া উঠিলেই ছেলে পিলে গুলার মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে। এবং তাঁহারা যে তাঁহাদের কনিষ্ঠ সকলের ভীতির পাত্র, ইহাই তাঁহাদের প্রধান আমোদ।

মনুষ্য জাতি স্বভাবতই ক্ষমতার অন্ধ উপাসক। যে পক্ষে ক্ষমতা সেই পক্ষেই আমাদের সমবেদনা, আর অসহায়ের আমরা কেহ নই। এই জন্যই এক জনের হাতে যথেচ্ছা ক্ষমতা থাকিলে অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। ব্যবহারের তাহার ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার লোক সংসারে পাওয়া যায় না। কাজেই তাহাকে আর বড় একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হয় না। যাহাদের বিবেচনা করিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক, সংসারের গতিকে এমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহাদেরই বিবেচনা করিয়া চলিবার কম প্রবর্ত্তনা হয়। এই গুরুজন সম্পর্কেই একবার ভাবিয়া দেখ না। যত আইন, যত বাঁধাবাঁধি, যত কড়াকড় সমস্তই কি কনিষ্ঠদের উপরেই না? কেহ যদি নিতান্ত অসহ্য আঘাত পাইয়া গুরুজনের মুখের উপরে একটা কথা বলে, অমনি কি বড় বড় পক্ক-কেশ মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে না? আর, যদি কোন গুরুজন বিনা কারণে বা সামান্য কারণে বা অন্যায় কারণে

তাহার কনিষ্ঠের উপরে যথেচ্ছা ব্যবহার করে তবে তাহাতে কাহার মাথাব্যাথা হয় বল দেখি? গুরুজন মারুন্, ধরুন্, গালাগালি দিন্, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখুন্, তাহাতে কাহারো মনোযোগ মাত্র আকর্ষণ করে না, আর কনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি তাহার গুরুজনের আদিষ্ট পথের একচুল বামে কি দক্ষিণে হেলিয়াছে, গুরু জনের পান হইতে একতিল চুন খঁসাইয়াছে, অমনি দশদিক হইতে দশটা যমদূত আসিয়া কেহ তাহার হাত ধরে, কেহ তাহার চুল ধরে, কেহ গালাগালি দেয়, কেহ বক্তৃতা দেয়, কেহ মারে ও তাহার দেহ ও মনকে সর্ব্বতোভাবে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তবে নিষ্কৃতি দেয়। সমাজের এ কিরূপ বিচার বল দেখি? যে দুর্ব্বল, যাহার দোষ করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহাকেই কথায় কথায় মেয়াদ ফাঁসী ও দ্বীপান্তরে চালান করিয়া দেওয়া হয়, আর যে বলিষ্ঠ, যাহার অন্যায় ব্যবহার করিবার সমূহ ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহার কাজ একবার কেহ বিচার করিয়াও দেখে না।' যেন ঐ দন্তহীন কোমল শিশুগুলি এক একটি দুর্জ্জয় দৈত্য, উহাদের বশে রাখিতে সমাজের সমস্ত শক্তির আবশ্যক, আর ঐ যমদূতাকার বেত্রহস্ত পাষাণ হৃদয়রা নবনীতে গঠিত কুসুম-সুকুমার, উহাদের জন্য আর সমাজের পরিশ্রম করিতে হইবে না। 'এই জন্য সকল শাস্ত্রেই লিখিয়াছে যে, গুরুজনের অবাধ্য হওয়া পাপ, কোন শাস্ত্রেই লিখে নাই, কনিষ্ঠদের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করা পাপ। কেহই হয়ত স্বীকার করিবেন না (যদি বা মুখে করেন তথাপি কাজে করিবেন না) যে গুরুজনের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা যতখানি পাপ, কনিষ্ঠদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করাও ঠিক ততখানি পাপ। একজন গুরুব্যক্তি তাহার কনিষ্ঠকে অন্যায়রূপে মারিলে যতটুকু পাপে লিপ্ত হন, একজন কনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার গুরুজনকে অন্যায়রূপে মারিলে ঠিক ততটুকু পাপেই লিপ্ত হন, তাহার কিছুমাত্র অধিক নয়। ঈশ্বরের চক্ষে উভয়ই ঠিক সমান। কোন্ ব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া ঈশ্বর তাহার প্রতি কনিষ্ঠের অপেক্ষা অধিক অন্যায়াচরণ করিবার অধিকার দিয়াছেন! কিন্তু সকলেই যেন মনে মনে সেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই একই কারণ হইতে আমরা অবলাদিগের সামান্য দোষটুকু পর্য্যন্ত বর্দাস্ত করিতে পারি না, অথচ পুরুষদের প্রতিপদেই মার্জ্জনা করিয়া থাকি! যেন সবলেরাই কেবল মাত্র মার্জ্জনার যোগ্য। যেন হীনবল স্ত্রীলোকদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য পুরুষের বাহুবলই যথেষ্ট নহে তাহার উপরে ধর্ম্মের বিভীষিকা ও সমস্ত সমাজের নিদারুণতর বিভীষিকার আবশ্যক, আর পুরুষদের জন্য যেন সে সকল কিছুই আবশ্যক নাই। যাহা হউক, ছেলেবেলা হইতেই আমরা কি এইরূপ বলের উপাসনা করিতে শিখিনা? এবং যে শিক্ষা বাল্যকাল হইতে আমাদের হাড়ে হাড়ে

প্রবেশ করে বড় হইলে কি তাহা আমরা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি? সুতরাং যে-খানে বাঙ্গালী সেই খানেই পদাঘাত, সেই খানেই গালাগালি, সেই খানেই অপমান, এবং সেই অপমান পদাঘাতবৃষ্টির মধ্যে এই ক্ষীণ-শরীর সুন্দর-বনবাসীদের শর-শয্যাশায়ী ভীষ্মের ন্যায় অবিকৃত মুখশ্রী! ছেলেবেলা হইতে তাহারা পদে পদে শিখি-য়াছে যে, গুরু জনেরা মারে, ধরে, যাহা করে তাহার উপরে আর চারা নাই, ইচ্ছা করিলেই সকল করিতে পারেন, এবং সেরূপ ইচ্ছা প্রায়ই করিয়া থাকেন। জন্মগ্রহণ করিয়াই গুরুজনদের নিকট তাহাদের প্রথম শিক্ষা এই যে, "যাহা বলি তাহার উপরে আর কথা নাই!" ভাল করিয়া বলিতে ও বুঝাইয়া বলিতে অনেক বাক্য ব্যয় হয়, অতএব যত অল্প পরিশ্রমে ও যত অল্প কথায় একটা আজ্ঞা দেওয়া যাইবে তাহা দেওয়া হইবে, ও আজ্ঞা লইয়া যত কম আন্দোলন করিয়া যত শীঘ্র পালন করা হইবে ততই ভাল! দাদা আসিয়া ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন "কি কর্‌চিস শুতে যা।" যে ছেলে বলে "কেন দাদা এখনো ত সন্ধ্যা হয় নি" তাহার কিছু হইবে না, যে ছেলে বলে "যে আজ্ঞা দাদা মহাশয়" তাহার তুল্য ছেলে হয় না!

ছেলে বেলায় যে আমরা শিক্ষা পাই যে, গুরুজনদের ভক্তি করা উচিত, তাহার অর্থ কি? না গুরুজনদের ভয় করা উচিত। কারণ, ভক্তির ভাব, বালকদের নহে। তাহাদের নিকট সকলই সমান। তাহা-দের হৃদয়ে কেবল অনুরাগ ও বিরাগের ভাব জন্মে মাত্র তাহারা কাহারো অনু-রক্ত হয়, কাহারো হয় না, আবার কা-হারো প্রতি তাহাদের স্বতঃই বিরাগ জন্মে। তাহাদের যখন ভর্ৎসনা করিয়া বলা হয় "গুরুজন ব'লচেন শুন্‌চিস্‌নে!" তখন তাহারা এই বুঝে, যে, না শুনিলে ভয়ের কারণ আছে। না শুনিলে তাঁহা-দের এমন ক্ষমতা আছে, যে শুনিতে বাধ্য করাইতে পারেন। অতএব গুরুজনদের ভক্তি করিবে, অর্থাৎ ভয় করিবে; কেন ভয় করিবে? না তাঁহারা আমাদের অ-পেক্ষা বলিষ্ঠ, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা কোন মতে পারিয়া উঠি না। এই জন্যই, যখনি ছেলেরা দশজন সমবয়স্কদের লইয়া মনের আমোদে খেলা করিতেছে, এবং যখনি গুরুজন বলিয়া উঠিয়াছেন "কী তোরা গোলমাল কর্‌চিস।" তখনি তাহারা তৎ-ক্ষণাৎ থামিয়া যায়। বেশ বুঝিতে পারে যে, গুরুজন যে, তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া ঐ আজ্ঞাটি করিলেন তাহা নহে, তবে কেন তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল? না যিনি আজ্ঞা দিলেন তিনি তাহাদের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি! আমার বল আছে অতএব তুই আজ্ঞা পালন কর এই ভাব ছেলেদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া, তাহাদের চখের সামনে দিনরাত্রি একটা অদৃশ্য বেত্র নাচান,' এইরূপ একটা ভয়ের ভাবে, একটা অবনতির ভাবে কোমল হৃদয় দীক্ষিত করা কি স্বাধীনতাপ্রিয় স-হৃদয় গুরুজনের কাজ?

ভক্তির ভাব ভাল, কিন্তু ভক্তির অপেক্ষা অনুরাগের ভাব আরো ভাল; কারণ, ভক্তিতে অভিভূত করিয়া ফেলে আর অনুরাগে আকর্ষণ করিয়া আনে। যাহার হৃদয় যত প্রশস্ত, তাহার অনুরাগ ততই অধিক। পিতা ত পিতা, সমস্ত জগতের পিতাকে যাঁহারা সখা বলিয়া দেখেন তাঁহারা কে? না, তাঁহারা ভক্তদের অপেক্ষা অধিক ভক্ত! তাঁহারা ঈশ্বরের এত কাছে থাকেন যে, ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের সখ্যতা জন্মিয়া যায়। কত শত কালীভক্ত আছে, কিন্তু রামপ্রসাদের মত কয় জন ভক্ত দেখা যায়! অন্য ভক্তেরা শত হস্ত দূরে থাকিয়া তটস্থ হইয়া কালীকে প্রণাম করে; কিন্তু রামপ্রসাদ যে কালীর কোলে মাথা রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিয়াছেন, রাগ করিয়াছেন, অভিমান করিয়াছেন! হাফেজের ন্যায় ঈশ্বর-ভক্ত কয়জন পাওয়া যায়, কিন্তু দেখ দেখি, হাফেজ কি ভাবে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করেন! হৃদয়ের প্রধান শিক্ষা অনুরাগ শিক্ষা, ভক্তি শিক্ষা তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা। যে হৃদয় যত উদার সে হৃদয় ততই অন্য হৃদয়ের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে সমর্থ হয়, এবং যতই নিকটবর্ত্তী হয়, ততই ভক্তি অপেক্ষা অনুরাগ করিতে শিখে। পিতার প্রতি পুত্রের কি ভাব থাকা ভাল? না অভক্তির অপেক্ষা ভক্তি থাকা ভাল, আবার ভক্তি অপেক্ষা অনুরাগ থাকা আরো ভাল। সেই পুত্রই সৎপুত্র যে পিতাকে সখা বলিয়া জানে। কর্ত্তব্যের সহিত প্রিয়কার্য্যের যত খানি প্রভেদ ভক্তির সহিত অনুরাগের ঠিক ততখানি প্রভেদ। কর্ত্তব্যজ্ঞান যেমন আমাদের হৃদয়ের দূর সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়, ভক্তিভাবও তেমনি আমাদের হৃদয়ের দূর-সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়। ভক্তিভাজন ব্যক্তি আমাদের দূরের লোক অথচ নিজের লোক। আমি যদি জানি যে একজন আত্মীয় নিয়তই আমার শুভাকাঙ্খা করেন, বাল্যকালের বিঘ্ন-সঙ্কুল পথে আমার হাতে ধরিয়া যৌবন কালে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, আমার সুখ দুঃখের সহিত যাঁহার সুখ দুঃখ অনেকটা জড়িত, তাঁহাকে আমার নিতান্ত নিকটের ব্যক্তি মনে না যদি করি তবে সে একটা কৃত্রিম প্রথার গুণে হইয়াছে বলিতে হইবে। মায়ের সহিত পিতার সম্পর্কগত প্রভেদ কিছু অধিক নহে, সমানই বলিতে হইবে। পিতা যদি ভক্তিভাজন হন তবে মাতাও ভক্তিভাজন হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণতঃ কি দেখা যায়? পিতার প্রতি পুত্রের যে ভাব মাতার প্রতি কি সেই ভাব? আমি ত বলি মাকে যে ছেলে শুষ্ক কেবল ভক্তি করে সে মায়ের প্রতি অন্যায ব্যবহার করে। মায়ের সহিত আমাদের অনুরাগের সম্পর্ক। মায়ের এমন একটি গুণ আছে, যাহাতে তাঁহাকে আমরা অনুরাগ না করিয়া থাকিতে পারি না। সে গুণটি কি? না, তিনি আমাদের মনের ভাবগুলি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, আমাদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সমবেদনা আছে, তিনি কখনো জানিয়া শুনিয়া

আমাদের হৃদয়ে আঘাত দিতে পারেন না, তিনি কখনো আমাদের আজ্ঞা দিতে চাহেন না, তিনি অনুরোধ করেন, বুঝাইয়া বলেন, আমরা একটা ভাল কাজে বিরত হইলে তিনি সাধ্য সাধনা করেন। এই জন্য মায়ের প্রতি আমাদের যে একটি আমরণ-স্থায়ী মর্ম্মগত ভালবাসা জন্মে, তাহা আমাদের হৃদয়ের একটি শিক্ষা। যে ব্যক্তি শৈশবকাল হইতে মাতৃ স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছে সে একটি শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। নিস্বার্থ ভালবাসা পাওয়া নিস্বার্থপরতা শিক্ষা করিবার প্রধান উপায়। মনে কর, এক জন বালক তাহার সঙ্গীদের লইয়া খেলা করিতেছে, গোল করিতেছে, সেই সময়ে আসিয়া একটি গুরুজন তাহাকে খুব একটা চড় কসাইয়া দিল, ইহাতে তাহাকে স্বার্থ ত্যাগের শিক্ষা দেওয়া হয় না। পরের সুখের প্রতি মনোযোগ দেওয়া শিক্ষা ঐ এক চড়েই হয় না। আমি নিজের সুখের জন্যে আর এক জনের সুখের হানি করিলাম, এবং তাহার উপরে একটা চড় কসাইলাম, ইহাতে তাহাকে কি শিক্ষা দেওয়া হইল? একটা কাজ আপাততঃ বন্ধ করিয়া দেওয়া এক, আর তাহার কারণ উঠাইয়া দেওয়া এক স্বতন্ত্র। প্রতিকাজে একটা কান ধরিবার জন্য একটা হাত নিযুক্ত রাখা, সে কানের পক্ষে ও সে হাতের পক্ষে উভয়ের পক্ষেই খারাপ। যে শাসন করে তাহার চরিত্রেও কুফল জন্মে আর যে শাসিত হয় তাহার চরিত্রেও কুফল জন্মে। শাসনপ্রিয়তার ভাব বর্ব্বর ভাব, সে ভাব যত দমন করা যায় ততই ভাল। আর যে ব্যক্তি শাসনে অভ্যস্ত হইয়া যায় তাহার পক্ষেও বড় শুভ নহে।

আমাদের পরিবারের মূলগত ভাবটা কি? না, শাসনকারী ও শাসিতের সম্পর্ক, প্রভু ও অধীনের সম্পর্ক, গুরু ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক। আর কোন সম্পর্ক নাই। সম্মান ও প্রসাদ ইহাই আমাদের পরিবারের প্রাণ! এমন কি স্বামীর প্রতিও ভক্তি করা আমাদের শাস্ত্রের বিধান। স্বামীর আদেশ পালন করা পুণ্য। সেই সুগৃহিনী যাহার পতিভক্তি আছে! যাহার প্রতি স্বতঃই ভালবাসা ধাবিত হয় এমন যে স্বামী, তাহার কথা শুনিবার জন্য কি ভক্তির আবশ্যক করে? স্বামী ভক্তিভাজন অতএব ইহাঁর কথা পালন করিব, ইহা কি স্ত্রীর মুখে শোভা পায়? ভক্তির স্থলে স্বার্থত্যাগ একটা কর্ত্তব্য কার্য্য, অনুরাগের স্থলে স্বার্থত্যাগ একটা প্রিয় কার্য্য। অনুরাগে স্বার্থবিসর্জ্জন দিতেছি বলিয়া মনেই হয় না। অনুরাগের নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া। লোক মুখে শুনা গিয়াছে অনেক স্ত্রী প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করে! এমন হাস্যজনক কৃত্রিম অভিনয় ত আর দুটি নাই! কিন্তু এ ভাবটি আমাদের পরিবারের ভাব। আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি আর নাই। ভক্তি ভাব পরিবার হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দেওয়া আমার মত নহে ও তাহা দেওয়াও বড়

সহজ নহে, আমার মত এই যে ভক্তি ব্যতীত অন্য নানা প্রকার স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আছে, সে গুলিকে কৃত্রিম শিক্ষা দ্বারা দমন করিবার আবশ্যক নাই। ভাইয়ে ভাইয়ে সমান ভাব, সখ্যতার ভাব, স্ত্রী পুরুষে সমান ভাব, প্রেমের ভাব, পিতা পুত্রে অনুরাগের ভাব, এবং তাহার সহিত শ্রদ্ধার ভাব মিশ্রিত,(ভক্তির ভাব সর্ব্বত্র নহে) এই ত স্বাভাবিক। শ্রদ্ধার ভাব, অর্থাৎ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, চরণ ধূলি লইয়া পূজা করিবার ভাব নহে, সসম্ভ্রমে দশ হাত তফাতে দাঁড়াইবার ভাব নহে, কোন কথা কহিলে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহার উপরে তোমার মত ব্যক্ত করিতে নিতান্ত সঙ্কোচের ভাব নহে। এ ভাব শোভা পায় রাজার সম্মুখে, যাঁহার সহিত তোমার রক্তের সম্পর্ক নাই, যাঁহার প্রতি তোমার নাড়ীর টান নাই, যিনি তোমার কোন প্রকার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন কি না তোমার সন্দেহ আছে। পিতার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব কিরূপ? না, তোমার পিতার প্রতি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তিনি তোমার শুভাকাঙ্খী, জান' যে, তিনি কখন' কুপরামর্শ দিবেন না, জান' যে, তোমার অপেক্ষা তাঁহার অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, বিপদে আপদে পড়িলে সকলকে ফেলিয়া তাঁহার পরামর্শ লইতে মন যায় এমন একটা আস্থা আছে, তাঁহার সহিত মতামত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে, এই পর্য্যন্ত; একেবারে চক্ষু-কর্ণনাসাবরোধক অন্ধ নির্ভর নহে। আমি নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াও এক-জনকে শ্রদ্ধা করিতে পারি, কিন্তু আমরা যাহাকে ভক্তি বলি, তাহার কাছে আমাদের আর স্বাধীনতা থাকে না। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি উপদেশ দেন, পরামর্শ দেন, বুঝাইয়া বলেন, মীমাংসা করিয়া দেন, আদেশ দেন না, শাস্তি দেন না। আদেশ ও শাস্তি বিচারালয়ের ভাব, পরিবারের ভাব নহে। উপদেশ, অনুরোধ ও অভিমান আত্মীয় সমাজের ভাব। এ ভাব যদি চলিয়া যায় ও পূর্ব্বোক্ত ভাব পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে তবে সে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে শত হস্ত ব্যবধান পড়িয়া যায়, তবে আত্মীয়েরা পর হইয়া, দূরবর্ত্তী হইয়া একত্রে বাস করে মাত্র। সে রুগ্ন পরিবারে ভয়ের ও শাসনের রাজত্ব! দৈবাৎ যদি ভয়টার রাজ্যচ্যুতি হয় (কর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যুতে যেমন প্রায়ই হইয়া থাকে) তবে আত্মীয়দের মধ্যে কাক চিলের সম্পর্ক বাধিয়া যায়। আর কোন সম্পর্ক থাকে না।

আমাদের বঙ্গ সমাজের মধ্যে এই ভয়ের এমন একাধিপত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে, যেখানে ভয় সেই খানে কাজ যেখানে ভয় নাই সেখানে কাজ নাই। এক জন নবাগত ইংরাজ তাঁহার এক বাঙ্গালী বন্ধুর সহিত রেলোয়েতে ভ্রমন করিতেছিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল তথাপি গাড়িতে আলো পাইলেন না, অতি নম্রভাবে তিনি ষ্টেষনের একজন ভদ্র (!) বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে কহিলেন, "অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটা আলো আনাইয়া দিন, নহিলে বড়

অসুবিধা হইতেছে;" কর্ম্মচারীটি চলিয়া গেল। অমনি ইংরাজটির বাঙ্গালী বন্ধু কহিলেন "আপনি বড় ভাল কাজ করিলেন না, অমন করিয়া বলিলে বাঙ্গালীদের দেশে কখন আলো পাওয়া যায় না; যদি আপনি তেরিয়া হইয়া বলিতেন, 'এখনো আলো পাইলাম না, ইহার অর্থ কি" তাহা হইলে আলো পাইবার একটা সম্ভাবনা থাকিত।" আমি সেই বাঙ্গালীটির কথা শুনিয়া নিতান্ত লজ্জা বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি, কথাটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে সে ইংরাজটি যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া আলো আনাইলেন। এরূপ আরো সহস্র ঘটনা হয়ত আমাদের পাঠকেরা অবগত আছেন। অনেক বাঙ্গালী রেলোয়েতে যাইতে হইলে কোট্ হ্যাট্ পরেন ও গলা বাকাইয়া কথা কহেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে, বাঙ্গালী মেষণ কর্ম্মচারীদের জন্য দায়ে পড়িয়া তাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করেন। ইঙ্গবঙ্গেরা বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে যে কুণ্ঠিত হন তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা জানেন যে, বাঙ্গালীদের বাঙ্গালীরা মানে না। তাহারা বলের দাস। এক জন ভৃত্য তাহার কর্ত্তব্য কাজে শৈথিল্য করিতেছে তাহাকে দুই চড় কসাইলে সে সিধা হয়। ভয় না থাকিলে সে হয়ত কাজ করিবেই না। অতএব দেখা যাইতেছে ভয়ের শাসনে কত কাজের ক্ষতি হয়। তাহাতে আপাততঃ একটু সুবিধা আছে। একটা চাবুক কসাইলে তৎক্ষণাৎ একটা কাজ সমাধা হয়, কিন্তু সেই চাবুকের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ছেলেবেলা হইতে ভয়ের শাসনে থাকিয়া ভয়টাকেই আমরা প্রভু, রাজা বলিয়া বরণ করিয়াছি, সে ব্যতীত আর কাহারো কথা আমরা বড় একটা খেয়াল করি না। স্বাধীনতা শিক্ষার প্রণালী এইরূপ নাকি!

যদি স্বজাতিকে স্বাধীনতা প্রিয় করিয়া তুলিতে চাও, তবে সভা ডাকিয়া, গলা ভাঙিয়া, করতালি দিয়া একটা হট্ট গোল করিবার ত আমি তেমন বিশেষ আবশ্যক দেখি না। তাহার প্রধান উপায়, প্রতি ক্ষুদ্র বিষয়ে স্বাধীনতা চর্চ্চা করা। জাতির মধ্যে স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি ও পরিবারের মধ্যে অধীনতার শৃঙ্খল ইহা বোধ করি কোন সমাজে দেখা যায় না। প্রতি পরিবারেই যদি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদের ভ্রাতাদের, পুত্রদের, ভৃত্যদের স্বাধীনতা অপহরণ না করেন, পরিবারের মধ্যে যদি কতকগুলি কৃত্রিম-প্রথার অস্ট-পৃষ্ঠ-বন্ধন না থাকে, তবেই আমাদের কিছু আশা থাকে। যাঁহারা স্ত্রীকে শাসন করেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ও সন্তানদের প্রহার করেন, ভৃত্যদিগকে নিতান্ত নীচ জনোচিত গালাগালি দেন, তাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতার কথা যত কম ক'ন ততই ভাল। বোধ করি তাঁহারা চাকর বাকর ছেলে পিলে গুলাকে মারিয়া ধরিয়া, গালাগালি দিয়া বীর রসের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। এই মহাবীর বৃন্দ, এই পারিবারিক তৈমুর লঙ্গ, জঙ্গিস্ খাঁ

গণ যথেচ্ছাচারের বিষয় যতই বলেন, আর স্বাধীনতার কথায় যত কম লিপ্ত থাকেন ততই তাঁহারা শোভা পান। তাঁহাদের আস্ফালনের প্রবৃত্তিটা কমিয়া গেলেই দেশের হাড় যুড়ায়।

আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা স্বাধীন স্ফূর্ত্তি নাই বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বড় আক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমোদের জন্য বিরামের জন্য আমাদের অন্যত্র যাইতে হয়। পরিবারের সকলে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবার শত সহস্র বাধা বর্ত্তমান। ইনি শ্বশুর, উনি ভাসুর, ইনি দাদা, উনি ছোট ভাই, ইনি বড়, উনি ছোট ইত্যাদি কত যে সাত পাঁচ ভাবিবার আছে তাহার আর সংখ্যা নাই। লাভের হইতে হয় এই যে, আত্ম-বিনোদনের জন্য পরের সহায়তা আবশ্যক করে। আমাদের পরিবার আমাদের আমোদের স্থান নহে। (আমোদ বলিতে যাঁহারা দমনীয় কিছু বুঝেন, তাঁহাদের কল্পনা নিতান্তই বিকৃত।) ইহাকে ছুঁইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, উহার সহিত কথা কহিলে, এমন কি উহার নিকট মুখ দেখাইলে বেহায়া বলিয়া বিষম অখ্যাতি হয়; যেদিন কোন গুরুজন বাড়ির বধুর হাসির সুর শুনিতে পান, সে দিন সে বালিকা বেচারীর কপালে অনেক দুঃখ থাকে; দিনের বেলায় স্বামী স্ত্রীতে দেখাশুনা কথা বার্ত্তা হইলে পাড়ায় লোকের কাছে তাহাদের মুখ দেখাইবার যো থাকে না। নিজের ঘরেই যত বাঁধা বাঁধি, যত শাসন, যত আইন কানুন, আর বন্ধন মুক্ত স্বাধীন ব্যবহার কি পরের সঙ্গেই! পরিবারের মধ্যেই কি যত ঢাকাঢাকি, লুকাচুরি, ত্রস্তভাব! ইহার অপেক্ষা অস্বাভাবিক কিছু কল্পনা করা যায় না। আধুনিক যে সকল উন্নত পরিবারে এই সকল কৃত্রিম বন্ধন সমূহ দূরীভূত হইয়াছে, আমোদের নিমিত্ত সে পরিবার ভুক্ত কাহাকেও পরের নিকট ভিক্ষা করিতে হয় না। এই সকল বন্ধন-মুক্ত পরিরারে যে কেহ প্রবেশ করেন তিনিই চমৎকৃত হইয়া যান। বুঝিতে পারেন যে, আপনার লোক আপনার হইলে পরের আবশ্যক অনেক কমিয়া যায়।

যাহারা আপনার কনিষ্ঠদের নিজের সম্পত্তি মনে করে, তাহারা যে, নিজের ভৃত্যদেরও তাহাই মনে করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে। লেখক ইংলণ্ড হইতে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, "এখানে চাকরকে গালাগালি দেওয়া ও মারাও যা আর একজন বাহিরের লোককে গালাগালি দেওয়া ও মারাও তাই। আমাদের দেশের মত চাকরদের বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত অধিকার মনিবদের হাতে নেই। চাকর কোন কাজ ক'রে দিলে 'Thank you' ও তা'কে কিছু আজ্ঞা করবার সময় 'Please' বলা আবশ্যক।" ইহাতে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়াছেন,—"চাকরদের সঙ্গে পদে পদে সম্মান সূচক ব্যবহার করা আস্টে পৃষ্ঠে কাষ্ঠ সভ্যতার ভার বহন করা আমাদের দেশের সহজ সভ্য লোকদের পোষায় না। এ সকল কৃত্রিম সভ্যতার আমদানী যত কম হয় ততই ভাল; মনে কর ছেলের

জ্বর হ'য়েছে আর যেই তার বাপ একটা তালপাখা তুলে নিয়ে তার গায়ে বাতাস দিতে লাগল, অমনি ছেলে ব'লে উঠলেন, 'Thank you বাবা!' এরূপ কাষ্ঠ সভ্যতা কাষ্ঠ হৃদয়ের উপরেই গুণ করিতে পারে, সহজ হৃদয়কে আগুন করিয়া তোলে!" জাতীয় ভাব এমন একটি যুক্তি বিহীন অন্ধ বধির ভাব যে, সে নিতান্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি-কেও অযৌক্তিক করিয়া তুলে। আমাদের দেশে একটা সাধারণ সংস্কার আছে, যে, ইংরাজদের সমস্ত আচার ব্যবহার কাষ্ঠ-সভ্যতা প্রসূত, এরূপ সংস্কার সাধারণ লোকদের মধ্যেই বদ্ধ থাকা স্বাভাবিক, যাহারা কিছু বিবেচনা করেনা, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কেবল তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করিতেই জানে তাহাদেরই মুখে এরূপ কথা শোভা পায়, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি অত শীঘ্র একটা সংস্কারে উপনীত হন না। Please কথা বলিবার ভাবটার মূল যে রসনায় নহে হৃদয়ে, ইহা মনে করিতে আপত্তিটা কি? আমার যে ভাবটি নাই, আর এক ব্যক্তির সেই ভাব থাকিলেই তাহাকে মৌখিক বলিয়া মনে করা নিতান্ত অন্যায়। তাহা হইলে যত প্রকার অনুষ্ঠান আছে সমস্ত মৌখিক; জাতীয় হৃদয়ের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা যে পিতাকে প্রণাম করি, তাহা কৃত্রিম কাষ্ঠ-সভ্যতার প্রথা, তাহা আন্তরিক নহে। আমি ত বলি, এইরূপ মনে করা উচিত যে, ইংরাজ জাতির হৃদয়গত এমন একটি ভাব আছে, যাহাতে করিয়া তাহাকে স্বতঃই Please বলায়। সে ভাবটি কি? না তাহাদের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য ভাব। তাহারা সকলেই নিজে নিজেই নিজের কায করিতে চায়, ও তাহাই করে, এই নিমিত্ত অপরে যতটুকুই কাজ করিয়া দেয়, তাহা যতই সামান্য হউক না কেন, Thank you কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে, এবং অপরকে সামান্য কাজটুকু করিতে বাধ্য করিতে হইলেও তাহারা Please না বলিয়া থাকিতে পারে না। আমরা যেমন অনেক সামান্য কাজে পরের উপর নির্ভর করি, এবং পরের নিকটে অনেকটা আশা করি, আমাদের অত সহজে Please ও Thank you বাহির হয় না। এমন হইতে পারে যে, প্রতি বারেই যখন তাহারা Please ও Thank you বলে তখন তাহাদের হৃদয়ে ঐরূপ ভাব উদয় হয় না, কিন্তু ঐ ভাব হইতে যে এই প্রথার উৎপত্তি তাহা কি কেহই অস্বীকার করিবেন? আমরা যখন প্রতি অবসরেই প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করি, তখন যে ভক্তির উচ্ছ্বাস হইতে করি, তাহা নহে, অনেক সময়ে প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া করি, কিন্তু ইহা অসঙ্কোচে বলা যায় যে, গুরুভক্তি আমাদের দেশে বিশেষ প্রচলিত।

জাতীয় ভাব আমাদের কি অন্ধ করিয়াই তুলে! মনে কর আমাদের দেশে যদি কবরের প্রথা প্রচলিত থাকিত, ও ইংলণ্ডে শবদাহ প্রচলিত থাকিত তবে আমরা (অর্থাৎ জাতীয় ভাবোন্মত্ত পুরুষেরা) কি

বলিতাম? আর আজকালই বা কি বলি, একবার কল্পনা করিয়া দেখা যাউক্! আজ কাল আমরা বলি,"দেখ দেখি শবদাহে কত সুবিধা! স্থান সংক্ষেপ, ব্যয় সংক্ষেপ, স্বাস্থ্যরক্ষা, ইত্যাদি। এমন কি আমাদের দেখা দেখি দেখ' আজকাল য়ুরোপেও এই প্রথা প্রচলিত হইতেছে!" আর আমাদের দেশে যদি কবর প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে আমরাই বলিতাম, "যে দেশে কাষ্ঠ সভ্যতা প্রচলিত সেই দেশেই শবদাহ শোভা পায়! সুবিধাই কি সর্ব্বস্ব হইল, আর হৃদয় কি কিছুই নহে? যে দেহে সামান্য আঘাত মাত্র দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছি, যে দেহের স্পর্শে প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছি, আজ তাহা কি না অকাতরে দগ্ধ করিলাম? কি জন্য? না, স্থান সংক্ষেপের জন্য, ব্যয় সংক্ষেপের জন্য, সুবিধার জন্য? সহজ-সভ্য দেশের কি এই প্রথা? আবার নিজ হস্তে প্রিয়জনের মুখাগ্নি করা কি সহৃদয় জাতির কাজ!" জাতীয় ভাব এইরূপ একটা অদূর-দৃষ্টি, যুক্তিহীন অথচ গোঁ-বিশিষ্ট ভাব। উহা দ্বারা অতিমাত্র বিচলিত হওয়া সাধারণ লোকদের কাজ, চিন্তাশীল লোকদের নহে!

উপরের প্রস্তাব উপলক্ষে সম্পাদকের মন্তব্য।

পূর্ব্ব কালে চিকিৎসকেরা পুঁথির বচন অভ্রান্ত মনে করিয়া রোগ কেবল নয় রোগের আধার পর্য্যন্ত—রোগী পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে ত্রুটি করিতেন না, লোকের যখন চক্ষু ফুটিতে লাগিল তখন হাতুড়িয়ার দল ক্রমে ক্রমে পসার করিতে আরম্ভ করিল; অব্যর্থ ঔষধির বিজ্ঞাপন সংবাদ-পত্রের আপাদ মস্তক জুড়িয়া আশ্বাস বাক্যের ঘটায় রোগীর অর্দ্ধেক রোগ নিবারণ করিতে লাগিল,—উঁহারা ইঁহাদিগকে হাতুড়িয়া—ইঁহারা উঁহাদিগকে গোবৈদ্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু জন-সাধারণের রোগ উড়াইয়া দেওয়া তেমন সহজ ব্যাপার নহে। সমাজ-সংক্রান্ত রোগেরও ঐরূপ দুই দল চিকিৎসক দেখিতে পাওয়া যায়,—এক দল চিকিৎসক পুরাতন রীতি নীতিকে অব্যর্থ ঔষধি মনে করেন আর এক দল আপনাদের নব নব সিদ্ধান্তকে অব্যর্থ মহৌষধি মনে করেন। ফরাসীস্ বিদ্রোহে দুই দলেরই বিশিষ্টরূপে বল-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনো তাহার জের চলিতেছে,—তাহার সাক্ষী—সম্প্রতি হাতুড়িয়ার হাতে পড়িয়া রুষিয়াকে পতিহীনা হইতে হইয়াছে। দুই দলকেই লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং। বর্ত্তমান প্রস্তাব উপলক্ষে আমরা তাহাই বলিতে বাধ্য হইতেছি।

পারিবারিক দাসত্ব কথাটাই আমাদের কেমন কেমন ঠেকে,—তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া পারিবারিক বন্ধন কথাটাই আমাদের মনের সমক্ষে বল পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হয়,—কিন্তু তাহা বলিয়া বলকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের অভিপ্রায় নহে। দুই কথাকেই যুক্তির তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া যাহা দাঁড়াইবে তাহাই আমরা শিরোধার্য্য

করিতে প্রস্তুত। দাসত্ব শব্দের ভাবটা কিছু গোলমেলে; ও কথা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে;—ভূতপূর্ব্ব আমেরিকার প্রভুদের নিকট কাফ্রীদের আজ্ঞাধীনতাকে যেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায়, সেন্যপতির নিকট সৈন্যদিগের আজ্ঞাধীনতাকে সেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায় কি না? প্রভুর নিকট এক জন কিঙ্করের আজ্ঞাকারিতাকে যেমন দাসত্ব বলিতে পারা যায়—পিতামাতার নিকট পুত্রের আজ্ঞাকারিতাকে সেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায় কি না? দাসত্ব কথাটা শুনিলেই মনে হয় যে তাহার সহিত কাপুরুষত্ব জড়ানো আছে, কিন্তু ছোট ভাই যদি দাদা যাহা বলে তাহা শুনে তাহা হইলে তাহাকে কি কাপুরুষ বলিয়া মনে হয়—কিংবা সৈন্য যদি সেনাপতির কথা শুনে তাহাকে কি কাপুরুষ বলিয়া মনে হয়, তাহা দূরে থাকুক রাম অপেক্ষা লক্ষ্মণকে আরো বেশী বীর পুরুষ বলিয়া মনে হয়। লেখকের লেখার ধরণ দেখিলে হঠাৎ লোকের যাহা মনে হইতে পারে তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা উপরি উক্ত কথা গুলি বলিলাম—কিন্তু লেখক বোধ হয় রামের নিকট লক্ষ্মণের আজ্ঞাধীনতাকে দাসত্ব বলিয়া দোষ দিতে কখনই প্রবৃত্ত হইবেন না। কৈকেয়ীর মতন গুরুজনের নিকট রামের দাসত্বকেই লেখক দাসত্ব বলিয়া দোষারোপ করেন, কিন্তু তাহা হইলেও দাসত্ব শব্দটা শুনিবামাত্র কাপুরুষত্বের ভাব সহসা যাহা আমাদের মনে উদয় হয়, সে ভাব দূরে থাকুক তাহার ঠিক বিপরীত ভাবই আমাদের মনকে ভক্তি ও বিস্ময়-রসে অভিভূত করে; কৈকেয়ীর সমীপে রামের আজ্ঞাকারিতা অসাধারণ বীর পুরুষের লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। সৈন্যেরা যে সেনাপতির দাসত্ব করে, পুত্র যে পিতার দাসত্ব করে, সে দাসত্ব মহত্ত্বেরই লক্ষণ; একটি গান আছে "ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যেরই ভয়"—সেনাপতির দাসত্ব করিলে শত্রুর দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না, পিতার দাসত্ব করিলে অজ্ঞাত-কুলশীল যে সে লোকের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না; এক জন জর্ম্মান্ বক্তা বলিয়াছেন Liberty I am thy slave—এ দাসত্ব যেমন, পিতার কাছে দাসত্বও সেইরূপ উচ্চ দরের দাসত্ব। এইরূপ মহত্ত্বসূচক দাসত্ব যিনি যত অভ্যাস করেন তিনি তত নীচত্ব-সূচক দাসত্বের হস্ত হইতে দূরে অবস্থিতি করেন,—দুই দাসত্বের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই ত গেল শব্দের মারপ্যাঁচ—এখন আসল কথাটা কি দেখা যা'ক্;—লেখকের অভিপ্রায় এই যে, রাম কৈকেয়ীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারেন না বলিয়া কৈকেয়ীর কি কর্ত্তব্য যে, তিনি রামকে বনে পাঠান্? এখন—রামের গুরুজন বলিলে অগ্রে কৌশল্যা সুমিত্রা দশরথ বশিষ্ঠ প্রভৃতিকেই মনে পড়ে—কৈকেয়ীকে গুরুজনের ওঁচা বলিয়া মনে হয়। এস্থলে দেখা উচিত যে, কৈকেয়ী আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ রামের গুরুজন তাহার জন্য দায়ী নহেন। এমনি—কোথায় কোন্ গুরুজন আপনার

ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বলিয়া সাধারণত সকল গুরুজন সে দোষে দোষী হইতে পারে না;—কিন্তু লেখক বলেন সাধারণতঃ গুরুজনদিগের স্ব স্ব ক্ষমতার অপব্যবহার করিবারই কথা—না করেন ত সে ছোটদের পরম সৌভাগ্য। ক্ষমতার অপব্যবহার করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এই মূলতত্ত্বটির উপর দাঁড়াইয়া লেখক গুরুজনদিগের প্রতি ঘোরতর কটাক্ষপাত করিতেছেন,— তিনি বলেন "মনুষ্যজাতি স্বভাবতঃ ক্ষমতার অন্ধ উপাসক। যে পক্ষে ক্ষমতা সেই পক্ষে আমাদের সমবেদনা আর অসহায়ের আমরা কেহ না, এই জন্যই এক জনের হাতে যথেচ্ছা ক্ষমতা থাকিলে অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। তাহার ব্যবহারের ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার লোক সংসারে পাওয়া যায় না কাজে তাহাকে আর বড় একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হয় না। যাহাদের বিবেচনা করিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক সংসারের গতিকে এমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, তাঁহাদেরই বিবেচনা করিয়া চলিবার কম প্রবর্ত্তনা হয় এই গুরুজন সম্পর্কেই একবার ভাবিয়া দেখ না। আইন যত বাঁধাবাঁধি যত কড়াক্কড় সমস্তই কি কনিষ্ঠদের উপরে না ?"

এস্থলে বক্তব্য এই যে, ক্ষমতার অপব্যবহার যেমন মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ছোটোদের প্রতি স্নেহও তেমনি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ—বিশেষতঃ ঘরের ছেলেদের প্রতি,—আপনার ছেলেদের ত কথাই নাই। দুষ্ট বালকেরা অনেক জায়গায় গুরুজনদিগেরই স্নেহকে সহায় করিয়া গুরুজনদিগেরই প্রতি অবাধ্যতাচরণ করে—তাহারা মনে মনে বলে "হদ্দ মারিবেন নয় বকিবেন ফাঁসি ত আর দিবেন না,"—গুরুজনদিগের স্নেহ তাঁহাদের প্রভুতাকে ছাপাইয়া উঠে—ইহা বলা বাহুল্য। স্নেহের বাঁধ অতিক্রম করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার মাল-মোকোদ্দামা স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়—ঐরূপ বিশেষ বিশেষ স্থলে যাহা হয় তাহা সাধারণত সকল স্থলেই সংলগ্ন হইতে পারে না।

অদ্যাপি এমন কোন সমাজ-তত্ত্ববিৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ যাঁহাকে না মানিতে হইয়াছে যে—সমাজ-তত্ত্বের অতি অল্পই তাঁহাদের বুদ্ধির আয়ত্তাধীন। সামাজিক সকল তত্ত্বেরই দুই দিক্ আছে এবং দুই দিকেই ভাল মন্দ দুই-ই আছে;—এক দিকের ভাল এক দেশে শোভা পায়, আর একদিকের ভাল আর এক দেশে শোভা পায়, একদিকের ভাল এক কালে শোভা পায়; আর এক দিকের ভাল আর এক কালে শোভা পায়; এক দিকের ভাল এক পাত্রে শোভা পায় আর এক দিকের ভাল আর এক পাত্রে শোভা পায়;—এ ভিন্ন সকল দিকের ভাল একই দেশে একই কালে শোভা পাইবে কি সম্ভবই নহে।

ইংলণ্ড প্রভু যে দাসকে আজ্ঞা না করিয়া অনুগ্রহ করিতে বলেন তাহার ভালর দিকটাই লেখক দেখাইয়াছেন—কিন্তু অতটা কায়দা-কানন আমাদের দেশের সহজ-শোভন প্রকৃতির সহিত কোন

মতেই মিল খায় না,—আমাদের দেশের গৃহস্থেরা চাকর বাকরদের তুই-তোঁকারি করে বটে কিন্তু তাহার মধ্যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব দূরে থাকুক স্নেহ বাৎসল্যেরই প্রাবল্য দৃষ্ট হয়—আমাদের দেশের "বাপু বাছা" শব্দ Please, thank you প্রভৃতি শব্দ অপেক্ষা হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশ হইতে বাহির হয়; এবং সাধারণতঃ এইরূপ দেখা যায় যে ছেলেদের উপর পিতার কটু-কাটব্য করিবার যতটুকু অধিকার তাহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া ভৃত্যদের প্রতি কটূক্তি করা আমাদের দেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; তবে—সহর অঞ্চলের প্রকৃতিকে সাধারণতঃ আমাদের দেশের প্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিলে আমরা নিরুত্তর।

ভক্তি এবং অনুরাগ সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহাও আমাদের সঙ্গত বোধ হয় না। পূজ্যের প্রতি অনুরাগকেই ভক্তি কহে—সমানের প্রতি অনুরাগকেই প্রেম কহে—শাসন-ভয়কে ত আর ভক্তি বলে না। মনুষ্যের স্থায়ী উন্নতি-স্পৃহাও আছে এবং ক্ষণিক আমোদ-স্পৃহাও আছে, উন্নত লোকদিগের প্রতি ভক্তিও স্বাভাবিক, সমানে সমানে প্রেমও স্বাভাবিক। নেপোলিয়নের প্রতি সৈন্যদের কেমন অনুরাগ ছিল—সে অনুরাগ একরূপ, আর বয়স্যে বয়স্যে অনুরাগ একরূপ; প্রথম প্রকারের অনুরাগের নামই ভক্তি, দ্বিতীয় প্রকার অনুরাগের নামই প্রণয়; ভক্তি-প্রকাশ করা যেমন করিয়াই হউক না কেন তাহাতে কিছু আইসে যায় না,—কিছু না করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, সেলাম করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, প্রণাম করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, যাহাই হউক্ না কেন ভক্তির পাত্রে ভক্তি ভিন্ন নীচু শ্রেণীর অনুরাগ শোভা পায় না; মনে কর ব্যাস দেব আসিয়া তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার সহিত সেকৃহ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিতে তোমার কি মনে একটুও কিন্তু হইবে না? একত্র-বাসী ঘরের লোকদের মধ্যে কিছু না করিয়াও ভক্তিই বল, আর প্রণয়ই বল ব্যক্ত করা হইয়া থাকে; পুত্রেরা পিতাকে প্রণাম না করিয়াও ভক্তি প্রদর্শন করে, ভ্রাতারা পরস্পর আলিঙ্গন না করিয়াও সৌহার্দ্দ বিস্তার করে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা প্রেমের মূল্য অধিক বলিয়া যদি মানা যায় তবে তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে—সে কারণ অন্য কোথাও খাটে না, সে কারণ এই যে, তিনি যেমন দূর হইতে দূরতম তেমনি নিকট হইতে নিকটতম—যেমন বৃহৎ হইতে বৃহৎ তেমনি অণু হইতে অণু; কিন্তু সংসারে, যে বড় সে বড়, যে ছোটো সে ছোটো,—বড়-ছোটোর মধ্যে এইরূপ প্রাচীরের আড়াল রহিয়াছে; তাহা যদি না থাকে তবে সংসারের বৈচিত্র্য রক্ষা হইতে পারে না।

লেখক বলিয়াছেন "এই জন্য সকল শাস্ত্রেই লিখিয়াছে যে গুরুজনের অবাধ্য হওয়া পাপ কোন শাস্ত্রেই লেখে নাই কনিষ্ঠদের প্রতি যথেচ্ছাব্যবহার করা পাপ।" একথাটি ঠিক নয়। মনু বলিয়াছেন "গুরো-

রূপ্যাবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথ প্রতিপন্নস্য ন্যায্যংভবতি শাসনং।" গুরু যদি গর্ব্বিত কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান শূন্য ও বিপথগামী হন তাঁহাকেও শাসন করা উচিত। এখনও লোক প্রবাদ আছে "যে দোষা বাচা গুরোরপি।"

জ্ঞানের অঙ্গ-বৈচিত্র্য।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি।

প্রশ্ন। তোমার কথার মর্ম্ম আমি এইরূপ বুঝিতেছি যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপতঃ এক অথচ তাহার বিষয়োন্মুখী বুদ্ধি-বৃত্তি বিচিত্র বিষয়-রাগে রঞ্জিত এবং বহুধা বিকীর্ণ; ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, বুদ্ধি-বৃত্তিই জ্ঞানের অঙ্গ বৈচিত্র্যের মূল; এই না তোমার অভিপ্রায়? কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান আপনাব স্বরূপ ছাড়িয়া যে বুদ্ধি বৃত্তি রূপে পরিণত হয়—ইহা কেন হয়—ইহার আবশ্যকতা কি? অসীম আকাশের এবং অনাদ্যন্ত কালের সকল তত্ত্ব ব্যাপিয়া যে এক মূলতত্ত্ব তাহাই যদি বিশুদ্ধ জ্ঞান হয় তবে তাহার কিসের অভাব যে, মুক্ত অবস্থা হইতে নামিয়া বুদ্ধি বৃত্তির সংকীর্ণ ভাব পরিগ্রহ করিবে।

উত্তর। বিশুদ্ধ জ্ঞানের কিছুরই অভাব নাই ইহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি কিন্তু তদ্ভিন্ন আর সকল বস্তুতেই একটা না একটা অভাব রয়ে-ই-চে—সেই অভাব সমষ্টির মূলাধার যাহা তাহাই প্রকৃতি এবং সেই অভাব সমষ্টি যদ্দ্বারা পূরিত হয় এমন যে প্রভাব-সমষ্টি তাহার মূলাধার—বিশুদ্ধ-জ্ঞান। প্রকৃতির অভাব কোথা হইতে? বিচ্ছেদ হইতে,—প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু অন্যান্য বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন, সুতরাং সকল বস্তুতে সকল গুণ সম্ভবে না—এক বস্তুতে যাহা আছে অন্য বস্তুতে তাহা নাই, এই অভাব পূরণের জন্যই যাওয়া-আসার সৃষ্টি,—এক পরমাণুতে যে অভাব আছে তাহার পূরণের জন্য অন্য পরমাণুদের নিকট তাহার যাওয়া আসা আবশ্যক—অভাবই ক্রিয়াব প্রবর্ত্তক। কিন্তু গোড়ায় যদি প্রভাব না থাকিত তবে অভাবের শুদ্ধ কেবল আঁকু বাঁকুই সার হইত—শিশু ক্ষুধার উত্তেজনায় হাত পা আছাড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে কিন্তু তাহাকে স্তন্য পান করাইবার লোক নাই—এইরূপ দশা হইত। অভাব—বিচ্ছেদ হইতে,—প্রভাব কোথা হইতে? পূর্ণতা হইতে। এক অক্ষৌহিণী-পতির অধীনে মনে কর যেন দশ জন সহস্র-পতি দশ জায়গায় যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে, এক এক সহস্র-পতির অধীনে আবার দশ দশ জন শত-পতি দশ জায়গায় যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে। অক্ষৌহিণী-পতির প্রভাব দশজন সহস্র-পতি ভেদ করিয়া, শত জন শত-পতি ভেদ করিয়া, লক্ষ দল-বলে বিকীর্ণ রহিয়াছে। কত সৈন্য কোথায় কখন প্রেরণ করিতে হইবে—কোন জায়গা অধি-

কার করিলে জয়-লাভের কত সম্ভাবনা—ইত্যাদি-প্রকার যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব দ্বারা অক্ষৌহিনীপতির মন পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সহস্র-পতির মন কতকটা ঐরূপ—কিন্তু উহার মত অতটা নহে, শত-পতির মন তাহা অপেক্ষাও অল্প পরিমাণে ঐরূপ; সৈন্যদের ওরূপ কিছুই না—বলিলেই হয়। "শত্রুদের যদি না বধ করি তবে আমরা হত হইব" এই যে একটি অভাব-বোধ ইহা দ্বারা সৈন্যেরা যুদ্ধ কার্য্যে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট রহিয়াছে,—কিন্তু তাহারা কেবল বিপক্ষ-দল বধ করিয়াই ক্ষান্ত, তাহাদের কাহার কার্য্যের উপর কত পরিমাণে জয়-লাভ নির্ভর করে তাহা তাহারা বলিতে পারে না—তাহা শত-পতি কতকটা বলিতে পারে—সহস্র-পতি আরো অধিক বলিতে পারে— অক্ষৌহিনী-পতির ত কথাই নাই। উপস্থিত যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম-প্রণালী যেমন অক্ষৌহিনী-পতির আয়ত্তাধীন, প্রকৃতির সমস্ত নিয়ম-প্রণালী সেইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের আয়ত্তাধীন; অক্ষৌহিনী-পতির প্রভাব যেমন সমস্ত সৈন্য-দলে পরিকীর্ণ হইয়া সকলকে এক ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাব সমস্ত-প্রকৃতিময় পরিকীর্ণ হইয়া সকলকে এক ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; এ জন্য এক বস্তু আর এক বস্তু হইতে সহস্র বিচ্ছিন্ন হইলেও ভিতরে ভিতরে তাহাদের মধ্যে যোগ-সূত্র প্রবাহিত থাকে—সূর্য্য পৃথিবী-হইতে এত যে দূরে অবস্থিতি করে তথাপি সূর্য্যের একটু কিছু হইলে পৃথিবীর মর্ম্মে আঘাত পৌঁছে। বিশুদ্ধ জ্ঞান অসীম আকাশ এবং অনাদ্যন্ত কালের বন্ধন-সূত্র;—এক কালের সহিত আর এক কালের যে ধারাবাহিক যোগ রহিয়াছে, এক দেশের সহিত আর এক দেশের যে ধারাবাহিক যোগ রহিয়াছে, সে কেবল সেই সার্ব্ব-ভৌমিক বন্ধন-সূত্রের গুণে; বিশুদ্ধ জ্ঞানকে শূন্য এক মনে করিলে তাহাকে নির্জ্জীব ভাবে দেখা হয়,—কিন্তু যখন দেখি যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার হইতে সমস্ত প্রকৃতির সমস্ত অভাব অজস্র ধারে পরিপূরিত হইতেছে—অন্ধকারের মধ্য দিয়া জ্যোতি উদ্ভাসিত হইতেছে—অজ্ঞানের মধ্য দিয়া জ্ঞান উন্মেষিত হইতেছে—অভাবের মধ্য দিয়া ভাব উদ্দীপ্ত হইতেছে—তমোগুণের মধ্য দিয়া সত্ত্বগুণ প্রাদুর্ভূত হইতেছে—তখনই বিশুদ্ধ জ্ঞানকে জীবন্ত ভাবে দেখি—দেখি যে বিশুদ্ধ জ্ঞান কেবল জ্ঞানের জ্ঞান নহে, যেমন জ্ঞানের জ্ঞান তেমনি প্রাণের প্রাণ। প্রকৃতি অভাবের মূলাধার—বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রভাবের মূলাধার; বিশুদ্ধ জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত প্রকৃতি থাকিতে পারে না, প্রকাণ্ড এক অভাব-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়; প্রকৃতি না থাকিলেও বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাব স্ফূর্ত্তি পায় না, প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে এই রূপ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের টান। পুরুষকে ছাড়িয়া প্রকৃতির যে অভাব তাহাই তমোগুণ, সেই অভাব পূরণের জন্য ব্যস্ততা রজোগুণ এবং পুরুষের অধিষ্ঠান-প্রভাবে সেই অভাব হইতে ভাবের উদ্রেক সত্ত্ব-গুণ, এ কথা শাস্ত্র এবং

যুক্তি উভয়েরই সহিত সঙ্গত। বিচ্ছিন্ন বস্তু-সকলের পরস্পর-সংসর্গ-জনিত পরস্পরের অভাব মোচন হাওয়াতে-করিয়া প্রকৃতি ক্রমশই অভাব হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে—তমোগুণ হইতে সত্ত্বগুণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সাংখ্য শাস্ত্র সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণের ব্যাখ্যা এই রূপ করেন যে, সত্ত্ব-গুণ প্রকাশাত্মক এবং সুখাত্মক, রজোগুণ ক্রিয়াত্মক এবং দুঃখাত্মক ও তমোগুণ স্থিতিশীল (inert) ও মোহাত্মক; ত্রিগুণের প্রত্যেকের এই যে দুই দুই লক্ষণ ইহার তাৎপর্য্য এই,—(১) শুদ্ধ অভাব মাত্র নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম, তাহাই তমোগুণ,—(২) অভাবের বোধই দুঃখ এবং তাহাই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক—তাই রজোগুণ দুঃখাত্মকও বটে ক্রিয়াত্মকও বটে,—(৩) আর পূর্ণতার একমাত্র নিকেতন যে বিশুদ্ধ জ্ঞান তাঁহার আলোক দ্বারা অভাবের পূরণ—বিচ্ছেদের মিলন—ইহারই নাম প্রকাশ, এজন্য সত্ত্ব-গুণ প্রকাশাত্মকও বটে—অভাব-নিরাকরণ জন্য সুখাত্মকও বটে। এখন বক্তব্য এই যে বিশুদ্ধ জ্ঞান হইতেই জ্ঞানের একত্ব—এবং ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি হইতেই জ্ঞানের অঙ্গ-বৈচিত্র।

প্রশ্ন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের আপনার কোন অভাব নাই—অভাব যাহা তাহা প্রকৃতির; প্রকৃতির অভাব কি প্রকৃতি আপনি পূরণ করিতে পারে না? প্রকৃতির কি কোন শক্তি নাই—যদি আদবেই তাহার শক্তি না থাকে তবে তাহার অস্তিত্বই বা কি রূপ?

উত্তর। তোমার কথার ভাব এই যে প্রকৃতির যদি শক্তিই নাই তবে তাহার আছে কি? ইহার উত্তর এই যে, বালকের ক্রন্দনই বল—প্রকৃতির ক্রন্দনই তাহার শক্তি;—বিচ্ছেদ হইতে অভাব, অভাব হইতে ক্রন্দন,—এক দিক্ হইতে সেই ক্রন্দন উত্থিত হয় আর এক দিক্ হইতে প্রভাব অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃতির অভাব পূরণ করে,—এটি হয় জ্ঞানের দিক্ হইতে; উদরস্থ অন্ন হইতে প্রথমে যেমন কালো রক্ত উৎপন্ন হইয়া শিরা বাহিয়া উপরে উঠে, পরে প্রাণ-প্রভাবে সেই রক্ত লোহিত বর্ণ হইয়া শরীরের সকল অভাব পূরণ করত সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি হইতে অন্ধকার ময় ক্রন্দন জ্ঞানাভিমুখে উত্থিত হয়, পরে জ্ঞানের প্রভাবে তাহা জ্যোতির্ম্ময় শক্তিরূপে পরিণত হইয়া প্রকৃতির অভাব দূর করে।

প্রশ্ন। কবিতার দৌড় মন্দ নয়—কিন্তু আমি সাদা কথার ভক্ত,—অত উচ্চে দৌড় না দিয়া আর একটু মাটির কাছে কাছে থাকিলে ভাল হয়।

উত্তর। আর বলিতে হইবে না,—তাহাই হইতেছে। মনে কর যেন এক মুহূর্ত্তের কমে কোন শব্দ আমাদের শ্রবণে উপলব্ধি হইতে পারে না। দুই আধ মুহূর্ত্ত জড়াইয়া এক মুহূর্ত্ত হয়; প্রথম আধ মুহূর্ত্তের শব্দ দ্বিতীয় আধ মুহূর্ত্তের শব্দ হইতে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন ছিল ততক্ষণ তাহা প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যখন দ্বিতীয় আধ মুহূর্ত্তের শব্দের সহিত প্রথম আধ

মুহূর্ত্তের শব্দ, সংযুক্ত হইল তখনই শব্দ বোধের উৎপত্তি হইল; যখন প্রথম আধ-মুহূর্ত্তের অভাব দ্বিতীয় আধ মুহূর্ত্তের দ্বারা পূরণ হইল তখনই শব্দ-বোধ উৎপন্ন হইল—তাহার পূর্ব্বে নহে। কিন্তু অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি ত আর আপনা হইতে হইতে পারে না, শূন্য ঘটের মধ্য হইতে ত আর আপনাআপনি জলের উৎপত্তি হইতে পারে না;—দুই অর্দ্ধ মুহূর্ত্তের যে দুই শব্দ তাহা শব্দই নহে তাহা শব্দাঙ্কুর মাত্র—উভয়েতেই শব্দের অভাব বিদ্যমান—শব্দ তবে কোথা হইতে আইসে? ও দুটী শব্দাঙ্কুর জাতিতে এক—কালে বিভিন্ন;—দুই অর্দ্ধ মুহূর্ত্তের দুই শব্দাঙ্কুরের মধ্যে জাতিগত ঐ যে ঐক্য তাহাই শব্দ—আর সে ঐক্য কেবল বুদ্ধিই উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা উপলব্ধি করা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম নহে; শ্রবণেন্দ্রিয়ে যখন যেটি উপস্থিত হয় তখন সেইটিই গৃহীত হয়—কালান্তরীয় শব্দ বর্ত্তমান কালে গৃহীত হয় না; কিন্তু স্মরণ-শক্তির প্রভাবে বর্ত্তমান কালের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অতীত কালের শব্দ আমাদের অন্তঃকরণে গৃহীত হয়—এবং বুদ্ধি দুয়ের মধ্যে জাতিগত ঐক্য উপলব্ধি করিয়া দুইকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করে। আরো ঠিক কথা এই যে বুদ্ধি শব্দরূপী ঐক্য-বন্ধন-দ্বারা শব্দাঙ্কুর-দ্বয়ের বিচ্ছেদের উচ্ছেদ করে—শব্দরূপী ভাব দ্বারা তাহাদের অভাব পূরণ করে—তবেই শব্দ বলিয়া একটা বিষয় খাড়া হয়। বিচ্ছিন্ন শব্দাঙ্কুরদ্বয় নিজে তবে কি? না শব্দরূপে পরিণত হইবার জন্য একটা আঁকুবাকু।

অতএব শব্দের অভাব হইতে শব্দরূপী যে একটা ভাবের উৎপত্তি হয়—তাহা অভাবের গুণে হয় না, বুদ্ধির প্রভাব-গুণেই হয়। এই রূপ ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে প্রকৃতির অভাব-সূচক আঁকুবাঁকু জ্ঞানের প্রভাব দ্বারা পূর্ণ হয়—এবং এই ব্যাপারটির ভিতর দিয়াই জ্ঞান এবং প্রকৃতি উভয়েরই সজীব মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি পায়।

প্রশ্ন। সবই বলিলে ভাল—কেবল গোড়াতেই গোল। প্রথম আধ-মুহূর্ত্তের শব্দাঙ্কুর এত অল্প-ক্ষণ-স্থায়ী যে, উপস্থিত হইবা মাত্র তাহা শব্দ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না—গ্রাহ্যই যদি না হইয়া থাকে তবে দ্বিতীয় আধ মুহূর্ত্তের শব্দাঙ্কুরের সহিত তাহার সমজাতীয়তা কিরূপে নিরূপিত হইবে; যদি একটা মূষিক আমার সম্মুখ দিয়া এত দ্রুত বেগে চলিয়া যায় যে তাহা আমার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় তবে তাহা আর একটা মূষিকের সহিত জাতিতে এক ইহা আমি কেমন করিয়া বলিতে পারিব।

উত্তর। শব্দাঙ্কুর শব্দেরই অংশ—কিন্তু এত অল্প অংশ যে তাহা স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধি-যোগ্য নহে, সুতরাং তাহা শব্দ-জাতীয় বিষয় হইয়াও শব্দজাতীয় বিষয় বলিয়া স্বতন্ত্ররূপে গৃহীত হইতে পারে না—অন্যান্য শব্দাঙ্কুরের যোগেই তবে তাহা শব্দ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে,—তাহা যে শব্দজাতীয় তাহা বুদ্ধি-যোগে পরে প্রকাশ পায়—প্রথমে তাহা প্রকাশ পায় না,—শব্দাঙ্কুর-দ্বয়ের মধ্যে জাতিগত ঐক্য উপলব্ধি বুদ্ধির

এক প্রকাকার—সৃষ্টি, অর্থাৎ ভিতর হইতে পাওয়া—বাহির হইতে নহে; মূষিক গেল কি বিড়াল গেল—তাহা আমরা চক্ষে দেখিলে তবে বলিতে পারি, কিন্তু শব্দাঙ্কুর যে শব্দজাতীয় তাহা বুদ্ধি আপনা হইতে স্থির করে,—দুইটি শব্দাঙ্কুর উপর্য্যুপরি উপস্থিত হইলেই বুদ্ধি আপনার ভিতর হইতে ভাব-বন্ধন—ঐক্য-বন্ধন—বাহির করিয়া তাহাদিগকে শব্দরূপে গঠিয়া তোলে। বৈদান্তিক ভাষায় বলিতে হইলে—রজ্জু যেমন সর্প নহে শব্দাঙ্কুর সেই রূপ শব্দ নহে, তথাপি শব্দাঙ্কুরের সমষ্টিতে শব্দের অধ্যাস বুদ্ধি কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। অতএব শব্দের উপাদান কারণ—শব্দাঙ্কুর, শব্দের নিমিত্ত কারণ—বুদ্ধি এবং যে প্রকরণ দ্বারা শব্দাঙ্কুর হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা ভাবনা;—ভাবনা শব্দটাই ভাবনার অর্থব্যঞ্জক—অভাবকে ভাব করিয়া তোলাই ভাবনা;—শব্দাঙ্কুরদ্বয়ে শব্দের অভাব যা আছে, পরস্পরের যোগসংঘটন -দ্বারা সে অভাবের পূরণ চেষ্টাই ভাবনা,—সে যোগ-সংঘটন আসিবে কোথা হইতে—যদি একত্ব গোড়ায় না থাকিবে? বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব স্ফুরিত হইলে তবে ত যোগ কথাটার অর্থ পাওয়া যায়—তাহার পূর্ব্বে ত আর নহে; একত্ব স্ফুরণ করে—বুদ্ধি, যেহেতু একই বুদ্ধি কর্ত্তৃক নানা বিষয় গৃহীত হয়। অতএব বিষয়জ্ঞানের প্রকরণ-পদ্ধতি তিনটি পাওয়া যাইতেছে—(১) প্রকৃতির বৈচিত্র্য ইন্দ্রিয়সন্নিধানে উপস্থিত হওয়া—(২) ভাবনা-কর্ত্তৃক তাহাদের যোগ-সংঘটন অথবা আন্দোলন (৩) এবং বুদ্ধি কর্ত্তৃক একত্ব স্ফুরণ। শব্দাঙ্কুর-দ্বয় তমোগুণ, শব্দের ভাবনা-ক্রিয়া রজোগুণ এবং শব্দের প্রকাশ সত্ত্বগুণ—এরূপ বলিলে অসঙ্গত হয় না। এই প্রকার ত্রিগুণের ভিন্নতাই জ্ঞানের অঙ্গ বৈচিত্র্যের মূল।

ক্রমশঃ।

সম্পাদকের বৈঠক।

দোকান্‌দার বড় লোক

কিম্বা

হঠাৎ নবাব।

জুর্দ্দ্যাঁ, দুই জন পেয়াদা।

জুর্দ্দ্যাঁ। তোমরা আমার সঙ্গে এসো, আমার এই পোষাক সমস্ত সহর-ময় একবার দেখিয়ে আসি। আর, তোমরা ঠিক্ আমার পিছনে পিছনে থেকো, তাহলে লোকে বুঝ্‌তে পারবে যে তোমরা আমারই পেয়াদা।

পেয়াদা। যে আজ্ঞা হুজুর।

জু। আমার দাসী নিকোলকে ডেকে দাও তো হে—তাকে কতকগুল হুকুম দিতে হবে। আর যেতে হবে না; ঐ এসেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ, নিকোল, দুই পেয়াদা।

জু। নিকোল!

নিকোল। আজ্ঞে?

জু। শোনো।

নি। (হাসিতে হাসিতে)—হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আরে, হাস্ চিস্ কেন?

নি। হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আরে মর্ মাগি ও রকম কচ্চে কেন?

নি। হি, হি, হি. কেমন মজার সাজ হয়েচে। হি, হি, হি।

জু। কেন, কি রকম হয়েচে?

নি। ওমা! আমি যাব কোথা! হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আ মর্ মাগি, তুই আমাকে নিয়ে তামাসা কচ্চিস্?

নি। না মশাই, তা কি করতে পারি। হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। দেখ্, ফের যদি হাসবি, তো কিলিয়ে তোর নাক ভেঙ্গে দেব।

নি। মশাই আমি হাসি রাখ্‌তে পাচ্চিনে। হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। তুই থাম্‌বি নে?

নি। মশাই আমাকে মাপ কর; কিন্তু মশাই তোমাকে এমন মজার দেখ্‌তে হয়েচে, যে না হেসে থাকতে পাচ্চি নে। হি, হি, হি।

জু। দেখ দিকি মাগির আস্পর্দ্ধা!

নি। তোমাকে ভারি মজার দেখতে হয়েচে। হি হি।

জু। আমি তোকে—

নি। আমাকে মশাই মাপ কর। হি, হি, হি, হি।

জু। দেখ্, তুই ফের যদি হাস্‌বি, তোর গালে এমনি চড় কষিয়ে দেব যে তখন দেখ্‌তে পাবি।

নি। আচ্ছা মশাই, এইবার হয়েচে আর আমি হাস্‌ব না।

জু। দেখিস খবরদার। আজ বিকেল বেলায় ঝাঁট দিতে হবে—

নি। হি, হি।

জু। দেখিস যেন ভাল করে ঝাঁট দিস্—

নি। হি, হি।

জু। শোন্ কি বলচি, হলের ঘরটা ভাল ক'রে ঝাঁট, দিস্ আর—

নি। হি, হি।

জু। ফের?

নি। (হাসিতে হাসিতে ভূতলে পড়িয়া) বরং আমাকে মারো মশাই, আমি একবার মন খুলে হেসে নি—আমার দম ফেটে যাচ্চে, একটু আমি হেসে বাঁচি। হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আমার রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলচে।

নি। মশাই, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে একটু হাস্‌তে দেও।

জু। আমি যদি একবার আরম্ভ করি—

নি। মশাই—ই আমি দম্‌ফেটে মরবো যদি না হাস্‌তে পাই, হি, হি, হি।

জু। এমন লক্ষ্মীছাড়া মাগি কেউ কখন কি দেখেচে—আমি কোথায় ওকে হুকুম দিতে এলুম না ওর এতদূর আস্পর্দ্ধা যে আমার হুকুম না শুনে আমার মুখের উপর ও হাস্‌তে আরম্ভ করেচে।

নি। কি করতে হবে মশাই বল।

জু। আজ বিকেলে নিমন্ত্রন খেতে আমার এখানে লোক আস্‌বে, হারামজাদি তাই বল্‌চি বাড়িটা ঠিকঠাক্ করে রাখ্।

নি। (উঠিয়া) মাইরি, আর আমার হাস্‌তে ইচ্ছে নেই, তোমার কথায় মশাই আমার রাগ ধর্‌চে, যখনি তোমার লোকজন আসে, বাড়ির মধ্যে এমন হুলস্থূল প'ড়ে যায়।

জু। তোর জন্যে আমার বাড়ির দরজা বন্দ করে রাখ্‌তে হবে না কি, অ্যাঁ?

নি। নিদেন মশাই কতক লোকের জন্য বন্দ করা দরকার।

---

৩ য় দৃশ্য।

জুর্দ্দ্যাঁর স্ত্রী, জুর্দ্দ্যাঁ, নিকোল্, দুই জন পেয়াদা।

স্ত্রী। ভ্যালা যাহোক! এ আবার কি! এ নতুন সাজ আবার কোথা থেকে পেলে? তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ হয়েচে না কি? এই রকম সাজ করে বাহিরে বেরোচ্চো? তোমার কি এই ইচ্ছে তোমাকে দেখে সহর শুদ্ধ লোক হাসুক?

জু। এ তুমি বেশ জেনো ঠাকরণ, কতকগুল পাগল আর পাগলী বই আমাকে দেখে আর কেউ হাস্‌বে না।

স্ত্রী! লোকে হাস্‌তে আর বড় বাকি রাখেনি—তোমার রকম সকম দেখে অনেক দিন থেকেই সবাই হাস্‌তে আরম্ভ করেচে।

জু। আচ্ছা বল দেখি ঠাকরণ সবাই-টা কে?

স্ত্রী। সবাই যাদের বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, যারা তোমার মত পাগল নয়। যা হোক্ তোমার রকম সকম দেখে আমি অবাক হয়েচি। আমাদের বাড়ি আর চেন্‌বার জো নেই। যে রকম গোলমাল, লোকে শুনলে মনে করতে পারে রোজ রোজ এখানে মোচ্ছব বসে—সকাল থেকে, গাইয়েদের চিৎকারে আর বেহালার কাঁকো শব্দে পাড়ার লোকেরা বিরক্ত হয়।

নি। ঠাকরণ ঠিক্ বলেছেন। তুমি এই রকম লোকজন রোজ রোজ আনলে আমি তো আর বাড়ি সাফ্ রাখ্‌তে পারিনে, তারা পায়ে ক'রে এখানে রাজ্যের কাদা নিয়ে আসে, ঘরের মেজে রগড়াতে রগড়াতে আমার পা খসে পড়ে।

জু। বাঁ রে বা নিকোল, পাড়াগাঁ থেকে এসে যে খুব মুখ ফুটেচে দেখচি!

স্ত্রী। নিকোল, ঠিক বলচে, তোমার চেয়ে ওর বুদ্ধি আছে—আচ্ছা ভাল বল

দেখি, আমি জানতে চাই, তোমার এই বয়েসে নাচের ওস্তাদের দরকার কি ?

নি। আর সেই তলোয়ারের ওস্তাদেরই বা দরকারটা কি—সে যখন খট খট্ করে আসে, আমাদের বাড়িটা কেঁপে ওঠে—মেজের টালিগুল ভেঙ্গে যায়।

জু। আমার চাকরাণী, আর আমার স্ত্রী, দুজনেই তোমরা চুপ্ কর।

স্ত্রী। পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই—এই বয়সে কি না তোমার নাচ শিখ্‌তে সখ গেছে !

নি। মশাই তোমার কি কাউকে মেরে ফেল্‌তে ইচ্ছে হয়েছে ?

জু। তোমরা চুপ্ কর বল্‌চি, তোমরা দুজনেই মুখ্যু, ও সব লোকের মর্য্যাদা তোমরা কি বুঝবে ?

স্ত্রী। এখন ও-সব রেখে যাতে তোমার মেয়ের বিয়ে হয় তারই ভাবনা ভাবো। তার বিয়ের সুপ্যি বয়েশ হয়েচে।

জু। যখন ভাল পাত্র এসে উপস্থিত হবে, তখন আমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবা যাবে। এখন যাতে ভাল ভাল চীজ শিখ্‌তে পারি, আমার সেই ভাবনা হয়েচে !

নি। ঠাকরুণ আরও আমি শুনলুম নাকি ন্যাকাপড়া শেখবার জন্য একজন ভটচায্যি' পণ্ডিত রেখেচেন, তাহলেই চুড়োন্ত হবে।

জু। সত্যিই তো আমি রেখেছি। আমার একটু বিদ্যে শিখ্‌তে ইচ্ছে আছে, বড় লোককের সঙ্গে তাহলে আমি নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করতে পারব।

স্ত্রী। তার চেয়ে এই বয়সে পাঠশালায় গিয়ে গুরুমশায়ের বেত খাও না কেন ?

জু। কেনই বা খাব না ? ইস্কুলে লোকে যা শেখে আমি যদি তা শিখ্‌তে পাই, তাহলে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা যেন এখনি আমি সকলের সম্মুখে বেত খাই।

নি। হাঁ তাহলে আর কিছু না হোক্, মশাই তোমার পিঠের গড়ন অনেকটা ভাল হয়।

স্ত্রী। গেরস্ত-আলি কাজ করবার জন্য ওসবে তোমার বড় দরকার—না ?

জু। তার সন্দেহ নেই। তোমরা দুজনেই জানোয়ারের মত কথা কচ্চ, তোমাদের মুখখুমি দেখে আমার ভারি লজ্জা হয় (স্ত্রীর প্রতি)। তার দৃষ্টান্ত, তুমি এখন যে কথা কোইলে সেটা কি, তা কি তুমি জানো ?

স্ত্রী। হাঁ আমি বেশ জানি, আমি যা তোমাকে বল্লুম তা খুব ভাল কথা—আমি বলছিলুম তোমার ধরণ-ধারণ বদ্‌লানো খুব দরকার।

জু। আমি তা বল্‌চি নে—আমি জিজ্ঞেস কচ্চি, তুমি যে কথাগুল কইলে, সে গুলো কি ?

স্ত্রী। সে গুলো ভাল কথা—তোমার মত পাগ্‌লামি নয়।

জু। আমি তা বল্‌চি নে। আমি এই জিজ্ঞেস কচ্চি, এখন তোমার সঙ্গে যা কথা কচ্চি, তোমাকে যা বল্‌চি, সেটা কি জিনিস্ ?

স্ত্রী। মাথা আর মুণ্ডু।

জু। নানা, তা নয়। যা আমরা দু জনেই এখন বল্‌চি, যে ভাষায় আমরা দু জনে কথা কচ্চি!

স্ত্রী। অ্যাঁ?

জু। তাকে কি বলে?

স্ত্রী। যা তোমার ইচ্ছে তাই বল্‌তে পার।

জু। আরে মুখ্‌খু, একে বলে গদ্য।

স্ত্রী। গদ্য?

জু। হাঁ, গদ্য। যা গদ্য, তা পদ্য নয়। আর যা পদ্য তা গদ্য নয়। অ্যাঁ হ্যাঁ এখন দ্যাখো বিদ্যে কি জিনিস! (নিকোলের প্রতি) আর তুই, তুই জানিস উ বলতে গেলে কি করতে হয়?

নি। সে কি?

জু। যখন তুই উ বলিস্‌ তখন তুই কি করিস্‌?

নি। কি?

জু। আচ্ছা একবার বল দেখি উ।

নি। আচ্ছা! উ।

জু। এখন কি করলি?

নি। আমি বল্লুম উ।

জু। হাঁ, কিন্তু যখন উ বলিস্‌ তখন কি করিস?

নি। যা তুমি আমাকে করতে বল তাই করি।

জু। আঃ! এই সব জানোয়ারদের বোঝানো বড় ঝক্‌মারি! তুই করিস্‌ কি শোন্‌—তুই ঠোঁট দুটো বাহিরের দিকে লম্বা ক'রে দিস্‌ আর উপরের চোয়াল কাছাকাছি নিয়ে আসিস; উ, দেখ্‌চিস্‌? আমি যেন তোকে ভেম্‌চোচ্চিঃ—উ।

নি। বাঃ! বেশ!

স্ত্রী। বাঃ! চমৎকার!

জু। এতেই আশ্চর্য্য হলে—যদি তুমি দেখ্‌তে ড, ঢ, ড়, ঢ় কি রকম ক'রে উচ্চারণ করতে হয় তা হলে না জানি কি করতে?

স্ত্রী। ও সব মাথা মুণ্ডু কি বক্‌চ?

নি। ও রোগ সারে কিসে?

জু। আঃ মুখ্‌খু স্ত্রীলোকদের দেখ্‌লে আমার ভারি রাগ ধরে।

স্ত্রী। যাও যাও, ঐ লোকদের দূর করে তাড়িয়ে দেও।

নি। সেই তলোয়ারের ওস্তাদটাকে আগে। সে ধূলো উড়িয়ে বাড়িটাকে অন্ধকার ক'রে তোলে।

জু। বটে! ঐ ওস্তাদের উপর দেখ্‌চি বড় রাগ—তোর যে রকম আস্পর্দ্ধা—এখনি তার মজা দেখিয়ে দিচ্চি (দুটো শেখ্‌বার তলোয়ার আনাইয়া, তার মধ্যে একটা নিকোলের হাতে দিয়া) এই দেখ্‌—সাক্ষাৎ প্রমাণের সঙ্গে দেখিয়ে দেব। শরীরের লাইনে। যখন চার ঘার ঘা মারতে হয়, তখন এই রকম করতে হয়, যখন তিনের ঘা মারতে হয় তখন এই রকম করতে হয়—এ জানলে আর কেউ কখন মেরে ফেলতে পারে না। যখন কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তখন যদি জানা যায় যে আমার কিছু হবে না, তা হলে কেমন মজা! আয় তোকে দেখিয়ে দিচ্চি, ঐ তলোয়ার দিয়ে আমাকে মার দিকি।

নি। (নিকোল জুর্দ্যার গায় দুই চার বার খোঁচা দিয়া) কেমন, হয়েছে?

জু। আরে! আরে! আস্তে! আস্তে অত জোরে না, আরে মর মাগি।

নি। তুমি যে আমাকে খোঁচা দিতে বোল্লে।

জু। হাঁ। কিন্তু তুই চারের ঘা না মারতে মারতেই যে তিনের ঘা মেরে দিয়েচিস্—আর ঘা আট্‌কাবার সময় পর্য্যন্ত আমাকে দিস্‌নি।

স্ত্রী। তুমি নিশ্চয়ই খেপেচ—যে অবধি তুমি বড় লোকদের সঙ্গে মিশ্‌তে আরম্ভ করেছ, সেই অবধি তোমার মাথায় ঐ সব পাগলামি ঢুকেচে।

জু। যে অবধি আমি বড় লোকদের সঙ্গে মিশ্‌তে আরম্ভ করেছি, সেই অবধি বরং আমার বুদ্ধি খুলেচে—আর, তুমি যেমন সামান্য লোকদের সঙ্গে মেশো, এ তার চেয়ে ঢের ভাল।

স্ত্রী। তা তো বটেই! বড় লোকদের সঙ্গে মেশায় তো ঢের লাভ; সেই নবাবটার সঙ্গে ভাব ক'রে তুমি যে রকম কাজ গুছিয়েছ তা আর—

জু। চুপ; কি বোল্‌চ তুমি একবার ভেবে দেখো—এ তুমি বেশ জেনো স্ত্রী, যার কথা তুমি বলচ—সে কেমন লোক তা তুমি জান না। তুমি জান না যে সে একজন মস্তলোক, একজন রাজ-দরবারের গণ্য মান্য নবাব, আর আমি এখন যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্চি, তিনি তেমনি রাজার সঙ্গে কথা কন। আর অমন বড় লোক প্রায়ই আমার বাড়িতে আসে, আমাকে প্রিয় বন্ধু বোলে তার সমকক্ষ লোকের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করে—এতে কি আমার খুব নাম বাড়বে না? আর আমার উপর তার এত অনুগ্রহ যে তুমি তা মনেও করতে পার না—আমাকে যখন সে আদর করে তখন আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই।

স্ত্রী। হাঁ, তোমার উপর তার যথেষ্ট অনুগ্রহ, আর তোমাকে খুব আদর করেও বটে—কিন্তু এদিকে তোমার কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে যে তোমার ঘাড় ভাংচে।

জু। অমন বড় লোককে টাকা ধার দেওয়া কি মানের বিষয় নয়? আর যে নবাব আমাকে প্রিয় বন্ধু বোলে ডাকে তাকে কি একটু টাকা ধার দিতেও পারিনে?

স্ত্রী। আর সেই নবাব তোমার জন্য কি করে?

জু। কি করে? সে যে কি করে তা যদি জান্‌তে তাহলে আশ্চর্য্যি হয়ে যেতে।

স্ত্রী। সে কি?

জু। বস্! আমি তা খুলে বল্‌তে চাইনে। এই পর্য্যন্ত তোমাকে বোল্লেই যথেষ্ট হবে, আমি তাকে টাকা ধার দিয়েচি, আর শীঘ্রই সে টাকা শুধে দেবে।

স্ত্রী। বটে। সেই আশায় আছ না কি?

জু। নিশ্চয়ই শুধ্‌বে—সে কি আমাকে সে বিষয় কথা দেয় নি?

স্ত্রী। হাঁ হাঁ শুধবে যত তা গায়ে রইল।

জু। সে শপথ করে আমাকে বলেচে।

স্ত্রী। শপথ না তার মাথা।

জু। কি সর্ব্বনাশ! স্ত্রী, তুমি ভয়ানক একগুঁয়ে দেখ্‌চি, আমি তোমাকে বল্‌চি সে নিশ্চয়ই তার কথা রাখ্‌বে—আমার বেশ বিশ্বাস আছে।

স্ত্রী। আর আমার বিশ্বাস যে সে কথা রাখবে না—আর তোমাকে যে সে এত আদর করে সে কেবল তোমাকে ভোলাবার জন্যে।

জু। চুপ চুপ—ঐ আস্‌চে।

স্ত্রী। এইবার সারবে দেখচি—আবার বুঝি কিছু ধার করতে এসেছে, ওকে দেখলে আমার খিদে তৃষ্ণা উড়ে যায়।

জু। চুপ কর—আমি বলচি।

---

৪ র্থ দৃশ্য।

নবাব দোরাস্ত, জুর্দ্দ্যাঁ, জুর্দ্দ্যাঁর স্ত্রী,

নিকোল দাসী।

দোরাস্ত। আমার প্রিয় বন্ধু জুর্দ্দাঁ বাবু তুমি কেমন আছ বল দেখি?

জু। আপনার আশীর্ব্বাদে বেশ আছি মশায়।

দো। আর ঠাকরুণ উনি কেমন আছেন?

স্ত্রী। ঠাকরুণ এক রকম আছেন।

দো। একি! জুর্দ্দ্যাঁ, তোমাকে আজ ভয়ানক ভদ্র দেখতে হয়েছে!

জু। এই দেখুন।

দো। এই পোষাকে তোমাকে বড় ভাল দেখাচ্চে—রাজ-দরবারে যত যুবারা আসে তাদেরও এত ভাল দেখায় না।

জু। আঁ্যা আঁ্যা।

স্ত্রী। (জনান্তিকে) ও লোকটা চুলকোনির জায়গা বুঝে চুলকে দিচ্চে।

দো। আচ্ছা ফেরো দিকি, বাঃ পিছন দিক্‌টাও বড় চমৎকার।

স্ত্রী। (জনান্তিকে) সামনেও যেমন, পিছনেও তেমন—চৌকোশ পাগল।

দো। মাইরি, জুর্দ্দ্যাঁ, আজ তোমাকে দেখ্‌বার জন্য আমি ভারি অধৈর্য্য হয়েছিলুম। পৃথিবী মধ্যে তোমাকে আমি যে রকম শ্রদ্ধা করি এমন আর কাউকে না, আর আজ এই সকাল ব্যালা রাজ-দরবারে তোমার কথা পেড়েছিলুম।

জু। মশায় আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ (স্ত্রীর প্রতি) কি বলচে শুনেছ, রাজ-দরবারে!

দো। টুপি মাথায় দেও না।

জু। আপনার সামনে টুপি মাথায় রাখাটা বেয়াদবি হয়।

দো। না না না না টুপি পর আমাদের মধ্যে আবার লৌকিকতা কি?

জু। মশায়—

দো। জুর্দ্দ্যাঁ আমি বলচি টুপিটা পর, তুমি হচ্চ আমার বন্ধু।

জু। আমি মশায়ের দাস।

দো। তুমি যদি টুপি মাথায় না রাখ, তা হলে আমিও আমার টুপি খুলে ফেলব।

জু। (টুপি পরিয়া) বিরক্ত করা চেয়ে আমি অভদ্র হতেও রাজি আছি।

ডো। তুমি তো জানই আমি তোমার ধারি।

স্ত্রী। (জনান্তিকে) হাঁ, সে খুব জানি।

দো। অনেক সময়ে তুমি আমাকে মুক্ত হস্তে ধার দিয়েছ, আর আমি তার জন্য যে ভারি বাধিত আছি তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি।

জ। মশায় আপনি ঠাট্টা কচ্চেন।

দো। না না, আর ধার আমি শুধ্‌তেও জানি। আর লোকের উপকার কি রকম করে স্বীকার করতে হয় তাও বিলক্ষণ জানি।

জ। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই মশায়।

দো। তোমার ঋন থেকে এখন আমি মুক্ত হতে ইচ্ছে কচ্চি, আর সেই জন্য হিসেব নিকেশ কর্‌তে তোমার এখানে আজ এসেছি।

জ। (স্ত্রীর প্রতি মৃদু স্বরে) স্ত্রী, এখন দেখ, তোমার কত দূর বোঝবার ভুল।

দো। যত শীঘ্র পারি আমি লোকের ধার শুধে ফেল্‌তে ভালবাসি।

জ। (স্ত্রীর প্রতি মৃদু স্বরে) আমি তো তখন তোমাকে বলিছিলুম।

দো। দেখা যাক্ এখন তোমার আমি কত ধারি।

জ। (স্ত্রীর প্রতি মৃদু স্বরে) এই দেখ দিকি তোমার সন্দেহ করাটা কি পাগলামি।

দো। তুমি যত টাকা আমাকে ধার দিযেছিলে, তা কি তোমার বেশ মনে আছে?

জ। হাঁ বোধ হয় মনে আছে। আমি একটি চিরকুটে তা টুকে রেখেছি। এই দেখুন। একবার আপনাকে ২০০ লুই দি।

দো। তা সত্যি।

জ। আর একবার ১২০ লুই।

দো। হাঁ।

জ। আর একবার ১৪০ লুই।

দো। ঠিক বলেছে।

জ। এই সব শুদ্ধ ৪৬০ লুই, তার দাম হচ্চে ৫০৬০ পাউণ্ড।

দো। হিসেব খুব ঠিক্। ৫০৬০ পাউণ্ড।

জ। তার পর, ১৮৩২ পাউণ্ড আপনার পালক-বিক্রি ওয়ালাকে দেওয়া যায়।

দো। ঠিক্।

জ। ২৭৮০ পাউণ্ড আপনার দর্জিকে দেওয়া যায়।

দো। তা সত্যি।

জ। ৪৩৭৯ পাউণ্ড, ১২ সু, ৮ দেনিয়ে আপনার দোকানদারকে দেওয়া যায়।

দো। ভাল। ১২ সু, ৮ দেনিয়ে। হিসেব ঠিক আছে।

জু। আর ১৭৪৮ পাউণ্ড, ৭ সু, ৪ দেনিয়ে আপনার ঘোড়ার জিন্ বিক্রীওয়ালাকে দেওয়া যায়।

দো। ও সব ঠিক্। সব শুদ্ধ কত হল?

জু। সবশুদ্ধ হচ্চে ১৫৮০০ পাউণ্ড।

দো। মোট ঐ ঠিক্ বটে। ১৫৮০০ পাউণ্ড। আর ২০০ পিস্তোল আমাকে দিয়ে ঐ হিসেবে যোগ ক'রে দেও। তা

হলে মোট ঠিক্ হল ১৮০০০ ফ্র্যাঙ্ক, এক দিনেই আমি এই সমস্ত টাকা শুধে ফেলব।

স্ত্রী। (জুদঁ্যার প্রতি মৃদু স্বরে) এখন দেখ দিকি আমি ঠিক্ আন্দাজ করেছিলুম কি না?

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদু স্বরে) চুপ্।

দো। যে টাকার কথা বল্লুম সে টা কি দিতে তোমার অসুবিধা হয়?

জু। অঁ্যা! না।

স্ত্রী। (জুদঁ্যার প্রতি মৃদু স্বরে) ও লোকটা তোমাকে কামধেনু পেয়েচে।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) চুপ কর।

দো। যদি তোমার অসুবিধে হয়, তা হলে বল আমি অন্যত্র চেষ্টা করি।

জু। না, মশায়।

স্ত্রী। (জুদঁ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত না করে ও ক্ষান্ত হচ্চে না।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে)—চুপ কর আমি বল্‌চি।

দো। আমাকে বোল্লেই হয় তোমার অসুবিধে হচ্চে।

জু। না না, মশায়।

স্ত্রী। (জুদঁ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) এ একজন আসল জুয়োচোর।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) চুপকর বলচি।

স্ত্রী। (জুদঁ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) তোমার শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত ও শুষে নেবে।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) তুমি কি চুপ করবে?

দো। এমন অনেক লোক আছে যারা আমাকে আহ্লাদের সহিত টাকা ধার দেবে, কিন্তু তুমি নাকি আমার প্রধান বন্ধু, তাই মনে করলুম যদি অন্য জায়গায় ধার করতে যাই তাহলে তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে।

জু। আমার উপর মশায়ের যথেষ্ট অনুগ্রহ—এখনি আপনার কাজ নিকেশ ক'রে দিচ্চি।

স্ত্রী। (জুদঁ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) কি! আবার তুমি ওকে ধার দিতে যাচ্চ?

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) কি করা যায়? অমন বড়লোক, আর যে ব্যক্তি আজ সকালে আমার কথা রাজার কাছে বলেচে তার কথা কি অগ্রাহ্য করতে পারা যায়?

স্ত্রী। (জুদঁ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) যাও যাও—তুমি খুব ওর ফাঁদে পড়েছ যা হোক্।

৫ম দৃশ্য।

দোরান্ত, জুদঁ্যার স্ত্রী, নিকে'ল।

দো। তোমাকে ভারি বিমর্ষ দেখচি যে, তোমার হয়েচে কি ঠাকরুণ?

জু স্ত্রী। আমার আর যাই হোক্, আমার মাথা ঠিক আছে।

দো। তোমার মেয়েকে দেখচিনে যে, তিনি কোথায়?

জু-স্ত্রী। আমার মেয়ে যেখানে আছে, সেই খানেই আছে।

দো। তাঁর শরীর গতিক কেমন চলচে?

জু-স্ত্রী। দু পায়ের উপর ভর দিয়ে।

দো। রাজার বাড়ি যে নাচ ও প্রহসন

হবে তা দেখতে এর মধ্যে কি একদিন তোমার মেয়েকে নিয়ে যাবে না ?

জু-স্ত্রী। হাঁ, নিশ্চয়! হাস্‌তে আমাদের ভারি ইচ্ছে আছে—আমাদের ভারি হাস্‌তে ইচ্ছে আছে।

দো। তুমি যেমন সুন্দরী ও রসিকা ছিলে. তাতে বোধ হচ্চে তোমার যৌবন কালে তোমার অনেক গুলি প্রণয়ী ছিল।

জু-স্ত্রী। ওমা কি হবে; তুমি বল কি ? এর মধ্যেই কি তবে আমি বুড়ি হয়ে গিয়েছি—আমার কি শিরকম্প উপস্থিত হয়েছে না কি।

দো। ঠাকরণ আমাকে মাপ করবে তোমার যে অল্প বয়েস সেটা আমি ভুলে গিয়েছিলুম—অনেক সময় অন্য মনস্কে আমি কি ভাবতে কি ভাবি—আমার এই অভদ্রতার জন্য মাপ করবে।

---

৬ ষ্ঠ দৃশ্য।

জুর্দ্যা, জুর্দ্যার স্ত্রী, দোরান্ত, নিকোল।

জু! (দোরান্তের প্রতি) এই নিন ২০০ লুই।

দো। জুর্দ্যা আমি তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলচি যে আমি তোমারই, আর রাজদরবারে তোমার যাতে কোন উপকার করতে পারি তার জন্য আমি অধৈর্য্য হয়েচি।

জু। আমি আপনার কাছে খুবই বাধিত আছি।

দো। যদি আপনার গিন্নি ঠাকরণ রাজবাড়ির নাটক দেখতে ইচ্ছে করেন তাহলে আমি তাঁর জন্য ভাল ভাল জায়গা ঠিক করে রাখি।

জু-স্ত্রী। আমি তার জন্য বাধিত হলুম।

দো। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) আমাদের বেগমও আজ বিকেলে নাচ দেখতে ও আহার করতে এখানে আসবেন—চিঠিতে তো সে বিষয়ে তোমাকে আগেই খবর দিয়েছিলেম। অনেক বলে কয়ে তাঁকে এই নিমন্ত্রণে আসতে মত করিয়েছি।

জু। আসুন আমরা একটু দূরে যাই, তার কারণ আছে।

দো। আট দিন হল তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। আর তুমি তাঁকে উপহার দেবার জন্য যে হীরেটা আমার হাতে দিয়েছিলে, সে বিষয়ের খবরটা তোমাকে তাই দিতে পারি নি; কিন্তু তাঁর সঙ্কোচ ভাংতে আমার ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল—আর এত দিন পরে সবে আজ নি. ঐ উপহার নিতে সম্মত হয়েছেন।

জু। তাঁর সে জিনিসটা কেমন লাগল ?

দো। ভয়ানক ভাল লেগেচে; আর ঐ হিরেটি যে রকম সুন্দর তাতে তোমার উপরে যে তাঁর খুব টান হবে তা আমার বেশ বোধ হচ্চে।

জু। ভগবান যেন তাই করেন।

জু-স্ত্রী। (নিকোলের প্রতি) ওলোকটা একবার এলে ছিনে জোঁকের মত ওকে আর ছাড়তে চায় না।

দো। ঐ উপহারের মূল্য কত, আর তোমার ভালবাসা কত দূর, সমস্ত তাকে আমি খুলে বলেছি।

জু। আপনি আমার প্রতি কতই অনুগ্রহ কচ্চেন—আর, আপনার মত বড় লোক আমার জন্য যে এতদূর নীচতা স্বীকার কচ্চেন এই মনে ক'রে আমি ভারি লজ্জিত হচ্চি।

দো। তুমি বল কি? বন্ধুদের মধ্যে কি এসব সঙ্কোচ হওয়া উচিত? আর আমারও যদি একদিন এই রকম সুবিধে উপস্থিত হয়, আমার হয়ে কি তুমিও ঠিক্ তাহলে এই রকম কর না?

জু। ও! নিশ্চয়ই আহ্লাদের সহিত।

জু-স্ত্রী। (নিকোলের প্রতি) ও লোকটা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আমার মনে যেন একটা ভার চেপে থাকে।

দো। বন্ধুর যখন কোন উপকার ক[illegible] হয় তখন আমি আর কিছুই মানি [illegible] যেমনি সুন্দরী বেগমের সঙ্গে আমার আপ [illegible] ছিল, যখন শুনলুম তার উপর তোমার অনুরাগ হয়েছে, তখনই তোমার প্রেমে সহায্য করতে আমি নিজেই তোমার কাছে অগ্রসর হলুম।

জু। তা সত্যি। আপনার এই সকল অনুগ্রহে আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিচি।

জু-স্ত্রী। (নিকোলের প্রতি) লোকটা কি যাবে না?

নিকোল। দু জনে একত্র হলে ওঁরা বেশ থাকেন।

দো। তাঁর মন ভেজাবার জন্য তুমি বেশ উপায় অবলম্বন করেছ। স্ত্রীলোকদের জন্য খরচ পত্র করলেই, স্ত্রীলোকেরা সন্তুষ্ট হয়; তোমার গান, তোমার ফুলের তোড়া, তোমার আতস বাজি, তোমার হিরে যা উপহার দিয়েছ, এই সকলে যেমন কাজ করেচে, এমন কাজ হাজার মুখের কথাতেও হয় না।

জু। তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করবার জন্যে আমি কি না খরচ করতে পারি। বড় ঘরের স্ত্রীলোকদের আমার বড় রূপসী বলে মনে হয়, আর এই মান কেনবার জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

জু-স্ত্রী। (নিকোলের প্রতি চুপি চুপি) দু জনে না জানি এত কি কথাই হচ্চে? যা দিকি নিকোল, আস্তে আস্তে একটু শুনে আয় দিকি।

দো। আজ তুমি মনের সাধে তাঁকে দেখতে পাবে, দেখলে তোমার চক্ষু জুড়িয়ে যাবে।

জু। আরও স্বাধীন থাক্‌বার জন্য একটা ফিকির করেচি—আজ আমার স্ত্রীকে আমার বোনের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে পাঠাচ্চি সমস্ত বিকেল ব্যালাটা সে সেখানে কাটাবে।

দো। বেশ বুদ্ধির কাজ করেছ। তিনি থাকলে আমাদের বাধা হত। রাঁধবার জন্য আর নৃত্য-নাট্যের জন্য যা কিছু দরকার আমি সব হুকুম দিয়েচি—এই নৃত্য-নাট্যটা আমার নিজের রচনা—আমার রচনা যে রকম, কাজে যদি ঠিক সেই রকম করতে পারে, তাহলে নিশ্চয় বলতে পারি—

জু। (নিকোল শুনিতেছে জানিতে পারিয়া তাহার গালে এক চপেটাঘাত)

আরে মাগি! তুই তো ভারি বজ্জাৎ (দোরান্তের প্রতি) আসুন আমরা এখান থেকে যাই।

---

৭ ম দৃশ্য।

জুর্দ্যার স্ত্রী, নিকোল।

নি। ঠাকরণ, শুনতে গিয়ে আমার বিলক্ষণ হয়েছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওঁদের একটা কি চলচে। একটা কিসের কথা হচ্চিল তাতে ঠাকরণ তুমি যে থাক, ঐ তাঁদের ইচ্ছে নয়।

জু-স্ত্রী। দেখ নিকোল আজ বোলে নয় অনেক দিন থেকে আমার স্বামীর উপর সন্দেহ হয়েচে। একটা নিশ্চয় কি প্রেমের ব্যাপার আছে। এ যদি না হয় তো কি বলিচি—সে ব্যাপারটা কি আমার সন্ধান করে বের করতে হবে। কিন্তু এখন আমার মেয়ের বিষয় ভাবা যাক্। তুই তো জানিস, ক্লেওন্ত আমার মেয়েকে কতদূর ভাল বাসে। সেই ছেলেটিকে আমার বড় মনে ধরেচে, যদি আমি পারি তো আমার লুসিলকে তাকেই দেব।

নি। ঠাকরুণ তোমার যে এরকম মত হয়েচে তাতে আমিও ভয়ানক খুসি হয়েচি, কেন না, মনিবদের যদি তোমার মনে ধরে থাকে, তার চাকরকেও আমার ঠাকরণ মনে ধরেচে। আর আমার এই ইচ্ছে যে তাঁদের বিয়ের সময়, আমাদের বিয়ে হয়ে যায়।

জু স্ত্রী। আমি যা তোকে বল্লুম এখনি তাকে গিয়ে বল্, আর বল্ যেন এখনি সে এখানে আসে, তাহলে যাতে সে লুসিলকে পায়, আমরা দু জনে মিলে আমার স্বামীর কাছে বলব।

নি। ঠাকরণ আমি এখনি যাচ্চি। আমার এতে ভারি আহ্লাদ হচ্চে। এমন মনের মত হুকুম আমি কখন পাই নি।

---

৮ ম দৃশ্য।

ক্লেওন্ত্, কোবিয়েল, নিকোল।

নি। (ক্লেওন্তের প্রতি) বাঃ! ঠিক্ সময়ে দেখা হল, আমি একটা সুখবর নিয়ে এসেছি।

ক্লেওন্ত। দূর হ বিশ্বাস-ঘাতিনী, তোর কথায় আমি ভুলি নে।

নি। তোর এই রকম ব্যবহার—

ক্লে। দূর হ আমি বলচি, আর তোর মনিবকে বলিস্ যে সরল ক্লেওন্ত আর তার কথায় ভোলে না।

নি। এ কি রকম বদল? আমার কোবিয়েল, তুমিই বল দেখি এ সকলের মানে কি?

কো। তোর কোবিয়েল! হতভাগি কোথাকারে! দূর হ এখান থেকে—আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ।

নি। তুইও এই রকম কল্লি ——

কো। দূর হ বলচি—তোর কথা শুনতে চাই নে।

নি। (স্বগত) বাঃ! এ দেখচি, একই বিছে দুজনকেই কামড়েছে। ঠাকরণকে সব কথা বলিগে যাই।

৯ দৃশ্য।

ক্লেওম্ভ্—কোবিয়েল্।

ক্লে। কি! একজন প্রণয়ীর সঙ্গে কি না এই রকম ব্যবহার—আর যে প্রণয়ী সকল চেয়ে বিশ্বাসী ও অনুরক্ত!

কো। আমাদের দুজনের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছে তা অতি ভয়ানক।

ক্লে। এক জনের উপর যত দূর ভাল বাসা, যতদূর অনুরাগ হতে পারে তা আমি প্রকাশ করেছি। তাকে ছাড়া আর আমি কাউকেই ভালবাসি নে—সে বই আমার হৃদয়ে আর কেউ নেই; আমার সমস্ত যত্ন, সমস্ত বাসনা, সমস্ত সুখ তাকে নিয়েই; আমি তাকে ছাড়া কোন কথা কই নে, তাকে ছাড়া কোন ভাবনা ভাবিনে, তাকে ভিন্ন কোন স্বপ্ন দেখিনে—তাকে ছেড়ে নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলি নে, তাতেই আমার হৃদয় বেঁচে আছে—আর এত ভাল-বাসার কি না শেষ এই উপযুক্ত পুরস্কার! দুদিন তাকে দেখি নি, আর এই দুদিন যেন দুশ বৎসর বলে মনে হচ্ছিল—হটাৎ তার সঙ্গে সে দিন দেখা হল; তাকে দেখে আমার হৃদয় উথলে উঠল—আমার মুখে আহ্লাদ ফেটে পড়তে লাগল—আমি মনের আগ্রহে দৌড়ে তার কাছে গেলুম—আর সেই বিশ্বাসঘাতিনী আমার দিকে কি না একবার ফিরেও তাকালে না—যেন জন্মেও আমাকে দেখি নি, এই ভাবে চট্ করে আমার কাছ দিয়ে চলে গেল।

কো। আপনার যে কথা আমারও সেই কথা।

ক্লে। কোবিয়েল, বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ লুসিলের কি আর জুড়ি আছে?

কো। আর সেই, মশায়, সেই হতভাগি নিকোলেরও কি জুড়ি আছে?

ক্লে। এত জ্বলন্ত ত্যাগ-স্বীকার ক'রে, এত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শেষটা কি না এই হল!

কো। এত সাধ্য সাধনা করে, রান্নাঘরে তার হয়ে কত কাজ করে শেষ কি না এই হল!

ক্লে। তার পদতলে কত না অশ্রু বর্ষণ করেচি!

কো। তার হয়ে পাতকুয়ো থেকে কত কলসি না জল তুলিচি!

ক্লে। নিজেকে যতদূর ভালবাসি তার চেয়ে তার উপর আমার জ্বলন্ত ভালবাসা।

কো। তার হয়ে কতবার গরম হাঁড়ি নাবিয়ে দিয়ে আমি জ্বলে পুড়ে মরেছি।

ক্লে। এখন আমাকে দেখলে তাচ্ছিল্য করে পালিয়ে যায়।

কো। এখন আমাকে দেখলে নাক সিটকে পিছন ফেরে।

ক্লে। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য খুব শাস্তি দেওয়া উচিত!

কো। এর জন্য খুব চড় কষিয়ে দেওয়া উচিত।

ক্লে। আমি তোমাকে বলচি, কোবি-য়েল,—তার পক্ষ হয়ে আমাকে কখনো অনুরোধ কোরো না।

কো। আমি মশায় ? তা কখন কোরব না।

ক্রে। ঐ বিশ্বাস-ঘাতিনীর দোষ কাটিয়ে আমার কাছে কিছু বোলো না।

কো। তার কোন ভয় নেই।

ক্রে। দেখ তোকে বলচি—হাজার যদি তার পক্ষ হয়ে তুই আমার কাছে বলিস্, তবুও কিছু হবে না।

কো। তা বলবার জন্য কার এত মাথা ব্যথা ?

ক্রে। আমাব এই রাগ কিছুতেই পড়তে দেব না—তার সঙ্গে আর কোন সংস্রব রাখব না।

কো। আমার ও তাই মত।

ক্রে। ওর বাড়িতে যে নুবাব্ সাহেব আসে সেই ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েচে—আমি বেশ দেখছি, বড় লোক দেখেই ওর চোখ ঝলসে গেছে। কিন্তু আমাকে ত্যাগ ক'রেছে বোলে ওযে জাঁক করচে তা আমি ও কে করতে দেব না—ও যতদূর করবে আমিও তত দূর করব।

কোবি। বেশ বলেছেন সব বিষয়ই আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্চে।

ক্রে। দেখ্‌ কোবিয়েল, আমার ঘৃণার একটু তুই সাহায্য করিস। আমার ভালবাসা তার জন্য আমাকে যতই কেন বলুক না, যাতে সেই ভালবাসার অনুরোধে আমার প্রতিজ্ঞা টলে না যায়, তার জন্যে আমাকে তুই সাহায্য করিস;—এমন ক'রে তার শরীরের বর্ণনা আমার কাছে কর, যাতে তার উপর আমার ঘৃণা হয়—আর শোন্‌ তার উপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মাবার জন্য যত কিছু তার দোষ আছে সঁব খুটিনাটি করে আমার কাছে বল।

কো। তার কথা বলচেন। সে যে রকম কদাকার তার উপর আপনার কি ক'রে যে এত ভালবাসা হল ভেবে পাই নে ! তার রূপ অতি সামান্য, ওর চেয়ে হাজার হাজার আপনার যুগ্যি রূপসী আপনি পেতে পারেন। প্রথমতঃ তার চোখ ছোটো।

ক্রে। তা সত্যি, তার চোখ ছোটো বটে, কিন্তু এমন জ্বলজ্বলে, এমন উজ্জ্বল, এমন তীক্ষ্ণ, এমন মর্ম্মভেদী চোখ আমি আর কোথাও দেখিনি।

কো। তার মুখটা বড়।

ক্রে। হাঁ। কিন্তু সে মুখেতে যেরকম সৌন্দর্য্য দেখা যায় সে-রকম সৌন্দর্য্য অন্য কোন মুখে দেখতে পাওয়া যায় না—আর সেই মুখ দেখলে কত যে ভালবাসার উদ্রেক হয় তা বলা যায় না।

কো। তার শরীরটা একটু বেঁটে।

ক্রে। কিন্তু তার গড়ন ভাল।

কো। তার চাল চোল ও কথাবার্ত্তায় কেমন সে একটা খাতির-নদারদ ভাব দেখায়।

ক্রে। তা সত্যি—কিন্তু সে-সবে কেমন একটা লাবণ্য আছে, আর তার ধরণ-ধারণ এমন মিষ্টি, আর কি একটা মোহিনী আছে, কেমন চুরি ক'রে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে।

কো। আর তার মন—

ক্লে। কোবিয়েল, তার মনটি বড় কোমল।

কো। তার কথা বার্ত্তা—

ক্লে। তার কথা বার্ত্তায় মোহিত হয়ে যেতে হয়।

কো। তার কথাবার্ত্তা বড় গম্ভীর ধরণের।

ক্লে। অত খোলাখুলি আমোদ প্রমোদ কি তোমার ভাল লাগে? যে মেয়েগুল সব কথাতেই খিক্‌খিক্ ক'রে হাসে, সে মেয়েগুলকে কি ভাল লাগে?

কো। কিন্তু তার মত খাম-খেয়ালি লোক আর ভূ-ভারতে নেই।

ক্লে। হাঁ, সে খামখেয়ালি বটে—সে কথা আমি মানি; কিন্তু সুন্দরীর সকলই শোভা পায়—সুন্দরীর ও-সব দোষ সহ্য করা যায়।

কো। এতদূর যখন হল; তবে বেশ বোঝা যাচ্চে আপনি চিরকালই তাকে ভাল বাসবেন।

ক্লে। আমি? বরং আমি মরে যাব। আগে আমি তাকে যে রকম ভাল বাসতেম, এখন আমি তাকে আবার তেমনি ঘৃণা করব।

কো। তাকে যদি অত ভাল মনে করেন তা হলে কি ক'রে করবেন?

ক্লে। এত যে ভাল, এত যে সুন্দরী, এত যে রূপসী, তবুও যে আমি তাকে ত্যাগ কচ্চি, ঘৃণা কচ্চি, এতেই কি আমার জ্বলন্ত প্রতিশোধ আরও প্রকাশ পাচ্চে না?

ক্রমশঃ

বিরহের দীপক-মল্লার।

মেঘমল্লার।

ঘন ঘোর বরষা, মেঘের হুড়ামুড়ি,
দিগঙ্গনা দিয়া আছে মুখ মুড়ি সুড়ি;
দিবসে অকাল সন্ধ্যা, সন্ধ্যায় রজনী;
চমকে বিদ্যুন্মালা গরজে অশনি।
টোলের রত্তন এক এ হেন সময়
একাকী আছেন বসি নিরানন্দময়।
নাশায় শুষিয়া ল'য়ে নস্য এক থাবা
উঁকি দেন বাহিরে হুঁকাটি ল'য়ে ডাবা।
সাঙ্গ করি' ছিলুম শেষের শোষ টানে
দেয়ালের গায়ে হুঁকা থো'ন সাবধানে।
গীত গোবিন্দের পুঁথি সযতনে খুলি,
আওড়ান অনুরাগে মিঠা মিঠা বুলি।

পড়িতে পড়িতে পুঁথি লেগে গেল ভাব,
ঘন ঘন নিশ্বাসের হ'ল আবির্ভাব।
অশ্রুজল-চসমার মধ্য দিয়া শেষে
টাহরিয়া ল'ন বর্ণ অতি কায়ক্লেশে।
অক্ষর পড়িতে তবু পরাজয় মানি,
ঢুঁকি দিয়া বাহিরে বাঁধেন পুঁথি খানি।
ব্রাহ্মণের মুখখানি দেখি দুঃখ হয়,
প্রেয়সী নাহিক কাছে এ-হেন সময়।
ঘন ঘন নিশ্বাস উথলে ক্ষণেক্ষণ
প্রাণের ব্যথার ব্যথী নাহি কোন জন।
বাদলের সঙ্গে তাঁর আঁখি দেয় যোগ
ব্রাহ্মণের না জানি কেন এ কর্ম্মভোগ।
বেড়ে দিবা বাদল—চাসারা খুব খুসি,
কান্তাকান্তে করিছে কতকি ফুসাফুসি;
শর্ম্মার বুঝিতে নারি দুঃখের কারণ,
কিছুতেই অশ্রু তাঁর না মানে বারণ।
বুকের মাঝারে তাঁর ডোবা এক রতি,
তাহার ভিতরটিতে প্রাণের বসতি,
ছল করি সেই প্রাণ বাহিরিতে চায়,
কিন্তু বাহিরিতে নারে এই বড় দায়।
নিশ্বাস বাহির হয় তাহার বদলে,
নয়ন ভাসিয়া যায় উষ্ণ ধারা-জলে।
বক্ষে হাত দিয়া কভু থামাইছে মন
গালে হাত দিয়া কভু চিন্তায় মগন,
ভালে হাত দিয়া কভু আড়া-পানে চায়
অদৃষ্টের একবার দেখিবারে চায়;

বলিবারে আছে তারে অনেক বচন,
"বলবান্ ব'লেই কি দুর্ব্বলে নিধন!"
কিন্তু সে যে অদৃষ্ট কে পায় তার দেখা,
ললাটে চুকেছে লিখে' ভাবনার রেখা।
আশ্রয় করিয়া কবি দ্বারের আড়াল
এই সব ব্যাপার নিরখে কিছুকাল।
বলে "ওকি—ও ঠাকুর? দ্বারোপান্তে তব
ময়ূর নাচিছে দেখি' জলধর নব;
চণ্ডকীর এ উল্লাস, কেতকীর বাস,
কদম্বের কেশর র'বে কি বারোমাস?
দেবতার কান্না এবে ফুরাইয়া যাবে
উহাদের বিহনে আমার কান্না পাবে।
তুমি কিনা এখন কাঁদিছ ঘরে বসি!
কাঁদাইল যে তোমায় কে সে উরবশী?"
শর্ম্মা বলে "না উর্ব্বশী না মেনকা রম্ভা,
এক জন বিহনে হ'য়েছি হতভম্বা।
উরো-মাঝে আছে বসি—তারি পাকে যদি
উর্ব্বশী বলিতে চাও, তা'সে নিরবধি
আছয়ে হৃদি-মাঝারে না জানি বিরাম;
উর্ব্বশীই বলিয়া ডাকিব তার নাম।
উর্ব্বশী—হা—তুই মোরে ছাড়িয়া চলিলি!
বরষার ভরসা আমার তুই ছিলি—
রজনীর সজনী—সন্ধ্যার ছিলি জপ—
বুকের আছিলি সুখ—নারীর দরপ!
মহীপৃষ্ঠে, ধারাবাণ, জলধর ছুঁড়ে—
তোর কাল-বিরহ আমার বক্ষ জুড়ে।

জলে স্থলে ভেকের আনন্দ-কোলাহল
শ্রবণে আমার আজি ঢালে হলাহল।
শিলায় ছাইছে মেঘ মেদিনীর পীঠ,
হায় রে—আমার বক্ষে ছুঁড়েতেছে ইঁট।
ময়ূর নাচিতেছিস্ পাখনা তুলিয়া,
তার কি সে কেশজাল গেছিস্ ভুলিয়া ?
এখন—এখন বৈ কি—নাচিবি খঞ্জন,
এ মুলুকে নাই আর সে তোর গঞ্জন,
যাহার অঞ্জন রেখা হৃদয়ে আমার
জাগিছে বিরহ নিশা করিয়ে আঁধার !
ঐ বা উর্ব্বসী মোর ঐ চলি' যায়
আলো করি সারা ধরা হাঁসির ছটায় !
পালায় এমনি দ্রুত নাহি যায় ধরা,
মিলায় বিদ্যুৎ সনে হ'য়ে অপ্সরা।
কি করি এখন তবে—হরি, হরি, হরি !
জীয়ন্তে মরিব কত গুমরি গুমরি।"
বলে কবি, এ "রোগের নাহি প্রতিকার
আবার আসিব—এবে করি নমস্কার।"

দীপক।

শর্ম্মার নিকট হ'তে মাগিয়া বিদায়
* এম্-এ-বন্ধু-সকাশে চলিল কবি-রায় !
দেখে এম্-এ-বন্ধুবর নবীন কিশোর
চেয়ারে হেলান দিয়া ভাবে হ'য়ে ভোর,
শুখিখা চুরট টানি নয়ন মুদিয়া,
ধূম উড়াইয়া, ছাই উড়ান ফুঁদিয়া।
খোলা বাইরনের পুঁথি বক্ষে ধরি' চাপি'
নয়ন আকাশ পানে উঠা'য়ে কদাপি
ঈষৎ হেলান্ ঘাড় ভাবের আবেশে ;
ধূমপত্রে পলিতা ধরা'ন্ অবশেষে।
কবিরে দেখিতে পা'ন্ এই অবসরে
সহাস্যে দাঁড়া'য়ে পাশে কুতুহল-ভরে।
"হ্যালো" বলি কবির হাতটি পাকড়িয়া
হা ! হা! হা! হা! হাসিলেন পৃষ্ঠ থাবড়িয়া,—
"আশার অতীত এযে আজি অনুগ্রহ ;"
কবি বলে "সে যা' হোক্ ঠিক কথা কহ'
এই দশ মিনিট কোথায় ছিলে তুমি ?
সরগে,'না রসাতলে ? ছার মর্ত্ত্যভূমি
তোমার পায়ের যোগ্য নহে কদাচন ;
বোধ হয় যেন কারো কমল-লোচন
তোমায় সরগে তুলি জাদু-মন্ত্র-বলে
আছাড়িয়া ফেলিয়াছে ঘোর রসাতলে।"
এম-এ বলে "মনে মোর দেওয়া আছে চাবি,
কেমনে পশিলে তথা তাই আমি ভাবি।
ঠিক আঁচিয়াছ কিন্তু, সাবাস তোমায় !
হেবেন * হইতে হেলে † ফেলেছে আমায়।
সেই ভালবাসা ! উঃ সেই ভালবাসা !
কোথায় সে ! এককালে করেছিনু আশা
ধমনিতে ধমনিতে শিরায় শিরায়

---

* M. A.

* Heaven.
† Hell.

বহিবে তাহার স্রোত অজস্র ধারায়,
রোমে রোমে সঞ্চারিয়া জ্বলন্ত তড়িৎ,
হৃদয়ের অন্তস্তল করি' আলোড়িত!
সে আশার বাসা এবে গিয়াছে ভাঙিয়া—
ভাঙিয়া গিয়াছে হিয়া শতধা হইয়া!
উঁকি দিয়া দেখ যদি হৃদয় আমার,
নিরখিবে ছিঁড়ি খুঁড়ি তন্ত্রী সেথাকার
দাপুটিয়া বেড়াইছে নিরাশার বায়ু!
উপাড়িয়া ফেলিতেছে মরমের স্নায়ু!
ঐ যে আমার দেহ রক্ত-মাংসময়
ইহার ভিতরে এযে জ্বলন্ত হৃদয়
হৃদয়ের মাঝারে এই যে মর্ম্ম খনি,
ইহার মাঝারে—যারে বলে মহপ্রাণী,
তাহার ভিতরকার প্রত্যেক ধমনী,
তাহার ভিতরকার স্নায়ুর কাঁপনি
তাহার ভিতরকার অণু তস্য অণু
জ্ব'লে হ'ল ছারখার—ম'মু, ম'মু ম'মু!
প্রাণের কাঁদুনি মোর তুমি কি শুনিবে?
যদি শুন তাহাতে কি মনোযোগ দিবে?
মনোযোগ দেও যদি বুঝিবে কি তাহা?
বুঝিয়াও বন্ধু তুমি বলিবে কি "আহা?"
"আহা" বল যদি বা—মুখেরি শুধু কথা
না মর্ম্মের উচ্ছ্বসিত মমতার বন্যা?
দেখি আগে উত্তর কি দেও তুমি এর,
তা পরে বলিবার কথা আরো আছে ঢের।
তোমার সহানুভূতি পাইলে দোসর,

হইবে হৃদয়-তন্ত্রী সপ্তমে সোয়ার"।
"আর না" বলিল কবি "পায়ে ধরি ক্ষম'
হাঁপ ছাড়ি ঠাণ্ডা হও, বিরম,' বিরম'!
আর না—বুঝেছি সব, হইয়াছে—থামো!
উঠেছ সপ্তম স্বর্গে মর্ত্ত্যে এবে নামো!
সহা-অনুভূতিকে করি হে নমস্কার—
প্রকাণ্ড শব্দেরি বোঝা, অর্থ বোঝা ভার!
মুখাগ্রে ভারতী তব জ্বলন্ত আগুন!
সরস্বতীর ঘাড়ে চেপেছে বা খুন!
প্রকাশি' সম-বেদনা ধরা যদি দিই
উঁহার এ অবস্থায়,—হয়েছে তবিই!
শুনেছি দীপক রাগ আলাপিল যেই
গায়ক হইল ভস্ম সেই মুহূর্ত্তেই,
তোমার মুখ নির্গত জ্বলন্ত অনলে
দিব্য তুমি দেখিতেছি রয়েছ কুশলে!
নিজে খুব জ্বল না—জ্বলিতে যদি হয়,
রাজ্য-শুদ্ধ জ্বালাবে সেইটি ভাল নয়।"
বলে এম-এ "কি বুঝিবে তুমি মাথা মুণ্ড
He jests at scars who never felt the
wound-ও।"
কবি বলে "চেষ্টা নেই—যাবে কিসে জ্বালা?
হাহুতাস কেবল বৈত না জপমালা!
বলি শুন কিসে হবে রোগের দমন
তুমিই না ব'লে থাকো মস্তিষ্কেই মন,—
মনের আগুন তব মস্তকেরই গুণ,
দাবদগ্ধ হ'য়ে সব মরিছে উকুন!

মস্তকে সলিল সেক ক্রমাগত চাই
তা'ভিন্ন উপায় নাই বন্ধু ও-হে ভাই!
তাই কর তাতেও না পাও যদি স্বাস্তি,
কালিঘাটে-স্বস্ত্যয়ন বিনা গতি নাস্তি।"
এম্ এ বলে "Don't know what
you mean by স্বস্তান!
To be or not to be it is the
question.
রই কিম্বা না রই ইহাই এবে প্রশ্ন।"
কবি বলে "ও প্রশ্নের সদুত্তর 'yes no'
এর বেশী ইংরাজী আমার ঘটে নাই
মানে মানে এখন বিদায় হই ভাই।"

হরিদ্বার হইতে পত্র।

আমি যখন হরিদ্বারের মেলা দেখিতে যাই, তখন তোমার এক পত্র পাইয়াছিলাম। সে পত্র এখনো আমার সঙ্গে আছে। তাহাতে তুমি আমাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিয়াছিলে—তুমি লিখিয়াছিলে যে "কত দিন আর তুমি জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সকল অবহেলা করিয়া হিমালয়ের বিজনে বিজনে ভ্রমন করিয়া বেড়াইবে? সমস্ত সমাজ বন্ধন ছিঁড়িয়া অমন দূরে দূরে নিতান্ত অনাথের মত জীবনধারণে সুখও নাই, শান্তিও নাই।" কিন্তু ভাই বাঙ্গালী জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য কি? বাঙ্গালী জীবনের সামান্য উদ্দেশ্যই বা কি? আমি ও বিস্তর বিস্তর ভাবিয়া দেখিয়াছি—কিন্তু এই ব্যতীত আমার ত আর কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না যে,—আমাদের জীবন কেবল নিশ্বাস-প্রশ্বাস মাত্র, ইহার কোন মহৎ বা সামান্য উদ্দেশ্য নাই।

বাঙ্গালীর জীবন ত জীবনই নহে—ঐ নির্জীব যুগ্য জীবনের আবার উদ্দেশ্য কি? ধন উপার্জ্জন—পরনিন্দা—আর পিণ্ডদানের উপায় সংস্থাপন করা ব্যতীত সে জীবনের আবার উদ্দেশ্য কি? তুমি হয় ত আমার এই সকল কথায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইতেছ, কিন্তু আমি প্রকৃত কথা না বলিয়াই বা কি করি? তুমি ত জানই যে তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া বাঙ্গালী জীবন ও বাঙ্গালী সমাজ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া কতবার হাসিয়াছি, কতবার কাঁদিয়াছি, কতবার ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছি। সমস্ত বঙ্গ সমাজ যদি একটি প্রভূত শরীর রূপে কল্পনা করিয়া লই, তা হোলে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে আমি বলিতে পারি যে, সে শরীরে মস্তিষ্কও নাই, হৃদয়ও নাই! যদি একটু মাত্র মস্তিষ্ক থাকে ত তাহা কেবল অন্যের সর্ব্বনাশ করিতে চালিত হয়, যদি

কটুমাত্রও হৃদয় থাকে, ত সে কেবল অন্যের দুঃখে ও যাতনায় প্রচণ্ড হর্ষে স্ফূর্ত্তি পায়! আমি ব্যক্তি বিশেষের কথা বলিতেছি না, কারণ আমি দুই তিন জন বাঙ্গালীকে অ-বাঙ্গালী বলিয়াই ভক্তের ভাবে ভক্তি করিয়া থাকি, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের কথাই কহিতেছি! আজ—এই রাত্রে—ঐ সুন্দর ধ্রুব নক্ষত্র হইতে যদি কোন জীবন্ত পুরুষ আসিয়া আমাকে বলে যে "সূর্য্য মণ্ডলের একটি গ্রহে এক প্রকার জীব দেখিলাম, যাহা নরকের কীট অপেক্ষাও হীন, কিন্তু আস্ফালনে বাসুকী-সদৃশ;—যাহারা বিকট মূর্খ হইলেও আপনাকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া সমস্ত পৃথিবীকে দৃক্‌পাতও করে না, পরচর্চ্চাই যাহার ব্যবসা এবং পর নিন্দাতেই যাহার আমোদ;—শত্রু পদ দলিত হইয়াও যাহারা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া চীৎকার করিতে ছাড়ে না,—এমন কি,—সেই শত্রুর পাদুকা-পেষণে শরীরের প্রত্যেক পঞ্জর যে সময় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে সেই সময়েই জীবন ভিক্ষা করিতে করিতে সাধু পয়ার ত্রিপদীতে—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে"

ঊর্দ্ধ কণ্ঠে আওড়াইতে কখনই ভুল করে না;—আমি সূর্য্যমণ্ডলের একটি গ্রহে এইরূপ এক প্রকার [illegible] আসিয়াছি।"—এই [illegible] বুঝিতে পারিব [illegible] পরিব্রাজক পুরুষ [illegible]ের পৃথিবী রূপ গ্রহেতে ভারতের বঙ্গদেশ দেখিয়া আসিয়াছে। বঙ্গদেশের জলবায়ুর গুণেই হোক—বঙ্গবাসীদের কৌলীক অমানুষত্ব বশতঃই হোক,—বদ্ধমূল কুসংস্কারের প্রভাবেই হোক,—অথবা শৈশবাবস্থা হইতে শিক্ষার দোষেই হোক, বঙ্গবাসীরা যে কখন বিনীত অথচ মহান কোমল অথচ গম্ভীর—সুস্নিগ্ধ অথচ তেজীয়ান মনুষ্যত্বে পরিণত হইতে পারিবে, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। চারিদিকের সকল বিষয়ের কার্য্য-কারণ জানিতে একটি শিশুর পর্য্যন্ত যে কৌতুহল আছে, হাঁটিতে শিখিয়া পড়িয়া গিয়া আবার উঠিতে একটি শিশুর পর্য্যন্ত উদ্যম হয়, একটি অবিবাহিতা বঙ্গের বালিকাকে অন্যায়রূপে পরিহাস করিলেও তাহার যে ঊর্দ্ধফণাময় তেজস্বীতার ভাব হয়, একজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী পুরুষের সে কৌতুহল, সে উদ্যম, সে তেজস্বীতা নাই। বক্তৃতার বেদীতে এক জন বঙ্গবাসীকে উঠাইয়া দাও, অভিনয়ের রঙ্গ ভূমিতে তাহাকে ছাড়িয়া দাও, অপহৃত ভাবময় ছন্দহীন কবিতা তাহাকে লিখিতে দাও,—তুমি দেখিবে যে এক জন কৃতবিদ্য বঙ্গবাসী দেশহিতৈষীতাতে আদর্শ ও তেজস্বীতার মধ্যাহ্ন-সূর্য্য স্বরূপ। কিন্তু তুমি তাহার হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ কর,—দেখিবে যে সে হৃদয়ে অকিঞ্চিৎকর দাস দাসীর পর্য্যন্ত কি বলে, সেই ভাবনা, সেই আশঙ্কা, সেই ভয়ই তাহা সমস্ত আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যে স্বতঃ উৎসারিত সরলতা, যে অপ্রতিহত তেজস্বীতা, কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে যে অকুতোভয়তা অথচ সহৃদয়তা,—যে সামঞ্জ-

স্যতা অথচ উদারতার দ্বারা মানুষের মানুষত্ব নির্দ্ধারিত হয়, কয়জন বঙ্গবাসীতে তাহা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়? তবে কেন আর তুমি বাঙ্গালী জীবনের উদ্দেশ্যের কথা আমাকে শুনাও? আমি বঙ্গ সমাজ হইতে যে সুদূরে রহিয়াছি—এই কি তোমার পরম আহ্লাদের বিষয় নহে? যেখানে পুরুষেরা লক্ষ্মী রূপা স্ত্রীলোকদিগকে মুসলমানদের মতন হীন পশু বলিয়া জ্ঞান করে, স্বামীরা আপন স্ত্রীদিগকে ক্রীত দাসী রূপে গণনা করে, পিতারা আপন সন্তানদিগকে "পুতুল বাজীর" পুত্তলিকাবৎ মনে করে, পরস্পরে পরস্পরকে আপন শীকারের উচিত সামগ্রী ভাবিয়া তাহাকে অনুসরণ করে, সেই দুর্গন্ধ বায়ুময় সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত সমাজ ছাড়িয়া এই মহান হিমালয়ের উদার বক্ষে যে আজও পর্য্যন্ত আমি থাকিতে পারিয়াছি—ইহাই কি তোমার পরম আহ্লাদের বিষয় নহে? তুমি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছ যে "বিজনে বিজনে আমি আর কত কাল ভ্রমন করিব?" কিন্তু, সহৃদয়! হিমালয়ের এই বিজন প্রদেশে প্রকৃত বিজনতা কোথায়?

*　*　*　*

এই সমগ্র হিমাচলে বিজনতা কোথা[illegible] নাই! বঙ্গ সমাজে—শূন্য শ্মশান দেশে অলক্ষিত উদাসীনের মত পরিভ্রমণ ক[illegible] অপেক্ষাও এই হিমালয়ে বিচরণ করিতে যে কি আমোদ, তাহা তুমি কি বুঝিবে? মমতা শূন্য বঙ্গ-সমাজ অপেক্ষাও এই কঠোর হিমাদ্রীশিখর আমার স্পৃহনীয় সামগ্রী! এখানে স্বয়ং হিমাচলই আমার স্নেহময় পিতৃ-সদৃশ, কারণ তাঁহার উদার অঙ্কেই আমার সকল পার্থিব যাতনার উপশম হইয়াছে,—এখানে প্রত্যেক নিহার-স্তম্ভই আমা[illegible] সোদর-স্বরূপ, কারণ তাহাদিগকে দেখিয়া আমার হৃদয়ের শান্তি,—এখানে এই উত্ত[illegible] আকাশের প্রত্যেক নক্ষত্রই আমার স[illegible] স্বরূপ, কারণ তাহাদের নিকটেই আ[illegible] আমার মনের সকল কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচা[illegible] করিয়া থাকি। বাস্তবিক, এই সু[illegible] হিমাদ্রী প্রদেশে ঐ সুদূর আকাশ-স্থি[illegible] একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে যতটা বন্ধুত্ব[illegible] হৃদয়ের ভিতরে স্থান দিই, তত আ[illegible] কাহাকেও দিতে ইচ্ছা করে না।

*　*　*　*

ভূ-পঞ্জর।

তৃতীয় প্রস্তাব।

তৃতীয় যুগ।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ আফ্রিকা সংলগ্ন একটি মহাদেশ ভুক্ত ছিল। ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব্বে আধুনিক আসামের অধিকাংশ, পশ্চিমে সম্পূর্ণ না হউক প্রায় সমস্ত পারস্য, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু নদীর সন্নিহিত প্রদেশ, এবং গাঙ্গেয় প্রদেশের উত্তরাংশ অধিকার করিয়া সমুদ্র অবস্থিত ছিল। এই পশ্চিম সমুদ্রের এক শাখা কাশ্মীরের মধ্য দিয়া ল্যাডাক উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে তিব্বত ও হিমালয় প্রদেশ সমুদ্র হইতে অল্পই উচ্চ ছিল, পরে যে বিপ্লব দ্বারা ক্রমশ হিমালয় উন্নত হইয়াছে, যাহার দ্বারা হিমালয়ের স্তর সকল লণ্ড ভণ্ড হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা ইয়োসিন অন্ত যুগের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান কালেও চলিতেছে।

হিমালয় পর্ব্বত আসাম প্রদেশ ব্রহ্মদেশ কচ্ছ ও সিন্ধু দেশে মাঝে মাঝে এখনো যে প্রবল ভূকম্পন দেখা যায় তাহা সেই বিপ্লবের ধারাবাহীত্যের প্রমাণ। এই বিপ্লবের কারণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ সত্বেও এইরূপ বলা যাইতে পারে যে হিমালয়-সন্নিহিত প্রদেশের অভ্যন্তর শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হওয়াতে সেই সকল স্থান দমিয়া হিমালয়কে উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে।

এ সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ দাক্ষিণাত্যের সহিত সংলগ্ন ছিল কি না নিশ্চয় বলা যায় না তবে সংলগ্ন থাকাই আধুনিক ভূবেত্তাগণ সম্ভবপর মনে করেন।

অনেক ভূবেত্তাদের মত যে এতাবৎকাল দাক্ষিণাত্য ও হিমালয়-সন্নিহিত প্রদেশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, পরে ইয়োসিন অন্তর-যুগের শেষ দিক হইতে আরম্ভ হইয়া তৃতীয় যুগেই প্রথম গঙ্গা ও সিন্ধু মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র শুকাইয়া উপরোক্ত উভয় প্রদেশ সংলগ্ন হইল। কিন্তু ভূবেত্তা ব্ল্যানফর্ড বলেন * সম্ভবতঃ চাথড়ি অন্তর যুগের শেষ হইতেই ভারতবর্ষ-উপকূল স্থূলতঃ আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা হইতে দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। একটি, যদি চাথড়ি অন্তর যুগের শেষে ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ একই-সংলগ্ন ভূখণ্ড না হইয়া সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকিত,

* See Medlicott and Blandford's Manual of the Geology of India. Vol 1—Int.

তাহা হইলে তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে উৎপন্ন সমুদ্র মৃত্তিকা-স্তরে সামুদ্রিক জীব কঙ্কাল পাওয়া যাইত। কিন্তু রাজমহেন্দ্রী হইতে গারো পর্ব্বত পর্য্যন্ত এ সময়ের মৃত্তিকায় সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে স্থূল-চর্ম্মী জন্তু, (pachyderm) হস্তী মহিষ ইত্যাদি জন্মিবার আগে ভারতবর্ষের উত্তর ভাগেই এই সকল জন্তু উৎপন্ন হয়, কেননা উত্তরেই তৃতীয় যুগের প্রথম ভাগ ইয়োসিন অন্তর যুগের মৃত্তিকায় হস্তী মহিষ জাতীয় স্থূল-চর্ম্মী জীব কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। পরে শীতের তাড়নে উহারা উত্তর হইতে দক্ষিণে পলায়ন করে। যে সকল প্রাণী উত্তরে লোপ পাইয়াছে তাহারা ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে এবং ইহার সম নিরক্ষান্তর প্রদেশে এখনো বর্ত্তমান, এবং দাক্ষিণাত্যে আবার যে সকল জীব এখন বিলুপ্ত তাহা আফ্রিকায় দেখা যায়। যদি চাখড়ির শেষে ভারতবর্ষ উপকূল সংলগ্ন না থাকিত তাহা হইলে তৃতীয় যুগের প্রথমেও সমুদ্র দ্বারা উত্তর দক্ষিণ বিচ্ছিন্ন থাকিলে কি করিয়া স্থূলচর্ম্মী জাতি দক্ষিণে উপস্থিত হইবে? তাহা হইলে তৃতীয় যুগের মধ্য অন্তর যুগ মায়োসিন কালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মৃত্তিকাতে হস্তী মহিষ কঙ্কাল পাওয়া যাইত না।

ব্ল্যান ফর্ডের মতে, ভারতবর্ষের উপকূল চাখড়ি অন্তর যুগের শেষাংশ হইতে স্থূলতঃ প্রায় একই রূপ আছে, তবে চাখড়ি অন্তর যুগে ভারতবর্ষের উপকূলে মাঝে মাঝে যে সকল সমুদ্র শাখা প্রবিষ্ট ছিল তাহা কালে শুকাইয়া স্থলে পরিণত হইয়াছে।

কচ্ছ ও কাটিবার প্রদেশ পূর্ব্বে দ্বীপাকার ছিল, ইহা তৃতীয় যুগেই বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধু-গাঙ্গ প্রদেশ তৃতীয় যুগের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলে তাহা এরূপ সমতল ক্ষেত্র কি করিয়া হইল? সমুদ্র-গর্ভ শুকাইয়া মাটী হইলে সেই নূতন স্থল প্রথমে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অপেক্ষা নীচু হয় এবং প্রায় সর্ব্বত্রই এক রূপ উচ্চ বলিয়া সমতল ক্ষেত্র হইয়া পড়ে। কিন্তু সিন্ধু-গাঙ্গ প্রদেশ যদি বহুদিন উৎপন্ন স্থল হয় তবে ইহা কি করিয়া সমতল হইল?

যে কারণে হিমালয় উচ্চ হইয়াছে সেই কারণে সিন্ধুগাঙ্গ প্রদেশ ও সমতল হইয়াছে। একটা গোলাকার বস্তুর কোন স্থান নীচু হইয়া চেপটা হইয়া পড়িলে অর্থাৎ কোন গোলাকার পদার্থ ক্রমশঃ সরল রেখার অনুরূপ হইতে সচেষ্ট হইলে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকস্থান অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং অধিক স্থানের অভাব হইলে এক দিক উচ্চ ও এক দিক নীচু হইয়া পড়ে। সেই নিয়ম অনুসারে ভূগর্ভের সঙ্কোচন হেতু সিন্ধু গাঙ্গ প্রদেশ নীচু ও হিমালয় উন্নত হইয়াছে।

কিন্তু গণনা দ্বারা দেখা যায় যে সিন্ধু গাঙ্গ প্রদেশের অবনতি বশতঃ হিমালয়ের বর্ত্তমান উচ্চতা উৎপন্ন হইতে পারে না; উহাতে হিমালয়কে উর্দ্ধ সংখ্যা সাত হাজার ফুট উন্নত করিতে পারে। সুতরাং সিন্ধু-

গাঙ্গ-প্রদেশের অবনতি ও হিমালয়ের উন্নতির পরস্পর কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নাই—এতদুভয়ই পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তির ক্রিয়া ফল।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে ইয়োরোপের ভূপৃষ্ঠ অবস্থা কিরূপ ছিল এইবার দেখা যাউক।

ক্রিটেসস অন্তর যুগের শেষে ইয়োরোপে সমুদ্র ভাগই অধিক। স্পেন এবং ইটালির অধিকাংশ, হলাণ্ড, সুইজারলাণ্ড, প্রসিয়া, হানগেরি, ওয়ালেকিয়া, উত্তর রুসিয়া ও পারিসের কতকাংশ লইয়া চাথড়ি অন্তর যুগের শেষে সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। এ সময় জুরাসিক যুগ উৎপন্ন সার বর্গের (Cherbourg) ভূখণ্ডের দ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সংযুক্ত ছিল। পরে ঐ ভূখণ্ড সমুদ্রগ্রস্থ হওয়াতে অধুনা ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় যুগে ক্রমশঃ ক্রিটেসস অন্তর যুগের এই বিস্তৃত মহা সমুদ্র শুকাইতে আরম্ভ করিয়া ইয়োরোপের আধুনিক স্থল ভাগ উৎপন্ন হইয়াছে।

এ যুগের একটি বিশেষ লক্ষণ-সম্পূর্ণ রূপে নূতন প্রাণী জাতির আবির্ভাব। এ সময় প্রায় সমস্ত পুরাতন স্থলচর প্রাণী অন্তর্হিত করিয়া স্তন্যপায়ী জীবের দ্বারাই পৃথিবীর স্থল ভাগ পূর্ণ হইল। প্রথম যুগে কাঁকড়া, মৎস্য ও দ্বিতীয় যুগে সরীসৃপদিগের যেমন বিশেষ রূপ প্রাদুর্ভাব, তেমনি এই যুগে স্তন্যপায়ী জীবই প্রধান, সেই জন্য ইহার আর একটি নাম স্তন্যপায়ী যুগ। এই সময়ে যে কত আকৃতির কত অসংখ্য প্রকারের স্তন্যপায়ী জীব ছিল তাহা এখন পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয়ই করিতে পারেন না।

আমরা দ্বিতীয় যুগের জুরাসিক সময়ের যে কাঙ্গারু জাতীয় স্তন্যপায়ী জীবের কথা বলিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তৃতীয় যুগের স্থূলচর্ম্মী অর্থাৎ হস্তী মহিষ প্রভৃতি জাতীয় জীবই পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী জীব বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তৃতীয় যুগকে যে তিন ভাগে ভাগ করা যায় তাহার প্রথম ভাগে এই জাতীয় জীবেরই অধিক প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এবং আর দুই ভাগের স্তন্যপায়ী জীব সকল এত প্রকাণ্ড ও অদ্ভূত গঠনের যে তাহাদের জাতীয় সাদৃশ্যও এখনকার জীবে পাওয়া যায় না, সে সকল জাতীয় জীব এখন সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত। কেবল তৃতীয় যুগের শেষাংশে যে সকল জীব জন্মিয়াছে তাহার অধিকাংশ এখনও বর্ত্তমান। এ যুগের শেষ দিকে অনেক পক্ষী ছিল বটে কিন্তু তাহারা স্তন্যপায়ী জীবের মত বহু সংখ্যক নহে। কুম্ভীরাকার এক রূপ প্রকাণ্ড সরীসৃপ তৃতীয় যুগের সকল সময়েই দেখা যায়। আমাদের বর্ত্তমান সময়ের মত তৃতীয় যুগের সমুদ্রে নানা জাতীয় নানা প্রকার জীবের বসতি, কিন্তু দ্বিতীয় যুগে আমরা অ্যামোনাইট বেলেমনাইট ইত্যাদি যে সকল শম্বুক জাতির প্রাচুর্য্য দেখিয়াছি তাহা আর এখনকার সমুদ্রে নাই। এ যুগের শম্বুক জাতীয় যে সকল জীব দেখা যায়, তাহা অনেকটা আমাদের সময়ের মত।

এ যুগের আশ্চর্য্য রূপ প্রাণী প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এ সময়ে ফারমিনিফেরা ও নিউমিলাইট নামক শম্বুক জাতীয় ক্ষুদ্র জীব এত বহু সংখ্যক একত্রে বিচরণ করিত যে ইহাদের দেহাবশেষ দ্বারা এক এক স্থানে শতাধিক ফুট পরিমান স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নহিলে ইহাদের দেখাই যায় না।

এই যুগের কতক উদ্ভিদ আমাদের উদ্ভিদের কাছাকাছি, আর কতক একেবারে আমাদের মত। * দ্বি-পত্র উদ্ভিদ এ যুগে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ফুল ও ফল এই প্রথম হইল। নানা বর্ণের ফুল ও নানা রূপ ফল দ্বারা এখন চৌদিক সুশোভিত। বন ফুল শোভিত হরি বর্ণ বিস্তৃত ক্ষেত্রে কীট পতঙ্গের সীমা নাই। বৃহৎ বৃহৎ ফুল-বৃক্ষ সঙ্কুল বনে নানা প্রকার পাখীদের বসতি। বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর মেঘাচ্ছ বাষ্পাবরণ ক্রমে পরিষ্কৃত হইয়া এই সকল সূক্ষ্ম ফুস ফুস বিশিষ্ট (Delicate pulmonary) জীবের বাসোপযোগী হইয়াছে। ভূপঞ্জর এখন এত স্থূল যে আভ্যন্তরিক উত্তাপ আর বড় উপরে উঠিতে পারে না। তৃতীয় যুগে পৃথিবীর উত্তাপ স্থূলতঃ বর্ত্তমান সময়ের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায় ছিল, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপের ন্যূনাধিক্য বশতঃ পৃথিবীর দ্রাঘিমা ভেদে শীতাতপের বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং মেরু দেশে অল্প অল্প শীত দেখাদিয়াছে।

প্রচুর বৃষ্টি দ্বারা এই সময়ে যে সকল প্রধান প্রধান নদী ও পরিষ্কার জলের হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছিল পরে সেই সকল প্রকাণ্ড নদী-মোহানার ব-দ্বীপই ক্রমে নূতন নূতন দেশ রূপে পরিণত হইল। আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে এখন জল ও স্থল যে অবস্থায় দেখিতেছি ইহা তৃতীয় যুগেরই শেষ ভাগে এই রূপ আকার ধারণ করিয়াছে।

তৃতীয় যুগটি বিখ্যাত লায়েল তিন ভাগে বিভক্ত করেন। ইয়োসিন মায়োসিন ও প্লায়োসিন। ইয়োসিন অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রারম্ভ, মায়োসিন অর্থাৎ অল্পাধুনিক, প্লায়োসিন অর্থাৎ অধিকাধুনিক। এই সকল আখ্যা দ্বারা বর্ত্তমান সময়ের জীব জন্তু হইতে তৎসাময়িক জীব জন্তুর প্রভেদ দর্শাইতে তিনি এই রূপ নামকরণ করিয়াছেন।

এখন এই তিন ভাগের স্থূল লক্ষণ সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এ অংশ শেষ করা যাউক।

ইয়োসিন অন্তর যুগ।

পূর্ব্বের সেই মহা সমুদ্রের অনেক অংশ এখন স্থলে পরিণত। নানা নদ নদী হ্রদ ও তড়াগে শোভিত-স্থল এখন নানা প্রকার উদ্ভিদ ও জীব জন্তু পূর্ণ। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের উদ্ভিদ, এবং পরবর্ত্তী অর্থাৎ আমাদের

* যে বৃক্ষের অঙ্কুর উদ্গাম কালে একটি মাত্র পত্র উদগত হয় তাহা এক পত্র অর্থাৎ Monocotyledon, যথা, পেয়াজ যব ছোলা ইত্যাদি। যাহার দুইটি পত্র উদ্গাত হয় তাহা দ্বি-পত্র অর্থাৎ Dicotyledon, যথা, মটর পোস্ত কুল পেয়ারা ইত্যাদি।

বর্ত্তমান যুগের উদ্ভিদ এই যুগে একত্রে উৎপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

নানা জাতীয় লুপ্ত বৃক্ষের সহিত আধুনিক বার্চ. আকরোট ওক কেলু ও ঝাউ জাতীয় দেবদারু, ফার, ইউ, সাইপ্রেস ইত্যাদি নানা প্রকার বৃক্ষ একত্রে বিরাজমান।

নানা জাতীয় পর্ণীতরু শৈবাললতা ও জল-উদ্ভিদের অভাব নাই। আশ্চর্য্য এই, তখনকার সরোবরে আধুনিক জলজ উদ্ভিদ অনেক দেখা যায়, যেমন এক রূপ পানিফল (Water caltrop)। তখনকার উদ্ভিদের মধ্যে ২০০০ জাতি বিদিত। ১৪৩ দ্বি-পত্র (Dycotyledon) জাতি; ৩৩ এক-পত্র, (monocotyledon,) 33 পুষ্পহীন (cryptogam) জাতি, যথা, শৈবাল, পর্ণীতরু ঝাউ সাইকাড ইত্যাদি। স্তন্যপায়ী, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, পতঙ্গ, কীট, কচ্ছপ, শম্বুক ইত্যাদি এই যুগের জীব। এ সময়ে ইয়োরোপের উত্তাপ গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মত ছিল বলিয়া আধুনিক গ্রীষ্ম দেশের জীব কঙ্কাল এ সময়ে ইয়োরোপের মৃত্তিকাতে অনেক পাওয়া যায়। এই যুগের স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে স্থূলচর্ম্মীরাই প্রধান। এই সময়ে প্যালিওথেরিয়াম অর্থাৎ পুরাতন জন্তু, অ্যানোপ্লিথেরিয়াম অর্থাৎ নিরস্ত্র জন্তু ও জিফাডন (Palaeotherium Anoplotherium Xiphodon) বলিয়া যে সকল স্থূলচর্ম্মী জন্তু ছিল তাহারা উদ্ভিদাহারী. এবংপালে পালে থাকিত। তাহাদের শারীরিক আকার ঘোড়া গণ্ডার ও শূকরের মধ্যবর্ত্তী। এই জাতীয় নানা প্রকার ও নানা আয়তনের জীব কঙ্কাল এই যুগে দেখা যায়। পেলিওথেয়েরিয়াম, টেপার নামক শূকর ও গণ্ডারের মধ্যবর্ত্তী, ইহার অতি প্রকাণ্ড চক্ষু, ক্ষুদ্র কলেবর, চারিটা পা প্রকাণ্ড, খর্ব্ব ও মাংসাল, উচ্চতায় ইহা বৃহৎ ঘোড়ার ন্যায়। ইহার শূণ্ড টেপার শূকরের মত ক্ষুদ্র এবং দন্ত গণ্ডারের মত।

অ্যানোপ্লিথেরিয়ম জন্তুর খুর গরুর ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত, পদের অগ্রভাগ উষ্ট্রের ন্যায় ও দন্ত গণ্ডারের ন্যায়; আয়তনে ইহা গর্দ্দভের মত ইহার লাঙ্গুল অতি বৃহৎ, এবং গোড়া মোটা। জলে সন্তরণের সময় এই বৃহৎ লাঙ্গুল হালের কাজ করিত।

জিফডনের আয়তন অনেকটা শামা হরিণের ন্যায়। ইহাদের লাঙ্গুল ছোট এবং কর্ণ হরিণের ন্যায় বৃহৎ, কিন্তু ইহাদের গাত্র লোমাচ্ছাদিত নহে।

এই সকল জন্তু ছাড়া ইয়োসিন অন্তর যুগে উৎপন্ন প্যারিসের সন্নিহিত সোহাগার আকরে শূকর প্রভৃতি অন্যান্য প্রকার স্থূলচর্ম্মী জীব কঙ্কাল এবং শ্বাপদ পশুর পদচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

এই সময়েই নিউমিউলাইট নামক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শম্বুক দ্বারা সমুদ্র পূর্ণ ছিল এবং এই সকল মৃত জীব-স্তর দ্বারা পিরিনিস পর্ব্বত শ্রেণী স্থানে স্থানে নির্ম্মিত, এবং এই স্তর দ্বারাই ইজিপ্টের লোকেরা পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের কঙ্কাল দ্বারা শত শত ফুট উচ্চ স্তর হইতে কত শত শত বৎসর লাগিয়াছে তাহার ঠিক নাই। তৃতীয় যুগের এই

নিউমিলাইট মৃত্তিকা-স্তর ইয়োরোপ আসিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সকল স্থানেই পাওয়া যায়। এক এক স্থানে নিউমিউলাইট স্তর সহস্র ফুট উচ্চ।

ইয়োসিন মৃত্তিকার মধ্য ভাগে নিউমিউলাইট স্তর সন্নিবেশিত, কিন্তু এই স্তর হিমালয়, কারপেথিয়ান, আল্প, পিরানিস পর্ব্বতের অতি উচ্চাংশে দেখিয়া মনে হয় এই যুগে পৃথিবীতে কি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইয়া ছিল! সেই বিপ্লবের দ্বারাই ঐ সকল পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশ নির্ম্মিত।•

ইয়োসিন অন্তর যুগে ভারতবর্ষে, সিন্ধু আসামের কতকাংশ, এবং ব্রহ্মদেশে চুনে প্রস্তর স্তর উৎপন্ন। হিমালয় যে এই যুগ হইতেই পর্ব্বত রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ময়োসিন অন্তর যুগ।

শীত গ্রীষ্ম উভয় দেশের উদ্ভিদ এই অন্তর যুগে একত্রে জন্মিয়া ইহাকে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্তরযুগ হইতে ভিন্ন করিয়াছে। গ্রীষ্ম প্রধান আফ্রিকা দেশের নানা প্রকার বৃক্ষ এবং শীত দেশের ম্যাপল আকরোট পিচ এলম ওক, ও বাঁশ তাল প্রভৃতি বৃক্ষাদি ইয়োরপে এই অন্তর যুগে এক সঙ্গে জন্মে। ইহা ছাড়া এ সময়ে ডুম্বুর বটবৃক্ষ প্রভৃতিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এক-পত্র বৃক্ষ শৈবাল-উদ্ভিদ, পর্ণী-তরু এবং ঝাউ জাতীয় বৃক্ষ পূর্ব্ব অন্তর যুগ অপেক্ষা এখন সংখ্যায় অল্প এবং তাল জাতীয় বৃক্ষই বহু সংখ্যক। পূর্ব্ব অন্তর যুগের বৃক্ষাদি ছাড়া এ সময়ে ঝাউ ও তাল জাতীয় অনেক নূতন গাছ উৎপন্ন হইয়াছে। সংক্ষেপে বর্ত্তমান সময়ের সমস্ত বৃহৎ বৃক্ষেরই প্রথম ছাঁচ এই অন্তর যুগে দেখিয়া মনে হয় উদ্ভিদ রাজ্য এ সময়ে তাহার উন্নততম অবস্থায় উঠিয়াছে। এই যুগের বৃক্ষাদি হইতে এক প্রকার নিকৃষ্ট অঙ্গার উৎপন্ন। *

স্তন্যপায়ী, পক্ষী, এবং সরীসৃপ এ সময়ের প্রধান জীব। এ সময় অনেক নূতন স্তন্যপায়ী জন্মিয়াছে। এ সময়ে উৎপন্ন পশুদের মধ্যে বানর বাদুড় কাঙ্গারু জাতীয় নানাবিধ জন্তু মাংসাশী ও রোমন্থক জীব কুকুর ইন্দুর কাট বিড়াল এবং খরগোস জাতীয় অনেক প্রকার জীব; পক্ষীদিগের মধ্যে চড়াই বক কাক ইত্যাদি, সরীসৃপদিগের মধ্যে সাপ ব্যাং গিরগিটি এখনো বর্ত্তমান। কিন্তু এ সময়ের প্রধান প্রাণী স্থূলচর্ম্মী স্তন্যপায়ী, এখন লোপ পাইয়াছে, তাহাদের কঙ্কাল মাত্র এখন অবশিষ্ট। তাহারা এ সময়ে যেমন অসংখ্যক তেমনি অদ্ভুতাকার ও বৃহদায়তন।

---

* সুইজরল্যাণ্ডের এ অন্তর যুগের মৃত্তিকা এরূপ উদ্ভিদাবশেষ সমাকীর্ণ, যে অধ্যাপক হিয়ারের (Heer) মতে এস্থান তৎকালে ব্রেজিল ও জ্যামেকার সদৃশ নিবিড় অরণ্যময় ছিল। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান আমেরিক উদ্ভিদ এত প্রচুর পাওয়া যায় যে উঙ্গের (Unger) বলেন মায়োসিন অন্তরযুগে আ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর স্থলরূপে আমেরিকা ও ইয়োরোপকে সংযুক্ত রাখিয়াছিল।

এ সময়ের এক রকম প্রকাণ্ড অদ্ভুত স্থূলচর্ম্মী জন্তুর কঙ্কাল দেখিয়া প্রাণীবেত্তারা তাহার নাম ভয়ঙ্কর জীব (Dinotherium) রাখিয়াছেন। ইহার আকার অনেকটা হস্তীর ন্যায়, কিন্তু হস্তী হইতে ইহা অনেক প্রকাণ্ড, এবং ইহার নিম্নের দন্তস্তর হইতে দুইটি দন্ত মহিষ শৃঙ্গের ন্যায় নিম্নে বক্র হইয়া নির্গত। ইহা দেখিতে যদিও ভয়ানক, কিন্তু শষ্যাহারী। এই সময়ের হস্তীজাতীয় আর এক রূপ স্থূল-চর্ম্মীকে মাশটডন (অর্থাৎ স্তনবিভকার দন্ত বিশিস্ট) কহা যায়। ইহাদের বাহিক আকার অনেকটা হাতীর মত, তবে হাতী অপেক্ষা ও ইহারা স্থূলচর্ম্মী এবং লম্বা। ইহাদের কসের দাঁতের বিভিন্ন গড়ন ই আধুনিক হস্তী হইতে ইহাদিগকে বিশেষ রূপে ভিন্ন করিয়াছে।

পেনসিলভেনিয়া ইউনিভারশিটির অধ্যাপক বারটন, খড়ি মৃত্তিকাস্তরের ৬ ফুট নীচে যে মাশ্‌টডন কঙ্কাল পাইয়াছিলেন, তাহার একটি দন্ত সতের পাউণ্ড ওজনে হইয়াছিল। উত্তর আমেরিকার আদিমবাসীরা ইহাকে বৃষের পিতা বলে। ফাব্রি নামে এক জন ফরাসী, প্রাণীবেত্তা বুর্ফকে লেখেন, ক্যানেডা এবং লুইশিইনা প্রদেশে যেখানে মাশটডন কঙ্কাল প্রচুর পাওয়া যায় সেই প্রদেশ-বাসীদের প্রত্যেক শ্রুতি পরম্পরায় ও পুরাণ গানে এই জন্তুর কথা উল্লিখিত। তাহাদের একটি গানে আছে যখন মনিটর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা পৃথিবীতে নামিয়া, তাঁহার সৃষ্ট জন্তু সকল, কে কেমন সুখে আছে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বাইসন অর্থাৎ আমেরিক মহিষ বলিল, "ঐ ভয়ানক বৃষপিতা পর্ব্বত হইতে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে নামিয়া আমাদের কখন খাইতে আসেন তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিতে হইলে আমরা এই তৃণ-পূর্ণক্ষেত্রে চরিতে পাইয়া সম্পূর্ণ রূপে সুখী হইতে পারিতাম" আমেরিকার চৈন নামক প্রাচীন জাতির একটি প্রবাদ যে, পূর্ব্বে এই প্রকাণ্ড জন্তুরা, তাহাদের সমান প্রকাণ্ডাকার মনুষ্যের সহিত বাস করিত। কিন্তু ঈশ্বর অনবরত বজ্রাঘাত দ্বারা সেই সকল মানুষ ও জন্তু এক কালে বিনাশ করিলেন। বর্জ্জিনিয়ার আদিম অধিবাসীদের আবার অন্যরূপ গল্প আছে। তাহারা বলে, এই ভয়ানক জন্তু অন্য জন্তুদের বধ করিত বলিয়া ঈশ্বর বজ্র দ্বারা সকলকে বিনস্ট করিলেন, কেবল একটি মাত্র পুং মাশটডন বজ্র পড়িবার সময় মস্তক নাড়িয়া তাহা ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু পালাইবার সময় গাত্রে বজ্র পতন দ্বারা আহত হইয়া সে হ্রদে সে লুকাইয়াছিল সেই খানেই মরিয়া যায়। এই সকল গল্প হইতে মনে হয় মাশটডন, মামথ হস্তীর সমকালীন, হয় আদিম মনুষ্যে ইহা দেখিয়াছে, কিম্বা ঠিক মনুষ্য জন্মাইবার আগেই ইহা লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক ইহা যে মানুষ জন্মের বহু কাল পূর্ব্বে নহে তাহা এই সকল গল্প হইতে প্রকাশ পায়। এই মাশটডন হস্তী সম্বন্ধে আর একটি ঐতিহাসিক সত্য গল্প

আছে। রোন নদীর বাম পার্শ্বে ডফিনি প্রদেশে সোম নামক দুর্গের সন্নিহিত বালুকা স্তর খুঁড়িতে খুঁড়িতে ১৬১৩ খৃস্টাব্দের ১১ই জানুয়ারিতে সেই খননকারী লোকেরা একটি হস্তীর কতকগুলি অস্থি পায়। তখন এইরূপ পুরাতন জন্তুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। সেই দেশীয় মাজুইয়ার (mazuyer) নামক এক জন চিকিৎসক এই অস্থি সকল কিনিয়া রটনা করিলেন যে টিউটবকাশ রাজার (Teutobocchus Rei); নামাঙ্কিত ৩০ ফুট লম্বা এবং ৩৫ ফুট চওড়া একটি কবরে তিনি এই অস্থি সকল পাইয়াছেন এবং আরো বলিলেন যে সেই কবরস্থিত মারিয়াস (marius) মূর্ত্তি অঙ্কিত পঞ্চাশ মুদ্রা তাঁহার অধিকারে আসিয়াছে।

টিউটোবোকাস কিম্বি নামক প্রাচীন জর্ম্মান জাতির সেনাপতি হইয়া গল আক্রমন করিতে গমন করেন এবং প্রভেন্স প্রদেশের আই নামক নগরে মারিয়াস কর্ত্তৃক পরাজিত ও ধৃত হইয়া রোমে আনিত হয়েন। মাজুইয়ার ২৫ ফুট লম্বা দশ ফুট চওড়া একটি অস্থি কঙ্কাল দেখাইয়া বলিলেন ইহাই মৃত টিউটোবকাস দেহাবশেষ। তিনি এই মিথ্যা টিউটোবকাসের দেহ ফ্রান্স ও জার্ম্মনির প্রায় সর্ব্বত্রই প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশলুই পর্য্যন্ত এই অদ্ভুত কঙ্কাল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। এই কঙ্কাল লইয়া মহা বাকবিতণ্ডা চলিতে লাগিল। শরীর তত্ত্ববিদ রিয়োলাঁ টিউটোবোকাসের এই দেহ হস্তী কঙ্কাল ছাড়া কিছুই নহে এই প্রমাণ করিবার জন্য হারবিকট নামক এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া মহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। পরস্পর মহা লেখনী যুদ্ধ চলিতে লাগিল। গাসেনডি (Gassendi) বলিয়া আর এক জন পণ্ডিত প্রমাণ করিলেন যে মারিয়াসের মূর্ত্তি-অঙ্কিত মুদ্রাও মাজুইয়ারের প্রবঞ্চনা, কেন না সে মুদ্রায় গথিক অক্ষর অঙ্কিত।

এই মিথ্যা টিউটোবকাস-দেহ ১৮৩২ খৃস্টাব্দ পর্য্যন্ত বোর্দোতে রক্ষিত হইয়াছিল, পরে ইহা পারিসের মিউজিয়ামে প্রেরিত হয়। ব্লাঁভিল ইহা দেখিয়া মাশটডন অস্থি স্থির করেন। এবং যাহারা এ অস্থি একবার দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইহা মনুষ্য কঙ্কাল বলিয়া ভ্রম হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক।

এই অন্তর যুগেই প্রথম বানরের জন্ম। এ সময়ের দুই তিন প্রকার বানর কঙ্কাল পাওয়া যায়। মায়োসিন সমুদ্রে ৯০ জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন নূতন জীব জন্মে। তাহার মধ্যে কয়েক জাতীয় জীব এখনো বর্ত্তমান যেমন এখনকার কাঁকড়া, চিংড়ি মাছ ইত্যাদি।

এই যুগের কয়লায় আর এক অপরূপ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা হলদে ধূনা, Amber।

তৃতীয় যুগের লুপ্ত দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ নির্যাস অনেকদিন ভূমধ্যে প্রোথিত থাকিয়া এইরূপ আকরিক ধূনা হইয়াছে। বালুকা ও কর্দ্দম মধ্যস্থিত এই ধূনা

ব্যালটিক-সমুদ্র-তরঙ্গ-ধৌত হইয়া কূলে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং ইহা দ্বারা বহুকাল হইতে বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ফৈনিসিয়েরা বাণিজ্যার্থে এই ধূনা কুড়াইতে ব্যালটিক-সমুদ্র-তীরে আরোহন করিত। এখন গভর্ণমেণ্টে ইহা নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। এই ধূনা এখন প্রধানত ডান্‌ৎসিক ও মেমেলের মধ্যস্থিত জর্ম্মান উপকূলে প্রাপ্তব্য। অন্য মূল্য ছাড়া ইহার একটি বিশেষ মূল্য এই, তৃতীয় যুগের যে সকল প্রকার কীট পতঙ্গ দেহ ইহাতে রক্ষিত, তাহাদের বর্ণ এবং আকৃতির কিছুমাত্র, বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

মায়োসিন অন্তর যুগে ভারতবর্ষে, ব্রহ্মদেশের পেগু, আসাম ও সিন্ধুর কতকাংশ এবং মারি প্রদেশ উৎপন্ন।

প্লায়োসিন অন্তর যুগ।

তৃতীয় যুগের এই শেষ অন্তর যুগে বিষম বিপ্লব চিহ্ণ পাওয়া যায়। সকল সময়ের বিপ্লবের যে কারণ ইহারও তাই। ভূগর্ভ শীতল হইয়া এই সময় এত সঙ্কুচিত হইয়াছিল, যে কঠিন ভূপৃষ্ঠ নিম্নে নির্ভর না পাইয়া তুবড়াইয়া উচ্চনীচ হইতে লাগিল, এবং কোন কোন স্থান ফাটিয়া সেই গহ্বর নিঃসৃত আভ্যন্তরিক দ্রব পদার্থ পর্ব্বতমালায় পরিণত হইল। প্লায়োসিন অন্তর যুগের এই রূপ উৎপাৎ জনিত পর্ব্বতমালা ইয়োরোপে অনেক দৃষ্ট হয়। এই অন্তর যুগে হঠাৎ শীতের প্রাধান্য দেখাযায়, এখন পর্ব্বত চূড়া তুষারাচ্ছন্ন। দেশ মহাদেশ এই সময় হইতেই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু এই অন্তর যুগের অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্রদ এখন শুষ্ক। এই সময়ের উদ্ভিদ প্রায় ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের মত। পর্ণীতরু জাতির এখন আর আধিক্য নাই। শীতাতপ বৈষম্য হেতু ভিন্ন দেশে এখন ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ জন্মিয়াছে। ইয়োরপে আর গ্রীষ্ম দেশের বৃক্ষের তত প্রাচুর্য্য নাই। এ অন্তর যুগেও নানা প্রকার অদ্ভুত স্থলচর জন্তু দেখা যায়। তবে এ সময়ে স্তন্যপায়ী এবং ভেকজাতীয় সরীসৃপেরই প্রাধান্য অধিক। এ অন্তর যুগের শেষ ভাগে মাস্টডন্ আর বড় দেখা যায় না। এ যুগের নূতন উৎপন্ন জন্তুর মধ্যে, জল-হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব বৃষ শূকর ও হরিণ এখনো বর্ত্তমান। এ অন্তর যুগের অশ্ব আধুনিক জাতি অপেক্ষা আকারে ছোট ইহা প্রায় গর্দ্দভের সমান।

এখন নানা জাতীয় অসংখ্য বানর দেখা যায়। মায়োসিন অন্তর যুগে গণ্ডারের প্রথম উৎপত্তি, এ সময়ে তাহার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। এ সময় একরূপ দ্বিখড়্গী গণ্ডার (Rhinoceros tichorhinus) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সুমাত্রা ও আফ্রিকার আধুনিক দ্বিখড়্গী জাতি হইতে অনেক ভিন্ন। ইহাদের নাসারন্ধ্রদ্বয়ের মধ্যে একটা হাড়ের ব্যবধান আছে, আধুনিক জাতিতে তাহা নাই।

এই পুরাতন অদ্ভুত-গণ্ডার-কঙ্কাল হইতে নানাবিধ অদ্ভুত গল্পের উৎপত্তি। আরব্য উপন্যাসে যে রক পক্ষীর গল্প পড়া যায়, ভূগর্ভে এই গণ্ডার শৃঙ্গ পাইয়াই

সেই অদ্ভুত পক্ষীর গল্প সৃষ্টি হইয়াছে। ইয়োরপের বিখ্যাত ড্রাগনের গল্পও ইহা হইতে সৃষ্ট।

ক্যারিনথিয়া প্রদেশের ক্ল্যাগেনভূর্থ নগরের ফোয়ারায় প্রকাণ্ড ৬ ফুট পরিমান এক-শৃঙ্গ-ড্র্যাগন মস্তক অঙ্কিত আছে।

প্রবাদ এই যে, এই ড্রাগন পূর্ব্বে এক পর্ব্বত গুহায় বাস করিত এবং মধ্যে মধ্যে গুহা নির্গত হইয়া দেশ ছারখার করিত। এক সাহসী বীর নিজ-প্রাণ দিয়া এই ড্রাগনকে হত্যা করেন। ক্লাগেনভূর্থের টৌন-হলে রক্ষিত এই ড্র্যাগনমস্তক হইতে শেষে ফোয়ারায় তাহার অনুরূপ অঙ্কিত হয়। ভিয়েনার হের উঙ্গের (Herr unger) এই মস্তক-চিত্র দেখিবা মাত্রেই গণ্ডার মস্তক বলিয়া চিনিতে পারেন।

কোন পর্ব্বত গুহায় এই মস্তক পাইয়া হয় তো এই অদ্ভুত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল। হিমালয়ের মার্কণ্ড উপত্যকায় এই সময়কার একরূপ অদ্ভুত রোমন্থনকারী জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইংরাজেরা শিবের নাম হইতে ইহার নাম শিবথেরিয়াম রাখিয়াছেন। ইহার শরীর বৃষের ন্যায় প্রকাণ্ড, এবং আকারে অনেকটা আধুনিক (Elk) এল্ক জাতীয় হরিণের মত। ভিন্ন ভিন্ন শষ্যাহারী-জন্তুর অবয়ব মিশ্রণ সত্ত্বেও ইহার একটি নিজত্ব লক্ষিত হয়। ইহার বৃহৎ মস্তকে বর্ত্তমান সময়ের এক-জাতীয় আমেরিক হরিণের (Prong Buck) শৃঙ্গের মত শাখা প্রশাখা-বিশিষ্ট ৪ টি শূণ্যগর্ভ শৃঙ্গ।

বর্ত্তমান কালে জীবিত ভেক জাতীয় উভচর সরীসৃপ (যথা, গোসাপ ইত্যাদি) ২০ ইঞ্চের অধিক দীর্ঘ নহে। কিন্তু তৃতীয় যুগে এই জাতীয় এক একটি সরীসৃপ কুম্ভীরের ন্যায় দীর্ঘায়তন ছিল।

পূর্ব্বে এই সকল সরীসৃপ কঙ্কালকে চতুর্থ যুগের বন্যাহত মনুষ্য কঙ্কাল বলিয়া বিশ্বাসছিল। এই ভ্রম বিশ্বাসটি ঘুচাইবার জন্য ক্যাপে ও কুভিয়ের অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

হোরেশ দে সোস্যর (Horace de Saussure) তাঁর আল্প পরিভ্রমন (Voyage daus les Alpes) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে রাইননদীর বামপার্শ্বে ইনিংগেন গ্রামের নিকটে এক-স্থানে প্রস্তর-তলে একটি অস্থি-কঙ্কাল পাইয়া মনুষ্য কঙ্কাল বোধে শ্যুকজার (Scheuchzer) নামক এক জন সুইশ প্রাণীবেত্তা ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ফিলজফিক্যাল ট্র্যানজ্যাকসন পত্রিকায় ইহার বিশেষরূপ বর্ণনা করিয়া এক প্রবন্ধ লেখেন। এবং১৭৩১ খৃঃ অব্দে তিনি আবার এই সম্বন্ধে "মনুষ্য বন্যার" সাক্ষী (Homo deluvii testis) নামক এক খানি পুস্তক লেখেন। পবিত্র ভৌতিক বিদ্যা (Physica Sacra) নামক তাঁহার আর একখানি পুস্তকেও ঐ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

"মনুষ্য বন্যার সাক্ষী" এই কথা লইয়া জার্ম্মনিতে মহা হুলস্থূল চলিল, কিন্তু প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম উপদেষ্টা ও প্রাণী বেত্তা সুইজ পণ্ডিত সুকিজারের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা

কহিতে সাহস করিলেন না—কেবল পিয়ার কঁ্যাপার একাকী এই মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে নিজে এনিং-গেন (OEningen) পর্য্যন্ত গিয়া এই কঙ্কাল পরীক্ষা দ্বারা সরীসৃপ কঙ্কাল বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু কোন জাতীয় সরীসৃপ তাহা কঁ্যাপার ঠিক ধরিতে পারেন নাই; কুভিয়ে পরে সে মীমাংসা করিলেন। এযুগের পক্ষীর মধ্যে শকুনি, ঈগল গল, ছাতারি শুকজাতীয় ফেজ্যাণ্ট কুকুট, হংস, ইত্যাদি এখনো জীবিত।

এই সময়ে প্রথম আমরা জলচর স্তন্য-পায়ী দেখিতে পাই, ডলফিন এবং তিমি মৎস্য এই সময়ে জন্মে। জিফিউস(Ziphius) বলিয়া আর একরূপ জলচর জীবদের কুভিয়ে স্তন্যপায়ী জলচর শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন। ভূমধ্য সাগরে এই জাতি এখনো বর্ত্তমান। এই সময়ে বহুসংখ্যক নূতন শম্বুক জাতীয় জীব জন্মে এবং পৃথিবী ফলতঃ আধুনিক আকারে পরিণত হয়।

ভগ্ন হৃদয়।

ষষ্ঠ সর্গ।

কবি ও মুরলা।

কবি।—
উন্মাদিনী, কল্লোলিনী ক্ষুদ্র এক নির্ঝরিণী,
শিলা হোতে শিলাস্তরে লুটিয়া লুটিয়া,
নেচে নেচে অট্ট হেসে, ফেনময় মুক্ত কেশে
প্রশান্ত হ্রদের কোলে পড়ে ঝাঁপাইয়া;
শুধু মুহূর্ত্তের তরে তিল বিচলিত করে
সে প্রশান্ত সলিলের শুধু এক পাশ,
উনমত্ত কোলাহল, অধীর তরঙ্গদল
মুহূর্ত্তের মাঝে সব পায় গো বিনাশ!
দেখ, সখি, গৃহ মাঝে দেখ গো চাহিয়া,
নাচ, গান বাদ্য, হাসি,আমোদ কল্লোলরাশি-
নিশীথ-প্রশান্তি মাঝে পড়িছে ঝাঁপিয়া।
আলোকে আলোকে গৃহ উঠেছে মাতিয়া,
স্ফটিকে স্ফটিকে আলো নাচে বিদ্যুতিয়া,
শত রমণীর পদ পড়ে তালে তালে;
চরণের আভরণ, নেচে নেচে প্রতিক্ষণ,
শত আলোকের বাণ হানে এককালে;
মূর্চ্ছিয়া পড়িছে আলো হীরকে হীরকে;
শত কৃষ্ণ আঁখিতারা হানিছে আলোক ধারা—
শত হৃদে পড়ে গিয়া ঝলকে ঝলকে!
চারি দিকে ছুটিতেছে আলোকের বাণ,
চারিদিকে উঠিতেছে হাসি বাদ্য গান।

কিন্তু হেথা চেয়ে দেখ কি শান্ত যামিনী!
কি শুভ্র জোছনা ভায়, কি শান্ত বহিছে বায়,
কেমনে ঘুমন্ত আছে প্রশান্ত তটিনী!
বল, সখি, পূর্ণিমা কি আমোদের রাত?
এস তবে দুই জনে বসি হেথা এক সনে,
করি আপনার মনে রজনী প্রভাত!

(গান)

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে অতিধীরে—অতিধীরে গাও গো!
ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশীথের সুনীরব শিশিরের সম,
নিশীথের সুনীরব সমীরের সম,
নিশীথের সুনীরব জোছনা সমান
অতি—অতি—অতিধীরে কর সখি গান!
নিশার কুহক বলে নীরবতা-সিন্ধুতলে
মগ্ন হোয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর;
প্রশান্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর-উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর!
তটিনী কি শান্ত আছে! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি,
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বন ধ্বনি শুনে চমকে আপনি!
তাই বলি অতি ধীরে—অতিধীরে গাও গো,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!

(মুরলার প্রতি)
কেনলো মলিন সখি, মুখানি তোমার?
কাছে এস, মোর পাশে বোস' একবার!
কেন সখি বল মোরে, যখনি দেখেছি তোরে
মাটি পানে নত দুটি বিষণ্ন নয়ান!
আননের দুই পাশ এলানো কুন্তল রাশ,
করুণ ও মুখ খানি বড় সখি ম্লান!

মুরলা।—
সত্য ম্লান কিগো কবি এ মুখ আমার?
নিশীথ বাতাস লাগি মনে কত উঠে জাগি
নিস্তব্ধ জোছনা রাতে ভাবনার ভার!
(স্বগত) আহা কি করুণ সখা, হৃদয় তোমার!
কবি গো! বুক যে যায়, ভেঙ্গে যায়, ফেটে যায়—
অশ্রুজল রুধিবারে পারিনাক আর!
পারিনে—পারিনে সখা—পারিনে গো আর!
ভেঙ্গে বুঝি ফেলে তারা মর্ম্ম-কারাগার!
একবার পায়ে ধোরে কেঁদে নিই প্রাণ ভোরে,
একবার শুধু, কবি, শুধু একবার!
যুঝিছে বুকের মাঝে শত অশ্রুধার!

কবি।—
একটি প্রাণের কথা রোয়েছে গোপনে,
বলিব বলিব তোরে করিতেছি মনে!
আজ জোছনার রাতে বিপাশার তীরে
কাছে আয়, সে কথাটি বলি ধীরে ধীরে:

মুরলা।—
কি কথা সে? বল কবি! করহ প্রকাশ!

কবি।—
কে জানে উঠেছে হৃদে কিসের উচ্ছ্বাস!
খেলিছে মর্ম্মের মাঝে অধীর উল্লাস।
অথচ, উল্লাস সেই সুকুমার হেন,
শিশিরের বাষ্প দিয়ে গঠিত সে যেন:
হৃদয়ে উঠেছে যেন বন্যা জোছনার,
মধুর অশান্তিময় হৃদয় আমার।
সুক্ষ্ম আবরণ, গাঁথা সন্ধ্যা-মেঘ স্তরে,
পড়িয়াছে যেন মোর নয়নের পরে!

কিছু যেন দেখেও দেখেনা আঁখিদ্বয়,
সকলি অস্ফুট, যেন সন্ধ্যাবর্ণময় !
শোন্ বলি মুরলা লো, আরো আয় কাছে !
শূন্য এ হৃদয় মোর ভাল বাসিয়াছে !
মুরলা।—
ভালবাসে? কারে কবি? কারে সখা? কারে?
কবি।—
মধুর নলিনী সম নলিনী বালারে !
মুরলা।—
নলিনী ? নলিনী সখা ! নলিনী বালারে ?
কবি মোর ! সখা মোর ! ভালবাস' তারে ?
কবি।—
হাঁ মুরলা, সেই নলিনী বালারে,
তারে তুমি জান না কি ?
এমন মধুর মুখ-ভাব তার !
এমন মধুর আঁখি !
এত রাশি রাশি খেলাইছে হাসি
হৃদয়ের নিরালায়—
নয়ন অধর ভাসাইয়া দিয়া
উথলি পড়িয়া যায় !
যে দিকে সে চায় হাসিময় চোখে—
হাসি উঠে চারি ধার ;
যে দিকে সে যায় আঁধার মুছিয়া
চলে জ্যোতি-ছায়া তার !
তার সে নয়ন-নিঝর হইতে
হাসি সুধারাশি ঝরি,
এই হৃদয়ের আকাশ পাতাল
রেখেছে জোছনা করি !
মুরলা।—(স্বগত) দেবী গো করুণাময়ী,
কোথা পাই ঠাঁই মাগো, কোথা গিয়ে কাঁদি !
দুর্ব্বল এ মন দে মা পাষাণেতে বাঁধি !

(প্রকাশ্যে)
আহা কবি তাই হোক্—সুখে তুমি থাক'।
এ নব প্রণয়ে মন পূর্ণ কোরে রাখ' !
নয়নের জল তব কিছুতে মোছে নি,
হৃদয়-অভাব কিছুতে ঘোচে নি—
আজ কবি, ভালবেসে সুখী যদি হও শেষে,
আজ যদি থামে তব নয়নের ধার,
দেবতা গো, তাই কর ! চিরজন্ম সুখী কর
কবিরে আমার, বাল্য-সখারে আমার !
কবি।—
মুছ' অশ্রুজল সখি কেঁদনা অমন ;—
যে হাসির কিরণেতে পূর্ণ হ'ল মন
একেলা বিজনে বসি কবিরে তোমার
কাঁদিতে দেখিতে সখি হবেনাক আর !
আজ হোতে মিলাবে না হাসি এ অধরে,
বিষণ্ণ হবেনা মুখ মুহূর্ত্তের তরে।
আয় সখি, আয় তবে, কাছে আয় মোর,
মুছাইয়া দিই আয় অশ্রুজল তোর !
মুরলা।—
অশ্রু মুছায়োনা আর—বহুক্ যা' বহিবার,
এখনি আপনা হোতে থামিবে উচ্ছ্বাস ;
এ অশ্রু মুছাতে কবি কিসের প্রয়াস !
ক্ষুদ্র হৃদয়ের কত ক্ষুদ্র সুখ দুখ
আপনি সে জাগি উঠে—আপনি শুকায় ফুটে
চেয়েও দেখে না কেহ উঠুক্ পড়ুক্ !
এস সখা, ওই কাঁধে রাখি এই মুখ ;
একে একে সব কথা কহগো আমারে—
বড় ভাল বাস' কি সে নলিনী বালারে ?
কবি।—
শুধু যদি বলি সখি ভাল বাসি তায়
এ মনের কথা যেন তাহে না ফুরায়।—

ভালবাসা ভালবাসা সবাইত কয়,
ভালবাসা কথা যেন ছেলেখেলাময়;
প্রতি কাজে প্রতি পলে সবাই যে কথা বলে
তাহে যেন মোর প্রেম প্রকাশ না হয়!
মনে হয় যেন সখি, এত ভালবাসা
কেহ কারে বাসে নাই,কারো মনে আসে নাই
প্রকাশিতে নারে তাহা মানুষের ভাষা!

মুরলা।—

তাই হোক, ভাল তারে বাস' প্রাণপণে!
তারে ছাড়া আর কিছু না থাকুক্ মনে!

কবি!—

সে আমার ভালবাসা না যদি পুরায়!
যেই প্রেম-আশা লোয়ে,রয়েছি উন্মত্ত হোয়ে
বিশ্ব দেখি হাস্যময় যাহার মায়ায়,
যদি সখি ফিরে নাহি পাই ভালবাসা—
ম্রিয়মান হোয়ে পড়ে সেই প্রেম-আশা,
মুমূর্ষু আশার সেই গুরু দেহ-ভার
সমস্ত জগৎময় বহিয়া বেড়াতে হয়—
শ্রান্ত হৃদি দিবানিশি করে হাহাকার!
অসুস্থ আশার সেই মুমূর্ষু-নিশ্বাসে
যদি এ হৃদয় হয় শূন্য মরুভূমি ময়,
হৃদয়ের সব বৃত্তি শুকাইয়া আসে,
দিনরাত্রি মৃত-ভার করিয়া বহন
ম্রিয়মান হোয়ে যদি পড়ে এই মন!

মুরলা।—

ওকথা বোলোনা, কবি, ভেবোনাক আর;
নিশ্চয় হইবে পূর্ণ প্রণয় তোমার!
কি-জানি-কি-ভাবময় ওই তব মুখ—
ওই তব সুধাময়—প্রেমময়—স্নেহময়
সুকুমার—সুকোমল—করুণ ও মুখ—
হাসি আর অশ্রুজলে মাথান' ও মুখ
রাখিতে প্রাণের কাছে,এমন কে নারী আছে
পেতে না দিবেক তার প্রেমময় বুক!
শত ভাব উথলিছে ওই আঁখি দিয়া—
শত চাঁদ ওই খানে আছে ঘুমাইয়া—
মুছাইতে ও মধুর নয়নের ধার
কোন্ নারী দিবেনাক' আঁচল তাহার!
মধুময় তব গান দিবারাত করি পান
ঘুমাইয়া পড়িবে সে হৃদয়ে তোমার;
বসি ওই পদমূলে মুগ্ধ আঁখি-পাতা তুলে
দিন রাত্রি চেয়ে রবে ওই মুখ পানে
সূর্য্যমুখী ফুল সম অবাক্ নয়ানে!
হেন ভাগ্যবতী নারী কে আছে ধরায়—
যেজন কবির প্রেম না চাহিয়া পায়!

(স্বগত) মুরলারে—

কোন আশা পূরিল না তোর—
কাঁদ তুই অভাগিনী এ জীবন ভোর!
এ জনমে তোর অশ্রু মুছাবেনা কেহ,
এ জনমে ফুটিবে না তোর প্রেম স্নেহ;
কেহ শুনিবেনা আর তোর মর্ম্ম-ব্যথা,
ভালবেসে তোর বুকে রাখিবেনা মাথা!
বড় যদি শ্রান্ত হোয়ে পড়ে তোর মন
কেহ নাহি কহিবারে আশ্বাস-বচন;
মাতৃহারা শিশু মত কেঁদে কেঁদে অবিরত
পথের ধূলার পরে পড়িবি ঘুমায়ে,
একটি স্নেহের নেত্র দেখিবে না চেয়ে!

(নলিনীর প্রবেশ)

কবি।—(দূর হইতে)

পূর্ণিমা-রূপিণী বালা! কোথা যাও, কোথা যাও!
একবার এই দিকে মুখানি তুলিয়া চাও!

কি আনন্দ ঢেলেছ যে, কি তরঙ্গ তুলেছ যে
আমার হৃদয় মাঝে, একবার দেখে যাও!
দিবানিশি চায়, বালা, অধীর ব্যাকুল মন
ও হাসি-সমুদ্র মাঝে করে আত্ম বিসর্জ্জন!
হেরি ওই হাসিময়, মধুময় মুখপানে
উন্মত্ত অধীর-হৃদি তিল দূর নাহি মানে ;—
চায়, অতি কাছে গিয়া ওই হাত দুটি ধরি,
অচেতনে কাটাইয়া দেয় দিবা বিভাবরী ;
একটি চেতনা শুধু জাগি রবে অনিবার—
সে চেতনা তুমি-ময়—ওই মিষ্ট হাসিময়—
ওই সুধা মুখ-ময়—কিছু—কিছু নহে আর!
আমার এ লঘু-পাখা কল্পনার মেঘগুলি
তোমার প্রতিমা, বালা, মাথায় লয়েছে তুলি;
তোমার চরণ জ্যোতি পড়িয়া সে মেঘ পরে
শত শত ইন্দ্রধনু রচিয়াছে থরে থরে!
তোমার প্রতিমা ল'য়ে কিরণে কিরণে ভরা
উড়েছে কল্পনা—কোথা ফেলিয়ে রেখেছে
ধরা!

হরিত-আসন পরে নন্দন-বনের কাছে,
ফুল-বাস পান করি বসন্ত ঘুমায়ে আছে,
ঘুমন্ত সে বসন্তের কুসুমিত কোল পরে
তোমারে কল্পনা-রাণী বসায়েছে সমাদরে ;
চারি দিকে জুঁই ফুল, চারি দিকে বেলা ফুল
ঘিরে ঘিরে রহিয়াছে সহস্র কুসুম কুল ;
শাখা হোতে নুয়ে পোড়ে পরশিয়া এলো চুল
শতেক মালতী কলি হেসে হেসে ঢলাঢলি,
কপালে মারিছে উঁকি, কপোলে পড়িছে ঝুঁকি
ওই মুখ দেখিবারে কৌতূহলে সমাকুল ;
অজস্র গোলাপ রাশি পড়িয়া চরণ তলে
না জানি কি মনোদুখে আকুল শিশির জলে।
তোমার প্রতিমা লোয়ে কল্পনা এমনি করি,
খেলাইয়া বেড়াইছে নাহি দিবা বিভাবরী ;
কভু বা তারার মাঝে, কভু বা ফুলের পরে,
কভু বা উষার কোলে, কভু সন্ধ্যা-মেঘ স্তরে ;
কত ভাবে দেখিতেছে, কত ছবি আঁকিতেছে;
প্রফুল্ল-আনন কভু হরষের হাসি-মাখা,
অভিমান-নত আঁখি কভু অশ্রুজলে ঢাকা।
কাছে এস' কাছে এস', একবার মুখ দেখি,
তোল গো, নলিনী বালা, হাসি ভারে নত
আঁখি!

মর্ম্মভেদী আশা এক লুকানো হৃদয় তলে,
ওই হাতে হাত দিয়ে, প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে
বসন্তের বায়ু সেবি কুসুমের পরিমলে,
নীরব জোছনা রাতে, বিপাশা তটিনী তীরে,
ফুল-পথ মাড়াইয়া দোঁহে বেড়াইব ধীরে ;
আকাশে হাসিবে চাঁদ, নয়নে লাগিবে ঘোর,
ঘুমময় জাগরণে করিব রজনী ভোর!
আহা সে কি হয় সুখ। কল্পনায় ভাবি মনে
বিহ্বল আঁখির পাতা মুদে আসে দু নয়নে।

মুরলা।—(স্বগত) হৃদয় রে—
এসংসারে আর কেন রয়েছি আমরা?
তুচ্ছ হোতে তুচ্ছ আমাদেরো তরে আজ
তিল মাত্র স্থান কি রে রাখিয়াছে ধরা।
এখনো কি আমাদের ফুরায় নি কাজ?
হৃদয় রে! হৃদয় রে! ওরে দগ্ধ মন!
আমাদের তরে ধরা হয় নি সৃজন।

কবি।—মুরলা লো!
চেয়ে দেখ্—চেয়ে দেখ্ হোথা।
বল্ দেখি এত হাসি—এত মিষ্ট সুধারাশি,
হেন মুখ, হেন আঁখি দেখেছিস্ কোথা?

মুরলা।—
এমন সুন্দরী আহা কভু দেখি নাই—

কবির প্রেমের যোগ্য আর কিবা চাই।
কবিতার উৎস সম ও নয়ন হোতে
ঝরিবে কবিতা তব হৃদে শত-স্রোতে।
হাসিময় সৌন্দর্য্যের কিরণ পরশে
বিহঙ্গম-হৃদি তব গাহিবে হরষে;
মধুর সঙ্গীতে বিশ্ব করিবে প্লাবন;
সুখে থাক' পূর্ণ মনে, ভালবাস' প্রাণপণে
প্রেম-যোগ্য নারী যবে পেয়েছ এমন।
(স্বগত)
কেন এত অশ্রু আজি করি বরিষণ?
কেন রে কিসের দুখ? কেন এত ফাটে বুক?
কিসের যন্ত্রণা মর্ম্ম করিছে দংশন?
কখনো ত কবির অমূল্য ভালবাসা
অভাগিনী মনে মনে করি নাই আশা।
জানিতাম চির দিন, রূপহীন, গুণহীন,
তুচ্ছ মুরলার এই ক্ষুদ্র ভালবাসা
পূরাতে নারিবে তাঁর প্রণয় পিপাসা;
মোরে ভালবেসে কবি সুখী হইবে না;
তবে আজ কিসের গো—কিসের যাতনা!
আজ কবি মুছেছেন অশ্রুবারিধার,
বহুদিনকার আশা পূরেছে তাঁহার!
আহা কবি, সুখে থাক'—আর কিছু চাই-
নাকো,
এই মুছিলাম অশ্রু, আর কাঁদিব না,
কিসের যাতনা মোর, কিসের ভাবনা!
কবি।—
ওই দেখ, ফুল তুলে আঁচলটি ভরি,
কামিনীর শাখা নোয়ে ওই দেখ ভয়ে ভয়ে
অতি যত্নে রাখিয়াছে নুয়াইয়া ধরি,
পাছে কুসুমের দল ভুঁয়েপড়ে ঝরি!
ওই দেখ—উচ্চ শাখে ফুটিয়াছে ফুল,
তুলিবার তরে আহা কতই আকুল!
কিছুতে তুলিতে নারে কত চেষ্টা করি,
শাখাটি ধরিয়া শেষে নাড়িছে মধুর রোষে
কুসুম শতধা হোয়ে পড়িতেছে ঝরি;
বিফল হইয়া শেষে সখীদের কোলে
ওই দেখ্ হেসে হেসে পড়িতেছে ঢোলে!
মুরলা।—(স্বগত)
আমি যদি হইতাম হাস্যোল্লাসময়!
নির্ঝরিণী, বরষার নবোচ্ছাসময়!
হরষেতে হেসে হেসে কবির কাছেতে এসে
ডুবাতেম ভালবেসে আদরে আদরে!
যদি কভু দেখিতাম মুহূর্ত্তের তরে
বিষাদ ছাইছে পাখা কবির অধরে,
হাসিয়া কত না হাসি—ঢালিয়া সঙ্গীত রাশি,
মৃদু অভিনয় করি, মৃদু রোষ ভরে—
মৃদু হেসে, মৃদু কেঁদে—বাহুতে বাহুতে বেঁধে
দিতেম বিষাদ-ভার সব দূর কোরে!
কিন্তু আমি অভাগিনী ছেলেবেলা হোতে
এ গম্ভীর মুখে মম অন্ধকার ছায়া সম
রহিয়াছি সতত কবির সাথে সাথে!
আমি লতা গুরু ভার মেলি শাখা অন্ধকার
হেন ঘন আলিঙ্গনে কোরেছি বেষ্টন,
উন্নত মাথায় তাঁর পড়িতে দিই না আর
চাঁদের হাসির আলো, রবির কিরণ!
হা মুরলা, মুরলারে—এমনি কোরেই হা রে
হারালি—হারালি বুঝি ভালবাসা ধন!
বুক, ফেটে যা'রে, অশ্রু কর বরিষণ,
কবি তোর অশ্রু-ধার দেখিতে পাবেনা আর'
যে কিরণে আছে ডুবি তাঁহার নয়ন!
দুর্ব্বল—দুর্ব্বল-হৃদি! আবার! আবার!
আবার ফেলিস্ তুই অশ্রু বারি-ধার?

আবার আবার কেন হৃদয় দুয়ারে হেন
পাষাণে পাষাণে গাঁথা—কে যেন হানিছে মাথা,
কে যেন উন্মাদ সম করে হাহাকার—
সমস্ত হৃদয়ময় ছুটিয়া আমার!
থাম্ থাম্, থাম্ হৃদি, মোছ্ অশ্রুধার!
কবি যদি সুখী হয় কি ভাবনা আর!
আহা কবি, সুখী হও—তুমি কবি সুখী হও।
আমি কে সামান্য নারী?—কি দুঃখ আমার,
তুমি যদি সুখী হও কি দুঃখ আমার!
ও চাঁদের কলঙ্কও হোতে নাহি পারি,
এত ক্ষুদ্র হোতে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ আমি নারী।

(চপলার প্রবেশ ও গান)

সখি, ভাবনা কাহারে বলে?
সখি, যাতনা কাহারে বলে?
তোমরা যে বল' দিবস রজনী
ভালবাসা ভাল বাসা,
সখি, ভালবাসা কারে কয়?
সেকি কেবলি যাতনাময়?
তাহে কেবলি চোখের জল?
লোকে তবে করে কি সুখের তরে
এমন দুখের আশ?
জীবনের খেলা খেলিছে বিধাতা,
আমরা তাঁহার খেলেনা,
আমাদের কিবা সুখ!
সখি, আমাদের কিবা দুখ!
সখি, আমাদের কিবা যাতনা।
তোমাদের চোখে হেরিলে সলিল
ব্যথা বড় বাজে বুকে,
তবুত স্বজনি বুঝিতে পারিনে
কাঁদ যে কিসের দুখে।

আমার চোখেতে সকলি শোভন,
সকলি নবীন, সকলি বিমল,
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল,
সকলি আমারি মত।
কেবলি হাসে, কেবলি গায়,
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়,
না জানে বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত।
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,
হাসিতে হাসিতে আলোক-সাগরে
আকাশের তারা তেয়াগে কায়।
আমার মতন সুখী কে আছে।
আয় সখি, আয় আমার কাছে,
সুখী হৃদয়ের সুখের গান
শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ,
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল
একদিন নয় হাসিবি তোরা,
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া
সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা।
(মুরলার প্রতি)
এই যে আমার সখীর অধরে
ফুটেছে মৃদুল হাসি,
আয় সখি, মোরা দুজনে মিলিয়া
ললিতারে দেখে আসি।
মালতী সেথায়—মাধবী সেথায়,
সখীরা এসেছে সবে,
এতখনে সেথা ফাটিছে আকাশ
কমলার হাসি-রবে।
মুরলা।—চল্ সখি চল্ তবে।

চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব।

(বাঙ্গালা, ত্রিপুরা ও আরাকাণ ইতিহাসের কিয়দংশ মাত্র।)

তৃতীয় অধ্যায়।

সম্রাট আকবরের সেরেস্তাদার রাজা তোড়লমল্ল চট্টগ্রাম সরকারের বার্ষিক রাজস্ব ২৮৫৬০৭ টাকা স্থির করিয়া কেবল তাহার সেরস্তার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। চট্টলের রাজস্ব বোধ হয় কপর্দ্দক ও রাজকোষে জমা হইত না। তোড়লমল্লের ১৪০ বৎসর অন্তে জাফর খাঁ (মুর্শিদকুলি) বাঙ্গালার তৃতীয় বন্দোবস্ত করেন। (৫১) এই বন্দোবস্ত ১১৩৫ হিঃ অব্দে (১১২৮ বঙ্গাব্দে, ১৭২২ খৃষ্টাব্দে) হইয়াছিল। জাফর খাঁর বন্দোবস্তি কাগজ "জমা কামেল তোমারি" নামে খ্যাত। জাফর খাঁ বাঙ্গালা ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে সরকার চট্টগ্রাম "চাকলে ইসলামাবাদ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই চাকলায় ১৪৪টী পরগনা ও মহাল; বার্ষিক রাজস্ব ১৭৬৭৯৫ টাকা লিখিত আছে। যথা—

হিসাব চাকলে ইসলামাবাদ সরকার চাটিগাঁ।

হাউলি চট্টগ্রাম ...	২১৮৫৬
জুগদা (জুগিদিয়া কি ?)...	৩৫১৩৫
দক্ষিণ কুল ...	২১২৩৫
বন্দর অলমগীর নগর ...	১৪৮২৫
ফতেয়াবাদ ...	৫৯২৩
সুন্দুনা ...	৪০৫০
অরঙ্গানগর ...	২২৬৪
খুরদা খাঁ জাহানাবাদ ...	২৪১৯
তরাঘোড়া ...	৩৪৯১
দেবগ্রাম ...	৪৪০১
সারুয়া থলি ...	২১৯৭
সায়ের চট্টগ্রাম ...	১৩১৭৭
নৃসিংহাবাদ ও সেনাবাদ গাঁ ৬ মহাল—	১৩২৯৮
	১৪৪২৮৪
ইজা	১৪৪২৮৪
১২৬ টী ক্ষুদ্র মহালের বাবত	৩২৫১১
	১৭৬৭৯৫

নবাব জাফর খাঁ ১৭৬৭৯৫ টাকা চট্টলের রাজস্ব স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু

৫১। সম্রাট সাজাহানের পুত্র সুলতান সুজা ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার দ্বিতীয় রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। তোর্ড়ন মল্লের "ওয়াসিল তোমার জমা" র ন্যায় সুজার "জমা তোমারিতে" ও চট্টলের রাজস্ব ২৮৫৬০৭ টাকা লিখিত। আমাদিগের বিবেচনায় আকবর কিম্বা সাজাহান চট্টলের রাজস্ব ভোগ করিতে পারেন নাই।

একটী টাকাও মুর্শিদাবাদে আসিত বলিয়া বোধ হয় না। চট্টগ্রামের উৎপন্ন চট্টগ্রামেই ব্যয় হইত। ৩৫৩২ জন পদাতি সৈন্যের ব্যয় জন্য ১৫০২৫১ টাকা লাভের ভূমি জায়গির ছিল। ফৌজদার ও সেনাপতিগণের বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গির ২৪০০০ টাকা ও রণতরীর ব্যয় জন্য দুই জন প্রদেশীয় গোলান্দাজ দারগার জায়গির ২৫৪৪ টাকা—মোট ১৭৬৭৯৫ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত ছিল। জাফর খাঁর উত্তরাধিকারী সুজাউদ্দিনের সংশোধিত হিসাবে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত রাজস্ব ১৫৮৩৪০ টাকা দৃষ্ট হইতেছে। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দাবধি চট্টগ্রামের ফৌজদার থানাদারি (৫২) মহালাতের জায়গিরদারগণ হইতে একটী নূতন কর সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন, ইহা দ্বারা বার্ষিক ৬৮৪২২ সিক্কা টাকা লাভ হইত। বঙ্গেশ্বর এই লভ্যের অংশভাগী ছিলেন কি না ইহা সন্দেহ স্থল। যাহা হউক এবম্প্রকার রাজস্ব বৃদ্ধি দ্বারা চিরভাগ্যবান ইংরাজ জাতির ভাবি লাভের সূত্রপাত হইল।

কালবশে যবনেরা সৌভাগ্যের উন্নত শিখর হইতে অধঃপতিত হইল। প্রবলপ্রতাপ বঙ্গেশ্বরগণ ব্রিটনবাসী বনিকদিগের ক্রীড়া পুত্তল হইলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ মিরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মিরকাশিমকে বাঙ্গালার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। কাশিম সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ইংরাজ কোম্পানিকে চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর প্রভৃতি তিনটী চাকলা দান করেন। (৫৩) এই সময়ে চট্টগ্রামে বার্ষিক রাজস্ব ৩৩৫১৩৫ টাকা—"আখেরাজাত" খরচ ১২০০০ টাকা বাদে ৩২৩১৩৫ টাকা ছিল। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই ইংরাজগণ চট্টলের রাজস্ব ৪৬৬৪২৮ টাকা স্থির করিয়াছিলেন।

ভারলেষ্ট সাহেব (৫৪) প্রথমতঃ চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার সরদার (Chief) উপাধি ছিল।

১৬৮৪ শকাব্দে (১৭৬২ খৃঃ অঃ) চট্টগ্রামে একটি ভূমিকম্প হয়। অনেক স্থানে বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইয়া জলকর্দ্দম নিঃসৃত করিয়াছিলেন। সেই নিঃসৃত দ্রব্যের সহিত গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যাইত। বন্দরভূন নামক স্থানে একটি বৃহৎ নদী শুখাইয়া যায়। বাথরচক্ক নামক সমুদ্র নিকটবর্ত্তী স্থানটী দুই শত লোক ও তাহাদের গবাদি পশুর সহিত সাগর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

এই সময় আরাকাণে রাষ্ট্র বিপ্লব উপ-

৫২। সমগ্র চট্টগ্রাম প্রদেশ "থানাদারি মহাল" নামে পরিচিত ছিল।

৫৩। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টাম্বরের সন্ধি-পত্রের পঞ্চম দফার মর্ম্মানুসারে কোম্পানি বাহাদুর এই সকল স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাইর সন্ধি দ্বারা কোম্পানি ঐ সকল প্রদেশের প্রকৃত স্বামী নির্ণীত হন।

৫৪। লর্ড ক্লাইবের স্বদেশ যাত্রার পর—১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ভারলেষ্ট বাঙ্গালার গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হন। তিনি কিঞ্চিদূন তিন বৎসর বাঙ্গলা শাসন করিয়াছিলেন।

স্থিত হয়। ক্রমে মগগণ চট্টগ্রামে পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

১৬৯৮ শকাব্দে (১৭৭৬ খৃঃ অঃ) পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী সাক-(চাকমা)-নামক মগজাতির সরদার রাজা শ্রীদৌলত খাঁ ও রাম খাওন নামক অপর একজন মগসরদার ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাহাদিগের দমন জন্য একটি সামান্য যুদ্ধ যাত্রার প্রয়োজন হইয়াছিল।

১৬৯৯ শকাব্দে কোম্পানি বাহাদুর পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে "খেদা" করিয়া হস্তী ধৃত করেন। ঐ অব্দের ৩১ মে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা তদানীন্তন ইংরাজ গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংসকে যে পত্র লিখেন তৎপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সে সময় প্রায় দশ সহস্র পার্ব্বত্য মানব আরাকাণ হইতে চট্টল পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

১৭০৪ শকাব্দে (১৭৮২ খৃঃ অঃ) আরাকাণ ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়। নূতন রাজার রাজ্যাধিকারে সচরাচর দেশের যে অবস্থা ঘটিয়া থাকে আরাকাণে তাহাই হইল। দুর্ব্বল শান্তপ্রকৃতি মানবগণ বিজেতার বশ্যতা স্বীকার করিল। তেজস্বিগণ ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না এবং অনেকেরই চট্টল পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। রাষ্ট্রবিপ্লব ক্রূরমতি দস্যুদিগের বাঞ্ছনীয়। আরাকাণের দস্যুগণ নিরীহ প্রজা বৃন্দের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ব্রহ্মার সেনাদল দস্যুদলনে প্রেরিত হইল। দস্যুগণ নিরুপায় হইয়া ব্রিটিস অধিকারে পলায়ন করিল। আরাকাণের শাসনকর্ত্তা বন্ধুভাবে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তাকে দুশ্চরিত্র লোকদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে লিখিলেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় এই সকল নূতন প্রজার মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই সকল ঘটনা হইতে ক্রমে একটী প্রকাণ্ড—লোমহর্ষণ অভিনয়ের সূত্রপাত হইতে লাগিল। একদিবসের সঞ্চিত মেঘে যে বৃষ্টি হয়, তাহাতে কখনই দেশ প্লাবিত হইতে পারে না।

১৭০৬ শকাব্দের আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে ব্রহ্মরাজ তরকুমার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার হস্তগত হয়। এই পত্র খানা পাঠ করিয়া আমরা আমোদ পাইয়াছি, পাঠকদিগকে তাহার অংশভাগী না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। পত্রখানা ব্রহ্মা ভাষায় লিখিত, কিন্তু তাহার একখানি ইংরেজি অনুবাদ মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। অনুবাদক নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সুতরাং ভাষান্তরিত করিবার কালে আমাদিগকে অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

(পত্র।)

আমি মানবমণ্ডলীর ঈশ্বর। আমি একশতাধিক রাজ্যের অধিপতি। আমি ছত্রধারী সূর্য্যবংশীয় (৫৫) নরপতি। সতত

৫৫। "মহারাজোয়াং" নামক ব্রহ্মার ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে লিখিত আছে,—কপি-

বহু সংখ্যক নরপতি আমার আজ্ঞা বহন করিয়া থাকে। আমার রাজ্যে বসুন্ধরা প্রতিনিয়ত স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মাণিক্যাদি প্রসব করিতেছেন। বিদ্যুদ্বৎ অস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ আমার প্রচুর পরিমাণে আছে। যে সকল অস্ত্র বিদ্যুতের ন্যায় বিপক্ষ দমনে ও বশীকরণে উপযুক্ত তাহা আমারই আছে। সংগ্রামের জন্য আমার সৈনিকবর্গকে আদেশ বা কৌশল বুদ্ধির অপেক্ষা করিতে হয় না।' আমার ঘোটক ও হস্তী অগণনীয়। আমার বেতনভোগী দুশজন পণ্ডিত ও একশত চারিজন মহাধার্ম্মিক ধর্ম্মযোজকের বিদ্যাবুদ্ধি সহায় করিয়া আজি প্রজাদিগকে সুবিচার দান করিতেছি। তাঁহারা সর্ব্বদা নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যে বিরত। আমি সূর্য্য-সদৃশ জ্যোতিষ্মান (জ্ঞানালোক দ্বারা); সুতরাং মনুষ্যের অতি গোপনীয় অভিলাষও আমার সমক্ষে অপ্রকাশিত নহে।

যিনি "রাজ" পদ বাচ্য হইতে অভিলাষী তিনি প্রজার প্রতি দয়াশীল ও সদ্বিচারক হইবেন। আমার বিচারে চোর, দস্যু প্রভৃতি শান্তি দ্রোহিগণ তাহাদের পাপোচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার মুখ নিঃসৃত বাক্য বিদ্যুতের ন্যায় ভীতিজনক।

লবাস্তুর অধিপতি সাক্যবংশীয় অভিরাজ কৌশল ও পিঞ্চলারিতের রাজা কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। তিনি স্বীয় পরিবার ও সৈনিকবর্গের সহিত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া ঐরাবতী তীরে উপনীত হইয়াছিলেন। অভিরাজ সপ্তবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে সেই স্থানে একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার স্থাপিত রাজধানী "সেঙ্গসরত" বা "তেগুয়াং" নামে খ্যাত হয়। ঐরাবতী তীরে অদ্যাপি সেই নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; ইহার উত্তর—অক্ষাংশর ২৩ অংশ ২০ কলা। দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া অভিরাজ লোকান্তরিত হন। কনিষ্ট কুমার কেনরাজনে বুদ্ধিবলে পৈতৃক আসন অধিকার করেন। জ্যেষ্ঠ কেনরাজ'গী রাক্ষিয়াং প্রদেশে স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করেন। কেনরাজ'নে ও তাঁহার অধস্তন একত্রিংশ নরপতি দুই শত বৎসর পৌরুষানিক রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। শেষ নরপতি বিয়েনা'কা একমাত্র পত্নী নগসেনীকে বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। রাষ্ট্রবিপ্লবে কপিলবাস্তুর অন্যতম রাজকুমার দাজারাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ "মউরিয়া" বা "মউরিঙ্গ" (মিত্তাই লেইপাকের—আধুনিক মণিপুরের-পূর্ব্বদিকস্থ কাইবো উপত্যকা) নামকস্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। মলি নামক স্থানে রাজ্ঞী নগসেনীর সহিত দাজারাজের সাক্ষাৎ হয়। দাজা নগসেনীর পানি গ্রহণ করিলে, তাহাদের একটী পুত্র জন্মে। সেই কুমার বীরগ আখ্যা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মরাজগণ সেই বীরগকেই আপনাদের পিতৃ পুরুষ নির্দ্দেশ করেন।

রাজস্থানে ইতিহাসবেত্তা কর্ণেল টড সাহেব ব্রহ্মরাজদিগকে চন্দ্রবংশজ নির্ণয় করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে টড সাহেব প্রায়ই ভ্রমমার্গে পদ বিক্ষেপ করিয়াছেন। টডের ভ্রমগুলি সংশোধন করিবার জন্য আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি। পাঠকগণ শুনিলে অবাক হইবেন যে, টড সাহেব শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের কন্যা ও ভরতের ধর্ম্মপত্নী লিখিয়াছেন।

আমি—দুই সহস্র নদী ও বহুসংখ্যক নালার সমক্ষে—মহাসাগরের ন্যায়। আমি চল্লিশ সহস্র শৈলবেষ্টিত সুমেরু সদৃশ। আমার আধিপত্য একশতাধিক নৃপতিশিরে বিস্তৃত রহিয়াছে। অপিচ দশ সহস্র নরপতি সর্ব্বদা আমার দরবারে উপস্থিত থাকে। আমার রাজ্য পৃথিবী মধ্যে শ্রেষ্ঠ; স্বর্ণ ও মণি মানিক্যাদিতে খচিত আমার রাজধানী জগতে স্বর্গের ন্যায় সম্মানার্হ। আমার কার্য্য প্রধান দেব দূতের ন্যায়। এই পত্র নির্ব্বিঘ্নে চট্টগ্রামে পহুঁছাইবার জন্য রাক্ষিয়াং প্রদেশে আদেশ প্রেরিত হইয়াছে। এই চট্টগ্রাম পূর্ব্বে মোগলরাজদিগের অধীন ছিল। [মোগলরাজ ও অমরপুরের (৫৬) রাজা উম্বংদোমা (৫৭) চট্টগ্রামে যে সকল ধর্ম্মালয় ও ভজনালয়, জলাশয় ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন;—এস্থলে তাহার তালিকা দেওয়া হইয়াছে।]

মোগলাধিকারের পূর্ব্বে চট্টগ্রাম যে সকল নরপতির অধীনে ছিল, তাহারাও ছত্রধারী। (৫৮) এই সকল নরপতি ধর্ম্মালয় ও ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রত্নপুর,দুর্গাদি,রাক্ষিয়াং,দুর্গাবতী, রমাবতী, চেদোগি, মাহোদিনে ও মেনাং প্রভৃতি দেশ সকল রাজা সেরিতোমছোকার অধিকারের পূর্ব্বে চট্টগ্রাম প্রদেশে সুশাসনের অভাব ছিল। তাঁহার রাজ্যাধিকার কালে সেই প্রদেশে সুশাসনোপযুক্ত কার্য্য প্রণালী প্রচলিত হয়। সেই যশস্বী নরপতি উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার শাসনে প্রজাবর্গ সুখী ছিল। সেই

৫৬। ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্যদেবের স্থাপিত রাজধানী অমরপুর। কাপ্তান লেউইন অমরপুর ও উদয়পুর অভিন্ন বিবেচনা করিয়াছেন। পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলেও অমরপুর উদয়পুর হইতে স্বতন্ত্র। পত্র লেখক ব্রহ্মরাজ তরফুমা এক "অমরাপুর' নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজ পাঠ সংস্থাপন করেন। এস্থলে ত্রিপুরার রাজধানী "অমরপুরের" পরিবর্ত্তে যেন কোন পাঠক সেই অমরাপুর বিবেচনা না করেন।

৫৭। উম্বং দোমা বোধ হয় অমরমাণিক্য। কারণ তদন্তে ত্রিপুর বংশীয় আর কোনও নরপতি চট্টলাধিকার করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মগণ প্রায়ই নামগুলি বিকৃত করিয়াছে। কর্ণেল ফেয়ার বলেন—"The Burmise make sad havoc of all Indian names except those they have received through the ancient Pali." (History of Burmah race)।

৫৮। ত্রিপুরা ও আরাকাণ পতিদ্বয়কে নির্দ্দেশ করিতেছে। অনুবাদক "ছত্রধারী" শব্দের অর্থ "Sitting under a canopy" করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ছত্রধারী শব্দের ইংরেজী অর্থ—Sovereign Prince. যে রাজা অন্যের রাজছত্রের অধীন নহেন, তিনিই ছত্রধারী (স্বাধীন)। "ছত্রধারী"—ছত্রপতি শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কোষকার Sir Graves Chaughton, knt. K. H., M. A., F. R. S. M. R. A. S., R. I. A., &c "ছত্রপতি" শব্দের অর্থ Sovereign লিখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই "ছত্রধারী" শব্দ ব্যবহার দ্বারা ও অর্থের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। কারণ কর-নিবারক পদার্থকে ছত্র বলা যায়, সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যের করতল নহেন, তাহাকেই ছত্রধারী বলা যাইবে।

রাজেন্দ্রের সহিত অনেক ধার্ম্মিকের বন্ধুত্ব ছিল। বুদ্ধদেব তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা তৎসমক্ষে একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা প্রার্থনা করেন; তাঁহার প্রার্থনানুসারে বুদ্ধদেব সুহেমহরিকে রাজোপদেস্টার পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

এই সময় আকাশ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মনি মাণিক্যাদি বৃষ্টী হইয়াছিল। (৫৯) সেই সকল বস্তু সুহেমহরির কর্ত্তৃত্বাধীনে ভুগর্ভে সমাহিত হয়। হেমহরির বাসগৃহ স্বর্ণ রৌপ্যে খচিত ছিল। সর্ব্ব সাধারণ মানবগণ সেই গৃহে যাইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিত। অতিথি পরিব্রাজক ও ভ্রমণকারীদিগের পরিচার্য্যার্থ রাজা সেই গৃহে ভৃত্য ও দাস নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই ধার্ম্মিক রাজেন্দ্র সর্ব্বদা পঞ্চ পুস্তক পাঠে কালাতিপাত করিতেন। ধর্ম্মযাজকগণ হংস, ছাগ, বরাহ, পারাবত ও কুকুটাদির মাংস-ভোজন করিতেন না। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যে চৌর্য্য, প্রতারণা, ব্যভিচার ও মদ্য পানাদির নামগন্ধও শ্রুতি গোচর হইত না।

আমিও সেইরূপ ধর্ম্ম ও সদাচারের বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছি। আমার রাক্ষিয়াং জয়ের পূর্ব্বে তত্রত্য অধিবাসীগণ সর্প স্বভাবাপন্ন ও বৈরপরবশ ছিল। মগধ (৬০) মাইলোং, দাড়াওয়াদি, চাগদাগ ও রামাবতী প্রদেশে নরমাংসাশী রাক্ষস বৃত্তি মানবমণ্ডলী বাস করিত। প্রতারাণাই তাহাদের অঙ্গভূষণ ছিল; সুতরাং প্রতিবেশীদিগের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ছিল না। এই সময়ে শ্রীবৌৎঠাকুর অথবা বুদ্ধ ঘোষ (৬১) রাক্ষিয়াং

৫৯। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে রক্তবৃষ্টির উল্লেখ আছে। প্রবাদ আছে মহারাস্ট্রপতি শালিবাহনের অত্যাচারে দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দাক্ষিণাত্যে অগ্নি ও কর্দ্দম বৃষ্টি করিয়াছিলেন।—(Indian Antiquiry Vol II. page 303।) প্রাচীন মুসলমান লেখকগণ বৃহৎ প্রস্তর বৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। বিজ্ঞবর ভারতী সম্পাদক কমলানেবু, দুগ্ধ, গন্ধক, পুষ্টিকর খাদ্য, শুষ্কপত্র, পঙ্গপাল ও জীবন্ত প্রাণী প্রভৃতি বৃষ্টির বিবরণ ইতিপূর্ব্বে পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছেন। (ভারতী প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।) কিন্তু উৎকৃষ্ট ধাতু ও প্রস্তর বৃষ্টির ইহাই প্রথম উল্লেখ বোধ হইতেছে।

৬০। ইহাই আমাদের পূর্ব্বোক্ত মগধ। (ভারতী; চতুর্থ ভাগ, ৭ সংখ্যা, ৩৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।)

৬১। এস্থলে বুদ্ধদত্ত লিখিত। বোধ হয় অনুবাদক ভ্রম ক্রমে ঘোষের স্থলে দত্ত লিখিয়াছেন। অতীত সাক্ষী ইতিহাস বলিতেছে—ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা বুদ্ধ ঘোষ ব্রাহ্মণ কুলে—শকাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে—বিহার প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ ভৈষজ্য ও গণিত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদণ্ডে কোনও কারণ বশতঃ অবমানিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ ও সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধিয় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। তিনি "ত্রিপটক" আখ্যাবিশিষ্ট বিখ্যাত গ্রন্থের পালি অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি আত্মকৃত কার্য্যবলে অদ্যাপি সিংহল ও পূর্ব্বোদ্বীপে সাক্য সিংহের নিম্নাসন অধিকার করিয়া পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন।—(The Great relegiovs teacher.)

দেশে উপস্থিত হন। (৬২) তিনি মনুষ্য ও পশুকে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার উপদেশানুসারে রাক্ষিয়াং পাঁচ সহস্র বৎসর একই নিয়মে শাসিত হইয়াছিল। (৬৩) পরস্পর প্রজাগণ একে অন্যের মঙ্গল কামনা করিত। আমি পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার সন্নীতির অনুসরণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছি। স্থান বিশেষ সমুৎপন্ন সুগন্ধি মৃৎ স্নেহের ন্যায় আমার মহত্ত্ব ও প্রতাপ রাজমণ্ডলীতে শ্রেষ্ঠ। ১১৪৮ শকের (১১৯৪ বঙ্গাব্দ) প্রাসমাসের ১৫ই তারিখে প্রধান ধর্ম্মযাজক জাফবু আমাকে শ্রীবৌৎঠাকুরের বিধি অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। সেই মুহূর্ত্তে আমি তাহা অবলম্বন করিয়াছি। সেরিতোমছোকার বিধি ও ব্যবহার অবলম্বন করিয়া আমি সুবিচার দ্বারা প্রজাগণের পরিতোষ সাধন করিতেছি।

চট্টগ্রাম রাক্ষিয়াং প্রদেশের নিকটবর্ত্তী। ইংরাজদিগের সহিত আমার বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি সংস্থাপিত হইলে পরস্পর একতা ও নৈকট্য সম্বন্ধ জন্মিতে পারে। তজ্জন্য লিখিতেছি, যে আপনার দেশীয় বণিকগণ আমার অধিকার হইতে মুক্তা, গজদন্ত, মম প্রভৃতি ক্রয় করিতে পারিবে; তদ্বিনিময়ে আমার প্রজাবর্গ চট্টগ্রাম সমুৎপন্ন দ্রব্যাদি অবাধে ক্রয় করিতে পারে, আপনি এমত অনুমতি করিবেন। চট্টগ্রামবাসী মগগণ ধর্ম্ম ও আচার ভ্রষ্ট হইয়াছে। (৬৪) বিধি অনুসারে তাহাদের ভ্রম ও কুনিয়ম সংশোধন করা উচিত। ক্ষমতা সত্ত্বে যে ব্যক্তি ধর্ম্মদ্রোহী মানববৃন্দকে সংশোধন না করেন তাহাকে অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা (Eternal punishment) ভোগ করিতে হইবে। দয়া ও ধর্ম্মের নীতি অনুসারে যে ব্যক্তি আত্ম সংশোধন করিয়াছেন, তিনি লোকান্তরে স্বর্গবাসী হইবেন। ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা সংস্থাপনোদ্দেশে আমি ৩০ জন লোক দ্বারা ৪ টী গজদন্ত আপনার সমক্ষে প্রেরণ করিতেছি। পত্রোত্তরে এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানাইবেন।

অনেকেরই এরূপ সংস্কার যে ব্রহ্মরাজ গায়ে পড়িয়া দুইবার ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়াছেন। এই পত্র পাঠে তাহাদের সেই সংস্কার দূর হইবে কি? ব্রহ্মরাজ বারংবার মিত্রতা কামনা করিয়াছেন। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী মগ দস্যুগণ বারম্বার আরাকানে প্রবেশ ও প্রজাবর্গের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া ব্রিটীশ অধিকারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দেও রামরির শাসনকর্ত্তা এই সকল দস্যুর অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া পুন-

---

৬২। ৯৪৬ বৌদ্ধাব্দে (৩২৫ শকাব্দে) বুদ্ধ ঘোষ পূর্ব্বোপদ্বীপে পদার্পণ করেন।

৬৩। এস্থলেও অনুবাদক ভ্রমে পতিত হইয়াছে। ইতিহাসে লিখিত আছে "তাহার উপদেশানুসারে পাঁচ সহস্র বৎসর শাসিত হইবে।"

৬৪। ইহারা ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।

র্ব্বার লিখিলেন, "ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শান্তি ও বন্ধুত্ব অপেক্ষা যুদ্ধের সমধিক অভিলাষী। দস্যু মগগণ বারংবার আমাদের রাজ্যে অত্যাচার করিয়া ইংরাজ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে আমাদের হস্তে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও আত্ম প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন না।" (৬৫) ফলে সেই সময় এই সকল দস্যুদিগকে ব্রহ্মরাজের হস্তে সমর্পণ করিলে কখনই লোমহর্ষণ নাটকাভিনয় হইত না। যে ব্যক্তি চট্টগ্রাম ভিন্ন রাজার চির অধিকৃত বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি মুর্শিদাবাদ অবধি সমগ্র পূর্ব বাঙ্গালা তাঁহার রাজ্যান্তর্গত দাবি করিবেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস যোগ্য নহে। লর্ড হেষ্টিংস সেই "জাল পত্র" জাল গণ্য করিয়া আত্ম মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়াছেন। কোন কোন নীচচেতা ঐতিহাসিক ব্রহ্মরাজকে কটুবাক্যে অভিহিত করিয়া, তাঁহারাও আপন পরিচয় দিয়াছেন। ১৮২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের ব্রহ্মাযুদ্ধের বিবরণ ইতিবৃত্তজ্ঞ পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, আমরা তৎ সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটীশ ভারত রঙ্গাঙ্গনে যে লোমহর্ষণ নাটকাভিনয় হইয়াছিল, তাহা অনন্তকাল ইতিবৃত্ত পাঠকগণ স্মৃতির নয়নে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইবেন। ১৮৫৭—৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত বক্ষে যে অনল প্রজ্বলিত হয় চট্টগ্রামও তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। ব্রিটীশ ভারত সীমান্ত রক্ষার জন্য তিন শত সুশিক্ষিত সৈন্য চট্টগ্রামে ছিল। (৬৬) তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজ জাতি নির্মূল করিতে উদ্যত হইল। সৌভাগ্য বশতঃ চট্টলবাসী ইংরাজগণ প্রাণ ভয়ে লুক্কায়িত হইলেন। বিদ্রোহী সৈন্যগণ কারাগারের দ্বারভঙ্গ করিয়া বন্দিগণকে মুক্ত করত রাজকীয় ধনাগার লুণ্ঠন করিল। ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া তাহারা ২৭৮২৬৭/৫ পাইয়াছিল। বিদ্রোহীগণ তৎপরে তিনটী হস্তী লইয়া ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা করিল। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র কুমিল্লাবাসী কর্ত্তৃপক্ষগণ ভয়ে মৃয়মান হইলেন। (৬৭) কিন্তু সৌ-

৬৫। Gleig's British Empire in India. Vol IV. Page 109.

৬৬। 2d, 3d and 4th Companies of the 34th Regiment Native Infantry.

৬৭। বোধ হয় নোয়াখালীতেও কিছু গণ্ডগোল হইয়াছিল। কান্দি রাজ বংশের ইতিহাস লেখক বলেন—(Kandi Family C. R. LV111. 115.) রাজা প্রতাপ চন্দ্রের অনুপস্থিত কালে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পাইকপাড়ার জমীদারি কাছারির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। একদা অবগত হইলেন যে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সেনাদল নোয়াখালীর রাজকীয় ধানাগার লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র তিনি ভুলুয়ার প্রধান কর্ম্মচারী যশোদাকুমার পাইনকে লিখিলেন—" দেশীয় বলশালী লোকদিগকে বন্দুক ও তরবারি দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাজকীয় ধনাগার রক্ষা করিবা, কোন প্রকার অর্থ ব্যায়ে কুণ্ঠিত হইবা না এবং কালেকটার সাহেব যে কার্য্য করিতে

ভাগ্যবশতঃ তাহারা কুমিল্লার পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগড়তলার পথাবলম্বন করিল। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র তাহাদিগকে ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। বিশাল গড় সন্নিহিত স্থানে গয়াদিন পণ্ডিত বিদ্রোহী সুবেদারকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাত করাইলেন। তৎপরে তাহারা ব্রিটীশ রাজ্য দিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিল। "সন্দেহ" কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে বিদ্রোহীগণের সাহায্যকারী বলিয়া ব্রিটীশ-গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরা রাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব জজ মহাত্মা মেটকাফ (৬৮) গবর্ণমেণ্টের অমূলক সন্দেহ ও ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ত্রিপুরার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজদণ্ড যতকাল ত্রিপুরের বংশধরদিগের হস্তে থাকিবে ততকাল তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তে মেটকাফের নাম স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন।

বিদ্রোহীগণ গমন কালে পথ পার্শ্বস্থ জমিদারদিগের গৃহে উপনীত হইয়া খাদ্য যাচ্ঞা করিত। নিরস্ত্র দুর্ব্বল ভূস্বামীগণ এক বেলার খাদ্য দান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিত। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীহট্টের পদাতি দলের "মেজর" বিঙ্গ সাহেব বলিয়াছিলেন—"হারামজাদা লোক কো ফাঁসী দেনে হোগা।"

আদেশ করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবা।" এই সকল কার্য্য দ্বারা রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের অকৃত্রিম রাজভক্তি প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু ইতিহাস লেখক কিঞ্চিৎ পরেই ঘটনাটীকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন। লেখক বলেন—ঈশ্বর চন্দ্রের আদেশ ক্রমে ভুলুয়ার জমিদারি কাছারি দুর্গে পরিণত হইত, দেশীয় বীর পুরুষগণ দুর্গ রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। বিদ্রোহীগণ এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র ভয়াতুর হইয়া অন্যত্রে গমন করিল। রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের কৃপায় নোয়াখালী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহ রক্ষাপাইল। ইহা দ্বারা লেখকের ভৌগোলিক অনভিজ্ঞতাও প্রকাশ পাইতেছে। ঈশ্বর চন্দ্রের অনুমতি আনাইয়া ভুলুয়া দৃঢ় করিতে অনুান ১৩।১৪ দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল। এই কাল মধ্যে বিদ্রোহী সেনাগণ শ্রীহট্টের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে উপনীত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৯ নবেম্বর বিদ্রোহীগণ চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করে। ৩রা ডিসেম্বর রাজ্ঞীর ৫৪ সংখ্যক সেনাদলের ৩০০ সৈন্য ঢাকা হইতে ত্রিপুরায় যাইয়া অবগত হইল যে কয়েক দিবস পূর্ব্বেই বিদ্রোহীগণ ত্রিপুরা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। নোয়াখালী চট্টগ্রাম হইতে গন্তব্য পথের পার্শ্বেও নহে। বিদ্রোহীগণ ধনাগার লুণ্ঠনাভিলাষী হইলে ত্রিপুরায় না আসিয়া নোয়াখালী যাওয়ার কোন কারণ ছিল না; কারণ সে সময়ে নোয়াখালী ত্রিপুরার অধীন একটি "মহকুমা" মাত্র ছিল। যে সকল বীরপুরুষ ত্রিপুরেশ্বরের সুশিক্ষিত সৈন্যগণকে "বিল্লি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, তাহারা নোয়াখালীর নাবীয়ালদিগের নাম শ্রবণে কম্পিত হইবে, ইহা নিতান্ত হাস্য-জনক।

৬৮। ইনি সুবিখ্যাত লর্ড মেটকাফের ভ্রাতৃজ।

জগৎপিতা জগদীশ্বর অগতির গতি ও দুর্ব্বলের বল ; প্রবাদ আছে মিরজাফারের পুত্র পামর মিরন বিহার প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা কালে পথমধ্যে বস্ত্রাবাসে বজ্রাঘাতে প্রাণ-ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার বস্ত্রমধ্যে একখণ্ড কাগজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই কাগজে লিখিত ছিল—"যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই সকল (তিনশত) ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড করিতে হইবে।" বোধ হয় দয়াময় পরমেশ্বর তিনশত মানবের প্রাণ রক্ষার জন্যই মিরনের অকাল মৃত্যু বিধান করিয়াছিলেন। বোধ হয় তদ্রূপ শ্রীহট্টবাসী দুর্ব্বল ভূস্বামীগণের জীবন রক্ষার্থ অনাথের-নাথ দুর্ব্বলের-বল জগদীশ্বর মেজর বিঙ্গেরও অকাল মৃত্যু বিধান করেন। লাতু (করিমগঞ্জ) নামক স্থানে বিদ্রোহী-গণের সহিত শ্রীহট্টের পদাতি দলের (Sylhit Light Infantry) একটি যুদ্ধ হয়। যুদ্ধারম্ভমাত্রেই মেজর বিঙ্গ শমন ভবনে গমন করেন। মেজর সাহেবের মৃত্যুর পর সুবাদার অযোধ্যা সিংহ লাতুর যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন।

লাতুর যুদ্ধান্তে বিদ্রোহীগণ কাছার দিয়া পূর্ব্বমুখে গমন করে। কাছারের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটিকমিসনর এডগার সাহেব বলেন,(৬৯) মোহনপুর ও বিননকান্দীর যুদ্ধে ইংরাজ সেনা বিদ্রোহী দিগকে জয় করিয়াছিল।

মণিপুরের অন্যতম রাজকুমার চাইহম (বা নরেন্দ্র জিত) (৭০) এই সময়ে কাছারে বাস করিতেছিলেন। তিনি দুরাশয়ে মুগ্ধ হইয়া, সহচর বর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া, হতাবশিষ্ট বিদ্রোহী দলের অঙ্গপুষ্টি করিলেন। মণিপুরের রাজ-সর্পাসন অধিকার তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি (বা কীর্ত্তিচন্দ্র) সিংহ এই সংবাদ শ্রবণমাত্র চারিশত সৈন্য তাহাদের প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন। ঘোর সংগ্রামে বিদ্রোহীগণ পরাজিত হইল! অল্প সংখ্যক হতাবশিষ্ট বিদ্রোহী কুকিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বাণিজ্য। চট্টগ্রাম চির বাণিজ্যোন্নত। ইহার প্রাচীন বাণিজ্যের প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থানে আমরা চট্টালের ইদানীন্তন বাণিজ্যের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিব। চট্টগ্রাম বাণিজ্য বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গে অদ্বিতীয়। অদ্যাপি চট্টগ্রামে একপ্রকার দেশীয় অর্ণবতরী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। চট্টগ্রামের প্রধান পণ্য তণ্ডুল। কিন্তু ধান্য চট্টগ্রামে অতি অল্পই জন্মে। ত্রিপুরা, নোয়াখালী, হাতীয়া-সনদ্বীপ ও দক্ষিণ সাহাবাজপুর হইতে চাউল চট্টগ্রামে আমদানি হয়। ইয়োরোপীয় বণিকগণ তাহা দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করেন। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিসনর হেঙ্কি সাহেব স্বীয় বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়াছেন, "তণ্ডুলের

৬৯। History and Statistics of Dacca division. Page 358.

৭০। "চাইহম" অর্থ তিন বৎসর। প্রবাদ আছে নরেন্দ্রজীত মাতৃগর্ভে তিন বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

প্রধান বাণিজ্য স্থানের বাণিজ্য কেবল ইয়োরোপীয় বণিকদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। দুই একটি মাত্র দেশীয় গোলাদার আছেন।” বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের উদ্ধৃত তালিকা পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে চট্টগ্রাম হইতে গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ২৯ লক্ষ মন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। গত ৯ বৎসর মধ্যে ১২৭৯ বাঙ্গাব্দে অধিক চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার পরিমাণ ২৮২৩২৫৫ মন; তন্মধ্যে ইয়োরোপ, আমেরিকা, ও আফ্রিকায় ৬৪৯১৭ টন, এদেন (৭০), সিংহল, মালদ্বীপ প্রভৃতি আসিয়ার অন্তর্গত স্থান সমূহে ২৮৭৭৪ টন।

চট্টগ্রামে ১৫টী চা উদ্যান আছে। এই সকল উদ্যানের স্বত্বাধিকারী ইংরাজ ও বাঙ্গালী। ১২৮১ বঙ্গাব্দে ৪৪২৭ বাক্স চা চট্টল হইতে বিদেশে প্রেরিত হয়, তাহার মূল্য ৩০১৪৭ টাকা।

চট্টগ্রামে দুই প্রকার কার্পাস জন্মে,—ফুল সুতা ও বেণী সুতা। ফুল সুতা শ্বেতবর্ণ ও উৎকৃষ্ট, ইহারই জুম প্রণালীতে চাস হইয়া থাকে। বেণী সুতা ধূসরবর্ণ, ইহার চাস হয় না; ফুলসুতার বিচির সহিত ইহার বিচি মিশ্রিত থাকায় অল্প পরিমাণে জন্মে। কাসলং, রাঙ্গামাটী, বন্দরবন, মাণিক ছরি, বোরাডোম, ত্রিপুরাবাজার, চন্দ্রঘোনা, রোয়াজাহাট, পোয়াংহাট কার্পাসের বাণিজ্য স্থান। বিচি শূন্য পরিষ্কার কার্পাসের মূল্য প্রতি মন ২০।২১ টাকা। কষ্টাম হাউসের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে ১২৮২ বঙ্গাব্দে ১৬৫৯৯ মন (বা ৬০৯—১ টন) কার্পাস বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর প্রায় এই পরিমাণ কার্পাস চট্টল হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। এলিসন সাহেব স্বপ্রণীত ইয়োরোপের ইতিহাসে লিখিয়াছেন “ভারতের কার্পাস ব্রিটীস উপকূলে প্রেরিত হয়। ইয়োরোপের শিল্প যন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া তাহা পুনর্ব্বার পূর্ব্বদেশেই প্রেরিত হইয়া থাকে।” আমরা বলি শিল্প ও বাণিজ্যের কৃপায় ইয়োরোপবাসীগণ ভারতের কার্পাস ও কোষ্ঠা দ্বারা আমাদের রক্ত শোষণ করিয়া কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করিতেছে। আর আমরা বলীবর্দ্দ, স্বাদ বুঝি না, চিনির মোট বহিতেছি। শরীরের রক্ত জল করিয়া আমরা কার্পাস ও কোষ্ঠা জন্মাইতেছি, আমরা শিল্প কার্য্যানভিজ্ঞ মূর্খ, যৎকিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে সে সকল ইয়োরোপবাসীগণের পাদ-পদ্মে সমর্পণ করিয়া চরিতার্থ হই। তাহারা বিজ্ঞ শিল্প যন্ত্রের সাহায্যে সেই সকল কার্পাস ও কোষ্ঠা রূপান্তরিত করিয়া আমাদিগকে দান করিতেছেন, আমরা পূর্ব্ব প্রাপ্ত টাকার বিংশতি গুণ অধিক দান করিয়া, বাণিজ্যের কুহক হইতে মুক্তিলাভ ও আত্ম অনভিজ্ঞতার পরিচয় দান করিতেছি।

হে ভারত জাগান কবিবৃন্দ! কেন

৭০। প্রবন্ধের প্রারম্ভে “এদেনের” উল্লেখ আছে, (ভারতী ১২৮৭, কাঃ, ৩০১ পৃষ্ঠা) কিন্তু মুদ্রাকরের প্রেতগণ “এদেন” এর পরিবর্ত্তে “এদেশ” করিয়াছে।

অকালে বোধন করিয়া "নয় আইনের" সৃষ্টি করিতেছ! শিল্প বাণিজ্যের জন্য ভারতবাসীদিগকে উত্তেজিত কর, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ প্রাচীন বঙ্গবাসীগণ যে পথে গমন করিয়া উন্নতি শৈলের সানুদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই পন্থা ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায় নাই। সেই এক মাত্র সোপান পরিহার পূর্ব্বক অপথে বিচরণ করিলে কি পার প্রাপ্ত হইবে? কেন অকালে "খোল তরবার" বলিয়া চীৎকার করিতেছ। কুটীরে বাস করিয়া শিল্প বাণিজ্য দ্বারা যখন প্রাসাদ-বাসীগণকে পদতলে আনিতে পারিবে, তখন যাহা বলিবে তাহাই শোভা পাইবে। দেখিতেছ না, ইয়োরোপবাসী বণিকগণ ধনুর্ব্বান হস্তে আমাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; রাজবিধি তাহাদের অঙ্গে অভেদ্য কবচের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভীত হইও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিও না। স্মরণ রাখ—

"Patience and perseverance can overcome mountains.'

প্রাচীন শিল্পীদিগকে (৭১) উৎসাহ দান কর, নব আবিষ্কৃত শিল্প বিদ্যায় পারদর্শী হও বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমাদের বাণিজ্য-তরীগুলি সেকালের ন্যায় (৭২) সাগর বক্ষে বিচরণ করুক, তখন দেখিবে শত্রুদল শাল্মলী পুষ্পের ন্যায় উড়িয়া যাইবে।

চট্টগ্রাম পর্ব্বত হইতে প্রায় ৪৪ প্রকার কাষ্ঠ রপ্তানি হয়। তন্মধ্যে "জারোল"ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা জাহাজও নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ মন লবণ বিদেশ হইতে চট্টগ্রামে আইসে। যে চট্টগ্রাম চিরকাল সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গকে লবণ দান করিয়াছে অদ্য তাহাকে "লিবারপোল"-এর নিকট লবণ ভিক্ষা করিতে হইল। অদৃষ্টদেব তোমাকে নমস্কার!

"লাবণাম্বুরাশি বেষ্টিত যে স্থল,
জন্মে "লিবারপোলে" লবণ তাহার!"

ভাষা।—ক্রমাগত রাষ্ট্রবিপ্লবে চট্টগ্রামের ভাষা এরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে অদ্যাবধি অধিকাংশ বাক্যের অর্থ গ্রহণ করা নিতান্ত দুরূহ। কিন্তু ভাষা বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আর একটী আশ্চর্য্য প্রকার বিশেষ ভাব (Peculiarity) পরিলক্ষিত হয়। কবিগণ কাব্য রচনার জন্য বাঙ্গালা এইক্ষণ যেরূপ পড়িতেছেন, চট্টগ্রামের ভাষায় সচরাচর সেই রূপ পদ্যোচিত বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়। মধুসূদন "চলি গেলা" শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। চট্টগ্রামে বহুকাল হইতে "চলিযার" শব্দ প্রচ-

৭১। জগদ্বাসী মানবগণ অদ্যাপি ভারত শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ভায়েনা একজিবিসনের বিজ্ঞাপনীই ইহার প্রমাণ।

৭২। In the Budhist era they (Bengalis) sent warlike fleets to the east and west, and colonized the islands of Archipelago. (Hunter's Orissa.)

লিত। (৭৩) ফলত চট্টগ্রাম বাসীগণ স্বভাব কবি (Natural Poet)।

এই কবিত্বের আভাস চট্টগ্রামের বিকৃত ভাষায় এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। আমরা ইহাকে গুণ মধ্যে অন্তর্ভূত করি। ইহা ভিন্ন চট্টগ্রামের ভাষায় অন্য কোন বিশেষ গুণ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ভাষা বিষয়ে এই প্রকার দোষের আধিক্য ও গুণের অল্পতা চিরস্থায়ী হইবে না এরূপ আশা করা যাইতে পারে। বিদ্যানুশীলন, সভ্যপদ্ধতি পদার্পণ এবং অপকৃষ্ট অবস্থা হইতে ক্রমে উৎকৃষ্ট পদবী আরোহণ করিবার অন্যান্য উপায় অবলম্বনে চট্টগ্রাম প্রদেশ অসামান্য উৎসাহ ও দ্রুততা প্রকাশ করিতেছে। তদ্দেশ বাসীদিগের উদ্যমশীলতা ও জাতীয় ভাব যেরূপ অনুকরণাই এবং দিন দিন তাহারা যে প্রকারে উৎকৃষ্ট অবস্থাতে উন্নীত হইতেছে তাহাতে অনতিবিলম্বেই যে তাহারা স্বীয় মাতৃ ভাষার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তদ্দেশে নানা বিষয়ক পরিবর্ত্তন ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে এবং আমরা সাতিশয় আনন্দ ও উৎসাহের সহিত আশা করি যে এই পরিবর্ত্তনের দ্রুতগামী ও মহাবল স্রোত—বঙ্গের একটী প্রধান আশার স্থল—চট্টগ্রামকে অতি সত্বর দূরলক্ষিত সভ্যতাও উন্নতির সুখময় দ্বীপে লইয়া উপনীত করিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

৭৩। পাঠক মহাশয়েরা অদ্যাবধি চট্টগ্রামে প্রচলিত ভাষার স্বরূপ কথঞ্চিৎ নির্ণয় করিতে পারেন এই অভিপ্রায়ে এবং আমাদের উল্লিখিত পদ্যোচিত বাক্য-বন্ধের প্রচলন প্রতিপন্ন করিবার জন্য উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

১। গর্ বাইস্যে গর্ বাইস্যে লইত খর লইত খরি পুছ খরি ছুথ খরি বন্দরৎযা।

অর্থ—কুটুম্ব আসিয়াছে কুটুম্ব আসিয়াছে, লৌকিকতা কর্, লৌকিকতা করিয়া (কুশল) জিজ্ঞাসা কর, জিজ্ঞাসা করিয়া শীঘ্র করিয়া বাজার যা।

২। দাই আয় দাই আয় আদর গালাদি এগু খচ্ছুপ ছলি যায়।

অর্থ—শীঘ্র এস শীঘ্র এস পথের পার্শ্ব দিয়া একটী কচ্ছপ চলিয়া যায়।

চট্টগ্রামের প্রচলিত ভাষায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ মগ ও যাবনিক বাক্যের সংযোগ আছে বোধ হয়। যাহা হউক উচ্চারণ নিতান্ত কদর্য্য।

জ্ঞানের অঙ্গ-বৈচিত্র্য।

প্রশ্ন। শরীরেরই ত অঙ্গ-বৈচিত্র্য জানি —জ্ঞানের অঙ্গ বৈচিত্র্য আবার কিরূপ?

উত্তর। কথাটা একটু বিস্ময়-জনক শুনায় বটে কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না; জ্ঞানের আর সমস্ত বাদ দিয়া যদি শুদ্ধ কেবল তাহার একত্ব-টুকুকেই জ্ঞান বলিয়া মানা যায় তবে সত্যই ত বটে—তাহার আবার অঙ্গ-বৈচিত্র্য কিরূপ? কিন্তু যখন দেখা যায় যে, নানা বিচিত্র বিষয়ে ব্যাপৃত হইবার শক্তি-পুঞ্জ সেই একত্বের সকল দিক্ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে জ্ঞানের সেই যে একত্ব তাহা ফাঁকা একত্ব নহে— তাহা সর্ব্বাঙ্গীন একত্ব; জ্ঞানের এই যে বহু-মুখীন শক্তি-বৈচিত্র্য ইহাই তাহার অঙ্গ বৈচিত্র্য।

প্রশ্ন। তবে বেদান্তদর্শনের এই যে একটি সিদ্ধান্ত—যে, কি স্বগত-ভেদ (অর্থাৎ একই ব্যক্তির অবয়ব-গত ভেদ), কি স্বজাতীয় ভেদ (অর্থাৎ একই জাতির ব্যক্তি-গত ভেদ), কি বিজাতীয় ভেদ (অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় দুই ব্যক্তির মধ্যগত ভেদ) কোন প্রকার ভেদই জ্ঞানকে স্পর্শ করিতে পারে না, এত বড় কথাটা কি একেবারেই অমূলক?

প্রশ্ন। বেদান্তের কথা এক ভাবের কথা—এখানে যে কথা হইতেছে তাহা আরেক ভাবের কথা—দুই ভাবের দুইকথা এক সঙ্গে আন্দোলন করা কম গোলোযোগের ব্যাপার নহে, তথাপি আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, আঁকজোঁক পাড়া দেখিয়া যদি ভয় না পাও—যদিচ ভয়ের একটুও কারণ নাই—তাহা হইলে অতি সহজে উভয়ের মধ্যেকার বিবাদও নিষ্পত্তি হয় আর সেই-সঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবের আলোচনা-কার্য্যও অনেক দূর এগোয়।

প্রশ্ন। এক ত আমি গণিত-শাস্ত্রের কোন ধারই ধারি না, তাহাতে আবার নিরাকার বস্তুর সঙ্গে আঁকজোঁকের যে কেমন করিয়া মিল খাইবে তাহা আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না—আমার ত এইরূপ মনে হয় যে, তেলে জলে যেমন মিল ও-দুয়ের মধ্যেও তেমনি মিল, অতএব আমার নিকট হইতে যদি উত্তর-লাভের প্রত্যাশা কর তবে তোমার প্রকৃত অভিপ্রায়টি ভাল করিয়া খুলিয়া বল।

উত্তর। গণিতশাস্ত্র-বিষয়ে আমিও তোমারি মত পণ্ডিত—সে জন্য ভয় নাই, তবে নিরাকার পদার্থ সম্বন্ধে তুমি যে আশঙ্কা করিতেছ—যে, তাহার সঙ্গে আঁকজোঁকের কোন মিল খায় না—এক হিসাবে তোমার ও-কথা আমি শিরোধার্য্য করি কিন্তু আর এক হিসাবে আমার কথাও তুমি শিরোধার্য্য না করিয়া থাকিতে পার না।

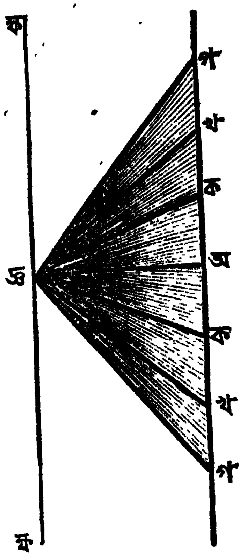
উত্তর পশ্চিম-অঞ্চলে জন্ম-দিবসকে বলে বরস-গাঁট,*—আমাদের দেশে পুরা-কালে এইরূপ একটা রীতি প্রচলিত ছিল যে, জীবনের এক এক বৎসর অতীত হইলে গৃহজনেরা একগাছি সূত্রে এক-একটি করিয়া গ্রন্থি বন্ধন করিয়া রাখিত; মনে কর ঐরূপ প্রথানুসারে জীবনের দশ বৎসর গত হওয়াতে বর্ষ-নির্ণায়ক সূত্রে দশটি গ্রন্থি পরে পরে নিপতিত হইয়াছে; তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, কাল নিরাকার —অথচ তাহার দশটি বার্ষিক অংশ দশটি সাকার গ্রন্থি দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট হইতেছে। সাকার গ্রন্থিপাত দ্বারা নিরাকার কালের অবয়ব নিরূপণ এই যা দেখিলে, সাকার রেখা-পাত দ্বারা নিরাকার জ্ঞানের অবয়ব-নির্ব্বাচন তাহা অপেক্ষা নূতন কিছুই নহে, তবে আর তাহাতে আপত্তি কি?

প্রশ্ন। ওরূপ বিষদাঁত-ভাঙা আঁক-জোঁক তুমি যথেচ্ছা খেলাও না কেন—তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই বরং আমোদ আছে।

উত্তর। তুমি যতটা আমোদ মনে করিতেছ তাহা নাও হইতে পারে—তাহার জন্য আমি দায়ী নহি, তবে আমি এই পর্য্যন্ত অসংকোচে বলিতে পারি যে আঁক-জোকের সাহায্যে তোমার আমার উভয়েরই পথ-কষ্টের অনেক লাঘব হইবে। বক্তব্য বিষয়ের নাকি দুইটী পক্ষ—এক পক্ষের আলোচনায় যখন নিমগ্ন হওয়া যায় অপর পক্ষ তখন একেবারেই মনশ্চক্ষুর দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া পড়ে, এইটি যাহাতে না হইতে পায় সেই জন্যই আঁকজোঁকের প্রয়োজন—অন্য কোন কারণে নহে। মনে কর যেন তুমি কোন নাট্যাভিনয় দেখিতেছ, কিন্তু রঙ্গস্থান হইতে দূরে পিছাইয়া থাকা প্রযুক্ত অভিনায়কদিগের কথা বার্ত্তা বুঝিতে পারিতেছ না, অভিনীয়মান নাটক পুস্তক তোমার সঙ্গে আছে, তাহা দেখিয়া তবে তুমি অভিনায়কদিগের কথা বার্ত্তা বুঝিতে পারিতেছ, কিন্তু যখন তুমি পুস্তক দেখিতেছ তখন অভিনায়কদিগের কি অঙ্গভঙ্গী কি মুখের ভাব কিছুই দেখিতে পাইতেছ না, আর যখন তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিতেছ তখন তাহাদের কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারিতেছ না; এ যেমন দুর্দ্দশা—জ্ঞানের দুই পক্ষ পর্য্যায়-ক্রমে আলোচনা করাও ঠিক্ সেইরূপ; এ যদি হয় ত ও হয় না, ও যদি হয় ত এ হয় না। শুদ্ধ কেবল কথা দ্বারা ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে দুই পক্ষ পর্য্যায়-ক্রমে বলা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না, কিন্তু রেখা-পাত দ্বারা দুই পক্ষকেই এক সঙ্গে চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করা যাইতে পারে যথা,—

পার্শ্ব পত্রস্থিত চিত্রের জ্ঞ-অক্ষর হইতে দুই দিকের দুই ক্ষ-অক্ষর পর্য্যন্ত যে রেখা প্রসারিত দেখিতেছ তাহাকে সংক্ষেপে ক্ষ-রেখা বলা যাউক—মনে কর যেন, তাহা উপর নীচে দুই দিকেই অসীম বিস্তৃত সুতরাং আদ্যন্ত-বিরহিত, আর মনে কর যেন

* সংস্কৃত ভাষায় এই স্থলে বর্ষ-গ্রন্থি শব্দের প্রয়োগ আছে।



তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের অসীম-স্ফূর্ত্তি—এই এক পক্ষ, তেমনি আবার মনে কর অ-অক্ষর হইতে দুই গ-অক্ষর পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখা উপর-নীচে দুই দিকে অসীম বিস্তৃত ও মনে কর তাহা জ্ঞানের অসীম বৈচিত্র্যশালী জ্ঞাতব্য বিষয়—এই আর এক পক্ষ; এ দুই পক্ষের মধ্যে এ-পিট ও-পিট সম্বন্ধ। যেমন কোন বস্তুর এক পিট আমাদের চক্ষের সম্মুখীন হইলে তাহার অন্য পিট চক্ষের আড়াল হয়,—কোন বস্তুরই দুই পিট এক সঙ্গে নেত্রগোচর হইতে পারে না; তেমনি জ্ঞানের দুই পক্ষ এক সঙ্গে নির্ব্বচনীয় হইতে পারে না,—এ নয় যে, কোন বস্তুর এক পিট ভিন্ন দুই পিট নাই অথবা জ্ঞানের এক পক্ষ ভিন্ন দুই পক্ষ নাই। মনে কর জ্ঞ এক-জন জ্ঞাতা পুরুষ, অ তাঁহার বহিরবয়ব; অ-হইতে দুই ক পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখা মনুষ্য-মণ্ডলীর বহিরবয়ব; দর্শকের বহিরবয়ব অ-অপেক্ষা ইহা অবশ্য বিস্তীর্ণ দেশব্যাপী; অ-হইতে দুই গ পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখা চেতনাচেতন উভয়-বিধ জীব সমূহের—যেমন তরু-লতা জীব জন্তু মনুষ্যের—বহিরবয়ব,—ইহা আরো বিস্তীর্ণ দেশ-ব্যাপী; নীচের ক হইতে উপরের ক পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখাকে সংক্ষেপে ক-রেখা বলা যাউক—তেমনি খ-হইতে খ পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখাকে খ-রেখা ও গ-হইতে গ-পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখাকে গ-রেখা বলা যাউক্। ক-রেখা মনুষ্যমণ্ডলীর বহির্দৃশ্য; খ-রেখা কি মনুষ্য-মণ্ডলী কি পশু পক্ষী সচেতন জীব মাত্রেরই বহির্দৃশ্য, সুতরাং ক-রেখা অপেক্ষা খ-রেখা বিস্তীর্ণ; গ-রেখা—কি মনুষ্য-মণ্ডলী কি পশু পক্ষী কি তরুলতা—চেতনাচেতন জীব মাত্রেরই বহির্দৃশ্য, ইহা আরো বিস্তীর্ণ; মনে কর যেন মনঃকল্পিত ঘ রেখা ঙ-রেখা চ-রেখা প্রভৃতি বিস্তীর্ণ হইতে বিস্তীর্ণতর অসংখ্য রেখা অ-হইতে উপর-নীচে প্রসারিত রহিয়াছে। ঘ-রেখা মনে কর যেন পার্থিব ভূত-নিচয়, ঙ-রেখা মনে কর যেন সৌর-জগতিক ভূত-নিচয়, চ-রেখা মনে কর যেন আরো বিস্তীর্ণ জগতের ভূত নিচয় ইত্যাদি ক্রমে মনে কর যেন অ হইতে শেষে অসীম-বিস্তীর্ণ রেখা-একটি প্রসারিত রহিয়াছে—চাই কি সেই অসীম রেখাকে অসীম আকাশ বলিয়া মনে করিতে পার তাহাতে কিছু আইসে যায় না। জ্ঞ-স্থান হইতে যে ছটা-গুচ্ছ যে বিষয়ে (ক-রেখাতে হউক্ খ-রেখাতে হউক) নিপতিত হইয়াছে সেই ছটা মনে কর যেন সেই বিষয়ের জ্ঞান, এবং সেই ছটার বিস্ফারণ সেই বিষয়ক তত্ত্বের ব্যাপ্তি। ক-রেখাতে যে ছটা নিপতিত হইয়াছে তাহা ক-ছটা, খ-বিষয়ক ছটা খ-ছটা ইত্যাদি প্রকারে প্রত্যেক-বিষয়ক ছটা

স্বীয় বিষয়ের নাম দ্বারা লক্ষিত হউক্। যে-বিষয়—যেমন ক-রেখা খ-রেখা—যে পরিমাণে বিস্তীর্ণ সে-বিষয়ক ছটা—যেমন ক-ছটা খ-ছটা—সেই পরিমাণে বিস্ফারিত, ইহাতে বুঝাইতেছে যে সে বিষয়ের তত্ত্ব সেই পরিমাণে ব্যাপক। সচেতন জীব রাজ্য (খ-রেখা) যেমন মনুষ্য-রাজ্য অপেক্ষা (ক-রেখা অপেক্ষা) বিস্তীর্ণ, সচেতন জীব তত্ত্ব তেমনি মনুষ্য তত্ত্ব অপেক্ষা ব্যাপক; এইরূপ ক-ছটা অপেক্ষা খ-ছটার বিস্ফারণের মাত্রাধিক্য দ্বারা ক-তত্ত্ব অপেক্ষা খ-তত্ত্বের ব্যাপ্তির আধিক্য সূচিত হইতেছে। ক-ছটা অপেক্ষা খ-ছটা, খ-ছটা অপেক্ষা গ-ছটা, ক্ষ-রেখার কাছ ঘেঁসিয়া বিস্ফারিত হইয়াছে দেখিবে, ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, বুদ্ধির আয়ত্তীকৃত বিষয় যত বিস্তীর্ণ হইতে থাকিবে, তাহার উপলভ্য তত্ত্ব ততই ব্যাপ্তি লাভ করিতে থাকিবে এবং তাহার বৃত্তি-ছটা ততই বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্ফূর্ত্তির (ক্ষ-রেখার) কাছ ঘেঁসিতে থাকিবে, কিন্তু কোন কালেই ক্ষ-রেখার গাত্র-সাৎ হইতে পারিবে না। কিন্তু যদি ক-রেখা প্রভৃতি বিষয়-পরম্পরাকে অসীম বিস্তীর্ণ মনে করা যায় এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধির বৃত্তি-ছটাকে অসীম বিস্ফারিত মনে করা যায়, তাহা হইলে সেই বৃত্তি-ছটা ক্ষ-রেখার (অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান স্ফূর্ত্তির) গাত্র-সাৎ হইয়া যাইবে ইহা প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হইতেছে; এরূপ হইলে দাঁড়ায় এই যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তিও যা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিষয়ও তা, দুয়ের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; শেষোক্ত ব্যাপারটিকে জ্ঞানের পূর্ণতার আদর্শ বলিয়া আমরা ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি বটে, কিন্তু সৃষ্ট জীব কোন কালেই তাহাকে কার্য্যে ফলিত করিতে পারে নাই পারিবে না—কেন না বুদ্ধি যতই কেন বিস্ফারিত হউক না তাহা অপেক্ষা আরো সহস্র বিস্ফারিত হইলেও অসীম-ব্যাপ্তির অসীম পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

বেদান্ত-দর্শন বুদ্ধির অতীত আদর্শ-রূপী বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন যে, সেখানে জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় একীভূত—সুতরাং সেখানে কোন প্রকার ভেদ স্থান পাইতে পারে না,—আমরাও এই মাত্র দেখিলাম যে সেখানে জ্ঞান-স্ফূর্ত্তি এবং জ্ঞানের বিষয় এ দুয়ের মধ্যে মূলেই কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু পক্ষান্তরে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের জ্ঞানের উন্নতি ক্রম-সাপেক্ষ—তাহা নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া অসীম জগৎব্যাপী পরিপূর্ণ একত্বের দিকে ক্রমশই অগ্রসর হয় অথচ ক্রমাগতই তাহা হইতে অসীম দূরে অবস্থিতি করে; তবে উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধনের টান—সম্বন্ধের গুরুত্ব—অসীম প্রগাঢ় বলিয়া এক পক্ষ হইতে অন্য পক্ষ দূর হইতে দূরতম হইলেও নিকট হইতে নিকটতম ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

সম্পাদকের বৈঠক।

দোকান্‌দার বড় লোক

কিম্বা হটাৎ নবাব।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জুর্দ্যা, গান বাজানার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ।

জুর্দ্যা। বাঃ এ নিতান্ত মন্দ নয়, ও লোকগুল বেশ ত্রিংত্রিং করে ল্যাকায়।

গা-ওস্তাদ। নাচের সঙ্গে যখন আবার গান বাজনা মিশবে, তখন আরও ভাল লাগবে। আর আমরা যে আপনার জন্য একটা নাচ ঠিক করেছি তাতে বেশ মজা দেখতে পাবেন।

জুর্দ্যা। আজ বৈকালে নিদেন তা হওয়া চাই। আমি যে ব্যক্তির জন্য এই সমস্ত উদ্যোগ করেছি তিনি অনুগ্রহ করে এখানে আহার করতে আসবেন।

না-ওস্তাদ। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত।

গা-ওস্তাদ। কিন্তু, হুজুর এক দিনেই কি বস্ হবে। আপনি যে রকম দেল-দরিয়া মানুষ, ভাল চিজ দেখতে শুনতে আপনার যে রকম সক্, তাতে প্রতি বুধ-বার, আর বেরস্পতিবারে আপনার বাড়িতে গান বাজনার বৈঠক দেওয়া উচিত।

জুর্দ্যা। বড় লোকেরা কি তাই করে?

গা-ওস্তাদ। আজ্ঞে হাঁ হুজুর।

জুর্দ্যা। তবে আমিও করব। তা হলে ভাল হবে?

গা-ওস্তাদ। তার কোন সন্দেহ নেই। তাহলে আপনার তিন রকম গলার সুর যোগাড় করা আবশ্যক। উঁচু নীচু মা-জারি। আর এই সকল গলার সুরের মত যন্ত্রও চাই। ছোট বেয়ালা বড় বেয়ালা, আর—

জুর্দ্যা। আর তার সঙ্গে একটা এক-তারাও চাই। এক তারা যন্ত্রটা আমার বড় ভাল লাগে—ওর আওয়াজ বড় মিঠে।

গা-ওস্তাদ। সে সব বন্দবস্ত আমাদের করতে দিন।

জুর্দ্যা। সে যাই হোক্ আমার টেবিলে গান করবার জন্য কতকগুল গাইয়ে পা-পাঠাতে ভুলো না।

গা-ওস্তাদ। যা যা আবশ্যক, সব পাবেন।

জুর্দ্যা। বিশেষ যেন নাচটা খুব খাসা হয়।

গা-ওস্তাদ। তা দেখে আপনি খুসি হবেন। আর তাতে খ্যাম্‌টাও থাকবে।

জুর্দ্যা। আ! খ্যামটাই আমার খাস্ চীজ, আর এই নাচ আমি একবার নেচে তোমাদের দেখাতে চাই। এসো ওস্তাদ্‌জি।

না-ওস্তাদ। আজ্ঞা হজুর একটা টুপি মাথায় দিন। (জুর্দ্যা, পেয়াদার নিকট হইতে একটা টুপি লইয়া, তাঁহার কান ঢাকা রাত পোরে টুপির উপর পরিধান, ওস্তাদ গান গাইতে গাইতে তাঁহাকে নাচাইতে লাগিলেন) তা না না না না না, না না না না না না; তা না না না না না না না না না না না। তালে তালে হজুর। তা না না না না না। ডান পা, তা না না না না না। কাঁধ অত নড়াবেন না। তা না না না না না। তা না না না না না না না। হাত দুটো জড়সড় আছে। তা না না না না না। মাথা ওঠান্। পায়ের আঙ্গুলগুল উঁচু করে রাখুন—শরীরটাকে সোজা রাখুন।

জুর্দ্যা। অ্যাঁ? কেমন?

গা-ওস্তাদ। বাহাবা! তোফা হয়েছে।

জুর্দ্যা। ভাল কথা! এক জন বেগমকে কি রকম ক'রে সেলাম করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেও। আমার এখনি তা দরকার হবে।

নাচ-ওস্তাদ। এক জন বেগমকে কেমন ক'রে সেলাম করতে হবে?

জুর্দ্যা। হাঁ এক জন বেগম, তাঁর নাম দরিমেন্।

নাচের ওস্তাদ। আপনার হাত দিন।

জুর্দ্যা। না তুমি করলেই হবে, আমার বেশ মনে থাকবে।

না-ওস্তাদ। যদি খুব মান্য দেখাতে হয়, তাহলে পিছু হেটে একবার সেলাম করতে হবে, পরে তাঁর দিকে এগুতে এগুতে তিন বার সেলাম করতে হবে—আর শেষ বারটা তাঁর হাঁটু পর্য্যন্ত নীচু হয়ে সেলাম করতে হবে।

জুর্দ্যা। আচ্ছা একটু খানি তুমি কর দিকি। (নাচের ওস্তাদ তিন বার সেলাম করিল) বেশ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জুর্দ্যা, গান বাজনার ওস্তাদ্—নাচের ওস্তাদ, একজন পেয়াদা।

পেয়াদা। হজুর, তলোয়ার খেলবার ওস্তাদ এসেছে।

জুর্দ্যা। আচ্ছা তাকে আসতে বল আমাকে তালিম দেবে।

(গান বাজনার ও নাচের ওস্তাদ দুয়ের প্রতি) আমার ইচ্ছে তোমরা একবার আমার খেলা দেখো।

তৃতীয় দৃশ্য।

জুর্দ্যা—তলোয়ার খেলাবার ওস্তাদ, গান বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ দুটো তলোয়ার লইয়া এক জন পেয়াদা।

তল-ওস্তাদ। (দুটো তলোয়ার প্রথমে পেয়াদার নিকট হইতে লইয়া, তার একটা তলোয়ার জুর্দ্যাকে দান করিয়া)—আসুন হুজুর, প্রথমে বন্দেগি। শরীর সোজা করে, বাঁ উরোতের উপর ভর দিয়া একটু হেলে থাকৃতে হবে। পা অত ফাঁক্ না—এক লাইনের উপর দুই পা থাকবে। হাতের কজা উরোতের এক লাইনে, তলোয়ারের মুখটা কাঁধের সামনে থাকবে—হাত অত বাড়িয়ে না—বাঁ হাতটা চোখ পর্য্যন্ত উঁচুতে উঠবে—বাঁ কাঁধটা আরও চৌকোস ভাবে রাখতে হবে। মাথা সোজা, চোখের দৃষ্টি স্থির। এগোন্। শরীর হেল্‌বেনা—এই বার আসুন, পিছনে এক লাফ, এইবার সামাল সামাল (দুই তিন তলোয়ারের ঘা দিয়া, সামাল সামাল বলিতে বলিতে)

জুর্দ্যা। অ্যাঁ! কেমন?

গান-ওস্তাদ। বড় চমৎকার।

ত-ওস্তাদ। আপনাকে তো আগেই বলেছি তলোয়ার খেলার দুটো জিনিস আছে। সেই দুটো জান্‌লেই সব জানা হয়। ঘা দেওয়া, আর, ঘা না নেওয়া। আর সে দিন আমি প্রমাণের সঙ্গে তা দেখিয়ে দিয়েছি।

জুর্দ্যা। এক জন লোক, যার সাহস নেই, সে তাহলে এই রকম ক'রে নিজে না মরে আর একজনকে মেরে ফেল্‌তে পারে?

ত-ওস্তাদ। তার সন্দেহ নেই। আর তার প্রমাণ শুদ্ধ কি আপনি দেখেন নি?

জুর্দ্যা। হাঁ।

ত-ওস্তাদ্। তবে দেখুন রাজ্যের মধ্যে আমাদের কতদূর মান হওয়া উচিত। আর সকল রকম অকেজো বিদ্যের চেয়ে এ বিদ্যে যে কত উঁচু তাও বিবেচনা ক'রে দেখুন। অকেজো বিদ্যে, যেমন নাচ, গান বাজনা—

না-ওস্তাদ। তলোয়ারের ওস্তাদজি, একটু মুখ সাম্‌লে কথা কও—নাচের কথা অমন অমান্য ক'রে বোলো না।

গা-ওস্তাদ। এও ভাই তোমাকে বল্‌চি, গান-বাজনার কথা অমন ক'রে বোলো না।

ত-ওস্তাদ। তোমরা তো বড় মজার লোক হে—আমাদের বিদ্যের সঙ্গে কিনা তোমাদের বিদ্যের তুলনা!

গা-ওস্তাদ। কি মস্ত লোকটাই বল্‌চে রে।

না-ওস্তাদ। বুকে কবচ প'রে কি মজার জানোরই সেজেচে।

ত-ওস্তাদ। ও গো নাচের ওস্তাদের পো, তোমাকে এখনি ঘুর্কি নাচন নাচিয়ে দেব।

না-ওস্তাদ। ও হে তলোয়ারের ওস্তাদ, তোমার ব্যবসার আমিও তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি।

জুদঁ্যা। (নাচের ওস্তাদের প্রতি) তোমরা কি পাগল হয়েছ না কি?—যে ব্যক্তি প্রমাণ প্রয়োগের সঙ্গে একজন মানুষকে বধ করতে পারে, তার সঙ্গে আবার ঝগড়া?

না-ওস্তাদ। ওর প্রমাণ প্রয়োগ চুলোয় যাক।

জুদঁ্যা। (নাচের ওস্তাদের প্রতি) চুপ চুপ আস্তে!

ত-ওস্তাদ। কি! অভদ্র কাঁহেকা।

জুদঁ্যা। আমার তলোয়ারের ওস্তাদজি! কি কর কি কর—

না-ওস্তাদ। (ত-ওস্তাদের প্রতি) কি! গাধা কোথাকারে!

জুদঁ্যা। আমার নাচের ওস্তাদজি কি কর—কি কর!—

ত-ওস্তাদ। তোমাকে একবার যদি পাকড়ে ধরি—

জুদঁ্যা। (ত-ওস্তাদের প্রতি) আস্তে!

না-ওস্তাদ। তোমার উপর যদি একবার হাত চালাতে আরম্ভ করি—

জুদঁ্যা। (না-ওস্তাদের প্রতি) আস্তে আস্তে।

ত-ওস্তাদ। আমি এমন ঠেঙ্গিয়ে দেব—

জুদঁ্যা। (ত-ওস্তাদের প্রতি) তোমার পায়ে পড়ি।

না-ওস্তাদ। আমিও এমন পিটিয়ে দেব—

জুদঁ্যা। (না-ওস্তাদের প্রতি) ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও।

গা-ওস্তাদ। হজুর একটু থামুন—কি রকম ক'রে কথা কইতে হয় আমরা ওকে একবার শিখিয়ে দি।

জুদঁ্যা। (গা-ওস্তাদের প্রতি) কি সর্ব্বনাশ! তোমরা থাম না হে!

---

৪ দৃশ্য।

একজন তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক, জুদঁ্যা, গান বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ তলোয়ারের ওস্তাদ, একজন পেয়াদা।

জুদঁ্যা। এই যে! পণ্ডিত মহাশয়, ঠিক সময়ে আপনি তত্ত্ববিদ্যা নিয়ে এসেছেন—এই ব্যক্তিদের মধ্যে ঝগড়াটা থামিয়ে দিন দেখি।

তত্ত্বজ্ঞানী। মহাশয়েরদের মধ্যে কি হচ্চে? ব্যাপারটা কি?

জুদঁ্যা। কার ব্যবসায় সকলের চেয়ে ভাল এই নিয়ে ওঁদের মধ্যে রাগারাগি হয়েছে, এমন কি গালাগালি পর্য্যন্ত হয়েছে। হাতাহাতি হবারও উপক্রম হয়েছিল।

তত্ত্বজ্ঞানী। কি মহাশয়রা! ক্রোধে কি এ প্রকার বিচলিত হতে হয়? সেনেকা ক্রোধের বিষয় যে প্রবন্ধ লিখে গেছেন তা কি আপনারা পড়েন নি? এই ক্রোধ রিপু অপেক্ষা জঘন্য ও নীচ আর কি কিছু আছে? ক্রোধেতেই কি মনুষ্য পশুবৎ ভীষণ হয় না?

না-ওস্তাদ। কি, মশায়! আমাদের

নাচ ও গানবাজনার পেষাকে তাচ্ছিল্য করে আমাদের তুজনকে ও ব্যক্তি গালাগালি দিতে আসবে!

তত্ত্বজ্ঞানী। যে ব্যক্তি বিজ্ঞ, তিনি অন্যের কটুকাটব্যে বিচলিত হন না—মিতব্যবহার ও সহিষ্ণুতা সেই সকল কটু কাটব্যের একমাত্র উত্তর।

ত-ওস্তাদ। ওদের আস্পর্দ্ধা দেখেছেন মহাশয়—আমার পেষার সঙ্গে কিনা ওদের পেষার তুলনা!

তত্ত্বজ্ঞানী। তাতে কি আপনার বিচলিত হওয়া উচিত? বৃথা গর্ব্ব নিয়ে মানুষদের মধ্যে কলহ হওয়াটা উচিত নয়; আর বিজ্ঞতা ও ধর্ম্ম নিয়েই অন্যদের সহিত আমাদের যা প্রভেদ।

না-ওস্তাদ। আমি ওকে এই বলছিলুম যে নৃত্য বিদ্যা যেমন সরেশ এমন আর কিছুই না।

গা-য়স্তাদ। আর আমি বলছিলেম যে শত শত বৎসর থেকে গান বাজনার যে রকম আদর হয়ে আসচে এমন আর কিছুরই না।

ত-ওস্তাদ। আর আমি ওদের তুজনকেই বলছিলেম যে অস্ত্র বিদ্যা সকল বিদ্যা অপেক্ষাই ভাল ও কেজো।

তত্ত্বজ্ঞানী। তবে তত্ত্ববিদ্যার কি হবে? তোমাদের তিন জনেরই এত দূর স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার যে, যে সকল জিনিসকে আমি শিল্প বলতেও রাজি নই, সেই নাচ গান বাজনা ও পালোয়ানির নীচ কাজকে কি না আমার সম্মুখে অনায়াসে বিদ্যা ব'লে পরিচয় দিলে?

ত-ওস্তাদ। যাও যাও, পণ্ডিত কোথাকারে।

গা-ওস্তাদ। যাও যাও বিদ্যে কলাসে ভিক্ষুক ভট্টাচার্য্যি কোথাকার।

না-ওস্তাদ। দূর হ নির্ব্বোধ টুলো পণ্ডিত।

তত্ত্বজ্ঞানী। কি! পাজি বেটারা—

(পণ্ডিত তাহাদের তিন জনের উপর পড়িয়া কিল মারিতে আরম্ভ)

জুদাঁ। পণ্ডিত মহাশয়!

তত্ত্বজ্ঞানী। পাজি, নচ্ছার, হতভাগা!

জুদাঁ। পণ্ডিত মহাশয়!

ওস্তাদ। গাদা ছুঁচো—

জুদাঁ। ও গো ওস্তাদজিরা!

তত্ত্বজ্ঞানী। নির্লজ্জ!

জুদাঁ। পণ্ডিত মহাশয়!

না-ওস্তাদ। গর্দ্দভ কোথা কারে!

জুদাঁ। ওগো তোমরা কর কি!

তত্ত্বজ্ঞানী। পাজি ব্যাটারা!

জুদাঁ। পণ্ডিত মহাশয়!

গা-ওস্তাদ। অসভ্য কোথাকারে!

জুদাঁ। ও গো ওস্তাদজিরা!

তত্ত্বজ্ঞানী। চোর, বাটপারে, জুয়াচোর নচ্ছার!

জুদাঁ। ও পণ্ডিত মহাশয়! ও ওস্তাদজিরা! ও পণ্ডিত মহাশয়! ও ওস্তাদজিরা! ও পণ্ডিত মহাশয়!

(মারামারি করিতে করিতে সকলে প্রস্থান)

---

৫ দৃশ্য।

জুদঁ্যা। এক জন পেয়াদা।

জুদঁ্যা। যত খুশি তোমরা মারামারি কর আমি তো আর পারিনে, আর তোমাদের ছাড়িয়ে দিতে গিয়ে কি আমার পোষাক নষ্ট করব? আর, আমি এমন পাগল নই যে ওদের মধ্যে ঢুকে আমিও দুই চার ঘা খাই।

---

৬ দৃশ্য।

তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক, জুদঁ্যা, এক জন জন পেয়াদা।

ত-শিক্ষক। (তাহার গলাবন্দ ঠিক্ ঠাক করিয়া) এই বার পাঠ আরম্ভ করা যাক্।

জুদঁ্যা। আ, মশায় আপনি যে মার খেয়েছেন, তার জন্য আমি বড় দুঃখিত হয়েছি।

ত-শিক্ষক। সে কিছুই নয়। একজন তত্ত্বজ্ঞানী ওসব অনায়াসে সহ্য করতে পারেন। আর তাঁদের নামে জুবিনালের ছাঁদে উপহাস ক'রে একটা প্রবন্ধ লিখতে যাচ্চি, তাতে তারা খুব জব্দ হবে। ওকথা থাক্—আপনি কি শিখ্‌তে ইচ্ছা করেন?

জুদঁ্যা। যা আমি শিখ্‌তে পারব। কারন, পণ্ডিত হতে আমার ভয়ানক ইচ্চে। আর ছোট ব্যালায় বাপমারা আমাকে ভাল ক'রে বিদ্যা শিক্ষা দেননি বোলে আমার এমন রাগ ধরে!

ত-শিক্ষক। হাঁ এ কথাটা মনে হওয়া যুক্তি সঙ্গত বটে;* "বিদ্যাভাবাৎ জীবনং-মৃত্যু সদৃশং" এ শ্লোকটা আপনি বুঝ্‌তে পেরেছেন, সংস্কৃত অবশ্য আপনি জানেন।

জুদঁ্যা। আচ্ছা, মনে করুন যেন আমি জানি নে। ওর মানে কি আমাকে বলুন।

ত-শিক্ষ। অস্যার্থ এই—বিদ্যার অভাবে জীবন মৃত্যুবৎ হয়।

জুদঁ্যা। এই সংস্কৃতটাতে খুব জ্ঞানের কথা আছে।

ত-শিক্ষ। বিদ্যার মুলতত্ব কি আপনার কিছু জানা আছে?

জুদঁ্যা। হ্যাঁ আছে বৈ কি। আমি লিখ্‌তে পড়্‌তে জানি।

ত-শিক্ষ। তবে কিসের থেকে আরম্ভ করা আপনার ইচ্ছে?—ন্যায় শাস্ত্র শিখ্‌তে কি ইচ্ছে করেন?

জুদঁ্যা। এই ন্যায়শাস্ত্র জিনিস টা কি?

ত শিক্ষ। যে বিদ্যা মনের তিন প্রকার কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়।

জুদঁ্যা। কি এই তিন প্রকার কার্য্য?

ত শিক্ষ। সে হচ্চে প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয়। প্রথম হচ্চে, সার্ব্বভৌমিক পদার্থ সংখ্যার দ্বারা ভাল করে বিচার করা—তৃতীয় কতকগুলি সংকেত দ্বারা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যেমন—বার্ব্বারা সেলাবেণ্ট, ডারি, ফেরিও, বাবালিপটন্ ইত্যাদি।

জুদঁ্যা। কি বিশ্রী কটমটে কথাগুলো। ও সব আমার পোষাবে না। ও ছাড়া আর কোন ভাল জিনিস শেখা যাক্।

---

* মূলে লাটিন আছে।

শিক্ষক। ধর্ম্মনীতি কি শিখবেন ?

জুর্দ্যাঁ। ধর্ম্মনীতি ?

শিক্ষক। হাঁ।

জুর্দ্যাঁ। এই ধর্ম্মনীতিটা বলে কি ?

শিক্ষক। ধর্ম্মনীতি সুখের বিষয় ব্যাখ্যা করে, মনুষ্যদের রিপু দমন কর্‌তে শিক্ষা দেয় আর—

জুর্দ্যাঁ। না না ও থাক্। আমার মেজাজটা বড় গরম। ধর্ম্ম নীতি হোক্ আর অধর্ম্ম নীতিই হোক, আমার রাগতে ইচ্ছে হলে, খুব রাগ্‌তে ভাল বাসি।

শিক্ষক। ভৌতিক বিদ্যা কি তবে আপনি শিখ্‌তে চান ?

জুর্দ্যাঁ। এই ভৌতিক বিদ্যাটা বলে কি ?

শিক্ষক। ভৌতিক বিদ্যা প্রাকৃতিক পদার্থের মূলতত্ব সকল ব্যাখ্যা করে; পঞ্চভুত, ধাতব পদার্থ খনিজ পদার্থ, প্রস্তর, উদ্ভিদ ও জন্তুদের প্রকৃতি বর্ণনা করে, এবং উল্কা, ইন্দ্রধনু, আলেয়া ধূমকেতু, বিদ্যুৎ, বজ্র বৃষ্টি তুষার, বায়ু ও ঘূর্ণা বায়ু সকলের কারণ নির্ণয় করে।

জুর্দ্যাঁ। ওর ভিতর ভারি গোলমেলে কেত্তন—অনেক হ্যাঙ্গাম।

শিক্ষক। তবে আপনাকে কি শেখাব বলুন ?

জুর্দ্যাঁ। আমাকে বানান শেখান।

শিক্ষ। আচ্ছা বেশ।

জুর্দ্যাঁ। তার পরে, আমাকে পাঁজি দেখ্‌তে শেখাতে হবে কারণ কখন্ চাঁদ ওঠে আর কখন্ চাঁদ ওঠে না আমার সব জান্‌তে হবে।

শিক্ষ। আচ্ছা তাই হোক্। আপনি যা ইচ্ছা কচ্চেন তা শেখাবার জন্য বর্ণের তত্ববিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে। তা হলে পদার্থ সকলের শৃঙ্খলা অনুসারে, বর্ণের প্রকৃতি এবং সেই সকল বর্ণের উচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষা প্রথম আরম্ভ করতে হবে। আর সে বিষয়ে আপনাকে এই বল্‌তে চাই যে, বর্ণ সকল স্বর বর্ণে বিভক্ত—কারণ তাহারা কণ্ঠ স্বর প্রকাশ করে; এবং ব্যঞ্জন বর্ণে বিভক্ত, কারণ তাহারা স্বর বর্ণের সহযোগে উচ্চারিত হয়—এবং কণ্ঠ স্বরের বিভিন্ন উচ্চারণ সূচনা করে। স্বরবর্ণ সবশুদ্ধ পাঁচটি:—আ, এ, ই, ও, উ।

জুর্দ্যাঁ। ও সব আমি বুঝি।

শিক্ষ। মুখ খুব হাঁ ক'রে আ বর্ণটি উচ্চারণ হয়। আ।

জুর্দ্যাঁ। আ—আ—হাঁ।

শিক্ষক। চোয়াল নিচের থেকে উপরে আস্তে আস্তে নিয়ে এলে এ স্বরবর্ণ উচ্চারণ করা যায়; আ—এ।

জুর্দ্যাঁ। আ—এ; আ—এ। ঠিক্। বাঃ! কি চমৎকার!

শিক্ষ। দুটো চোয়াল আরও কাছাকাছি আন্‌লে আর কানের দিকে মুখের দুই কোণ বিস্তৃত কর্‌লে স্বরবর্ণ ই পাওয়া যায়।

জুর্দ্যাঁ। আ—এ—ই—ই, ই, ই। এ কথা ঠিক্। বিদ্যাকে বলিহারি!

শিক্ষ। চোয়াল দুটো খুলে ঠোঁটের দুই কোন কাছাকাছি আন্‌লে স্বর বর্ণ ও পাওয়া যায়:—ও।

জুর্দ্যাঁ। ও, খুব ঠিক্ঃ আ, এ, ই, ও, ই, ও। বড় চমৎকার! ই, ও, ই, ও।

শিক্ষ। ও (O) যেমন গোলাকার, ও উচ্চারণ করবার সময়ে ঠোঁটের ফাঁক্ একটি ছোট গোল হয়ে ওঠে।

জুর্দ্যাঁ। ও, ও, ও, ঠিক্ বলেছ। আ! সব বিষয়ে কিছু জানা-শুনো থাকা বড় ভাল।

শিক্ষক। দুই পাটি দাঁত একেবারে যোগ না করে কাছাকাছি এনে আর বাহিরের দিকে ঠোঁট্ দুটো লম্বা ক'রে দিলে, উ বর্ণটি উচ্চারণ হয়। উ।

জুর্দ্যাঁ। উ, উ। ওর চেয়ে আর সত্যি কিছু হতে পারে না। উ।

শিক্ষ। যেন ভেংচোচ্চো, এই রকম ভাবে ঠোঁট দুটো লম্বা করতে হয়। এ থেকে এই পাওয়া যাচ্চে যখন আপনার কাউকে ভেম্‌চোবার দরকার হবে, তখন তাকে উ বল্লেই হবে।

জুর্দ্যাঁ। উ, উ, তা ঠিক্ কথা। আঃ এসব জান্‌বার জন্য কেন আরও আগে শিখ্‌তে আরম্ভ করি নি।

শিক্ষ। কাল ব্যঞ্জন বর্ণের বিষয় দেখা যাবে।

জুর্দ্যাঁ। সে সবগুলও কি এই রকম মজার?

শিক্ষ। তার সন্দেহ নেই। তার দৃষ্টান্ত ড। উপরের পাটি দাঁতের উপরে জীবের আগা দিলে এই ড বর্ণ উচ্চারণ হয়। ড।

জুর্দ্যাঁ। ড, ড, হাঁ, বা বাঃ বেশ জিনিস! বেশ জিনিস্!

শিক্ষা। নীচের ঠোঁটের উপর উপরের দাঁত সকল ভর দিলে ফ এই ব্যঞ্জন বর্ণ টি পাওয়া যায়। ফ।

জুর্দ্যাঁ। ফ, ফ। ঠিক কথা। আ! মা বাপ্! তোমাদের উপর কি রাগই ধর্‌চে।

শিক্ষক। আর, জিবের আগা তালু পর্য্যন্ত নিয়ে গেলে র'এই বর্ণটা পাওয়া যায়।

জুর্দ্যাঁ। র—র-র-র। ঠিক্ কথা! আহা আপনি কি বিদ্বান্, আর আমি যে কতটা সময় হারিয়েছি তার ঠিক নেই। র—র—র—র।

শিক্ষক। এই সব চীজ ভাল ক'রে আপনাকে শিখিয়ে দেব।

জুর্দ্যাঁ। আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আছে। একটি গোপনীয় কথা বিশ্বাস করে আপনার কাছে বল্‌চি। এক জন বড় লোকের মেয়েব সঙ্গে আমার ভাল বাসা হয়েছে। আমি তাঁর পদতলে একটি প্রেম-লিপি পাঠাতে চাই। আপনি যদি সেই চিঠি লিখ্‌তে আমাকে সাহায্য করেন।

শিক্ষ। আচ্ছা বেশ।

জুর্দ্যাঁ। তাহলে রসিক লোকের মত কাজ করা হয় না?

শিক্ষ। তা সত্য। আপনি কি তাঁকে পদ্য লিখ্‌তে ইচ্ছে করেন?

জুর্দ্যাঁ। না না—পদ্য না।

শিক্ষ। তবে কি খালি গদ্য?

জুর্দ্যাঁ। না আমি গদ্যও লিখ্‌তে চাইনে, পদ্যও লিখ্‌তে চাই নে।

শিক্ষক। হয় পদ্য হবে, নয় গদ্য হবে এদুটের একটাও হবে না তা তো আর হতে পারে না।

জুর্দ্যাঁ। কেন?

শিক্ষক। মশায় তার কারণ হচ্চে এই যে, ভাব প্রকাশ করতে গেলে হয় পদ্যে নয় গদ্যে প্রকাশ করতে হয়।

জুর্দ্যাঁ। গদ্য আর পদ্য ছাড়া কি তবে আর কিছু নেই?

শিক্ষক। না মশায়। যা গদ্য নয়, তাই পদ্য, আর যা পদ্য নয় তাই গদ্য।

জুর্দ্যাঁ। যখন আমরা কথা কই, তখন সেটা কি?

শিক্ষক। গদ্য।

জুর্দ্যাঁ। কি! যখন আমি বলি, "নিকোল, আমার চটি জুতো নিয়ে এসো, আর আমার রাত্রে পরবার টুপিটা দেও" এটা কি গদ্য হল?

শিক্ষক। হাঁ মশায়।

জুর্দ্যাঁ। মাইরি, আমি চল্লিস বৎসরেরও বেশি গদ্য বোলে আসচি অথচ গদ্য যে কি জিনিস তা আমি কিছুই জানি নে; আর, আপনি আমাকে এ বিষয় শিক্ষা দেওয়াতে আপনার কাছে আমি বড়ই বাধিত আছি। আমি তবে একটি পত্রে তাকে এই লিখতে চাই, "সুন্দরি বেগম, তোমার সুন্দর চোখ্ দেখে, আমি প্রেমে মরে যাচ্চি," এই কথাগুলি আর একটু রসালো ভাবে লিখতে চাই, এই কথাগুল একটু ভাল রকমে বসাতে চাই।

শিক্ষক। এই কথা লিখুন যে তাঁহার নয়নানলে আপনার হৃদয় ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, আর তার জন্য রাত্রি দিন আপনার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্চে।

জুর্দ্যাঁ। না না না—ও সব আমি চাইনে, আমি যে কথা আগে তোমাকে বলেছি আমি কেবল ঐই লিখতে চাই,—"সুন্দরী বেগম, আমি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে ম'রে যাচ্চি।"

শিক্ষক। ঐ কথাটা তো একটু বাড়িয়ে বলা চাই।

জুর্দ্যাঁ। না না! আমি ঐ কথাগুলই চিঠিতে লিখতে চাই কেবল একটু ভাল করে গুচিয়ে বলতে হবে। আচ্ছা দেখা যাক্, তুমি একটু বল দেখি ঐ কথাগুল কত রকম ক'রে বলা যেতে পারে।

শিক্ষক। আপনি যে রকম বলছিলেন, প্রথমতঃ তো সেই রকম করে বলা যেতে পারে "সুন্দরী বেগম, আমি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে ম'রে যাচ্চি।" কিম্বা "প্রেমে ম'রে যাচ্চি সুন্দরী বেগম তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি" কিম্বা "তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে, সুন্দরী বেগম, ম'রে যাচ্চি"—কিম্বা "মরে যাচ্চি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি, প্রেমে।

জুর্দ্যাঁ। কিন্তু এই সকলের মধ্যে কোনটা সকলের চেয়ে ভাল?

শিক্ষক। আপনি যেটা বলেছিলেন; সুন্দরী বেগম, তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি আমি প্রেমে ম'রে যাচ্চি।"

জুর্দ্যাঁ। তবুও দেখ আমি কখন লিখতে

পড়তে চেষ্টা করিনি। প্রথম চোটেই কেমন এটা আমার বেরিয়ে গেছে। আপনাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ, আর আমার এই অনুরোধ কালও আপনি সকাল সকাল আসবেন।

শিক্ষক। তার ব্যত্যয় হবে না।

---

৭ দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ। একজন পেয়াদা।

জুর্দ্যাঁ। (পেয়াদার প্রতি) কি! আমার পোষাক এখনও আসিনি?

পেয়াদা। না, হুজুর।

জুর্দ্যাঁ। আজ আমার কত কাজ আর আজ কিনা লক্ষ্মীছাড়া দর্জিটা আমাকে সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে। আমার ভারি রাগ ধরচে। দর্জিটা জাহান্নমে যাক্—চুলোয় যাক। পাজি দর্জি লক্ষ্মীছাড়া দর্জি হতভাগা দর্জি ছুঁচো দর্জি! হারামজাদাকে যদি এখন একবার পাই—

---

৮ দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ। এক জন কর্ত্তা দর্জি, তার এক জন চাকর দর্জি, জুর্দ্যাঁর পোষাক হস্তে করিয়া এক জন পেয়াদা।

জুর্দ্যাঁ। আঃ এই যে! আমি আর একটু হলেই তোমার উপর রাগ কচ্ছিলুম।

দর্জি। আমি এর চেয়ে আর শীঘ্রির আসতে পারলেম না আপনার এই পোষাক তৈরি করতে আমার ২০ জন ছোগরা লাগিয়েছিলেম।

জুর্দ্যাঁ। তুমি যে রেশমের মোজা পাঠিয়ে দিয়েছিলে তা এত ছোট যে তা আমার পরতে ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল, আর এর মধ্যেই তার দুটো সেলাই খুলে গেছে।

দর্জি। কেন, যত টানবেন ততই তো বাড়ান যায়।

জুর্দ্যাঁ। হাঁ ক্রমাগত যদি সেলাইগুল খুলে যায় তাহলে বটে! আর তুমি আমার যে জুতো তৈরি করিয়ে দিয়েছ সেও এমনি কষা যে ভয়ানক পায়ে লাগে।

দর্জি। না মশায় আদপে লাগে না।

জুর্দ্যাঁ। কি! আদপে লাগে না?

দর্জি। না মহাশয় আপনার পায়ে লাগে না।

জুর্দ্যাঁ। আমি বলচি আমার লাগে।

দর্জি। সে আপনার কল্পনা।

জুর্দ্যাঁ। আমার লাগচে বলেই কল্পনা কচ্চি।

দর্জি। দেখুন সমস্ত রাজ বাড়িতেও এমন সরেশ মানানসই পোষাকের সুট নেই। কাল রং না হয়েও যে এমন ভদ্র রকম কাপড় হতে পারে সে কেবল কারিগরের বাহাদুরি। আর আমি রাজি রাখতে পারি, খুব ভাল ভাল কারিগরেরা দশবার চেষ্টা ক'রে এই রকম পোষাক তৈরি করতে পারে না।

জুর্দ্যাঁ। এ আবার কি? ফুলগুল সব নীচের দিকে মুখ ক'রে রেখেছে দেখচি।

দর্জি। আপনি তো আমাকে বলেন নি যে উপর দিকে মুখ ক'রে রাখতে হবে।

জুর্দ্দ্যা। তা কি আবার বলতে হবে?

দর্জি। বলতে হবে বৈ কি। কেন না, বড় লোকরা সবাই এই রকম প'রে থাকেন।

জুর্দ্দ্যা। বড় লোকেরা এই রকম উলটু ক'রে ফুল পরেন?

দর্জি। হাঁ মশাই।

জুর্দ্দ্যা, ওঃ তবে এ বেশ হয়েছে?

দর্জি। আপনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে উপর দিকে মুখ করে দিতে পারি।

জুর্দ্দ্যা। না—না।

দর্জি। আপনি বোল্লেই করে দিতে পারি।

জুর্দ্দ্যা। না না তা করতে হবে না। যা করেছ বেশ করেছ। তোমার মনে হয় কি? আমার গায়ে বেশ লাগবে তো?

দর্জি। বলেন কি! একজন ছবি ওয়ালাও তুলি দিয়ে এমন ফিট ক'রে পোষাক আঁকতে পারে না। আমার কারখানায় একটি ছোগরা কারিগর আছে তার মত রিন্‌গ্রেব কেউ করতে পারে না—তার ও বিষয়ে ভারি জেহেন্। আর একটি ছোগরা আছে তার মত ডবলেট কেউ বানাতে পারে না—সে বিষয়ে সে অদ্বিতীয়।

জুর্দ্দ্যা। পরচুলো ও পালকগুল কি দস্তুর মত হয়েছে?

দর্জি। সব ঠিক হয়েছে।

জুর্দ্দ্যা। (দর্জির প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আ! আ! দর্জি সাহেব, শেষ বারে তুমি আমাকে যে কাপড়ের কার্ব্বা করে দিয়েছিলে, তোমার গায়েও দেখচি সেই কাপড়! আমি বেশ চিনতে পাচ্চি।

দর্জি। ঐ কাপড়টা আমার এত ভাল লেগেছিল, যে আমার নিজের জন্য ঐ কাপড়ের একসুট তৈরি করেছি।

জুর্দ্দ্যা। কিন্তু আমার কাপড় থেকে তৈরি কম্মটা তোমার উচিত হয় নি!

দর্জি। কোর্ত্তাটা কি পরে দেখবেন?

জুর্দ্দ্যা। হাঁ আমাকে দাও।

দর্জি। একটু সবুর করুন। ও রকম করে পরা দস্তুর না। তালে তালে কাপড় পরাতে হবে ব'লে আমি সঙ্গে করে লোক এনেছি—এসব পোষাক ঘটা ক'রে প'রতে হয়। ওহে! তোমরা এসো সবাই।

---

৯ দৃশ্য।

জুর্দ্দ্যা—হেড দর্জি,. কারিগর দর্জি, নৃত্যকারী কারিগর দর্জি সকল—এক জন পেয়াদা।

হেড-দর্জি। (কারিগরদিগের প্রতি) বড় লোকদের যে রকম করে পোষাক পরাতে হয় সেই রকম করে ওঁকে পোষাক পরিয়ে দাও।

নৃত্যকারীগণের প্রবেশ। (চারি জন কারিগর দর্জি নাচিতে নাচিতে জুর্দ্দ্যার নিকট আগমন—তাহাদিগের মধ্যে দুজন তাঁর কুর্ত্তি করিবার পরে জামা খুলিয়া ফেলিল—আর দুইজন ফতুয়া খুলিয়া লইল;

তার পর নাচিতে নাচিতে তাহার নতুন পোষাক পরাইয়া দিল। জুর্দ্দাঁ তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার পোষাক তাহাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে তাহা ঠিক্ মানান্-সই হইয়াছে কি না)

কারিগর দর্জ্জি। নবাব সাহেব, এই কারিগরদের সরাপ খেতে অনুগ্রহ করে কিছু দিন।

জুর্দ্দাঁ। আমাকে কি বোলে ডাকুলে?

কারিগর দর্জ্জি। নবাব সাহেব।

জুর্দ্দাঁ। নবাব সাহেব, বা! দেখ, বড় লোকদের মত পোষাক পরলে কি হয়! সামান্য লোকের মত যদি চিরকাল কাপড় পরে থাকা যায়, তাহলে একবারও কেই পোঁছে না। নবাব সাহেব। (কিছু টাকা দিয়া) এই নেও, নবাব সাহেব বলবার দরুণ এই দিলুম।

কারিগর। জাঁহাপনা!

জুর্দ্দাঁ। ও! ও! জাঁহাপনা! তুমি একটু দাঁড়াও হে; জাঁহাপনার দরুণ কিছু বকসিস পাওয়া উচিত—জাঁহাপানা বড় কম কথা নয়! এই নেও জাঁহাপানা তোমাকে এই দিলেন।

কারিগর। জাঁহাপানা হজুরালিকে খোদা সেলামৎ রাখুন এই উদ্দেশে আমরা সকলে মিলে সরাপ খাব।

জুর্দ্দাঁ। হজুরালী! ও! ও! ও! সবুর কর; তোমরা চলে যেও না। আমাকে হজুরালী! (মৃদুস্বরে জনান্তিকে) মাইরি, যদি বাদ্‌শা পর্য্যন্ত ওঠে, তাহলে তো আমি খোলে-ঝাড়া হয়ে পড়বো। (উচ্চস্বরে) হজুরালীর জন্য এই বকসিস্।

কারিগর। হজুরালীর কি দরাজ হাত—আমরা সবাই সেলাম ক'রে চল্লুম।

জুর্দ্দাঁ। যাচ্চে বেশ রুচ্চে—আর একটু হলেই আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে ফেলতেম।

---

১০ দৃশ্য।

নৃত্যকারীগণের দ্বিতীয়বার প্রবেশ। চারি জন কারিগর নাচিতে নাচিতে জুর্দ্দাঁর জয় জয়কার করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

দুঃখ আবাহন।

আয় দুঃখ আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন!
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস্ শোষন;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ!
হৃদয়ে আয়রে তুই হৃদয়ের ধন!

যখনি হইবি শ্রান্ত বুকেতে রাখিস্ মাথা!
সে বিছানা সুকোমল শিরায় শিরায় গাঁথা!

সুখেতে ঘুমাস্ তুই
হৃদয়ের নীড়ে ;
অতি গুরুভার তুই—
দুয়েকটি শিরা তাহে যাবে বুঝি ছিঁড়ে
যাক্ ছিঁড়ে !

জননীর স্নেহে তোরে করিব বহন,
দুর্ব্বল বুকের পরে করিব ধারণ,
একেলা বসিয়া ঘরে অবিরল এক স্বরে
গাব তোর কানে কানে ঘুম পাড়াবার গান !
মুদিয়া আসিবে তোর শ্রান্ত দুনয়ান !
প্রাণের ভিতর হোতে উঠিয়া নিশ্বাস
শ্রান্ত কপালেতে তোর করিবে বাতাস,
সুখেতে ঘুমাস্ !

আয় দুঃখ আয় তুই !
ব্যাকুল এ হিয়া !
দুই হাতে মুখ চাপি
হৃদয়ের ভূমি পরে
পড়্ আছাড়িয়া।
সমস্ত হৃদয় ব্যাপি
এক বার উচ্চ স্বরে
অনাথ শিশুর মত উঠরে কাঁদিয়া !
প্রাণের মর্ম্মের কাছে
একটি যে ভাঙ্গা বাদ্য আছে,
দুই হাতে তুলে নেরে
সবলে বাজায়ে দেরে,
নিতান্ত উন্মাদ সম
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্।

ভাঙ্গেত ভাঙ্গিবে বাদ্য,
ছেঁড়েত ছিঁড়িবে তন্ত্রী,
নেরে তবে তুলে নেরে,
সবলে বাজায়ে দেরে,
নিতান্ত উন্মাদ সম
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ !

দারুণ আহত হোয়ে দারুণ শব্দের ঘায়
যত আছে প্রতিধ্বনি
বিষম প্রমাদ গনি
একেবারে সমস্বরে
কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রনায়,
দুঃখ, তুই, আয় তুই আয় !

নিতান্ত একেলা এ হৃদয় !
কেহ নাই যারে ডেকে দুটি কথা কয় !
আর কিছু নয়,
কাছে আয় একবার, তুলে ধর্ মুখ তার,
মুখে তার আঁখি দুটি রাখ !
এক দৃষ্টে চেয়ে শুধু থাক্ !
আর কিছু নয়—
নিরালয় এ হৃদয়—
শুধু এক সহচর চায় !
তুই দুঃখ, তুই কাছে আয় !
কহিতে না চাস্ যদি
ব'সে থাক্ নিরবধি
হৃদয়ের পাশে দিন রাতি,

যখনি খেলাতে চাস্, হৃদয়ের কাছে যাস্
হৃদয় আমার চায় খেলাবার সাথী !—

যখনি খেলাতে চাস্ প্রাণের প্রান্তরে যাস্,
সেথায় ভস্মের স্তূপ আছে ;
মিলি তোরা দুই ভাই, ফুঁ দিয়ে উড়াস্ ছাই
সতত থাকিস্ কাছে কাছে।

সহসা দেখিতে যদি পাস্
দগ্ধ-শেষ অস্থি রাশ রাশ,
তাই দিয়ে খেলেনা গড়িস্,
তাই নিয়ে হাসিস্ কাঁদিস্!
প্রাণের যেথায়
অলক্ষ্যেতে শোণিতের ফল্গু ব'হে যায়,
যাস্ রে সেথায়,
খুঁড়িস বালুকা-রাশি অস্থি খণ্ড দিয়া
শোণিত উঠিবে উথলিয়া!
লোয়ে সে শোণিত ধারা মিশায়ে ভস্মের স্তূপে
গড়িস ভস্মের ঘর,
গড়িস ভস্মের নর,
গড়িস্ খেলানা নানারূপে!
তাই নিয়ে ভাঙ্গিস গড়িস,
তাই নিয়ে খেলানা করিস,
অস্থি, আর ভস্ম, আর হৃদয় শোণিত ধার,
তাই নিয়ে খেলেনা গড়িস,
দুই ভায়ে সতত খেলিস!

দুঃখ, তুই আয় মোর কাছে!
তুই ছাড়া কে আমার আছে!
প্রমোদে হোয়েছি আমি শ্রান্ত অতিশয়,
পারিনে হাসিতে আর কঙ্কালের হাসি,
মাংসহীন অস্থিদন্ত ময়!
শুধু হাসি, শুধু হাসি, আর কিছু নয়!
বেশ ছিনু বেশ ছিনু আগে,
যৌবনের কুঞ্জবন দহি দহি অনুক্ষণ
শুকায়ে আসিয়াছিল জ্বলন্ত নিদাঘে,
মাঝেতে বহিল কেন বসন্তের বায়
শুষ্ক কুঞ্জবনে?
রাশি রাশি শুষ্ক পাতা শুষ্ক শাখা যত
মাতি উঠি বসন্ত পবনে
ঝর ঝর ঝর ঝরে ভাঙ্গা কণ্ঠ স্বরে
উচ্ছ্বাসিল প্রমোদের গান,
সহসা স্বপন টুটে প্রতিধ্বনি এল ছুটে
প্রাণের চৌদিক হোতে,দেখিবারে শুধাইতে
"শুষ্ক কুঞ্জ-বনান্তরে
কত—কত দিন পরে
কে এলরে কে এলরে কে ধরিল তান!
পাতায় পাতায় মিলি
শাখায় শাখায় মিলি
ধোরেছিল গান!
সে কি ভাল লাগে?
শুকান' পাতার স্বর শুকান' শাখার গান
সে কি ভাল লাগে?
তাই এ হৃদয় ভিক্ষা মাগে
বরষা হওগো উপনীত!
ঝর ঝর অবিরল ঝরিয়া পড়ুক জল
শুনি ব'সে অশ্রুর সঙ্গীত!
আয় দুঃখ হৃদয়ের ধন,
এই হেথা পেতেছি আসন!
প্রাণের মর্ম্মের কাছে
এখনো যা' রক্ত আছে
তাই তুই করিস্ শোষন?

ভূ-পঞ্জর।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রথম যুগের শেষ ভাগে পৃথিবীর অধিকাংশই জলমগ্ন ছিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী সময়োৎপন্ন স্কটল্যাণ্ড, উত্তররুষ ও স্কান্‌ডিনেবিয়াকে উত্তরে রাখিয়া পারমিয়ান অন্তরযুগের য়ুরোপীয় সমুদ্র একদিকে আয়ারল্যাণ্ড হইতে ইয়ুরেল পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং সম্ভবতঃ স্পিটজ্‌বার্জেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্য ভাগে সম্ভবতঃ পিরিনীসের উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ফ্রান্সের মধ্যদেশ লইয়া একটি দ্বীপ, আধুনিক ব্রিটনি লইয়া আর একটি দ্বীপ, এবং পাঃদে ক্যালে ও ভুনর প্রদেশ হইতে রাইন নদীর বিপরীত কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেলজিয়াম আর ইংলণ্ডে রথ অন্তরীপ হইতে ল্যাণ্ডস্‌ এণ্ড অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডই, এ সময়ে য়ুরোপের স্থলভাগ।

ভারতবর্ষে বাঙ্গলার কতকাংশ, বুন্দেলখণ্ড, আরাবলি পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ, ছোটনাগপুর প্রভৃতি ব্যতীতও পঞ্জাব, সিকিম, ভুটান ও কাশ্মীরের কতকাংশ এবং ব্রহ্মদেশের মুলমেন প্রদেশ—পারমিয়ান অন্তর যুগে বর্ত্তমান ছিল, সুতরাং য়ুরোপে ও ভারতবর্ষে এই সকল দেশই কেবল দ্বিতীয় যুগের প্রারম্ভ দেখিয়াছে।

জীবদিগের মধ্যে কাঁকড়াও মৎস্যই যেমন প্রথম যুগে প্রধান, তেমনি দ্বিতীয় যুগে সরীসৃপই প্রধান জীব। এই নিমিত্ত প্রথম যুগকে মৎস্যের এবং দ্বিতীয় যুগকে সরীসৃপের যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগের আশ্চর্য্যরূপ বৃহদায়তন অসংখ্য সরীসৃপ দেখিলে মনে হয় ইহারাই এ সময়ের রাজা। জীবরাজত্বের প্রভাব বৃদ্ধি হেতু এ সময়ে উদ্ভিদরাজ্যের প্রাধান্য হ্রাস হইয়া ছিল। ভূবেত্তাগণ দ্বিতীয় যুগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

১। ত্রিস্তর বা নূতন লোহিত প্রস্তর অন্তরযুগ। (Triassic or new red period)

২। জুরাসিক অন্তরযুগ (Jurassic)

৩। চাখড়ি বা ক্রিটেসস্‌ অন্তরযুগ (Cretaceous)

ত্রিস্তর অন্তরযুগ।
(Triassic)

এই অন্তর যুগের মৃত্তিকা তিন স্তর বিশিষ্ট বলিয়া ভূবেত্তাগণ ইহার ত্রিস্তর নাম দিয়াছেন।

ইহার সর্ব্বনিম্নভাগ নূতন লোহিত প্রস্তর স্তর, মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ চুনে প্রস্তর ও শেষ অর্থাৎ সর্ব্বোপরিভাগ লোণা বেলে প্রস্তর স্তরে নির্ম্মিত। এই অন্তর যুগের প্রথম অর্থাৎ লোহিত প্রস্তর স্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বাহুপদী ও রক্তকপদী শম্বুক, গেনইড ও প্লাকইড মৎস্য অল্পই পাওয়া যায়।

এখন জীবজগতের পরিবর্ত্তনের স-

হিত উদ্ভিদেরও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। যে সকল বৃক্ষ ও লতা অঙ্গারজনক যুগে বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাদের স্থান এখন অন্য জাতি আসিয়া গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের উদ্ভিদ এখন অল্প সংখ্যক, কেবল ঝাউ জাতীয় বৃক্ষই (Conifer) কিছু অধিক।

কতক পুরাতন জীবজাতির এসময় যেমন লোপ পাইয়াছে তেমনি অসংখ্য অসংখ্য নূতন জাতীয় জীব তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই অন্তর যুগের লোহিত প্রস্তর স্তর সংস্থিতির সময়ে কচ্ছপের প্রথম জন্ম ও এই সময় হইতেই সরীসৃপ-দিগের আধিপত্য আরম্ভ।

পরে কৃষ্ণবর্ণ চুনে প্রস্তর স্তর সংস্থিতি হইবার সময়ে সমুদ্রে অসংখ্য নূতন শম্বুক জাতীয় জীব ও কচ্ছপ, বার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সরীসৃপ এবং কঠিন আচ্ছাদন বিশিষ্ট ছয় প্রকার নূতন মৎস্য উৎপন্ন হয়। উত্তর আমেরিকার কনেকটিকাট নদীর লোণা বেলে পাথর স্তরে উষ্ট্র পক্ষীর মত বৃহৎ পক্ষীর তিনটি পদাঙ্গুল চিহ্ন দেখিয়া এই সময়েই প্রথম পক্ষীর আবির্ভাব অনুমান করা হয়। কিন্তু পক্ষীর কঙ্কাল না পাওয়াতে অনুমান ছাড়া ইহার অন্য প্রমাণ নাই। এ সময়ের মৃত্তিকাতে অনেক প্রকার সরীসৃপের পদ চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ভেকজাতীয় (Cheirotherium of Labyrinthodon) একরূপ সরীসৃপ অত্যন্ত অদ্ভুত আকার। এই সময়ে অন্য একরূপ বৃহদায়তন অদ্ভুত কুম্ভীর (Nothosaurus) জন্মিয়া ইহার পরবর্ত্তী কালে আরো বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

হ্রদ-শুষ্ক ভিজা মাটিতেই, এই সকল সরীসৃপের পদচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। জোয়ারের জল সরিয়া যে মাটী ভিজা থাকে তাহাতে কোন চিহ্ন নিবদ্ধ রহিতে পারে না, অঙ্কিত চিহ্ন আবার জোয়ার আসিলেই ধৌত হইয়া যায়। আমেরিকার লোণা হ্রদের শুষ্কতটে এখনো এইরূপ চিহ্ন নিবদ্ধ হইতে দেখা যায়।

দ্বিকোষক মুক্তবীজ বৃক্ষ জাতি (Dicotyledonous Gymnosperm) এই সময়েই প্রথম উৎপন্ন। এ সময়ের জঙ্গল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ঝাউ বৃক্ষ এবং পর্ণীতরু ও ক্যালেমাইট শর গাছ দ্বারাই পূর্ণ।

লোণা বেলেমাটীর স্তর কৃষ্ণবর্ণ চুনে প্রস্তর স্তরের পরবর্ত্তী। এই মৃত্তিকাতে যে বহুল পরিমাণে লবণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয়ই সমুদ্রের জলীয় ভাগ বাষ্পাকারে উঠিয়া যাইলে অবশিষ্ট লবণাদি পদার্থ এই সকল স্তরে জমাট রহিয়াছে। সিন্ধু নদের ব-দ্বীপের সন্নিকটস্থ একটি স্থানে এখনো এই রূপে লবণ সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। কচ্ছরন্ ঠিক সমুদ্রও নহে, শুষ্ক স্থলও নহে। গ্রীষ্ম কালে এ স্থানের জল শুকাইয়া স্তরে স্তরে লবণ জমিতে থাকে, বৎসরের অপর সময়ে আবার ইহা জলে আবৃত হয়। একবার সমুদ্রের কার্য্য দ্বারা এই ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিক বালুকার প্রাচীরে বদ্ধ হইলে ইহা আর সর্ব্বদা জলপ্লাবিত হইবে না।

সেই সময় সমস্ত আবদ্ধ জল শুষ্ক হইয়া লবণস্তর নির্ম্মিত হইতে থাকিবে। পরে সময়ে সময়ে সমুদ্র-জল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আবার নূতন স্তরের উপকরণ যোগাইবে। ত্রিস্তরের লোণা বেলেমাটীর স্তরও উপরোক্ত প্রকারে উৎপন্ন। এই স্তরের অতি অল্প স্থানেই প্রাণী-চিহ্ন পাওয়া যায়—তাহাও কোন নূতন জাতির নহে। এই সময়ে বৃহৎ হ্রদবেষ্টিত দ্বীপ উপদ্বীপে মাঝে মাঝে দুই চারিটি পর্ব্বতও দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্র-কূলে উদ্ভিদের অভাব নাই, সেই উদ্ভিদাবশেষ এখনো অপর্য্যাপ্ত। লোণাস্তরের উদ্ভিদ অনেকটা পরবর্ত্তী অন্তর যুগের ন্যায়।

কটক হইতে ত্রিরুঞ্চিনাপল্লী এবং পুনা হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে ত্রিস্তর যুগের প্রস্তর পাওয়া যায় বলিয়া ভূবেত্তাগণ ঠিক করিয়াছেন ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যের উভয় পার্শ্বস্থ সমুদ্র উপকূল এই সময়ে উৎপন্ন। এই সময়ে সিকিম ও ভুটান লইয়া প্রায় চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল।

জুরাসিক অন্তরযুগ।

এই যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং ত্রিস্তর অন্তর যুগের অব্যবহিত পরে উভয়ের মধ্যে আর একটি মৃত্তিকাস্তর পাওয়া যায়। ইহা দুই যুগের কোন যুগেরি অন্তর্গত নহে। এই স্তর অতি অল্পই গভীর বলিয়া ইহার আর বিশেষ বিবরণের আবশ্যক বোধ হইল না, ভূবেত্তারা ইহাকে রিটিক অথবা পেনার্থ গর্ভযুগ বলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে জুরাসিক অন্তরযুগ একটি প্রধান। ফ্রান্সের জুরা নামক পর্ব্বতশ্রেণী এই যুগের মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া এই যুগের নাম জুরাসিক হইয়াছে। জুরাসিক যুগ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। লায়াস—অর্থাৎ কর্দ্দমময় চুনস্তর, এবং ওয়োলাইট অর্থাৎ ডিম্বাকার প্রস্তর-স্তর। এই দুই রূপ বিভাগ জুরা পর্ব্বতে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এই দুই ভাগে জুরাযুগকে ভাগ করা গিয়াছে। জুরাসিক যুগের উদ্ভিদ ও জীব সমূহে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

পূর্ব্ব সময়ের অনেক জাতীয় জীব এ যুগে লোপ পাইয়া নূতন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। ৪০০০ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন নূতন জাতীয় জীব এসময়ে উৎপন্ন। দানাদার চুণে পাথর ও চুণযুক্ত বেলে-কর্দ্দম দ্বারা জুরা যুগের প্রথম স্তর লায়াস মৃত্তিকা নির্ম্মিত। লায়াস গর্ভযুগ আবার দুই তিনটি স্তর-বিশিষ্ট। প্রত্যেক স্তরে মৃত্তিকার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

আমোনাইট* ও বেলেম্‌নাইট† নামক শম্বুক এবং ঝিনুক এই সময়ের সমুদ্রে প্রচুর। অনেক প্রকার নূতন জাতীয় শম্বুক, মৎস্য, পুরুভুজ, ঝিনুক প্রভৃতি সামুদ্রিক জীব ব্যতীত, অসংখ্য অদ্ভুদাকার সরীসৃপ

* অর্থাৎ মেষশৃঙ্গের ন্যায় বক্রাকার।

† অর্থাৎ তীরবৎ সূক্ষ্মাগ্র।

এই সময়ে উৎপন্ন। এই অদ্ভুত সরীসৃপদিগের মধ্যে তিনটি প্রধান। এক প্রকার সরীসৃপের (Ichthyosaurus) শরীর বড় আশ্চর্য্য রূপে নির্ম্মিত; এখনকার ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ইহাতে সন্নিবেশিত দেখা যায়। ইহার মস্তক কৃকলাসের ন্যায়, দন্ত কুম্ভীরের ন্যায়, শরীর ও লেজ চতুষ্পদ জীবের ন্যায়, অস্থি গ্রন্থি (Vertebra) মৎস্যের ন্যায় এবং পাখনা তিমি মৎস্যের ন্যায়।

ইংলণ্ডের লাইম রিজিস নামক স্থানে মেরি অ্যানিং নামক একটি গ্রাম্য বালিকা তৎস্থানীয় পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর কঙ্কাল আনিয়া বিক্রয় করিত। সে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে জীব-কঙ্কাল খুজিতে খুজিতে প্রস্তরের মধ্য হইতে নির্গত এক খণ্ড অস্থি দেখিতে পায়, এবং পরীক্ষা দ্বারা ইহা একটা প্রস্তরীভূত প্রকাণ্ড জীবের দেহাবশেষ বুঝিয়া লোক দ্বারা তাহাকে স্থানান্তরিত করে। এ প্রকার প্রকাণ্ড জীব এই রূপে প্রথমে মানুষের নেত্রগোচর হইল। এই অদ্ভুত জীব প্রায় ৩০ ফুট লম্বা। ইহার চোয়াল প্রায় ৬ফুট এবং চক্ষুদ্বয় এক একটা বড় রেকাবীর মত। ইহার চক্ষু দ্বয় এমনি সুন্দর অবস্থায় প্রস্তরীভূত হইয়াছিল যে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাচ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা এমনি হিংস্র-জন্তু যে নিজের জাতিকেই নিজে ভক্ষণ করিত।

দ্বিতীয় প্রকার সরীসৃপ (Plesiosaurus) আরো অদ্ভুত, ইহাও সামুদ্রিক হিংস্র-জন্তু। ইহারও মস্তক কৃকলাসের ন্যায়, দন্ত কুম্ভীরের ন্যায়, কিন্তু ইহার গলা রাজহংসের গলার মত, অথচ লম্বায় অনেক বড়। ইহার পঞ্জর বহুরূপীর ন্যায়, এবং তিমি মৎস্যের পাখনার ন্যায় ইহার চারিটি পাখনা। ইহার দেহ ও লেজ হ্রস্ব বলিয়া দেখিতে ইহা অনেকটা কচ্ছপের ন্যায়। এই সরীসৃপের তুলনার দ্বারা বোধ হয় যে প্রথমোক্তটি গভীর জলবাসী ও শেষোক্তটি কূলের নিকটে থাকিত।

তৃতীয় প্রকার সরীসৃপ (Pterodactylus) কতকটা বাদুড়ের মত, কিন্তু ইহার ঠোঁট কুক্কুটের মত লম্বা, দন্ত কুম্ভীরের ওষ্ঠাগ্রের মত, অস্থি-গ্রন্থি, পঞ্জর ও পদাদি কৃকলাসের মত। ইহার শরীরে ডানা আছে অথচ পক্ষীদিগের পালক কিম্বা বাদুড়ের ন্যায় লোম ছিল না। বাদুড়দিগের ন্যায় ইহাও রাত্রিচর ও পতঙ্গভুক, কিন্তু ইহার শরীরের প্রধান প্রধান অস্থির গঠন সরীসৃপের ন্যায়। এই জন্তুর শারীরিক গঠন দেখিয়া বোধ হয় পক্ষ সত্ত্বেও ইহা উড়িতে পারিত না। এই সকল সরীসৃপ জীবদেহ যেরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাতে ইহারা হঠাৎ কোন বিপ্লবে বিনষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। এই সময়কার উদ্ভিদ ইহার পূর্ব্ব অন্তর যুগের মত কেবল এক জাতীয় নূতন উদ্ভিদ (Cycad) এই যুগে প্রথম জন্মে।

ওয়োলাইট গর্ভ যুগ।

এই গর্ভ যুগের মৃত্তিকা গোল গোল দানা-বিশিষ্ট, সেই নিমিত্ত গ্রীক ভাষায় ইহা উয়োলাইট অর্থাৎ ডিম্বাকৃতি গর্ভ যুগ

অ্যাখ্যাত হইয়াছে। এই যুগের বিশেষ লক্ষণ স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব। স্তন্যপায়ী জীবের সন্তান জীবিত অবস্থায় প্রসূত হয়, অন্য প্রকার জীব অণ্ডজ। সর্ব্ব প্রথমে যে সকল স্তন্যপায়ী জীব জন্মে তাহারা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী। এ প্রকার জীবের সন্তান প্রসূত হইয়া মাতার উদরের নিকটস্থ একটি চর্ম্মের থলিয়ায় অবস্থিতি করে এবং সেইখান হইতে স্তন পান করিয়া বড় হইলে বাহির হয়, যেমন আধুনিক কাঙ্গারু। এইরূপ স্তনাপায়ী জীবকে মারস্যুপিয়াল জাতি (Marsupial) কহে। ওয়োলাইট গর্ভযুগে এই রূপ স্তন্যপায়ী জাতিরই জন্ম হয়। পূর্ব্ব অন্তর যুগের ন্যায় এ যুগেও শম্বুক ঝিনুক ইত্যাদি নানা প্রকার নূতন সামুদ্রিক জীব ও প্রবাল কীট জন্মে। এই যুগেও আবার ৩৪ প্রকার প্রকাণ্ড নূতন সরীসৃপ-কঙ্কাল দেখা যায়। ইহারা অনেকটা আমাদের গাঙ্গেয় কুম্ভীরের মত। ইহার মধ্যে একটি (Cetcosaurus) পঞ্চাশ ফুট লম্বা, এই প্রকাণ্ড তিমি মৎস্যাকার সরীসৃপ দেখিয়া অধ্যাপক ফিলিপস্ বলেন যে ইহার ন্যায় বলবান ও প্রকাণ্ডকায় জীব পৃথিবীতে কখনো জন্মে নাই।

এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নানা প্রকার বৃহৎ আরণ্য বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল।

পূর্ব্ব গর্ভ যুগের ন্যায় এগর্ভ যুগও তিন স্তরে বিভক্ত। ওয়োলাইট যুগের চুনে প্রস্তর কি প্রকারে দানাদার হইয়াছে তাহা এখনো সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় নাই। অনেকে বলেন যেমন এখন টেনেরীফ জগমগ্ন শৈলে এবং ইটালির ত্রিবলির জলপ্রপাতে জল ঘর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকা দানাদার হয়, তেমনি জলের ঘর্ষণ দ্বারাই ওয়োলাইট মৃত্তিকা দানাদার হইয়াছে। কিন্তু যেখানে জলের ঘর্ষণ সম্ভাবনা নাই সেখানেও যখন ঐরূপ মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় তখন বোধ হয়, যেমন অপরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে স্ফাটিক পদার্থের একটি বিশেষ আকৃতি হয় ইহাও সেইরূপ একটি নিয়মের বশবর্ত্তী। এই জুরাসিক যুগ পর্যান্ত পৃথিবী নিয়মিত সমান রূপে শীতল হইয়া আসিতেছিল এবং এখন অবারিত বৃষ্টির প্রাচুর্য্য অনেক কম। পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকার অদ্ভুত জন্তুই এখনকার পৃথিবীর প্রধান অধিবাসী; সমুদ্র শম্বুক বহুল এবং প্রকাণ্ড কচ্ছপে পরিপূর্ণ।

কেবল এক জাতীয় স্তন্যপায়ী জীব মাত্র এখন জন্মিয়াছে, পতঙ্গাদি জীবই শূন্যের অধিপতি, পক্ষী এখনো জন্মায় নাই। ভারতবর্ষে রাজমহল কচ্ছদেশ শ্রীহট্ট ও ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ এই সময় উৎপন্ন।

চাখড়ি বা ক্রিটেসস্ অন্তরযুগ

এই যুগের সমস্ত স্তরই প্রায় চাখড়ি নির্ম্মিত বলিয়া ইহার নাম চাখড়ি অন্তর যুগ। কিন্তু এই সময়েই যে প্রথম পৃথিবীতে চাখড়ি দেখাদেয় এমন নহে, সাইলুরিয়ান অন্তরযুগ হইতে ক্রমাগতই চাখড়ি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু চাখড়ি স্তর সংস্থিতিই এই সময়ের একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া ইহার এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

শম্বুক জাতীয় জীবের কঠিন আচ্ছাদ-

নের উপর উষ্ণ জলের প্রাকৃতিক কার্য্য দ্বারা বহুকাল ধরিয়া সমুদ্রগর্ভে চাখড়ির স্তর জমিতেছিল। পরে কি প্রকারে এই সকল স্তর সমুদ্র-গর্ভ হইতে উন্নমিত হইয়া শৈল-শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে তাহা দেখা যা-উক। এবিষয়ের যথার্থ কারণ এখনো নিশ্চিত রূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে সর চারল্‌স্ লায়েল এবং অধ্যাপক রামজে ইংলণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ চাখড়ি পর্ব্বত উৎপত্তি সম্বন্ধে এই বলেন যে এখনকার গ্রেট ব্রিটন ও তৎ-সন্নিহিত দেশ পুরাকালের কোন এক বৃহৎ মহাদেশের মধ্য দিয়া বহমান প্রকাণ্ড নদীর জলমগ্ন বদ্বীপের অবশেষ মাত্র। জোয়ার ভাটার কার্য্য বশতঃ সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত চাখড়ি, সেই নদীর মোহানায় জমিয়া জমিয়া ক্রমে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত রূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ মহাদেশ য়ুরোপ নহে, উহা এক্ষণে জল-মগ্ন হইয়াছে। লায়েলের মতে উহা আ-মেরিকা কিম্বা আসিয়া অপেক্ষাও বৃহত্তর ছিল; তিনি আরো বলেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ অনেক মহাদেশ বারম্বার জলমগ্ন হইয়াছে। চাখড়ির যে পর্ব্বত গুলি স্থানে স্থানে দেখা যায় তাহা সেই মহাদে-শের চিহ্নাবশেষ মাত্র। এই সময় হইতে পৃথিবীর বর্ত্তমান আকৃতির সূত্রপাত। ফরাসী ভূবেত্তা লিকক বলেন যতই আমরা বর্ত্তমান কালের নিকট আসিতেছি ততই দেখিতে পাই যে মেরুসন্নিহিত প্রদেশে মৃত্তিকা স্তর সংস্থিতি বন্ধ হইয়া মধ্যদেশেই নূতন মৃত্তিকা সংস্থিতি দ্বারা ফুলিয়া উঠিতেছে। এখনকার শীতাতপ প্রধানতঃ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং এখন বৎসরে ঋতুর বিভাগ আরম্ভ হইল। শীতাতপের বৈষম্য হেতু পৃথিবীর উপরি ভাগে কোটীবন্ধ প্রথম উৎপন্ন হইল। এখনকার উদ্ভিদ আমাদের বর্ত্তমান উদ্ভিদের প্রথম সোপান স্বরূপ। এ অন্তর যুগের উদ্ভিদজাতিই ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া আমাদের বর্ত্তমান উদ্ভিদ রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এখন-কার ও তখনকার জীবজন্তুর মধ্যে সেরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় না। তাল জাতীয় বৃক্ষ পৃথিবীতে এই প্রথম উৎপন্ন হইল এবং এই সময়ে উৎপন্ন ওক আক-রোট ও বট বৃক্ষ এখনো পৃথিবীতে বর্ত্তমান। এ সময় পর্ণীতরু খুব কমিয়া আসিয়াছিল। জন্তুর মধ্যে এখন সরীসৃপ প্রধান। এখন প্রকাণ্ড দুই জাতির সরীসৃপ দেখা যায়।

একটি, (Iguanodon) লম্বায় ৫০।৬০ ফুট এবং ইহার দেহ একটি বৃহদাকার হস্তীর ন্যায়। অপরটি ইহা অপেক্ষাও লম্বা। বৈ-জ্ঞানিকমণ্ডলীতে অনেক বাদানুবাদের পর দ্বিতীয়টি (Megalosaurus) সামুদ্রিক সরী-সৃপ বলিয়া স্থির হইয়াছিল। ইহা লম্বে প্রায় ৬০।৭০ ফুট, এবং দেখিতে কতকটা কুম্ভীরের মত।

এই সময়েই প্রথম পক্ষী দেখিতে পা-ওয়া যায়। ভারতবর্ষে নর্ম্মদা প্রদেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সংলগ্ন উপকূল,এই সময়ে উৎপন্ন।

ক্রমশঃ।

শীত

পাখী বলে, আমি চলিলাম;—
ফুল বলে, আমি ফুটিব না;
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
বনে বনে আমি ছুটিব না!
কিশলয় মাথাটী না তুলে
মরিয়া পড়িয়া গেল ঝরি,
সায়াহ্ন, ধূমল-ঘন বাস
টানি দিল মুখের উপরি।
নিশীথিনী বাষ্পময় আঁখি
চোখেতে দেখিতে নাহি পায়;
হিমানীর মৃত কোলে শুয়ে
জোছনা সে আড়ষ্টের প্রায়।

পাখী কেন গেলগো চলিয়া?
কেন, ফুল, কেন সে ফুটেনা?
চপল মলয় সমীরণ
বনে বনে কেন সে ছুটেনা?
শীতের হৃদয় গেছে চোলে,
অসাড় হ'য়েছে তার মন,
ত্রিবলী-বলিত তার ভাল
কঠোর জ্ঞানের নিকেতন।
প্রেম নাই, দয়া নাই তার,
নীরস বৈরাগ্য শুধু আছে,
ফুল তার ভাল নাহি লাগে,
কবিতা নিরর্থ তার কাছে!
সে চায় বালক সমীরণ
সম্ভ্রমে দাঁড়ায়ে রবে দীন,
জোছনার হাসি-মুখ হ'তে
হাসিরাশি হইবে বিলীন।
সে কাহারো সঙ্গ নাহি চায়,
একেলা করিতে চায় বাস।
চায় সে একেলা বসি বসি
ফেলিবেক শীতল নিশ্বাস।
জোছনার যৌবনের হাসি,
ফুলের যৌবন-পরিমল,
মলয়ের বাল্যখেলা যত,
পল্লবের বাল্য-কোলাহল,
সকলি সে মনে করে পাপ,
মনে করে প্রকৃতির ভ্রম,
ছবির মতন ব'সে থাকা
সেই জানে জ্ঞানীর ধরম।
তাই পাখী বলে, চলিলাম;
ফুল বলে, আমি ফুটিব না;
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
বনে বনে আমি ছুটিব না।
আশা বলে, বসন্ত আসিবে,
ফুল বলে, আমিও আসিব,
পাখী বলে, আমিও গাহিব,
চাঁদ বলে, আমিও হাসিব।

বসন্তের নবীন হৃদয়
নূতন উঠেছে আঁখি মেলে,
যাহা দেখে তাই দেখে হাসে,
যাহা পায় তাই নিয়ে খেলে।

মনে তার শত আশা জাগে,
কি যে চায় আপনি না বুঝে,
প্রাণ তার দশ দিকে ধায়
প্রাণের মানুষ খুঁজে খুঁজে।
ফুল-শিশু দেখিলে পাতায়
বসিয়া দুলায় তারে কোলে,
যখনি চাঁদের মুখ দেখে
তখনি হরষে যায় গোলে।
দখিনা-বাতাস বহিলেই
অমনি সে খুলে দেয় বুক,
খোলা-মন ভোলা-মন তার
মুখ দেখে দূরে ধায় দুখ।
ফুল ফুটে তারো মুখ ফুটে;
পাখী গায় সেও গান গায়;
বাতাস বুকের কাছে এলে
গলা ধ'রে দুজনে খেলায়।
প্রণয়ে হৃদয় তার ভরা,
বড়ই করুণ তার মন,
কেমন সুধীরে চুম'খায়
ফুলগুলি ঘুমায় যখন!
অতি মৃদু কথাগুলি কয়,
ফুলের মাথাটি লয়ে কোলে,
চুপি চুপি কি কহে কেজানে
কানেতে স্বপন দিবে বোলে?
তাই শুনি, বসন্ত আসিবে,
ফুল বলে,আমিও আসিব;
পাখী বলে, আমিও গাহিব;
চাঁদ বলে আমিও হাসিব!

শীত তুমি হেথা কেন এলে?
উত্তরে তোমার দেশ আছে,
পাখী সেথা নাহি গাহে গান,
ফুল সেথা নাহি ফুটে গাছে।
সকলি তুষার-মরুময়,
সকলি আঁধার জনহীন,
সেথায় একেলা বসি বসি
জ্ঞানীগো কাটায়ো তব দিন!
এযে হেথা কবিতার দেশ,
হেথা কেন তব আগমন,
হেথায় যে ফুল ফুটে গাছে,
হেথায় যে বহে সমীরণ,
হেথায় সকলি অনুরাগ—
হেথায় বৈরাগ্য কিছু নাই,
তুমিগো দারুণ জ্ঞানবান—
হেথায় তোমারে নাহি চাই!

লক্ষ্মণসেন-প্রদত্ত সুন্দরবনের তাম্রশাসন।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল সুন্দর বনের কোন এক লাটে মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের এক খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মার্সমান সাহেব স্বপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। অল্পকাল অতীত হইল

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ শাসন-পত্রের একখণ্ড ভ্রমসঙ্কুল প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন ১ এবং ভ্রমপ্রমাদের দায় অন্যের শিরে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং পরিত্রাণের চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি বলেন—"আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও সে তাম্রশাসন খানি আর একবার হস্তগত করিতে পারিলাম না। মজিলপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দত্ত মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে উহার একটী প্রতিলিপি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, গ্রন্থের শেষ ভাগে তাহা অবিকল মুদ্রিত করিলাম। ত্রিবেণীর মৃত হলধর চূড়ামনি মহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ঐ সনন্দের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন,তিনিও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেন নাই।"

'মিত্রোদয়' সম্পাদক বাবু হিরন্ময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ঐ সনন্দের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছেন। ২ তিনি বলেন—"ঐ তাম্রফলকের প্রতিলিপি আমার নিকট আছে। কিন্তু তাহাতে এত ভুল যে তাহা আদ্যোপান্ত মুদ্রিত করা যায় না।"

সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয় "যৎ দৃষ্টম্ তৎ প্রকাশিতম্" মাত্র করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন দানপত্রের প্রতিলিপি আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাহা সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করাই উচিত ছিল। বোধ হয় একটু পরিশ্রম করিলেই তিনি তাহা সংশোধন করিতে পারিতেন। ১৮৭৩ খৃস্টাব্দের অন্তভাগে দিনাজপুরের অন্তর্গত তর্পণদীঘির সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে "পরমেশ্বর পরম বৈষ্ণব পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব" প্রদত্ত আর এক খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই তাম্র শাসনের প্রতিলিপি (Photozincograph.) দৃষ্টে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত-সুন্দরবনে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি সংশোধন করিয়া অদ্য আমরা পাঠকদিগকে উপহার অর্পণ করিলাম।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর তর্পণদীঘির তাম্রফলকের বিবরণ ও মন্তব্য প্রতিলিপির সহিত ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সুসাইটির জর্ণালে মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদিগের ন্যায় সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু অন্যান্য দুই চারিখানি প্রাচীন শাসন দর্শন করিয়া তিনি অনায়াসে যে সকল বাক্য সংশোধন করিতেন তাহাতেও হস্তক্ষেপ করেন নাই। "চট্ট ভট্টের" ৩ স্থলে

---

১ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় ভাগ, ৩৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

২ মিত্রোদয়, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

৩ পাল ও সেনরাজগণের প্রায় সমস্ত শাসন-পত্রে "চট্টভট্ট" জাতির উল্লেখ আছে। দেব পালদেব-প্রদত্ত মুঙ্গেরের শাসনপত্রের অনুবাদক উইলকিন্স সাহেব 'লাষ্ট, ভট্ট';—নারায়ণ পাল প্রদত্ত ভাগলপুরের তাম্রফলক হইতে শ্রদ্ধাস্পদ মিত্র মহোদয় 'চাট, ভট,'—কেশবসেন-প্রদত্ত তাম্রশাসনের পণ্ডিত গোবিন্দরাম যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে "চণ্ড ভণ্ড"

স্ফুরি দ্রায়ুধং বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরো-মালাবলাকাবলিঃ। ধ্যানাভ্যাসসমীরণো-পনিহিতঃ শ্রেয়ো স্কুরোন্তুতয়ে ভুয়াদ্বঃ সভ-বার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ॥ ১

আনন্দোম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখ-চ্ছিদাত্যন্তিকী কহ্লারেহতমোহতোরতিপ-তাবেকোহমেবেতিধীঃ। যস্যামী অমৃতা-ত্মনঃ সন্তুদয়ন্ত্যাশুপ্রকাশার্জ্জগত্যন্ত্রেধ্যানপ-রম্পরাপরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাম্বুদে॥ ২

সেবাবনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচিরম্বুল্লসত পদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ। তেজোবিষজ্বরমুষো দ্বিষতামভূবন্ ভূমীভুজঃস্ফুটমথোষধিনাথ-বংশে॥ ৩ ॥ ৯

আকৌমারবিকস্বরৈর্দ্দিশি দিশি প্র-স্যন্দিভির্দ্দোর্যশঃপ্রালেয়ৈররিরাজবক্তুনলিন-ম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্। হেমন্তঃ স্ফুটমেয় সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবলী শালিশ্লাঘ্যবি-পাকপীবরগুণস্তেষামভূদ্বংশজঃ॥৪ ॥

যদীযৈরদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃ সহচরৈ র্যশোভিঃ শোভন্তে পরি ১০ ধি পরিণদ্ধা ইব দিশঃ। ততঃ কাঞ্চীলীলাচতুরচতুরম্ভোধিল-হরী পরীতোর্ব্বীভর্ত্তাজনিবিজয়সেনঃ স বি জয়ী॥ ৫ ॥

প্রত্যহঃ কলিসম্পদামনলসোবেদায় নৈকাধ্বগঃ সঙ্গামঃ শ্রিতজঙ্গমাকৃতিরভূদ্ব-ল্লালসেন স্তুতঃ। যশ্চেতোময়মেব শৌর্য্য-বিজয়ী দস্বোষধং তৎক্ষণাদক্ষীণা রচয়াংচ-কার বশগাঃ স্বস্মিন পরেষাং শ্রিয়ঃ॥ ৬ ॥

সংভুক্তানাদিগঙ্গনাগণগুণাভোগপ্রলো-ভাদ্দিশা মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিতস্তত্তৎ প্রভাব স্ফুটৈঃ। দোরুষ্মক্ষপিতারিসঙ্গর-রসোরাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতি-রতঃ সৌজন্যসীমাজনি॥ ৭ ॥

শশ্বদ্বন্ধভয়াদ্বিমুক্তবিষয়াস্তস্মাত্রনিষ্ঠীকৃত স্বান্তা যাস্ত কথং ন নাম রিপবস্তস্য প্রয়ো-গাল্লয়ম। যৈরাত্মপ্রতিবিম্বিতেপি নিপত প (বা থ) ত্রেপিচক্ষত্তৃণে যদ্দৈতেন যতস্ত-তোপিস পরো দেবঃ পরংবীক্ষতে॥ ৮ ॥ ১১

কিন্তু শুনিয়াছি গড়োলীদিগের বংশাবলী এইক্ষণও তৎপ্রদেশে বাস কবিতেছে।

৯ তৃতীয় শ্লোকের প্রথম পংক্তির ল্ল ও দ্বিতীয় পংক্তির থো,এই দুইটী অক্ষর তাম্রফলকে সমভাবে উর্দ্ধ ও নিম্নে (যথা ল্লথো) অবস্থিত। মূর্খ শিল্পী ভ্রমক্রমে "ল্ল" এর 'ল' ফল টি "ল" হইতে পৃথক করিয়া 'থো' এর মস্তকে স্থাপন করিয়াছে। বোধ হয় এই সামান্য ভ্রম অনুভব করিতে না পারিয়া স্বর্গগত চূড়ামনি মহাশয় "থো" এর পরিবর্ত্তে "থৌ"—তদনুসারে "ঔষধনাথ বংশ" পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ 'ধি' এর "ি" টি ও বিসর্জ্জন করা হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত প্রতিলিপিতে 'ওষধিনাথ' এর পরিবর্ত্তে 'ঔষধনাথ' মুদ্রিত হইয়াছে।

যে সকল উদ্ভিদ ফল পাকিলেই মরিয়া যায় তাহাদিগকে "ওষধি" বলা যায়, যথা ধান্য। ওষধি সকল চন্দ্রকিরণে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া, চন্দ্র 'ওষধীশ' "ওষধিপতি" ও— "ওষধিনাথ" প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই-য়াছেন। সেনরাজগণ, আপনাদিগকে চন্দ্র-বংশোৎপন্ন বলিযা লিখিয়াছেন। (বাবিন্দার প্রস্তর ফলক, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক, লক্ষ্মণ সেনের উভয় তাম্রফলক তৃতীয় শ্লোক কেশব সেনের শাসনপত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক দেখ।)

১০ "রি" অক্ষরটী অনুমানসিদ্ধ।

১১ বোধ হয় ৺ চূড়ামণি মহাশয় বু-

সথলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারত ১২ মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন দেব পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরম বৈষ্ণব পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব কুশলী ; * * সমুপগতাশেষ রাজরাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রাজপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত মহাধর্ম্মাধক্ষ্য মহাসান্ধি বিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত আন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক মহাক্ষপটলিক মহাপ্রতীহার মহাভোগিক মহাপীলুপতি মহাগণস্কদোস্‌সাধিক (মহাদোঃসাধ সাধনিক) চৌরোদ্ধরণিক নৌবল হস্ত্যাশগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয় পত্যাদীন্ বন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনোধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান চট্ট ভট্ট জাতীয়ান্ জনপদান ক্ষেত্রকাবশ্চ ব্রাহ্মণান ব্রাহ্মণোত্তরান যথার্হমানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভবতাং। যথা শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যান্তঃপাতিখাড়ী মণ্ডলিকান্ত(ন্ত)ল্লপুর চতুবকে পূর্ব্বে শান্ত শাবিক প্রভাস শাসনং সীমা—দক্ষিণে চিতাড়ি খাত্তার্দ্ধং সীমা—পশ্চিমে শান্ত শাবিক রামদেব শাসন পূর্ব্ব পার্শ্বঃ সীমা—উত্তরে শান্ত শাবিক বিষ্ণুপাণি গড়োলী কেশব গড়োলী ভূমী সীমা—ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন শ্রীমদ্গ্রমাধব পাদীয়স্তম্ভাঙ্কিত দ্বাদশাঙ্গুলাধিক হস্তেন দ্বাত্রিংশদ্ধস্ত পরিমিতা ন্মানেনাধস্তয়া সার্দ্ধ কাকিনী দ্বয়াধিক ত্রয়োবিংশত্যান্মানোত্তর খাবকক (কাকবক) সমেত ভুদ্রোণাত্রয়াত্মকঃ ১৩ সংবৎসরেণ পঞ্চাশৎ পুরাণোপত্তিকঃ সবাস্তুচিহ্নঃ মণ্ডলগ্রামীয়ঃ কিয়ানপি ভূভাগঃ সমাট বিটপঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোষরঃ সগুবাক নারিকেলঃ সহা শাপরাধঃ পরিহৃতসর্ব্ব পীড়োঽ চট্টভট্টপ্রবেশোঽকিঞ্চিৎ প্রাগ্রহাস্তৃণ পুতি গোচর পর্য্যান্তঃ জগদ্ধর দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় নারায়ণধর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গ সগোত্রায় আঙ্গিরস বার্হস্পত্য শিন গর্গভরদ্বাজ প্রবরায় ঋগ্বেদাশ্বলায়ন শাখাধ্যায়িনে শান্ত্য শাবিক শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মণে পুণোঽ-

ঝিতে না পারিয়া অস্টম শ্লোকটী এককালে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাম্রফলক দর্শন না করিয়া ইহা নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে না।

১২ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, পাল রাজগণের রাজধানী ছিল; কিন্তু প্রায়ই পাল রাজগণ মুদ্গগিরিতে, ও সেনরাজগণ বিক্রমপুরে বাস করিতেন। কলিকাতা ব্রিটীস ভারতের রাজধানী, কিন্তু শাসনকর্ত্তা প্রতি বৎসর আট মাস শিমলাশৈল-শৃঙ্গে বাস করেন। শিমলা হইতে কোন আদেশ-পত্র প্রচারিত হইলে, তাহাতে "শিবির শিমলা" (Camp Simla) অঙ্কিত থাকে। তদ্রূপ পাল গৌড়েশ্বরদিগের শাসনপত্রে "বিজয়ী শিবির মুদগগিরি (শ্রীমুদ্গগিরি সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারত—) ও সেন রাজগণের সনন্দ পত্রে "বিজয়ী শিবির বিক্রমপুর" অঙ্কিত রহিয়াছে। মৃত চূড়ামণি মহাশয় এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলেন না বলিয়াই, তিনি এস্থলে "শ্রীমজ্জয়স্কন্ধবীরম্মহা রাজাধিরাজ—" পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

১৩ চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব। (ভারতী, চতুর্থ ভাগ, ৩০৩ পৃষ্ঠা।) দেখ।

হুনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্না-রায়ণ ভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্ম-নশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্বরথ মহাদানে দক্ষিণাত্বেনোৎসৃজ্য আচন্দ্রার্ক ক্ষিতি সমকালং যাবৎ ভূমি চ্ছিদ্র ন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোহস্মাভিঃ॥ তদ্ভ বস্তিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যম। ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ম। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মা-নুশাসন শ্লোকাঃ।

বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মানৌ নিয়তং স্বর্গ গা-মিনৌ॥

স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেত বসুংধরাং। সবিষ্ঠায়াঃ কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য জীবিতঞ্চ। সকল মিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়োবিলোপ্যা॥

শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনোক্ষৌণীভানুসান্ধিবিগ্র-হিকম ১৪ * * শাসনীকৃতং। সং ২ মাঘ দিনে ১০।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ভৌতিক-বিজ্ঞানের মূল-পত্তন।

জ্যামিতির নূতন সংস্করণ নামক একটি প্রস্তাব যাহা ইতি পূর্ব্বে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল তাহাতে একটি নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিবার কথা ছিল; কি? না ইউক্লিড শুদ্ধ কেবল অতীন্দ্রিয় আকাশ খণ্ডের আয়তনাদিকেই আপনার জ্যামি-তির মধ্যে আমল দিয়াছিলেন, আমরা তাহাতে বদ্ধ না থাকিয়া ইন্দ্রিয়-গোচর ভৌতিক বস্তু এবং অতীন্দ্রিয় আকাশ উভয়কে (আয়তন-সম্বন্ধে) অভেদ দৃষ্টিতে দেখিয়াছি; তাহারই গুণে আমরা ইউক্লি-ডের কয়েকটি মূল-গত দোষ হইতে রক্ষা পাইতে পারিয়াছি; সে দোষ-গুলি অনে-কেই জানেন কিন্তু অল্প লোকেই তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন,—যাঁহারা চেষ্টা পাইয়াছেন তাঁহারা আশা-নুরূপ ফলে বঞ্চিত হইয়াছেন। আমরা এতাবৎকাল ইউক্লিডের দোষ গুলি এড়া-ইতে পারাকেই যথেষ্ট মনে করিয়া সন্তুষ্ট ছিলাম, আর ঐ দোষ-গুলির সংশোধন কার্য্যেই আমাদের নূতন প্রণালীটাকে উৎসর্গ করিয়াছিলাম, বেসী কিছু করি নাই; এখন দেখিতেছি যে নূতন প্রণালী-

১৪ লক্ষ্মণাব্দে নারায়ণ দত্ত সান্ধি বি-গ্রহিক ছিলেন। তর্পণ দীঘির তাম্র শাসন দেখ।

টিকে রীতিমত খাটাইলে জ্যামিতি চর্চ্চার সহজ অথচ সুবিচার সঙ্গত নূতন একটি পথ উদ্ঘাটিত হইতে পারে। এখন আমরা এইরূপ সংকল্প করিয়াছি যে (Physical science) ভৌতিক বিদ্যার মূল-তত্ত্ব গুলি, এবং যে সকল অকাট্য তত্ত্ব উহা হইতে সহজে নিষ্কর্ষণ করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সেইগুলি, একে একে যথা ক্রমে বিবৃত করি। এবার যে আমাদের প্রসঙ্গ শুদ্ধ কেবল জ্যামিতিতেই বদ্ধ নহে তাহা বর্ত্তমান প্রস্তাবের নামেতেই সপ্রকাশ—কার্য্যতঃ প্রকাশ পাইবে যে জ্যামিতি ভৌতিক বিজ্ঞানেরই অঙ্গ-বিশেষ।

আমরা পূর্ব্ব-প্রকাশিতের সংজ্ঞাদির কিয়দংশ পুনরুল্লেখ করিতে অগত্যা বাধ্য হইলাম কিন্তু সে গুলির আকার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমার্জ্জিত করা হইল।

সংজ্ঞা ॥

(১) রেণু ও বিন্দু।

১।১ ॥ যে বস্তুর আয়তন প্রত্যক্ষ-গম্য অথচ এত অল্প যে, তাহা-অপেক্ষা অল্পায়ত বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য নহে তাহা রেণু বলিয়া উক্ত হয়।

১।২ ॥ রেণু কর্ত্তৃক যে-টুকু আকাশ পূরিত হইতে পারে, তাহা বিন্দু বলিয়া উক্ত হয়। আয়তন-বিষয়ে রেণু ও বিন্দুর একের সম্বন্ধে যাহা কিছু স্থির হইবে অন্যের সম্বন্ধে তাহাই খাটিবে।

১।৩ ॥ যে রেণু-কর্ত্তৃক যে আকাশ-টুকু পূরিত হয় তাহা সেই রেণুর স্থান বলিয়া উক্ত হয়।

১।৪ ॥ যে কোন বস্তুর কোন অংশ-বিশেষ স্বতন্ত্র রূপে, অর্থাৎ অপরাংশ হইতে পৃথক্ রূপে, প্রত্যক্ষ-গোচর হইতে পারে, তাহা আয়ত বস্তু বলিয়া উক্ত হয়। (১।১ অনুসারে) রেণুর কোন অংশই স্বতন্ত্র-রূপে প্রত্যক্ষ-গম্য নহে অতএব রেণু অনায়ত বস্তু বলিয়া ধর্ত্তব্য।

মন্তব্য। রেণুর যে বাস্তবিক কোন অংশ নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষাতীত হওয়াতে তাহা জ্যামিতির কোন ব্যবহারে আসিতে পারে না। জ্যামিতির কাছে প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বস্তুই বস্তু, প্রত্যক্ষের অতীত বস্তু বস্তু নহে; এজন্য জ্যামিতির কাছে রেণুর অংশ অংশই নহে সুতরাং রেণু অনায়ত বস্তু।

১।৫ ॥ যে বস্তু বহুরেণুর সমষ্টি তাহা আয়ত বস্তু বলিয়া উক্ত হয়।

১।৬ ॥ আয়ত বস্তু-দ্বয়ের একটি যদি আর একটির অংশ-বিশেষ হয় তবে পূর্ব্বোক্ত বস্তু শেষোক্ত বস্তুর খণ্ড বলিয়া উক্ত হয়।

১।৭ ॥ যে রেণু যে বস্তুর অংশ, সেই রেণু সেই বস্তুর রেণু বলিয়া উক্ত হয়।

(২) ধারা ও রেখা।

২।১ ॥ যে আয়ত বস্তুর প্রত্যেক খণ্ডের প্রান্ত-রেণু সেই খণ্ডের একটি মাত্র রেণুকে স্পর্শ করিয়া রহে, তদ্ভিন্ন সে খণ্ডের দ্বিতীয় কোন রেণুকে স্পর্শ করে না তাহা ধারা বলিয়া উক্ত হয়। যথা

খ ঘগ
ক————চ এই বস্তুর যে কোন খণ্ডের—যেমন কগ খণ্ডের—প্রান্ত

রেণু ক উক্ত খণ্ডের একটি মাত্র রেণু খ-কে স্পর্শ করিয়া আছে এবং ঐ খণ্ডের অপর প্রান্ত-রেণু গ উক্ত খণ্ডের একটি মাত্র রেণু ঘ-কে স্পর্শ করিয়া আছে, তাই কচ বস্তু ধারা শব্দের বাচ্য।

২।২॥ ধারা কর্ত্তৃক যতখানি আকাশ পূরিত হইতে পারে তাহা রেখা বলিয়া উক্ত হয়। আয়তন-বিষয়ে ধারা এবং রেখার একের সম্বন্ধে যাহা কিছু স্থির হইবে অন্যের সম্বন্ধে অবিকল তাহাই খাটিবে।

২।৩॥ যতখানি আকাশ যে ধারা কর্ত্তৃক পূরিত হয় তাহা সেই ধারার রেখাঙ্ক বলিয়া উক্ত হয়।

২।৪॥ যে কোন ধাধার যে কোন প্রান্ত সেই ধারার প্রথম রেণু বলিয়া গৃহীত হইবে তাহার উত্তরোত্তরবর্ত্তী রেণু পরম্পরা যথা ক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি উত্তরোত্তর স্থানীয় রেণু বলিয়া গণ্য হইবে; আর, কোন একটি ধারার প্রথম রেণু দ্বিতীয় কোন একটি ধারার প্রান্ত-রেণুকে স্পর্শ করিলে শেষোক্ত প্রান্ত-রেণু দ্বিতীয় ধারার প্রথম রেণু বলিয়া গণ্য হইবে। দুই ধারার প্রথম রেণুদ্বয় কিংবা প্রথম রেণুদ্বয়ের সমোত্তরবর্ত্তী দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি রেণুদ্বর উভয়ের সমস্থানীয় রেণু-দ্বয় বলিয়া উক্ত হইবে।

২।৫॥ কোন ধারার বা তাহার কোন খণ্ডের প্রত্যেক রেণু যদি অপর কোন ধারার সমস্থানীয় রেণুকে স্পর্শ করিয়া রহে তবে ধারা-দ্বয় পরস্পরের গাত্র-সাৎ বলিধা উক্ত হয়।

২।৬॥ বহু ধারা-বিশিষ্ট বস্তু যদি এরূপ হয় যে তাহার যে কোন ধারা হউক্ তাহা ঐ বস্তুর আর কোন না কোন ধারার গাত্র-সাৎ হইয়া রহিয়াছে তবে সে বস্তু বিস্তৃত বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য। বর্ত্তমান সংজ্ঞা এবং ১।৫ সংজ্ঞা দুয়ের যোগে দাঁড়াইতেছে যে, বিস্তৃত বস্তু মাত্রই আয়ত কিন্তু আয়ত বস্তু বিস্তৃত না-ও হইতে পারে।

২।৭॥ যে বস্তুর যে-কোন খণ্ড বিস্তৃত সেই বস্তুর সেই খণ্ড বিস্তৃত খণ্ড বলিয়া উক্ত হয়।

২।৮॥ যে ধারার প্রান্তবর্ত্তী রেণু-স্থান-দ্বয়ের মধ্যে উহার একটি বই আর রেখাঙ্ক সম্ভবে না তাহা এবং তাহার প্রত্যেক খণ্ড শলাকা বলিয়া উক্ত হয়।

২।৯॥ দুই বিন্দুর প্রান্তবর্ত্তী সরল-রেখা ব্যবধান বা সরল-রেখাংশ-ব্যবধান দূরত্ব বলিয়া উক্ত হয়। দুই বিন্দুর অন্যূন-মাত্রা দূরত্ব বিদূরত্ব বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য॥ এক বিন্দু পরিমাণ ব্যবধানও দূরত্ব; কেন না বিন্দু সরল রেখা না হউক্, তাহা সরল-রেখাংশ তাহাতে আর সংশয় নাই, কেননা তাহা হইতে যে কোন সরল রেখা আকাশে প্রসারিত রহিয়াছে তাহারি তাহা অংশ-বিশেষ।

২।১০॥ দুই বিদূর-বর্ত্তী রেণুর মধ্যে শলাকা স্থিতি করিলে, ঐ দুই বিন্দু ঐ শলাকা দ্বারা সংযুক্ত বলিয়া উক্ত হয়।

(৩) ক্ষেত্র ও তল।

৩।১॥ বিস্তৃত বস্তুর প্রত্যেক বিস্তৃত

খণ্ডের সীমা-স্থানীয় ধারা-মাত্রই যদি সেই খণ্ডের দ্বিতীয় একটি-মাত্র ধারার গাত্র-সাৎ হইয়া রহে, তদ্ব্যতীত সে খণ্ডের আর কোন ধারার গাত্রসাৎ হইয়া না রহে তবে সেই বিস্তৃত বস্তু এবং তাহার প্রত্যেক বিস্তৃত খণ্ড ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হয়। যথা,—

এই কাগজের যে কোন খণ্ড গ্রহণ কর না কেন, তাহার সীমাস্থানীয় সাদা ধারার পার্শ্ব ঘেঁসিয়া বরাবর যদি একটা কালো ধারা টানা যায় তবে সেই সাদা ধারাটি ঐ কালো ধারাটি-ভিন্ন সে খণ্ডের আর কোন ধারার গাত্রসাৎ হইয়া থাকিবে না, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; অতএব বর্ত্ত-মান সংজ্ঞা অনুসারে এই কাগজ একটি ক্ষেত্র।

৩। ২॥ ক্ষেত্র-কর্ত্তৃক যতখানি আকাশ পূরিত হইতে পারে তাহা তল বলিয়া উক্ত হয়। আয়তন-বিষয়ে ক্ষেত্র এবং তলের একের সম্বন্ধে যাহা স্থির হইবে অন্যের সম্বন্ধে তাহা খাটিবে।

৩। ৩॥ যে কোন ধারা যে কোন ক্ষে-ত্রের সীমা প্রদেশস্থিত অথবা সীমাভ্যন্তর-স্থিত তাহা সেই ক্ষেত্রের ধারা বলিয়া উক্ত হয়।

৩। ৪॥ যে ক্ষেত্রের পরস্পর বিদূরবর্ত্তী রেণুদ্বয় মাত্রই সেই ক্ষেত্রের শলাকা-দ্বারা সংযুক্ত তাহা সমতল ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হয়। সমতল ক্ষেত্র কর্ত্তৃক পূরণ-যোগ্য আকাশ-স্থান সমতল বলিয়া উক্ত হয়।

৩। ৫॥ দুই সমতল-ক্ষেত্রের প্রত্যে-কের প্রত্যেক ধারা যদি অপরটির কোন না কোন ধারার গাত্রসাৎ হইয়া অব-স্থিতি করে তবে ক্ষেত্রদ্বয় পরস্পরের গাত্রসাৎ বলিয়া উক্ত হইবে এবং একটি আর-একটির পৃষ্ঠ-ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইবে, ও একটির তলাঙ্ক আর একটির পৃষ্ঠতল বা পৃষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইবে।

মন্তব্য॥ এখনকার-মত এইরূপ ধার্য্য করা যাইতেছে যে, যে-কোন বস্তুর কথা উল্লেখ করা যাইবে—মনে করিতে হইবে তাহা একটি নির্দ্দিষ্ট সমতল ক্ষেত্রের নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠে অবস্থিতি বা চলাচলি করিতেছে; মনে কর যেন এই কাগজটি সেই সমতল ক্ষেত্র, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, যে কোন বস্তুর কথা বলা যাইতেছে তাহা এই কাগজের এ পৃষ্ঠেই হউক কিংবা ও-পৃষ্ঠেই হউক, একটি নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠে স্থিতি করিতেছে বা চলাচলি করিতেছে।

(৪) পিণ্ড এবং পিণ্ডাকাশ।

যে বস্তুর সীমা স্থানীয় কোন রেণু স্থান-চ্যুত না হইলে তাহার সীমাভ্যন্তরস্থিত কোন রেণু বহির্ব্বস্তুর স্পর্শ-গম্য হয় না, তাহা পিণ্ড বলিয়া উক্ত হয়। যে পিণ্ড যে আকাশ-স্থান পূরণ করে তাহা সেইপিণ্ডা-কাশ বলিয়া উক্ত হয়। পিণ্ড কর্ত্তৃক অব-চ্ছেদ্য আকাশ খণ্ডাকাশ বলিয়া উক্ত হয়।

(৫) যুক্ত ধারা।

৫।১ ॥ দুই ধারার দুই প্রান্ত যদি পরস্পর স্পর্শ করিয়া রহে এবং একটির সর্ব্বাংশের বা খণ্ডাংশের অন্য কোন রেণু অন্যটির সর্ব্বাংশের বা খণ্ডাংশের অন্য কোন রেণুকে স্পর্শ না করে, তবে উক্ত ধারা-দ্বয় পরস্পর হইতে অথবা উভয়ের সন্ধিস্থল হইতে বিকীর্ণ বলিয়া উক্ত হয়।

৫।২ ॥ সমতল ক্ষেত্র-পৃষ্ঠে যদি ধারাগণ এরূপ গায়ে গায়ে মিলিয়া থাকে যে, প্রত্যেকেই তাহার পার্শ্বস্থ ধারার গাত্রসাৎ হইয়া আছে, তবে উক্ত ধারা-গণ সংস্তীর্ণ ধারা বলিয়া উক্ত হয়।

৫।৩ সংস্তীর্ণ ধারা-গণের মধ্যে যে কোন ধারা-দ্বয় পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া রহে তাহারা নিরন্তরাল ধারা বলিয়া উক্ত হয়, তদ্ব্যতীত উহাদের ভিতরকার অন্যান্য ধারা-দ্বয় সমান্তরাল ধারা বলিয়া উক্ত হয়।

(মন্তব্য) সমান্তরাল ধারা-দ্বয়ের কথা হইলেই সামান্যতঃ এইরূপ মনে করা যাইবে যে, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সংস্তীর্ণ ধারা বা ধারা-সমষ্টির পরিবর্ত্তে তাহাদের রেখাঙ্ক মাত্র রহিয়াছে; স্থল-বিশেষে আবশ্যক হইলে ঐ রেখাঙ্কগণের যত-গুলিকে হউক ধারা দ্বারা পূরিত মনে করা যাইতে পারে।

৫।৪ ॥ বিকীর্ণ বা সমান্তরাল ধারা-দ্বয়ের একটির যে কোন রেণু হইতে আর একটির যে কোন রেণু পর্য্যন্ত শলকা প্রসারিত হয় তাহা উক্ত ধারাদ্বয়ের যোজক শলাকা বলিয়া উক্ত হয়।

৫।৫ ॥ কোন সমতলবর্ত্তী বিকীর্ণ বা সমান্তরাল ধারা-দ্বয় মাত্রেরই যোজক শলাকা উক্ত ধারা-দ্বয়ের যে দুই পৃষ্ঠ স্পর্শ করে সে দুই পৃষ্ঠ উক্ত ধারা দ্বয়ের সম্মুখীন পৃষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয়।

৫।৬ ॥ বিকীর্ণ ধারা-দ্বয়ের সম্মুখীন পৃষ্ঠ-দ্বয়ের পরস্পরের বিচ্ছেদকে কোণ কহে; সুতরাং উক্ত বিচ্ছেদের ন্যূনাধিক্যে কোণের ন্যূনাধিক্য হয়।

মন্তব্য। বিকীর্ণ ধারা-দ্বয়ের সম্মুখীন পৃষ্ঠ-দ্বয়ের বিপরীত পৃষ্ঠ-দ্বয়ের বিচ্ছেদকেও যে, এক হিসাবে কোণ বলিতে পারা যায়, তাহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণী-কৃত হইতে পারে, এজন্য তাহাকে সংজ্ঞার মধ্যে স্থান দেওয়া হইল না।

৫।৭ ॥ কোণ-কারী বিকীর্ণ ধারা-দ্বয় কোণের ভুজ-দ্বয় বলিয়া উক্ত হয় এবং উভয়ের সন্ধি-স্থানীয় রেণু কোণের মুখ বলিয়া উক্ত হয়।

৫।৮ ॥ শলাকা-দ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোণ ঋজু-ধার কোণ বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য। যদি কোন কোণের মুখ হইতে একটি ধারা প্রসারিত হইয়া উহার দুই ভুজের সহ-যোগে দুইটি কোণ উৎপাদন করে, তবে শেষোক্ত কোণ-দ্বয় পূর্ব্বোক্ত কোণের অংশ-দ্বয় বলিয়া ধর্ত্তব্য, কেন না পূর্ব্বোক্ত কোণ শেষোক্ত কোণ-দ্বয়ের সমষ্টি। (৩।৫ সংজ্ঞার মন্তব্য দেখ)।

৫।৯ ॥ যে কোণের ভুজ-দ্বয়ের যোজক শলাকা মাত্রই সেই ভুজ-দ্বয়ের গাত্র-সাৎ হইয়া যায়, তাহা সমসূত্র কোণ বলিয়া উক্ত

হয়, সমসূত্র-কোণের অর্দ্ধাংশ মধ্যম কোণ বলিয়া উক্ত হয় *; সমসূত্র কোণের ছোটো ও মধ্যম কোণের বড় ঋজুধার কোণ ব্যায়ত কোণ বলিয়া উক্ত হয়, এবং মধ্যম কোণ অপেক্ষা ছোটো ঋজুধার কোণ তীক্ষ্ণ কোণ বলিয়া উক্ত হয়।

৫।১০॥ সমধার কোণ-মাত্রেরই ভুজ-দ্বয় কোণ-মুখ হইতে দুই বিভিন্ন দিকে প্রসারিত বলিয়া উক্ত হয়।

৫।১১॥ সমসূত্র কোণের ভুজ-দ্বয় কোণ-মুখ হইতে দুই বিপরীত দিকে প্রসারিত বলিয়া উক্ত হয়, ও কোণ-মুখেতর প্রান্ত-দ্বয় হইতে কোণ মুখ পর্য্যন্ত পরস্পরাভিমুখে প্রসারিত বলিয়া উক্ত হয়।

(৬) সীমাবচ্ছিন্ন সমতল-ক্ষেত্র।

৬। ১॥ যে কোন সমতল ক্ষেত্র তিনটি শলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ২॥ কোন ত্রিকোণের কোন একটি কোণ যদি মধ্যম কোণ হয় তবে তাহা জাত্য ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ৩॥ ত্রিকোণের কোণ-ভুজ-ত্রয় ত্রিকোণের ভুজ বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ৪॥ জাত্য ত্রিকোণের মধ্যম কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ কর্ণ বলিয়া উক্ত হয়, অবশিষ্ট ভুজ দ্বয়ের একটিকে ভূমি বলিয়া গ্রহণ করা হইলে অপরটি লম্ব বলিয়া উক্ত হয়।

* শূন্য কোণ সর্ব্বাপেক্ষা ছোটো, সমসূত্র কোণ সর্ব্বাপেক্ষা বড়, উভয়ের ঠিক মধ্যের জায়গায় মধ্যম-কোণ।

৬। ৫॥ যে সমান্তরাল ক্ষেত্র চারিটি শলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা চতুষ্কোণ বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ৬॥ চতুষ্কোণের কোণ-ভুজ চতুষ্কোণের ভুজ বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ৭॥ চতুষ্কোণের যে কোন কোণ দ্বয় পার্শ্বাপার্শি অবস্থিতি করে তাহাদের একটি আর একটির পার্শ্ব-কোণ বলিয়া উক্ত হয়, এবং তাহার কোন কোণের পার্শ্বেতর কোণ সেই কোণের সম্মুখীন কোন বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ৭॥ যে চতুষ্কোণের প্রত্যেক ভুজ উহার আর একটি ভুজের সমান্তরাল শলাকা সে চতুষ্কোণ সমস্তর বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য। সমতল ক্ষেত্র পৃষ্ঠে সমান শলাকাগণ একটির পর আর একটি স্তরে স্তরে গাত্রসাৎ হইয়া রহিলে বর্ত্তমান-সংজ্ঞক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহার নাম দেওয়া হইল—সমস্তর। সমান আস্তরণ এইরূপ চৌকোণ-আকারেই সচরাচর দেখা গিয়া থাকে—এ অর্থেও উহাকে সমস্তর বলা যাইতে পারে।

৬। ৮॥ যে সমস্তরের কোণ মধ্যম কোণ তাহা ঋজু সমস্তর বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ৯॥ যে ঋজু সমস্তরের চারি ভুজ সমান তাহা চতুরক (চক) বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ১০॥ যে ক্ষেত্রের যত কোণ সে ক্ষেত্র তত-সংখ্যক-কোণ-ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হয়, চারের ঊর্দ্ধসংখ্যক-কোণ-ক্ষেত্র বহু কোণ বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ১১॥ সমস্তরের সম্মুখীন কোণ-দ্বয়ের

মুখ-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শলাকা সমস্তরের ব্যাস বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ১২॥ কোন সমতল ক্ষেত্রের কোন একটি রেণু হইতে সমদূরবর্ত্তী যত গুলি রেণু সেই ক্ষেত্রে স্থিতি করে তাহারা সকলে মিলিয়া যে ক্ষেত্রটিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহে সে ক্ষেত্র চক্র বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ১৩॥ চক্রের বেষ্টন-ধারা পরিধি বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ১৪॥ পরিধির রেণুগণের সমদূরবর্ত্তী সাধারণ রেণু কেন্দ্র বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ১৫॥ কেন্দ্রের মধ্য দিয়া পরিধির এক রেণু হইতে অন্য রেণু পর্য্যন্ত প্রসারিত শলাকা ব্যাস বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ১৬॥ কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত প্রসারিত শলাকা অর বলিয়া উক্ত হয়।

(৭) গতি।

৭। ১॥ কোন বস্তুর, এক স্থান হইতে স্থানান্তর প্রাপ্তি, গতি বলিয়া উক্ত হয়।

৭। ২॥ নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে আয়ত পথ অতিক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি বেগ বলিয়া উক্ত হয়।

৭। ৩॥ যে বেগের প্রভাবে প্রত্যেক সমদীর্ঘ কালাংশে সমদীর্ঘ পথাংশ অতিবাহিত হয় তাহা আনুপূর্ব্বিক বেগ বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য। কেহ বলিতে পারেন যে সচরাচর কথিতরূপ বেগ সমবেগ বলিয়া উক্ত হয়, তাহার পরিবর্ত্তে আনুপূর্ব্বিক বেগ বলিবার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই— দুই অশ্ব সমবেগে চলিতেছে বলিলে তাহারা সমান আনুপূর্ব্বিক বেগে চলিতেছে এইটিই যে কেবল বুঝায়, তাহা নহে,—এটিও বুঝাইতে পারে যে, উভয়ে যদিও ক্রমাগত পাশাপাশি দৌড়িতেছে তথাপি ক্লান্তিবশতঃ উভয়েরই বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মন্দীভূত হইয়াছে, শেষোক্ত-পক্ষে প্রতি মুহূর্ত্তে উভয়ের বেগ সমান এই হিসাবে উভয়ে সমবেগে চলিতেছে,—পূর্ব্বে যত বেগে চলিয়াছিল এখনো তত বেগে চলিতেছে—এ হিসাবে নহে। সমবেগ বলিলে বস্তু-বিশেষের পূর্ব্বানুরূপ বেগও বুঝায়, আর দুই বস্তুর সামকালিক সমবেগও বুঝায়, এজন্য পূর্ব্বানুরূপ বেগ বিশেষ করিয়া জ্ঞাপন করিতে হইলে সমবেগ শব্দের পরিবর্ত্তে আনুপূর্ব্বিক বেগ বলাই যুক্তি সিদ্ধ।

৭। ৪॥ বস্তু-বিশেষের বেগের উৎপত্তি ধ্বংশ ও হ্রাস-বৃদ্ধির কারণকে বল কহে।

৭। ৫॥ যাহা অপেক্ষা অল্প স্থায়ী বল প্রয়োগ কল্পনা করা অসাধ্য তাহা ঘাত-প্রয়োগ বলিয়া উক্ত হয়। ঘাত-প্রয়োগ যতটুকু কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী তাহা মুহূর্ত্ত বলিয়া উক্ত হয়।

৭।৬॥ নিরবচ্ছিন্ন মুহূর্ত্তগণের সমষ্টি আয়ত কাল বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য॥ আকাশের বিন্দু যে হিসাবে অনায়ত, কালের মুহূর্ত্তও সেই হিসাবে অনায়ত—ভেদ যাহা তাহা কেবল বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয় লইয়া।

৭।৭॥ দুই চলমান রেণু যদি ক্রমাগত পরস্পর হইতে সমদূর-বর্ত্তী থাকে তবে উভয়ে যুগপৎ সমবেগে, বা যুগপৎ সমদূরে, চলিতেছে বলিয়া উক্ত হয়।

৭।৮॥ যে গতির বেগ যতকাল পর্য্যন্ত প্রতিমুহূর্ত্তেই বাড়িতে থাকে ততকাল পর্য্যন্ত তাহা ত্বরায়মান গতি বলিয়া উক্ত হয় এবং তাহার বেগ বর্দ্ধমান বেগ বলিয়া উক্ত হয়, উহা যত কাল পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তেই কমিতে থাকে ততকাল পর্য্যন্ত মন্দায়মান গতি এবং তাহার বেগ হ্রসমান বেগ বলিয়া উক্ত হয়।

১০।৯॥ যে গতির বেগ প্রতি মুহূর্ত্তেই সমগুণ বর্দ্ধিত বা হ্রসিত হয় তাহা আনুপূর্ব্বিক ত্বরায়মান বা মন্দায়মান বলিয়া

উক্ত হয় এবং উহার বেগ আনুপূর্ব্বিক বর্দ্ধমান বা হ্রসমান বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১০॥ যদি কোন শলাকার প্রথম রেণু তাহার দ্বিতীয় রেণু-স্থানে, দ্বিতীয় রেণু তৃতীয় রেণু-স্থানে, এইরূপ তাহার প্রত্যেক অন্ত্যেতর রেণু পরবর্ত্তী রেণু-স্থানে যুগপৎ চলিতে থাকে তবে তাহা সমসূত্রে চলিতেছে বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১১॥ কোন বিন্দু নিরবচ্ছিন্ন সরল-রেখা পথে চলিলে পর-পর-মুহূর্ত্ত গম্য বিন্দুগণের দিকে চলিতেছে বলিয়া উক্ত হয় এবং সেই সরল রেখা পথ দিয়া প্রত্যাগমন করিতে হইলে যে বিন্দুর পর যে বিন্দুতে উত্তীর্ণ হইতে হয় সেই বিন্দু হইতে সেই বিন্দুতে চলাকে পূর্ব্বোক্ত দিকের বিপরীত দিকে চলা কহে।

৭।১২॥ কোন শলাকা যে কোন পথ দিয়া যতদূর সমসূত্রে চলিতে পারে তাহা বা তাহার কোন অংশ সেই শলাকার সমসূত্র পথ বা সমসূত্র রেখা বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১৩॥ চলাচলি বশতঃ যে বস্তুর কোন্ রেণুদ্বয়ের দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভবে না তাহা দৃঢ় বস্তু বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১৪॥ দৃঢ় বস্তুর অন্তর্গত কোণ দৃঢ় কোণ বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১৫॥ যদি দুই বস্তু মিলিয়া একটি দৃঢ় বস্তু রূপে পরিণত হয় তবে একটির সহিত আর একটি দৃঢ় বদ্ধ বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য॥ দৃঢ় বস্তু ভিন্ন অদৃঢ় বস্তু আপাততঃ আমাদের কোন কাজে আসিবে না এজন্য যে কোন বস্তুর উল্লেখ করা যাইবে তাহাই দৃঢ় বস্তু বুঝাইবে।

৭।১৬॥ দৃঢ় বস্তুর সকল রেণু যদি যুগপৎ সমদূরে চলে তবে তখনকার গতি প্রস্থান বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১৭॥ প্রস্থীয়মান দৃঢ় বস্তুর এক রেণু যে দিকে চলিতেছে তাহার প্রত্যেক রেণু, বা তদুপরি সংলগ্ন কোন রেণু, সেই একই দিকে চলিতেছে বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১৮॥ যদি কোন শলাকা উত্তরোত্তর বর্ত্তী নিরন্তরাল রেখা হইতে নিরন্তরাল রেখায় চালিত হইয়া সমান্তরাল রেখা পরম্পরায় উত্তীর্ণ হয় তবে তাহা সমান্তরালে চলিতেছে বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১৯॥ যদি কোন শলাকা তাহার কোন প্রান্ত হইতে বিকীর্ণ পর-পরবর্ত্তী সরল রেখায় নিরবচ্ছেদে চালিত হয়, তবে তাহা সেই প্রান্তের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়া উক্ত হয়।

মূল তত্ত্ব।

মূ।১॥ এক শলাকার কোন রেণুদ্বয় যদি আর এক শলাকা স্পর্শ করে তবে দুই শলাকা পরস্পরের গাত্র সাৎ হইয়া যায়।

মূ।২॥ শলাকার গাত্র-সংলগ্ন নিরবচ্ছিন্ন রেণু-পরম্পরা শলাকা।

মূ।৩॥ সমতল ক্ষেত্রের পৃষ্ঠ মাত্রই (৩।৫ সংজ্ঞা দেখ) সমতল।

মূ।৪॥ নিরন্তরাল শলাকাদ্বয়ের সমসূত্র রেখা-দ্বয়ও নিরন্তরাল, সুতরাং সমন্তরাল রেখা-দ্বয়ের সমসূত্র রেখা-দ্বয়ও সমান্তরাল।

মূ।৫॥ বহির্বস্তু হইতে বাধা প্রাপ্ত না হইলে শলকা যতদূর ইচ্ছা ততদূর সমসূত্রে চালিত হইতে পারে।

মূ।৬॥ রেণু সমষ্টি মাত্রই বাহির হইতে বাধা প্রাপ্ত না হইলে যতদূর ইচ্ছা যুগপৎ সমবেগে, বা যাহা একই কথা যুগপৎ সমদূরে, চালিত হইতে পারে।

মূ।৭॥ কোন্ দৃঢ় বস্তুর কোন আয়ত্ত অংশের রেণুগণ যুগপৎ সমদূরে চলিলে তাহার অবশিষ্ট রেণুগণ ও যুগপৎ সমদূরে চলে।

মূ।৮॥ যুগপৎ সমদূরে চালিত রেণু-

দ্বয়ের একটি যে সময়ে আপনার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিন্দুতে উপনীত হয়, আর একটিও সেই সময়ে আপনার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিন্দুতে উপনীত হয়।

মূ। ৯॥ বিশেষ কারণাভাবে বিশেষ প্রকারের পরিবর্ত্তন সম্ভবে না।

মূ ১০॥ শলাকা বা তাহার কোন খণ্ডের প্রান্ত রেণু হইতে উহার এক পৃষ্ঠে যে কোন প্রকার কোণ উন্মীলিত হইতে পারে তাহার অপর পৃষ্ঠে অবিকল সেই প্রকার কোণ উন্মীলিত হইতে পারে, এবং দুই কোণেরই ভুজদ্বয় অবিকল সমান হইতে পারে।

স্বর-রহস্য।

গোড়ার প্রতিজ্ঞা অনুসারে, স্বরগণের মধ্যে প্রকৃত ব্যবধানের নিয়ম কিরূপ তাহা গতবারের ভারতীতে যথাসাধ্য প্রদর্শন করা গিয়াছে; তাহার মধ্যে ঘর-গড়া কিছুই নাই, বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহার ভিতরকার একটি সিদ্ধান্তেরও এক চুল এদিক্ ওদিক হইবার জো নাই। কিন্তু আমাদের মুখ্য আলোচ্য সঙ্গীত বিজ্ঞান তত নয়—যত সঙ্গীত বিদ্যা। বিজ্ঞান হ'চ্চে তত্ত্বনির্ব্বাচন জ্ঞান (Science), বিদ্যা হ'চ্চে কার্য্য-সাধন জ্ঞান (Art); বিদ্যা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) শাস্ত্র-বিদ্যা যেমন(Mensuration navigation, চিকিৎসা, ইত্যাদি) শিল্প-বিদ্যা, এবং সৌখীন বিদ্যা (Fine art)। সঙ্গীত সৌখীন * বিদ্যার শ্রেণী-ভুক্ত। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, যে-কোন গ্রামেরই হউক সা গা পা † স্ব-গ্রামের সংবাদী সুর ও এক গ্রাম উচ্চের সা গা পা (অর্থাৎ স্ব-গ্রামের ম প ধ) স্ব-গ্রামের অনুবাদী সুর, কিন্তু সঙ্গীত বিদ্যার নিজের একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত এই যে সংবাদী-স্থলে স্ব-গ্রামের এবং অনুবাদী স্থলে এক গ্রাম উচ্চের শুদ্ধ গান্ধারের পরিবর্ত্তে কোমল গান্ধার ব্যবহার করিলে তাহা একটু কান্নার ভাব উদ্দীপন করে; তাহার সাক্ষী—ভৈরব ললিত প্রভৃতি রাগাদিতে মধ্যম-গ্রামের কোমল গান্ধার (অর্থাৎ কোমল ধৈবত) এবং তাহার একগ্রাম উচ্চের কোমল গান্ধার (অর্থাৎ কোমল রেখাব) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐরূপ পদ্ধতিতে, যে কোন গ্রামেরই শুদ্ধ গান্ধার এবং শুদ্ধ ধৈবতের পরিবর্ত্তে কোমল গান্ধার এবং কোমল ধৈবত ব্যবহার করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে যে দ্বাদশ গ্রাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকেই মৌলিক উপাধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং তাহারি গান্ধার এবং ধৈবতকে কোমল করা হইলে উহা বৈকারিক উপাধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে; নিম্নে ইহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যে দুই স্থানে উক্ত দুই জাতীয় গ্রামের শুদ্ধ-

* কুল হইতে যেমন কৌলীন সুখ হইতে তেমনি সৌখীন উৎপন্ন হইয়াছে।

† সা-গ্রামের সা = সা, ম-গ্রামের সা = ম, রে-গ্রামের সা = রে, এইরূপ কোন গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়া তাহার সা রে গা প্রভৃতি বলিলে সেই গ্রামের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি স্বর বুঝাইবে, আর গ্রামের কথা উল্লেখ না করিয়া সা রে গা প্রভৃতি বলিলে সা-গ্রামের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি স্বর বুঝাইবে।

কোমল-ঘটিত বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় সেই দুই স্থান বিন্দু-মালা দ্বারা চিহ্নিত করা হইল।

মধ্যম গ্রাম

মৌলিক	বৈকারিক
সা = মা	সা = মা
রে = পা	রে = প
গ = ধা ……………………	গ = ধা
ম = নি	ম = নি
প = সা	পা = সা
ধা = রে ……………………	ধা = রে
নি = গা	নি = গা

আমাদের দেশের অনেক-গুলি রাগ রাগিণী বৈকারিক মধ্যম গ্রামে গীত হইয়া থাকে।

বৈকারিক গ্রাম মাত্রেরই সংবাদী শ্রেণীস্থ গান্ধার এবং অনুবাদী শ্রেণীস্থ ধৈবত কোমলীকৃত হয়, কিন্তু মৌলিক গ্রাম এবং বৈকারিক গ্রাম উভয়ের বিবাদী সুর-গুলি সমান ; তবে, বৈকারিক গ্রামে বিকল্পে আর একরূপ বিবাদী সুর ব্যবহৃত হইতে পারে,—কেবল উপান্ত স্থানে (অর্থাৎ উপসংহারের অব্যবহিত পূর্ব্ব স্থানে) নহে,—যে প্রকার বিবাদী সুর সাধারণতঃ ব্যবহার যোগ্য—উপান্ত স্থানে তাহারি প্রয়োগ বিধি-সঙ্গত। সাধারণতঃ ব্যবহার্য্য বিবাদী সুর হ'চ্চে নি, রে, ম, প, কিন্তু—শুদ্ধ কেবল বৈকারিক গ্রামে ব্যবহারোচিত বিবাদী সুর নি, রে, ম, ধ,—এই যা' প্রভেদ ; কিন্তু শেষোক্ত বিবাদী সুরের বিশেষ কতক-গুলি সঙ্গীতিক গুণ আছে ইহা যথাকালে প্রদর্শিত হইবে। নিম্নে বৈকারিক মধ্যম গ্রামের একটি গীত প্রকাশিত হইল।

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

বৈকারিক মধ্যম-গ্রাম

☞ (রে, ধা এবং নি কোমল)

২	৩	০	১
সা রে।	প প প।	ধ প।	প ধ ম।
অ নু।	প ম ম।	হি ম।	পূ - র্ণ।
২	৩	০	১
ম প।	ম গ ম।	গ -।	রে - সা।
ব্র -।	ক্ষ্ম - ক।	রো -।	ধ্যা - ন।
২	৩	০	১
স স।	ম ম ম।	ম প।	ম ম প।
নি র।	ম ল প।	রি -।	ত্র উ -।
২	৩	০	১
ম -।	ম প -।	ধা -।	প - -॥
যা -।	কা - -।	লে -।	- - -॥
২	৩	০	১
ধা -।	ধা সা*সা।	রে।	রে সা সা।
ভা -।	নু ন ব।	তাঁ -।	র সে ই।
২	৩	০	১
সা গ।	রে রে সা।	সা -।	ধা - -।
প্রে -।	ম মু খ।	ছা -।	য়া - -।
২	৩	০	১
ধা সা।	সা সা সা।	রে নি।	নি ধ ধ।
দে -।	খ অ ই।	উ দ।	য় গি রি।
২	৩	০	১
মা -।	মা পা -।	ধা -।	পা - -।
শু -।	ভ্র ভা -।	লে -।	- - -॥
২	৩	০	১
সা সা।	সা রে ধ।	ধা ধা।	ধা প প।
ম ধু।	স মী -।	র ণ।	ব হি ছে।
২	৩	০	১
পা ধা।	মা প ম।	প -।	ধা - -।
কি আ।	জি শু ভ।	দি -।	নে - -।

* অর্থাৎ এক সপ্তক উচ্চের সা।

২ ৩ ০ ১
ধা - । প প প। ধা - । প প প।
তাঁ - । র গু ণ। গা - । ন ক রি।
২ ৩ ০ ১
ম ম । ম গ রে। গ ম । প ম - ॥
অ মৃ । ত টা - । - - । - লে - ॥
২ ৩ ০ ১
ধা ধা । ধা সা সা। রে - । রে সা সা।
মি লি । রে স বে। যা - । ই চ ল॥
২ ৩ ০ ১
সা গ । রে রে সা। সা - । রে নি ধা।
ভ গ । ব ত নি। কে ত। নে - -।
২ ৩ ০ ১
সা সা। সা সা সা। রে - । নি ধ ধ।
প্রে - । ম উ প। হা - । র ল য়ো।
২ ৩ ০ ১
ম ম । মা পা । ধ - । প - - ।
হৃ দ । য় থা । লে - । - - - ॥

উপরের ব্যাখ্যা। সা মধ্যম-গ্রামের পঞ্চম—পঞ্চম আদিস্থিত হইলে তাহা সম্বাদী ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না; যেহেতু গীতের আরম্ভ স্থলে সম্বাদী স্বর থাকা চাই-ই-চাই; অন্যত্র পঞ্চম থাকিলে স্থান বুঝিয়া বিবাদী শ্রেণীর মধ্যেও গণ্য হইতে পারে। কোমল রে মধ্যম গ্রামের কোমল ধৈবত; বৈকারিক গ্রামের কোমল ধৈবত ঔপান্তিক ভিন্ন আর সকল বিবাদী-স্থলেই ব্যবহৃত হইতে পারে। তৎপরবর্ত্তী তিনটি প মধ্যমের রে সুতরাং বিবাদী। তাহার পর কোমল ধা হইতে পা = মধ্যম গ্রামের কোমল গা হইতে রে—সম্বাদী হইতে বিবাদী। তাহার পর প্রা হইতে কোমল ধা এবং মা = মধ্যম গ্রামের রে হইতে কোমল গা এবং সা,—বিবাদী হইতে সংবাদী। পরবর্ত্তী তৃতীয় তাল পর্য্যন্ত সম্বাদী বিবাদীর ওলট পালট্। ফাঁকের তালে বিবাদী; তাহার পরবর্ত্তী প্রথম তালে বৈকারিক বিবাদী কোমল রে (যাহা, মধ্যম গ্রামের কোমল ধৈবত তাহা) হইতে মধ্যমের পঞ্চমে (সা'তে) অবতীর্ণ হওয়াতে বুঝাইতেছে যে, ঐ পঞ্চমটি (সা'টি) এবারও সংবাদী বলিয়া ধর্ত্তব্য। পরবর্ত্তী সা-দুটি বিবাদী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তাহার পরবর্ত্তী তালের ঘরে সংবাদা স্বর স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার পরে সম্বাদী বিবাদীর ওলট্ পালট্, শেষে বিবাদীতে আস্থায়ীটি পরিসমাপ্ত হইয়াছে; বিবাদীতে আসিয়া গীত থামিতেপারে না, তাই পাল্‌টিয়া গোড়া হইতে আরম্ভ করা আবশ্যক, এবং প্রথম পংক্তির শেষের ঘরের বিবাদী প হইতে সংবাদী ধ ম হইয়া দ্বিতীয় পংক্তির সংবাদী ম'ই থামিবার জায়গা; এই বিরাম স্থানটিতে রীতিমত বিবাদী হইতে সংবাদীতে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক, হইয়াছেও তাই; এখানকার বিবাদী সোপানটি বৈকারিকের বিশেষ-ব্যবহারোচিত বিবাদী দ্বারা অধিকৃত হইতে পারে না—দ্বিতীয় পংক্তির শেষ ঘরে যেমন কোমল রেখাব হইতে সা'তে উত্তীর্ণ হওয়া গিয়াছে এখানে সেরূপ হইলে চলিত না। পঞ্চম পংক্তি হইতে অষ্টম পংক্তি পর্য্যন্ত বিবাদী সংবাদীর ওলট পালট স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। নবম পংক্তির কতকটা দূর পর্য্যন্ত সম্বাদী চলিয়া শেষে বিবাদী দেখা দিয়াছে, তাহার পর বিবাদী সম্বাদীর ওলট পালট হইয়া অবশেষে আভোগের শেষাংশ সম্বাদীতে পরিণত হইয়াছে; আভোগের পরবর্ত্তী অন্তরা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্তরার দ্বিরুক্তি মাত্র। অতঃপর মূল-গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াতের কিরূপ নিয়ম তাহা প্রদর্শিত হইবে।

ভগ্নহৃদয়।

পঞ্চম সর্গ।

কানন।

রাত্রি।

অনিল, ললিতা ; নলিনী ও সখীগণ ;
বিজয়, সুরেশ, বিনোদ, প্রমোদ,
অশোক, নীরদ।

(কাননের একপাশে ললিতার প্রতি
অনিলের গান)

বউ! কথা কও!

সারাদিন বনে বনে ভ্রমেছি আপন মনে,
সন্ধ্যাকালে শ্রান্ত বড়—বউ, কথা কও!
শুনলো, বকুল ডালে লুকায়ে পল্লব জালে
পিক সহ পিক-বধূ মুখে মুখ মিলায়ে
দুজনেতে এক প্রাণ গাহিতেছে এক গান,
রাশি রাশি স্বর-সুধা বাতাসেরে বিলায়ে।
সারাদিন তপনের কিরণেতে তাপিয়া
সন্ধ্যাকালে নীড়ে ফিরে আসিয়াছে পাপিয়া।
প্রিয়ারে না দেখি তার ঢালিতেছে স্বর-ধার,
অধীর বিলাপ তার লতাপাতা ভিতরে,
গলি সে আকুল ডাকে বসি অতি দূর-শাখে
প্রাণের বিহগী তার "যাই যাই" উতরে।
অতি উচ্চ শাখে উঠি দেখলো কপোত দুটি
মুখে মুখে কাণে কাণে কত কথা বলিছে,
বুকে বুক মিলাইয়া—চঞ্চুপুট বুলাইয়া,
কপোতী সে কপোতের আদরেতে গলিছে!
এস প্রিয়ে, এস তবে, মধুর—মধুর রবে
জুড়াও শ্রবণ মোর—বউ! কথা কও!
যদি বড় হয় লাজ, আমার বুকের মাঝ
পাখার ভিতরে মুখ লুকাও তোমার!
অতি ধীরে মৃদু-মধু বুকের কাছেতে, বধূ,
দুচারিটি কথা শুধু বল একবার!

(কিছুক্ষণ থামিয়া)

তবে কি কবেনা কথা পূরাবেনা আশা?
ভাল ভাল, কোয়োনাকো,মুখ ফিরাইয়া থাকো
বুঝিনু আমার পরে নাই ভালবাসা।

ললিতা।—(স্বগত)

কি কহিব কথা সখা? কহিতে না জানি!
বুদ্ধি নাই—ক্ষুদ্র নারী—ফুটেনাকো বাণী।
মনে কত ভাব যুঝে, হৃদয় নিজে না বুঝে,
প্রকাশ করিতে গিয়া কথা না যোগায়।
হৃদয়ে যে ভাব উঠে হৃদয়ে মিলায়।
তবে কি কহিব কথা—ভেবে নাহি পাই—
কথা কহিবার, সখা, ক্ষমতা যে নাই!
কি এমন কথা কব, ভাল যা' লাগিবে তব?

তুমি গো শুনাও মোরে কাহিনী বিরলে,
একমনে শুনি আমি বসি পদতলে।
মাথার উপর দিয়া তারাগুলি যত
একটি একটি করি হবে অস্তগত।
শ্রান্তি তৃপ্তি নাহি জানি ও মুখের প্রতি বাণী
তৃষিত শ্রবণে মোর শুনিতে শুনিতে
কখন্ প্রভাত হোল নারিব জানিতে।

অনিল।—
জানত—জানত সখি, মানুষের মন ?
যে কথা সে ভালবাসে শত শতবার তা' সে
ঘুরে ফিরে শুনিবারে চায় প্রতিক্ষণ।
জানি, ভালবাস' তুমি, ললিতা, আমারে,
তবু সখি প্রতিক্ষণে বড় সাধ যায় মনে
বাহিরে সে প্রেমের প্রকাশ দেখিবারে।
দুদিনে নীরব-প্রেম হয় পুরাতন!
বিচিত্রতা নাহি তায়, শ্রান্ত হয় মন।
আদর তরঙ্গ-মালা নিয়ত যে করে খেলা,
তাইতে দেখায় প্রেম নিয়ত নূতন।
নিত্য নব নব উঠি আদরের নাম
নিয়ত নবীন রাখে প্রণয়ের ধাম।
আদর প্রেমের, সখি, বরষার জল—
না পেলে আদর-ধারা হয় সে যে বলহারা,
ভূমে নুয়াইয়া পড়ে মুমূর্ষু বিকল।
ওকি বালা, কেন হেন কাতর নয়ানে
এক দৃষ্টে চেয়ে আছ ভূমি-তল পানে!
হাসিতে হাসিতে, সখি, দুটা ক্ষুদ্র কথা
কহিনু, তা'তেই মনে পেয়েছ কি ব্যথা ?

ললিতা। (স্বগত)
একা বোসে ভাবিয়াছি কত—কতবার,
কোন গুণ নাই মোর, কি হবে আমার ?
হা ললিতা! কি করিস্—দেখিস্ না চেয়ে ?
শুধু দুটা কথা হা-রে পারিস্ না কহিবারে ?
দুটা আদরের কথা—বুদ্ধিহীন মেয়ে!
দেখিস্ না—দুটা কথা কহিলি না বোলে,
আদরের ধন তোর—প্রাণের সর্ব্বস্ব তোর
হারায়—হারায় বুঝি—যায় বুঝি চোলে!
শুধু দুটা কথা তুই কহিলি না বোলে!
কি কহিবি ? হা অবোধ! ভাবনা কি তায় ?
মুক্তকণ্ঠে বল্—মন যা' বলিতে চায় ?
মনের গোপন ধামে ডাকিস্ যে শত নামে
সেই নামে মুখ ফুটে ডাক্‌রে তাহায়!
একবার প্রাণ খুলে বল্ প্রাণেশ্বরে—
"মোর প্রেম, চিন্তা, আশা, সব তোমা পরে;
নির্ব্বোধ—নির্গুণ বোলে—নাথ, স্বামী, প্রভু,
অসহায় অবলারে ত্যজিও না কভু!"
দিবস রজনী ভুলি বুকে তারে রাখ্ তুলি,
"ভালবাসি" "ভালবাসি" বল্ শতবার,
আলিঙ্গনে বেঁধে বেঁধে হৃদয় তাহার!
কিন্তু লজ্জা ?—দূর হ'রে—লজ্জা, দূর হ'রে—
বিষময় বাহু তোর বাঁধি বাঁধি শত ডোর
জীর্ণ করিয়াছে মোর মন স্তরে স্তরে!
আর না—আর না লজ্জা—দূর হ' এখন!
চূর্ণ চূর্ণ ভেঙ্গে আর ফেলিস্ না মন!
শিথিল কোরে দে তোর শতেক বন্ধন ডোর,
মুহূর্ত্তের তরে মুখ তুলি একবার;
বন্ধন-জর্জ্জর মন শুধুরে মুহূর্ত্ত ক্ষণ
বাহিরে বাতাসে গিয়া বাঁচুক আবার!

অনিল।—
আজি শুভদিনে ওকি অশ্রুবারি পাত ?
অশ্রুজলে কাটাবে কি ফুলশয্যা রাত ?

(কাননের অপর পার্শ্বে অভিমান করিয়া
বিজয়ের প্রতি)

নলিনী।—
মিছে বোলোনাকো মোরে ভালবাস' ভালবাস'
নয়নেতে ঝরে বারি হৃদয়ে হৃদয়ে হাস'!
সারহীন, ভাবহীন দুটা লঘু কথা বোলে,
হেসে দুটা মিষ্টহাসি,দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলে,
শূন্য রসিকতা কল্পি দুই দণ্ড কাল হরি,
সরল-হৃদয় চাহ' লভিবারে অবহেলে!
অবশেষে আড়ালেতে কহ হাসি হাসি কত
রমণীর ক্ষুদ্র মন লঘু তৃণটিব মত!
ভালবাসা খেলা নয়, খেলেনা নহেগো হৃদি,
নারী বোলে,মন তার দলিতে স্থজেনি বিধি!
ভাল যদি বাস', তবে ভালবাস' প্রাণপণে—
ক্ষুদ্র মনে কোরে খেলা করিওনা মোর সনে!
হৃদয়ের অশ্রু ফেল' দিবানিশি পদতলে,
মিছা হাসিওনা হাসি—কথা কহিওনা ছলে!

বিজয়।—
কেন বালা, আমিত লো দিনরাত্রি ভুলে
অশ্রু ঢালিয়াছি তব প্রেমতরু মুলে,
আজিও ত কিছু তার হয়নিক ফল,
ব্যর্থ হইয়াছে মোর এত অশ্রুজল!

নলিনী।—ওই যে স্বরুচি হোথায় আছে,
যাই একবার তাঁহার কাছে!
(দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া)
দেখিনি এমন জ্বালা!
হাত হোতে খসি পোড়েছে কোথায়
বেল ফুলে গাঁথা বালা!
(সহসা উপরে চাহিয়া)
ওই দেখ হোথা কামিনী-শাখায়
ফুটেছে কামিনীগুলি—
পাতাগুলি সাথে দুচারিটি, সখা,
দাওনা আমারে তুলি!

বিজয়।—কি পাইব পুরস্কার?

নলিনী।—পুরস্কার? মরি লাজে!
একটি কুসুম যদি ঠাঁই পায়
আমার অলক মাঝে,—
একটি কুসুম নুয়ে পড়ে যদি
এ মোর কপোল পরে,
একটি পাপ্ড়ি ছিঁড়ে পড়ে পায়ে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে,
ভুলে যদি রাখি একটি কুসুম
রচিতে এ কণ্ঠহার—
তার চেয়ে বল আছে ভাগ্যে তব
আর কিবা পুরস্কার!
(বিজয়ের ফুল তুলিয়া দেওন
ও তাহা চরণে দলিয়া)

নলিনী।—এই তব পুরস্কার!
অনুগ্রহ করি এ চরণ দিয়া
ফুলগুলি তব দিলাম দলিয়া,
এই তব পুরস্কার!

বিজয়।—আহা! আমি যদি হোতেম সজনি
একটি কুসুম ওর,—
ওই পদতলে দলিত হইয়া
ত্যজিতাম দেহ মোর!
(গাছের দিকে চাহিয়া নলিনীর
মৃদুস্বরে গান)
খেলা কর্—খেলা কর্—
(তোরা) কামিনী-কুসুম গুলি,
দেখ্, সমীরণ লতাকুঞ্জে গিয়া
কুসুম গুলির চিবুক ধরিয়া
ফিরায়ে এ ধার—ফিরায়ে ও ধার

দুইটি কপোল চুমে বার বার
মুখানি উঠায়ে তুলি!
তোরা খেলা কর্—তোরা খেলা কর্
কামিনী কুসুম গুলি!
কভু পাতা মাঝে লুকারে মুখ,
কভু বায়ু কাছে খুলেদে বুক—
মাথা নাড়ি নাড়ি নাচ কভু নাচ্
বায়ু কোলে দুলি দুলি!
দুদণ্ড বাঁচিবি—খেলা' তবে খেলা,'
প্রতি নিমেষেই ফুরাইছে বেলা,
বসন্তের কোলে খেলা-শ্রান্ত প্রাণ
ত্যেজিবি ভাবনা ভুলি।
অশোক।—(দূর হইতে দেখিয়া)
ওই যে হোথায় নলিনী রোয়েছে
বসি বিজয়ের সাথে!
কত কাছাকাছি!—কত পাশাপাশি!
হাত রাখি তার হাতে!
অসার-হৃদয়, লঘু, হীন-মন
কোন গুণ নাই যা'র—
শুধু ধন দেখে বিকাবি, নলিনী,
তারে দেহ আপনার?
কতবার প্রেম! যাস্ পলাইয়া
ভয়ে ফুল ডোর দেখি,
ধনের সোণার শিকল হেরিয়া
আজ ধরা দিলি একি?
সুরেশ।—খুঁজিয়া খুঁজিয়া পাইনা দেখিতে
নলিনী কোথায় আছে।
ওই যে হোথায় লতা-কুঞ্জতলে
বসিয়া বিজয় কাছে!
কি ভয় হৃদয়! জানি গো নিশ্চয়
সে আমারে ভালবাসে,
মন তার আছে আমারি কাছেতে
থাকুক্ সে যার পাশে!
বিনোদ।—কথা শুনে তার—ভাব দেখে তার
কতবার ভাবি মনে—
নলিনী আমার—আমারেই বুঝি
ভালবাসে সঙ্গোপনে!
সত্য হয় যদি আহা!
সে আশ্বাস বাণী, সে হাসি মধুর
সত্য যদি হয় তাহা!
নীরদ।—কে আমার সংশয় মিটায়?
কে বলি দিবে সে ভালবাসে কি আমায়?
তার প্রতি দৃষ্টি হাসি তুলিছে তরঙ্গ রাশি
এক মুহূর্ত্তের শান্তি কে দিবে গো হায়!
পারিনে পারিনে আর বহিতে সংশয় ভার,
চরণে ধরিয়া তার শুধাইব গিয়া,
হৃদয়ের এ সংশয় দিব মিটাইয়া!
কিন্তু এ সংশয়ো ভাল,
পাছে গো সত্যের আলো
ভাঙ্গে এ সাধের স্বপ্ন বড় ভয় গণি;
হানে এ আশার শিরে দারুণ অশনি!
(নলিনীর নিকট হইতে বিজয়ের দূরে
গমন, ও নলিনীর নিকটে
গিয়া প্রমোদের গান)
আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি'
বিজন বনে, মালতী বালা,
আছিস্ কেন ফুটিয়া?
শুনাতে তোরে মনের ব্যথা,
শুনিতে তোর মনের কথা,
পাগল হোয়ে মধুপ কভু
আসেনা হেথা ছুটিয়া;

মলয় তব প্রণয় আশে
ভ্রমেনা হেথা আকুল শ্বাসে,
পায়না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে-মাখা মুখানি ;
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি-শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি !

নলিনী।—(হাসিয়া)
শুনিয়া ধীরে মালতী বালা
কহিল কথা সুরভি-ঢালা,—
"আঁধার বনে আছিগো ভাল
অধিক আশা রাখি না !
তোদের চিনি চতুর অলি,
মনো-ভুলানো বচন বলি
ফুলের মন হরিয়া লোয়ে
রাখিয়া যাস্ যাতনা !
অবলা মোরা কুসুম-বালা
সহিব মিছা মনের জ্বালা,
চিরটি কাল তাহার চেয়ে
রহিব হেথা লুকায়ে !
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভি রাশি,
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে !"

(অশোকের নিকটে গিয়া)
নলিনী।—
অশোক, কোথায়, দূরে কেন তুমি
দাঁড়াইয়া এক ধার ?
কত দিন হোল আমার কাছেতে
আস'নিত একবার !
ভুলেছ যে প্রেম, ভুলেছ যে মোরে
তোমার কি দোষ আছে ?
এ মুখ আমার এ রূপ আমার
পুরাতন হইয়াছে !
ভাল, সখা, ভাল, প্রেম না থাকিলে
আসিতে নাই কি কাছে ?
যেচে প্রেম কভু পাওয়া নাহি যায়
বন্ধুত্বে কি দোষ আছে ?
যদি সারাদিন রহিয়া তোমার
প্রাণের রূপসী সাথে
কোন সন্ধ্যাবেলা মুহূর্তের তরে
অবকাশ পাও হাতে,
আমাদের যেন পড়ে গো স্মরণে
এসো একবার তবে !
দু চারিটা গান গাব' সবে মিলি
দু চারিটা কথা হবে !

অশোক।—(স্বগত)
পাষাণে বাঁধিয়া মন মনে করি যতবার
কাছে তার যাবনাক মুখ দেখিব না আর,
তার মুখ হোতে তিল আঁখি ফিরায়েছি যবে—
দূরে যেতে এক পদ শুধু বাড়ায়েছি সবে,
অমনি সে কাছে ঢোলে দু একটি কথা বোলে
পাষাণ প্রতিজ্ঞা মোর ধূলিসাৎ করিয়াছে ;
শুধু দুটি কথা বোলে, একবার এসে কাছে !
জানিনা কি শুধু সেগো মন ভোলাবার কথা ?
সে হাসি—সে মিষ্টহাসি–নিদারুণ কপটতা ?
জানে জানে সব জানে, তবু মন নাহি মানে,
প্রতিবার ঘুরে ফিরে তবুও সে যায় তথা ;
জেনে শুনে তবু তার ভাল লাগে কপটতা,
সেই মিষ্ট হাসি, সেই মন ভুলাবার কথা !
যবে ভুলাবার তরে কপট আদর করে,

মোর মুখ পানে চেয়ে গাহে প্রণয়ের গীত,
সাধ কোরে মন যেন হোতে চায় প্রতারিত!
হা হৃদয়! লঘু, নীচ, হীন—হীন অতি—
খেলেনার পরে তোর এতই আরতি?
কখনো না—কখনো না—হোক্ যা হবার,
এই যে ফিরানু মুখ ফিরিব না আর!
ধিক্—ধিক্—শিশু-হৃদি! ধিক্ ধিক্ তোরে—
লজ্জার পাথারে আর ডুবাস্‌নে মোরে!
কপট রমণী এক, অধম, চপল,
নির্দ্দয়, হৃদয় হীন, অসার, দুর্ব্বল—
দুর্ব্বল হাতে সে তার যেথা ইচ্ছা সেই ধার
টলাইবে নুয়াইবে এ মোর হৃদয়?
তৃণ—শুষ্ক পত্র এক, দুর্ব্বলতা-ময়?
কাঁদাইবে, হাসাইবে, দূরে যেতে নাহি দিবে—
নিশ্বাসে উড়ায়ে দেবে প্রতিজ্ঞা আমার!
ইচ্ছা, সাধ, চিন্তা, আশা, দুঃখ, সুখ, ভালবাসা
সমস্ত রাখিবে চাপি পদতলে তার—
শিকলি, পশুর সম—বাঁধিবে গলায় মম
মুহূর্ত্ত নহিবে শক্তি মাথা তুলিবার,
ধূলিতে পড়িবে লুটি এ মাথা আমার!
হা হৃদয়, কি করিলি? তুই কি উন্মাদ হলি?
সমস্ত সংসার তুই দিলি বিসর্জ্জন,
ধন, মান, যশ, আশা—সখাদের ভালবাসা,
লুটিতে শুধু কি এক নারীর চরণ?
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তার উঠিতে পড়িতে?
কাঁদিতে হাসিতে তার কটাক্ষে ইঙ্গিতে?
খেলেনা হইতে তার ভ্রূকুটি হাসির?
কেন এত গেলি গোলে!
শুধু রূপ আছে বোলে?
ক্ষণ-স্থায়ী জড়রূপ গঠিত মাটির!
কুঞ্চিত-কুন্তল তার, আরক্ত-কপোল,
সুদীর্ঘ নয়ন তার কটাক্ষ-বিলোল,
তাই কি ত্যজিলি তুই সমস্ত সংসার?
জীবনের উদ্দেশ্য করিলি ছারখার?
সমস্ত জগৎ হাসে ধিক্ ধিক্ বলি—
প্রতি ক্ষণে আত্মগ্লানি উঠে জ্বলি জ্বলি—
তবু তার পদতলে লুটাইবি গিয়া
শুধু তার আঁখি দুটি সুদীর্ঘ বলিয়া?
কি মদিরা আছে বালা নয়নে তোমার!
ফেলেছ বিহ্বল করি হৃদয় আমার!
ফিরাও—ফিরাও আঁখি, পাতা দিয়া ফেল ঢাকি
হৃদয়ের দূরে যেতে দাও একবার!—
কোরেছি দারুণ পণ করিবারে পলায়ন,
নিঠুর মধুর বাক্যে ফিরায়োনা আর!
ও অনল হোতে সাধ দূরে থাকিবার—
ফিরায়োনা মোরে সখি ফিরায়োনা আর!

অনুতাপের অশ্রুজল।

সকলেই প্রায় অবগত আছেন যে বিখ্যাত নামা Irish কবি Moore—এর লিখিত "লালারুখ্" নামক কাব্যে "Paradise and the Peri" বলিয়া একটি কবিতা আছে। সেই কবিতার সার মর্ম্ম এই যে স্বর্গ ভ্রষ্ট পরীদের মধ্যে একটি পরী

আবার সেই নন্দন কাননে ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল?—ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু ফিরিয়া যাইতে পারিল না।—কারণ, স্বর্গের দ্বার-রক্ষক তাহাকে বলিল যে "মর্ত্তভূমির চূড়ান্ত সার বস্তু আমাকে দেখাইলে, আমি স্বর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিব, নচেৎ এ দ্বার তোমার পক্ষে চিরকালই রুদ্ধ থাকিবে!" ভগ্নহৃদয় পরী মর্ত্তভূমির চূড়ান্ত সার বস্তুর অন্বেষণে দিক-দিগন্তে বিচরণ করিতে লাগিল,——কখন' প্রণয়িনীর দীর্ঘ শ্বাস, কখন' অপোগণ্ড বালকের উপাসনার ধ্বনি, এই মর্ত্তভূমির বিস্তর সামগ্রী লইয়া স্বর্গের দ্বার-রক্ষককে দিল,কিন্তু তবুও দ্বার খুলিল না।—শেষে এক জন প্রকৃত অনুতাপীর অশ্রুজল লইয়া পরী দ্বার-রক্ষককে দিল,—এবং তাহা দিবামাত্রই আপনা আপনি স্বর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িল এবং নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গচ্যুতা পরী স্বর্গের নন্দন-কাননে আবার প্রবেশ করিল। অনুতাপের অশ্রুজলের এমনি অমোঘ শক্তি!—কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না,কেন যে একজন ভাবুক কবি সেই অশ্রুজলের জন্য তাঁর স্বর্গচ্যুতা পরীকে ব্যাগ্‌ড়াতের নিভৃত নিলয়ে লইয়া গিয়াছিলেন? তিনি কি জানিতেন না যে, যে অনুতাপের অশ্রুজলে স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয় তাহা এই মর্ত্তভূমের দেশে দেশে—ঘরে ঘরে দিবানিশিই খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে?—এক দিন মাত্র, কেহ যদি গভীর নিশীথকালে একটি নিরালয় স্থানে বসিয়া কল্পনার চক্ষে সমস্ত মর্ত্তভূমির কার্য্যকলাপ ভাবিয়া দেখেন, ত, তিনি দেখিতে পাইবেন যে এই সংসারে মন্দাকিনী অপেক্ষাও অনুতাপের অশ্রুলহরী অধিকতর প্রবহমানা;—তিনি দেখিবেন যে শতসহস্র কোমল হৃদয়া রমণীর অজ্ঞান পরিহৃত হৃদয়ের উৎসারিত অশ্রুজল;—শতসহস্র স্বামীর অস্থানে পরিহৃত ভালবাসার নিভৃত নিলয় হইতে অনুতাপের অশ্রুজল—শতসহস্র মন্দভাগিনীর মর্ম্ম-অভিলষিত পাতকের জন্য হৃদয়ের গোপনীয় প্রস্রবণ হইতে জলন্ত অশ্রুজল—শতসহস্র মহাপাতকীর মর্ম্মের অদৃশ্য অশ্রুসরোবরের অতল-স্পর্শ হইতে আকাশভেদী অশ্রুজল—এত—এত—এত—অশ্রুজল—একত্রে মিশিয়া সেই ত্রিযামা রাত্রির নিস্তব্ধ আকাশ মণ্ডলে তরঙ্গিত—উচ্ছ্বসিত হইতেছে!—আর কেনই বা তা হইবে না? কোন্ মানুষ বলিতে পারে যে সে অনুতাপের আগুনে জ্বলে নাই?—বাল্যকালের নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে—যৌবনের দুর্দ্দান্ত হৃদয়-ঝটিকায়, প্রৌঢ়াবস্থার অকিঞ্চিৎকর অথচ অপরিহার্য্য বৈষয়িক ব্যস্তসমস্ততে কে আপনাকে এতদূর সঠিক রাখিতে পারিয়াছে যে, সে বলিতে পারে যে "আমি কখনই অনুতাপ করিব না।"—কেহই সে কথা বলিতে পারে না।——

পৃথিবীতে ১২।১৪টি এমন নৈতিক নিয়ম প্রচারিত আছে,—যে তাহা সকলেরই প্রায় কণ্ঠস্থ। পৃথিবীর সুসভ্য প্রায় সকল লোকই জানে যে চুরি করা বা মিথ্যা কওয়া বা পরনিন্দা করা বিষম দোষের কার্য্য—কিন্তু

কত রকম অবস্থায় পড়িয়া যে কত লোক কি কায করিয়া ফেলে, তাহা কি কেহই কখন' দেখে?—পৃথিবীর প্রচারিত নিয়মাবলির একটুমাত্র এদিক বা ওদিক হইলে সকলেই আমাকে ঘৃণা করিতে পারে বটে, কিন্তু পৃথিবীর ঘৃণার কথা আমি ধরিতেছি না—কারণ আমি যে কেন সে কাজ করিলাম, তাহা কি কেহই শুনিতে বা জানিতে বা পরীক্ষা করিতে অপেক্ষা করে? রামচন্দ্র কেন সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন—যুধিষ্ঠির কেন যে "অশ্বত্থামা হত-ইতি গজ," বলিয়াছিলেন, দুষ্মন্ত কেন আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার প্রতি প্রেম প্রকাশ করিয়াছিলেন, রত্নাবলী কেন যেউদয়ন রাজার প্রতি ভালবাসায় উন্মাদিনী হইয়াছিলেন, ইলইসা কেন যে প্রশান্ত ও পবিত্র কুমারিকা-আশ্রম প্রশান্ত প্রেমের অশ্রুজলে ভাসাইয়াছিলেন—তাহা কি সকলে শুনিবে? অথবা শুনিয়াওবুঝিবে? পৃথিবীতে মানুষের দোষ-গুণ বিচারের সময় মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার কথা কেহই প্রায় ভাবিয়া দেখে না। এবং তাহা না ভাবিয়া দেখাতে সংসারে যে সকল বিষময় ফল উৎপন্ন হয় তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন? সুসভ্য সমাজের যেখানেই যাও, সেই খানেই গভীর-নৈতিক নিয়ম গুলি এমন কঠোর ও জমাট্‌ভাবে মানুষের মনে খোদিত আছে যে তাহার তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইলেই অপরাধী ব্যক্তি চিরকলঙ্কের ভাগী হইয়া সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে! "চুরি করিও না"—"বিশ্বাস-ঘাতকতা করিও না"—"পরস্ত্রী বা পরপুরুষের উপরে অনুরাগের চক্ষে চাহিও না" ইত্যাদি শুভকর নৈতিক নিয়মগুলি চির-প্রচলিত ও বদ্ধমূল হইলেও অবস্থা-ক্রমে—অদৃষ্ট-ক্রমে—হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার অনিবার্য্য গতি-ক্রমে মানুষে যে কি রূপে ঐ সকল নিয়ম সময়ে সময়ে লঙ্ঘন করিয়া ফেলে, তাহা কে ভাবিয়া দেখে?—আমি যদি সহসা শুনি যে ম্যাক্‌বেথ নামে একজন বৈলাতিক রাজপুরুষ ও যোদ্ধা নিজের আলয়ে স্বদেশীয় রাজাকে অতিথি রূপে আহ্বান করিয়া পরে রাজ-সিংহাসন অভিলাষী হইয়া তাহাকে রাত্রযোগে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বধ করিয়াছিল, তাহা হইলে আমরা কি ম্যাক্‌বেথ্‌কে ঘৃণিত হইতেও ঘৃণিততর পিশাচ বলিয়া গণ্য করি না? কিন্তু যদি সেই সঙ্গে আবার দেখি যে সেই সাহসী বীরপুরুষ ম্যাক্‌বেথের হৃদয়-বীণায় একটি এমন তার ছিল, যে তার অন্য সকল তার অপেক্ষাও প্রবলতর, কিন্তু একসঙ্গে থাকাতে তাহার প্রবলতা অপরিস্ফুট থাকিত,—অথচ তদাপ চণ্ডালিনী যে তারের সন্ধান পাইয়া ভালবাসা—পরিণামদর্শিতা—অনুরাগ—বিরাগ ও উত্তেজনার আঘাতে ক্রমাগত জাগ্রত করিয়া দুর্ব্বলমনা ম্যাক্‌বেথকে রাজ-হত্যা কার্য্যে প্রযুক্ত করিয়াছিল—যদি দেখি যে পরিণামে সেই ম্যাক্‌বেথ নিতান্ত শিশুর মত স্ত্রৈণ-পীড়নের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় আলয় রাজরক্তে কলঙ্কিত করিয়াছিল—তখন কি সেই ম্যাক্‌বেথকে একই চক্ষে দেখি?—আমরা জানি যে, পর-স্বামীর উপর

অনুরাগের চক্ষুতে দেখা ঘোরতর পাতক, কিন্তু যখন দেখি যে রত্নাবলী রাজা উদয়নকে ভালবাসিয়াও ভালবাসিতে চাহিতেছেনা—আবার ভালবাসিতে না চাহিয়াও ভালবাসিতেছে—যখন দেখি যে আত্মসংযমে দৃঢ়ব্রতী হইয়াও তিনি আত্মহারা হইতেছেন, আবার আত্মহারা হইয়াও আত্মসংযম করিতে চেষ্টা করিতেছেন—যখন দেখি যে রাজা উদয়নের চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে তিনি ব্যাকুল, অথচ সেই আত্মবিসর্জ্জন হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্বন্ধনেও জীবন বিসর্জ্জন করিতে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন—তখনও কি রত্নাবলীকে আমরা "পর-স্বামী-লোলুপ পাতকিনী" বলিয়া ঘৃণা করিব?—অ্যাবিলাডের সঙ্গে কি সীজর বর্জীয়ার—হিলইসার সঙ্গে কি ক্লিওপেট্রার আমরা তুলনা করিব? কিন্তু সংসারে কে না তাহা করিয়া থাকে? পৃথিবীতে কজন লোক আমাদের পদস্খলনের ভূমিকা হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া থাকে?—একটি কারাগারে প্রবেশ কর—দেখিবে শতসহস্র লোক সেখানে বন্দী—হয় ত শুনিবে যে, সেই শতসহস্র লোকই চোর। তুমি স্বভাবতই সকলের উপর ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিয়া আসিবে যে "পৃথিবীতে কতই চোর আছে, ছিঃ!"—কিন্তু এরূপ কেহই ভাবে না যে হয় ত ঐ সকল বন্দীদের মধ্যে এমন চোরও কেহ কেহ আছে, যাহারা দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় নিতান্ত নিঃসহায় ও নিরাশ হইয়া স্বীয় পতিপ্রাণা মুমূর্ষু প্রণয়িনী বা অপোগণ্ড মৃতকল্প শিশুগুলিকে যৎকিঞ্চিৎ আহার দিয়া বাঁচাইবার জন্য একজন পাষাণ-হৃদয় সুকৃপণ ধনীর ধন অপহরণ করিয়াছে। হয় ত সেই অপহরণ কার্য্যের তীক্ষ্ণ শেল তাহাদেরই হৃদয়ে বিষবৎ বিঁধিয়াছে—হয় ত তাহারাই নিজ পাপের জন্য ঈশ্বরের চরণযুগল অনুতাপের অশ্রুজলে প্রক্ষালিত করিয়াছে—হয়ত তাহারাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সন্মুখে স্ত্রী-পুত্র অন্ন বিহনে মরিয়া যাইলেও আর তাহারা ওরূপ কার্য্য করিবে না,—কিন্তু সমাজের কে তাহাদের মনের ভিতর প্রবেশ করে?—কেই বা তাহাদের সকল অবস্থা ভাবিয়া তাহাদের প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ একটুমাত্র অপসারিত করিয়া লয়? সকলেই হয় ত বলিবেন যে "অপরাধীদের সকল অবস্থা জানিতে পারিলে আমরাও মমতা করিতে পারি"—কিন্তু অপরাধীদের সকল অবস্থা জানিবার জন্য কে ব্যাকুল হয়? আমরা কি সচরাচর এক ব্যক্তিকে অপরাধী মাত্র শুনিয়াই তাহাকে মনে মনে দ্বীপান্তরিত করিতে চাহি না? আমরা নিজেই অনেক বিষয়ে দারুণ অপরাধী হইয়াও কি আমাদের অন্যতম দোষে দোষীকে ঘৃণার আদর্শস্থল মনে করি না? ইয়াগোর মত নরপিশাচরাও কি সরল স্বভাব কেশীয়োকে মদ্যপায়ী বলিয়া হাস্যাস্পদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয় না? একজন গৃহ-বিচ্ছেদক—কুটিলমনা—সর্ব্বনাশ-কারিণী তাড়কা রাক্ষসীও কি এক-

জন পবিত্রমনা অথচ প্রেম মুগ্ধা অবলাকে "অসতী" বলিয়া ঘৃণা করিতে স্পর্দ্ধিত হয় না? ছিঃ ছিঃ সংসারের এই সকল বিচার দেখিয়া কখন হৃৎকম্প, উপস্থিত হয়, কখন হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়! অথচ কেহই কাহারও অপরাধের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে দৃক্‌পাতও করিবেন না। আমরা দেখিতে পাই যে "বেশ্যা" কথাটি উচ্চারণ করিলেই, যে রমণীতে সে কথা প্রযুক্ত হইতে পারে, লোকে তাহাকে একেবারে অধম হইতেও অধমতর পশুর মধ্যে গণনীয় করিয়া লয়—কিন্তু যদি কেহ আজ সমস্ত বেশ্যামণ্ডলের ইতিবৃত্তান্ত জানিতে সাহসী হয়েন, ত হয় ত তিনি শুনিতে পাইবেন যে প্রকৃতির অনেক সরলা বালিকারা প্রবঞ্চকের ঐন্দ্রজালিক ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া, অথবা কল্পিত দেবতার উপর আত্মসমর্পণ করিয়া, অথবা আপনার সঙ্গে দুর্দ্ধর্ষ সমর করিয়া পরাজিত হইয়া শেষে কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে! হয় ত ঐ সকল অভাগিনীদের অবস্থাতে দেবতারাও পড়িলে কি করিতেন বলা যায় না,—কিন্তু মানুষ বলিয়াই তাহারা পৃথিবীর ঘৃণিত ও সমাজের পরিত্যক্ত!—সমাজের পরিত্যক্ত হউক, কিন্তু তাহাদিগকে একটু দয়ার চক্ষে দেখিলেই কি মহাপাতক হয়? হা হৃদয়! যদি এই মনুষ্য-শরীরেই নিতান্তই বাস করিবে, ত কেন সর্ব্ব-শক্তিমান হইয়া আসিলে না? হৃদয়-বিহীন লোকেরই ত পার্থিব সমাজে আদর ও প্রতিষ্ঠা!—যিনি ছলে, কলে, কৌশলে ধন পার্জ্জন করিতেছেন ও সামাজিক নীরস অঙ্কশাস্ত্রের অনুসারে আদান প্রদানের হিসাব ঠিক রাখিতে পারিয়াছেন, এবং ঘড়ীর কাঁটার মত লোক লৌকিকতা বিষয়ে একটী চুল-মাত্র ব্যতিক্রম করেন না, তিনিই সমাজের পূজ্য দেবতা ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উপমাস্থল! তবে আর হৃদয়ের আবশ্যকতা কোথায়? আমি কর্ত্তব্য-জ্ঞানে জানিতেছি যে "মিথ্যা কথা কহায় মহা পাপ"—কিন্তু একদিন দেখিলাম যে একজন নিঃসহায়া যুবতী সতী একটী ঘোর পশুবৎ চণ্ডালের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া একটী পর্ব্বত-কন্দরে লুকাইয়া নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে আমাকে বলিল যে "আমি যে এখানে লুকাইয়াছি—তাহা ও পামরকে বলিও না"—সহসা সেই পশুবৎ চণ্ডাল আসিয়া সেই যুবতী কোথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি বলিলাম যে "আমি জানি না।"—সমাজ!—আমি কি এই মিথ্যা কথার অপরাধে বাস্তবিকই অপরাধী হইলাম?—হইলেও হইতে পারি, কিন্তু, হে মানব-সমাজ! তোমার বিচার-ক্ষমতা আমি বুঝিয়াছি! আমি ঘোর পাতকী হইলেও তোমার "ডিক্রী ডিস্‌মিস্" অনুসারে আর লোমাঞ্চিত বা বিকম্পিত হইব না! কবিবর বায়রণের ব্যাপার হইতে জানিয়াছি এবং সামাজিক প্রায় সকল ব্যাপারেই দেখিতে পাইতেছি যে অপরাধীর প্রতি অগ্রে তোমার দণ্ড-আজ্ঞা, তাহার পরে অপরাধের বিবরণ পরীক্ষা, তাহার পরে অপরাধের অপরাধিত্ব আলোচনা, এবং সকল শেষে "কে অপরাধী" তাহাই বিবেচ্য! ছিঃ ছিঃ এই জন্যই

অনেক সহৃদয় লোকেও সমাজ-দ্বেষী হইয়া থাকে! একটি অপরাধের সমস্ত ঘটনাগুলি বিবেচনা না করার জন্য এক পরিবারের মধ্যে কলহ ও অশান্তি বিরাজ করে— উদারতার দ্বার রুদ্ধ হয় ও সাধু ইচ্ছার ভাব মরুময় হইয়া যায়? অপরাধী হয় লোক-গঞ্জনাতে ম্রিয়মাণ হইয়া শেলীর মত চির-কালেই কষ্ট পায়, নহেত ক্রুদ্ধ হইয়া বায়রণের মত প্রতিহিংসার বজ্র চারিদিকে ক্ষেপণ করিতে চেষ্টা করে। হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বা অমোঘ অদৃষ্ট-জনিত অপরাধ সমূহের পরিমাণ যন্ত্র সমাজের কথা বা কটাক্ষ নহে—তাহাদের পরিমাণ যন্ত্র অপরাধীদের অনুতাপের অশ্রুজল। রত্নাবলীর অপরাধ বাসবদত্তার তিরস্কারের দ্বারা পরিমিত হয় না, তাহা রত্নাবলীর অনুতাপের অশ্রুজলের দ্বারাই পরিমিত হইতে পারে। শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের জন্য দুষ্মন্তের অপরাধ গৌতমী ও কণ্ব-শিষ্য দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে না, তাহা কেবল দুষ্মন্তেরই অনুতাপের অশ্রুজল দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে! যদি কেহ যত্ন করিয়া সেই অশ্রুজল বিশ্লেষ করিয়া দেখেন, ত তিনি দেখিতে পাইবেন যে সেই অশ্রুজলে অপরাধ স্বীকার—অপরাধের গুরুত্ব স্বীকার—সে অপরাধ আর করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা— ও আপনার দ্বারাই আপনি দণ্ডিত হওয়ার জন্য কতকটা শাস্তি—এই কয়েকটী উপাদান বিদ্যমান আছে! এই জন্য অনুতাপের অশ্রুজলের এতদূর গৌরব! সে অশ্রুজলে স্বার্থপরতা নাই, পার্থিব কলঙ্ক নাই, সঙ্কুচিত ন্যায়শাস্ত্র নাই! তাহা অনাবৃত হৃদয়ের উদারতাময়, বর্ত্তমান কালে যাতনাময় হইলেও ভবিষ্যতের শান্তির অঙ্গীকার স্বরূপ! পৃথিবীর সকল লোককে যদি আমরা ভাবিয়া দেখি, ত দেখিতে পাইব, যে পৃথিবীতে তিন প্রকার লোক আছে। কোন লোক শত সহস্র প্রলোভনের মধ্যেও হিমাচলের মত অচল ও অটল থাকে,—প্রাকৃতিক সকল দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিয়া— শরীরের উপর, স্বীয় হৃদয়ের উপর, অসঙ্কুচিত আধিপত্য বিস্তার করিয়া মূর্ত্তিমান মহান ভাবের ন্যায় বিরাজ করিতে থাকেন!— ইহাঁদের আর অনুতাপের কারণ নাই— ইহাঁরা ধৈর্য্য বা স্থৈর্য্য বা গাম্ভীর্য্যের উদাহরণ স্থল হইয়া পড়িয়াছেন!—ইহাঁরাই এই পৃথিবীতে ধন্য!—এই জন্যই আমরা লক্ষ্মণ ও ভীষ্মদেব ও অর্জ্জুনকে এত প্রশংসা করি। কিন্তু পৃথিবীতে আর এক শ্রেণীর লোক আছে—তাহারা অন্যায় কার্য্য করে— গভীর অন্যায় কার্য্য করে, অথচ তাহাদের মনে অনুতাপ কখনই হয় না! পাপের কল্পনাতে—পার্থিব ক্ষমতার প্রভাবে পুনঃ পুনশ্চ পাতকের অভিনয়ে স্বীয় হৃদয়কে এতদূর পাষাণ করিয়াছে যে তাহাদের মনে অনুতাপের অগ্নির ধূম পর্য্যন্ত উঠে না! সীজার বর্জীয়া স্বীয় সহোদরাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে—স্বীয় পিতাকে হত্যা করিতে— স্বদেশীয় সুরূপা কামিনীকে বিবাহ-যজ্ঞ হইতে সবলে কাড়িয়া লইতে কখন সঙ্কুচিত হয় নাই!—কারণ, সীজার বর্জীয়ার সমস্ত হৃদয় পাপে এতদূর সংলগ্ন—যে মরিবার

কালেও সে ইহাদের কথা উল্লেখ করে নাই! এই সকল লোকের কথা আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যে মনে করি না। চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক আছে পৃথিবীতে যেমন সর্প ও শার্দ্দূল আছে, মনুষ্য-সমাজেও বরজীয়া বা চেঞ্চী বা আইরীণের মত পুরুষ ও রমণী থাকিবে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রথম শ্রেণীর পর্ব্বত সদৃশ মহান ভাবের প্রতিমা যেরূপ বিরল, দ্বিতীয় শ্রেণীর বিভীষিকাময় মূর্ত্তিও তদ্রূপ বিরল। পৃথিবী ভীষ্মদেবময় হইলে যেমন তাহা স্বর্গতুল্য হইত, আবার বরজীয়া বা চেঞ্চীময় হইলে তাহা প্রকৃত নরক প্রতিম হইত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে পৃথিবী স্বর্গও নয়, পৃথিবী নরকও নয়—পৃথিবী পৃথিবীই! আমরা প্রথম শ্রেণীর লোকদিগকে ভক্তি করি—দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে ঘৃণা বা ভয় করি, কিন্তু এই দুই শ্রেণী ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদিগকে আমরা দয়া করি—যাহাদিগকে আমরা কৃপাপাত্র মনে করি! তাহারা কে?—তাহারা পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ সকলেই! গভীর রজনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে জিজ্ঞাসা কর—দূর দূরস্থ পরিহাসময়ী তারকাদিগকে জিজ্ঞাসা কর—তাহারা সকলেই সমস্বরে বলিবে যে ঐরূপ কৃপাপাত্র পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ সকলেই! প্রতি নৈশ বায়ু হিল্লোলেই কবি ট্যাসোর দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাইবে, এমী রবসার্টের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইবে—সর্ব্বত্যাগিনী ইলাইসার বা সর্ব্বচ্যুতা রেবেকার মর্ম্মভেদী আর্ত্তরব শুনিতে পাইবে! কিন্তু সে সকল রোদনধ্বনি কে শুনে? "বাইরণ নীতিভ্রষ্ট ছিল—এমা রবসার্ট পদাভিলাষী ছিল, রেবেকার দুর্ব্বল হৃদয় ছিল—সুতরাং সকলেই হেয়—ঘৃণা—অভিশপ্ত!"—হইতে পারে তাঁহারা অভিশপ্ত!—কিন্তু তাহার জন্যই কি তাঁহারা দয়া ও মমতার সামগ্রী নহেন? এমন শত সহস্র অপরাধী হয় ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনবরত অনুতাপের অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াও আবার সেই অপরাধে দিন দিন অপরাধী হইতেছে! কিন্তু তথাপি কি তাহারা কৃপাপাত্র নহে! আমরা জানি যে এক সময়ে একটি প্রকাণ্ডকায় হস্তী একটি বালুকাময় স্বল্প-জল নদী পার হইতে গিয়া নদীর বালুকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়—হস্তী যতই শক্তি সহকারে উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই আপনার দেহের ভরে বালুকা মধ্যে গাঢ়তর রূপে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল,—চারিদিকের লোকেরা নিরুপায় হইয়া দেখিল যে হস্তীটি ক্রমে ক্রমে পাতালসাৎ হইয়া গেল। মানুষেরও কি এইরূপ হয় না?—পরিহার্য্য পাপে লিপ্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যাইয়াও কি সময়ে সময়ে গভীরতররূপে সেই পাপে নিমজ্জিত হইতে হয় না?—প্রতিপদে অপরাধ—প্রতিপদে অনুতাপ—অথচ প্রতিপদে সেই অপরাধের পুনঃ পুনঃ অভিনয়—ইহা সত্বেও কি সেই অপরাধী কৃপাপাত্র নহে? যদি তাহা না হয়—ওঁ—জগদীশ্বর! আর কেন আমাদের উপর জীবনের বিড়ম্বনা!

মনু ও বেদের অব্দ নির্ণয়।

প্রলয়ের পূর্ব্বেও যে শ্রুতির কিয়দংশ রচিত হইয়া পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল তাহা প্রলয়ের পর বেদোদ্ধার প্রসঙ্গে অবগত হওয়া যাইতেছে। এবং এই প্রলয় বৃত্তান্তও বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের প্রলয়োপাখ্যানে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, ইহাও অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত বিসংবাদী নহে। আমরা ঐ বৃত্তান্তের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

"স হোবাচ অপীপরং বৈত্বা বৃক্ষেনাবং প্রতিবধ্নীব। তং তু ত্বা মা গিরৌ সন্তমুদক মন্তশ্ছৎসীৎ যাবদুদকং সমবায়াৎ তাবৎ তাবদন্ববসর্পাসীতি। সহ তাবত্তাবদেবান্ববসসর্প॥"

তিনি (মৎস্য) কহিলেন আমি তোমাকে রক্ষা করিয়াছি, তুমি এই বৃক্ষে নৌকাবন্ধন কর। কিন্তু তুমি এই পর্ব্বতে থাকিতে থাকিতে জল যেন তোমাকে ছাড়িয়া না যায়। জল যত নীচে নামিতে থাকিবে তুমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তত নামিতে থাকিবে। তিনিও তত (অর্থাৎ জলের অবতরণ অনুসারে) অবতরণ করিলেন।

যে শৃঙ্গে মনু নৌকাবন্ধন করিয়াছিলেন বেদব্যাসের সময়ে তাহা নৌবন্ধন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যথা—

অথাব্রবীৎ তদা মৎস্যস্তানৃষীন্ প্রহসন্ শনৈঃ।
অস্মিন্ হিমবতঃ শৃঙ্গে নাবং বধ্নীত মা চিরম্।
সা বদ্ধা তত্রত তূর্ণ মৃষিভি র্ভরতর্ষভ।
নৌ মৎস্যস্য বচঃ শ্রুত্বা শৃঙ্গে হিমবতস্তদা।
তস্য নৌ-বন্ধনং নাম শৃঙ্গং হিমবতঃ পরং॥
খ্যাতমদ্যাপীত্যাদি।

মহাভারতং।

অনন্তর মৎস্য হাসিতে হাসিতে সেই ঋষিদিগকে কহিলেন এই হিমবানের শৃঙ্গে শীঘ্র নৌকা বন্ধন কর। হে ভরতর্ষভ, মৎস্যের বচন শ্রবণ করিয়া ঋষিরা সেই নৌকাখানি সেখানে বন্ধন করিলেন। সেই হেতু সেই শৃঙ্গ অদ্যাপি নৌবন্ধন নামে খ্যাত আছে।

যদি এই সকল বচন বিশ্বাস করা যায় অর্থাৎ বেদ প্রলয়ের পূর্ব্বেও রচিত হইয়াছে এরূপ বিশ্বাস করা যায় তবে বেদশাস্ত্র দ্বারা ৫০০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সকলও প্রমাণিত হইতে পারে এ কথাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কিন্তু বেদের সমুদায় অংশ দ্বারা যে ঐরূপ সপ্রমাণ হয় এ কথা বলা যায় না। কারণ সমুদায় সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ঐ প্রাচীন কালের রচিত নহে। ঋক্‌সূত্র সকলকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়। ভূরি ভূরি ইতিহাসবিৎ ও ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরা তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহারাই যে অক্ষর সৃষ্টির পূর্ব্বে আর্য্যজাতির উচ্চার্য্যমান ভাষার সহিত অথবা আর্য্যজাতির সমুদ্ভবের সহিত রচিত, শ্রুত, ও রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে এরূপ অনুমান করা যা-

হইতে পারে। কিন্তু এই ঋক্ সূত্র সকলের মধ্যে আবার কোন্ গুলি পূর্ব্ববর্ত্তী ও কোন্ গুলি তৎপরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে তাহা অনুমান করার কোন সুবিধা নাই, তবে সামান্যতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে যে আর্য্যদিগের এদেশে আগমন, অত্রত্য আদিমবাসীদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ ও অধিকার বিস্তার সূচক বিবরণ সমুদায়কে যেমন এদেশে আগমনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে রচিত বলিয়া বোধ হয় তেমনই ইহাঁদের এই সকল ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয় সূচক ও ইহাঁদিগের পূর্ব্বাবাসভূত হিমালয়ের অপর পার্শ্বস্থ দেশ সম্বন্ধীয় নানাবিধ ঘটনাবলী ও তৎসম্বন্ধীয় প্রকৃতিমূলক বিবিধ বিষয় যাহা এদেশ সম্ভাবিত বলিয়া কোন মতে প্রতীত হইতে পারে না সেই সকল রচনাই ঐ সকল রচনার পূর্ব্বকালবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক যে এই পূর্ব্ববর্ত্তী কাল কোন্ কাল হইতে পারে। যদি সংস্কৃতভাষী ব্যাসের সময়ের সেই সেই উন্নতি সাধন করিতে ভারতবর্ষীয় ঋক্ সূত্র ভাষা ব্যবহারী অনুন্নত আর্য্যদিগের অন্ততঃ ১৫০০ বৎসরও লাগিয়া থাকে তবে যুদ্ধ বিগ্রহাদিসূচক ঋক্ সকল অন্ততঃ ৪৩৩০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। ফলতঃ যদি সমভাষা ব্যবহারী ব্যাস ও কালিদাসের সময়ের Accelerating motion এর উন্নতির মধ্যে ১৩০০ বৎসর বিগত হইতে পারে তবে সংস্কৃতভাষী ব্যাস ও ব্রাহ্মীভাষা ব্যবহারী অপেক্ষাকৃত অমার্জ্জিত প্রকৃতিক ছন্দঃপ্রণেতা ঋষিগণের মধ্যে যে অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকিবে তদ্বিষয়ে কোনও আপত্তি হইতে পারে না। অতএব তদনুসারে, ব্যাসের প্রাদুর্ভাব সময় এখন হইতে স্থূলতঃ ৩৩০০ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর ১৫০০ সমুদায়ে ৪৮০০ হওয়াতে ছন্দঃ প্রণেতৃ ঋষিগণের প্রাদুর্ভাব সময় এখন হইতে স্থূলতঃ ৪৮০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

এদিকে দেখা যাইতেছে যে প্রায় সমুদায় প্রাচীন জাতীয় শ্রুতি ও শাস্ত্রে জগৎ প্রসিদ্ধ সর্ব্বপ্রধান প্রলয় ঘটনা ঐ রূপ সময়ের বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং পরম সম্মাননীয় ঋক্ সূত্র সকলের মধ্যেও কতক গুলি, দেশান্তর হইতে আর্য্যদিগের এদেশে আগমন ও রাজ্যাধিকার ঐ প্রলয়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়াই প্রমাণ প্রদান করিতেছে। যথা—

"তেনৈতমুত্তরং গিরিমতিদুদ্রাব। সহোবাচ অপীপরং বৈত্বা বৃক্ষে নাবং প্রতিবধ্নীষ। ত্বং তু মা গিরৌ সন্তমুদক মন্তশ্ছেৎসীৎ যাবদুদকং সমবায়াৎ তাবৎ তাবদন্ববসর্পাসীতি। সহ তাবত্তাবদেবান্ববসসর্প। তদপ্যেতদুত্তরস্য গিরের্মনোরবসর্পণমিতি।

শতপথব্রাহ্মণ।

তদ্দ্বারা তিনি (মনু) এই উত্তর পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। তিনি (মৎস্য) কহিলেন আমি তোমাকে রক্ষা করিয়াছি, তুমি এই বৃক্ষে নৌকা বন্ধন কর। কিন্তু জল যেন গিরি স্থিত তোমাকে ছাড়িয়া দূরে না যায়। যে যে পরমাণে জল নামিতে থা-

কিবে সেই সেই পরিমাণে তুমিও অবতরণ করিবে। তিনিও সেই জলের অবতরণ অনুসারে অবতরণ করিতে লাগিলেন। এই সেই মনুর উত্তর পর্ব্বত হইতে প্রসিদ্ধ অবতরণ বৃত্তান্ত।

অতএব প্রলয়ের অব্যবহিত পরেই মনুর আগমন সূচিত হইতেছে। তাহা হইলে ঐ আগমন অবশ্যই এখন হইতে পশ্চাৎবর্ত্তী ৪৯৮০—৮১ বৎসর মধ্যে হইয়াছিল। ফলতঃ মনু যে এদেশে আসিয়া অত্রত্য অধিবাসীগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও অবশেষে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আর্য্যদিগের এদেশে প্রথম রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ভূরি ভূরি ঋক্ সূত্র দ্বারাও অবগত হওয়া যাইতেছে। আমরা এস্থলে তাহার দুই একটি উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

অথ দাসস্য নমুচেঃ শিরো
যদাবর্ত্তয়ো মনবে গাতু মিচ্ছন্।
স্ত্রিয়ো হি দাস আয়ুধানি চক্রে
কিংমাং করন্নবলা অস্য সেনাঃ॥
অন্তর্হি্ অখ্যদুভে অস্যধেনে
অথোপপ্রৈদ্ যুধায় দস্যুমিন্দ্রঃ॥

৫।৩০।৭,৯।

মনুর যশোগান করিতে ইচ্ছা করিয়া তুমি (ইন্দ্র সম্বোধন) নমুচি নামক দাসের শিরশ্ছেদ করিয়াছ। (অর্থাৎ তোমার ইচ্ছায় মনু নমুচিকে হত করিতে সক্ষম হইয়াছেন) দাসেরা তাহাদিগের স্ত্রীগণকেও যুদ্ধ করাইয়াছিল কিন্তু তাহাদিগের অবলা সেনারা আমাদিগের কি করিতে পারে। তাহারা দুইটি সুন্দরী স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। অনন্তর ইন্দ্র যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিলেন।

ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমান মার্য্যং প্রাবদ্ বিশ্বেষু শতমূতি রাজিষু স্বর্মী হেলষু আজিষু। মনবে শাসদব্রতান্ ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ॥

ইন্দ্র * পুনঃ পুনঃ শত শত প্রাণঘাতী স্বর্গপ্রদ যুদ্ধে অব্রতদিগকে (দস্যু প্রভৃতি জাতিকে) শাসন করিয়া যজমান আর্য্যদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি ঐ কৃষ্ণত্বক্দিগকে (দস্যু প্রভৃতিকে) মনুর অধীন করিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রসাদে মনু জয়ী হইয়াছেন।

প্রাচীনকালের আর্য্যেরা আপনাদিগের কার্য্য সকল দেবতাতে আরোপণ করিতেন, অতএব স্বয়ং ইন্দ্রকর্ত্তৃক এই সকল কর্ম্ম কৃত হইয়াছিল এমন মনে করিবেন না। তাহার প্রমাণার্থ আমি একটি স্পষ্ট উদা-

* ইন্দ্র আর্য্য রাজাদিগের উপাসনীয় যুদ্ধাধিদেব। বজ্র ইঁহার অমোঘ অস্ত্র। মেঘ বৃষ্টি ইঁহার আয়ত্ত। ইঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত শস্যাদি উৎপন্ন হয় না, শস্য না হইলে সমুদায় জীব নষ্ট হয়, সুতরাং সমুদয় লোক ও দেবতারা ইঁহার অধীন যুদ্ধাধিদেব বলিয়া ইঁহাকে দেবরাজ বলা যায়। বিদ্যুৎ হেতুক ইনি সহস্র লোচন, তাহা ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত। ইঁহার পূজা রাজগণ মধ্যে বহু কালাবধি চলিয়া আসিতেছে। এখনও কৌমুদী বা ইন্দ্রধ্বজ নামে একটি উৎসব হইয়া থাকে।

হরণ দিতেছি যথা "ত্বং করঞ্জ মত পর্ণয়ং বধী তেজিষ্ঠয়া হতিথিগ্বস্য বর্ত্তনী।" ১।৫৩।৮। তুমি অতিথিগ্বের তীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা করঞ্জ ও পর্ণয়কে বধ করিয়াছ। করঞ্জ ও পর্ণয় বধ স্বয়ং ইন্দ্র কর্ত্তৃক হইলে অতিথিগ্বের ভল্ল দ্বারা এ কথাটির উল্লেখ করার আবশ্যক হইত না। এরূপ স্তোত্র সকলের অর্থ এই যে তুমি অতিথিগ্ব কর্ত্তৃক ভল্ল দ্বারা ঐ উভয় দস্যুকে হত করিয়াছ—বা তোমায় ইচ্ছায় বা অনুগ্রহে বা বরে অতিথিগ্ব উহা দগ্যকে বধ করিয়াছেন।

য ঋক্ষাদং হসো মুচদ্ যো বা
আর্য্যাৎ সপ্তসিন্ধুষু বধর্দাসস্য তু
বিনৃম্ন নীনসঃ। ঋক্ ৮।২৪।২৭।

যিনি আমাদিগকে হিংস্র শত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই শক্তিমান্ সপ্তসিন্ধু দেশে * আর্য্যগণ হইতে দাসদিগের বজ্র বিনিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

এই সকল এবং এরূপ আর আর বহু প্রমাণ দ্বারা প্রলয়ের পরেই অর্থাৎ এখন হইতে ৪৯৮১ বৎসর পূর্ব্বে যে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষভূত আর্য্যেরা ও তাঁহাদিগের প্রধানভূত মনু এদেশে আগমন করিয়া আর্য্যদিগের প্রথম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এরূপ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। এরূপ অনেক ঋক্‌সূত্র দেখা যায় যাহা ঐ সকল যুদ্ধ ঘটনাই বিজ্ঞাপন করিতেছে। 'অতএব ঐ ঋক্ সকল যে ৪৯৮১ হইতে কোন নিকটবর্ত্তী কালের মধ্যে রচিত হইয়াছে তাহাও অনুমিত হইতে পারে। কারণ মনুর আগমন, মনুর সহিত দাসদিগের যুদ্ধ, মনুর জয়লাভ এই সকল ঘটনা অবশ্যই মনুর সমকালবর্ত্তী বা তাহার পর কোন আসন্নকালবর্ত্তী লোকদিগের রচিত হইবে। কিন্তু মনুর আগমন ৪৯৮০ বৎসর পূর্ব্বে অনুমিত হইতেছে অতএব এতাদৃশ ঋক্ সকলও ঐ কাল বা তাহার সন্নিহিত কোন কাল হইবে। কারণ তাদৃশ কালের রচিত না হইলে "আমাদিগের কি করিতে পারে, আমার কি করিতে পারে, আমি করিতেছি" ইত্যাদি অস্মদ্ শব্দের ও বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রয়োগ হইত না। এবং স্থলে স্থলে এক এক দেশ জয়ের নিমিত্ত উৎসাহ ও স্তুতিপাঠাদিও দৃষ্ট হইত না। আমরা সেইরূপ দুই একটি ঋক্ উদ্ধার করিয়া দিতেছি। যথা—

অভীদমেকমেকো অস্মি নিষ্বাল অভিদ্বা কিমু ত্রয়ঃ করন্তি। খলে ন পর্ষান্ প্রতিহন্মি ভূরি কিং মা নিন্দন্তি শত্রবোঽনিন্দ্রাঃ। ১০।৪৮।৭।

আমি একাকী এই এক শত্রু জয় করিতেছি, আমি দুই শত্রু জয় করিয়াছি, তিনজনেই বা আমার কি করিতে পারে। প্রাঙ্গণে শস্য ব্যহের ন্যায় আমি অসংখ্য শত্রু নিপাত করি। ইন্দ্রদ্বেষী শত্রুরা কেন আমাকে নিন্দা করে।

অহং পুরো মন্দসানো বৈরং নবসাকং নবতীঃ শম্বরস্য শততমং বৈশ্যং সর্ব্বতাতা-দিবোদাস মতিথিগ্বঃ যদাবম্। ।২৬।৩।

আমি উৎসাহিত হইয়া এককালে

* এই সপ্তসিন্ধু দেশ যে ভারতবর্ষ তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

শম্বরের ৯৯ নগর ধ্বংশ করিয়াছি এবং শততম নগর তাহাকে বাসকরণার্থ প্রদান করিয়াছি। এবং দিবোদাস অতিথিম্বকে রক্ষা করিয়াছি।

এই সকলকেও যদিও কেহ অতীত ঘটনার অনেক পরবর্ত্তী অনুমান করিতে পারেন, তথাপি দাসদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের ভবিষ্যৎকালসূচক প্রার্থনা গুলিকে কখনই সেরূপ মনে করিতে পারেন না। যথা—

অস্মন্যন্তং সমং তদহি দূনাশং যো ন তে ময়ঃ। অস্মভ্যমস্য বেদনং দদ্ধি সূরিশ্চিদোহতে। ১।

কঠিন হইলেও অহোমকারী সুতরাং অবহেলনকারীদিগকে তোমরা বধ কর। আমাদিগকে তাহাদিগের ধন প্রদান কর। পূজকেরা ইহা আশা করে।

যো নো দাস আর্য্যো বা পুরুষ্টুত অদেব ইন্দ্র যুধয়ে চিকেতধি। অস্মাভীষ্টে সুসহাঃ সন্তু শত্রবস্ত্বয়া বচং তানং বনুয়াম সঙ্গমে। ১০।৩৮।৩।

হে অনির্ব্বচনীয় ইন্দ্র, দাসই হউক আর আর্য্যই হউক যে অদেব পুরুষ আমাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে সেই শত্রুগণ যেন আমাদিগকর্ত্তৃক অনায়াসে দমিত হয়, আমরা যেন তাহাদিগকে সংগ্রামে বধ করিতে পারি।

দাসা চ বৃত্রা হত আর্য্যাণি চ সুদাসমিন্দ্রাবরুণা বসাবতম্। ৭।৮৩।১।

দাস সকলকে এবং শত্রুভূত আর্য্যদিগকে বধ কর। হে ইন্দ্র বরুণ তোমরা আশ্রয় প্রদান করিয়া সুদাস রাজাকে রক্ষা কর।

হতো বৃত্রাণি আর্য্যা হতো দাসানি সত্যতী হতো বিশ্বা অসদ্বিষঃ। ৬।৬০।৬।

হে ধার্ম্মিকবর সকল তোমরা আমাদিগের আর্য্যশত্রু এবং আমাদিগের দাসশত্রুদিগকে (যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে) বধ কর।৮

ত্বং তাং ইন্দ্র উভয়াং অমিত্রান্ দাসা বৃত্রাণি আর্য্যা চ শূরং, বধীঃ। ৬।৩৩।৩।

হে শূর ইন্দ্র তুমি দাস এবং আমাদিগের যে সকল আর্য্য শত্রুপক্ষে গিয়াছে তাহাদিগকে বধ কর।

ইন্দ্র জামর উত যে অজাময়ো অর্ব্বাচীনামোবনুষো যুযুজে। ত্বমেষাং বিথুরা শবাংসি জাহি বৃষ্ণ্যানি কৃণুহি পরাচঃ। ৬।২৫।২,৩।

হে ইন্দ্র যাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে তাহারা আত্মীয়ই হউক আর অনাত্মীয়ই হউক তাহাদিগের ক্ষীণবলকে বিনাশ কর, তাহাদিগকে পরাস্ত কর।

যদিও মনুর পরবর্ত্তী কক্ষীবান্ উশশঃ ঋজিশ্বান অতিথিম্ব পুরুকুৎস তৎপুত্র ত্রসদস্যু ও পূরু, তূর্ব্বাণ দভীতি, সুদাস সুগ্রবা পুরূরবা দিবোদাস প্রভৃতি রাজাদিগের সহিতও সময়ে সময়ে বিদ্রোহকারী দস্যুদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল ও তত্তৎকালে এরূপ প্রার্থনা সূচক ঋক্ সকল রচিত হইয়াছিল দেখা যাইতেছে এবং মনুসময়ের রচিত বলিয়া কোন বিশিষ্ট ঋক্ আমরা আপাততঃ প্রাপ্ত হইতেছি না

তথাপি ঐ সকল রাজাদিগের সময় ও মনু-সময় হইতে অধিক দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় না; কারণ এই পুরূরবা মনু হইতে তৃতীয় পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। যথা—

'ইষ্টিং মিত্রাবরুণয়োর্ম্মনুঃ পুত্রকামশ্চকার। তত্রাপহুতে হোতুরপচারাদিলা নাম কন্যা বভূব। সৈব মিত্রাবরুণপ্রসাদাৎ সুদ্যুম্নো নাম মনোঃ পুত্রো মৈত্রেয় আসীৎ। পুনশ্চেশ্বরকোপাৎ শ্রীমতী সোমসূনোর্বুধস্যাশ্রমসমীপে বভ্রাম। সানুরাগশ্চ তস্যাং বুধঃ পুরূরবসমাত্মজমুৎপাদয়ামাস।'

বিষ্ণু পুরাণ ৪।১।৫-৮।

মনু পুত্রকামনায় মিত্রাবরুণের পূজার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে হোতার ক্রটী বশতঃ পুত্র না জন্মাইয়া ইলা নামে একটী কন্যা জন্মিল। পরে সেই কন্যাই আবার মিত্রাবরুণের প্রসাদে সুদ্যুম্ন নামক পুত্র হইল। এই সুদ্যুম্ন ঈশ্বরের কোপে পুনরায় স্ত্রী হইয়া একদা চন্দ্রপুত্র বুধের আশ্রমসমীপে ভ্রমণ করিতেছিলেন। বুধ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাতে পুরূরবা নামে পুত্র উৎপন্ন করিলেন।

ফলত এই পুরূরবা মনু হইতে তৃতীয় অথবা পঞ্চম পুরুষই হউন তাহা হইলেও এই সময় মনুসময় হইতে অধিক দূরবর্ত্তী হইবে না, অতএব ঋক্‌সূত্র সকল যে সাম্যন্ততঃ ৪৮০০ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে অনুমান করা গিয়াছে, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না এবং মনুর আগমন সময় যে ৩৭৮০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত বোধ হয় না।

সম্পাদকের বৈঠক।

দোকান্‌দার বড়লোক।

(নাটক)

(বুর্জোয়া জাঁতিয়ম্ হইতে অনুবাদিত)

সকলেই জানেন, সমালোচকগণ মোলিয়েরকে (MOLIÈRE) হাস্য রস-কবিদিগের শীর্ষ স্থানীয় বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহারই রচিত একটি বিখ্যাত প্রহসন আমরা মূল ফরাসীস্ হইতে অনুবাদ করিয়া নমুনা স্বরূপ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

প্রথম অঙ্ক। ১ দৃশ্য।

(গান-বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ, ও তাহাদের দলবল)

গানের ওস্তাদ।—(দলের প্রতি) এসহে, তোমরা এই ঘরে এস; যতক্ষণ না তিনি আসেন এই খানে বোসে একটু আরাম কর।

নাচের ওস্তাদ।—(তার দলবলের প্রতি) তোমরাও এই দিকে ব'স।

গানের ওস্তাদ।—(ছাত্রের প্রতি) সেটা কি তৈরি হয়েছে?

ছাত্র।—হাঁ হ'য়েছে।

গা-ওস্তাদ।—দেখি; বাঃ বেশ হয়েছে যে!

না-ওস্তাদ।—ওটা কি কিছু নতুন চীজ্ তৈরি হল নাকি?

গা-ওস্তাদ।—ওটা একটা বিরহ টপ্পা। আমার ছাত্রকে দিয়ে এই খেনেই ওটা তৈরি করিয়েছি।

না-ওস্তাদ।—আমি কি দেখ্‌তে পারি?

গা-ওস্তাদ।—যখন আমাদের মনিবের কাছে গাওয়া হবে তখনই শুন্‌তে পাবে। আর বেশী দেরি নেই।

না-ওস্তাদ।—আজ কাল আমাদের দুজনের হাতেই খুব কাজ।

গা-ওস্তাদ।—তা সত্যি। আমাদের ঠিক মনের মতন মনিবটি পেয়েছি। আমাদের মনিবই আমাদের জমিদারী। দোকানদার হঠাৎ বড় মানুষ হ'য়ে উঠেছে, মাথায় কতই সক চেপেছে। এই রকম সব কাপ্তেন পেলে আমরা আর কিছুই চাইনে।

না-ওস্তাদ।—কিন্তু ভাই একটু সমজ্‌দার লোক না হলে তেমন সুখ হয় না।

গা-ওস্তাদ।—তা সত্যি। কিন্তু তাতে কি এল গেল? আমাদের ত বেশ টাকা দেয়; টাকা পেলেই আমাদের ব্যবসা গুল্‌জার!

না-ওস্তাদ।—আমার কথা যদি বল, ত ভাই, বল্‌তে কি, আমি একটু প্রশংসা চাই। বাহবা পেলে আমার মনটা খুব গলে। আর তাও বলি—একটা উজবুক্ জানোয়ারের কাছে গান বাজনা শোনান' বড় ঝক্‌মারি—হাঁ, যারা বোঝে, তাদের শুনিয়ে সুখ আছে।

গা-ওস্তাদ।—তা' সত্যি; কিন্তু ফাঁকা বাহবার সঙ্গে কিছু কিছু নিরেট মাল থাকাও চাই। লোকটা নেহাৎ বোকা, নিতান্ত উজবুক্ বটে, কিন্তু ইদিকে টাকা কড়ি বেশ দেয়, আর কি চাই বল? যে বড় লোকে এখানে আমাদের পরিচয় ক'রে দিয়েছে, তার চেয়ে এই সামান্য দোকান্‌দারটা অনেক ভাল।

না-ওস্তাদ।—হাঁ, তুমি যা' বল্‌চ তা কতকটা সত্যি বটে—কিন্তু তুমি ভাই টাকা টাকা ক'রে গেলে যে! টাকাটা বড় নীচ জিনিয। টাকার উপর অত টান থাকা কি ভাল মানুষের উচিত?

গা-ওস্তাদ।—কিন্তু মুখে তুমি যাই বল, টাকা নিতে ত বড় কসুর কর না।

না-ওস্তাদ।—তা নিই বটে, কিন্তু আ-

এমন মিষ্ট মুখশশি পাঁঠা কোথায় লাগে ?
হায়, হায়, দেখ্ছি এখন, এমন তোর
কঠিন মন
তোর কাছে (জান্তে রে আমার) হার মানে
বনের বাঘে !

এ গানটা খুব সরেস না ?

গা-ওস্তাদ।—বড় সরেস। এমন আর হয় না !

না-ওস্তাদ।—আর হুজুর কি চমৎকার গান করেন ! কি সরেস গলা !

জু।—অথচ আমি কখন গান শিখিনি।

গা-ওস্তাদ।—হুজুর যেমন নাচ শিখ্চেন, তেমনি গান শেখাও আপনার কর্ত্তব্য। এই নাচ আর গান বাজ্না—এই দুটোতে বড় যোগ আছে।

না-ওস্তাদ।—আর নাচ গান শিখ্লে যেমন দেল্ খুলে যায় এমন আর কিছুতে না।

জু।—আচ্ছা বড় লোকেরাও কি গান বাজনা শেখে ?

গা-ওস্তাদ।—হাঁ মশায় শেখে বৈ কি !

Aussi douce que belle ;
Je croyios Jeanneton
Plus douce qu'un mouton.
Hélas ! Hélas !
Elle est cent fois, mille fois plus cruelle
Que n'est le tigre aux bois.

আমরা mouton (ভ্যাড়া) শব্দ পাঁঠা বলিয়া অনুবাদ করিয়াছি।

জু।—তবে আমি শিখ্ব। কিন্তু কে জানে শিখ্তে কতদিন লাগবে ! কেননা তলোয়ার খেল্বার ওস্তাদ ছাড়া একজন পণ্ডিতও রেখেছি, তাঁর কাছে আজ্ সকালে তত্ত্ববিদ্যা শিখ্ব।

গা-ওস্তাদ।—হাঁ—তত্ত্ববিদ্যা একটা চীজ্ বটে, কিন্তু হুজুর গান—গান—

না-ওস্তাদ।—গান আর নাচ—গান আর নাচ—এই দুই বিদ্যেই যথেষ্ট।

গা-ওস্তাদ।—রাজ্যের মধ্যে গান যেমন কাজের এমন আর কিছুই না।

না-ওস্তাদ।—নাচ যেমন মানুষের পক্ষে আবশ্যক এমন আর কিছু না।

গা-ওস্তাদ।—গান না হ'লে রাজ্য চল্তেই পারে না।

না-ওস্তাদ।—নাচ না হ'লে মানুষ কোন কাজই কর্তে পারে না !

গা-ওস্তাদ।—পৃথিবীতে যত গোলমাল, যত ঝগড়া ঝাঁটি দেখা যায়, তা কেবল গান না জানার দরুণই হয় !

না-ওস্তাদ।—মানুষের যত কিছু দুর্দ্দশা, ইতিহাসে যত কিছু বিপ্লবের কথা শোনা যায়, রাজমন্ত্রীদের যত কিছু ভুল হয়, বড় বড় সেনাপতিদের যত কিছু চুক হয়, তা' কেবল নাচ্তে না জানার দরুণই হয়।

জু।—সে কি রকম ?

গানের ওস্তাদ।—মানুষদের মধ্যে ঐক্যের অভাবেই কি যুদ্ধ বাধে না ?

জু।—তা সত্যি।

গা-ওস্তাদ।—যদি সকলেই সঙ্গীত

শেখে, তা'হলেই কি সকলের মধ্যে মিল্ হবার উপায় হয় না?

জু।—তুমি ঠিক বলেছ।

না-ওস্তাদ।—যখন কোন মানুষ, ব-ক্তোর মধ্যে কিম্বা তার পরিবারের মধ্যে কিম্বা সৈন্য চালনায় কোন ভুল করে, তখন কি লোকে বলেনা যে, অমুক লোকের অ-মুক কাজে পদস্খলন হ'য়েছে।

জু।—হাঁ লোকে তা'বলে বটে।

না-ওস্তাদ।—আর নাচ না জানবার দরুণ ভিন্ন আর কিসে পদস্খলন হয় বলুন?

জু।—তা' সত্যি। তোমরা দুজনেই ঠিক বলেছ।

না-ওস্তাদ।—তবে এখন দেখুন, নাচ গান কত কাজে লাগে?

জু।—এখন আমি বুঝ্তে পার্চি।

গা-ওস্তাদ।—আমাদের দুজনের কাজ কি তবে দেখ্তে চান?

জু।—হাঁ;

গা-ওস্তাদ।—আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি, গানেতে যে কত রকমের ভাব প্রকাশ করা যায় তারই একটা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই গান তৈরি করেছি।

জু।—তা' বেশ?

গা-ওস্তাদ।—(গাইয়ে বাজিয়েদের প্রতি) এদিকে এ'স। (জুর্দ্যার প্রতি) আপনার এ-খন কল্পনা কর্তে হবে যে, ওরা রাখালদের মত কাপড় পোরে আছে।

জু।—সারাদিন রাখাল কেন? সব জায়গাতেই ওদের দেখা যায়।

না-ওস্তাদ।—যখন কোন লোককে দিয়ে গান কোরে কথা কওয়াতে হয়, তখন তাকে রাখাল না সাজালে হয় না। কেননা গান করা চিরকাল রাখালদেরই সাজে, রাজা রাজ্ড়া কিম্বা জমিদারদের গান ক-রাটা স্বাভাবিক নয়।

জু।—আচ্ছা, আরম্ভ কর' দেখা যাক্।

(সকলে মিলিয়া গান)

গায়িকা।—

প্রেম যারা করে, শুখাইয়া মরে
দিবানিশি মন দহে;
লোকে কিন্তু বলে, সুখেই শুখায়
সুখেতেই শ্বাস বহে।
লোকে যা' বলুক্, কিছুই তা নয়,
স্বাধীনতা সম কিছুই নহে।

১ম গায়ক।—

প্রণয় যেমন আছে কি তেমন
মিশিলে মনেতে মনে?
মানুষের সুখ কোথা বল দেখি
প্রেমের লালসা বিনে,
প্রাণ থেকে যদি প্রেম তুলে লও
প্রাণ থেকে সুখ লইবে ছিনে।

২য় গায়ক।—

প্রেমেতে প্রেমিক খাঁটি থাকে যদি
কি সুখ প্রেমের চেয়ে!
কিন্তু হায় হায়, পাওয়া বড় দায়
খাঁটি রাখালের মেয়ে!
আমি বলি ভাল না বাসাই ভাল
অবিশ্বাসী নারী যত!

১ম গায়ক।—

কি আছে প্রেমের মত!

গায়িকা।—

স্বাধীনতা মজা ভারি!

২য় গায়ক।—

বিশ্বাসঘাতিনী নারী!

১ম গায়ক।—

তুমি মোর সাত রাজার ধন!

গায়িকা —

তুমি রে আবার সোণার চাঁদ!

২য় গায়ক।—

তোরে হেরি জ্বলে ঘৃণায় এ মন!

১ম গায়ক।—

সেত ভাল নয়, দূর কর' ঘৃণা,
ও কিও কথার ছাঁদ!

গায়িকা।—

খাঁটি রাখালিনী নারী
এখনি দেখাতে পারি!

২য় গায়ক।—

হায়, হায়, হায়, কোথায় সে জন!

গায়িকা।—

মোদের জাতির নাম বাঁচাইব,
আমিই রে তোরে সঁপিব মন!

২য় গায়ক।—

কিন্তু মন তোর আজ বাদে কাল
অবিশ্বাসী হবে না সে?

গায়িকা।—

পরখ ক'রেই দেখা যাবে দোঁহে
কে কেমন ভাল বাসে!

২য় গায়ক।—

চপল যে জন, মরুক্ সে জন!

তিন জনে।—

এস মোরা সবে প্রণয়ে মাতি!
প্রণয় কেমন মজার রতন
হৃদয়ে হৃদয় গাঁথি!

জুর্দ্দ্যা।—বস্, হ'য়ে গেল?

গা-ওস্তাদ।—হাঁ।

জুর্দ্দ্যা।—গানটা বেশ পরিপাটি। ওর মধ্যে বড় মজার মজার কতকগুল কথা আছে।

নাচের ওস্তাদ।—আমাদের কাজ তবে আরম্ভ করি। পা ফেলার যত রকম কারিগরী আছে, তা' সব দেখ্‌তে পাবেন।

জুর্দ্দ্যা।—ওতেও আবার রাখাল আছে নাকি?

নাচের ওস্তাদ।—এতে আপনি খুসী হবেন। (নাচিয়েদের প্রতি) চলুক্।—

(নৃত্য)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

কাব্য ও দুর্নীতি।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা দুর্নীতির উত্তেজক বলিয়া কাব্যের প্রতি দোষ আরোপন করেন। তাঁহারা বলেন কাব্যের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, উহার দ্বারা যে ফল হয় তাহা নীতি-বিরুদ্ধ। এমতটি ইয়ুরোপে সময় সময় মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। St. Augustine বলেন কাব্যে অনেক কল্পনা-প্রসূত মিথ্যা কথা আছে, সুতরাং উহা মিথ্যার আদি পুরুষ সয়তানের মদিরা স্বরূপ (Vinum daemonum)। এ যুক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, তবে একথাটা অরিজেনের মুখ-নিঃসৃত হইলে আরো ভাল হইত। কাব্য-জাত মিথ্যা মনের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়ে কিন্তু তাহাতে মনের উর্ব্বরতার অনেক বৃদ্ধি হয়।

অপর এক শ্রেণীর নীতিবেত্তারা অন্য কারণে কাব্যের নীতি-বিরোধ প্রমাণ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, কাব্যের দ্বারা মনোবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া কার্য্যকারিতার দিকে উন্মুখ হইয়া উঠে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোন কার্য্যেই তাহার পরিসমাপ্তি হয় না। এইরূপে উত্তেজিত মনোবৃত্তি উপযুক্ত উদ্যাপনে বঞ্চিত হইয়া ক্রমে নিজের কার্য্যকারিতা হারায়। তথন তাহার ফল হয় এই যে বাস্তব কোন ব্যবহার কিম্বা ঘটনাতেও মনোবৃত্তি আর তাহার নিয়োজিত কার্য্য করিতে চাহে না। একটা অন্যায় আচরণ দেখিলে আর আমাদের ক্রোধের উদ্রেক হয় না এবং ক্রোধ তাহার নিয়োজিত কার্য্য করে না, অর্থাৎ অন্যায়াচারীকে শাস্তি দেয় না। কাব্যে কোন একটা অন্যায় আচরণ দেখিলে আমাদের ক্রোধ হয় বটে কিন্তু তাহাতে অন্যায়াচারীর শাস্তি হয় না। সুতরাং ক্রমে ক্রমে এমন হইয়া পড়ে যে বাস্তব জীবনে অন্যায়াচরণ দেখিলে আমাদের ক্রোধ আর উত্তেজিত হয় না; আমরা অবিবাদে এক জনের উপর অত্যাচার দেখিয়া অত্যাচারীর অপ্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা করি। এরূপ ফল উৎপন্ন করিলে কাব্য যে নীতি-বিরোধী সে বিষয়ে আর বিসম্বাদ থাকে না।

সম্প্রতি একটি বাঙ্গালা পুস্তকে দেখিলাম পেলির এই মতটি বিয়োগান্ত কাব্যের সম্বন্ধে খাটান হইয়াছে। বলা বাহুল্য উক্ত মত কেবল মাত্র যে বিয়োগান্ত কাব্য সম্বন্ধেই খাটে এমন নহে, মিলনান্ত কাব্যেও ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। মনে কর, আমরা কাব্যে পড়িলাম যে, এক ব্যক্তি আপনার প্রাণ সঙ্কটেও আমাদের মমতাভাজন এক পাত্রের উপকার করিল, তাহাতে তাঁহার প্রতি আমাদের যে কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হয়, তাহা আমাদের প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এইরূপ অনেকবার হইলে

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে, বাস্তব জীবনে উপকার পাইলেও আমাদের কৃতজ্ঞতার উদয় হইবে না। এক কথায় সাধারণতঃ সকল কাব্যের প্রতিই এই দোষ অর্পিত হইতে পারে। একজন সমালোচক এই পুস্তকের সমালোচনায় উক্ত মতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দিয়াছেন। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে,পাকা ভিত্তির উপর মিথ্যা দাঁড়াইয়া. এবং কাঁচা ভিত্তির উপর সত্য দাঁড়াইয়া,—উপস্থিত মত ও তাহার সমালোচনাই তাহার এক প্রমাণ। সুতরাং এ বিষয়ে দুই একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

কাব্যে বর্ণিত ঘটনা গল্প মাত্র এই জ্ঞানের উপরেই আমাদের কাব্য-রসাস্বাদিনী শক্তি নির্ভর করে; যে ঘটনা আমরা বাস্তব জীবনে দেখিলে শোকে অভিভূত হই, কাব্যে তাহাই পড়িয়া আমরা সুখ উপভোগ করি। দুঃস্বপ্ন দেখিবার সময় যদি আমাদের মনে হয় যে ইহা কেবল স্বপ্নমাত্র তাহা হইলে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না, বরঞ্চ অনেক সময় ভাল লাগে।* ইহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাস্তব জীবনে যে পরিমাণে আমাদের মনোবৃত্তি উত্তেজিত হয় কাব্যে ততদূর হয় না; সুতরাং কাব্য পাঠে আমাদের মনোবৃত্তি উত্তেজনামান-যন্ত্রের কার্য্যকারিতা ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে না। যদি উঠিত তবে দুঃখময় কাব্য পাঠ কথনই সুখকর হইত না, বরং তাহা যন্ত্রনার নিদান হইয়া উঠিত। এরূপ অবস্থায় কাব্যালোচনায় মনোবৃত্তির কার্য্যকালে অকর্ম্মণ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যদি কাব্যালোচনায় কতক পরিমাণে উত্তেজিত মনোবৃত্তিকে বশীকরণ শিক্ষা পাই তাহা হইলে কাব্য আমাদের উপকারী ব্যতীত অপকারী নহে। সকল সময় মনোবৃত্তি কার্য্যে পরিণত হওয়া, অসভ্য অবস্থায় যাহা হউক, বর্ত্তমান সভ্যতার অবস্থায় অপ্রার্থিত। যদি মনোবৃত্তি বশীকরণ পূর্ব্বোক্ত নীতিবেত্তাদের মতে দুর্নীত হয় তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দোষ পড়ে বর্ত্তমান সভ্যতার ঘাড়ে। যদি কাব্য পূর্ব্বোক্ত নীতিবেত্তাদিগের মতানুসারে মনোবৃত্তির উপর কার্য্য করে, তাহা হইলে কাব্য যে শুধু নীতি-গর্হিত ফল উৎপন্ন করে এরূপ নহে। তাহা হইলে অনায়াসেই কাব্যকে নীতি সংরক্ষণ কার্য্যেও নিযুক্ত করা যাইতে পারে। একটি সুন্দরী কুলরমণীকে দেখিবামাত্র মনে কুচিন্তাকে স্থান দেওয়া একটা নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নীতিবেত্তাদের মতানুসারে ঐরূপ কুচিন্তা উদ্রেকোপযোগী কাব্য পাঠ করিলে ক্রমশ ওরূপ অবস্থায় আর কুচিন্তা উদিত হইবে না। সুতরাং কাব্যের দ্বারা যদি ভাল মনোবৃত্তি ক্রমে ভোঁতা হইয়া যায় তবে কাব্যের দ্বারা মন্দ মনোবৃত্তিরও ক্রমে ক্রমে বিষদাঁত ভাঙ্গা যাইতে পারে।

আসল কথাটা এই, অন্যান্য চারু-শিল্পের (Fine arts) ন্যায় কাব্য একটী চিত্ততোষিণী বিদ্যা। ইহা মূলতঃ নীতি

* এবিষয় ভারতীয় তৃতীয় খণ্ডে "সুখ দুঃখের" প্রথম প্রস্তাবে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

রক্ষকও নহে নীতি ভক্ষকও নহে। তবে পৃথিবীর অপর সকল বিষয়ের ন্যায় ইহা দুর্নীতও হইতে পারে সুনীতও হইতে পারে। কিন্তু এটা বিশেষ রূপ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কাব্যের উদ্দেশ্য সুরুচি ও সুপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদের আমোদ দেওয়া; যে কাব্য আমোদ না দিয়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন করে তাহা অপর বিষয়ে খুব উৎকৃষ্ট হইলেও কাব্যাংশে নিকৃষ্ট।

একখানি কাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দোষ দুর্নীতি। একখানি কাব্যের যত অধিক সংখ্যক লোকের নিকট পরিচিত ও সমাদৃত হওয়া সম্ভব ও তাহার যেরূপ দীর্ঘ জীবন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে তাহাতে দুর্নীত কাব্য হইতে ভয়ানক অনিষ্ট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। দুর্নীতি দুই কারণে দূষনীয়। প্রথমতঃ দুর্নীতির কার্য্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ পক্ষে সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয় আর দ্বিতীয়তঃ, দুর্নীত কার্য্যে অন্য লোককে আকৃষ্ট করিয়া সমাজের অনিষ্টকারী একটা ভয়ঙ্কর রক্তবীজ সৃষ্টি করে। দুর্নীত কার্য্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ পক্ষে যত অনিষ্ট হয় পরক্ষে তদপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। প্রথমোক্তরূপ অনিষ্ট সাধিত হইবার পর তবে জানিতে পারা যায় সুতরাং তাহা দুর্নিবার্য্য, দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্ট কাল-সাপেক্ষ সুতরাং তাহার প্রতিবিধান সম্ভব ও সকলেরই তাহার নিরাকরণে বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। স্পৃহনীয় বস্তুর সংস্রব বশতঃ দুর্নীত কার্য্য বিশেষ রূপ সংক্রামক হইয়া পড়ে,সেই জন্য দুর্নীত কাব্য বিশেষরূপ অনিষ্টকর ও দণ্ডার্হ। দুর্নীতি অপেক্ষা কাব্যের আর গুরুতর দোষ হইতে পারে না; কাজেই এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কোন কাব্য বিচারালয়ে আনীত হইলে অনেক বুঝিয়া সুঝিয়া আমাদের মত দেওয়া উচিত। চুরির আসামীকে বিচারের সময় জজ সাহেব যত বিবেচনা করিয়া কাজ করেন খুনের মকদ্দমা নিস্পত্তির সময় তাহার সহস্র গুণ অধিক সতর্ক হইয়া কার্য্য করা তাঁহার উচিত। ইহার অন্যথা হইলে অনেক কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া গ্রন্থ রচনা করিলে হতভাগ্য গ্রন্থকারকে কেহ বা নাস্তিক কেহবা দুর্নীত বলিয়া অবজ্ঞা করিবার ভান করেন। সামান্য বিষয়ে মতভেদ হইলেও যেরূপ গালাগালি হইয়া থাকে, বোধ করি কাহারো অবিদিত নাই। কাজেই এক জন গ্রন্থকারের নামে এই দোষ আরোপিত হইলে তাহাকে অস্পৃশ্য মনে না করিয়া তাহার যথার্থ দোষ গুণ বিচার করিয়া আমাদের মতস্থির করা উচিত।

বস্তুতঃ পক্ষে সচরাচর ভাষায় ব্যবহৃত "দুর্নীত" শব্দের বিশেষ কোন আকৃতি নাই। উহা অনেকটা গ্রীক দেবতা প্রোটিয়ুসের ন্যায়। তুমি একটা কিছু মনে করিয়া তাহাকে ধরিতে গেলে সে অমনি আর একটা আকার ধরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তবে এই একটা বুঝিতে পারা যায় যে কাহারো কোন একটা বদ্ধমূল কুসংস্কারের বিরোধী হইলেই তাহার নিকট তাহা

দুর্নীত। ব্যক্তি মাত্রের পক্ষেও এইরূপ গ্রন্থ মাত্রের পক্ষেও এইরূপ।

যে গ্রন্থ লোককে নীতিপথ হইতে বিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে রচিত তাহা দুর্নীত। এখানে "অভিপ্রায়ে" কথার ব্যবহারের কারণ বলিতে হইবে।

সৌন্দর্য্য-লিপ্সা উত্তেজিত করা এক, এবং ইন্দ্রিয়-লিপ্সা উত্তেজিত করা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ অনেক সময়ে সৌন্দর্য্যের সহিত ইন্দ্রিয়-লিপ্সা জড়িত হইয়া থাকে। এক জন কবি আমাদের সৌন্দর্য্য-লিপ্সা উত্তেজিত না করিয়াও ইন্দ্রিয় লালসা উদ্রেক করিতে পারেন, এবং আর এক জন কবি যথন আমাদের সৌন্দর্য্য-লালসা চরিতার্থ করিতে যত্নশীল হন, তথন আমাদের কল্পনার দোষে আমাদের মনে আনুষঙ্গিক রূপে ইন্দ্রিয়-লিপ্সা জাগ্রত হইতেও পারে। এক্ষণে নীতি পরায়ণ পাঠকদের নিকটে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, উপরোক্ত উভয় কবিই কি তাঁহাদের চক্ষে দণ্ডার্হ? প্রথমোক্ত কবির কাব্য হইতে কুফল ব্যতীত আর কিছুই উৎপন্ন হয় না, তিনি সুমিষ্ট খাদ্যের প্রলোভন দেখাইয়া অপচ্য দ্রব্য ভক্ষণ করান্, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত কবির উদ্দেশ্য অতি প্রশংসনীয়। মনে কর, মনুষ্য-শরীরের পরিমাণ-সামঞ্জস্য ও তাহার সুঠাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত অবয়ব-সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে যদি গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়স্ তাঁহার সজীবপ্রভ প্রস্তর মূর্ত্তি সমূহকে উলঙ্গ করিয়া গঠিত করিয়া থাকেন, ও তাহাতে করিয়া যদি কোন মাংস-পিণ্ডের কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-লালসাই উদ্দীপ্ত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে দণ্ডার্হ কে?—শিল্পী না দর্শক? ভাস্কর বিদ্যায় অতুলনীয় গ্রীক্ ফিডিয়স্ কিম্বা পলিক্লীনিস্ রচিত উলঙ্গ প্রস্তর মূর্ত্তির একটি ভগ্নাংশ মাত্র পাইলেও তাহা সৌন্দর্য্য-উপাসক ইয়ুরোপের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী হইয়া পড়ে। এবং ঐ সকল উলঙ্গ প্রস্তর মূর্ত্তির অনুকরণ সমূহই দর্শকদের বিশুদ্ধ আনন্দ বর্দ্ধনের জন্যই য়ুরোপের প্রকাশ্য স্থানে রক্ষিত হয়; এমন কি লণ্ডনের য়ুনিবর্সিটি কলেজে—যে স্থানে স্ত্রী পুরুষে একত্র হইয়া বিদ্যানুশীলন করেন, যে স্থানে বৃদ্ধ অধ্যাপক ও অল্প বয়স শিষ্যগণ একত্রে শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকেন—সেখানেও সর্ব্বত্রেই ওইরূপ উলঙ্গ প্রস্তর মূর্ত্তি দর্শকদের সৌন্দর্য্য-প্রীতি চরিতার্থ করে। কিন্তু প্যারিসের জঘন্য স্থান সমূহে যে সকল চিত্র ও প্রস্তর মূর্ত্তি রক্ষিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য কদর্য্য বলিয়াই তাহা নিন্দনীয়। যে গ্রন্থ হইতে কুফল উৎপন্ন হয় তাহাই যে দুর্নীত, এমন নয়। গোলাপ ফুল হইতে মাকড়সা গরল সংগ্রহ করে কিন্তু সেই জন্য গরলাধার বলিয়া কেহ গোলাপকে ত্যাজ্য মনে করিবেন না। বলিংব্রুক দুইটি Puritan ধর্ম্মোপদেশ পড়িয়া নাস্তিকতায় দীক্ষিত হন কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ উক্ত ধর্ম্মোপদেষ্টাকে নাস্তিকতা শিক্ষা দেওয়ার দোষে দোষী করিবেন না। এক-জন যদি যথার্থ মনের বিশ্বাসের উপর

নির্ভর করিয়া বেশ্যাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তার সাপক্ষে এমন গ্রন্থ রচনা করেন যে তাহা পরিবার মণ্ডলীতে পাঠ করিলে সকলে কানে হাত দিবেন, তথাপি তাহা দুর্নীত নয় কেননা তাহার অভিপ্রায় মানুষকে কুপথে লইয়া যাওয়া নহে। শারীর-তত্ত্ববিদ্যায় এমন অনেক কথা আছে যে তাহা লোকের সামনে উচ্চারণ করা অসম্ভব কিন্তু তাহা বলিয়া কি শারীরতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ দুর্নীত? পৃথিবীর প্রাচীন কবিরা কিছু খোলাখুলী কথা কহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সে জন্য দুর্নীত আখ্যা পাইতে পারেন না। লরেন্‌স স্টার্ণ নিজের গ্রন্থের দুর্নীতি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন প্রাচীন কবিদের বিষয়ে তাহা খুব খাটে। একদিন স্টার্ণ একজন ভদ্র মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি আমার Tristram Shandy পড়িয়াছেন?" ভদ্র মহিলা উত্তর করিলেন, "না, মহাশয়, আমি পড়িনাই; আর সত্য কথা বলিতে কি, আমি শুনিয়াছি যে উহা স্ত্রীলোকের অপাঠ্য।" ইহাতে স্টার্ণ বলিলেন, Madam, he is like your little heir playing on the carpet. At times he shows a good deal of his person which is generally hidden—but in perfect innocence.

আসল কথাটা এই যে—গ্রন্থের আলোচিত বিষয়ের উপর তাহার নীতি নির্ভর করে না রচনা-প্রণালীর উপর করে। পাঠকের মনে দুর্নীত ভাব উৎপন্ন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হইলে নিশ্চয়ই গ্রন্থ দুর্নীত। আর যদি গ্রন্থকারের অপর কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তবে সে গ্রন্থ দুর্নীত নহে। গ্রন্থকারের মনের ভিতরকার উদ্দেশ্য অন্তর্যামীই জানিতে পারেন, তবে গ্রন্থে যে উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত থাকে আমরা তাহারই কথা কহিতেছি। আলোচ্য গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন সূত্র হইতে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাহা লইয়া কোলাহল করা অনাবশ্যক।

ভগ্ন হৃদয়।

চতুর্থ সর্গ।

কবি।

(প্রথম গান।)

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই,
প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই
লতা-পাতা-ঘেরা জানালা মাঝারে
একটি মধুর মুখ!
চারিদিকে তার ফুটে আছে ফুল,
কেহবা হেলিয়া পরশিছে চুল,

দুয়েকটি শাখা কপাল ছুঁইয়া,
দুয়েকটি আছে কপোলে নুইয়া,
কেহবা এলায়ে চেতনা হারায়ে
চুমিয়া আছে চিবুক!
বসন্ত প্রভাতে লতার মাঝারে
মুখানি মধুর অতি!
অধর দুটির শাসন টুটিয়া
রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,
দুটি আঁখি পরে মেলিছে মিশিছে
তরল চপল জ্যোতি।

(দ্বিতীয় গান।)

প্রতিদিন যাই সেই পথ দিয়া,
দেখি সেই মুখ খানি;
কুসুম মাঝারে রোয়েছে ফুটিয়া
কুসুমগুলির রাণী!
আপনাআপনি উঠে আঁখি মোর
সেই জানালার পানে,
আন-মন হোয়ে রহি দাঁড়াইয়া
কিছু খণ সেই খানে!
আর কিছু নহে, এ ভাব আমার
কবির সৌন্দর্য্য-তৃষা,
কলপনা-সুধা-বিভল কবির
মনের মধুর নেশা!
গোলাপের রূপ, বকুলের বাস,
পাপিয়ার বন-গান,
সৌন্দর্য্য-মদিরা দিবস রজনী
করিয়া করিয়া পান,
শিথিল হইয়া পোড়েছে হৃদয়,
নয়নে লেগেছে ঘোর,
বিকশিত রূপ বড় ভাল লাগে
মুগধ নয়নে মোর!

(তৃতীয় গান।)

প্রতিদিন দেখি তারে,কেন না দেখিনু আজি?
আলিঙ্গিতে গ্রীবা তার লতাগুলি চারিধার
আছে শত বাহু তুলি শত ফুল-হারে সাজি!
দূর-বন হোতে ছুটি আসিয়া প্রভাত-বায়
সে মুখটি না দেখিয়া, শূন্য বাতায়ন দিয়া
প্রবেশি আঁধার গৃহে করিতেছে হায় হায়!
কতখণ—কতখণ—কতখণ ভ্রমি একা
গণিনু ফুলের দল, মাটিতে কাটিনু রেখা,
কতখণ—কতখণ—গেল চলি কতখণ
ক্ষণে ক্ষণে দেখি চাহি তবু না পাইনু দেখা!
ফিরিনু আলয় মুখে চলিনু আপন মনে,
চলিতে চলিতে ধীরে ভুলে ভুলে ফিরে ফিরে
বার বার এসে পড়ি সেই—সেই বাতায়নে!
নিরাশ-আশার মোহে চেয়ে দেখি বারবার,
শূন্য—শূন্য—শূন্য সব বাতায়ন অন্ধকার,
ফুলময় বাহু দিয়া অন্ধকারে বুকে নিয়া—
অন্ধকারে আলিঙ্গিয়া রোয়েছে সে লতাগুলি,
তবু ফিরি ফিরি সেথা আসিলাম ভুলি ভুলি!
তেমনি সকলি আছে, বাতায়ন ফুলে সাজি,
দুলিছে তেমনি করি বাতাসে কুসুম-রাজি!
শুধু এ মনে আমার, এক কথা বার বার
এক সুরে মাঝে মাঝে উঠিতেছে বাজি বাজি
"প্রতিদিন দেখি তারে কেননা দেখিনু আজি?
"কেননা দেখিনু তারে কেননা দেখিনু আজি?"
অতিধীর পদক্ষেপে আলয়ে আসিনু ফিরি,
শতবার আন-মনে বলিলাম ধীরি ধীরি—
"প্রতিদিন দেখি তারে কেননা দেখিনু আজি?"

(চতুর্থ গান।)

কাল যবে দেখা হোল পথে যেতে যেতে চলি
মোরে হেরে আঁখি তার কেনগো পড়িল ঢলি?
অজানা পথিকে হেরি এত কি সরম হবে?
কি যেন গো কথা আছে, আটকিয়া রহিয়াছে,
আধ-মুদা দুটি আঁখি কি যেন রেখেছে ঢাকি,
খুলিলে আঁখির পাতা প্রকাশ তা হয় পাছে!
সরম না হয় যদি, এ ভাব কিসের তবে?
কাল তাই বোসে বোসে ভাবিয়াছি সারাক্ষণ,
স্বপনে দেখেছি তার ঢোলে-পড়া দুনয়ন!
প্রভাতে বসিয়া আজ ভাবিতেছি নিরিবিলি
"মোরে হেরে আঁখি তার কেন গো পড়িল ঢলি?"

(পঞ্চম গান।)

সত্য কি তাহারে ভালবাসি?
ভুলিনু কি শুধু তার দেখে রূপ রাশি?
স্বপনে জানি না তার হৃদয় কেমন,
সহসা আপনা ভূলে—শুধু কি রূপসী বোলে
জীবন্ত পুত্তলী পদে বিসর্জ্জিনু মন?

(ষষ্ঠ গান।)

মোর এ যে ভালবাসা রূপ-মোহ এ কি?
ভাল কি বেসেছি শুধু তার মুখ দেখি?
মুখেতে সৌন্দর্য্য তার হেরিনু যখনি
তখনি কি মন তার দেখিতে পাইনি?
মধুর মুখেতে তার আঁখি-দরপনে
মনচ্ছায়া হেরিয়াছি কল্পনা-নয়নে!
সেই সে মুখটি তার মধুর আকার
বেড়াতেছে খেলাইয়া হৃদয়ে আমার!
কত কথা কহিতেছে হরষে বিভোর,
কত হাসি হাসিতেছে গলা ধোরে মোর!
কি করিয়া হাসে আর কি কোরে সে কয়,
কি কোরে আদর করে ভালবাসাময়,
মুখানি কেমন হয় মৃদু অভিমানে,
সকলি হৃদয় মোর না জানিয়া জানে!
যেন তারে জানি কত বর্ষ অগণন,
এ হৃদয়ে কিছু তার নহে গো নূতন!
মুখ দেখে শুধু ভাল বেসেছি কি তারে?
মন তার দেখিনি কি মুখের মাঝারে?

(সপ্তম গান।)

দু জনে মিলিয়া যদি ভ্রমিগো বিপাশা-পারে!
কবিতা আমার যত সুধীরে শুনাই তারে!
দোঁহে মিলি এক প্রাণ গাহিতেছি এক গান,
দু জনের ভাবে ভাবে একেবারে গেছে মিশে,
দু জনে দুজন পানে চেয়ে থাকি অনিমিষে,
দু জনের আঁখি হোতে দু জনে মদিরা পিয়া
আসিবে অবশ হোয়ে দোঁহার বিভল হিয়া!
মুখে কথা ফুটিবে না, আঁখি পাতা উঠিবেনা,
আমার কাঁধের পরে নোয়াবে মাথাটি তার,
দু জনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা পার!

(অষ্টম গান।)

শুনেছি—শুনেছি কি নাম তাহার—
শুনেছি—শুনেছি তাহা!
নলিনী—নলিনী—নলিনী—নলিনী—
কেমন মধুর আহা!
নলিনী—নলিনী—বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,
কভু আন-মনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী—নলিনী—নলিনী নাম!

বালার খেলার সখীরা তাহারে
নলিনী বলিয়া ডাকে,
স্বজনেরা তার, নলিনী—নলিনী—
নলিনী বলে গো তাকে!
নামেতে কি যায় আসে?
রূপেতে কি যায় আসে?
হৃদয় হৃদয় দেখিবারে চায়
যে যাহারে ভাল বাসে!

নলিনীর মত হৃদয় তাহার,
নলিনী যাহার নাম;
কোমল—কোমল—কোমল অতি
যেমন কোমল নাম!
যেমন কোমল, তেমনি বিমল
তেমনি সুরভ-ধাম!
নলিনীর মত হৃদয় তাহার
নলিনী যাহার নাম!

ত্রিবেদ কি চতুর্ব্বেদ?

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকেই চারি বেদ স্বীকার করিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন ব্রহ্ম এক সময়েই সাম্‌ ঋক্‌, যজু ও অথর্ব্ব বেদকে নিশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে প্রচার করেন, তজ্জন্যই বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া থাকে। (১) বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয় আমরা এ প্রবন্ধে তাহার বিচার না করিয়া এই মাত্র দেখাইব যে, আদি বেদ চারি নয়; সাম্‌, ঋক্‌, যজু, এই তিনটীই আদি, অথর্ব্ব বেদ উক্ত. বেদত্রয়ের সার সংগ্রহ স্বরূপ উহা অথর্ব্ব নামক জনৈক ঋষি কর্ত্তৃক প্রচারিত। আমার বৈদিক কালের ও পৌরাণীকি কালের প্রামাণ্য সূত্রাদি উদ্ধৃত করিয়া বেদ তিন, কি চারিবেদ, তাহা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম, তাঁহারা প্রমাণাদি দেখিয়া যে রূপে বিচার করিবেন তাহাই মাননীয়।

(১) কিয়ৎকাল অতীত হইল কোন বন্ধুর গৃহে জনৈক সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞ পরমহংস সমাগত হন, আমি বন্ধুর অনুরোধে তাঁহার সহিত বেদ বিষয়ক কিছু আলাপ করি। তিনি, বেদ তিনটী নয়, চতুর্ব্বেদ স্বীকার করেন, তদুত্তরে আমি এই প্রমাণ প্রয়োগ করি।

বৈদিক কালের প্রমাণ।

১ম। ঋগ্বেদে যথা—অহো বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপয়া যঃ মৃষয় স্ত্রয়ীবেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি”

২য়। “পুমান রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বী প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি”

৩য়। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের চার্ব্বাক মত সমালোচনে বৃহস্পতির যে সূত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেন তাহাতেও তিন বেদ যথা, নস্বর্গো নাপবর্গো বা নৈ-

বাত্মা পারলৌকিকঃ নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ। অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদা স্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্। অপিচ ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ

৪র্থ শতপথ ব্রাহ্মণে যথা—

৪র্থ।—"প্রজাপতি র্বা ইদমগ্র আসীৎ সোঽশ্রাম্যৎ সতপোঽতপ্যত তস্মাচ্ছ্রান্তং তে পানাৎ ত্রয়ো লোকা অসৃজ্যন্ত পৃথিব ন্তরীক্ষংদ্যৌ স ইমান ত্রীন্ লোকান্ অভিতপাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রীনি জ্যোতিংষ্যজায়ন্ত অগ্নি যোঽয়ং পবতে সূর্য্যঃ সইমানি ত্রীনি জ্যোতিংন্যভিততাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রযোবেদা অজায়ন্ত অগ্নে ঋগ্বেদোবাযো যজুর্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ স ইমাংস্ত্রীন্ বেদান্ অভিততাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রীনি শুক্রাণ্যজায়ন্ত ভূরিত্যৃগ্বেদাভুব ইতি যজুর্বেদাৎ স্বরিতি সামবেদাৎ।" অর্থাৎ প্রজাপতিই অগ্রে ছিলেন, তিনি শ্রম পূর্ব্বক তপঃ করিলেন; তাঁহার শ্রম এবং তপ হইতে ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, সৃষ্ট হইল। তিনি ঐ তিন লোককে অভিতপ্ত করিলেন। ঐ অভিতপ্ত লোকত্রয় হইতে অগ্নি বায়ু এবং সূর্য্য এই জ্যোতিত্রয় উৎপন্ন হইল। তিনি ঐ জ্যোতিত্রয়কে অভিতপ্ত করাতে অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উৎপন্ন হইল। পুনশ্চ ঐ বেদত্রয়কে অভিতপ্ত করাতে তিন শুক্র উৎপন্ন হইল, ঋগ্বেদ হইতে ভূ, যজুর্ব্বেদ হইতে ভুব, সামবেদ হইতে স্বঃ।

বৈদিক সূত্র সমালোচনা।

বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ অতি প্রাচীন। ১ম সূত্রে আছে তিন বেদ, ঋক্, যজু, ও সাম। ২য় সূত্রে আছে সেই পরম পুরুষ হইতে সাম, ঋক ও যজুর উৎপত্তি হইয়াছে। ৩য় সূত্রে আছে স্বর্গ অপবর্গ বা পরলোকগামী কোনও আত্মা নাই, বর্ণাশ্রমের ক্রিয়াদিও নিস্ফল, অগ্নিহোত্র, বেদত্রয় (সাম, ঋক, ও যজু) ত্রিদণ্ড ও ভস্মলেপন বৃথা। ৪র্থ সূত্রে আছে প্রথমে মাত্র প্রজাপতি ছিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া প্রথমে ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গোক সৃষ্টি করিলেন। ঐ লোকত্রয় হইতে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য এই তিনের উৎপত্তি হইল। জ্যোতিত্রয়ের অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু, হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সাম বেদ উৎপন্ন হয়। পাঠক পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক সূত্রগুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে বৈদিক কোনও সূত্রে অথর্ব্ব বেদের নামোল্লেখ নাই। বৈদিক কালের অব্যবহিত পরেই ভগবান মনু স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার করেন। আমি মনু হইতে সেই প্রমাণগুলি দেখাইতেছি যে তাহাতেও চতুর্ব্বেদের উল্লেখ নাই।

১ম "অগ্নি, বায়ু, রবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসাম লক্ষণং"

অর্থাৎ তিনি যজ্ঞ কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে সনাতন ঋগ্বেদ বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, এবং সূর্য্য হইতে সাম বেদ উদ্ধৃত করিলেন। ১ম অং ২৩।

২য় অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ। বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতিচ’,

৩য় ত্রিভ্য এবতু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যাচোহস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।

৪র্থ ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োহব্যয়াঃ’। ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা, ঋক, যজু, সাম এই বেদত্রয় হইতে ওঁকারের অকার, উকার, মকার ও ভূ ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি ক্রমে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ২ অং ৭৭ পরমেষ্ঠী পিতামহ ঋক, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয় হইতে তদিত্যাদি গায়ত্রীর এক এক পাদ করিয়া পাদত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ২অ ৭৭

ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ ওঁকার, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন মহা ব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রী প্রভৃতিকে বেদত্রয়ের নিদান বলিয়া জানিবে। ২অং ৮১। ইত্যাদি

অপিচ ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।

সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাত্তস্যাশুচি ধ্বর্নিঃ॥

এতদ্বিদন্তো বিদ্বাংসস্ত্রয়ীনিষ্কর্ষমন্বহং,

ক্রমশঃ পূর্ব্বমভ্যস্য পশ্চাদ্বেদমধীয়তে।

অর্থাৎ যেহেতু ঋগ্বেদের দেবই দেবতা, যজুর্ব্বেদের মানুষই দেবতা সামবেদের পিতৃগণই দেবতা অতএব সামবেদ অধ্যয়নের পর অন্যবেদের ধ্বনি অশুচির ন্যায়॥ বিদ্বানগণ বেদ ত্রয়ের এইরূপ দেবতা অবগত ইহার প্রথমে বেদের সারভূত প্রণব সহকৃত গায়ত্রী অধ্যয়ন করিবে পরে বেদাধ্যয়ন করিবে। ৪র্থ অং ১২৪। ১২৫

মনুসংহিতা সমালোচন।

মনু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিন জ্যোতি হইতে সাম, ঋক, ও যজু এই তিন বেদের উৎপত্তি বলেন, এবং অন্যান্য অধ্যায়ে যথায় বেদের উল্লেখ করিয়াছেন তথাতেই সুস্পষ্টরূপে তিন বেদ উল্লেখ করিয়াছেন কোথাও অথর্ব্ববেদের নামোল্লেখ করেন নাই। অপরাপর প্রাচীন সংহিতাতেও অথর্ব্ব বেদের নাম পাওয়া যায় না। যাহা হোক যাঁহারা চতুর্ব্বেদ স্বীকার করেন তাঁহারা এইরূপে তর্ক উপস্থিত করেন আমি পাঠকবর্গের গোচরার্থে চতুর্ব্বেদস্বীকারকারী মহাত্মাদিগের বচন. প্রমাণও যথাসাধ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

তাঁহারা বৃহদারণ্যকের অরেহস্য মহতো ভুতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্বাঙ্গিরস” অর্থাৎ সেই পরমাত্মা হইতে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ নিশ্বাসের ন্যায় অবলীলা ক্রমে নির্গত হইয়াছে।

যাঁহারা এই বচনা দ্বারা চতুর্ব্বেদের প্রমাণ দেখান তাহারা আংশিক অথবা পূর্ণ রূপে সত্যের অপলাপ করিয়া স্বমত রক্ষা করেন। কিন্তু ঐ বচনের পূর্ব্বেও উত্তরার্দ্ধ পাঠ করেন না।

পূর্ণ বচনটী এই যথা “স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা

অরেহস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো হথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসপুরাণবিদ্যাউপনিষদঃ শ্লোকা সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্মৈ বৈতানি সর্ব্বাণি শিক্ষাকল্পব্যাকরণনিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে"—এই বচনানুসারে দেখান যে বেদচতুষ্টয় সেই পরমাত্মার নিঃশ্বসিত তাহা নয় ইতিহাস, পুরাণ, সূত্র, ব্যাখ্যা, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ, জ্যোতিষ ইত্যাদিও বেদের ন্যায় সৃষ্ঠ, বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয় যখন তাহার বিচার এপ্রবন্ধে করিব না তখন বেদরচক কে তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু বৃহদারণ্যকে ইতিহাস ও শিক্ষা কল্পাদিতেও যে ঈশ্বরনিঃশ্বসিত বলায় তাহারই বিশেষ সমালোচন ও তত্তৎশাস্ত্র প্রণেতাগণের নামোল্লেখ করিব। বেদ, সাম, ঋক্, যজু, অথর্ব্ববেদ কেবল শান্তিক পৌষ্টিক অভিচারিক কার্য্যে প্রতিপন্ন হয়। বেদাঙ্গ ছয়। শিক্ষাশাস্ত্র দ্বারা উদাত্ত অনুদাত্ত স্বর ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণ সকলের উচ্চারণ জ্ঞান হয়, কল্প শাস্ত্র দ্বারা বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান জন্মে। ব্যাকরণ মহেশ প্রণীত মাহেশ, ও ঋষিপ্রণীত পানিনী ইহা দ্বারা বৈদিক সূত্রের শুদ্ধাশুদ্ধি জ্ঞান জন্মে। যাস্ক ঋষি নিরুক্ত শাস্ত্র রচনা করেন, ইহাতে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ নির্ণয় হয়। ছন্দ শাস্ত্র পিঙ্গল ঋষি প্রস্তুত করেন ইহাতে বেদোক্ত মন্ত্রের ছন্দ নিরূপণ আছে। জ্যোতিষ, আদিত্যগর্গ প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণয়ন করেন, ইহাতে অদৃষ্টাধীন ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান কালের শুভাশুভ পরিজ্ঞান হয় ও তিথি নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্যাদির গ্রহণ জানা যায়। এই গেল বেদাঙ্গ। বেদের উপাঙ্গ চারি, যথা, পুরাণ মহর্ষি বেদব্যাস ও অন্যান্য ঋষিপ্রণীত মৎস্য কূর্ম্ম, ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, অগ্নি, ভবিষ্য, বরাহ, স্কন্দ, বামন, গারুড়, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদীয়, ও মার্কণ্ডেয় এই অষ্টাদশ খানি। আবার পুরাণের অন্তর্ভূত উপপুরাণ যথা সনৎকুমার, নারসিংহ ইত্যাদি ২৩ খানি। ন্যায় শাস্ত্র মহর্ষি গৌতম রচনা করেন। ইহাতে ষোড়শ পদার্থ জ্ঞানে মুক্তি ইত্যাদি বর্ণিত আছে। মীমাংসা, বাদরায়ণপ্রণীত ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন, ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য এবং সমস্ত বস্তুই মিথ্যা ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি ইত্যাদি। আর জৈমিনী প্রণীত কর্ম্মমীমাংসা। ইহাতে কর্ম্মকাণ্ডের ও বেদের অপরিসীম মহিমা বর্ণিত আছে। ধর্ম্ম শাস্ত্র মন্বাদির স্মৃতি, ইহাতে সৃষ্টি প্রকরণ, চাতুর্ব্বণ্যের ধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, ইত্যাদি মানবের যাবতীয় করণীয় কর্ম্ম বিধিবদ্ধ আছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে পূর্ব্বোক্ত বেদাদি ও শিক্ষা কল্পাদি অপরা বিদ্যা কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা, যখন বেদাদিকে সামান্য ইতিহাস ব্যাকরণের ন্যায় সৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিলেন তখন তাঁহার কথা প্রমাণ স্বরূপে

গ্রহণ করা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক মধ্যবর্ত্তী কালের, বোধ হয় মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনার পরে বেদবিভাগ করিয়া চতুর্ব্বেদই আখ্যা প্রদান করেন, কেন না উপনিষদ ও পৌরাণাদি কালেই মাত্র চতুর্ব্বেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারত রচনান্তে যখন মহর্ষি বেদব্যাস অতি মানোন্মত্ত হইয়া ধর্ম্ম শাস্ত্র বেদকেও তদীয় মহাভারতের নিকট লঘু রূপে প্রতিপন্ন করিলেন তখনই স্পষ্ট রূপে চতুর্ব্বেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা একতশ্চতুরো বেদান্ ভারতং চৈতদেকতঃ। পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্। চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোহধিকং যদা, তদা প্রভৃতি লোকেপি মহাভারত মুচ্চতে" যাহা হৌক ইহা নিশ্চয় যে বৈদিক কালে ও আর্য কালে যখন অথর্ব্ব বেদের নাম উল্লেখ নাই তখন আদিবেদ যে তিন তাহার সন্দেহ নাই। যদিও উপনিষদ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ চতুর্ব্বেদের নাম পাওয়া যায় কিন্তু দেখিতে হইবে এই সকল গ্রন্থ ঋগ্বেদ ও মন্বাদির স্মৃতি, ও শতপথ ব্রাহ্মণাদির নিকট নিতান্ত নব্য গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। উপসংহারে পাঠকবর্গের নিকটে সানুনয় প্রার্থনা তাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক মদুল্লিখিত বচনগুলি পাঠ ও বিচার করিয়া যেরূপ বোধ হয় সিদ্ধান্ত করিবেন, এস্থলে ইহাও বক্তব্য যদি কোন মহাত্মা প্রাচীন প্রমাণাদি দেখাইয়া আমার ভ্রমাপনয়ন করেন তাহা হইলেও বাধিত হইব।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন।

স্বররহস্য।

ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, সপ্তকের যে কোন সুর হউক্ তাহার মধ্যে এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সুরের মধ্যে—হয় একমাত্রা ব্যবধান, নয় প্রায়-একমাত্রা ব্যবধান, নয় প্রায়-অর্দ্ধমাত্রা ব্যবধান—ইহার ন্যূনাধিক নহে। ৮ অপেক্ষা ৯ যত গুণ উচ্চ, প্রত্যেক সুর তাহার একমাত্রা নীচের সুর অপেক্ষা তত গুণ উচ্চ; ৯ অপেক্ষা ১০ যত গুণ উচ্চ, প্রত্যেক সুর প্রায়-এক মাত্রা নীচের সুর অপেক্ষা ততগুণ উচ্চ, আর ১৫ অপেক্ষা ১৬ যতগুণ উচ্চ প্রত্যেক সুর প্রায়-অর্দ্ধমাত্রা নীচের সুর অপেক্ষা ততগুণ উচ্চ। পার্শ্ব-পত্রস্থ প্রথম চিত্র দেখিলেই ঐ তিনটি কথা চক্ষের সমক্ষে দেদীপ্যমান হইবেক। প্রথম চিত্রের বহিস্থিত চৌকোণ-ক্ষেত্রটির ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫,এই আট-স্থান হইতে প্রসারিত আটটি সরল রেখা দ্বারা চক্রটি ৮ সমান অংশে

বিভক্ত হইয়াছে, এবং চক্রটির গায়ে ১২ হইতে ২৩পর্য্যন্ত যে ১২টি অঙ্ক বসিয়াছে তা-হাতে-করিয়া ঐ চক্রটি ১২ সমান অংশে বি-ভক্ত হইয়াছে। চক্রের পরিধিকে কিনা বে-ষ্টন-রেখাকে ১ বলিয়া ধরা হইয়াছে সুতরাং তাহা সা'র পরিমাণ-রেখা। সা ১=৮ অষ্টমাংশ=১২ দ্বাদশাংশ। চক্রটির ১২ দ্বা-দশাংশ হইতে ২৪ দ্বাদশাংশ পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিবার জন্য চক্রের গায়ে ১২ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত অঙ্ক উত্তরোত্তর বিন্যস্ত হইয়াছে, আর চক্রটির ৮ অষ্টমাংশ হইতে ১৬ অষ্ট-মাংশ পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিবার জন্য চৌকোণ-ক্ষেত্রটির গায়ে ৮ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত অঙ্ক উত্ত-রোত্তর বিন্যস্ত হইয়াছে। চক্রের বেষ্টন-পথের কোন এক স্থান হইতে এক পাক ঘুরিয়া স্ব-স্থানে আসিলে একগুণ পথ পরি-ভ্রমন করা হয়.দুই পাক ঘুরিয়া সেই একই স্থানে আসিলে দ্বিগুণ পথ পরি-ভ্রমণ করা হয়,—এই জন্য একই স্থানে ৮ অষ্টমাংশ ও ১৬ অষ্টমাংশ তথা ১২ দ্বাদশাংশ ও ২৪ দ্বাদশাংশ বসিয়াছে; অর্থাৎ একবার ৮অষ্ট-মাংশ অতিবাহন করিয়া সেখানে না থামিয়া আর একবার ৮অষ্টমাংশ অতিবাহন করিলে ১৬ অষ্টমাংশ অতিবাহন করা হয়, তাই যেখানে ৮-অষ্টমাংশ সা, সেইখানে ১৬ অষ্টমাংশ সা। ৮ অষ্টমাংশ এবং ১৬ অষ্ট-মাংশের মধ্য-পথে পাওয়া যাইবে—(১) ৯-অষ্টমাংশ রে, অতএব ৮-এর যত গুণ উচ্চে ৯—সা'র ততগুণ উচ্চে রে; (২) ১০-অষ্টমাংশ গা, অতএব ৯'এর যতগুণ উচ্চে ১০—রে'র ততগুণ উচ্চে গা; (৩) ১৫ দ্বাদশাংশ গা, ১৬ দ্বাদশাংশ মা, অতএব ১৫'র যতগুণ উচ্চে ১৬—গা'র ততগুণ উচ্চে মা; (৪) ১৬ দ্বাদশাংশ মা, ১৮দ্বাদশাংশ পা,অতএব ১৬'র যতগুণ উচ্চে ১৮ কিংবা যাহা একই কথা ৮'এর যতগুণ উচ্চে ৯—মা'র ততগুণ উচ্চে পা (এই মাত্র দেখা গিয়াছে যে, সা-রে'র মধ্যেও ঠিক্ এইরূপ ব্যবধান); (৫) ১৮'দ্বাদ-শাংশ পা, ২০ দ্বাদশাংশ ধা, অতএব ১৮'র যতগুণ উচ্চে ২০ কিংবা যাহা একই কথা ৯'এর যতগুণ উচ্চে ১০ পা'র ততগুণ উচ্চে ধা (রে-গা'র মধ্যেও ঠিক এইরূপ ব্যবধান দেখা গিয়াছে); (৬) ধা ২০ দ্বাদশাংশ, নি ২২॥০ দ্বাদশাংশ, এখন—২০'র যতগুণ উচ্চে ২২॥০, ৮'এর ততগুণ উচ্চে ৯, কেননা ৮কে ২॥০ গুণ করিলে ২০ হয় ও ৯কে ২॥০ গুণ করিলে ২২॥০ হয়, অতএব ৮'এর যতগুণ উচ্চে ৯—ধা'র ততগুণ উচ্চে নি (সা-রে'র মধ্যেও এইরূপ ব্যবধান দেখা গিয়াছে);(৭) ১৫ অষ্টমাংশ নি,১৬ অষ্টমাংশ সা, অতএব ১৫'র যতগুণ উচ্চে ১৬ নি'র ততগুণ উচ্চে সা (গা-মা'র মধ্যে ঠিক্ এই রূপব্যবধান দেখা গিয়াছে); এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সুর সাতটি কিন্তু পাশাপাশি-স্থিত দুই দুইটি সুরের মধ্যে তিন প্রকার বই আর ব্যবধান নাই ও সা রে-গ-ম এই প্রথম চারিটি সুরের মধ্যে তিনটিরই দেখা পাওয়া যায়, যথা,—৮'এর সম্বন্ধে যেমন ৯ সা'র সম্বন্ধে তেমনি রে,৯'এর সম্বন্ধে যেমন ১০ রে'র সম্বন্ধে তেমনি গা, ও ১৫'র সম্বন্ধে যেমন ১৬ গা'র সম্বন্ধে তেমনি মা। ৮এ তাহার অষ্টমাংশ যোগ করিলে ৯ হয়,

৯'এ তাহার নবমাংশ যোগ করিলে দশ হয়, ১৫তে তাহার ১৫শাংশ যোগ করিলে ১৬ হয়; এই হিসাবেই বলা হইয়াছে যে সা-রে ব্যবধান অষ্টমাংশ—ধর একমাত্রা, রে-গ-ব্যবধান নবমাংশ—প্রায় এক-মাত্রা, গ-ম ব্যবধান পঞ্চদশাংশ—প্রায় অর্দ্ধমাত্রা।

নি-সা'র মধ্যেই বা কেন প্রায় অর্দ্ধমাত্রা ব্যবধান, আর সা-রে'র মধ্যেই বা কেন একমাত্রা ব্যবধান ইহা এখন জলের ন্যায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে; ৮ ৯ ১০ অবধি করিয়া ১৫ ১৬ পর্য্যন্ত হ'চ্চে সা রে গা অবধি করিয়া নি সা'পর্য্যন্তের পরিমাণাঙ্ক,—৮-এ তাহার অষ্টমাংশ যোগ করিলে ৯ হয়, ১৫তে তাহার পঞ্চদশাংশ যোগ করিলে ১৬ হয়, পঞ্চদশাংশ অষ্টমাংশের প্রায় অর্দ্ধাংশ, এই সূত্রেই নি-সা-ব্যবধান সা-রে ব্যবধানের প্রায় অর্দ্ধাংশ। তাহা যেন হইল—গা-মা-ব্যবধান কেন অর্দ্ধমাত্রা হইল? ইহার উত্তর এই যে, পা'র এক মাত্রা নীচের সুরকেই মা বলিয়া ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ রে'র যত টুকু নীচে সা পা'র ততটুকু নীচে মা; সুতরাং ৯ হইতে ৮ যত গুণ কম কিংবা যাহা একই-কথা ১৮ হইতে ১৬ যত গুণ কম পা-হইতে মা ততটুকু নীচে আর ১৮ হইতে ১৫ যত গুণ কম পা হইতে গা তত নীচে,—কেননা পা হ'চ্চে ১২ অষ্টমাংশ, গা হ'চ্চে ১০ অষ্টমাংশ সুতরাং ১০ অপেক্ষা ১২,৬ অপেক্ষা ৫,কিংবা ১৮ অপেক্ষা ১৫ যতগুণ কম গা-হইতে পা ততটুকু নীচে; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ১৮ হইতে ১৬ যতগুণ কম পা হইতে মা তত নীচে ও ১৮ হইতে ১৫ যতগুণ কম পা হইতে গা তত নীচে, সুতরাং ১৬ হইতে ১৫ যতগুণ কম মা হইতে গা ততটুকু নীচে; এই সূত্রেই গ-মা-ব্যবধান অর্দ্ধমাত্রা হইয়াছে।

পূর্ব্বে ইহা যথেষ্ট বলা হইয়াছে যে, এক গ্রামের সাত সুরের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান, সকল গ্রামের সাত সুরের মধ্যেই ঠিক সেই রূপ ব্যবধান। সা-গ্রামের প্রথম সুরের পরিমাণাঙ্ক ১, কিংবা যদি আনা গণ্ডা হইতে নিষ্কৃতি চাও—৩৬০, তাহাতে তাহার অষ্টমাংশ (৪৫) যোগ করিলে সা-গ্রামের দ্বিতীয় সুরের অঙ্ক ৪০৫ উৎপন্ন হইবে; সংক্ষেপে সা'র সা ৩৬০, সা'র রে ৪০৫; রে'র সা (অর্থাৎ রে-গ্রামের প্রথম সুর) ৪০৫, ৪০৫এ তাহার অষ্টমাংশ যোগ যোগ করিলে রে'র রে (রে-গ্রামের দ্বিতীয় সুর) = ৪৫০৷৵০ পাওয়া যাইবে; কিন্তু ৪০৫এ তাহার নবমাংশ যোগ করিলে সা'র গা ৪৫০ হয়; অতএব সা'র রে এবং রে'র সা যদিও একই কিন্তু সা'র গা এবং রে'র রে একটু এদিক্ ওদিক্ যথা,—সা'র গ ৪৫০, রে'র রে ৪৫০৷৵০। রে-অঙ্ককে সা-অঙ্ক দিয়া গুণ করিলে রে'র সা অঙ্ক পাওয়া যাইবে, রে-অঙ্ককে রে-অঙ্ক দিয়া গুণ করিলে রে'র রে অঙ্ক পাওয়া যাইবে, রে-অঙ্ককে গা-অঙ্ক দিয়া গুণ করিলে রে'র গা-অঙ্ক পাওয়া যাইবে ইত্যাদি—যথা রে-অঙ্ক হ'চ্চে ৯-৮ম তাহাকে সা-অঙ্ক ১ দিয়া গুণ করিলে রে'র সা হইবে, উহাকে রে-অঙ্ক ৯-৮ম দিয়া গুণ করিলে রে'র রে-অঙ্ক ৮১-৬৪ ম হইবে,

উহাকে গা-অঙ্ক-৫-৪র্থ দিয়া গুণ করিলে রে'র গা-অঙ্ক ৪৫-৩২ শ হইবে. ইত্যাদি,—সকল গ্রামেরই এইরূপ। এক সপ্তক উচ্চের সা হ'চ্চে ২, এ জন্য সা বা রে বা যাহা-কেই হউক দ্বিগুণ করিলে এক সপ্তক উচ্চের সা বা রে বা আর যে কোন সুর ধরা গিয়া থাকে তাহাই হইবে, অর্দ্ধগুণ করিলে এক সপ্তক নীচের সেই সুর হইবে,—তারের পরিমাণাঙ্ক ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ উচ্চ সপ্তকের তারকে অর্দ্ধেক ছোটো এবং নিম্ন সপ্তকের তারকে দ্বিগুণ বড় করিতে হয়। মা-গ্রামের সহিত সা-গ্রামের যদিও খুব মিল আছে—নিম্নে দেখা যাইবে যে, উহাদের মধ্যে এক জায়-গায় মিলে না। সা-গ্রামের অঙ্ক গুলিকে মা-অঙ্ক ৪-৩য় দিয়া গুণ করিলেই মা-গ্রামের সমস্থানীয় অঙ্ক গুলি পাওয়া যাইবে, যথা—

সা-গ্রামের			মা-অঙ্ক		মা-গ্রামের		সা-গ্রামের
সা	১	×	৪-৩ য়	=	সা ৪-৩ য়	=	মা
রে	৯-৮ ম	×	ঐ	=	রে ৩-২ য়	=	পা
গা	৫-৪ র্থ	×	ঐ	=	গা ৫-৩ য়	=	ধা
মা	৪-৩ য়	×	ঐ	=	মা ১৬-৯ ম	=	নি
পা	৩-২ য়	×	ঐ	=	পা ২	=	স'া
ধা	৫-৩ য়	×	ঐ	=	ধা ২০-৯ ম	=	*
নি	১৫-৮ ম	×	ঐ	=	নি ৫-২ য়	=	গ'া
স'া	২	×	ঐ	=	স'া ৮-৩ য়	=	ম'া

উপরে দেখিবে যে, মা'র পা = স'া (অর্থাৎ সা'র স'া) কিন্তু মা'র ধা = রে' (স'া'র রে) নহে,—ইহার কারণ এই যে, যে গ্রাম হউক্ না কেন তাহারই পা অপেক্ষা ধা প্রায়-এক-মাত্রা উচ্চ, কিন্তু সা অপেক্ষা রে ঠিক এক মাত্রা উচ্চ; কোন সুরকে প্রায়-এক মাত্রা উচ্চে চড়াইতে হইলে তাহাতে তাহার নবমাংশ যোগ করিতে হয়, আর তাহাকে এক-মাত্রা উচ্চে চড়াইতে হইলে তাহাতে তাহার অষ্টমাংশ যোগ করিতে হয়; মা'র পা-অঙ্ক ২য়েতে তাহার নবমাংশ যোগ করিলে ২০-৯ম হয়—ইহাই মা'র ধা, কিন্তু স'া-অঙ্ক ২য়েতে তাহার অষ্টমাংশ যোগ করিলে তবেই তাহা রে' অঙ্ক (অর্থাৎ এক সপ্তক উচ্চ রে-অঙ্ক) ৯-৪র্থ হয়। এ-জন্য সা-গ্রামের সুর-গুলিকে মা-গ্রামে ভর্ত্তি করিতে হইলে শুধু যে কেবল নিখা-দকে কোমল করিলেই হয় তাহা নহে, রেখাবকেও একটু নীচে নাবাইতে হয়। ঐ একই কারণ-বশতঃ স'া'র ধা-অঙ্ক (৫-৩য়) পা'র রে-অঙ্ক হইতে পারে না; কেননা পা-অঙ্ক হ'চ্চে ৩-২য়, তাহাকে প্রায়-এক

মাত্রা উচ্চে চড়াইলে ধা-অঙ্ক ৫-৩য় হয়, কিন্তু তাহাকে ঠিক্ এক মাত্রা উচ্চে চড়াইলে তবে তাহা পা'র রে-অঙ্ক ২৭-১৬শ হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রায়-এক-মাত্রা এবং ঠিক এক মাত্রার ইতর-বিশেষই যত গোলোযোগের মূল। যদি কড়ি-কোমল সমেত ১৩-টি সুর লওয়া যায় যথা—

সা, রে রে, গ গ, ম, প. প, ধা ধা, নি নি, সা ; আর যদি উহাদের ব্যবধান-মাত্রা এইরূপ হয় যে, সা-হইতে রে যতগুণ উচ্চ—রে হইতে রে ঠিক ততগুণ উচ্চ, রে-হইতে গ ঠিক্ ততগুণ উচ্চ, গ হইতে গ, গ হইতে ম, মা হইতে পা, পা হইতে পা, ইত্যাদি অর্থাৎ এক সুর হইতে তাহার অব্যবহিত পর-বর্ত্তী সুর মাত্রই, ঠিক্ ততগুণ উচ্চ, তবে সা-বাদে ঐ ১২টি সুরের অতিরিক্ত কোন সুরই কোন গ্রামে আবশ্যক হয় না ; তাহা হইলে প্রায়-এক-মাত্রা ও প্রায়-অর্দ্ধমাত্রা এ দুটি কথা উঠিয়া গিয়া সপ্তকের পাশাপাশিস্থ সুর-গুলির মধ্যে কোথাও বা খাঁটি এক মাত্রা ব্যবধান এবং কোথাও বা খাঁটি অর্দ্ধমাত্রা ব্যবধান দাঁড়ায়। স্বর-চক্রে যে দ্বাদশ-টি সুর ধরা হইয়াছে তাহা ঐরূপ হিসাবেই ধরা হইয়াছে—নহিলে দ্বাদশ সুরের অতিরিক্ত বিস্তর সুর আবশ্যক হইত,—এইমাত্র দেখা গিয়াছে যে মা'র ধা ও পা'র রে ঐ দ্বাদশ সুরের অতিরিক্ত; সা গ্রাম হইতে যে গ্রাম যত দূরবর্ত্তী সেই গ্রামে ঐ প্রকার অতিরিক্ত সুরের ততই সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার কথা। উক্ত ত্রয়োদশ সুরের পাশাপাশিস্থ স্বর-দ্বয় মাত্রেরই মধ্যে সমান ব্যবধান স্থাপন করিলে দাঁড়ায় এই যে সা-অঙ্ক ১, এককে যাহা দিয়া ১২-বার গুণের উপর গুণ করিলে ২ হয় তাহাই রে-অঙ্ক, সংক্ষেপে ২-এর দ্বাদশ মূল (twelveth root of two) রে অঙ্ক, তাহার (রে-অঙ্কের) দ্বি-স্বগুণ (square) রে, ত্রি-স্বগুণ (cube) গ, চতুঃস্বগুণ গ, ৫-স্বগুণ ম এবম্প্রকারে চলিয়া সর্ব্বশেষে পাওয়া যাইবে যে, তাহার ১২-স্বগুণ সা-অঙ্ক ২। পার্শ্ব-পত্রস্থিত দ্বিতীয়-চিত্রে এ-সা রেখা অপেক্ষা এ-রে যতগুণ বড়, এ-রে অপেক্ষা এ-রে ততগুণ বড়, এ-রে অপেক্ষা এ-গ ততগুণ বড়, এ-গ অপেক্ষা এ-গ ততগুণ বড়, ইত্যাদি-ক্রমে চলিয়া সর্ব্ব শেষে এ-সা অপেক্ষা এসা দ্বিগুণ বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অতএব এসা-রেখা সা'র পরিমাণ রেখা, এরে-রেখা রে'র পরিমাণ রেখা, ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে উক্ত ত্রয়োদশটি সুরের মধ্যেকার পাশাপাশিস্থ প্রতি দুই দুই সুরের মধ্যেই ঠিক্ সমান মাত্রা ব্যবধান বর্ত্তিবে। তৃতীয় চিত্রে পূর্ব্বেকার স্বর-ক্ষেত্রকে ঐরূপ সামমাত্রিক ব্যবধান-প্রণালী অনুসারে গঠন করা হইয়াছে। পূর্ব্বেকার স্বরক্ষেত্রের সহিত বর্ত্তমান স্বরক্ষেত্রের অন্ততঃ এটুকু সাদৃশ্য আছে যে, উভয় ক্ষেত্রেই গা মা এবং নি সা'র মধ্যেকার ব্যবধান অন্যান্য ব্যবধান অপেক্ষা কম। সা-দাঁড়ি প্রভৃতি দাঁড়ি-গুলি উচ্চারক তারের পরিমাণ-রেখা ইহা বলা বাহুল্য, আর সা-দাঁড়ির সাত-টি

ছেদ-স্থান পর্দা বসাইবার স্থান ইহাও বলা বাহুল্য।

চতুর্থ চিত্রের চক্রাভ্যন্তরস্থিত চৌকোণ-ক্ষেত্রটির চারি কোণে সা-গ্রামের তিনটি সম্বাদী স্বর সা গা পা, আর নি,সব-শুদ্ধ ধরিয়া মা-গ্রামের চারিটি বিবাদী স্বর সা গা পা নি সমান্তরে সমান্তরে বসিয়াছে দেখিতে পাইবে; তেমনি আবার সা-গ্রামের অনুবাদী স্বর তিনটি সা মা ধা যাহা মা-গ্রামের সম্বাদী স্বর তাহারা চক্রাভ্যন্তরস্থিত সম ভুজ-ত্রি-কোণের তিনটি কোণে সমান্তরে সমান্তরে বসিয়াছে দেখিতে পাইবে; ও সা গ্রামের তিনটি বিবাদী স্বর রে পা নি যাহা পা-গ্রামের সম্বাদী স্বর তাহারা সম-দ্বি-ভুজ ত্রিকোণটির তিনটি কোণে বসিয়াছে —সুতরাং রে হইতে পা এবং পা হইতে নি সমান্তর-বর্ত্তী। সমান্তরবর্ত্তী স্বতন্ত্র এবং সম-গুণ উচ্চ স্বতন্ত্র—ইহা যেন মনে থাকে; ১ হইতে ২ যত অন্তরে ২ হইতে ৩ তত অন্তরে অবস্থিতি করে বটে কিন্তু ১ অপেক্ষা ২ দ্বিগুণ বেশী, ২ অপেক্ষা ৩ ১॥০ গুণ বই বেশী নয়।

চতুর্থ চিত্রের চক্রাভ্যন্তর-স্থিত চতুষ্কোণ-ক্ষেত্রের কোণ-চতুষ্টয়বর্ত্তী সা গা পা নি সা এই কয়টি উত্তরোত্তর সমান্তর-স্থিত স্বরের মধ্যে সম্বন্ধ এই-রূপ,—৪ হইতে ৫ যতগুণ উচ্চ সা হইতে গা ততগুণ উচ্চ; ৫ হইতে ৬ যতগুণ উচ্চ—গা হইতে পা ততগুণ উচ্চ; ৬ হইতে ৭ যত গুণ উচ্চ—পা হইতে কোমল-নি ততগুণ উচ্চ; ৭ হইতে ৮ যতগুণ উচ্চ কোমল-নি হইতে সা ততগুণ উচ্চ; ইহার সহিত একটানে পাওয়া যায়,—৮ হইতে ৯ যতগুণ উচ্চ—সা হইতে রে ততগুণ উচ্চ; ৯ হইতে ১০ যত গুণ উচ্চ—রে হইতে গা ততগুণ উচ্চ। সমভুজ-ত্রিকোণের কোণ-ত্রয়বর্ত্তী সা মা ধা সা এই চারিটি উত্তরোত্তর সমান্তর-স্থিত স্বরের মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপ,—৩ হইতে ৪ যতগুণ উচ্চ সা হইতে মা ততগুণ উচ্চ, ৪ হইতে ৫ যতগুণ উচ্চ মা হইতে ধা তত গুণ উচ্চ, ৫ হইতে ৬ যতগুণ উচ্চ ধা হইতে সা ততগুণ উচ্চ। সম-দ্বিভুজ ত্রিকোণের কোন-ত্রয়-বর্ত্তী রে পা নি এই তিনটি সমান্তরস্থিত স্বরের মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপ,—৩ হইতে ৪ যতগুণ উচ্চ রে হইতে পা ততগুণ উচ্চ, ৪ হইতে ৫ যত গুণ উচ্চ পা হইতে নি ততগুণ উচ্চ।

ব্যবধান-সম্বন্ধে একটি বিষয় বলিবার এখনো অবশিষ্ট আছে। উচ্চ গ্রামের বিবাদী দল-ভুক্ত স্বগ্রামের কোমল নিখাদটি ধা অপেক্ষা ২১-২০শ গুণ উচ্চ; যে তিন প্রকার ব্যবধানের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে উহা তাহার ভিতরকার একটিও নহে। পাশাপাশিস্থ স্বরদ্বয়ের মধ্যে কেবল ৯-৮ম, ১০-৯ম, এবং ১৬-১৫শ গুণ উচ্চতা থাকি-বার কথা, কিন্তু এস্থলে তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে। প্রথমতঃ কোমল নিখাদটি সাত স্বরের অতিরিক্ত—এজন্য সাত স্বরের মধ্যে যেরূপ ব্যবধানের নিয়ম দেখা যায় তাহা যে উহার সম্বন্ধেও খাটিবে এমন কোন কথা নাই; দ্বিতীয়ত ধা অপেক্ষা ১৬-১৫শ গুণ উচ্চ স্বরই সাধারণ নিয়মা-

নুসারে কোমল নিখাদের বাচ্য, এই শেষোক্ত কোমল নিখাদ-টিই মা-গ্রামের মধ্যম। নিম্ন গ্রামের কোমল নিখাদ হ'চ্চে স্ব-গ্রামের মধ্যম—কোমল নিখাদ যদি দুই প্রকার হইল কাজেই মধ্যমও দুই প্রকার হইতে চায়। এখন বক্তব্য এই যে এক প্রকার মধ্যম অনুবাদী সুরের শ্রেণীভুক্ত, আর এক প্রকার মধ্যম বিবাদী-সুরের শ্রেণীভুক্ত, যেটি অনুবাদী শ্রেণীভুক্ত সেইটিই গান্ধার অপেক্ষা ১৬-১৫শ গুণ উচ্চ (অর্থাৎ ১৫ অপেক্ষা ১৬ যতগুণ উচ্চ), আর যেটি বিবাদী-শ্রেণীভুক্ত তাহা গান্ধার অপেক্ষা ২১-২০শ গুণ উচ্চ (২০ অপেক্ষা ২১ যত গুণ উচ্চ); অথবা ৬০ অপেক্ষা ৬৪ যত গুণ উচ্চ গান্ধার অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত মধ্যম ততগুণ উচ্চ, আর, ৬০ অপেক্ষা ৬৩ যত-গুণ উচ্চ গান্ধার অপেক্ষা শেষোক্ত মধ্যম ততগুণ উচ্চ। প্রথম-চিত্রকীয় চক্রের ১০॥০ অষ্টমাংশ স্থান (অর্থাৎ বহিস্থিত চৌকোণ ক্ষেত্রের গায়ে যেখানে ১০ এবং ১১ লিখিত আছে সেই-খানকার সেই ১০ এবং ১১ র মধ্যবর্ত্তী চক্রাংশটির ঠিক মধ্যস্থল) শেষোক্ত মধ্যমের স্থান;—এ মধ্যমটি, বাহুল্য-ভয়ে, ব্যবধান-নির্দ্দেশক চক্রে দেওয়া হয় নাই—যে মধ্যমটি দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা এ মধ্যম গান্ধারের একটু নিকটবর্ত্তী। কিন্তু তৃতীয়-চিত্রের অনুযায়ী পাশাপাশিস্থ অর্দ্ধ-মাত্রা-উচ্চনীচ সুর-সকলের মধ্যে যদি সামমাত্রিক ব্যবধান দাঁড় করানো যায় তাহা হইলে ওরূপ দ্বিবিধ মধ্যমের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না।

ক্রমশঃ

ভূ-পঞ্জর।

প্রথম প্রস্তাব।

সূর্য্য হইতে খসিয়া ক্রমে পৃথিবীর বাষ্পচক্র কিরূপে একটি গ্রহরূপ ধারণ করিয়া পরে আবার তাহা উষ্ণ সমুদ্রে মগ্ন হইল, তাহা আমরা "পৃথিবীর উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধে দেখিয়া আসিয়াছি, পরে সেই আদিম মহাসমুদ্র হইতে কিরূপে আবার অল্পে অল্পে দেশ মহাদেশ জীব জন্তু উদ্ভিদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে—তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি যখন পৃথিবীর বাষ্পাবরণের উত্তাপ ২০০০ ডিগ্রি সেন-টিগ্রেড পরিমাণ ছিল তখন সেই বাষ্পাবরণে লৌহ প্রভৃতি ধাতব ও নানা প্রকার আকরিক পদার্থ বাষ্পাকারে মিশ্রিত ছিল। উষ্ণতার হ্রাস সহকারে ক্রমে সেই বাষ্পরাশি জল রূপে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া যখন সমুদ্র উৎপন্ন করিল, তখন সেই বাষ্পাকার ধাতব ও আকরিক পদার্থ-রেণুও সেই বৃষ্টি জলের সহিত মিশিয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়াছিল। সেই

সকল রেণুই কালে সমুদ্র তলে স্থিতাইয়া স্থিতাইয়া স্তরসংস্থিতি দ্বারা ক্রমে দেশ মহাদেশ সৃষ্ট করিয়াছে। ইহা ছাড়া ভূগর্ভস্থ অগ্নির কার্য্য হেতুও পৃথিবীর পৃষ্ঠে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে।

সকল দ্রব্যই প্রায় তরল হইতে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় আয়তনে ছোট হইতে থাকে। দ্রব ধাতব পদার্থ ঘন হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া আয়তনে অনেক কমিয়া যায়। সেই নিমিত্ত ভূগর্ভ কালে শীতল হইয়া ঘন হইবার সঙ্গে সঙ্গে হ্রস্বায়তন হইয়া পৃথিবীর কঠিন আবরণের সহিত অসম্বদ্ধ হইতে লাগিল। যেমন একটি তুলা পূর্ণ বালিসের কতকগুলি তুলা খুলিয়া লইলে বালিসটি তুবড়াইয়া যায়, তেমনি পৃথিবীর আভ্যন্তরিক পদার্থের আয়তন হ্রাস বশতঃ পৃথিবীর কঠিন আবরণ অন্তরে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভর না পাইয়া, তুবড়াইয়া কোন কোন স্থানে দমিয়া গেল, কোন কোন স্থানে উচ্চ হইয়া পর্ব্বত মালায় পরিণত হইল। হিমালয় আল্‌প্‌ প্রভৃতি আধুনিক উচ্চ পর্ব্বত সকল অধিকাংশ এইরূপে নির্ম্মিত। তাহাদের নিম্নস্থ স্তর প্রথম যুগের নিম্ন ভূমি কিম্বা সাগরতল বটে, কিন্তু ভূগর্ভের উষ্ণতার হ্রাস সহকারে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে হঠাৎ বিপ্লব দ্বারা চারি দিকের ভূমি দমিয়া গেলে হিমালয় ও আল্‌প্‌ প্রভৃতি পর্ব্বত রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল পর্ব্বত শ্রেণী দেখিলে আমাদের মনে কি ভাব হয়? আমরা মনে করি চিরকাল হইতেই ইহা এইরূপ উন্নত অবস্থায় বিরাজমান। কত অল্পে অল্পে কত যুগযুগান্তের স্তর সংস্থিতি দ্বারা ইহার ভিত্তি নির্ম্মিত হইয়া, অবশেষে উপরোক্ত প্রকারে উচ্চ হইয়া পর্ব্বত শ্রেণী রূপে পরিণত হইয়াছে, ইহা আমরা হঠাৎ কল্পনা করিতে পারি না।

এইরূপ প্রণালী ছাড়া, অন্তরস্থ অগ্নির প্রভাবে কোন কোন অপেক্ষাকৃত পাতলা স্থান ফাটিয়া সেই গহ্বর দিয়া ধাতু স্রোত নির্গত হওয়াতে কালে তাহা জমিয়াও বড় ছোট নানা প্রকারের পর্ব্বত হইতে লাগিল। কিন্তু এইরূপে প্রথমে যে সকল পর্ব্বত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই সমুদ্রজলে পুনরায় বিনষ্ট হইয়াছে; তাহার ভগ্নাবশিষ্ট মৃত্তিকা ছাড়া এখন আর কিছুই নাই। সেই গহ্বর দিয়া গ্রানিট প্রস্তর (granite) ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ ব্যতীত, ধাতব ও আকরিক পদার্থ মিশ্রিত উষ্ণ জল স্রোতও বহমান হইতে লাগিল। ঐ জল মিশ্রিত ধাতুরেণুও স্থিতাইয়া কালে ভূপঞ্জর গঠিত করিয়াছে।

নদীতে যে প্রণালীতে চর পড়ে সেই প্রণালীতে সমুদ্রস্থ পদার্থ রেণু স্থানে স্থানে স্থিতাইয়া স্থল হইয়া উঠিল, আবার কোন স্থানের বা নব নির্ম্মিত স্তর রাশিকে অমনি চূরমার করিয়া আপন প্রভাবে সমুদ্র ভাসাইয়া লইয়া গেল। তাহা হইতে কালে আবার অন্যত্রে স্থল উৎপন্ন হইয়াছে। কত পর্ব্বত সমুদ্র জলে গলিয়া, কত স্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সেই রেণু রাশিতে অবশেষে এই সকল দেশ মহাদেশ সৃষ্ট হইয়াছে

তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন আমরা যে সকল দেশ মহাদেশ দেখিতেছি, এইরূপ কত দেশ আবার সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহারও স্থিরতা নাই। পার্ব্বত্য গ্রিক উপদ্বীপ অ্যাটিকা যে এককালে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, নানা বৃক্ষ সমাকুল বন পূর্ণ একটি দেশ ছিল—তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভুবেত্তাগণ বলেন তাহা নহিলে তৎ স্থানীয় সমুদ্রস্তরে এত বৃহৎ জন্তুর দেহাবশেষ কোথা হইতে আসিবে? ভুবেত্তাগণ নানা কারণ দেখাইয়া বলেন যখন হিমালয় সমুদ্র গর্ভে নিহিত ছিল তখন ভারতবর্ষ মাডাগাস্কার দ্বীপ ও মধ্য ও আফ্রিকা সংযুক্ত ছিল এবং ইহার পূর্ব্বে এক সময়ে উক্ত দেশ ভারত সাগরের দ্বীপ পুঞ্জ ও অষ্ট্রেলেসিয়া এবং এক সময় আমেরিকা ও ইয়োরোপ যে যুক্ত ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

যে সকল পদার্থে ভূপঞ্জর গঠিত হইয়াছে, তাহা তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

প্রথম—উৎপাত-জনিত মৃত্তিকা। * (Eruptive Rocks) অর্থাৎ যে সকল তরল পদার্থ সকল যুগেই মাঝে মাঝে ভূগর্ভ হইতে সবলে নির্গত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী-স্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহা উৎপাত জনিত মৃত্তিকা। এ মৃত্তিকা ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য পদার্থ হইতে বিভিন্ন বটে কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মৃত্তিকার মত স্ফটিকাকৃতি দানাদার (Crystalliue)। রাজমহল পাহাড়ে ও আসামসোলের ডাক বাংলার নিকট এবং অন্যান্য স্থানে এই জাতীয় মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়—মূল মৃত্তিকা। যে উত্তপ্ত পদার্থ সর্ব্ব প্রথমে শীতল হইয়া পৃথিবীর আবরণ সৃজিত করিয়াছিল, (যাহা আমরা পৃথিবীর উৎপত্তিতে বরফের দৃষ্টান্তে উত্তপ্ত ভূগর্ভের উপর জমাট বাঁধিতে দেখিয়া আসিয়াছি,) সেই সর্ব্ব প্রথমের মৃত্তিকা পরে রূপান্তরিত হইয়া স্ফটিকাকৃতি দানাদার হইয়াছে। এই মৃত্তিকাকেই মৌলিক মৃত্তিকা (Fundamental gneiss) কহা যায়। এই মৃত্তিকা হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর প্রভৃতি ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে প্রাপ্তব্য।

পর্ব্বত প্রভৃতি যে সকল স্থানে স্তরাবলি পর্য্যায় ক্রমে মূল দেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারা যায় সেখানে সর্ব্বশেষ স্তরে ইহা অবস্থিত বলিয়া এই মৃত্তিকা সর্ব্ব প্রথম উৎপন্ন স্থির করা যায়।

তৃতীয়—স্থিতান মৃত্তিকা (Sedimentary Rocks)। নানা প্রকার ধাতব ও আকরিক পদার্থ যাহা সমুদ্রে থিতাইয়া থিতাইয়া স্থল উৎপন্ন করিয়াছে—তাহাকেই স্থিতান মৃত্তিকা বলা যাইতে পারে। যেমন বালি চূণ ম্যাগনেসিয়া ইত্যাদি। বাঙ্গালার সমুদ্র সন্নিকটস্থ প্রদেশ মাত্রেই এরূপ মৃত্তিকা অপরিমেয়।

এই সকল ধাতব ও আকরিক দ্রব্যের দ্বারা সামুদ্রিক স্তর সংস্থিতির এমনি একটি পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে

* প্রস্তর ধাতু কর্দ্দম ইত্যাদি যত প্রকার পদার্থে পৃথিবী পঞ্জর গঠিত, তাহার সমস্তই 'মৃত্তিকা' নামের বাচ্য হইবে।

তাহাদের উৎপত্তির সময় স্পষ্টই ব্যক্ত করে।

প্রত্যেক স্তর যে সকল আকরিক পদার্থে নির্ম্মিত,এবং তাহাতে যে সকল প্রাণী দেহাবশেষ পাওয়া যায় তাহারা পরস্পর এরূপ অসমধর্ম্মী যে, সে সকল পরীক্ষা করিয়াই স্তরের উৎপত্তির সময় নিরূপিত হয়। ভূগর্ভ হইতে মাঝে মাঝে গ্র্যানিট পরফায়েরি ইত্যাদি প্রস্তর ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া সবলে উঠিবার সময় যদি সমস্ত স্তর-পর্য্যায় লণ্ড ভণ্ড না করিত, যদি মাঝে মাঝে সমুদ্র দ্বারা সমস্ত স্তর ধৌত হইয়া আবরণ-বিচ্যুত না হইত, তাহা হইলে ভূতত্ত্ব বিদ্যা আয়াস-সাধ্য হইত না। প্রত্যেক স্তর চিরকাল একই রূপ সাজান থাকিলে ভূবেত্তারা মাটী খুঁড়িয়া অতি সহজেই তাহার উৎপত্তির সময় নিরূপন করিতে পারিতেন। কিন্তু সর্ব্বদা গ্র্যানীটাদির উৎপাত হেতু এবং বন্যা প্রভাবে ঐ সকল স্তর এত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে অনেক কষ্টে ভূবেত্তাদিগকে স্তরের বয়স নির্ণয় করিতে হয়।

পৃথিবীতে প্রত্যহই পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু এক এক সময় কিছু কাল ধরিয়া এক প্রকার বিশেষ পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলা লক্ষিত হয়, এই পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলা তাহার পূর্ব্ব কিম্বা পরবর্ত্তী শৃঙ্খলা হইতে বিভিন্ন। এক প্রকার পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলার দ্বারা যে সকল প্রাণী কিম্বা মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়াছে অপর প্রকার পরিবর্ত্তন শৃঙ্খলাদ্বারা তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন প্রাণী ও মৃত্তিকা উৎপাদিত। এইরূপ এক একটি পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলার সময়কে ভূতত্ত্ববিদ্যায় এক একটি যুগ কহা যায়। যুগ আবার অন্তর যুগে, ও অন্তর যুগ গর্ভ যুগে বিভক্ত। পৃথিবীর জীবন কাল দুইটি প্রণালীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম, যুগের পর্য্যায় অনুসারে,আর দ্বিতীয়, তৎসাময়িক প্রাণীর প্রকৃতি অনুসারে। পৃথিবীর যুগ বিভাগ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

যুগ			অন্তরযুগ
প্রারম্ভ বা ইনফ্রা-সাইলুরিয়ণ (Infra-Silurian) কাল	আদি জীব বা Paleozoic		লরেনসিয়ন বা মৌলিক মৃত্তিকা Laurention or Fundamental gneiss ক্যাম্ব্রিয়ান (Cambrian)
১ ম যুগ (Primary Epoch)			সাইলুরিয়ন (Silurian) ডিবোনিয়ান (Devonian) অঙ্গার জনক বা কার্বনিফেরাস (Carboniferous)
২ য় যুগ (Secndary Epoch)	মধ্য জীব বা Mesozoic	Neo-zoic	ট্রায়াসিক বা ত্রিস্তর (Triassic) জুরাসিক (Jurassic) ক্রেটেসস্ বা চা-খড়ি (Cretaceous)
৩ য় যুগ (Tertiary Epoch)	নব্য জীব বা Cainozoic		ইয়োসীন (Eocene) মায়োসীন (Miocene) প্লায়োসীন (Pleiocene)
৪ র্থ যুগ (Post Tertiary Epoch)			বর্ত্তমান কাল

উপরের তালিকায় দুই প্রণালীতে পৃথিবীর যুগ বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম স্তম্ভে পর্য্যায়-ক্রমানুসারে যুগ-বিভাগ হইয়াছে, আর দ্বিতীয় স্তম্ভের বিভাগ তৎসাময়িক প্রাণীর প্রকৃতি অনুযায়ী; তৃতীয় স্তম্ভে অন্তর-যুগবিভাগ সন্নিবেশিত। যুগ পরম্পরার মধ্যে চারিটি স্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় সে রূপ নহে সেই জন্য তাহাকে সাধারণতঃ প্রারম্ভ বা সাইলুরিয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী (Infra-Silurian) কাল কহা যায়। দ্বিতীয় স্তম্ভের নামকরণের আর ব্যাখ্যা আবশ্যক করে না।

এখন প্রত্যেক যুগ ও তাহার অন্তর যুগ কিরূপ মৃত্তিকাতে নির্ম্মিত, কিরূপ জীব জন্তু ও উদ্ভিদ সে যুগের উৎপন্ন তাহার সংক্ষেপে আলোচনা আরম্ভ হইতেছে।

আদিম কালের সেই ভয়ানক ঝটিকা, সেই ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাৎ যাহা আমরা "পৃথিবীর উৎপত্তি"তে দেখিয়া আসিয়াছি তাহা ক্ষান্ত হইলে প্রকৃতি শান্ত গম্ভীর হইয়া পড়িল। প্রারম্ভ কালে যখন পৃথিবীর প্রথম আবরণ নির্ম্মিত হয় তখন কোন প্রাণী মাত্রেরই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন পৃথিবীর উত্তাপ এত অধিক ছিল, যে সে উত্তাপে কোন প্রাণী * জন্মান অসম্ভব। তারাহীন অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় নানাপ্রকার বাষ্পীয় পদার্থ সমাচ্ছন্ন অন্ধকার পৃথিবীর নিবিড় মেঘ ভেদ করিয়া সূর্য্য তখন কিরণ দিতে পারিত না। সেই উত্তপ্ত এবং চিররাত্র অন্ধকার পৃথিবীতে কি করিয়া প্রাণী দেখা দিবে? এই সময়কে azoic অর্থাৎ জীব শূন্য সময় কহা যায়।

ক্রমে একদিকে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি হইয়া মেঘমুক্ত সূর্য্য দেখা দিতে লাগিল, আর একদিকে পৃথিবীর আবরণ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাণীর বাসোপযোগী হইতে লাগিল। সূর্য্যালোকই পৃথিবীর জীবন, সূর্য্যালোক না থাকিলে প্রাণী-উৎপত্তি হইতে পারিত না।

অগ্রে উদ্ভিদ কিম্বা অগ্রে জন্তু জন্মাইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করা দুরূহ, অতি পুরাকালের সমুদ্র কর্দ্দমে (argillaceous schists) উদ্ভিদ ও জন্তু-উভরেই দেহাবশেষ দেখা যায়। কিন্তু প্রথম যুগের অধিকাংশ সময়ে, বিশেষতঃ অঙ্গার জনক যুগে উদ্ভিদই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, সে যুগে প্রাণী অতি বিরল। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা যায় যে উদ্ভিদই জীবের অগ্রে জন্মিয়াছিল। বিশেষতঃ পৃথিবীর জীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে যখন দেখা যায় পৃথিবী অল্পে অল্পে ক্রমশই উন্নতির দিকে গিয়াছে, তখন উদ্ভিদ হইতে জীব জন্তু উন্নততর প্রাণী বলিয়া অগ্রে উদ্ভিদ হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

প্রারম্ভ বা ইনফ্রা সাইল্যুরিয়ান কাল।

ইনফ্রা সাইল্যুরিয়ান, অর্থাৎ সাইল্যু-

* বিজ্ঞানে জীব জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, সুতরাং এই প্রস্তাবে প্রাণী শব্দে উদ্ভিদাদিও বুঝাইবে।

রিয়ান অন্তর-যুগের নিম্ন স্তর দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম লরেনসিয়ান বা মৌলিক মৃত্তিকা, দ্বিতীয় ক্যামব্রিয়ান।

সেণ্টলরেন্স নদীর নাম হইতে মৌলিক মৃত্তিকার নাম লরেনসিয়ান হইয়াছে। পৃথিবীর উৎপত্তিতে বলা হইয়াছে যে প্রাচীন কালে পৃথিবীর বাষ্পাবরণের ভার এখনকার অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক ছিল। এই প্রভূত চাপ ও ভূগর্ভ নিঃসৃত উষ্ণ জলের কার্য্য দ্বারা প্রথম-উৎপন্ন ভূপৃষ্ঠ মৃত্তিকা এমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে তাহার আদিম রূপ এখন স্থির করা যায় না, সেই জন্য ইহার আর একটি নাম রূপান্তরিত মৃত্তিকা। এই দ্রবীভূত মৃত্তিকা পুনর্ব্বার ঘন হইবার সময় স্ফটিকাকৃতি দানাদার হইয়াছে। মৌলিক মৃত্তিকা ছাড়া অন্য দুই জাতীয় মৃত্তিকাও উক্ত রূপ কোন নৈসর্গিক কারণে সময় সময় রূপান্তরিত (Metamorphosed) হইয়াছে। লরেনসিয়ান কালে ভারতবর্ষে হিমালয়ের ও আসাম এবং ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে মূল মৃত্তিকা মাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এ সাময়িক স্তরে কোথাও কোথাও ফরমানিফেরা (Formanifera) নামক কীটাণুর দেহাবশেষ দেখা যায়। তাহা ছাড়া এ মৃত্তিকায় আর কোন প্রাণী চিহ্ন দেখা যায় না।

ক্যামব্রিয়ান কাল।

যে সকল পরিবর্ত্তন দ্বারা ভূপৃষ্ঠ বর্ত্তমান আকারে পরিণত লইয়াছে তাহা এই কেমব্রিয়ান সময় হইতেই আরম্ভ। ওয়েল্স্ দেশে প্রথমে এইরূপ মৃত্তিকা আবিষ্কৃত হয় সেই জন্য ওয়েল্সের প্রাচীন নাম কেমব্রিয়া হইতে ইহার নাম ক্যামব্রিয়ান. হইয়াছে।

ভূবেত্তাগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কেমব্রিয়ান যুগের মৃত্তিকায় অতি অল্পই জীবনের চিহ্ন পাইয়াছেন।

কেমব্রিয়ান মৃত্তিকার কোন কোন স্থানে কেবল কীট-চিহ্ন ও কোন কোন স্থানে পুরুভুজের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়। এইরূপ প্রাণী বিরল স্তরের উপরিভাগেই শম্বুক-জাতীয় প্রাণীবহুল স্তর সংস্থিতি দেখিয়া বোধ হয় ক্যামব্রিয়ান যুগের শেষ সময়ে হঠাৎ ভূপৃষ্ঠের বিশেষ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত ইহার পরের স্তর সংস্থিতি হইতেই প্রকৃত পক্ষে প্রথম যুগের আরম্ভ ধরা যায়। কেননা এই সময় হইতেই পৃথিবীতে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণী-সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে।

কাশ্মীরের উত্তরস্থ ল্যাডাকের সন্নিহিত পীরপঞ্জল এই যুগে উৎপন্ন।

প্রথম যুগ।

প্রথম যুগে জল দ্বারাই প্রায় সমস্ত পৃথিবী বেষ্টিত ছিল,এবং সেই জলেই আমরা প্রথমে উদ্ভিদ ও জীবের জন্ম দেখিতে পাই। ব্র্যাকিওপোডা (Brachiopoda) —বা বাহুপদী এবং অর্থসিরেটাইটীস (Orthoceratites) বা ঋজুশৃঙ্গ এবং আরো কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শম্বুক, এবং ট্রাইলোবাইটীস (Trilobites) বা ত্রিকুণ্ডলী বলিয়া একরূপ কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী অতি পুরাতন সমুদ্র জীব। ইহা ভিন্ন প্রবালকীট অতি পুরাতন কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত

বর্ত্তমান। একরূপ জলজ উদ্ভিদ এই সকল প্রাণীর সমকালীন। যখন সমুদ্র সরিয়া পড়িয়া আরো দেশ মহাদেশ বিস্তৃত হইল, তখন ক্রমে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতীয় উদ্ভিদ যেমন Equisetaccae জাতীয় শরগাছ ও দুই এক প্রকার পর্ণীতরু (Fern) এবং অন্যান্য প্রকার উদ্ভিদ জন্মাইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি প্রথম যুগের আবার অন্তর-যুগ আছে। প্রথম যুগটি ৪ ভাগে বিভক্ত—সাইলুরিয়ান্, ডিবোনিয়ান বা লোহিত প্রস্তর, কারবনিফরস বা অঙ্গারজনক, পারমিয়ান।

সাইলুরিয়ান অন্তর যুগ।

সাইলুরিয়ান অন্তর-যুগ কেমব্রিয়ান কালের পরবর্ত্তী। এ যুগের মৃত্তিকা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ডদেশের স্রপসিয়র ও ওয়েল্‌স দেশে এই মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া উক্ত প্রদেশের সাইলিয়োরিস নামক প্রাচীন অধিবাসীদিগের নাম হইতে বিখ্যাতনামা ভূবেত্তা মারকিসন এই মৃত্তিকার সাইলুরিয়ান নামকরণ করেন।

সাইলুরিয়ান যুগে প্রাণী চিহ্ন—অর্থাৎ উদ্ভিদ এবং জীব দেহাবশেষ বহুল-রূপে লক্ষিত হয়। এ সময়ে এখনো পৃথিবী অন্ধকার। মেঘ ভেদ করিয়া সূর্য্য এখনো সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। তবে অনবরত বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীর বাষ্পাবরণ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু পরিষ্কার হইয়াছে, কালে যে সূর্য্য রশ্মি প্রভাবে পৃথিবীর উন্নত অবস্থা হইবে তাহার লক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এই যুগের অতি বিস্তৃত স্বল্প-গভীর সমুদ্র মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে কোথাও বা অনুর্ব্বর, কোথাও বা জলজ-উদ্ভিদ-বেষ্টিত ভূখণ্ড কোথাও বা অনুচ্চ পাহাড়গুলি মস্তক তুলিয়া আছে। নানা জাতীয় শম্বুক এবং স্ফুটাঙ্গ (Articulated জীব সেই বিস্তৃত সমুদ্র এবং সেই সঙ্কীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর। একরূপ পুষ্পহীন জলজ-উদ্ভিদ সাইলুরিয়ানের সর্ব্ব নিম্ন স্তরে পাওয়া যায়। সাইলুরিয়ান অন্তর যুগ আবার দুই গর্ভ-যুগে বিভক্ত। অধঃ সাইলুরিয়ান এবং উর্দ্ধ সাইলুরিয়ান। আমরা এই যুগের অধস্তরে প্রথম উদ্ভিদ চিহ্ন দেখিতে পাই। ইহার আগে আর উদ্ভিদের চিহ্ন পাওয়া যায় না, কেমব্রিয়ান যুগে কেবল মাত্র পোকা ও পুরুভুজ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে উদ্ভিদ যে জীব জন্তুর পরবর্ত্তী ভূবেত্তারা এরূপ নিষ্পত্তি করেন না। তাঁহারা বলেন সম্ভবতঃ উদ্ভিদই অগ্রে জন্মিয়াছে, তবে উদ্ভিদ যেরূপ অল্পে বিনষ্ট হয় তাহাতে সেই বিপ্লব পরায়ণ লরেন্সিয়ান ও কেমব্রিয়ান কালে উদ্ভিদ জন্মাইলেও তাহাদের চিহ্ন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ডাক্তার হুকার বলেন সাইলুরিয়ান যুগের উর্দ্ধ স্তরে উন্নত জাতীয় একরূপ শৈবাল (Lyeopodaccn) উদ্ভিদের অসংখ্য বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। অরথোসেরাটাইটিস্ বলিয়া এ সময়ে যে এক রূপ সমুদ্র জীব ছিল তাহাদের শারীরিক গঠন দেখিয়া বোধ হয় তাহারা অন্যান্য

সমুদ্র জীব আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত।

তাহা ছাড়া এই সময়ে কাঁকড়া ও শম্বুক জাতীয় বহুসংখ্যক জীব দেখিতে পাওয়া যায়। সমেরু জীবের (Vertebrata) মধ্যে সাইলুরিয়ানের উর্দ্ধ স্তরে এক জাতীয় মৎস্যের দেহাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। ইহাই সর্ব্ব প্রথম মৎস্য।

সাইলুরিয়ান অন্তর-যুগে যেরূপ স্তর বিপ্লব দেখিতে পাওয়া যায় এমন আর কোন যুগে নহে। দর্বিগ্নি (D'orbigny) সমুদ্র হইতে ৪৬০০০ ফুট উচ্চ আণ্ডিস পর্ব্বত শিখরে প্রাণী দেহাবশেষ সহ সাই-লুরিয়ন মৃত্তিকা স্তর পাইয়াছেন। কি ভয়া-নক বিপ্লব দ্বারাই ইহা এত উচ্চে উঠিয়া-ছিল! ওয়েলস পর্ব্বত শ্রেণী সাইলুরিয়ান যুগে উৎপন্ন।

সাইলুরিয়ান অন্তর-যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ জলমগ্ন ছিল, ইয়োরোপে কেবল কয়েকটি দ্বীপ সমুদ্র হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। ব্রিটনের পশ্চিম প্রান্তে একটি দ্বীপ, ফ্রান্সের বর্ত্তমান ব্রিটনি ও ফ্রান্সের মধ্য দেশে অপর কএকটি দ্বীপ মাত্র তখন হইয়াছিল। উত্তরে নরওয়ে, সুইডেন ও রুসিয়া পরস্পর সংযুক্ত ভাবে একই মহা-দেশের অন্তর্গত ছিল। উত্তর আমেরিকায়, নিউ ব্রিটন, দক্ষিণ আমেরিকায় চিলি ও ব্রাজিলের কতকাংশ, ভারতবর্ষে বাঙ্গালার কতকাংশ, বুন্দেলখণ্ড, আরবলি পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ, পঞ্জাব, ছোটনাগপুর ইত্যাদি সাইলুরিয়ান অন্তর যুগে বর্ত্তমান ছিল।

ডিবোনিয়ান বা লোহিত প্রস্তর অন্তর যুগ।

এই দুই জাতীয় মৃত্তিকা একই যুগে উৎপন্ন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। সাইলুরিয়ান যুগের সমুদ্র ক্রমে যখন আরো শুকাইয়া আসিল, যখন স্বল্প গভীর সমুদ্র হইতে স্থানে স্থানে কোথাও বা মিষ্ট কোথাও বা লবনাক্ত জলাশয় হইয়া সময় ক্রমে আবার সেই জলাশয় সমুদ্র হইতে দূরে স্থিত হ্রদরূপে পরিণত হইল, তখন সেই হ্রদে যে স্তর-সংস্থিতি হইয়াছিল সেই মৃত্তিকাই লোহিত প্রস্তর, অর্থাৎ লাল বেলে পাথর। আর সেই একই সময়ে হ্রদের পরিবর্ত্তে সমুদ্র মধ্যে যে সকল মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা-কেই ডিবোনিয়ান মৃত্তিকা নামে ভূবেত্তারা আখ্যাত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ডিবন নামক স্থানে এই মৃত্তিকা প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া এই যুগকে মারকিসন এবং সেজবিক ডিবোনিয়ান নাম দিয়াছেন।

লোহিত-প্রস্তর-মৃত্তিকা-স্তর লাল, এবং তাহাতে প্রাণী চিহ্ন বিরল দেখিয়া অধ্যাপক র‍্যামজে বলেন তাহা সমুদ্র জাত নহে হ্রদ জাত।

ডিবোনিয়ান অন্তর যুগের যে সকল প্রাণী দেহাবশেষ পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বা-পেক্ষা উন্নততর। পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী সকল যে ক্রমশ উৎকর্ষ লাভ

করিয়া আসিয়াছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। সর্ব্বপ্রথম লরেনসিয়ান কালে ভারতবর্ষ প্রভৃতি দুই একস্থানে কীটাণুর চিহ্নই পাওয়া যায়, কেমব্রিয়ান কালে কেবল মাত্র পোকা ও পুরুভুজের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহার পর সাইলুরিয়ান অন্তর-যুগে জলজ উদ্ভিদ, শম্বুক, কাঁকড়া ইত্যাদি দেখা যায়। ডিবোনিয়ান অন্তর যুগে শম্বুক কাঁকড়া ও মৎস্য জাতীয় জীব অপেক্ষা উচ্চতর জীব জন্মে নাই বটে কিন্তু ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতর। বাহুপদী শম্বুকই এ সময়ের প্রধান জীব। এখন ইহারা যেমন বহুসংখ্যক তেমনি বর্দ্ধিতায়তন। অন্যান্য মৎস্য ছাড়া এখন অর্দ্ধ ভাগ আঁইস ও অর্দ্ধ কঠিন চর্ম্মাচ্ছাদিত একরূপ আশ্চর্য্যজনক মৎস্য ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্ভিদ ছাড়া ক্যালেমাইট ও ব্যাঙ্গের ছাতার ন্যায় একপ্রকার উদ্ভিদ এ সময়ে প্রথম জন্মে। সাইলুরিয়ান যুগের ক্রমশ অল্প অল্প পরিবর্ত্তন দ্বারা হঠাৎ আর একটি ভিন্ন যুগ আসাতে সাইলুরিয়ানেরশেষভাগ ও ডিবোনিয়ানের প্রথমাংশ এত মিশিয়া গিয়াছে, যে ডিবোনিয়ানের আরম্ভ স্থান নির্ণয় করা বড় সহজ নয়।

কারবনিফরস্‌ বা অঙ্গার জনক অন্তর-যুগ।

অঙ্গারজনক অন্তর-যুগ ডিবোনিয়নের পরবর্ত্তী। এই সময়ের উদ্ভিদ হইতেই মৃদঙ্গারের উৎপত্তি। কার্ব্বনিফরস্‌ দুই গর্ভযুগে বিভক্ত, মৃদঙ্গার গর্ভ-যুগ, এবং চুনে পাথর (Carboniferous limestone) গর্ভ যুগ। কার্ব্বনিফরসের যে সময়ে উদ্ভিদ হইতে ক্রমে মৃদঙ্গার হইয়াছে সেই বিভাগেই মৃদঙ্গার গর্ভ-যুগ। এবং যে সময় সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ-সঙ্কুল-স্তরের সংস্থিতি হইয়াছে তাহাই লাইমস্টোন অর্থাৎ চুনে পাথর গর্ভ-যুগ। ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া গ্র্যানিট পরফায়েরি প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত-নির্গত-উষ্ণ জল, চুণ ও বালি পূর্ণ ছিল। সমুদ্র জলে মিশ্রিত সেই চুণ দ্বারা শম্বুক জাতীয় জীবের কঠিন আচ্ছাদন নির্ম্মিত। সুতরাং এই আচ্ছাদন হইতেই আবার পরে চুণ উৎপন্ন হয়। চুনেপাথরের স্তরগুলি মৃদঙ্গার স্তরের নিম্নস্থিত অতএব ইহা তাহার পূর্ব্ব সাময়িক। চুনে পাথরের পর্ব্বত সকল সমুদ্রের স্থিতান মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত। এই সকল পর্ব্বতে পুরুভুজ ও দুই তিন প্রকার শম্বুক জাতীয় জীবের এবং মৎস্যের দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তাহাতেই এই সকল পর্ব্বতের সামুদ্রিক উৎপত্তি প্রমাণীকৃত হইয়াছে। উদ্ভিদ বহুলত্বই কার্বনিফরসের বিশেষ লক্ষণ। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাল যেমন উদ্ভিদ বিরল, ইহা তেমনি উদ্ভিদ-বহুল। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বের অসীম সমুদ্র বক্ষে এখন উদ্ভিদাবৃত বহুসংখ্যক দ্বীপপুঞ্জ উঠিয়া স্থলের পরিমাণ বাড়াইয়াছিল।

এ সময়ের জলবাতাস নিতান্ত স্যাঁতসেঁতে ও গরম; নহিলে, যে প্রকার উদ্ভিদ হইতে মৃদঙ্গার জন্মিয়াছে, তাহার উৎপত্তি

অসম্ভব হইত। তখনকার উদ্ভিদাদি পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে তখন ঋতুর বিশেষ পরিবর্ত্তন হইত না, সমস্ত বৎসরেই একটি মাত্র গ্রীষ্ম ঋতু প্রবল থাকিত। তখন পৃথিবীর কোন অংশেই শীতাতপের বৈষম্য ছিল না, প্রায় সকল অংশেই সমান গরম ছিল। ইহার অনেক পরে, তৃতীয় যুগেই শীতের প্রধান্য দেখা যায়। তখন আভ্যন্তরিক উত্তাপেই সমস্ত পৃথিবী এত উত্তপ্ত ছিল যে সূর্য্যের উত্তাপে তাহার বিশেষ কোন হ্রাস বৃদ্ধি হইত না। বিষুব রেখার সন্নিহিত গ্রীষ্ম প্রধান দেশ হইতে উত্তর মহাসাগরের চির তুষারময় মেলবিল দ্বীপ পর্য্যন্ত এবং স্পিউজবর্জেন হইতে আফ্রিকা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই এ সময়ে সম জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভিদ-প্রাচুর্য্য এই সময়ের একটি বিশেষ লক্ষণ, এবং মৃদঙ্গারের তৈলময় পদার্থে (bitumenous matter,) অধিক পরিমাণে অঙ্গারাম্ল এবং জলজান বাষ্প দেখিয়া বোধ হয় এ গর্ভযুগে অঙ্গারাম্ল বাষ্পের প্রাচুর্য্য বশতই প্রাণীর সংখ্যা এত বিরল। যাহা হউক কেবল অনুমান ছাড়া এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেবল এইটুক আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে আমাদের বর্ত্তমান যুগে যে সকল জাতীয় পর্ণীতরু (Fern) নিতান্ত ক্ষুদ্র, অঙ্গারজনক অন্তর যুগে সেই সকল জাতিই অতি বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর বৃক্ষ ছিল। এখনকার যে সকল শৈবাল-লতা (Lycopod) দুই হাতের অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায়না, তখন সেই জাতীয়েরাই আশি নব্বই ফুট উচ্চ বৃক্ষ হইত। এক প্রকার শল্কদেহী বৃক্ষ (Lepedodendrons) দ্বারাই তখন প্রায় সমস্ত জঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল। ইহার এক একটি পাতা ২০ ইঞ্চি লম্বা, এবং স্কন্ধ দুই হাত পরিমাণ পর্য্যন্ত দেখা যায়। এই জাতীয় আর এক রূপ বৃক্ষ ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘায়তনের। এ সময়ের আর এক রূপ বৃক্ষ (Sigellarias) কখন কখন দৈর্ঘ্যে ১০০ ফুট ছাড়াইয়া উঠিত। এই সকল বৃহৎ বৃক্ষ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র পর্ণীতরু দ্বারা তখনকার জঙ্গল পূর্ণ ছিল। সমুদ্র তীরও এই সময় নানা প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষে আবৃত থাকিত। ক্যালামাইট নামে এক প্রকার শরগাছ তখন উর্দ্ধে বিশ কি ত্রিশ ফুট এবং বেড়ে এক কিম্বা দুই ফুট হইতে দেখা গিয়াছে। ইহাদের ক্ষুদ্রায়তন বংশজ এখন ইংলণ্ডে অশ্বপুচ্ছ (Mare's tail) নামে বিখ্যাত। এ সময়ে ঝাউ জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পুষ্টিকর কোন ফল কিম্বা ফুল তখনো জন্মে নাই। ফুলহীন ফলহীন বৃক্ষাদি পূর্ণ হরিৎ ক্ষেত্রই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। বৃক্ষাদি সংখ্যায় বহুল, অথচ জাতিতে অত্যল্প। এই অন্তর-যুগের শেষ ভাগে কাঁকড়া জাতীয় ট্রাইলোবাইট জীব একেবারে লোপ পাইয়াছিল।

মৃদঙ্গার গর্ভ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী যে ভাগে জীব-দেহ-সঙ্কুল স্তর হইয়াছিল তাহা চুনে প্রস্তর গর্ভ যুগ। শম্বুক জাতীয় ৪০০ প্রকার প্রাণী,

কাঁকড়া ও মৎস্য জাতীয় অল্প সংখ্যক প্রাণী,এবং পুরুভুজ এই সময়ের অধিবাসী। এসময়ে একরূপ জলজ সরীসৃপের (Archegosaurus) কেবল মস্তক মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, এই সময়েই প্রথম সরীসৃপ জন্মে। এতদিন যত প্রকার জীব জন্মিয়াছে তাহার মধ্যে এ সময়ের গ্যানয়েড (ganoid) নামে একপ্রকার মৎস্য দেখিতে অতি সুন্দর। এ সময়ের উদ্ভিদ হইতেও অল্প পরিমাণে মৃদঙ্গার উৎপন্ন হইয়াছে।

এই চুনে পাথরের স্তর নির্ম্মিত হইতে যে বহু সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রোফেসর ফিলিপস্ গণনা করিয়া বলেন যে এক লক্ষ ২২ হাজার ৪০০ বৎসরে ৬০ ফুট মাত্র মৃদঙ্গার কিম্বা চুণে পাথরের স্তর নির্ম্মিত হইতে পারে। এইরূপ মৃদঙ্গারের স্তরের উপরস্তর নির্ম্মিত হইতে কত সহস্র বৎসরই লাগিয়াছে! এতাবৎকাল কোন বিশেষ ভৌতিক বিপ্লব লক্ষিত হয় না। কিন্তু মৃদঙ্গার গর্ভ যুগের শেষ কালে ভূপৃষ্ঠের প্রবল বিপ্লব দ্বারা অঙ্গার শৈল সকল উৎপাদিত রূপান্তরিত ও ভগ্নাবয়ব হইয়া ভিন্ন অন্তর যুগ উৎপন্ন হইয়াছে।

পারমিয়ান অন্তর যুগ।

অঙ্গার জনক অন্তর যুগের পরেই পারমিয়ান অন্তর যুগের আরম্ভ। রুসিয়ার পারম্ প্রদেশের স্তর সংস্থিতি দেখিয়া মারকিসন ইহার এই নাম দিয়াছেন। সায়েনাইট ও পরফাইরি প্রস্তর এই যুগে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই উৎপাৎ জনিত উত্তাপে সমুদ্র হইতে বহুল পরিমাণ বাষ্প উত্থিত হইতে লাগিল, এই বাষ্প উপরে উঠিতে উঠিতে শীতল হইয়া বৃষ্টি রূপে আবার পৃথিবীতে পড়িল। সেই বৃষ্টি-সিক্ত মাটীতে সরীসৃপ জাতির পদচিহ্ন লক্ষিত হয়। পারমিয়ানের প্রাণী প্রায় কার্বনিফরসেরই অনুরূপ, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী যুগের জীব দু একটিও এই যুগে দেখা যায়। এ যুগেই প্রথম ঝিনুক জন্মে। শম্বুক প্রভৃতি অন্যান্য জীব ছাড়া গ্যানয়েড ও প্লাসয়েড মৎস্য এ সময়ে অনেক দেখা যায়। এ সময়ের আবহাওয়া অনেকটা পূর্ব্ববর্ত্তী অন্তর-যুগের ন্যায়, কিন্তু অধ্যাপক র‍্যামজে দেখাইয়াছেন যে এ সময়ে দুই এক স্থানে হিম শৈলের কার্য্য (Glacial action) লক্ষিত হয়।

এই তো প্রথম যুগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া দেখা গেল প্রাণীর প্রথম আবির্ভাবই বর্ত্তমান যুগের বিশেষ লক্ষণ। প্রাণীদিগের মধ্যে মনুষ্য এখন যেমন শ্রেষ্ঠ জীব তেমনি এ যুগের সমুদ্রে গেনইড নামক যে উজ্জ্বল বর্ণ মৎস্য বাস করিত, তাহারা তখনকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ট্রাইলোবাইট জাতীয় কাঁকড়া এই যুগে জন্মে এবং এই যুগে তাহা লোপ পায়। পক্ষী কিম্বা স্তন্যপায়ী জীব এখনো জন্মে নাই। উদ্ভিদাদি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই, এ যুগের শেষ দিকে দুএকটি সরীসৃপের পদচিহ্ন পাওয়া যায়। এই কালের পৃথিবীর

সর্ব্বত্রই প্রায় আব-হাওয়া একরূপ, মেরু-সন্নিহিত প্রদেশেও যেরূপ আর বিষুবরেখা-সন্নিহিত প্রদেশেও সেইরূপ। পৃথিবী নিজে এই যুগে এত উষ্ণ ছিল যে তাহার উপর সূর্য্য উত্তাপের বিশেষ প্রভাব ছিল না। পৃথিবীর উত্তপ্ত তরল গর্ভ হইতে প্রথমে গ্র্যানিট Granite তৎপরে পরফায়েরি এবং শেষে সায়েনাইট উৎক্ষিপ্ত হয়। স্কটলাণ্ডের বেননেবিস পর্ব্বতে ইহা অতি সুন্দর রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বত শ্রেণীর মূল প্রদেশ গ্র্যানিটের; তন্মধ্য দিয়া পরফায়েরি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং এই পর্ব্বতের সর্ব্বোপরিস্থ সায়েনাইট স্তর পারফায়েরি ভেদ করিয়া উৎপন্ন।

পথিক।

(প্রভাতে।)

উঠ, জাগ' তবে—উঠ', জাগ' সবে—
প্রভাত এসেছে—প্রভাত এসেছে
স্বরণ-বরণ গো!
নিশার দারুণ প্রাচীর আঁধার
শতধা শতধা করিয়া বিদার—
তরুণ বিজয়ী তপন এসেছে
অরুণ চরণ গো।
মাথায় বিজয়-কিরীট জ্বলিছে,
গলায় বিজয় কিরণ-মাল,
বিজয়-বিভায় উজলি উঠেছে
বিজয়ী রবির তরুণ ভাল!
উষা নব-বধু দাঁড়াইয়া পাশে,
গরবে, সরমে, সোহাগে, উলাসে,
মৃদু হেসে হেসে সারা হোল বুঝি,
বুঝিবা সরম রহে না গো;
আঁখি দুটি নত, কপোলটি রাঙা,
পদতলে শুয়ে মেঘ ভাঙা ভাঙা,
অধর টুটিয়া পড়িছে ফুটিয়া
হাসি সে বারণ সহে না গো!

এস' এস' তবে—ছুটে যাই সবে,
কর' কর' তবে ত্বরা,
এমন বহিছে প্রভাত বাতাস,
এমন হাসিছে ধরা!
সারা দেহে যেন অধীর পরাণ
কাঁপিছে সঘনে গো,
অধীর চরণ উঠিতে চায়,
অধীর চরণ ছুটিতে চায়,
অধীর হৃদয় মম
প্রভাত বিহগ সম
নব নব গান গাহিতে গাহিতে,
অরুণের পানে চাহিতে চাহিতে
উড়িবে গগনে গো!
ছুটে আয় তবে, ছুটে আয় সবে,
অতি দূর—দূর যাব',
করতালি দিয়া সকলে মিলিয়া
কত শত গান গাব!
কি গান গাইবে? কি গান গাইব!
যাহা প্রাণ চায় তাহাই গাইব,

গাইব আমরা প্রভাতের গান,
হরষের গান,—জীবনের গান,
ছুটে আয় তবে—ছুটে আয় সবে
অতি দূর দূর যাব!
'কোথায় যাইবে? কোথায় যাইব!
জানি না আমরা কোথায় যাইব,
সুমুখের পথ যেথা লয়ে যায়,
কুসুম-কাননে, অচল শিখরে,
নির্ঝর যেথায় শত ধারে ঝরে,
মণি-মুকুতার বিরল গুহায়—
সুমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায়!'
দেখ—চেয়ে দেখ—পথ ঢাকা আছে
কুসুম রাশিতে গো,
কুসুম দলিয়া—যাইব চলিয়া
হাসিতে হাসিতে গো!
ফুলে কাঁটা আছে? কই! কাঁটা কই!
কাঁটা নাই—নাই—নাই,
এমন মধুর কুসুমেতে কাঁটা
কেমন থাকিবে ভাই!
যদিও বা ফুলে কাঁটা থাকে ভুলে
তাহাতে কিসের ভয়!
ফুলেরি উপরে ফেলিব চরণ,
কাঁটার উপরে নয়।
ত্বরা কোরে আয়, ত্বরা কোরে আয়,
যাই মোরা যাই চল্।
নির্ঝর যেমন বহিয়া চলেছে
হরষেতে টল মল,
নাচিছে, ছুটিছে, গাহিছে, খেলিছে,
শত আঁখি তার পুলকে জ্বলিছে,
দিন রাত নাই কেবলি চলিছে,
হাসিতেছে খল খল,
তরুণ মনের উছাসে অধীর
ছুটেছে যেমন প্রভাত সমীর;
ছুটেছে কোথায়?—কে জানে কোথায়!
তেমনি তোরাও আয় ছুটে আয়,
তেমনি হাসিয়া—তেমনি খেলিয়া,
পুলক-উজল নয়ন মেলিয়া,
হাতে হাতে বাঁধি করতালি দিয়া
গান গেয়ে যাই চল।
আমাদের কভু হবে না বিরহ,
এক সাথে মোরা রব' অহরহ,
এক সাথে মোরা করিব গমন,
সারা পথ মোরা করিব ভ্রমণ,
বহিছে এমন প্রভাত পবন,
হাসিছে এমন ধরা!
যে যাইবি আয়—যে থাকিবি থাক্—
যে আসিবি—কর ত্বরা!

আমি যাব গো!—
প্রভাতের গান আর জীবনের গান
দেখি যদি পারি তবে আমি গাব গো,
আমি যাব গো!
যদিও শকতি নাই এ দীন চরণে গো,
যদিও নাইক জ্যোতি এ পোড়া নয়নে গো,
শরীর সাধিতে নারে মন মোর যাহা চায়—
শতবার আশা করি শতবার ভেঙ্গে যায়;
আমি যাব গো!
সারারাত বোসে আছি নয়নেতে নাইক নিমেষ
প্রাণের ভিতরদিকে চেয়ে দেখি অনিমিখে,
চারিদিকে হৃদয়ের—যৌবনের ভগ্ন অবশেষ!
ভগ্ন আশা—ভগ্ন সুখ—
ধূলি মাখা অতি জীর্ণ স্মৃতি!

সামান্য বায়ুর দাপে ভিত্তি থর থর কাঁপে,
একটি আধটি করি ইস্টক খসিছে নিতি নিতি;
আমি যাব গো।
নবীন আশায় মাতি পথিকেরা যায়,
কত গান গায়—
এ ভগ্ন প্রমোদালয়ে পশে স্বর ভয়ে ভয়ে,
প্রতিধ্বনি মৃদুল জাগায়,
প্রতি ভগ্ন ঘরে ঘরে ভ্রমিয়া বেড়ায়।
তখন নয়ন মুদি কত স্বপ্ন দেখি!
কত স্বপ্ন হায়!
কত দীপালোক—কত ফুল—কত পাখী!
কত সুধামাখা কথা, কত হাসিমাখা আঁখি!
কত পুরাতন স্বর কে জানে কাহারে ডাকে!
কত কচি হাত এসে খেলে এ পলিত কেশে,
কত কচি রাঙ্গা মুখ কপোলে কপোল রাখে!
কত স্বপ্ন হায়!
হৃদয় চমকি উঠি চারিদিকে চায়,
দেখেগো কঙ্কালরাশি হেথায় হোথায়!
সে দীপ নিভিয়া গেছে—
সে ফুল শুকায়ে গেছে—
সে পাখি মরিয়া গেছে—
সুধামাখা কথাগুলি চিরতরে নীরবিত,
হাসিমাখা আঁখিগুলি চির তরে নিমীলিত।
আমি যাব গো!
দেখি যদি পারি তবে প্রভাতের গান
আমি গাব গো!
এ ভগ্ন বীণার তন্ত্রী ছিঁড়েছে সকল আর—
দুটি বুঝি বাকী আছে তার!
এখনো প্রভাতে যদি হরষিত প্রাণ
এ বীণা বাজাতে যাই—চমকি শুনিতে পাই
সহসা গাহিয়া উঠে যৌবনের গান
সেই দুটি তার।
টুটে গেছে ছিঁড়ে গেছে বাকী যত আর।
যুগ-যুগান্তের এই শুষ্ক জীর্ণ গাছে
দুটি শাখা আছে;
এখনো যদিগো শুনে বসন্ত পাখীর গীত;
এখনো পরশে যদি বসন্ত মলয় বায়,
দুচারিটি কিশলয় এখনো বাহির হয়,
এখনো এ শুষ্ক শাখা হেসে উঠে মুকুলিত,
একটি ফুলের কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিতে চায়,
ফুটো-ফুটো হয় যবে ঝরিয়া মরিয়া যায়।
এই জীর্ণ শুষ্ক গাছে
দুটি শাখা আছে;—
বাকী ছিল যত
শ্যামল যৌবনে হায়, অদৃষ্ট কুঠার ঘায়
বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে এ জন্মের মত,
সুমুখে রয়েছে পোড়ে শুষ্ক পাতা যত।
অদৃস্টের বজ্রানলে কেহ বা গিয়েছে জ্বোলে,
সে কখনো মুকুলিবে এ জন্মে কি আর?
সমুখে বাতাসে উড়ে ভস্মশেষ তার।
এ ভগ্ন বীণার দুটি ছিন্নশেষ তারে
পরশ ক'রেছ আজি গো—
নব-যৌবনের গান ললিত রাগিণী
সহসা উঠেছে বাজি গো।—
এই ভগ্ন ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনি খেলা করে,
শ্মশানেতে হাসিমাখা শিশুটির প্রায়,
লইয়া মাথার খুলি, আধ পোড়া অস্থিগুলি,
নিঃশঙ্কে ভস্মের পরে ছুটিয়া বেড়ায়,
হাসিয়া নিরখে, কি সে ভাবিয়া না পায়!
ভগ্ন গৃহে বাজে আজি যৌবনের গান;
জীর্ণ শাখে ফুটে আজি যৌবনের ফুল;
বহুদিন পরে আজি উলসিত প্রাণ

হরষে আকুল!
আমি যাব গো।—
তোমরা তরুণ পাখী উড়েছ প্রভাতে
সকলে মিলিয়া এক সাথে,
এ পাখী এ শুষ্ক শাখে একেলা কেমনে থাকে!
সাধ—তোমাদেরি সাথে যায়—
সাধ—তোমাদেরি গান গায়;
তরুণ কণ্ঠের সাথে এ পুরাণ' কণ্ঠ মোর
বাজিবে না স্বরে?
না হয় নীরবে রব'—না হয় কথা না কব'
শুনিব তোদেরি গান এ শ্রবণ পূরে।
এই ছিন্ন জীর্ণ পাখা বিছায়ে গগনে
যাব প্রাণ পণে—
পথমাঝে শ্রান্ত যদি হই অতিশয়
তবে দিস্‌রে আশ্রয়।
আমি যাব গো।
পথে যে কণ্টক আছে কি ভাবিলি তার?
কত শুষ্ক জলাশয়, কত মাঠ মরুময়,
পর্ব্বত-শিখর-শায়ী অনন্ত তুষার,
কত শত বক্রগতি নদী খরস্রোত অতি,
ঘুরিছে দারুণ বেগে আবর্ত্তের জল,
হা দুর্ব্বল, তুই তার কি ভাবিলি বল?—
ভাবিয়াত কাটায়েছি সারাটি জীবন,
ভাবিতে পারি না আর—জীবন দুর্ব্বহ ভার;
সহিব এ পোড়াভালে যা আছে লিখন।
প্রতি পদে পদে যদি অদৃষ্টের কাঁটা বিধি,
প্রতি কাঁটা তুলে তুলে কত আর চলি!
না হয় চরণে বিঁধি মরিব গো জ্বলি।
আমি যাব গো।

—

(মধ্যাহ্নে।)

"আর কত দূর?" "যত দূর হোক্"
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"এ শ্রান্ত চরণে বিঁধিয়াছে বড়
কণ্টক বিষম গো।"
"প্রখর তপন হানিছে কিরণ
অনলের সম গো।"
"বিঁধিয়াছে কাঁটা? কি হয়েছে তার!
যত বিঁধিয়াছে দ্বিগুণ তাহার
পাইবে কুসুম গো।
খেলিবার তরে আসিনিত হেথা,
বহিতে ফুলের ভার,
বিঁধিবেক কাঁটা, হানিবে তপন
প্রখর কিরণ ধার।
ছি ছি ছি সামান্য শ্রমেতে কাতর
করিছ রোদন গো!
ছি ছি ছি সামান্য ব্যাথায় অধীর
শিশুর মতন গো!"
"যাহা ভেবেছিনু সকাল বেলায়
কিছুই তাহা যে নয়।"
"তাহাই বোলে কি আধ'পথ হোতে
ফিরিবারে সাধ হয়?"
"তবে চল যাই—যত দূর হোক
ত্বরা চল সেই দেশ—
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"বল'বল মোরে এই মরুময়
পথের কি শেষ আছে?

পাব কি আবার শ্যামল কানন,
ঘন ছায়াময় গাছে ?"
"হয়ত বা পাবে—হয়ত পাবে না
হয়ত বা আছে—হয়ত নাই !"
"ওই যে সুদূরে দূর-দিগন্তরে
হরিত কানন দেখিতে পাই !"
"হরিত কানন—হরিত কানন—
ওই যে গো হেরি হরিত কানন !
চল, সবে চল, হসিত আনন,
চল ত্বরা চল—চলগো যাই !"
"ওযে মরীচিকা ;"—"ও কি মরীচিকা ?"
"মরীচিকা ?" 'তাই হবে !"
"বল. বল মোরে, এ দীর্ঘ পথের
শেষ কোন খানে তবে ?"

———

অবশ চরণ হেন উঠিতে চাহে না যেন—
পারি না বহিতে দেহ ভার।
এ পথের বাকী কত আর !
কেন চলিলাম ?
সে দিনের যত কথা কেন ভুলিলাম ?
ছেলেবেলা একদিন আমরাও চলেছিনু—
তরুণ আশায় মাতি আমরাও বোলেছিনু—
"সারাপথ আমাদের হবেনা বিরহ,
মোরা সবে এক সাথে রব অহরহ।"
অর্দ্ধপথে না যাইতে যত বাল্যসখা
কে কোথায় চলে গেল না পাইনু দেখা।
শ্রান্ত-পদে দীর্ঘ-পথ ভ্রমিলাম একা।
নিরাশা-পুরেতে গিয়া সে যাত্রা করেছি শেষ,
পুন কেন বাহিরিনু ভ্রমিতে নূতন দেশ ?
ভগ্ন-আশা ভিত্তি পরে নব-আশা কেন
গড়িতে গেলাম হায় উনমাদ হেন ?
যেথা ছিনু বেশ ছিনু নিরাশার সমাধি ভূমিতে,
শ্রান্ত এচরণ লোয়ে পুন কেন এলেম ভ্রমিতে?
আঁধার কবরে সেথা মৃত ঘটনার
কঙ্কাল আছিল পোড়ে, স্মৃতি নাম যার।
একদিন ছিল যাহা তাই সেথা আছে,
আর কভু হবে না যা' তাই সেথা আছে ;
এক দিন ফুটেছিল যে ফুল সকল
তারি শুষ্ক দল,
এক দিন যে পাদপ তুলেছিল মাথা—
তারি শুষ্ক পাতা,
এক দিন যে সঙ্গীত জাগাত রজনী
তারি প্রতিধ্বনি,
যে মঙ্গল ঘট ছিল দুয়ারের পাশ
তারি ভগ্ন রাশ !
যে বৃক্ষ মরিয়া গেছে তাই সেথা আছে,
যে অঙ্কুর বাড়িবে না তাই সেথা আছে।
সে প্রেত-ভূমিতে আমি ছিনু রাত্রিদিন
প্রেত-সহচর।
কেহবা সমুখে আসি দাঁড়ায়ে কাঁদিত
শীর্ণ-কলেবর।
কেহবা নীরবে আসি পাশেতে বসিয়া,
দিন নাই রাত্রি নাই—নয়নে পলক নাই—
শুধু বোসে ছিল এই মুখেতে চাহিয়া।
সন্ধ্যা হলে শুইতাম—দীপ হীন শূন্য ঘর;
কেহ কাঁদে—কেহ হাসে—
কেহ পায়—কেহ পাশে—
কেহ বা শিয়রে ব'সে শত প্রেত সহচর !
কেহ শত সঙ্গী লোয়ে,আকাশ মাঝারে রোয়ে
ভাব-শূন্য স্তব্ধ মুখে,করিত গো নেত্রপাত—
এমনি কাটিত দিন এমনি কাটিত রাত !
কেন হেন দেশ ত্যজি আইলাম হা—রে—

ফুরাত জীবন-দিন চিন্তাহীন, ভয়হীন,
মরিয়া গো রহিতাম মৃত সে সংসারে,
মৃত আশা, মৃত সুখ, মৃতের মাঝারে!
আবার নূতন করি জীবনের খেলা
আরম্ভ করিতে কি গো সময় আমার?
ফুরায়ে গিয়েছে যবে জীবনের বেলা
প্রভাতের অভিনয় সাজে কি গো আর?
তবে কেন চলিলাম?
সে দিনের যত কথা কেন ভুলিলাম?
এখন ফিরিতে নারি, অতি দূর—দূর পথ,
সমুখে চলিতে নারি শ্রান্ত দেহ জড়বৎ।
হে তরুণ পান্থগণ, যেওনাক' আর,
শ্রান্ত হইয়াছি বড় বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই, সীমা দেখিতে না পাই
অতি দূর—দূর পথ—বসি একবার।

"আর কতদূর?" "যত দূর হোক্,
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"কোথা এর শেষ?" "যেথা হোক্‌নাক'
তবুও যাইতে হবে,
পথে কাঁটা আছে শুধু ফুল নহে
তাহাও জানিও সবে!
হয়ত যাইব কুসুম-কাননে,
হয়ত যাইব না;
হয়ত পাইব পূর্ণ জলাশয়,
হয়ত পাইব না।
এ দূর পথের অতি শেষ সীমা
হয়ত দেখিতে পাব—
হয়ত পাব না, ভুলি যদি পথ
কে জানে কোথায় যাব!
শুনিলে সকল, এখন তোমরা
কে যাইবে মোর সাথ।
যে থাকিবে থাক, যে যাইবে এস—
ধর সবে মোর হাত।
দিন যায় চোলে, সন্ধ্যা হোল বোলে,
অধিক সময় নাই,
বহু দূর পথ রহিয়াছে বাকী,
চল ত্বরা কোরে যাই।"
"ওপথে যাব না, মিছা সব আশা,
হইব উত্তর গামী?"
"দক্ষিণে যাইব" "পশ্চিমে যাইব"
"পূরবে যাইব আমি।"
"যে যাইবে যাও, যে আসিবে এস,
চল ত্বরা কোরে যাই।
দিন যায় চোলে, সন্ধ্যা হোল বোলে,
অধিক সময় নাই।"

যেওনা ফেলিয়া মোরে, যেওনাক আর;
মুহূর্ত্তের তরে হেথা বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই, সীমা দেখিতে না পাই
যেওনা, বড়ই শ্রান্ত এ দেহ আমার।

"চলিলাম তবে, দিন যায় যায়,
হইনু উত্তর গামী।"
"দক্ষিণে চলিনু" "পশ্চিমে চলিনু"
"পূরবে চলিনু আমি।"
"যে থাকিবে থাক,' যে আসিবে এস,'
মোরা ত্বরা কোরে যাই।
দিন যায় চোলে, সন্ধ্যা হোল বোলে,
অধিক সময় নাই।"

হাসিতে হাসিতে প্রাতে আইনু সবার সাথে,
সায়াহ্নে সকলে তেয়াগিল।
দক্ষিণে কেহবা যায়, পশ্চিমে কেহবা যায়,
কেহবা উত্তরে চলে গেল।
চৌদিকে অসীম মরু, নাই তৃণ, নাই তরু,
দারুণ নিস্তব্ধ চারিধার,
পথ ঘোর জনহীন, মরিয়া যেতেছে দিন,
চুপি চুপি সমুখেতে আসিছে আঁধার।
অনল-উত্তপ্ত ভুঁয়ে নিস্পন্দ রয়েছি শুয়ে,
অনাবৃত মাথার উপর।
সঘনে ঘুরিছে মাথা, মুদে আসে আঁখি পাতা,
অসাড় দুর্ব্বল কলেবর।
কেন চলিলাম?
সহসা কি মদে মাতি আপনারে ভুলিলাম?
দক্ষিণা-বাতাস বহা ফুরায়েছে এ জীবনে,
হৃদয়ে উত্তর বায় করিতেছে হায় হায়—
আমি কেন আইলাম বসন্তের উপবনে?
জানিস্ কি হৃদয় রে, শীতের সমাধি পরে
বসন্তের কুসুম শয়ন?
অরুণ-কিরণ-ময় নিশার চিতায় হয়
প্রভাতের নয়ন মিলন?
একেলা থাকিতে যবে নারি কোন মতে,
মাঝে মাঝে ছুটে আসি তরুণ জগতে।
তাহারা যেমন হাসে তেমনি হাসিতে চাই,
তাহারা যে গান গাহে আমিও সে গান গাই,
তবুও, তবুও কেন মিশিতে পারিনে যেন,
হাসিময় জনময় যৌবনের বিজনতা,
বুঝিতে পারিনে যেন তাহাদের কোন কথা!
যেন তাহাদের গান পশি এই শূন্য প্রাণ
খুঁজিয়া না পায় কোথা লইবে আশ্রয়;
হেথা ভ্রমে হোথা ভ্রমে, না পায় আলয়।
যৌবন বীণার মাঝে আমি কেন থাকি আর,
মলিন, কলঙ্ক-ধরা একটি বেসুরা তার।
কেন আর থাকি আমি যৌবনের ছন্দ মাঝে
নিরর্থ অমিল এক কানেতে কঠোর বাজে!
আমার আরেক ছন্দ, আমার আরেক বীণ,
সেই ছন্দে একি গান বাজিতেছে নিশি দিন।
সন্ধ্যার আঁধার আর শীতের বাতাসে মিলি
সে ছন্দ হোয়েছে গাঁথা মরণ কবির হাতে;
সেই ছন্দ ধ্বনিতেছে হৃদয়ের নিরিবিলি,
সেই ছন্দ লিখা আছে হৃদয়ের প্রতি পাতে!
তবে কেন চলিলাম?
সহসা কি মদে মাতি আপনারে ভুলিলাম!
তবে যত দিন বাঁচি রহিব হেথায় পড়ি;
এক পদ উঠিবনা মরি ত হেথায় মরি।
মাথার উপর দিয়া যাইবে দিবস রাত;
পড়িবে মাথার পরে রবিকর বৃষ্টিপাত।
হেথা হোতে উঠিব না, মৌনব্রত টুটিব না,
চরণ অচল রবে, অচল রবে এ হাত।
দেখিস্, প্রভাত কাল হইবে যখন,
তরুণ পথিক দল করি হর্ষ-কোলাহল
সমুখের পথ দিয়া করিবে গমন,
আবার নাচিয়া যেন উঠেনারে মন!
উল্লাসে অধীর-হিয়া দুখ শ্রান্তি ভুলি গিয়া
আর উঠিস্ না কভু করিতে ভ্রমণ।
প্রভাতের মুখ দেখি উনমাদ হেন
ভুলিস্‌নে—ভুলিস্‌নে—সায়াহ্নেরে যেন!

বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস।

সূচনা।

প্রাচীন কালে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীগণ "ভৌমিক" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইতেন। * "ভূঞা" ইহার অপভ্রংশ। এক সময়ে বাঙ্গালা দ্বাদশ ভৌমিকের রাজ্য (বারভূঞকা মুলুক) বলিয়া খ্যাত ছিল। † কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন, গঙ্গা-বক্ষস্থিত বদ্বীপ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ছিল। সেই সকল বিভাগের জমীদারগণই "দ্বাদশ ভৌমিক" বা "বারভূঞা" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ‡ ভাগীরথী, পদ্মা ও মেঘনার মধ্যবর্ত্তী "ভাটী" প্রদেশই যে দ্বাদশ ভৌমিকের "মুলুক" ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। পাঠানদিগকে দূরীকৃত করিয়া সমগ্র বাঙ্গলা পদদলন করিতে মোগলদিগের সপ্তদশ বর্ষ অতীত হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন এই সপ্তদশ বর্ষই দ্বাদশ ভৌমিকের পরমায়ু। এই উক্তি কোন মতেই সঙ্গত বোধ হয় না; ভৌমিকশ্রেণীতে যে সকল মহাত্মার নাম গ্রথিত রহিয়াছে, তাঁহারা সকলেই আকবরের সমসাময়িক নহেন। বিশেষত আকবরের জন্মের পূর্ব্বেও বাঙ্গালা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। || প্রকৃত পক্ষে পাঠানদিগের শাসন কালেই বাঙ্গলা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ছিল। সেই সকল বিভাগের জমীদারগণ সংস্কৃতে "ভৌমিক"—অপভ্রংশে "ভূঞা" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাদিগের "রাজা" কিম্বা "রায়" উপাধি ছিল। "মহারাজাধিরাজ" "মহারাজেন্দ্র বাহাদুর" ও "মহারাজা বাহাদুর" প্রভৃতি অনেক অনুচিত উপাধি সে কালে প্রচলিত ছিল না কিন্তু ভারতীয় বর্ত্তমান স্বাধীন নৃপতিগণ হইতে বঙ্গীয় ভৌমিকগণ ভাল অবস্থাপন্ন ছিলেন। তাহাদের দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল, রণতরী ছিল। ইচ্ছানুসারে জলে-স্থলে সমভাবে আপনাদের বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া গৌরবান্বিত হইতেন। আমরা এই সকল ভৌমিক-

* রাজস্থানেও ভৌমিক আখ্যা পরিলক্ষিত হয়।

Tod's Rajasthan. (Mokerjees Ed) Vol I page 123.

† আসামেও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতীয় দ্বাদশ ভৌমিক ছিল। কিন্তু তাঁহারা জমীদার নহেন। (বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া প্রণীত আসাম বুরঞ্জী, ৪৮ পৃষ্ঠা।

‡ কর্ণেল উইলফোর্ড বলেন—ভাটী প্রদেশের আধিপত্য লইয়া ত্রিপুরা ও আরাকাণ রাজের নিয়ত জলযুদ্ধ চলিত এবং তাহারা উভয়ই "বারভূঞার অধিপতি" উপাধি ধারণ করিতেন।

Aseaatic Resrches Vol XIV page 451.

|| ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত; ১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

দিগের বিবরণ ক্রমে পাঠকদিগকে উপহার দিব।

দ্বাদশ ভৌমিকের নাম এই রূপ উল্লেখ হইয়া থাকে—

১। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়, চন্দ্রদ্বীপ। (কায়স্থ, বসু।)

২। রাজা প্রতাপাদিত্য, যশোহর। (কায়স্থ গুহ।)

৩। চাঁদ রায়,কেদার রায়,শ্রীপুর,বিক্রমপুর। (কায়স্থ, দেব।)

৪। মুকুন্দরাম রায়, ভুষণা। (কায়স্থ ?)

৫। রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য, ভুলুয়া। (কায়স্থ, সুর।)

৬। ঈশা খাঁ মসনদ্ আলি, খিজিরপুর, সুবর্ণগ্রাম। *

৭। ফাজেল গাজি, ভাওয়াল।

৮। চাঁদ গাজি, চাঁদ প্রতাপ।

৯। রাজা কংশনারায়ণ লস্কর রায়, তাহারপুর (বা তাহিরপুর। (ব্রাহ্মণ।)

১০। রাজা রামকৃষ্ণ, সাতৈল, পাবনা † (ব্রাহ্মণ।)

১১। পুটিয়ার ঠাকুর বা রাজা। (ব্রাহ্মণ।)

১২। রাজা গণেশ রায়,দিনাজপুর। (কায়স্থ। ‡)

* ঈশা খাঁর পিতা হিন্দু ও মাতা যবন কন্যা।

† চাটমহল স্টেসনের অধীন।

‡ ডাক্তার ওয়াইজ এতন্মধ্যে পাঁচ জন ভৌমিকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। See Journal As. So. Bengal Vol XLIII. part I page 197—214. উক্ত প্রবন্ধের সূচনায় ডাক্তার সাহেব বলেন The following notes regarding five of these governors, imperfect though they are, will it is to be hoped excite others, who have the opportunity, to add further particulars and complete what is still wanting of the history of Bengal previous to the final conquest by the Muhammadans.

আমরা ভৌমিকদিগের বিবরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের লিখাই যে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ হইবে এরূপ আশা করিতে পারি না। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিব।

চন্দ্রদ্বীপের রাজ বংশের বিবরণ।

চন্দ্রদ্বীপ জেলা বাখরগঞ্জের অন্তঃপাতী একটী পরগণা। এই পরগণার নামানুসারে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বাখরগঞ্জ প্রদেশ "চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বৈদেশিক লেখকগণ চন্দ্রদ্বীপের পরিবর্ত্তে "বাকলা" বা "বাগোলা" রাজ্য লিখিয়াছেন। * বাকলা একটী স্বতন্ত্র পরগণা। আমাদের বিবেচনায় "বাকলা" বা "বাগোলা" কেশবসেন দেবের তাম্রশাসনাঙ্কিত "বাঙ্গলী"র অপভ্রংশ মাত্র। †

* রাজমালা, ব্রহ্মার ইতিহাস ও আইন আকবরি প্রভৃতি গ্রন্থে "বাকলা" বা "বাগোলা"ই লিখিত। ছায়রল মতাক্ষরিণ প্রণেতা ইহাকে "বুগলা" লিখিয়াছেন।

† See Kasava Sen's Inscriptions of Bakerganj.

চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে বেব্রিজ সাহেব পশ্চাদুক্ত দেশপ্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন।—বিক্রমপুর নিবাসী চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহান্তে তিনি তাঁহার পত্নীর নাম "ভগবতী" শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইলেন। তিনি ইস্টদেবীর সংজ্ঞাবিশিস্টা রমণীর সহিত সহবাস করিতে অসম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণ অবশেষে আত্মনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। নির্ব্বেদ পরতন্ত্র চন্দ্রশেখর এক ক্ষুদ্র তরী আরোহণ করিয়া জলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে চলিলেন। সে সময় বাখরগঞ্জ প্রদেশের নাম গন্ধও ছিল না। নদরাজ লৌহিত্য এতদূর না আসিয়াই বঙ্গোপসাগরের দর্শন পাইয়াছিলেন। বঙ্গ বা সমতট রাজ্যের অর্দ্ধাংশ সে সময় লবণাক্ত জল রাশিতে আবৃত ছিল। * চন্দ্রশেখর ক্ষেপণী সঞ্চালনে দক্ষিণ দিগভিমুখে গমন করিলেন। অহোরাত্র গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন,—দ্বিতীয়মৎস্যগন্ধারূপিণী এক ধীবর-কন্যা ক্ষুদ্র নৌকারোহণে একাকিনী সমুদ্র বক্ষে বিচরণ করিতেছে। চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বালে? অসীম অর্ণবে একাকিনী বিচরণ করিতেছ, তোমার কি ভয় নাই?" বালিকা উত্তর করিল—"দেব! আমি জালজীবীর কন্যা, অর্ণবে বিচরণ আমার জাতীয় ব্যবসায়, ইহাতে আমার ভয় কি। কিন্তু আপনি জন্মপরিগ্রহ দ্বারা বর্ণগুরু ব্রাহ্মণকুল উজ্জ্বল করিয়াছেন, আপনি গোস্বামী, কি কারণে এখানে আসিলেন। তদুত্তরে চন্দ্রশেখর তৎসমক্ষে স্বীয় মর্ম্মপীড়া বিবৃত করিলেন। তখন বালিকা ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "মূর্খ! জাননা জগজ্জননী ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। রমণী মাত্রই প্রকৃতির অংশভূতা।" ব্রাহ্মণ ধীবর বালিকার মুখে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বালিকার ক্ষুদ্র জলযানে লম্ফপ্রদান করিলেন এবং বালিকার পদধারণ করিয়া বলিলেন,—"মাতঃ! আপনি কে?" বালিকা পুনঃ পুনঃ আপনাকে ধীবরকন্যা বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন মতেই

Journal As, So, Bengal Vol V1I page 56.

* দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গের রাজধানী সমতটের পাদমূলে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ খেলা করিত। ত্রিপুরা ও বঙ্গের মধ্যস্থলে সাগরশাখা বিস্তৃত ছিল। "ঝাপটার" বিস্তৃত মোহনা অদ্যাবধি তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে, অধিকন্তু রামপাল ও দাউদ কাঁদীর মধ্যবর্ত্তী চরস্থিত গ্রামগুলির বয়ঃক্রম ৩। ৪ শতাব্দীর অধিক হইবে না। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বেও সমতটের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে বঙ্গের কলেবর কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ছিল। শকাব্দের একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান বাক্‌লা (প্রাচীন বাঙ্গুলী) প্রদেশে চট্টভট্টজাতি বাস করিত। গৌড়েশ্বর কেশব সেনদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে ঐ স্থান শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে দান করা হইয়াছিল।

নিরস্ত হইলেন না। অবশেষে বালিকা বলিল, বৎস আমি তোমার ইস্টদেবী। তদনন্তর বরদা তাঁহাকে বরদান করিলেন, এই স্থান শুষ্ক হইয়া দ্বীপে পরিণত হইবে। তোমার নামানুসারে এই দ্বীপ "চন্দ্রদ্বীপ" নামে খ্যাত হইবে এবং তুমি ইহার অধিপতি হইবে। বর দিয়া বরদা অন্তর্হিত হইলেন।

মতান্তরে,—

চন্দ্রশেখর নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার, দনুজমর্দ্দন দেব নামে কায়স্থ জাতীয় জনৈক শিষ্য ছিল। চন্দ্রশেখর সতত ক্ষুদ্র জলযানে ভ্রমণ করিতেন। নৌকারোহী সন্ন্যাসী একদা নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন, কালী বলিতেছেন—"বৎস! এই স্থানে জলতলে কয়েকটী দেবমূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে। তুমি ইহাঁদের উদ্ধার কর।" পরদিবস সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্যকে তিন বার ডুবদিয়া তিনটী দেবমূর্ত্তি উদ্ধার করিতে বলিলেন। দনুজমর্দ্দন দুইবার ডুব দিয়া কাত্যায়নী ও মদনগোপাল নামে ২টী বিগ্রহ উঠাইয়াছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ইহা অদ্যাপি মাধবপাসা রাজবাটীতে স্থাপিত রহিয়াছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ সন্ন্যাসীশিষ্য তৃতীয়বার ডুবিতে চেস্টা করেন নাই, কিন্তু করিলে তিনি রাজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি উঠাইতে পারিতেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে এই বাণী উচ্চরিত হইল "এই স্থানটী শুষ্ক হইয়া একটী দ্বীপের উৎপত্তি হইবে এবং দনুজমর্দ্দন ইহার অধিপতি হইবেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর নামানুসারে এই দ্বীপ "চন্দ্রদ্বীপ" আখ্যাপ্রাপ্ত হইবে। * আকাশবাণী সফল হইল। রাজা দনুজমর্দ্দন দেব—অপভ্রংশে দনুজ রায় চন্দ্রদ্বীপের প্রথম ভূপতি।

চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজ বংশাবলী।

১

রাজা দনুজমর্দ্দন দেব রায়।

২

রাজা রমাবল্লভ রায়।

৩

রাজা কৃষ্ণবল্লভ রায়।

৪

রাজা হরিবল্লভ রায়।

৫

রাজা জয়দেব রায়।

চন্দ্রদ্বীপ-রাজ্যস্থাপয়িতা রাজা দনুজমর্দ্দনদেব কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পুরুষানুক্রমে গণনা করিলে তিনি শকাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। বিখ্যাত যবন ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজ স্বীয় "তবকতই নসরি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"মহাম্মদ বখ্তিয়ার লক্ষ্মণাবতী অধিকার

* ৪।৫ বৎসর অতীত হইল, একখানি ইংরাজি সংবাদ পত্রে (বোধ হয় Bengalee) চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে (যদি স্মৃতিভ্রম না হয়) লিখিত ছিল—প্রতাপাদিত্যের দুহিতার (রামচন্দ্রের পত্নী) নামানুসারে এই দ্বীপ চন্দ্রদ্বীপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

করিলে রায় লাক্ষ্মণেয় বঙ্গের রাজধানী সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করেন।” তবকত্তই নসরি” সঙ্কলন কালে (৬৪০—৪২ হিজিরি শক মধ্যে) তদ্বংশধরগণ বঙ্গ শাসন করিতেছিলেন। * তওয়ারিখে বারনি বলেন ৬৮০ হিঃ অব্দে গৌড়ের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা “সুলতান মোঘিসুদ্দিন তুগ্রল” “সম্রাট বলবন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া স্বীয় বন্ধু রত্নমাণিক্য দেবের আশ্রয়ে যাইতেছিলেন। সম্রাট সেন বংশজ সুবর্ণগ্রাম (বা সমতটাধিপতি দনুজরায়ের সাহায্যে জাহাজ নগর ত্রিপুরার) প্রান্তে তুগ্রলের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ববিদ ডাক্তার ওয়াইজ অনুমান করেন—এই দনুজরায়ই পশ্চাৎ পাঠান কর্ত্তৃক সুবর্ণগ্রাম হইতে তাড়িত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য স্থাপন করেন। ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের অনুমান সত্য হইলে সচিবপ্রবর আবেলফাজেল ও জোসেফ টিফেফনতল্লারের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। অনুশাসন পত্রে সেনরাজগণের নামের অন্তে “দেব” উপাধি পরিলক্ষিত হয়, রাজা দনুজ মর্দ্দনও কায়স্থ “দেব” বংশ সম্ভূত। †

রাজা দনুজ রায়ের জীবনী সংক্রান্ত প্রধান ঘটনা বঙ্গজ কায়স্থদিগের সমাজ বন্ধন। বল্লাল কায়স্থদিগকে যেরূপ সামাজিক শ্রেণীতে বন্ধন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই নিয়ম অনুসারে ঘোষ, বসু ও মিত্র এই তিন ঘর কুলীন; দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ও গুহ এই আট ঘর মৌলিক। এতদ্ভিন্ন কায়স্থগণ “বায়াত্তরে” নামে খ্যাত। দনুজ রায় এই নিয়ম সংশোধন করেন। কুলজি গ্রন্থানুসারে তিনি প্রথমতঃ “বঙ্গজকায়স্থ সমাজপতি” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সামাজিক আধিপত্য-সীমা তদ্দূর প্রসারিত ছিল না; পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণ সীমা সমুদ্র, পশ্চিমে যশোহর, উত্তর সীমা ঢাকা জেলাস্থ ইচ্ছামতী নদী।

দনুজ রায়ের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে চারি ঘর কুলীন, যথা—ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র। তৎপর আট ঘর। সেই আটঘরে আবার দুই শ্রেণী, মধ্যল্যা ও মহাপাত্র। দত্ত (মধুকুল্য গোত্রী)। নাগ, নাথ ও দাস মধ্যল্য; মধ্যল্য কুলীনদিগের বিশ্রামস্থল। সেন,

* Maior H. G. Raverty's Sapakat -I Nasiri page 558.—and Calliots Inpia Vol 11 page 309.

† শ্রদ্ধাস্পদ পুরাতত্ত্ববিদ ডাক্তর শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর সেন রাজগণের ক্ষত্রিয়জাতি নিরূপণ করিয়াছেন। (I. A. S. XXXIV. 1280) কতিপয় নবীন লেখক আবার মিত্র মহোদয়ের লিখিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া, রাজবল্লভের মতানুসরণ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সেন রাজগণ জনসমাজে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজবল্লভই তাঁহাদিগকে বৈদ্য নির্ণয় করিয়া, আপনাকে সেই বংশজ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নবীন লেখকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার এ উপযুক্ত স্থান নহে। সেন রাজগণের সম্বন্ধে আমাদের অনেক বলিবার আছে।

সিংহ,দেব ও রাহা—মহাপাত্র। মহাপাত্রের ৭ সহিত আদান প্রদান করিলে কুলীনদিগের কিঞ্চিৎ মানহানি হয়; কিন্তু কুল নষ্ট হইতে পারে না। মধ্যল্য ও মহাপাত্রের সর্ব্বথা কুলকার্য্য হওয়া উচিত। এই উৎকৃষ্ট কায়স্থ দ্বাদশ গৃহের নিম্নে পশ্চাল্লিখিত পনের ঘরের গণনা হইয়া থাকে; ইহারা মধ্যবিধ, যথা—কর, দাম, পালিত, চন্দ, পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, কুক,বিষ্ণু,আদ্য ও নন্দন। এতদ্ভিন্ন চৌষট্টি ঘর কায়স্থ নিকৃষ্ট শ্রেণীতে গণ্য; যথা—কেতু, সাই, সিল্ল, সর্ম্ম, থর্ম্ম, সুর, শাম; পাহি, বিদি, হোর, আদিত্য, ভুয়, বর্দ্ধন, লধ, লোধ, বিধি, বিদ, গুণ, বল, বর, ধীর, ব্রহ্ম, আইচ, ভুঞ্জ, ভূতক, নাহা, কুন্দ, এন্দ, সুবুদ্ধিদ, হীরা, ইর্ষা, নন্দ, চম্পক, অম, শুক অনো, হন, হরি, শুশ্চ, কুশ, ক্রুঞ্চ, মাঝি, রাহুত, রাজক, আখণ্ড, মুটেক, সাধু, গর, পাণি, হদেশ, সুত, শুক্ত, অন্য, রধ, রাধ, মালি, হাতি, বধ, শ্যাম, অঞ্জ, ভঞ্জ, সির্চ্ছা, বির্চ্ছা, রুদ্র। বঙ্গজ কায়স্থ কুলজি গ্রন্থে এতাধিক কোন কায়স্থের উল্লেখ নাই।

রাজা দনুজ রায় কতকগুলি ব্রাহ্মণের প্রতি দুইটী ভার অর্পণ করেন। সেই কার্য্য অনুসারে তাহারা স্বর্ণামাত্য ও কুলাচার্য্য (ঘটক) নামে খ্যাত। কায়স্থদিগের বংশাবলী তাহাদের বিবাহ-সংখ্যা ও উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট পুস্তকে লিখিয়া রাখা কুলাচার্য্যের কর্ম্ম। কায়স্থদিগের কুলকার্য্যাদির বিবরণ রাজসমক্ষে বিবৃত করা স্বর্ণামাত্যের কার্য্য। তদ্‌তিরিক্ত তাহারা রাজসভায় ও ভোজসভায় উপস্থিত থাকিয়া কায়স্থগণের উপবেশন স্থান নির্দ্দেশ করিতেন। চন্দ্রদ্বীপ রাজভবনে কায়স্থদিগের জন্য "চিত্রছত্র" নামে একটি ভোজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যস্থলে রাজা, তাঁহার চতুঃপার্শ্বে কুলীন, তৎপর কুলজ, মধ্যল্য ও মহাপাত্র; তাঁহাদের চতুঃপার্শ্বে অন্যান্য কায়স্থগণ বসিতেন।

চন্দ্রদ্বীপপতিদিগের রাজধানী কচুয়া নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। রাজা কৃষ্ণবল্লভের কন্যা তথায় একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। রাজা জয়দেব রায় অপুত্রাবস্থায় কাল-কবলিত হইলে তাঁহার দৌহিত্র "দেহড়গাতি" নিবাসী বসু-বংশজ পরমানন্দ মাতামহ-রাজ্য ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজপতির আসন প্রাপ্ত হন। ৮ বাবু-ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন পরমানন্দ, কান্যকুব্জ হইতে আগত পুষণ বসু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষে অবতীর্ণ। আমাদের বিবেচনায় এই উক্তি সঙ্গত নহে।

চন্দ্রদ্বীপের দ্বিতীয় রাজবংশের বংশাবলী।

১০

রাজা পরমানন্দ রায়।

৭ শাণ্ডিল্য, অগ্নিবাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ ও আলম্বন গোত্রীয় দত্তগণ সর্ব্বদা সংসম্বন্ধ করিলে মহাপাত্র শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারেন। "সপ্তদত্তা মহাপাত্রাঃ সম্বন্ধরূপতঃ সুধীঃ।"

৮ ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব ভ্রমক্রমে পরমানন্দকে জয়দেবের পিতৃদৌহিত্র লিখিয়াছেন।

২

রাজা জগদানন্দ রায়।

৩

রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়।

৪

রাজা রামচন্দ্র রায়।

৫

রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ রায়।

৬

রাজা বসুদেবনারায়ণ রায়।

৭

রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়।

৮

রাজা প্রেমনারায়ণ রায়।

পরমানন্দ মাতামহের আসন প্রাপ্ত হইয়াই সামাজিক বন্ধনে হস্তক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র যথাক্রমে অগ্রপশ্চাৎ লিখা হইত। পরমানন্দের সময় হইতে কুলজি-গ্রন্থে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র লিখা যাইতেছে।

আকবরের সেনানী মনিয়ম খাঁ গৌড়াধিকার করিয়া মুরাদ খাঁকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গজয় করিতে প্রেরণ করেন। মুরাদ ১৪৯৬ শকাব্দে (১৫৭৪ খৃঃ অঃ) বাকলা ও ফতেয়াবাদ জয় করিয়াছিলেন। বোধ হয় জগদানন্দের শাসনকালে এই ঘটনা হইয়াছিল।

বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র লিখিয়াছেন—"জগদানন্দ রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। উক্ত রাজা শক্তি উপাসনায় একজন "সিদ্ধ পুরুষ" ছিলেন। তিনি গঙ্গার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, যেন অন্তকালে তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন। একদা গঙ্গার (পদ্মা) জল উচ্ছ্বসিত হইয়া রাজবাটির দ্বার পর্য্যন্ত ধাবিত হইল। রাজা এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া স্মরণ করিলেন, বুঝি গঙ্গা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আগমন করিয়াছেন। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গার প্রতি নিবেদন করিলেন, মা! যদি আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, আমাকে গ্রহণ করুন। তাহাতে গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হইয়া তৎপ্রতি হস্ত প্রসারণ করিলেন। রাজা জগদানন্দ দেবীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি অন্তর্হিত হইলেন, গঙ্গার জল ও যথাস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল। ডাক্তর ওয়াইজ এই ঘটনাটি অন্যরূপ লিখিয়াছেন। ৯ প্রকৃত পক্ষে ১৫০৫ শকাব্দে একটি ভয়ঙ্কর ঝড় ও জলপ্লাবন হইয়াছিল। আইন আকবরি গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা

৯ "—an astrologer warned Jugadananda Rai the son of Paramananda Rai, that on a certain day and hour he would be drowned in the river. The Raja shut himself up in a tower of his palace at Kachua. The river gradually rose as the hour approached, and just at the time fixed, a mighty wave rolled up on which the goddess Ganga, like another Lurline, rode proudly. She held out her hands to the Raja who clasped them. In a moment he was swept away and disappeared." (J. A. S. B. XLIII. I. 207.)

আছে১০। ইহাতে বাকলারাজ্যবাসী দুই লক্ষ লোক ও জাহাজাদি নষ্ট হয়। মঠ ও নহবদখানা ব্যতীত অন্যান্য গৃহ সমুদয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ হইয়াছিল। ক্রমে পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ২৫। ৩০ হস্ত উচ্চ বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গকলাপ বাগুলীবক্ষে ক্রীড়া করিয়াছিল। আমাদের বিবেচনায়, এই ঘটনাটীই রাজা জগদানন্দের মৃত্যুর সমবায়িক। এই বিপদকালে রাজপুত্র কন্দর্পনারায়ণ একটী উচ্চশীর্ষ দেবমন্দির আরোহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর কন্দর্পনারায়ণ পৈতৃক আসন অধিকার করেন। তিনি এক জন বিখ্যাত ভৌমিক। ১৫০৮ শকাব্দে (১৫৮৬ খৃঃ অঃ) ইংলণ্ড দেশীয় বিখ্যাত পর্য্যটক রল্‌ফ ফিছ বাকলায় উপনীত হন। তিনি লিখিয়াছেন—"বঙ্গান্তর্গত চট্টগ্রাম হইতে আমি বাকলায় গমন করি। তত্রত্য অধিপতি (King) অতি ভদ্র। তিনি বন্দুক ব্যবহার করিতে ভালবাসেন। তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ও উর্ব্বরা। তথায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। রেসমি ও কার্পাস বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। তথাকার গৃহগুলি উচ্চ ও সুন্দর। পথ প্রশস্ত। অধিবাসীগণের দেহ প্রায় অনাবৃত, কেবল অল্প-পরিসর বস্ত্র দ্বারা কটি ও তাহার নিম্নদেশ আবৃত করিয়া রাখে। স্ত্রীলোকদিগের কণ্ঠ ও বাহু রৌপ্যালঙ্কারের ভাণ্ডারসদৃশ; তাহাদের পদে রৌপ্য, তাম্র, কিম্বা দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত মল।" ১১

রাজা কন্দর্পনারায়ণের বাকল শাসনকালে রাজা তোড়লমল্ল বাঙ্গলার রাজস্ব

১০ "The Sarkar, or district, of Bagla, extends along the seacoast. The fort of the Sarkar is surrounded by a forest. From new moon to full moon, the waves of the sea rise higher and higher; from the fifteenth to the last day of the moon, they gradually decrease. In the 29th year of the present era (A. D. 1583) one afternoon, an immense wave set the whole drstrict under water. The chief of the place was at a feast; he managed to get hold of a boat, whilst his son Pramanand (কন্দর্পনারায়ণ হইবে), with a few others, climbed up a Hindu temple. Some merchants got on a Talar. For nearly five hours the waves remain agi tated; the lightening and the wind were terrible; houses and ships were destroyed; only the Hindu temple and the Talar (নহবদখানা) escaped. About two hundred thousand souls perished in this hurricane (Blochmaun's translation.)

ভিনিস নগরের বণিক সিজার ফেডেরিক এই সময় পিগু হইতে চট্টগ্রামে আসিতেছিলেন। তিনি এই ঝড়ে নিতান্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন।

১১ Hackluyts Voyages, Vol II. page 257, (Hackluyts Voyage's নামক বিস্তৃত উপাদেয় গ্রন্থের কয়েক খণ্ড "কলিকাতা পবলিক লাইব্রেরিতে" আছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে কোন মহাত্মা তন্মধ্য হইতে ফিছের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বলিত পত্রগুলি অপহরণ করিয়াছেন।)

বন্দোবস্ত করেন। তন্মধ্যে বাকলা বাঙ্গলার উনবিংশ সরকারের অন্যতম। সরকার বাকলা ৪টি মহালে বিভক্ত, যথা—বাকলা, শ্রীরামপুর,সাহাজাদপুর ও আদিলপুর (বর্ত্তমান ইদিলপুর)। মোট বার্ষিক রাজস্ব ১৭৮৭৫৬ টাকা ১২। আবোল ফাজেল বলেন—বাকলার রাজা সম্রাটের সাহায্যার্থে ৩২০টী গজ ও পঞ্চদশ সহস্র পদাতি যোগাইয়া থাকেন। কিন্তু ফিছের লিখা পাঠে বোধ হয় বঙ্গীয় ভৌমিকগণ নামত মোগল সম্রাটের অধীন ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।

রাজমালায় লিখিত আছে শকাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্য দেব বাকলা আক্রমণ করেন। তিনি সেই স্থান লুণ্ঠন করিয়া বহুতর ধন ও বহু সংখ্যক লোক দাসরূপে লইয়া যান। আরাকাণরাজও বাকলার প্রতি খর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কন্দর্পনারায়ণ, ত্রিপুরেশ্বর,আরাকাণরাজ ও পর্টুগিজদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া কচুয়া হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। প্রথমত বসুরকাঠি—তথা হইতে হুসনপুর ক্ষুদ্র কাঠি—তৎপর মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। মাধবপাশায় জনৈক "গাজি'' উপাধিধারী যবন বাস করিত, কন্দর্পনারায়ণ তাহাকে বধ করিয়া সেই স্থানটী অধিকার করেন। অদ্যাপি চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যশূন্য রাজগণ তথায় বাস করিতেছেন। মাধবপাশা রাজবাটিতে একটি বৃহৎ পিত্তলের কামান আছে, ইহার দৈর্ঘ্য $\frac{৭৩}{৪}$ ফিট। ইহাতে রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম"৩১৮'' অঙ্ক ও কামান-নির্ম্মাতা শ্রীপুরনিবাসী "রুপিয়াখার" নাম খোদিত রহিয়াছে। "৩১৮" অঙ্কটি বোধ হয় কামানের সংখ্যা হইতে পারে।

কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর, শিশু রামচন্দ্র পৈতৃক আসনে আরোহণ করেন। তিনি সুবিখ্যাত রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বোধ হয় এই উদ্বাহ-কার্য্য কন্দর্পনারায়ণের জীবিতাবস্থায় সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র ও ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের লিখা দ্বারা এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। ব্রজসুন্দর বাবু বলেন—"বিবাহার্থী রাজা রামচন্দ্র বহু সমৃদ্ধি সহকারে সমারোহ পূর্ব্বক প্রতাপাদিত্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে বিবাহ-কার্য্য সমাপনানন্তর বর কন্যা গৃহপ্রবিষ্ট হইলে, বর (রামচন্দ্র) শুনিতে পাইলেন যে,রাত্রিতে তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ও বঙ্গজ কায়স্থসমাজপতিত্ব অধিকার করিবেন, তাহার সমুদয় মন্ত্রণা স্থির হইয়াছে। (কেহ বলেন, রামচন্দ্র তাঁহার নববিবাহিত পত্নীর নিকট এই কথা শুনিতে পান; কেহ বলেন, প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্তরায় তাঁহাকে এই সম্বাদ

১২ গ্রাণ্ট সাহেব সরকার বাকলার রাজস্ব ১৭৮২৬৬ টাকা লিখিয়াছেন। (Mr. J. Grant's Analysis of the Finances of Bengal.)

জ্ঞাপন করেন।) রামচন্দ্র ইহাও অবগত হইলেন, যে,যে খাল দিয়া গমন করিতে হয়, তাহা বৃহৎ কাষ্ঠ সকল দ্বারা রুদ্ধ করা হইয়াছে। অন্তঃপুরে রামচন্দ্র এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভয়ে মৃতকল্প হইলেন। কিন্তু সে সময়, তাঁহার আত্মীয় ভৃত্য ও রক্ষিবর্গ বহির্ব্বাটিতে আনন্দে কালক্ষেপ করিতেছিল। তাহারা ইহার বিন্দুবিসর্গও জ্ঞাত ছিল না। পরিশেষে রাজা রামচন্দ্র তাঁহার নবোঢ়া মহিষীর (কেহ বলেন বসন্ত রায়ের) সাহায্যে অবরুদ্ধ রাজপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। রাজা রামচন্দ্রের শরীর-রক্ষকদিগের নায়ক ভীমপরাক্রম রামমোহন মাল স্বীয় প্রভুর মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনুচরবর্গের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ রাজা রামচন্দ্রকে ৬৪ ক্ষেপণী-যুক্ত এক কোষ নৌকায় আরোপণ পূর্ব্বক কাষ্ঠ ও বৃক্ষাদি পূর্ণ খালে নৌকা টানিয়া লইয়া চলিল। বিঘ্নসঙ্কুল খাল অতিক্রম করিয়া তোপধ্বনিতে রাজা রামচন্দ্র স্বীয় শ্বশুরকে তাঁহার গমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।"

ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের লিখিত বিবরণ ইহার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য নহে। তিনি বলেন, "বিবাহ-রজনীতে রাজা রামচন্দ্রের অনুচর রামাই ভাঁড় স্ত্রীবেশে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রতাপ-মহিষীর সহিত হাস্য পরিহাস করিয়াছিল। রাজা প্রতাপাদিত্য এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া নূতন জামাতার প্রাণবধে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু প্রতাপ দুহিতা পিতৃপ্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া রাজা রামচন্দ্রকে নির্ব্বিঘ্নে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। চন্দ্রদ্বীপপতি রামমোহনের বাহুবলে নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় রাজধানীতে পহুঁছিয়াছিলেন।"

"প্রতাপাদিত্য চরিত্র" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত আছে, রাজা প্রতাপাদিত্য (বিবাহের বহুকাল পরে) লোভাক্রান্ত হইয়া জামাতৃরাজ্য করতলস্থ করিতে মনস্থ করেন। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া রাজা রামচন্দ্রকে নিজ ভবনে আনাইলেন। রামচন্দ্র শ্বশুরের কৌশলজালে রুদ্ধ হইয়া কিছুকাল যশোহরে বাস করিয়াছিলেন। অবশেষে একদা প্রতাপাদিত্য জনৈক দৌবারিককে আহ্বান করিয়া বলিলেন "কল্য প্রাতে রামচন্দ্র যখন অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবেন, তখন তোমরা এক জন যে হউক তাঁহাকে সংহার করিবে।" প্রতাপাদিত্যের এই অনুজ্ঞা তাঁহার কন্যার কর্ণগত হইলে তিনি দুঃখে মৃতকল্পা হইলেন। পরে নিশাযোগে সঙ্গোপনে স্বীয় স্বামীকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। রাজা রামচন্দ্র পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় শ্যালক যুবরাজ উদয়াদিত্যকে আহ্বান করিলেন এবং তিনি তথায় উপনীত হইলে সবিনয়ে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন। অনুজার রোদন ১৩ ও ভগিনীপতির বিনয়

১৩ খৃষ্টধর্ম্ম-যাজকদিগের লিখিত পত্র ও প্রবন্ধাদি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে যুবরাজ উদয়াদিত্য রাজা রামচন্দ্রের চারি বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। বোধ হয় রাম-

বাক্যে যুবরাজের অন্তঃকরণ দয়াদ্র হইল। তিনি কৌশলে রাজা রামচন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর হইতে নির্ব্বিঘ্নে বাহির করিয়া দিলেন। চন্দ্রদ্বীপপতি শ্যালকের কৃপায় প্রাণ রক্ষা করিলেন। বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, ও ওয়াইজ সাহেবের লিখা হইতে মহাত্মা রামরাম বসুর লিখার অধিকাংশ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ রাজা রামচন্দ্রের উদ্বাহকালে তিনি নিতান্ত শিশু ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর রামচন্দ্রের রাজ্যশাসনকালে খৃষ্টধর্ম্মযাজক ফোনসেকা ১৬০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাকলায় উপনীত হন। ফোনসেকা বলেন "রাজার বয়ঃক্রম অনধিক আট বৎসর। রাজা তাঁহাকে সম্মান ও আদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং বাকলা রাজ্যে গির্জা প্রভৃতি সংস্থাপন জন্য সনন্দ দান করিয়াছিলেন।" ফোনসেকা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, যে, তিনি অষ্টমবর্ষীয় বালকের পরিণামদর্শিতা দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ফোনসেকা বলেন সাদর সম্ভাষণের পর রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোথায় যাইব; আমি বলিলাম, আমি মহারাজের শ্বশুর চাঁদ খাঁর অধীশ্বর সমক্ষে যাইতেছি।" ১৪ এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে যে রামচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল তৎপক্ষে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই এবং উদ্বাহকালে তিনি নিতান্ত শিশু ছিলেন, অতএবই বোধ হইতেছে, যে, কন্দর্পনারায়ণ রায়ের জীবদ্দশায় এই বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। ফোনসেকার বাঙ্গালা ভ্রমণকালে যে যশোহর ও বাকলা রাজপরিবার মধ্যে কোন প্রকার অসূয়া বর্ত্তমান ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না।

বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন" রাজা রামচন্দ্র যশোহরের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া স্বীয় জীবনরক্ষিত্রী পত্নীকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর অন্তে প্রতাপ-দুহিতা কাশী-যাত্রাচ্ছলে চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। তিনি মাধবপাসার নিকটবর্ত্তী স্থানে পঁহুছিয়া নৌকাতেই রহিলেন. কেহ তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক নিতে আসিল না। তাঁহার নৌকার নিকট সপ্তাহে দুইবার হাট বসিত, অদ্যাপি সেই স্থানটী "বউ ঠাকুরাণীর হাট" নামে পরিচিত রহিয়াছে। পরে তিনি সারসী গ্রামে একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। এই সকল সংবাদ রাজমাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বয়ং আসিয়া বধূকে লইয়া গেলেন। কিন্তু তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না, রাজা পত্নী সন্দর্শন করিবেন

চন্দ্রের মহিষী, উদয়াদিত্যের ৫।৬ বৎসরের কনিষ্ঠা ছিলেন।

১৪ "Aftor compliment the king asked me where I bound for and I riplied that I was was going to the king of Ciandcan, who is to be the *Father-in-law* of your Highness." প্রতাপাদিত্যের রাজধানী "চাঁদ খাঁ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এরূপ নামকরণের ইতিহাস যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

বলিয়া তিন দিবস দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন। হতভাগিনী প্রতাপ-দুহিতা অবশেষে কাশী যাত্রা করিলেন।” আমাদের বিবেচনায় ব্রজসুন্দর বাবুর লিখিত বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য নহে। রাজা রামচন্দ্রের ন্যায় একজন সুবোধ নৃপতি তাঁহার জীবনরক্ষিত্রী পত্নীর প্রতি এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

ডু, জারিক বলেন “১৬০২ খৃষ্টাব্দে আরাকাণ রাজ বাকলা জয় করিয়াছিলেন।

প্রবাদ অনুসারে রামচন্দ্রের জীবনী সংক্রান্ত দ্বিতীয় ঘটনা লক্ষ্মণমাণিক্যের প্রাণদণ্ড। এই ঘটনাটী ভুলাযার ভৌমিক বংশের বিবরণে বিবৃত হইবে। বলা বাহুল্য যে রামচন্দ্র আকবরের মৃত্যুর পূর্ব্বে সিংহাসনারোহণ করেন, জাহাংগীর বাদসাহের শাসনকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ পৈতৃক আসন অধিকার করেন। তিনি একজন মহাযোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে মোগল-শাসিত বঙ্গের রাজধানী, ঢাকা (১৫) নগরীতে স্থাপিত হয় (১৬০৮-খৃঃ অঃ)। ঢাকার শাসনকর্ত্তার সহিত কীর্ত্তিনারায়ণের সদ্ভাব জন্মিল। নবাব যুদ্ধযাত্রা-কালে প্রায়ই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া যাইতেন। এক যুদ্ধযাত্রা-কালে, নবাবের রন্ধনালয়ের নিকট দাঁড়াইয়া রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ নবাবের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। হঠাৎ রন্ধনের ঘ্রাণ আসিয়া রাজার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। রাজা বস্ত্র দ্বারা নাশা আবৃত করিলে, নবাব বলিলেন “রাজন, ‘ঘ্রাণেনার্দ্ধভোজনং’ অতএব আপনার জাতি নষ্ট হইয়াছে।”(১৬) রাজা নবাব বাক্য শ্রবণ মাত্র স্বীয় অনুজ বাসুদেব নারায়ণের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বন করিলেন।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে হরবার্ট সাহেব (Sir J. Herbert.) বাকল, গঙ্গাতীরস্থ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন একটী প্রধান নগরী লিখিয়াছেন। ব্লেভ ও ব্রোকের মানচিত্রেও “বাকলা” (“Bcacola” Blaev's map; “Baecala” Van den Broucke's map.) প্রধান নগরী রূপেই চিত্রিত রহিয়াছে। এতাবতা অনুমিত হইতেছে খৃষ্টাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীতেও বাকলার সৌভাগ্য-দীপিকা নির্ব্বাণ হয় নাই।

রাজা বাসুদেব নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রতাপনারায়ণ দীর্ঘকাল পৈতৃক

---

১৫ ইহাই ঢাকা নগরীর জন্মকাল। ফেয়ার সাহেবের লিখা দ্বারা (History of Pegu.) ১৪১২ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে ঢাকার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে! কিন্তু ফেয়ার সাহেবের লিখিত—বাঙ্গলার ইতিহাস ও ভূগোল সংসৃষ্ট অংশগুলি যে প্রায়ই ভ্রমাত্মক তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৬ যশোহর ইসবপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ জমীদার এইরূপ সামান্য অপরাধে সমাজচ্যুত হন। সুবিখ্যাত ঠাকুরদিগের পিতৃপুরুষ জগন্নাথ ঠাকুর সেই বংশীয় ভূম্যধিকারী সুধারামের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি তদ্বংশধরগণ অন্যায়রূপে সমাজ কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছেন।

রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। উলাইল ১৭ নিবাসী গৌরীচরণ মিত্র মজুমদার সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। চন্দ্রদ্বীপ রাজকুমারীর গর্ভে গৌরীচরণের দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ উদয়নারায়ণ, কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ। রাজা প্রতাপ নারায়ণের মৃত্যু হইলে, তাঁহার এক মাত্র পুত্র প্রেমনারায়ণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তিনি অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন। মাতুলের মৃত্যুর পর উদয়নারায়ণ মিত্র—পশ্চাৎ রাজা উদয়নারায়ণ রায়—চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজপতির আসন অধিকার করেন। রাজনারায়ণ মিত্র "সরকার বাকলার" অধীনস্থ কয়েকটী তালুক লইয়া রাজধানী মাধবপাসার নিকটবর্ত্তী প্রতাপপুরে বাস করিতে লাগিলেন। তদ্বংশধরগণ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদের তালুক গুলি নিলাম হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় রাজ বংশাবলী।

১
রাজা উদয়নারায়ণ রায়।
২
রাজা শিবনারায়ণ রায়।

লক্ষ্মীনারায়ণ — নরনারায়ণ — নন্দনারায়ণ — ৩ রাজা জয়নারায়ণ

৪ রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়
(পোষ্য পুত্র।)

নরেন্দ্রনারায়ণ — ৫ রাজা বীরসিংহনারায়ণ রায় — ৬ রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।

১৭। উলাইলগ্রাম জেলা ঢাকার অন্তর্গত বংশ নদীর পশ্চিম তটে ছিল। ঐ গ্রামে মিত্র মজুমদার বংশীয়দিগের অনেক ইস্টকালয় ছিল। বিগত শতাব্দীর অন্তভাগে সুবিখ্যাত রেনল সাহেব যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন তাহাতেও ইহার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ১২২৬-২৭ বঙ্গাব্দে ধলেশ্বরী নদীর গাজিখালি নামক শাখানদী সাভার নামক স্থানের অভিমুখে নির্গত হইয়া বংশ নদীর সহিত মিলিয়া যায়। তাহাতে ঐ নদীর বেগ বর্দ্ধিত হইয়া উলাইল গ্রামটীকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ঐ নদীর তীরবর্ত্তী ফুলবেড়িয়া নামক যে স্থানে ওয়াইজ সাহেবের নীল

রাজা উদয়নারায়ণ কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, ইহা ডাক্তার ওয়াইজ কিম্বা ব্রজসুন্দর বাবু লিখেন নাই। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা মোগল-শাসিত বঙ্গের রাজস্বের তৃতীয় হিসাবে (জমাকামেল তোমারি) তাঁহার নাম পাইয়াছি, সুতরাং তিনি মুরশিদকুলি খাঁ ও সুজাউদ্দিনের সমসাময়িক। এই সময়ে (১১৩৫ বঙ্গাব্দে) সরকার বাকলার রাজস্ব ১৯২৪৪৮ টাকা লিখিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপপতি উদয়নারায়ণ রায় খালসা ভূমির জন্য ১১৭০ টাকা জায়গীর মহালাতের জন্য ৫৮৫৮১ টাকা মোট ৫৯৭৫১ টাকা কর দান করিতেন। সুতরাং প্রাচীন বাকলা রাজ্যের অধিকাংশ ইহার পূর্ব্বেই তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। ১৮

বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র প্রচলিত প্রবাদ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—"উদয়নারায়ণের রাজত্ব লাভ করিবার পরেই নবাবের শ্যালক খাদি মজুমদার তাহাকে অধিকার চ্যুত করেন। তাহাতে তিনি নবাবের সমীপে গমন করিয়া তদ্বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। নবাব বলিলেন—যদি তুমি একটি ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ কর, তাহা হইলে রাজ্যাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং দ্বিতীয় ফরিদের ন্যায় মল্লযুদ্ধে এক "সের" নিহত করিয়া অক্ষত শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নবাবের বেগম তাঁহার ন্যায্য পুরস্কার লাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। তদন্তে রাজা কৌশলক্রমে রাজ্যাধিকার নিজ হস্তগত করিয়াছিলেন।"

উদয়নারায়ণের মৃত্যুর পর শিবনারায়ণ পৈতৃক আসন অধিকার করেন। তাঁহার রাজ্যাধিকার কালে ভারতে ইংরাজ রাজ্যের সূত্রপাত হয়। এই নরপতি ভোগাবিলাসী ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর শিশু জয়নারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তাঁহাকেও তাঁহার মাতা দুর্গারাণীকে একটি নির্দ্ধারিত বৃত্তি দিয়া রাজকর্ম্মচারী শঙ্কর বকসী প্রকৃত রাজা হইয়া ৭ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। অবশেষে দুর্গারাণী ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ১৯ সাহায্যে

কুঠি আছে, তাহারই অপর পারে এক চর আছে, তাহাকেই লোকে "চর উলাইল" বলে। এস্থানেই সেই সমৃদ্ধ-সম্পন্ন উলাইল গ্রাম ছিল বলিয়া অনুমান হয়। যাঁহারা নৌকাযোগে গোয়ালন্দ হইতে ঢাকা গমন করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহারা ফুলবেড়িয়া ও চর উলাইল দর্শন করিয়াছেন।

১৮। আদিলপুর প্রভৃতি তিনটী পরগনা রমাবল্লভ রায় ও বুজরগ উমেদপুব মহর্ম্মদ সাদক এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র অংশগুলি অন্যান্য জমীদারদিগের দখলকারিতে নিযুক্ত ছিল। (See E. I. Co's Fifth Report, P. 367. (1812 Ed.) বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র অন্যায় রূপে লিখিয়াছেন "রাজা জয়নারায়নের সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশের দশশালা বন্দোবস্ত হয়। তাহাতে পরগণে কোটালিপাড়, ইদিলপুর, সুলতানাবাদ, বুজরগ, উমেদপুর এবং আরো কয়েক স্থান চন্দ্রদ্বীপ হইতে পৃথক্কৃত হয়।"

১৯ ইনি পাইকপাড়া রাজবংশের-তিলক স্বরূপ। পাইকপাড়ার রাজগণ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। কান্দি নিবাসী হর-

শঙ্কর বকসীকে পদচ্যুত করিয়া পুত্রের রক্ষয়িত্রী স্বরূপ রাজাসন অধিকার করেন। উক্ত রাণী একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "দুর্গাসাগর" নামে খ্যাত রহিয়াছে। ইহার আয়তন ৩৮/ তিন দ্রোণ তেরকানি (২৪৪ বিঘা)।

রাজা জয়নারায়ণের সময়ে প্রসিদ্ধ "দশশালা বা চিরস্থায়ী" বন্দোবস্ত হয়। পূর্ব্বেই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের কলেবর খর্ব্ব হইয়াছিল। এইক্ষণে আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের "নিলামের আইনের" কৃপায় প্রাচীন জমীদারদিগের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। অবধারিত দিবসে রাজস্ব প্রদান করা তাঁহাদিগের নিতান্ত অনভ্যস্ত কর্ম্ম ছিল। বিশেষতঃ চন্দ্রদ্বীপের রাজ কর্ম্মচারিগণ সময় সময় কোম্পানী বাহাদুরের ধনাগারের পরিবর্ত্তে চন্দ্রদ্বীপের রাজস্ব নিজ ধনাগারে অর্পণ পূর্ব্বক চরিতার্থ হইতেন। এই সকল কারণে বাকী-পড়া রাজস্বের জন্য চন্দ্রদ্বীপ জমীদারি নিলাম হইতে লাগিল। ১২০০ বঙ্গাব্দে ঐ জমীদারির /১৭ ক্রান্ত হিস্যা ঢাকার কালেক্টরিতে নিলাম হয়। ঢাকা নিবাসী দলসিংহ তাহা ক্রয় করেন। ১২০২ বঙ্গাব্দে ৵১২৷৹ হিস্যা ও ১২০৪ বঙ্গাব্দে ৵১৭৷৹ হিস্যা নিলাম হয় তাহা ঢাকাবাসী জন পোনয়টি (বোধ হয় আরমেনিয়ান) সাহেব ক্রয় করিলেন। ১২০৬ বঙ্গাব্দে অবশিষ্ট ৷৷১২৷৷/ হিস্যা নিলাম হইলে রাজার মুদী মাণিকচাঁদ তাহা ক্রয় করেন। মাণিকমুদী /০ এক আনা হিস্যা মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট ।৵১২৷৷/ হিস্যা রাজাকে দিতে সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু অভিমানী ভূপতি মুদীর সহিত সরিকিতে জমীদারি ভোগ করিতে অসম্মত হইলেন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজ বংশধরগণ অধুনা একটী বিস্তৃত নিষ্কর "খানেবাড়ী" ও কয়েক খানা খারিজা তাল্লুকের উপস্বত্ব দ্বারা কথঞ্চিৎ উদর পরিতোষ করিয়া থাকেন।
"অভাগা চন্দ্রদ্বীপের মাণিক মুদী রাজা।"

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ক্রমশঃ

কৃষ্ণ সিংহ এই রাজবংশের স্থাপন কর্ত্তা। ওয়ারেন হেষ্টিংস ও লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন কালে এই বংশধরগণ বাঙ্গার রাজস্ব বিভাগের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতে ছিলেন;

Mr. Hastings afterwards abolished the provincial Councils and appointed Gangagovinda Sinha as Divan of the Committee of the revenue. He was also appointed Nayeb kanungo; and his son, Prankrishna Sinha, Nayeb Divan of the Committee. Thus we see the members of the Kandi family holding the highest offices in the State, and exercising immense influence by virtue of their position. All Zaminders, talukdars, and in fact all those who held lands in any part of the country used to pay their respects to Gangagovenda. The Kandy Family. (T. A. B.) Calcutta Review. Vol. LVIII page 98.

ভগ্ন-হৃদয়।

দ্বিতীয় সর্গ।

ক্রীড়া কানন। নলিনী * ও সখীগণ।

নলিনী—

সখি! অলক-চিকুরে কিশলয় সাথে
একটি গোলাপ পরায়ে দে!
চারু! দেখি ও আরশী খানি,
বালা! সিঁথিটি দে ত লো আনি;
লীলা! শিথিল কুন্তল দেখ্ বার বার
কপোলে দুলিয়া পড়িছে আমার
একটু এপাশে সরায়ে দে!

সুরুচি—

মাধবী, বল্‌ত মোরে একবার
আজিকে হোল কি তোর!
কত খন ধোরে গাঁথিছিস্ মালা
এখনো কি শেষ হোল না তা' বালা?
এক মালা গেঁথে করিবি না কি লো
সারাটি রজনী ভোর?
অনিলের হবে ফুলশয্যা আজ,
সাঁঝের আগেই শেষ করি সাজ
সব সখী মিলি যেতে হবে সেথা
তা কি মনে আছে তোর?

অলকা—

মরি মরি কিবা সাজাবার ছিরি
চেয়ে দেখ্ একবার!
সখীর অমন ক্ষীণ দেহ মাঝে
কমল ফুলের মালা' কিলো সাজে?

* এক চপল-স্বভাবা কুমারী।

বিনোদিনী দেখ্ গাঁথিছে বসিয়া
কমলের ফুল হার!

নলিনী—

ওই দেখ্ সখি, দাঁড়ের উপরে
মাথাটি গুঁজিয়া পাখার ভিতরে
শ্যামাটি আমার সাধের শ্যামাটি
কেমন ঘুমায়ে আছে!
আন্ সখি ওরে কাছে!
গান গেয়ে গেয়ে তালি দিয়ে দিয়ে
ঘিরে বসি ওরে সকলে মিলিয়ে,
দেখিব কেমন ফিরে ফিরে ফিরে
তালে তালে তালে নাচে।

(শ্যামার প্রতি গান)

নাচ্ শ্যামা তালে তালে!
বাঁকায়ে গ্রীবাটি তুলি পাখা দুটি
এ পাশে ও পাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্ শ্যামা তালে তালে!

রুণু রুণু ঝুনু বাজিছে নূপুর,
মৃদু মৃদু মধু উঠে গীত সুর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি,
তালে তালে উঠে করতালি ধ্বনি
নাচ্ শ্যামা নাচ্ তবে!
নিরালয় তোর বনের মাঝে

সেথা কি এমন নূপুর বাজে ?
বনে তোর পাখী আছিল যত
গাহিত কি তারা মোদের মত
এমন মধুর গান ?
এমন মধুর তান ?
কমল করের করতালি হেন
দেখিতে পেতিস্ কবে ?
নাচ্ শ্যামা নাচ্ তবে !

বন্দী বোলে তোর কিসের দুখ ?
বনে বল্ তোর কি ছিল সুখ ?
বনের বিহগ কি বুঝিবি তুই
আছে লোক কত শত,
যারা শ্যামা তোর মত
এমনি সোনার শিকলি পরিয়া
সাধের বন্দী হইতে চায় !
এই গীত-রবে হোয়ে ভরপুর,
শুনি শুনি এই চরণ-নূপুর
জনম জনম নাচিতে চায় !
সাধ কোরে ধরা দেয় গো তারা !
সাথে সাথে ভ্রমি হয় গো সারা !
ফিরেও দেখিনে—ফিরেও চাহিনে—
বড় জ্বালাতন করেগো যখন
অশরীরী বাজ করি বরিষণ
উপেখা বাণের ধারা !
তবে দেখ্ পাখী তোর
কেমন ভাগ্যের জোর !
বড় পুণ্য ফলে মিলেছে বিহগ
এমন সুখের কারা !

আয় পাখী আয় বুকে !
কপোলে আমার মিশায়ে কপোল
নাচ্ নাচ্ নাচ্ সুখে !
বড় দুখ মনে বনের বিহগ
কিছু তুই বুঝিলি না !
এমন কপোল অমিয়-মাখা
চুমিলি, তবুও ঝাপটি পাখা
উড়িতে চাহিস্ কি না !
প্রতি পাখা তোর উঠেনি শিহরি ?
পুলকে হরষে মরমেতে মরি
ঘুরিয়া ঘুরিয়া চেতনা হারায়ে
পদতলে পড়িলি না ?

নাচ্ নাচ্ তালে তালে !
বাঁকায়ে গ্রীবাটি তুলি পাখা দুটি
এ পাশে ও পাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্ শ্যামা তালে তালে !

দামিনী—
শুনেছিস্ সখি, বিবাহ-সভায়
বিনোদ আসিবে আজ !
ভাল কোরে কর্ সাজ !

নলিনী—
আহা মোরে যাই কি কথা বলিলি !
শুনিয়া যে হয় লাজ !
বিনোদ আসিবে আজ ?
এ বারতা দিয়ে কেন লো স্বজনি,
মাথায় হানিলি বাজ ?
সারাখন মোর সাথে সাথে ফিরে
ক্লান্ত নহে একটুক,
মুখ খানা তার দেখিবারে পাই
যে দিকে ফিরাই মুখ !

এক-দৃষ্টে হেন রহে সে তাকায়ে
থেকে থেকে ফেলে শ্বাস,
মুখেতে আঁচল চাপিয়া চাপিয়া
রাখিতে পারিনে হাস!

লীলা—

শুনেছি প্রমোদ আসিবে, যাহারে
ভ্রমর বলিয়া ডাকি,
যাহারে হেরিলে হরষে তোমার
উজলিয়া উঠে আঁখি!

নলিনী—

গা ছুঁয়ে আমার বল্‌লো স্বজনি
সত্য সে আসিবে নাকি?
দেখ দেখি সখি অভাগীর তরে
কোথাও নিস্তার নাই,
মরি মরি কিবা ভ্রমর আমার!
ভ্রমরের মুখে ছাই!
সে ছাড়া ভ্রমর আর কি নাই?
তা হোলে এখনি—সখিরে, এখনি
নলিনি-জনম ঘুচাতে চাই!

চারুশীলা—

লুকাস্‌নে মোরে আমি জানি সখি
কে তোমার মনোচোর!
বলিব? বলিব? হেথা আয় তবে
বলি কানে কানে তোর!

(কানে কানে কথা)

নলিনী—

জ্বালাস্‌নে চারু, জ্বালাস্‌নে মোরে
করিস্‌নে নাম তার!
সুরেশ?—তাহার জ্বালায় স্বজনী
বেঁচে থাকা হোল ভার!

কে জানিত আগে বল্‌ত সখিলো
রূপের যাতনা অতি?
সাধ যায় বড় কুরূপা হইয়া
লভি শান্তি এক রতি!

মাধবী—

(লীলার প্রতি জনান্তিকে)
শোন্ বলি লীলা, জানি কারে সখি
মনে মনে ভাল বাসে!
দেখিনু সে দিন বিজয়ের সাথে
বসি আছে পাশে পাশে।
মৃদু হাসি হাসি কত কহে কথা,
কভু লাজে শির নত,
ল'য়ে কেশ পাশ বেণী ফেলি খুলে,
জড়ায়ে জড়ায়ে মৃণাল আঙ্গুলে
কভু খেলা করে কত!
কখন বা শুনে অতি এক মনে
বিজয়ের কথাগুলি,
শুনিতে শুনিতে শির নত করি
তুলি কুঁড়ি এক, কতখণ ধরি
খুলি খুলি দেয় মুদিত পাপড়ি,
ফুটাইয়া তারে তুলি;
কভু বা সহসা উঠিয়া যায়—
কভু বা আবার ফিরিয়া চায়—
মৃদু মৃদু স্বরে গুন্ গুন্ কোরে
উঠে এক গান গেয়ে;
এমন মধুর অধীরতা তার!
এমন মোহিনী মেয়ে!

বিনো—

সখীলো তা' নয়, কতবার আমি
দেখিয়াছি লুকাইয়া,

অশোকের সাথে বসি আছে একা
প্রমোদ-কাননে গিয়া!
জানি আমি তারে হেরিলে সখীর
সুখে নেচে উঠে হিয়া!

নলিনী—

হেথা আয় তোরা, দে দেখি সাজায়ে
শ্যামা পাখীটিরে মোর!
দুটি ফুল বসা দুইটি ডানায়;
বেল-কুঁড়ি মালা কেমন মানায়
সুগোল গলায় ওর!
ওই দেখ্ সখি! দেখিনি কখনো
এমন দুরন্ত পাখী!
যত গুলি ফুল দিলেম পরায়ে
সব গুলি দেখ্ ফেলেছে ছড়ায়ে—
শত শত ভাগে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া
একটি রাখেনি বাকী!
ভাল, পাখী যদি না চায় সাজিতে
আমারে সাজালো তবে!

চারু—

তোর সাজ ফুরাইবে কবে?

লীলা—

সখি, আবার কিসের সাজ!

সুরুচি—

দেখ্ এসেছে হইয়া সাঁঝ!

নলিনী—

দেখ্‌লো সুরুচি, লীলা ভাল কোরে
বাঁধিতে পারেনি চুল!
এই দেখ হেথা পরায়ে দিয়াছে
অলকে শুকানো ফুল!
বেণী খুলে চুল বেঁধে দে আবার
কানে দে পরায়ে দুল!

সুরুচি—

না লো সখী দেখ আঁধার হোতেছে
বেলা হোয়ে যাবে ঢের—
চল ত্বরা কোরে, যাই দেখিবারে
ফুল-শয্যা অনিলের।

অলকা—

এত খনে সখি, এসেছে সেথায়
যতেক গ্রামের লোক।

দামিনী (হাসিয়া)

এসেছে বিনোদ!

লীলা (হাসিয়া)

এসেছে প্রমোদ!

বিনো (হাসিয়া)

এসেছে সেথা অশোক!

মাধবী (হাসিয়া)

এসেছে বিজয়!

চারু (চিবুক ধরিয়া)

সুরেশ রয়েছে
পথ চেয়ে তোর তরে!

অলকা—

আয় তবে ত্বরা কোরে!

নলিনী—

ভাল, সখি, ভাল, চল্ তবে চল্
জ্বালাস্‌নে আর মোরে!

——:০:——

তৃতীয় সর্গ।

মুরলা ও অনিল*।

অনিল—

ও হাসি কোথায় তুই শিখেছিলি বোন?

* মুরলা—অনিলের ভগ্নী ও কবির বাল্য সহচরী।

বিষণ্ণ অধর দুটি অতি ধীরে ধীরে টুটি
অতি ধীরে ধীরে ফুটে হাসির কিরণ।
অতি ঘন মেঘ মালা, ভেদি স্তরে স্তরে,বালা,
সায়াহ্ণ জলদপ্রান্তে দেয় যথা দেখা
ম্লান তপনের মৃদু কিরণের রেখা।
কত ভাবনার স্তর—ভেদ করি পর পর
ওই হাসি টুকু আসি পঁহুছে অধরে।
ও হাসি কি অশ্রুজলে সিক্ত থরে থরে?
ও হাসি কি বিষাদের গোধূলির হাস?
ও হাসি কি বরষার সুকুমারী লতিকার
ধৌতরেণু ফুলটির অতি মৃদু বাস?
মুরলারে, কেন আহা, এমন তু' হ'ল?
এত ভালবাসা কারে দিলি জলাঞ্জলি?
যে জন রেখেছে মন শূন্যের উপরে!
আপনারি ভাব নিয়া উলটিয়া পালটিয়া
দিন রাত যেই জন শূন্যে খেলা করে।
শূন্য বাতাসের পটে শত শত ছবি
মুছিতেছে আঁকিতেছে—শতবার দেখিতেছে,
সেই এক মোহময় স্বপ্নময় কবি—
সদা যে বিহ্বল প্রাণে চাহিয়া আকাশ পানে
আঁখি যার অনিমিষ আকাশেরি প্রায়!
মাটিতে চরণ তবু মাটিতে না চায়—
ভাবের আলোকে অন্ধ তারি পদতলে
অভাগিনী লুটাইয়া পড়িলি কি বোলে?
সেকিরে,অবোধ মেয়ে,বারেক দেখিবে চেয়ে?
জানিতেও পারিবে না যাইবে সে চোলে
যুঁথিকা-হৃদয় তোর ধূলি সাথে দোলে।
এত ভালবাসা তারে কেন দিলি হায়?
সাগর উদ্দেশগামী তটিনীর পায়
না ভাবিয়া না চিন্তিয়া যথা অবহেলে
ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী দেয় আপনারে ঢেলে!

নিশীথের উদাসীন পথিক সমীর
শূন্য হৃদয়ের তাপে হইয়া অধীর,
কুসুম-কানন দিয়া যায় যবে বোয়ে,
আকুলা রজনীগন্ধা কথ টি না কোয়ে
প্রাণের সুরভি সব দিয়া তার পায়,
পর দিন বৃন্ত হোতে ঝোরে পোড়ে যায়।
মেঘের দুঃস্বপ্নে মগ্ন দিনের মতন
কাঁদিয়া কাটিবে কিরে সারাটি যৌবন?
কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হোয়ে দীন অতিশয়—
আপনার পানে তবে চাহিয়া দেখিবি যবে
দেখিবি জীবন দিন সন্ধ্যা হয় হয়!
যে মেঘ মাঝারে থাকি উদিলি প্রভাতে
সেই মেঘ মাঝে থাকি অস্ত গেলি রাতে ঃ,
মুরলা—

কি জানি কেমন!

মুরলার সুখের কি দুঃখের জীবন র,—
সুখ দুঃখ দিনরাত মিলিয়া উভয়ে খেছে পায়ে
রেখেছে সায়াহ্ণ করি এ শান্ত হৃদয়ে।
হেন আলিঙ্গনে তারা রয়েছে সদাই
যেন তারা দুটি সখা যেন দুটি ভাই।
জোছনা ও যামিনীতে প্রণয় যেমন
তেমনি মিলিয়া তারা রোয়েছে দুজন।
সুখের মুখেতে থাকে দুখের কালিমা
দুখের হৃদয়ে জাগে সুখের প্রতিমা।
একা যবে বোসে থাকি স্তব্ধ জোছনায়
বহে বাতায়ন পানে নিশীথের বায়,
বড় সাধ যায় মনে যারে ভালবাসি
একবার মুহূর্ত্ত সে বসে কাছে আসি,
দুটি শুধু কথা কহে একটু আদর—
সেই স্তব্ধ জোছনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া হায়
মরিয়া যাইগো তারি বুকের উপর।

যখনি কবিরে দেখি সব যাই ভুলে
কিছুই চাহিনা আর—কিছুই ভাবি না আর—
শুধু সেই মুখে চাই দুটি আঁখি তুলে।
দেখি দেখি—কি যে দেখি, কি বলিব কি সে!
হৃদয় গলিয়া যায় জোছনায় মিশে।
জোছনার মত, সেই বিগলিত হিয়া
প্রাণের ভিতরে ধরি একবারে মগ্ন করি
কবিরে চৌদিকে যেন থাকে আবরিয়া।
মনে মনে মন যেন, কাঁদিয়া ফু'করে
কবির চরণ দুটি জড়াইয়া ধরে—
আঁখি মুদি "কবি—কবি" বলে শতবার,
শতবার কেঁদে বলে "আমার আমার,"
'মার আমার" যেন বলিতে বলিতে
মন একেবারে জীবন ত্যজিতে।
কি দুখে যেন ফেটে যায় বুক
দখ আমি, দুখ বলে সুখ।
ভা কোথা আমি, সে যেগো দেবতা
তারে কি কহিতে পারি প্রণয়ের কথা?
কবি যদি ভুলে কভু মোরে ভালবাসে
তা' হোলে যে মোরে যাব সঙ্কোচে উল্লাসে।
চাইনা চাইনা আমি প্রণয় তাঁহার
যাহা পাই তাই ভাল স্নেহ সুধা-ধার।
শুকতারা স্নেহ মাখা করুণ নয়ানে
চেয়ে থাকে অস্তমান যামিনীর পানে,
তেমনি চাহেন যদি কবি স্নেহ ভরে
মুরলার ক্ষুদ্র এই হৃদয়ের পরে,
তাহা হোলে নয়নের সামনে তাঁহার
হাসিয়া ফুরায়ে যাবে, জীবন আমার।
অনিল—
স্বার্থপর, আপনারি ভাবভরে ভোর,
আজিও সে দেখিল না হৃদয়টি তোর?
সর্ব্বস্ব তাহারি পদে দিয়া বিসর্জ্জন
কাঁদিয়া মরিছে এক দীন হীন মন,
ইহাও কি পড়িল না নয়নে তাহার?
আপনারে ছাড়া কেহ নাহি দেখিবার?
নিশ্চয় দেখেছে, তবু দেখেও দেখেনি,
দেখেছে সে—নিরুপায়, নিতান্তই অসহায়
ভাল বাসিয়াছে এক অভাগা রমণী,
দেখেছে—হৃদয় এক ফাটিয়া নীরবে,
একান্ত মরিবে তবু কথা নাহি কবে;
দেখেও দেখেনি তবু, পশু সে নির্দ্দয়!
ভাঙ্গিয়া দেখিতে চাহে রমণী হৃদয়।
শতধা করিতে চায় মন রমণীর,
দেখিবারে হৃদয়ের শির উপশির।
এমন সুন্দর মন মুরলা তোমার,
এমন কোমল, শান্ত, গভীর উদার;
ও মহান্ হৃদয়েতে প্রেম জলধির
নাইরে দিগন্ত বুঝি, নাই তার তীর।
করিস্‌নে করিস্‌নে ও হৃদি বিনাশ
যৌবনেই প্রণয়েতে হোস্‌নে উদাস!
কহিগে প্রণয় তোর কবির সকাশে,
শুধাইগে ভাল তোরে বাসে কি না বাসে।
ভাল যদি নাই বাসে কেন সেই জন
মিছা স্নেহ দেখাইয়া বেঁধে রাখে মন?
না যদি করিতে পারে তোরে আপনার,
আপনার মত কেন করে ব্যবহার?
কথা নাহি কহে যেন, না করে আদর,
পরের মতন থাকে, দেখে তোরে পর!
নিরদয়-দয়া তোরে নাইবা করিল!
শত্রুতার ভালবাসা নাই বা বাসিল!
মুহূর্ত্ত সুখের তোরে দিয়া প্রলোভন
অসুখী করিবে কেন সারাটি জীবন?

ফুদণ্ডের আদরেতে কভু ভুলিস্‌না!
আধেক সুখেতে কভু পূরে না বাসনা।
এখনি চলিনু তবে তার কাছে যাই
ভাল বাসে কি না বাসে শুধাইতে চাই।

মুরলা—

মনে কোরেছিনু ভাই এ প্রাণের কথা
কাহারেও বলিব না যত পাই ব্যথা!
সেদিন সায়াহ্ন কালে উচ্ছ্বসি উঠিয়া
বড় নাকি কেঁদে মোর উঠেছিল হিয়া,
তাই আমি পাগলের মত একেবারে
ছুটিয়া তোমারি কাছে গেনু কাঁদিবারে!
উচ্ছ্বসি বলিনু যত কাহিনী আমার!
কেন রে বলিলি হা-রে দুর্ব্বল অসার?'
ভাল বাসিতেই যদি করিলি সাহস
লুকাতে নারিস্‌ তাহা হা হৃদি অবশ?
পরের চোখের কাছে না ফেলিলে জল
আশ কি মেটেনা তোর রে আঁখি দুর্ব্বল!
মুরলারে অভাগীরে—কেন ভাল বাসিলিরে?
যদি বা বাসিলি ভাল কেন তোর মন
হোল হেন নীচ হীন দুর্ব্বল এমন?
একটি মিনতি আজি রাখ গো আমার!
সহস্র যাতনা পাই আর কখনত ভাই
ফেলিব না তব কাছে অশ্রু বারি ধার!
যেওনা কবির কাছে ধরি তব পায়—
ভুলে যাও যত কথা কহেছি তোমায়!
দয়া কোরে আরেকটি কথা মোর রাখ'
যদি গো কবির পরে রোষ কোরে থাক'
মোর কাছে কভু আর কোরনাক' নাম তাঁর
সে নাম ঘৃণার স্বরে কভু সহিব না
জানালেম এই মোর প্রাণের প্রার্থনা!

অনিল—

তবে কি এমনি শুধু মিছে ভাল' বেসে
শূন্য এ জীবণ তোর ফুরাইবে শেষে?

মুরলা—

তুমি কি বুঝিবে কত ভাগ্য করেছিনু
কবির প্রেমেতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিনু।
অবোধ বালিকা আমি মিছে কষ্ট পাই,
এ জীবনে মুরলার কোন কষ্ট নাই।
স্নেহের সমুদ্র সেই কবি গো আমার,—
অনন্ত স্নেহের ছায়ে—আমারে রেখেছে পায়ে
তাই যেন চিরকাল থাকে মুরলার!
সে স্নেহের কোলে শুয়ে কাটায় জীবন!
সে স্নেহের কোলে প্রাণ করে বিসর্জ্জন!
কুসুমিত সে অনন্ত স্নেহ রাজ্য পরে
তিল স্থান থাকে যেন মুরলার তরে!
যত দিন থাকে প্রাণ—ব্যাপি সেই টুকু স্থান
মাটিতে মিশায়ে রবে হৃদয় আমার।
কোন—কোন সুখ আমি নাহি চাহি আর।

স্বররহস্য।

এতাবৎ কাল দুই দুই পার্শ্বস্থ সুরের মধ্যে (যেমন সা-রে'র মধ্যে, রে-গ'র মধ্যে, গ-ম'র মধ্যে) কোথাও-বা এক মাত্রা কোথাও-বা অর্দ্ধ মাত্রা স্বর-ব্যবধান ধরা হইয়া আসিতেছে;—মোটামুটি-হিসাবে তাহা চলিতে পারে, কিন্তু শক্তাশক্তি করিয়া ধরিলে স্থানে স্থানে তাহার অল্প স্বল্প পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

পার্শ্ব-পত্রে অঙ্কিত ক্ষেত্র-টি স্বর-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। ঐ স্বর ক্ষেত্রে প্রথমতঃ এক অষ্টকের (অর্থাৎ সা-হইতে উপর-সপ্তকের সা-পর্য্যন্ত আটটি সুরের) কোন্ স্বুর কত দ্রুত বায়ু-স্পন্দন হইতে উৎপন্ন হয়—অথবা যাহা একই কথা—কোন্‌টি কাহা-অপেক্ষা কত মাত্রা উঁচু বা নীচু, দ্বিতীয়তঃ কোন্‌টির জন্য কতখানি তারের স্পন্দন আবশ্যক, তৃতীয়তঃ সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে কোন্ সুরের পর্দা হইতে কোন্ সুরের পর্দা কত অন্তরে বসাইতে হয়, সমস্তেরই সটীক বিবরণ এক ঠাঁই জড় করা হইয়াছে।

স্বর-ক্ষেত্রের গায়ে যে-অক্ষরগুলি রহিয়াছে তাহার মধ্যে স স্বতন্ত্র, সা স্বতন্ত্র; স স্বতন্ত্র ও মাথায়-বিন্দু-যুক্ত স' স্বতন্ত্র; সা স্বতন্ত্র ও মাথায়-বিন্দু-যুক্ত সা' স্বতন্ত্র; রি স্বতন্ত্র, রে স্বতন্ত্র; গ স্বতন্ত্র, গা স্বতন্ত্র; নি স্বতন্ত্র, নী স্বতন্ত্র; ইত্যাদি; অতএব সা বলিলে যেন তাহার পরিবর্ত্তে সা' গ্রহণ করা না হয়, নি বলিলে যেন নী গ্রহণ করা না হয়, প বলিলে যেন পা গ্রহণ করা না হয় ইত্যাদি।

সা হইতে বাম-দিকে যতদূর পর্য্যন্ত যতখানি স্থূল রেখা প্রসারিত রহিয়াছে তাহা (অর্থাৎ সা-এ-রেখা) সা-কসি বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে, এবং সা-হইতে উপর-দিকে যতদূর পর্য্যন্ত যতখানি স্থূল-রেখা প্রসারিত রহিয়াছে তাহা (অর্থাৎ সা-ই রেখা) সা-দাঁড়ি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে; রে-হইতে বাম দিকে যতদূর পর্য্যন্ত যতখানি স্থূল রেখা প্রসারিত রহিয়াছে তাহা (অর্থাৎ রে-এ রেখা) রে-কসি বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে, এবং রে-হইতে উপর দিকে যতদূর পর্য্যন্ত যতখানি স্থূল-রেখা প্রসারিত রহিয়াছে তাহা (অর্থাৎ রে-উ-রেখার স্থূলাংশ) রে-দাঁড়ি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে; ইত্যাদি-ক্রমে যে স্থূল-রেখা সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নী, সা', অক্ষর-গুলির যেটি হইতে যত দূর পর্য্যন্ত বামদিকে প্রসারিত রহিয়াছে তাহা সেইটির নামীয় কসি, আর যে স্থূল রেখা যেটি হইতে যতদূর পর্য্যন্ত উপরদিকে প্রসারিত রহিয়াছে তাহা সেইটির নামীয় দাঁড়ি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

রে-উ-রেখার সরু অংশটি রে-তন্তু, গা-অ-রেখার সরু-অংশটি গা-তন্তু, ইত্যাদি ক্রমে যে সরু-রেখাটি যে অক্ষরের নামীয় দাঁড়ির শিরোভাগে অবস্থিতি করে তাহা সেই অক্ষরের নামীয় তন্তু বলিয়া নির্দ্দিস্ট হইবে।

স্বর-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থিত যে ক্ষেত্রটি দীর্ঘে সা-কসি প্রস্থে সা-দাঁড়ি তাহা সা-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে; যে ক্ষেত্রটি দীর্ঘে রে-কসি প্রস্থে রে-দাঁড়ি তাহা রে-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে; যে-ক্ষেত্রটি দীর্ঘে গা-কসি প্রস্থে গা-দাঁড়ি তাহা গা-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিস্ট হইবে; ইত্যাদি ক্রমে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নী, সা ক্ষেত্র-পরম্পরা নির্দ্দিস্ট হইবে।

দীর্ঘে ১ (১ ক্রোশই হউক, ১ হাতই হউক, ১ যাহাই হউক) এবং প্রস্থে ১—এই-রূপ করিয়া সা-ক্ষেত্রটি রচিত হইয়াছে, এজন্য সা-দাঁড়ি = সা-কসি = ১।

সা-কসি'কে সা-কসি অপেক্ষা দ্বিগুণ লম্বা করিয়া টানা হইয়াছে, এজন্য সা-ক্ষেত্র অপেক্ষা সা-ক্ষেত্র দীর্ঘে দ্বিগুণ,—দীর্ঘে যেমন দ্বিগুণ প্রস্থে তেমনি অর্দ্ধগুণ, কেননা এ ঐ-রেখা সা-দাঁড়িকে যে-দুই সমান ভাগে কর্ত্তন করিয়াছে—সা-দাঁড়ি সেই দুই-ভাগের এক ভাগের সমান ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; অতএব সা-ক্ষেত্র অপেক্ষা সা-ক্ষেত্র যেমন দীর্ঘে দ্বিগুণ বেশী তেমনি প্রস্থে দ্বিগুণ কম, সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেরই মোট আয়তন সমান। এখন,—ইহা অতি সহজে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নী, সা, এই আটটি ক্ষেত্রের সকল ক'টিরই মোট আয়তন সমান, যথা—

উক্ত ক্ষেত্রগণের মধ্যেকার যে-কোন ক্ষেত্র হউক একটিকে গ্রহণ কর,—যেমন রে-ক্ষেত্র; দেখিবে যে, এ-রে-উ-স চৌকোণ-ক্ষেত্রটির ভিতর রে-ক্ষেত্র এবং সা-ক্ষেত্র উভয়েই অবস্থিতি করিতেছে। এ-রে-উ-স চৌকোণ-ক্ষেত্রের যে-অংশটুকু দীর্ঘে ই-উ এবং প্রস্থে রে-তন্তু (অর্থাৎ রে-উ-রেখার সরু অংশ-টুকু) তাহা সা-ক্ষেত্র এবং রে-ক্ষেত্র উভয়েরই সীমা-বহির্ভূত, এজন্য তাহা বহিঃক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিস্ট হউক্; এ-রে-উ-স ক্ষেত্রের যে অংশ দীর্ঘে এ-রে প্রস্থে এ-রি, তাহা রে-ক্ষেত্রেরও অন্তর্গত—সা-ক্ষেত্রেরও অন্তর্গত, এজন্য তাহা সাধারণ-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিস্ট হউক্; এ-রে-উ-স-ক্ষেত্রের যে অংশ দীর্ঘে রে-দাঁড়ি এবং প্রস্থে সা-রে তাহা কেবল রে-ক্ষেত্রেরই অন্তর্গত—সা-ক্ষেত্রের নহে, এজন্য তাহা রে-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ বলিয়া নির্দ্দিস্ট হউক্; এ-রে-উ-স ক্ষেত্রের যে-অংশ দীর্ঘে স-ই এবং প্রস্থে স-রি তাহা কেবল সা-ক্ষেত্রেরই অন্তর্গত—রে-ক্ষেত্রের নহে, এজন্য তাহা সা-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ বলিয়া নির্দ্দিস্ট হউক্। (১) রে-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ, (২) সাক্ষেত্রের বিশেষাংশ, (৩) সাধারণ ক্ষেত্র, (৪) বহিঃক্ষেত্র, এই চারিটি ক্ষেত্র জোড়া দিলে যে একটি-ক্ষেত্র হয় তাহাই এ-রে-উ-স-ক্ষেত্র।

এখন—ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া

যাইতেছে যে, এ-উ রেখাটি—সাধারণ ক্ষেত্র বহিঃক্ষেত্র এবং এ-রে-উ-স-ক্ষেত্র—তিনটি ক্ষেত্রেরই ঠিক্ মধ্য-প্রদেশ দিয়া প্রসারিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ তিনটি ক্ষেত্রকে দুটি দুটি সমান ত্রিকোণাংশে বিভাগ করিয়াছে; অতএব এ-রে-উ ত্রিকোণ = এ-স-উ ত্রিকোণ, এবং ও-দুটি ত্রিকোণের যে-দুটি অংশ সাধারণ ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে পড়িয়াছে তাহারাও পরস্পর সমান, আর, যে-দুটি অংশ বহিঃক্ষেত্রের অভ্যন্তরে পড়িয়াছে সে-দুটিও পরস্পর সমান; সংক্ষেপে,—ও-দুটি ত্রিকোণ (এ-রে-উ এবং এ-স-উ) সমান, উভয়ের সাধারণ ক্ষেত্রাংশ সমান, উভয়ের বহিঃক্ষেত্রাংশ সমান। এ-রে-উ এবং এ-স-উ ত্রিকোণদ্বয় যখন সমান এবং উভয়ের বহিঃক্ষেত্রাংশদ্বয় তথা সাধারণ-ক্ষেত্রাংশদ্বয় যখন সমান তখন উক্ত ত্রিকোণদ্বয়ের মধ্য হইতে উহাদের সাধারণ-ক্ষেত্রাংশ এবং বহিঃক্ষেত্রাংশ বাদ দিলে দোঁহার দুই অংশ যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহারাও কাজে কাজেই সমান হইবে,—দেখা যাইতেছে যে ও-রূপ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার একটি ক্ষেত্র রে-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ, অন্যটি সা-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ; অতএব রে-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ = সা-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ; তাহার মধ্যে রে-ক্ষেত্রের বিশেষাংশে সাধারণ-ক্ষেত্র জুড়িয়া দিলে রে-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং সা-ক্ষেত্রের বিশেষাংশে সাধারণ-ক্ষেত্র জুড়িয়া দিলে সা-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়, অতএব রে-ক্ষেত্র = সা-ক্ষেত্র; এমনি করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, গা-ক্ষেত্র, মা-ক্ষেত্র, পা-ক্ষেত্র, ধা-ক্ষেত্র, নী-ক্ষেত্র, সা-ক্ষেত্র প্রত্যেকেরই মোট আয়তন = সা-ক্ষেত্রের আয়তন = একই সমান আয়তন। অতএব প্রমাণ হইল যে, সা, রে, প্রভৃতি সকল-ক্ষেত্রেরই মোট আয়তন সমান; সুতরাং উহাদের মধ্যে যে ক্ষেত্র যাহা অপেক্ষা দীর্ঘে যত গুণ বড়, সে ক্ষেত্র তাহা অপেক্ষা প্রস্থে ততগুণ ছোটো; যেমন—ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে—এ-সা ক্ষেত্র অপেক্ষা এ-সা-ক্ষেত্র দীর্ঘে দ্বিগুণ প্রস্থে অর্দ্ধেক; অর্দ্ধেককে দুই দিয়া গুণ করিলে ১ হয়; এ যেমন, তেমনি উক্ত ক্ষেত্রগণের প্রত্যেকেরই দৈর্ঘের পরিমাণাঙ্ককে তাহার প্রস্থের পরিমাণাঙ্ক দিয়া গুণ করিলে ১ হইবে, অথবা যাহা একই কথা—সা-দাঁড়িকে সা-কসি-দিয়া, রে-দাঁড়িকে রে-কসি-দিয়া—যে অক্ষরের দাঁড়ি হউক্ তাহাকে সেই অক্ষরের কসি দিয়া—গুণ করিলে ১ হইবে।

এখন,—বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, স্বরোচ্চারক তারের আয়তন যে পরিমাণে কম হয় তাহার স্পন্দনের বেগ সেই পরিমাণে বেশী হয় অথবা—যাহা একই কথা—সুর সেই পরিমাণে উচ্চ হয়। যতখানি তার হউক্ না কেন তাহাকে যদি এক-গুণ বড় তার বলিয়া ধরা যায় এবং তাহার ধ্বনি-কারক স্পন্দনকে একগুণ দ্রুত স্পন্দন বলিয়া ধরা যায় কিংবা—যাহা একই কথা—সেই স্পন্দন-জাত স্বরকে এক গুণ উচ্চ সুর বলিয়া ধরা যায়, তবে এক গুণের যত গুণ

বেশী উচ্চ স্বর চাও, উচ্চারক তারকে এক গুণের তত অংশ ছোটো করিলেই তাহা পাইবে। এক-গুণ তারের পরিমাণাঙ্ককে তথা সেই তারের স্পন্দন জাত এক-গুণ উচ্চ স্বরের পরিমাণাঙ্ককে যদি ১ বলিয়া ধরা যায় তবে যে-তারের পরিমাণাঙ্ক ১-এর যত ভাগ কম হইবে, সেই তারের স্পন্দন-জাত স্বরের পরিমাণাঙ্ক ১-এর তত গুণ উচ্চ হইবে; এ জন্য যে কোন তার হউক্ না কেন তাহার আয়তনের পরিমাণাঙ্ককে তাহার স্বরের উচ্চতার পরিমাণাঙ্ক দিয়া গুণ করিলে ১ হয়।

উপরে দেখা গিয়াছে যে, যে অক্ষরের দাঁড়ি হউক তাহাকে সেই অক্ষরের কসি দিয়া গুণ করিলে ১ হয়;—অতএব সা-কসি যে-স্বরের উচ্চতার পরিমাণ রেখা, সা-দাঁড়ি সেই স্বরের উচ্চারক তারের পরিমাণ-রেখা; সংক্ষেপে,—যে স্বরের উচ্চতা = সা-কসি, সে স্বরের তারের আয়তন = সা-দাঁড়ি। স্বর-ক্ষেত্রের আটটি দাঁড়ি এবং আটটি কসির প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ঐ কথা খাটে। সা-অপেক্ষা যে স্বর যতগুণ উচ্চ, সা-কসি অপেক্ষা সেই স্বরেব ক-সিকে ততগুণ বড় করিয়া আঁকা হইয়াছে; এজন্য প্রত্যেক স্বরের কসি = তাহার উচ্চতার পরিমাণ।

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তএই যে, যদি একগুণ দ্রুত স্পন্দন-হইতে এবং একগুণ আয়ত তার-হইতে সা (অর্থাৎ যে কোন স্বরকে একমাত্রা উচ্চ বলিয়া ধার্য্য করা যায় সেই স্বর) উৎপন্ন হয় তবে দ্বিগুণ দ্রুত স্পন্দন-হইতে এবং অর্দ্ধেক্ ছোটো তার হইতে এক সপ্তক উপরের সা উত্থিত হইবে; দ্বিগুণের দ্বিগুণ (চতুর্গুণ) দ্রুত স্পন্দন-হইতে এবং অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক (চতু-র্থাংশ) ছোটো তার-হইতে আর এক সপ্তক উচ্চের সা উত্থিত হইবে; চতুর্গুণের দ্বিগুণ (অষ্টগুণ) দ্রুত স্পন্দন-হইতে এবং চতুর্থাং-শের অর্দ্ধাংশ (অষ্টমাংশ) ছোটো তার-হইতে আর এক সপ্তক উচ্চের সা উত্থিত হইবে, ইত্যাদি। অতএব সা-হইতে এক সপ্তক উপরের সা দ্বিগুণ উচ্চ, দুই সপ্তক উপরের সা দ্বিগুণের দ্বিগুণ চতুর্গুণ উচ্চ, তিন সপ্তক উপরের সা তাহার দ্বিগুণ অষ্ট গুণ উচ্চ, চারি সপ্তক উপরের সা তাহার দ্বিগুণ ষোড়শ গুণ উচ্চ। আর একটি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে একের দ্বিগুণ, তিন গুণ, চারি গুণ, পাঁচ-গুণ, ইত্যাদি প্রকার একোত্তর-ক্রমে যত গুণ উচ্চ স্বর শ্রবণেন্দ্রিয়ের আয়ত্তের মধ্যে আসিতে পারে সকল-গুলিই সুক্ষ্মরূপে সা'র স-হিত অনুরণিত হয়। তৃতীয় সপ্তক পর্য্যন্ত যে স্বর গুলি অনুরণিত হয় সেই গুলিকেই সঙ্গীতজ্ঞেরা—কোমল-নিখাদ-বাদে—স্ব-গ্রামের সংবাদী-স্বর এবং নিম্ন গ্রামের অনুবাদী স্বর, ও কোমল-নিখাদ-সমেত উচ্চ গ্রামের বিবাদী স্বর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পঞ্চম সপ্তকের সা পর্য্যন্ত যে যে স্বর সা'র সহিত অনুরণিত হয়, তাহার পরিমাণাঙ্ক নিম্ন-স্থিত পাঁচটি পংক্তিতে ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত হইল।

১
২, ৩
৪, ৫, ৬, [৭]
৮, ৯, ১০, (১১), ১২, (১৩), [১৪], ১৫
১৬ * * * * * * *

প্রথম পংক্তিতে ১, অর্থাৎ ১-গুণ উচ্চস্বর কিনা সা। দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম-স্থানে ২ অর্থাৎ প্রথম সপ্তকের সা-অপেক্ষা ২-গুণ উচ্চ স্বর কিনা দ্বিতীয় সপ্তকের (বা এক সপ্তক উচ্চের) সা। তৃতীয় পংক্তির প্রথম স্থানে ৪, অর্থাৎ গোড়ার সা-অপেক্ষা দ্বিগুণেরও দ্বিগুণ চতুর্গুণ উচ্চ স্বর, কিনা আর এক সপ্তক উচ্চের সা—তৃতীয় সপ্তকের সা। চতুর্থ পংক্তির প্রথম স্থানে ৮, অর্থাৎ গোড়ার সা-অপেক্ষা দ্বিগুণের দ্বিগুণ তস্য দ্বিগুণ ৮গুণ উচ্চ স্বর কিনা চতুর্থ সপ্তকের সা। এই রূপ চারিটি পংক্তির আদিতে চারিটি উত্তরোত্তর উচ্চ সপ্তকের সা'র পরিমাণাঙ্ক স্থাপিত হইল; এবং পঞ্চম পংক্তিতে শুদ্ধ কেবল পঞ্চম সপ্তকের সা'র পরিমাণাঙ্ক স্থাপিত হইল।

দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয়-স্থানে ৩, অর্থাৎ প্রথম সপ্তকের সা-অপেক্ষা ৩-গুণ উচ্চস্বর; তাহা দ্বিতীয় সপ্তকের সা—যাহার পরিমাণাঙ্ক ২—তাহা অপেক্ষা উঁচুস্বর, এবং তৃতীয় সপ্তকের সা—যাহার পরিমাণাঙ্ক ৪—তাহা অপেক্ষা নীচু স্বর,—তাহা দ্বিতীয় সপ্তকের পা।

তৃতীয় পংক্তির দ্বিতীয় স্থানে ৫, তৃতীয় স্থানে ৬ চতুর্থস্থানে ৭। ইহা বলা বাহুল্য যে উহারা ক্রমান্বয়ে প্রথম সপ্তকের সা অপেক্ষা ৫গুণ ৬গুণ এবং ৭গুণ উচ্চস্বর, সুতরাং উহারা তৃতীয় সপ্তকের সা—যাহার পরিমাণাঙ্ক ৪—তাহা অপেক্ষা উঁচু স্বর এবং চতুর্থ সপ্তকের সা—যাহার পরিমাণাঙ্ক ৮—তাহা অপেক্ষা নীচু স্বর; ঐ তিনটি স্বর ক্রমান্বয়ে তৃতীয় সপ্তকের গা, পা এবং নি (কোমল নিখাদ)। নি সা-গ্রামের গ্রাম-বহির্ভূত বটে, কিন্তু তাহা এক গ্রাম উচ্চের বিবাদী শ্রেণীভুক্ত; কেবল সা-গ্রামের গ্রাম-বহির্ভূত বলিয়া তাহা আপাততঃ পরিত্যক্ত হইতেছে; আপাততঃ পরিত্যেজ্যের দুই পার্শ্বে [ ] এইরূপ ঘের দেওয়া হইল, এবং যাহা একেবারেই পরিত্যজ্য তাহার দুই পার্শ্বে ( ) এইরূপ ঘের দেওয়া হইল।

চতুর্থ পংক্তির দ্বিতীয় স্থানে ৯, তৃতীয় স্থানে ১০, চতুর্থ স্থানে ১১, পঞ্চম স্থানে ১২, ষষ্ঠ স্থানে ১৩, সপ্তম-স্থানে ১৪, অষ্টম স্থানে ১৫। ৯, ১০ প্রভৃতি অঙ্ক-পরম্পরা প্রথম সপ্তকের সা' অপেক্ষা ৯, ১০, প্রভৃতি গুণ উচ্চস্বর, ইহা বলা বাহুল্য। এখন,—

৮ = চতুর্থ-সপ্তকের সা

৯ = চতুর্থ সপ্তকের রে।

১০ = চতুর্থ সপ্তকের গ।

১১ পরিত্যজ্য।

১২ = চতুর্থ সপ্তকের প।

১৩ পরিত্যজ্য।

১৪ = চতুর্থ সপ্তকের কোমল নিখাদ। ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে আপাততঃ পরিত্যজ্য।

১৫ = চতুর্থ সপ্তকের নি।

১৬ = পঞ্চম সপ্তকের সা।

১১ এবং ১৩ অঙ্ক পরিত্যাজ্য হইল কেন ?—ইহার অবশ্য বিশেষ একটি কারণ আছে। ৮, ৯, ১০, চতুর্থ সপ্তকের সা-রে-গ স্থানে বসিয়াছে, ১২, ১৫, প-নি-স্থানে বসিয়াছে ; দেখ, ৮ অপেক্ষা ১০ যতগুণ উচ্চ, ১২ অপেক্ষা ১৫ঠিক ততগুণ উচ্চ ; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সা-গ ব্যবধানের সহিত প-নি-ব্যবধানের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে ; কিন্তু ১১ এবং ১৩ অঙ্কের মধ্যে এরূপ একটা সৃষ্টিছাড়া সম্বন্ধ যে অন্য কোন দুই স্বরের পরিমাণাঙ্কের মধ্যে সেরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না, এজন্য ১১ এবং ১৩ অঙ্কের পরিবর্ত্তে এরূপ দুইটি অঙ্ক বসানো কর্ত্তব্য যাহার সহিত অন্যান্য স্বরের পরিমাণাঙ্কের সৌসাদৃশ্য বর্ত্তিতে পারে।

১১ এবং ১৩ অঙ্কের স্থান চতুর্থ সপ্তকের ম এবং ধা'র স্থান; ম এবং ধা'র পরিমাণাঙ্ক যে কি তাহা একটু পরেই কসিয়া বাহির করা যাইবে। সর্ব্বশুদ্ধ ৪র্থ সপ্তকের সা-হইতে ৫ম সপ্তকের সা পর্য্যন্ত গ্রাহ্য (ঘের-বর্জ্জিত) এবং ত্যজ্য (ঘের-দেওয়া) আটটি স্বরের নিম্নস্থিত আটটি পরিমাণাঙ্ক পাওয়া যাইতেছে,—

৮, ৯, ১০, (১১), ১২, (১৩), [১৪], ১৫, ১৬।

এই আটটি অঙ্কের প্রত্যেকেই প্রথম সপ্তকের সমস্থানীয় অঙ্কের আট-গুণ,—অর্থাৎ ৪র্থ সপ্তকের সা-অঙ্ক যেমন ১ম সপ্তকের সা-অঙ্কের (১-এর) আটগুণ, তেমনিই চতুর্থ সপ্তকের রে-অঙ্ক প্রথম সপ্তকের রে-অঙ্কের আট গুণ, চতুর্থ সপ্তকের গা-অঙ্ক প্রথম-সপ্তকের গা-অঙ্কের আট-গুণ ইত্যাদি। অতএব উপরিস্থিত চতুর্থ সপ্তকের গ্রাহ্য এবং ত্যজ্য অঙ্ক-গুলির অষ্টমাংশ গ্রহণ করিলেই প্রথম সপ্তকের গ্রাহ্য এবং ত্যজ্য অঙ্কগুলি পাওয়া যাইবে, যথা,— প্রথম সপ্তকের গ্রাহ্য এবং ত্যজ্য অঙ্ক এই কয়টি,

৮-এর ৮ মাংশ ১
৯-এর ঐ = ১৵০
১০-এর ঐ = ১।০
(১১-র ঐ)
১২-র ঐ = ১॥০
(১৩-র ঐ)
[১৪-র ঐ] = ১৸০
১৫-র ঐ = ১৸৵০
১৬-র ঐ = ২

আনা-গণ্ডার দায়-হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ১-কে ৩৬০ অংশের সমষ্টি বলিয়া ধরা-যা'ক্, তাহা হইলে উপরের ঐ ১-হইতে ২-পর্য্যন্ত নয়টি অঙ্কের জায়গায় নিম্ন-লিখিত ৯-টি অঙ্ক বসিবে,—

৩৬০, ৪০৫, ৪৫০, (৪৯৫), ৫৪০, (৫৮৫,) [৬৩০], ৬৭৫, ৭২০।

উপরের ঐ অঙ্কগুলি দেখিবে যে, উহারা উত্তরোত্তর সমান্তর-ক্রমে বসিয়াছে—অর্থাৎ ৩৬০-এর যত অন্তরে ৪০৫, ৪০৫-এর তত অন্তরে ৪৫০ ইত্যাদি-ক্রমে বসিয়াছে। দেখিবে যে, পাশাপাশি-স্থিত প্রত্যেক অঙ্কদ্বয়ের মধ্যে ৪৫ ব্যবধান, যথা,—৩৬০ আর ৪৫ = ৪০৫, ৪০৫ আর ৪৫ = ৪৫০, ইত্যাদি।

যে-দুটি অঙ্ক দুই প্রান্ত-স্থিত ৩৬০ এবং ৭২০ অঙ্কের মধ্যস্থলে ঠিক সমান্তর-ক্রমে

বসিতে পারে,এমনি দুটি অঙ্ক কসিয়া বাহির কর তাহা হইলেই মধ্যম এবং ধৈবতের অঙ্ক পাইবে;—দেখিবে যে, ৩৬০ এবং ৭২০'র মধ্যস্থলে ৪৮০ এবং ৬০০ ঠিক সমা-ন্তর- ক্রমে বসিয়াছে, যথা,—

৩৬০, ৪৮০, ৬০০, ৭২০,

৩৬০ আর ১২০ = ৪৮০, ৪৮০ আর ১২০ = ৬০০, ৬০০ আর ১২০ = ৭২০। অতএব মাঝের ঐ দুটি অঙ্ক ৪৮০ এবং ৬০০ মধ্যম এবং ধৈবতের স্থানে রাখা হউক্—মা'র ত্যজ্য অঙ্ক ৪৯৫'এর পরিবর্ত্তে ৪৮০ এবং ধা'র ত্যজ্য অঙ্ক ৫৮৫-র পরিবর্ত্তে ৬০০ রাখা হউক্, আর কোমল নিখাদের ৬৩০ অঙ্ক আপাততঃ পরিত্যাগ করা হউক্, তাহা হই-লেই সা রে গা মা পা ধা নি স'া এই সাতটি সুরের সাতটি পরিমাণাঙ্কের সমস্ত-গুলি ধ-রিয়া পাওয়া যাইবে; তাহা যথা-ক্রমে এই,—

৩৬০, ৪০৫, ৪৫০, ৪৮০, ৫৪০, ৬০০, ৬৭৫, ৭২০।

ধা'র পরিমাণাঙ্ক ৬০০ এবং নি'র পরি-মাণাঙ্ক ৬৭৫ এ দুয়ের মধ্যস্থলে কোমল নিখাদকে বসাইলে দেখিতে ভাল বই মন্দ হয় না, তাহা হইলে পাশাপাশি-স্থিত অঙ্কদ্বয়-গুলির মাঝখানকার আটটি ব্যব-ধান দুই প্রান্ত হইতে মধ্য-দেশ পর্য্যন্ত সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়, যথা,—

সা = ৩৬০

ব্যবধান ৪৫

রে = ৪০৫

ঐ ৪৫

গ = ৪৫০

ঐ ৩০

ম = ৪৮০

ঐ ৬০

প = ৫৪০

ঐ ৬০

ধ = ৬০০

ঐ ৩০

নি̱ = ৬৩০

ঐ ৪৫

নি = ৬৭৫

ঐ ৪৫

স'া = ৭২০

দেখ যেমন উপর-হইতে ধরিলে মধ্য দেশ পর্য্যন্ত ৪৫, ৪৫, ৩০, ৬০ এই চারিটি ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়, নীচে হইতে ধরিলেও অবিকল সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর-ক্ষেত্রে যদি নী এবং ধা'র মধ্যস্থলে নী̱ বসানো যায় তবে স'া-নী-রেখা হবে = নী-নী̱-রেখা; তাহা হইলে টুক্‌রা রেখা-ব্যবধান গুলি (সুরের উচ্চতা-ব্যবধান নহে) এই রূপ দাঁড়াইবে,—

সা-রে = স'া-নী

রে-গা = নী-নী̱

গা-মা = নী̱-ধা

মা-পা = পা-ধা।

কোমল নিখাদ বাদ দিলেও ব্যবধানের বিশেষ কোন অমিল হয় না, যথা,—

সা-রে = সা-নী

রে-মা = নী-ধা

মা-পা = পা-ধা

এ-তিনটি মিল পাওয়া যায়,— কেবল রে-গা = নী-নী এইটির অপ্রতুল হয়।

স্বরের পরিমাণাঙ্ক-গুলির মধ্যেকার মা এবং ধা'র ত্যজ্য অঙ্ক ৪৯৫ এবং ৫৮৫'র পরিবর্ত্তে ৪৮০ এবং ৬০০ রাখিবা-মাত্র তাবৎ অঙ্কগুলির মধ্যে চারিদিক্ হইতে সৌসাদৃশ্য ঘনীভূত হইয়া উঠিল যথা,—

সা-অঙ্ক-৩৬০-এর যতগুণ উচ্চে রে-অঙ্ক ৪০৫, মা-অঙ্ক-৪৮০-র ততগুণ উচ্চে পা-অঙ্ক ৫৪০; সা-অঙ্ক-৩৬০-এর যত-গুণ উচ্চে গা-অঙ্ক ৪৫০, মা-অঙ্ক-৪৮০-র ততগুণ উচ্চে ধা-অঙ্ক-৬০০; ম-অঙ্ক ৪৮০-র যতগুণ নীচে গা-অঙ্ক-৪৫০, সা-অঙ্ক-৭২০-র ততগুণ নীচে নি-অঙ্ক-৬৭৫; রে-অঙ্ক ৪০৫-এর যতগুণ উচ্চে মা-অঙ্ক-৪৮০, ধা-অঙ্ক-৬০০-র ততগুণ উচ্চে সা-অঙ্ক-৭২০; সা-অঙ্ক-৩৬০-এর যতগুণ উচ্চে পা অঙ্ক ৫৪০, মা-অঙ্ক-৪৮০-র ততগুণ উচ্চে সা-অঙ্ক-৭২০; সা-অঙ্ক-৩৬০এর যতগুণ উচ্চে মা-অঙ্ক ৪৮০, পা-অঙ্ক-৫৪০এর ততগুণ উচ্চ সা অঙ্ক ৭২০। যদি ত্যজ্য অঙ্ক-দুটিকে স্ব-স্ব স্থানে থাকিতে দেওয়া যাইত তবে অতগুলি মিলের একটি মিল-ও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

এখন স্বর-ক্ষেত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাঁধুনি কিরূপ তাহা দেখা যাইতেছে; প্রথমে এ-সা-রেখা এবং ই-সা-রেখা এই দুই সম-দীর্ঘ রেখার উভয়কেই একগুণ লম্বা বলিয়া ধরা হইয়াছে; এ-সা-রেখা হচ্চে সা-কসি এবং ই-সা-রেখা হচ্চে সা-দাঁড়ি। এ-সা একগুণ লম্বা হওয়াতে বুঝাইতেছে যে, সা একগুণ উচ্চ স্বর, এবং ই-সা এক-গুণ লম্বা হওয়াতে বুঝাইতেছে যে, সা'র উচ্চারক তার একগুণ আয়ত। সা-সা-রেখার ঠিক মধ্যস্থলে পা, পা-সা-রেখার ঠিক মধ্য-স্থলে গা, গা-সা-রেখার ঠিক মধ্য স্থলে রে; সা-রে যতটুকু রেখা, সা-নী ততটুকু রেখা; বাকি রইল মা আর ধা; সা-সাকে—সা-মা সা-ধা ধা-সা—এই তিন সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া মা এবং ধা'র স্থান ঠিক করা হইয়াছে। এ-সা রেখার ঠিক মধ্যস্থলে সা; ইতি পূর্ব্বে এ-সা রেখাকে একগুণ লম্বা বলিয়া ধরা হইয়াছে,— এ সা-রেখা তবে দ্বিগুণ লম্বা। ১-গুণ ২-গুণ ৩-গুণ প্রভৃতি লম্বা রেখাকে ১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে দাঁড়ায়,—সা-কসি = ১, সা কসি = ২, কিনা সা-অপেক্ষা সা দ্বিগুণ উচ্চস্বর। পা ঠিক সা-সা-রেখার মধ্যস্থলে এজন্য পা-কসি (অর্থাৎ এ-পা-রেখা) = ১॥০, কিনা সা-অপেক্ষা পা ১॥০ গুণ উচ্চস্বর। গা ঠিক পা-সা-রেখার মধ্যস্থলে এজন্য গা-কসি (অর্থাৎ এ-গা-রেখা) = ১।০, কিনা সা-অপেক্ষা গা ১।০ গুণ-উচ্চ স্বর। রে ঠিক গা-সা-রেখার মধ্যস্থলে, এজন্য রে-কসি (অর্থাৎ এ-রে-রেখা) = ১৵, কিনা সা-অপেক্ষ রে ১৵০ গুণ-উচ্চ স্বর। নী-সা = রে সা = ৵০, এজন্য নী-কসি (অর্থাৎ এ নী-রেখা = ১৸৵০, কি না সা-অপেক্ষা নি ১৸৵০ গুণ উচ্চস্বর। বাকি রইল কেবল ম আর ধা; সা যে-তিনটি সমান-ভাগে বিভক্ত হইয়াছে তাহার প্রথম ভাগ হচ্চে সা-মা, দ্বিতীয় ভাগ হচ্চে মা-ধা, অতএব সা মা = ১-তৃতী-

য়াংশ (অর্থাৎ একের তিন ভাগের এক ভাগ) মা-ধা=তাহার দ্বিগুণ সুতরাং ২-তৃতীয়াংশ; অতএব মা-কসি (অর্থাৎ এ-মা-রেখা)=১ আর ১-তৃতীয়াংশ=৩-তৃতীয়াংশ আর ১-তৃতীয়াংশ=৪-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ ৪এর ৩ভাগের একভাগ); ধা-কসি (অর্থাৎ ঐ-ধা-রেখা)=১ আর ২-তৃতীয়াংশ =৩-তৃতীয়াংশ আর২-তৃতীয়াংশ=৫-তৃতীয়াংশ; কিনা সা-অপেক্ষা ম ৪-তৃতীয়াংশ গুণ উচ্চ স্বর এবং সা-অপেক্ষা ধা ৫-তৃতীয়াংশ গুণ উচ্চ স্বর। অতএব স'-শুদ্ধ ধরিয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে

কসি		পরিমাণাঙ্ক
সা...	...	...১
রে...	...	...১৵৹
গা...	...	...১।৹
মা...	...	৪-৩ য়াংশ
পা...	...	...১॥৹
ধা...	...	...৫-৩ য়াংশ
নী...	...	...১৸৵৹
স'...	...	..২

এই গেল স্বরের উচ্চতা-জ্ঞাপক কসি গুলির পরিমাণাঙ্ক; এখন তারের আয়তন-জ্ঞাপক দাঁড়ি-গুলির পরিমাণ কিরূপ তাহা দেখা যাউক; স'-তন্ত্ত (অর্থাৎ স'-ঐ রেখার সরু অংশ) যে অক্ষরে গিয়া ঠেকিয়াছে, এ-হইতে সেই অক্ষর পর্য্যন্ত প্রসারিত এ-ঐ-রেখা-কর্ত্তৃক সা-দাঁড়ি যে-স্থান-টিতে কর্ত্তিত হইয়াছে সেই-স্থান-টির মধ্য দিয়া স'-কসি (অর্থাৎ স'-হইতে যে স্থূল কসি যত-দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে সেই কসি) যাহা স'-কসির সমান্তর-বাহী (parallel), সেই স'-কসির অন্ত-হইতে স'-পর্য্যন্ত লম্বিত রেখা টুকুকে স্থূল করিয়া তাহাকেই স' দাঁড়ি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এইরূপ করাতেই দাঁড়াইয়াছে স'-দাঁড়ি × স'-কসি=১। এমনি আবার নী-তন্ত্ত (অর্থাৎ নী-ও-রেখার সরু অংশ) যে-অক্ষরে গিয়া ঠেকিয়াছে এ-হইতে সেই অক্ষর পর্য্যন্ত প্রসারিত এ-ও রেখা সা-দাঁড়িকে যে-স্থানে কর্ত্তন করিয়াছে, তাহার মধ্য-দিয়া প্রসারিত নি-কসি যাহা নী-কসির সমান্তর-বাহী, সেই নি-কসির অন্ত-হইতে নী-পর্য্যন্ত লম্বিত রেখা-টুকুকে স্থূল করিয়া তাহাকেই নী-দাঁড়ি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাহাতে করিয়াই দাঁড়াইয়াছে—নী-দাঁড়ি × নী কসি=১। অতএব যে স্বরের কসির পরিমাণকে যত দিয়া গুণ করিলে ১হয় তাহাই সেই স্বরের দাঁড়ির পরিমাণ, অথবা—যাহা একই কথা—যে-স্বরের উচ্চতার পরিমাণঙ্ককে যে অঙ্ক দিয়া গুণ করিলে ১ হয়, তাহাই সেই স্বরের উচ্চারক তারের আয়তনের পরিমাণাঙ্ক। সা'র উচ্চতা=১, তাহাকে কি দিয়া গুণ করিলে ১হয়? অবশ্য ১দিয়া,—তাই সা'র উচ্চারক তারের সুতরাং সা-দাঁড়ির আয়তন =১। রে'র উচ্চতা=১৵৹, তাহাকে কিদিয়া গুণ করিলে ১ হয়? ১৵৹ হচ্চে ৯-অষ্টমাংশ (অর্থাৎ ৯-এর ৮-ভাগের এক ভাগ), তাহাকে ৮-নবমাংশ দিয়া গুণ করিলে ১ হয়, অতএব রে-দাঁড়ির আয়তন=৮-নব-

মাংশ। গা'র উচ্চতা = ১।০ = ৫-৪র্থাংশ, অতএব গা-দাঁড়ির আয়তন ৪-৫মাংশ। মা'র উচ্চতা = ৪-৩য়াংশ অতএব মা-দাঁড়ির আয়তন = ৩-৪র্থাংশ = ৸০। পা'র উচ্চতা = ১৷৷০ = ৩-২য়াংশ, অতএব পা-দাঁড়ির আয়তন = ২-৩য়াংশ। ধা'র উচ্চতা = ৫-৩য়াংশ, অতএব ধা-দাঁড়ির আয়তন = ৩-৫মাংশ। নি'র উচ্চতা = ১৸৶০ = ১৫-৮মাংশ অতএব নি-দাঁড়ির আয়তন = ৮-১৫শাংশ। সা'র উচ্চতা = ২, অতএব সা-দাঁড়ির আয়তন = ১-২মাংশ = ৷৷০। যদি ৮–৯মাংশ, ৪-৫মাংশ প্রভৃতিকে সংক্ষেপে ৮-৯ম, ৪-৫ম ইত্যাদি রূপ সংকেত দ্বারা জ্ঞাপন করা যায় তবে স্বরোচ্চারক তারের আয়তনের পরিমাণাঙ্কগুলি এইরূপ দাঁড়ায়

স্বর		তারের আয়তন
সা...	...	... ১
রে...	...	... ৮-৯ম
গ ...	...	... ৪-৫ম
ম ...	...	... ৩-৪র্থ = ৸০
প ...	...	... ২-৩য়
ধ ...	...	... ৩-৫ম
নি...	...	... ৮-১৫শ
সা...	...	... ১-২য় = ৷৷০

স্বর-ক্ষেত্রস্থিত সা-কসি অর্থাৎ সা'র উচ্চতা এবং সা-দাঁড়ি অর্থাৎ সা'র উচ্চারক তারের আয়তন, উভয়কেই যদি ৩৬০ বলিয়া ধরা যায় তবে নিম্ন-প্রকার ফল দাঁড়ায়,—

স্বর	কসি		দাঁড়ি	গুণ-ফল
সা	৩৬০	×	৩৬০ =	১২৯৬০০
রে	৪০৫	×	৩২০ =	ঐ
গা	৪৫০	×	২৮৮ =	ঐ
মা	৪৮০	×	২৭০ =	ঐ
পা	৫৪০	×	২৪০ =	ঐ
ধা	৬০০	×	২১৬ =	ঐ
নি	৬৭৫	×	১৯২ =	ঐ
সা	৭২০	×	১৮০ =	ঐ

এখন সেতারের পর্দাস্থান স্বচ্ছন্দে পাওয়া যাইতে পারে, যথা,

সা-তন্তু = ৩৬০—৩৬০ = ০

ব্যবধান ৪০

রে-তন্তু = ৩৬০—৩২০ = ৪০

ঐ ৩২

গা-তন্তু = ৩৬০—২৮৮ = ৭২

ঐ ১৮

মা-তন্তু = ৩৬০—২৭০ = ৯০

ঐ ৩০

পা-তন্তু = ৩৬০—২৪০ = ১২০

ঐ ২৪

ধা-তন্তু = ৩৬০—২১৬ = ১৪৪

ঐ ২৪

নী-তন্তু = ৩৬০—১৯২ = ১৬৮

ঐ ১২

সা-তন্তু = ৩৬০—১৮০ = ১৮০

অতএব সা-পর্দ্দা-হইতে ৩৬০-এর ৪০ ভাগ অন্তরে রে-পর্দ্দা, রে-পর্দ্দা হইতে ৩২ ভাগ অন্তরে গা-পর্দ্দা, গা-পর্দ্দা-হইতে ১৮ ভাগ অন্তরে মা পর্দ্দা, মা-পর্দ্দা

হইতে ৩০ ভাগ অন্তরে পা-পর্দ্দা, পা-পর্দ্দা হইতে ২৪ ভাগ অন্তরে ধা-পর্দ্দা, ধা-পর্দ্দা হইতে ২৪ ভাগ অন্তরে নি-পর্দ্দা, নি-পর্দ্দা হইতে ১২ ভাগ অন্তরে স'া-পর্দ্দা। অতএব

৩৬০'এর		
স-রি-রেখা = ৪০	ভাগ	
রি-গ-রেখা = ৩২	ঐ	
গ-ম-রেখা = ১৮	ঐ	
		৯০
ম-প-রেখা = ৩০	ঐ	
প-ধ-রেখা = ২৪	ঐ	
ধ-নি-রেখা = ২৪	ঐ	
নি-স'-রেখা = ১২	ঐ	
		৯০
		১৮০

উপরে দেখিবে স হইতে ম পর্য্যন্ত ৯০, এবং ম হইতে স' পর্য্যন্ত ৯০, সুতরাং ম-পর্দা ঠিক স-স'-রেখার মধ্যস্থলে বসিতে চায়;—এই কারণেই চতুর্থ স্বরের নাম মধ্যম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পাশাপাশিস্থ স্বর-দ্বয়ের মধ্যে একমাত্রা ব্যবধানই বা কাহাকে বলে, অর্দ্ধ মাত্রা ব্যবধানই বা কাহাকে বলে, এখন তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে;—সা-অঙ্ক-৩৬০-এ তাহার ৮-মাংশ যোগ করিলে রে-অঙ্ক ৪০৫ হয়, রে-অঙ্ক-৪০৫-এ তাহার ৯-মাংশ যোগ করিলে গা-অঙ্ক-৪৫০ হয়; অতএব সা-রে-ব্যবধান (সা-রে রেখা-ব্যবধান নহে সা-রে স্বর-ব্যবধান) একের অষ্টমাংশ ও রে-গ-ব্যবধান, একের নবমাংশ; পূর্ব্বোক্ত ব্যবধান অপেক্ষা শেষোক্ত ব্যবধান ১-৭২ম (অর্থাৎ একের ৭২-ভাগের ১-ভাগ) কম,—এই যা' কেবল; সে কতটুকু? না—স্বর-ক্ষেত্রের অন্তর্গত সা-রে-রেখার উপরিস্থিত ক্ষেত্র যাহা দীর্ঘে রে-দাঁড়ি এবং প্রস্থে সা-রে তাহাকে যদি সা-রে স্তম্ভ বলা যায়, তবে সা-রে-স্তম্ভ হচ্চে সা-ক্ষেত্রের ৯মাংশ ও সা-রে-উ-ই ক্ষেত্র ঐ-একই-ক্ষেত্রের ৮ মাংশ, আর, সা-রে স্তম্ভের মস্তকের উপর যে একটি ছোট চৌকোণ ঘর দেখা যাইতেছে—কেবল সেই টুকু লইয়া উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু প্রভেদ;—সে ঘরটির আয়তন সা-ক্ষেত্রের ৭২ম অংশ মাত্র; নিতান্ত খাদের স্বর না হইলে ওটুকু প্রভেদ সামান্য কর্ণে আমল পায় না। সা-রে-ব্যবধান এবং রে-গ-ব্যবধান ঐরূপ প্রায়-একই হওয়াতে মোটামুটি হিসাবে উভয়েকেই একমাত্রা ব্যবধান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। গা-অঙ্ক-৪৫০-এ তাহার পঞ্চদশাংশ যোগ করিলে মা-অঙ্ক-৪৮০ হয়; সা-রে-ব্যবধান = ১-৮ম অর্থাৎ একের অষ্টমাংশ, রে-গ-ব্যবধান = ১-৯ম কিন্তু গ-ম-ব্যবধান = ১-১৫শ; অষ্টমাংশের ঠিক অর্দ্ধাংশ হচ্চে যোড়শাংশ,—যোড়শাংশ এবং পঞ্চদশাংশের মধ্যে প্রভেদ একের ২৪০ ভাগের এক ভাগ মাত্র,—সে কতটুকু? না—গা-মা-স্তম্ভ (যাহা দীর্ঘে মা-দাঁড়ি প্রস্থে গা-মা তাহা) সা-ক্ষেত্রের ১৬শ অংশ, আর গা-মা-স্তম্ভকে গা-দাঁড়ি পর্য্যন্ত দীর্ঘে বাড়া-

হইলে যে ক্ষেত্রটি উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ যাহা দীর্ঘে গা দাঁড়ি প্রস্থে গা-মা) তাহা সা-ক্ষেত্রের ১৫শ অংশ; গা-মা-স্তম্ভের মস্তকের উপর গা-দাড়ির উদ্বৃত্ত অংশ পর্য্যন্ত যে একটি ছোটো ঘর আঁকা যাইতে পারে কেবল সেই টুকু লইয়া উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু প্রভেদ; সে ঘরটি সা-ক্ষেত্রের ২৪০শ অংশ মাত্র; সুতরাং মোটামুটি হিসাবে পঞ্চদশাংশকে ষোড়শাংশ বলিয়া—অস্টমাংশের অর্দ্ধেক বলিয়া—ধরা যাইতে পারে; এইরূপ করিয়া পাওয়া যায় যে, সা-রে-ব্যবধান = একমাত্রা, রে-গ ব্যবধান = প্রায়-একমাত্রা, গ-ম ব্যবধান প্রায়-অর্দ্ধ-মাত্রা; কাজের সুবিধার অনুরোধে ঐ "প্রায়" কথাটা উঠাইয়া দিলে যেখানে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই সেখানে ও-কথাটা উল্লেখ করিবারই প্রয়োজন করে না। এখন বক্তব্য এই যে অষ্টকের ভিতর-কার পাশাপাশি-স্থিত স্বর দ্বয় মাত্রেরই মধ্যে—হয় একের অস্টমাংশ ব্যবধান, নয় একের নবমাংশ ব্যবধান, নয় একের পঞ্চদশাংশ ব্যবধান,—হয় একমাত্রা ব্যবধান, নয় প্রায়-একমাত্রা ব্যবধান, নয় প্রায়-অর্দ্ধমাত্রা ব্যবধান,—ইহার ন্যূনাধিক নহে;—যথা—

সা-রে-ব্যবধান = এক-মাত্রা, রে-গ-ব্যবধান = প্রায় একমাত্রা, গ-ম ব্যবধান = প্রায় অর্দ্ধমাত্রা, ম-প-ব্যবধান = এক মাত্রা (কেন না ম-অঙ্ক ৪৮০তে তাহার অষ্টমাংশ যোগ করিলেই প-অঙ্ক-৫৪০ হয়), প-ধ-ব্যবধান = প্রায়-একমাত্রা (কেননা প-অঙ্ক-৫৪০এ তাহার নবমাংশ যোগ করিলেই ধা-অঙ্ক-৬০০ হয়), ধা-নি-ব্যবধান = এক-মাত্রা (কেননা ধা-অঙ্ক ৬০০'এ তাহার অষ্টমাংশ যোগ করিলেই নি-অঙ্ক-৬৭৫ হয়), নি-সা-ব্যবধান = প্রায় অর্দ্ধমাত্রা (কেননা নি-অঙ্ক ৬৭৫এ তাহার পঞ্চদশাংশ যোগ করিলেই সা-অঙ্ক-২ হয়)।

যে কোন স্বর হউক না কেন—(১) তাহাতে যদি তাহার ১-৮ম যোগ করা যায়, অথবা যাহা একই কথা—তাহাকে যদি ৯-৮ম দিয়া গুণ করা যায় তবে তাহাকে একমাত্রা উচ্চে উঠানো হয়, (২) তাহাতে যদি তাহার ১-৯ম যোগ করা যায় কিংবা—যাহা একই কথা—তাহাকে যদি ১০-৯ম দিয়া গুণ করা যায় তবে তাহাকে প্রায়-একমাত্রা-উচ্চে উঠানো হয়, আর (৩) যদি তাহাতে তাহার ১-১৫ম যোগ করা যায় কিংবা তাহাকে ১৬-১৫শ দিয়া গুণ করা যায় তবে তাহাকে প্রায়-অর্দ্ধমাত্রা-উচ্চে উঠানো হয়। (১) সা-হইতে এক মাত্রা উচ্চ ব্যবধান (অর্থাৎ সা-রে, ম-প, এবং ধ-নি'র ন্যায় ব্যবধান), (২) প্রায়-এক মাত্রা-উচ্চ ব্যবধান (অর্থাৎ রে-গ এবং পা-ধা'র ন্যায় ব্যবধান), ও (৩) প্রায়-অর্দ্ধমাত্রা উচ্চ ব্যবধান (অর্থাৎ গ-ম এবং নি-সা'র ন্যায় ব্যবধান), সমস্তেরই পরিমাণাঙ্ক এবং পরিমাণ-ক্ষেত্র নিম্নে লতা-বদ্ধ হইল। স্বর-ক্ষেত্রে সা-ক্ষেত্রকে যদি সা'র উচ্চতা বলিয়া ধরা যায় তবে সা-স্বর হইতে

	পরিমাণাঙ্ক	পরিমাণ ক্ষেত্র
সা-রে-ব্যবধান =	১-৮ম =	সা-দাঁড়ি × সা-রে-রেখা

রে-গ ব্যবধান = ১-৯ম = রে-দাঁড়ি × রে-গা-রেখা
গ-ম ঐ = ১-১৫ম = গা-দাঁড়ি × গা-মা-রেখা
ম-প ঐ = ১-৮ম = মা-দাঁড়ি × মা-পা-রেখা
প-ধ- ঐ = ১-৯ম = পা-দাঁড়ি × পা-ধা-রেখা
ধ-নি ঐ = ১-৮ম = ধা-দাঁড়ি × ধা-নী-রেখা
নি-স1 ঐ = ১-১৫শ = নী-দাঁড়ি × নী-সা-রেখা

একেকে ৩৬০ অংশের **সমষ্টি** বলিয়া ধরিলে এবং সা-রে প্রভৃতি রেখার পরিবর্ত্তে তাহাদের পরিমাণাঙ্ক স্থাপন করিলে উপরের ঐ লতাটি নিম্নরূপ আকার ধারণ করে, যথা, সা-হইতে

	পরিমাণাঙ্ক	পরিমাণ-ক্ষেত্র	
সা-রে-ব্যবধান	= ৪৫	= সা-দাঁড়ি × ৪৫	
রে-গ ঐ	= ৪০	= রে-দাঁড়ি × ৪৫	} ৭৫
গ-ম ঐ	= ২৪	= গা-দাঁড়ি × ৩০	
ম-প ঐ	= ৪৫	= মা-দাঁড়ি × ৬০	
মা-ধ ঐ	= ৪০	= পা দাঁড়ি × ৬০	
ধা-নি ঐ	= ৪৫	= ধা-দাঁড়ি × ৭৫	
নি-স1 ঐ	= ২৪	= নি-দাঁড়ি × ৪৫	

ডা'ন দিক্কার অঙ্কগুলির উপর হইতে মধ্য পর্য্যন্ত যে তিনটি অঙ্ক (৪৫, ৭৫, ৬০) উত্তরোত্তর বসিয়াছে, নীচে হইতে মধ্য পর্য্যন্ত, সেই তিনটি অঙ্কই উত্তরোত্তর বসিয়াছে।

অঙ্ক-পাতের তিন প্রকার ক্রম যাহা প্রসিদ্ধ—কিনা (১) সমান্তর ক্রম (Arithmetical progression) অর্থাৎ প্রথম অঙ্ক হইতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়, তৃতীয় হইতে চতুর্থ-প্রভৃতি অঙ্ক পরম্পরা আনুপূর্ব্বিক সমান সমান অন্তরে স্থাপন করিবার ক্রম, যথা ২, ৪, ৬, ৮, ইত্যাদি; (২)সমগুণ ক্রম(Geometircal progression অর্থাৎ আনুপূর্ব্বিক সমান-সমান-গুণ অন্তরে অঙ্ক স্থাপন করিবার ক্রম, যথা ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি; (৩) সমান্তরাংশ ক্রম (Harmonical progression) অর্থাৎ উত্তরোত্তর একের সমান্তর অংশ পরম্পরা স্থাপন করিবার ক্রম, যথা, ১-২য়, ১-৪র্থ, ১-৬ষ্ঠ, ১-৮ম, অথবা যাহা একই কথা, ও-গুলিকে ২৪দিয়া গুণ করিয়া ২৪এর ১২, ৬, ৪, ৩, এই চারিটি অংশ পরম্পরা; কিংবা১, ১-২য়, ১-৩য়, ১-৪র্থ, অথবা যাহা একই কথা ১২র ১২, ৬, ৪, ৩, এই চারিটি অংশ পরম্পরা;—ঐ তিন প্রকার ক্রমের প্রত্যেকেই—হয় সুরের পরিমাণাঙ্ক, নয় তারের পরিমাণাঙ্ক, নয় উভয়ের পরিমাণাঙ্ক স্থলে নেত্র-পথে উপস্থিত হয়;—যথা,

প্রথমতঃ,—সা-হইতে সা পর্য্যন্ত সা, গা, পা, নি, সা, এই কয়টি সুর যাহার প্রথম তিনটি সুর স্বগ্রামের সম্বাদী সুর এবং যাহা সর্ব্বসমেত একগ্রাম উচ্চের বিবাদী সুর, ঐ কয়টী সুরের পরিমাণাঙ্ক গুলি ঠিক সমান্তর-ক্রমে বসিয়াছে, যথা,—

সুর		উচ্চতা
সা	=	৩৬০
ব্যবধান		৯০

গ·	=	৪৫০
ব্যবধান … … … …		৯০
প	=	৫৪০
ঐ … … … …		৯০
নি	=	৬৩০
ঐ … … … …		৯০
স'া	=	৭২০

দ্বিতীয়তঃ,—সা-হইতে স'া পর্য্যন্ত সা, মা, ধা, স'া এই কয়টি স্বর যাহা স্বগ্রামের অনুবাদী স্বর তাহারাও ঠিক সমান্তর-ক্রমে বসিয়াছে যথা,—

স্বর		উচ্চতা
সা	=	৩৬০
ব্যবধান … … …		১২০
ম	=	৪৮০
ঐ … … … …		১২০
ধা	=	৬০০
ঐ … … … …		১২০
স'া	=	৭২০

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সা-অঙ্ক হইতে স'া অঙ্ক পর্য্যন্ত সমান্তর ক্রমে ৫-টি অঙ্ক গ্রহণ করিলে, সর্ব্বসমেত এক-গ্রাম উচ্চের বিবাদী স্বরগুলির অঙ্ক এবং কোমল-নিখাদ-বাদে স্বগ্রামের সংবাদী স্বরগুলির অঙ্ক পাওয়া যায়, আর সা-অঙ্ক হইতে স'া-অঙ্ক পর্য্যন্ত সমান্তর-ক্রমে চারিটি অঙ্ক গ্রহণ করিলে স্ব-গ্রামের অনুবাদী স্বর পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, রে-হইতে নি-পর্য্যন্ত তিনটি স্বর সমান্তর-ক্রমে গ্রহণ করিলে স্ব-গ্রামের যে-তিনটি বিবাদী স্বর নিম্ন গ্রামের সংবাদী স্বর, সেই তিনটি পাওয়া যায় যথা,—

স্বর		উচ্চতা
রে	=	৪০৫
ব্যবধান … …		১৩৫
পা	=	৫৪০
ঐ … … …		১৩৫
নি	=	৬৭৫

পুনশ্চ যে-যে-স্বর-দ্বয়ের মধ্যে এক-এক সপ্তক ব্যবধান, সেই সেই স্বর-পরম্পরার উচ্চতা এবং তার উভয়েরই পরিমাণাঙ্ক উত্তরোত্তর সমগুণ-ক্রমে অবস্থিতি করে, যথা,—

১ম সা	=	৩৬০
গুণ … … … … …		২
২য় সা	=	৭২০
ঐ … … … … …		২
৩য় সা	=	১৪৪০
ঐ … … … … …		২
৪র্থ সা	=	২৮৮০

১ম-রে, ২য়-রে তথা ১ম-গা ২য়-গা প্রভৃতিও ঐরূপ দ্বিগুণ-দ্বিগুণ দূরে অবস্থিতি করে ইহা বলা বাহুল্য।

আর, যে-যে স্বরের উচ্চতার অঙ্ক পরম্পরা সমান্তর ক্রমে অবস্থিতি করে সেই সেই স্বরের তারের অঙ্ক-পরম্পরা সমান্তরাংশ ক্রমে অবস্থিতি করে; আনা গণ্ডা এড়াইবার জন্য তারের পরিমাণাঙ্ক গুলিকে ৭ দিয়া গুণ করিলে এইরূপ পাওয়া যায়,—

স্বর	তারের পরিমাণ
সা	= ২৫২০
ব্যবধান	৫০৪
গা	= ২০১৬
ঐ	৩৩৬
পা	= ১৬৮০
ঐ	২৪০
নি	= ১৪৪০
ঐ	১৮০
সা	= ১২৬০

সমান্তরাংশ রাশির বিশেষ একটি গুণ এই যে তাহার ভিতরকার কোন অঙ্ক হইতে যদি দ্বিতীয় ডিঙাইয়া তৃতীয় অঙ্ক গ্রহণ করা যায় তবে প্রথম অপেক্ষা তৃতীয় যতগুণ ছোটো বা বড়, প্রথম-দ্বিতীয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান অপেক্ষা দ্বিতীয়-তৃতীয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ঠিক ততগুণ ছোটো বা বড়; তাই উপরিস্থিত তারের অঙ্ক-রাশির মধ্যে প্রথম স্থানীয় অঙ্ক ২৫২০ অপেক্ষা তৃতীয় স্থানীয় অঙ্ক ১৬৮০ যতগুণ কম—প্রথম স্থানীয় ব্যবধান ৫০৪ অপেক্ষা দ্বিতীয় স্থানীয় ব্যবধান ৩৩৬ ঠিক ততগুণ কম; যথা—প্রথম-ব্যবধান-৫০৪ × ৫ = প্রথম অঙ্ক ২৫২০—কি না প্রথম ব্যবধান প্রথম অঙ্কের পঞ্চমাংশ, দ্বিতীয় ব্যবধান-৩৩৬ × ৫ = তৃতীয় অঙ্ক ১৬৮০—কি না দ্বিতীয় ব্যবধান তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চমাংশ; অতএব প্রথম অঙ্ক এবং তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে যতগুণ তারতম্য—প্রথম ব্যবধান এবং দ্বিতীয় ব্যবধানের মধ্যে ঠিক ততগুণ তারতম্য। তেমনি আবার দ্বিতীয় ব্যবধান ৩৩৬ × ৬ = দ্বিতীয় অঙ্ক ২০১৬, তৃতীয়-ব্যবধান ২৪০ × ৬ = চতুর্থ অঙ্ক ১৪৪০; অতএব দ্বিতীয় অঙ্ক এবং চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে যতগুণ তারতম্য—দ্বিতীয় ব্যবধান এবং তৃতীয় ব্যবধানের মধ্যে ঠিক ততগুণ তারতম্য। সা, মা, ধা, সা, এই কয়টি অনুবাদী স্বরের তথা রে, পা, নি, এই-তিনটি বিবাদী স্বরের তারের পরিমাণাঙ্ক-গুলির মধ্যেও ঐরূপ সমান্তরাংশ ক্রম দেখিতে পাওয়া যাইবে ইহা বলা বাহুল্য।

ক্রমশঃ

মুখ ও মনোভাব।

অনসূয়া রাজা দুষ্মন্তসম্বন্ধে প্রিয়ম্বদার সংশয় দূর করিবার জন্য বলিল, "এত্থ দাব বীসত্থা হোহি, ণত্তাদিসা আকিদি বিসেসা গুণবিরহিণো হোন্তি।" (এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তাদৃশ আকৃতি গুণহীন হয় না); আকৃতির অর্থ মুখাদির গঠন বুঝিতে হইবেক। মানুষের অবয়বের দৈর্ঘ্যপ্রস্ত হইতে আমরা তাহার মনোগত ভাবের কতকটা আভাস পাইয়া থাকি। অবয়বের গঠন

এবং অবয়ব-মধ্যস্থিত চিহ্নসকল ধরিয়া সমস্ত মনোবৃত্তি কি করিয়া পাঠ করিতে হয় তাহা আমরা জন-বিদ্যা হইতে পাই। মুখের সহিত মনোভাবের সম্বন্ধ নির্ণয় করা জন-বিদ্যার একটি শাখা মাত্র। * মানুষের মুখাকৃতির দুই প্রকার ভাব হইতে আমরা তাহাদের মনোবৃত্তি পাঠ করিতে পারি, একটি স্থায়ীভাব—অপরটি ক্ষণস্থায়ী ভাব। মুখে মানুষের মানসিক ভাব যেরূপ স্পষ্ট প্রতিফলিত হয় তাহা শরীরের আর কোন অঙ্গে হইতেই পারে না। কৃষক তাহার শস্যের শীষ দেখিবামাত্র যেমন তাহার ফসলের ভাবি-বৃত্তান্ত অনায়াসে গণনা করিয়া বলিতে পারে, তেমনি মানুষের মুখ দেখিলেই জন-বিদ্যা-বিৎ তাহার মনের ভাব বলিতে পারেন। য়ুরোপীয় কয়েকটি জন-বেত্তা মুখের স্থায়ী গঠন-ভঙ্গী হইতে যে মনোগত ভাব অনুমান করা যাইতে পারে তাহা স্পষ্ট অস্বীকার করেন। Herbert Spencer তাঁহাদের মত এই বলিয়া খণ্ডন করিতেছেন যে মুখের ক্ষণস্থায়ী পরিবর্ত্তন মানসিক ভাবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হইয়াই থাকে, এবং সেই পরিবর্ত্তন ক্রমাগত হইতে থাকিলে তাহা মুখে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া যায়; এমন কি মুখগঠনের সেই পরিবর্ত্তন বংশপরম্পরায়ও প্রবাহিত হইয়া থাকে। এ কথা যে কতদূর সত্য তাহা বলা বাহুল্য। দৃষ্টান্ত দেখ, একটি কোপন-স্বভাব লোকের মূর্ত্তি দেখিলেই আমরা তাহার প্রকৃতি জানিতে পারি। তাহার কারণ কি? ক্রোধ বৃত্তিকে সে এত প্রশ্রয় দিয়াছে যে, ক্রোধ হইলে মুখের যে সমস্ত মাংসপেশী বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হয়, সেই সকল মাংসপেশী পুনঃ পুনঃ বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হওয়াতে মুখ ক্রমে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধব্যঞ্জক হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা প্রফুল্ল-চিত্তে দিন যাপন করে, তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্ত এবং কপোলের মাংসপেশী এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তাহা হইতে তাহাদের মনের হাস্যভাব ফুটিয়া বাহির হয়। মুখের প্রশান্তভাব হইতে আমরা মনের প্রশান্ত ভাব অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারি। উক্ত জনবেত্তারা মুখাকৃতির স্থায়ী পরিবর্ত্তনের সহিত মনোভাবের সম্বন্ধ যদিও স্বীকার করেন না, তথাপি মানসিক ভাবের উদয়ে মুখের যে একটি ক্ষণিক পরিবর্ত্তন হয় তাহা তাঁহারা সত্য বলিয়া মানেন। সর্ব্বপ্রকৃতিদর্শী মহাকবি সেক্ষপীর একস্থলে

"I saw his heart in his face."—

এই কথা বলিয়া মুখে যে ক্ষণকালের নিমিত্ত হৃদয় প্রতিভাত হয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন। মুখের সেই ক্ষণ-স্থায়ী পরিবর্ত্তনের বিষয় লেখাই আমাদের উদ্দেশ্য।

Herbert Spencer বলেন যে স্নায়বীয় শক্তির চালনা-বশতঃ আমাদের মনোভাবের উৎপত্তি হয়। সেই শক্তির উত্তেজনা হইলে তাহা শরীরের কোন না কোন স্থানকে তদনুরূপ উত্তেজিত করে। কোন একটি

* ভারতী, ২য় খণ্ড, ২১৯ এবং ২২০ পৃষ্ঠা দেখিলে জানা যাইবে।

আবাহক স্নায়ু যদি বিচলিত হয় তবে সেই ক্রিয়াটি কতকগুলি স্নায়ু-কোষ বাহিয়া অবশেষে তাহা মস্তিষ্কে এবং মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে বিচরণ করে;—তথা হইতে ক্রমে ক্রমে শরীরের কতকগুলি নির্ব্বাহক স্নায়ুকে বিচলিত করিলে করিতে পারে। বাহ্য বস্তুর সন্নিকর্ষে স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের সহযোগে আমাদের মনে একটা চেতনার উদ্রেক হয়; এবং সেই চেতনা হইতে আমাদের মনোবৃত্তি-সকলের কার্য্যারম্ভ হয়। এক দল স্নায়ুর উত্তেজনা হইলে যেমন উত্তরোত্তর-ক্রমে অন্যান্য স্নায়ু উত্তেজিত হয়, সেইরূপ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একটি মানসিক ভাব কিম্বা বৃত্তি হইতে উত্তরোত্তর আরও নানা ভাব বা বৃত্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। * আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া মানসিক উত্তেজনা-সমূহ স্নায়ু বাহিয়া অগ্রে হৃদয়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে; এবং সেই কারণে হৃদয়ের রক্তের চলাচল বৃদ্ধি হয়। হৃদয় আমাদের ইচ্ছার বশীভূত নয় বলিয়া অভ্যাস-সংস্কার (Habitual association) গুণে তাহা অতি সহজেই বিচলিত হইয়া পড়ে। ক্রোধ কিম্বা অন্য কোন বৃত্তি প্রবল হইলে লোকে স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা ইচ্ছাপূর্ব্বক দমন করিতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের গতির উপর তাহার কোন প্রভুত্ব থাকে না। হৃদয়ের কার্য্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। ক্ষুধাতুর ব্যক্তি সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য দেখিলে মুখের ভাবভঙ্গী দমন করিয়া যদিও আপনার ক্ষুধা অন্যের নিকট গুপ্ত রাখিতে পারে, কিন্তু রসনা হইতে যে জল বাহির

* সম-বেদনা-গুণে আমাদের মনে এক প্রকার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। কোন একটি উজ্জ্বল হাস্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে সেই হাস্যভাবের অন্ততঃ কতকটা আমাদেরও মনে উদয় হয়। কোন একটি লোকের অবস্থাবিশেষ দেখিয়া আপনাকে সেই অবস্থাপন্ন কল্পনা করিয়া আমার মনে যে একটি ভাবের উদয় হয় তাহা কেবল সম-বেদনা-গুণে ঘটিয়া থাকে। যদি আমি কোন একটি শোকাতুর লোককে কাঁদিতে দেখি তাহা হইলে তাহার কষ্ট হইতে আমার মনে এতদূর কষ্ট হইতে পারে যে আমাকেও অশ্রুবর্ষণ করিতে হয়। সেই সময় তাহার মুখের ভাবভঙ্গী যেরূপ হইবে আমারও, ততটা না হউক, কষ্টহেতু সেইরূপ কতকটা হইবার সম্ভাবনা। আমোদের পক্ষেও সেইরূপ; আমোদ হইতে যে হাস্য উত্থিত হয় তাহা সম-বেদনা-গুণে একটি ঘরে যতগুলি লোক উপস্থিত থাকে তাহাদের প্রত্যেকের দ্বারা প্রতিধ্বনিত না হইয়া নিষ্কৃতি পায় না। আমাদের কতকগুলি রোগ যেমন "ছোঁয়াচে," সেইরূপ আমাদের সমস্ত মানসিক ভাব ও বৃত্তি এক প্রকার ছোঁয়াচে; কেননা আমাদের প্রবৃত্তি হইতে অপর লোকের সেই একইরূপ প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইতে পারে। ফরাসীদেশীয় কোন চিকিৎসক একটি গল্প বলেন যে একটি মঠ-বাসিনী (nun) এক সময় খেয়াল-বশতঃ একবার বেড়াল-ডাক ডাকিয়াছিল, তাহার পর হইতে অন্যান্য সমস্ত মঠ-বাসিনী প্রত্যহ সেই সময় একবার করিয়া বেড়াল-ডাক ডাকিত। ইহা যে সম-বেদনা-মূলক অনুকরণগুণে হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হইবে তাহা-সে হাজার চেষ্টা করুক-না কেন্—কোন প্রকারেই তাহা দমন করিতে কৃতকার্য্য হইবে না; সেইরূপ উত্তেজিত মনোভাবের দ্বারা অন্যান্য মাংসপেশীর কার্য্য যদিও না হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের কার্য্য যে দ্রুত হইবেই তাহা আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাই। হৃদয়ের সহিত দেহাভ্যন্তরস্থ আর একটি যন্ত্রের যথেষ্ট যোগ আছে, তাহাকে আমরা "ফুস্‌ফুস" বলিয়া থাকি। হৃদয় এবং ফুস্‌ফুস্ উভয়ে পরস্পর স্নায়ু দ্বারা যোজিত, এবং তাহাদের কার্য্য একত্রে হইয়া থাকে। যে সমস্ত স্নায়ু হৃদয় এবং ফুস্‌ফুস্ বেস্টন করিয়া রহিয়াছে তাহারাই আবার আমাদের মুখে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া স্থিতি করিতেছে। ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের গতির তারতম্য আমাদের মুখের ভাবকে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকে। যদি মনের কোন বৃত্তি প্রবল হয় তাহা হইলে তাহার সঙ্গে হৃদয় বিচলিত হয়, এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসের যথেস্ট তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। একটি ভয় প্রাপ্ত মনুষ্যের কিরূপ অবস্থা হয় দেখা যাউক। তাহার চক্ষু বিস্তৃত হয়, ভ্রূযুগল উন্নত হয়, তাছাড়া তাহার হৃদয়ের গতি এতদূর বৃদ্ধি হয় যে তাহা আমরা বাহির হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাই। ভালরূপ নিশ্বাস লইতে পারে না। অনেক সময়ঁ খুব সুস্থ লোকেও যদি বেশী ভয় পায় ত এমন কি মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাহার কারণ আর কিছু নয়, শুদ্ধ হৃদয়ের চলাচল বৃদ্ধি এবং ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের বিকলতা। একটি শোকার্ত্ত স্ত্রীলোককে কিরূপে চিত্রিত করা যাইতে পারে। তাহার মনের হীনাবস্থা হইতে তাহার মুখের যথেষ্ট পরিবর্ত্তণ হইয়া থাকে, মুখ বিবর্ণ এবং দৃষ্টি অধোগামী হয়; ওষ্ঠ কাঁপিতে থাকে;—এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহার হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে যে এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হয়, তাহাতে কি তাহার যাতনা আরো অধিকতররূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় না?

আমাদের শরীর সমস্তই মাংসপেশী দ্বারা বেষ্টিত; এবং সেই সকল মাংসপেশী অস্থির সহিত সংশ্লিস্ট। আমাদের মুখে যে সকল মাংসপেশী আছে তাহারা অত্যন্ত কোমল, এবং তাহাদেব সাময়িক বিস্তার ও সঙ্কোচই আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায়। মুখের মাংসপেশীর মধ্যে কতকগুলির কার্য্য আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক দমন করিতে পারি, কিন্তু আর অবশিষ্ট কতকগুলির দমনের উপর আমাদের খুব অল্পই ক্ষমতা আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মুখে স্নায়ু শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া স্থিতি করিতেছে, সেই সকল স্নায়ু আবার মুখের মাংসপেশীতে বিস্তৃত রহিয়াছে। ক্রোধের উদ্রেক হইলে আমাদের সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কাঁপিয়া থাকে, ক্রন্দনের সময় আমাদের ওষ্ঠ প্রান্তস্থিত মাংসপেশী কাঁপিতে থাকে—এগুলি কেবল স্নায়ুর উত্তেজিত অবস্থা হইতে ঘটিয়া থাকে। মনোভাবে যে যে স্নায়ু উত্তেজিত হয় সেই সেই স্নায়ু আবার কতকগুলি মাং-

সপেশীতে বিস্তৃত রহিয়াছে; সেই মাংসপেশীগুলির বিস্তৃতি ও সঙ্কোচ মনোভাবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদিত হইয়া থাকে। নবজাত সন্তানের ক্রীড়া দেখিয়া মাতার মনে যে একটি অনির্ব্বচনীয় আমোদ হয় তাহা আমরা মাতার কপোল এবং ওষ্ঠাধর প্রান্তস্থিত মাংসপেশীর অতি অল্পমাত্রও অবস্থান্তর হইতে অনুমান করিয়া লইতে পারি। পত্রের ভাল মন্দ খবর আমরা পাঠকের মুখের ভাব হইতে আঁচিয়া লইতে পারি। যদি খবর মন্দ হয় তাহা হইলে পাঠকের অজ্ঞাতভাবে পড়িবার সময়, হয় ওষ্ঠের দুই প্রকার কিছু নামিয়া পড়ে, নয় তাহার ভ্রূযুগল কিছু উন্নত হয়, কিম্বা উভয় লক্ষণই যে একত্রে হইতে পারে না এমন নহে। আর পাঠকের ওষ্ঠপ্রান্তের হাস্যরেখা হইতে আমরা পত্রের সুসমাচার অনুমান করিয়া লইতে পারি।

চক্ষু, ভ্রূ, ওষ্ঠাধর, নাসিকা, কপোল, এবং ললাটের অবস্থান্তর হইতে আমরা মনের অবস্থান্তর বুঝিতে পারি। Sir Charles Bell বলেন যে মুখের সমস্ত মাংসপেশী হইতে ওষ্ঠাধরপ্রান্ত এবং ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী দুই কোনের মাংসপেশী মনের ভাব অতি জাজ্বল্যরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। মুখের মধ্যে উক্ত দুইস্থল অতিশয় চঞ্চল; এবং ঐ দুইস্থলে মুখের সমস্ত মাংসপেশী কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে।* Darwinও সে কথা অস্বীকার করেন না।

সমস্ত মনোবৃত্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; একটি অপ্রীতিজনক, অপরটি প্রীতিজনক। যে সকল মানসিক বৃত্তির উত্তেজনায় আমাদের নিজের মনে এক প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং অপর লোকের নিকটেও যাহা সুখকর বলিয়া বোধ হয় না, তাহাদিগকেই আমরা অপ্রীতিজনক মনোবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি; যথা, ক্রোধ, ভয়, বিস্ময়, ঘৃণা, অহঙ্কার, কষ্ট। মনোমধ্যে এগুলির উদয়ে মুখে যে ভাব প্রকাশিত হয় তাহাও অত্যন্ত অপ্রীতিকর। প্রীতিজনক মনোবৃত্তির উদয়ে আমাদের নিজের মনে কোন কষ্ট ত হইতেই পারে না, এবং অপরের নিকট তাহা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়। যেমন, উল্লাসভাব, লজ্জাভাব, যোগভাব। এ গুলি হইতে মুখের একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাউক এই সমস্ত অপ্রীতিজনক এবং প্রীতিজনক মনোবৃত্তি হইতে মুখে কি কি ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ হইতে পারে।

ক্রোধ।—মানসিক সমস্ত বৃত্তি অপেক্ষা ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল। কোন লোক আমার সহিত কল্পিত বা বাস্তবিক মন্দ ব্যবহার করাতে অথবা আমার কোন কল্পিত বা বাস্তবিক অনিষ্ট করাতে আমার মনে যে একটি প্রবল ভাবের উদয় হয় তাহাকেই ক্রোধ বলা যাইতে পারে। প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা ক্রোধের পরিণাম। দুর্ব্বাসা

* Darwin প্রণীত "Expression of the Emotions"-এর Introduction-এর প্রথম চিত্রটি দেখিলে জানিতে পারা যায়।

শকুন্তলাকে যে অভিশাপ দিয়াছিল তাহা প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা হইতে সংঘটিত হইয়াছিল। সেই প্রতিহিংসার মূলস্থান ক্রোধ। ক্রোধ হইলে মানুষের মুখের এক প্রকার বিকট ভাব হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে; যেমন, কখন বা মুষ্টিবদ্ধ হয়, কখন বা হস্ত ঊর্দ্ধে উঠে ও দৃঢ় হয়, এবং শরীরের উপরি ঊর্দ্ধ ভাগ অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়ে। মহাকবি সেক্ষপীর ক্রোধ হইলে মুখের ভাব কিরূপ হয় তাহা অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা সে স্থল অনুবাদ করিয়া দিলাম—

"কিন্তু যবে সমরের ভীষণ নিনাদ
পশিবে শ্রবণে, ভাবি শার্দ্দূলের ভাব
বিগ্রহে বিকট মূর্ত্তি করিবে ধারণ।
লৌহনিভ করি সব শিরা উপশিরা,
আরক্ত করিবে মুখ রুধির উচ্ছ্বাসে—
... ...
ঝলসিত হবে চক্ষে প্রচণ্ড অনল।
... ...
কড়মড়ি দন্তে দন্তে, বিস্ফারিয়া ঘোর
যুগল নাসিকা-রন্ধ্র, বদ্ধ করি শ্বাস,
পূর্ণমাত্রে প্রজ্জ্বলিবে হৃদয়ের তেজ।" *

ক্রোধান্ধ হইলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত চঞ্চল হয়; চক্ষু বিস্তৃত হয় ও ঘুরিতে থাকে, এবং বোধ হয় যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চক্ষু হইতে নির্গত হইতেছে। ভ্রূযুগল উন্নত এবং সঙ্কুচিত হওয়ায় ললাট প্রদেশ তরঙ্গিত হইয়া পড়ে। নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠে। ওষ্ঠাধরের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায়; কখন কখন ওষ্ঠ অধরের উপরে গিয়া পড়ে; সময়ে সময়ে ওষ্ঠ এবং অধর এতদূর বিভিন্ন হইয়া পড়ে যে বদ্ধদন্তের কতকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়, কখন বা দন্ত দ্বারা আমরা ওষ্ঠ কামড়াইয়া ধরি; ওষ্ঠাধরের এরূপ পরিবর্ত্তন আমরা সচরাচর ক্রোধান্ধ নীচশ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে দেখিয়া থাকি। সমস্ত মুখমণ্ডল সময়ে সময়ে রক্তশূন্য (pale) হয়; কখন কখন স্ফীত ও রক্তবর্ণ হইয়া পড়ে; ক্রোধের উদয় হইলে মুখ যে সর্ব্বদা বিবর্ণ হয় তাহা অতি সুবিদিত কথা। সে সময় বাক্য বদ্ধদন্ত হইতে জোরে নির্গত হইতে থাকে। হৃদয়ের চলাচল এতদূর পর্য্যন্তও বৃদ্ধি হইয়া থাকে যে অনেক চিকিৎসকেরা ক্রোধান্ধ রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছেন। মস্তিষ্ক অত্যন্ত উত্তেজিত হয় বলিয়া আমাদের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয় এবং সমস্ত মাংসপেশী কাঁপিতে থাকে। মাংসপেশী কাঁপিতে থাকে বলিয়া আমাদের কথা তখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া বাহির হইতে থাকে; এবং সেই জন্য সময়ে সময়ে ওষ্ঠাধরপ্রান্তে ফেন দেখিতে পাওয়া যায়। শকুন্তলাকে অভিশাপ দিবার সময় দুর্ব্বাসার "জ্বলজ্জটা কলাপস্য ভ্রূকুটীকুটিলংমুখং" যদি কোন চিত্রকর অঙ্কিত করিতে চাহেন তাহা হইলে উপরি উক্ত ভাবগুলি যেন ঠিক মুখে বসাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, যে-সে নয়,

* King Henry V. Act 111. Sc. I.

সেই দুর্ব্বাসার ক্রোধও প্রকাশ পাইতে পারিবে।

আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি যে শিশুরা রাগান্বিত হইলে ভূমিতে গড়াগড়ি দেয়; কামড়াইবার চেষ্টা করে; এবং সময়ে সময়ে নখ দ্বারা আঁচড়াইতে যায়। তাহাদের মনে কোন বৃত্তি প্রবল হইলে তাহারা ক্রন্দন করিয়া থাকে; ক্রোধে, অসন্তোষে, ভয়ে শিশুরা যে সর্ব্বদাই কাঁদিয়া উঠে তাহা কাহারও নিকট অবিদিত নাই।

অল্প অনিষ্ট, অল্পমাত্র মন্দব্যবহার হইতে আমাদের মনে এক প্রকার ভাবের উদ্রেক হয়; সেই ভাব যদিও ক্রোধের সহিত খুব নিকট সম্বন্ধ বিশিষ্ট কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক নরম প্রকৃতির। সেইটুকু অনিষ্ট এবং কুব্যবহার হইতে আমরা চটিয়া উঠি। সেই ভাব হৃদয়কে অতি অল্পমাত্র বিচলিত করিয়া তিরোহিত হয়। চটিয়া উঠিলে আমাদের মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং চক্ষু উজ্জ্বল হয়; ক্রোধ হইলে যে সকল মাংসপেশী কার্য্য আরম্ভ করে তাহারা তখন ঈষৎ উত্তেজিত হয়মাত্র; বায়ুর গতিবিধির নিমিত্ত নাসিকার দুই রন্ধ্র স্ফীত হয়; ওষ্ঠাধর প্রায়ই যুক্ত থাকে; এবং ভ্রূকুটি স্বাভাবিক।

অসন্তোষ ভাবে ক্রোধের একটু আভাস থাকে মাত্র। মন্দ ব্যবহার হইতেই আমরা অসন্তুষ্ট হই। অসন্তোষে হৃদয়ের কিম্বা ফুস্‌ফুসের কার্য্য হয়ই না; তবে ভ্রূকুঞ্চিত হয় এবং চক্ষু ঈষৎ উজ্জ্বল হয় মাত্র।

ভয়।—অকস্মাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহাকেই ভয় বলে। মানসিক সমস্ত বৃত্তি অপেক্ষা ভয় হৃদয়ের উপর অত্যন্ত প্রভুত্ব স্থাপন করে, ভয়ে হৃদয়ের মধ্যে একরূপ যাতনা হইয়া থাকে। আমরা যে সকল মন্দকার্য্য করিয়া থাকি তাহার জন্য শাস্তি পাইতে হইবে ভাবিয়া যে ভয়—সে এক প্রকারের; সে ভয় ভাবনার সহিত জড়িত। উপস্থিত ভয় আবার একশ্রেণীস্থ। উপস্থিত ভয়ে আমাদের মুখাকৃতির যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য হয়। মনে কর আমার কোন শত্রুর ভয়ে আমি দেশ পরিত্যাগ করিয়া একটি বিজন প্রদেশে বাস করিতেছি। কিছু দিন পরে সেই শত্রু আমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই বিজনে গিয়া উপস্থিত হইল, হটাৎ আমার সহিত তাহার একদিন সাক্ষাৎ হইল,—তখন আমার কিরূপ মুখের ভাব হইতে পারে? এরূপ অবস্থায় আমরা প্রায়ই বিকট চিৎকার করিয়া থাকি, এবং পলায়ন তৎপর হইয়া আশ্রয়ের জন্য অত্যন্ত উতলা হইয়া পড়ি, সময়ে সময়ে আমাদের গমনের ক্ষমতাও থাকে না; আমরা দুএক পদ হটিয়া সেই ভয়োৎপাদক বস্তুর প্রতি বিস্তৃত এবং স্থির নেত্রে চাহিয়া থাকি; ভ্রূযুগল যতদূর উচ্চ হইবার হইয়া পড়ে; ললাট প্রদেশ ঈষৎ তরঙ্গিত হয়; মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়; এবং মস্তকের চুল ঊর্দ্ধগামী হইয়া পড়ে। কপোলের এবং ওষ্ঠপ্রান্তের মাংসপেশীর কম্পনই ভয়ের প্রধান লক্ষণ। ক্রোধের ন্যায় ভয়ও সর্ব্বা-

ঙ্গের মাংসপেশীকে অত্যন্ত কাঁপাইয়া তুলে। জিহ্বা, হৃদয় ও শ্বাসনালী কাঁপিতে থাকে এবং শুকাইয়া যায় বলিয়া সময়ে সময়ে আমাদের বাক্‌রোধও হয়। ওষ্ঠাধর বিভিন্ন হইয়া পড়ে; Bell বলেন যে ওষ্ঠাধরের বিভিন্নতার আতিশর্য্যহেতু নিম্নপাটীর দন্ত এবং জিহ্বার অগ্রভাগও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইল যে এক প্রকারের ভয় আছে যাহা ভাবনার সহিত জড়িত, তাহাকে আমরা "আশঙ্কা" বলিতে পারি। উপরি উক্ত ভয়ে আমাদের মুখের যেমন একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, আশঙ্কার পক্ষে তাহা নহে। মনে কোন ভাবনা কিম্বা যাতনা উপস্থিত হইলে মুখে যে যে লক্ষণ লক্ষিত হয়, আশঙ্কাতে ও অনেকটা তাহাই হয়। এই অবস্থায় মুখ বিবর্ণ হয়; চক্ষের পাতা এবং ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী দুই প্রান্ত নামিয়া পড়ে; ওষ্ঠপ্রান্ত কিছু নিম্ন হয়; হৃদয়ের গতি এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হইতে থাকে।

"ত্রাস" আবার একটি-স্বতন্ত্র প্রকারের ভয়। চকিতের মত আমাদের মনে যে একটি ভয় উদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হয় তাহাকে আমবা ত্রাস বলিতে পারি। বিপদ জনক ঘটনা হইতে তাহার উৎপত্তি নয়। এরূপ অবস্থায় হৃদয় বিচলিত হয়; চক্ষু বিস্তৃত হয়; ওষ্ঠ ও অধর ভিন্ন হইয়া পড়ে এবং মুখ রক্তবর্ণ হয়।

মর্য্যাদাপন্ন কিম্বা গুরুলোকের প্রতি বিনয় এবং ভক্তি মিশ্রিত যে ভয় তাহাকে "সম্ভ্রম" বলা যাইতে পারে। এ অবস্থায় আমাদের হৃদয় অল্পমাত্র বিচলিত হয়, এবং চক্ষের দুই পাতা ও দৃষ্টি অধোগামী হয়; মুখ এবং ঘাড় নত হয়। ইহা হইতেই প্রণামের উৎপত্তি।

বিস্ময় —অনাশ্বাসিত বা অননুভূতপূর্ব্ব ঘটনার প্রত্যক্ষে আমাদের মনে বিস্ময় ভাবের উদয় হয়। সহজ কথায় বিস্ময়কে আমরা "চমক্ লাগা" বলিয়া থাকি। বিস্ময়-জনক ভাব আমাদের মনকে অতি অল্পক্ষণ অধিকার করিয়া থাকে। সে ভাব আমাদের মনে এত শীঘ্র শীঘ্র উদয় হয় যে সে ঘটনার উৎপত্তি ও পরিণাম জানিতে অবসর পাই না; যখন সেই অজানিত ঘটনাটিকে স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া জানিতে পারি তখন বিস্ময় আমাদের মন হইতে দূরীভূত হয়। বালকেরা অধিকাংশ সময় বিস্মিত হইয়া থাকে, কেননা তাহাদের নিকট অনেক ঘটনা অজানিত, এবং সকল ঘটনার উৎপত্তি বিষয়ে তাহারা অনভিজ্ঞ। যত তাহাদের বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়িতে থাকে ততই অবিদিত ঘটনার উৎপত্তি তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং তাহার পরিণাম জানিতে তাহাদের খুব অল্পই সময় লাগে। বালকেরা যখন কোন গল্প শোনে তখন তাহা তাহাদের নিকট অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হয়; গল্পের স্রোতের সঙ্গে তাহার মন ও মুখের ভাব বিচলিত হয়। বিস্ময়-জনক ভাব হইলে আমাদের ওষ্ঠাধর বিভিন্ন হয়, এবং চক্ষু বিস্তৃত হয়। হটাৎ যত ঘটনা হয়

তাহাতে আমাদের ভ্রূযুগল যে উঠিয়া পড়ে তাহা সকলেই বিদিত আছেন। হৃদয় মুহূর্ত্ত কালের জন্য অত্যন্ত বিচলিত হয় এবং তখন নাসিকা অপেক্ষা মুখাভ্যন্তর হইতে শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুতবেগে বহিতে থাকে। অনেক সময় ভয়ের অগ্রে বিস্ময় হইয়া থাকে।

আমরা সচরাচর "আশ্চর্য্য" কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকি। মনুষ্যের আয়ত্তীভূত অথচ অদ্ভুত যে সকল ঘটনা আমরা দেখিয়া থাকি তাহাতেই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই। "আশ্চর্য্য" কথার উৎপত্তি "আঃ" "চর্য্য" হইতে, অর্থ—"আঃ কি ঘটনা।" ঈষৎ বিস্ময় এবং আনন্দ এই দুই ভাবে মিশ্রিত যে ভাব তাহাকেই আশ্চর্য্য বলা যাইতে পারে। আশ্চর্য্যভাব আমাদের হৃদয়ের গতিকে বিচলিত করে না; তবে চক্ষু বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল হয়, ভ্রূযুগল উন্নত হয়, এবং ওষ্ঠপ্রান্তে অল্প হাসির রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঘৃণা।—রুচির অসঙ্গত দ্রব্য হইতে ঘৃণাভাবের আদিম উৎপত্তি। যে সকল দ্রব্য আমাদের ইন্দ্রিয়ের অসুখকর সেই সেই দ্রব্যের উপর আমাদের ঘৃণা। দুর্গন্ধ আমাদের নিকট অত্যন্ত অসুখকর; বিস্বাদ দ্রব্য আমরা আহার করিতে চাহি না; কতকগুলি জঘন্য দ্রব্য আমরা চক্ষে দেখিতে পারি না; আর এমন কতকগুলি দ্রব্যও আছে যাহা স্পর্শ করিলে আমাদের ঘৃণা জন্মে *। কোন অসুখকর দ্রব্যের সংস্পর্শে মুখমধ্যস্থিত যে ইন্দ্রিয়টি সুউপমস্তিষ্ক সহযোগে আমাদের মনে ঘৃণাভাব উত্তেজনা করিয়া দেয়, ঘৃণার উদয়ে মুখের সেই ইন্দ্রিয়টির মাংসপেশী অধিকতর বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হয়। যেমন, দুর্গন্ধ ঘ্রাণে আমাদের নাসিকার চতুর্দ্দিক অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়; বিস্বাদ দ্রব্য গ্রহণে আমাদের ওষ্ঠাধর এতদূর বিভিন্ন এবং তাহাদের উভয় পার্শ্ব এতদূর সঙ্কুচিত হয় যে আমাদের সম্মুখের উভয়পাটির দন্ত এবং জিহ্বার অগ্রভাগ বাহির হইয়া পড়ে; নয়নের অপ্রীতিকর কোন দ্রব্যদর্শনে আমরা ভ্রূযুগলের এবং কপোলের মাংসপেশীগুলিকে এতদূর সঙ্কুচিত করি যে আমাদের চক্ষু প্রায় মুদ্রিত হইয়া যায়। তাই বলিয়া এ বলা যাইতে পারে না যে সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়টির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মুখের আর কোন ইন্দ্রিয় বিচলিত হয় না; যেমন, দুর্গন্ধ ঘ্রাণে ওষ্ঠাধরের এবং চক্ষু ও ভ্রূযুগলের পরিবর্ত্তন যে লক্ষিত হয় না এমন নহে, তবে নাসিকার সঙ্কুচন সর্ব্বাপেক্ষা বেশি হইবে, ইত্যাদি। সাধারণতঃ, ঘৃণার উদ্রেক হইলে ওষ্ঠাধর অত্যন্ত বিভিন্ন ও সঙ্কুচিত হয়; নাসিকার দুইরন্ধ্র উচ্চ হইয়া উঠে ও তাহার পার্শ্বস্থিত মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়; চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত এবং ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়। Darwin বলেন

*Darwinএ ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়; তিনি বলেন যে কোন একটি অসভ্য লোক তাঁহার খাদ্য দ্রব্যের শীতলত্ব এবং কোমলত্ব অনুভব করিয়া সম্পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল।

ঙ্গের মানে করিবার সময় আমাদের মুখ জিহ্বারূপ বিকৃত হয়, ঘৃণার উদ্রেকে আমাদের মুখভাব ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। ঘৃণার আতিশর্য্যহেতু আমাদের বমন করিবার ইচ্ছা হয়। "থুথু" ফেলা ঘৃণা প্রকাশ করিবার অন্যতর উপায়। সেই ঘৃণিত বস্তু আমাদের জিহ্বা কলুষিত করিয়াছে এই অনুমান করিয়াই আমরা বমন করিবার চেষ্টা করি ও "থুথু" ফেলিয়া থাকি।

তাচ্ছল্যভাবে ঘৃণাভাবের ঈষৎ আভাস থাকে। ময়লা বস্ত্রের উপর আমাদের ঘৃণা, ছিন্ন বস্ত্রের উপর আমাদের তাচ্ছল্য। কতকগুলি নিকৃষ্ট এবং অকর্ম্মণ্য বস্তুকে আমরা তাচ্ছল্য করিয়া থাকি। সময়ে সময়ে উপহাসব্যঞ্জক হাস্যদ্বারা আমাদের তাচ্ছল্য ভাব প্রকাশিত হয়, চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত করা, কিম্বা আড়্চোকে সেই নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাওয়া, ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করা, কিম্বা সেই বস্তু হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া পার্শ্ব কাটাইয়া চলিয়া যাওয়া ব্যতীত তাচ্ছল্যভাব আর কোন প্রকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে না। ঘৃণা কিম্বা তাচ্ছল্যভাবে আমাদের হৃদয়ের বা ফুস্ফুসের গতির কোন তারতম্য প্রত্যক্ষ হয় না।

অহঙ্কার।—আমি আমার নিজের কল্পিত বা সত্য স্বভাব, ক্ষমতা, কিম্বা সদ্গুণ হইতে নিজেকে যদি একটি মহৎ এবং অসাধারণ লোক বলিয়া মানিয়া লই তাহা হইলে আমি অহঙ্কারী হইলাম। অহঙ্কারী লোকেরা অন্য সকল হইতে আপনাকে অত্যন্ত উচ্চ মনে করে বলিয়া ময়ূয়ের ন্যায় সর্ব্বদাই তাহারা তাহাদের সমস্ত অবয়ব এবং মুখমণ্ডল উন্নত ও দৃঢ় করিয়া রাখে। তাহারা অন্য সকলকে তখন তাচ্ছল্যের পাত্র মনে করে; সর্ব্বদা ভূমির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে; ঘাড় উঠাইয়া অন্য মুখপানে চাহিতে ও তাহারা বড় নারাজ। সময়ে সময়ে তাহারা অন্যের উপর তাচ্ছল্য প্রকাশের জন্য নাসিকা এবং ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে।

কষ্ট।—নৈরাশ্য, আত্মীয় বা প্রিয় জনের বিরহ প্রভৃতি এই শ্রেণীস্থ সমস্ত বৃত্তি হইতে, এবং শারিরীক অসুস্থতা হইতে, আমাদের একপ্রকার মানসিক কষ্ট হইয়া থাকে। এই বৃত্তিগুলির উদয়ে আমাদের মুখের ভাব একরূপই হইয়া থাকে। মানসিক কষ্ট বলবান্ হইলে প্রথমে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা অত্যন্ত প্রবল হয়; সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা আমাদিগকে যখন ক্লান্ত করিয়া ফেলে তখন আমরা অনেকটা সুস্থবোধ করি, এবং তখন একটু কষ্টেরও লাঘব হয়। আমাদের দেশের শোকার্ত্ত স্ত্রীলোকদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ। দশরথের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে

"বিচুক্রুশু র্ভূমিপতে র্মহিষ্যঃ
কেশান্ লুলুঞ্চুঃ স্ববপূংষি জঘ্নুঃ।
বিভূষণান্যুন্মুমুচুঃ ক্ষমায়াং
ক্ষেপ্তু র্বভঞ্জু র্বলয়ানি চৈব॥ * "

* ভট্টিকাব্যং, ৩য় সর্গঃ, ২২ শ্লোকঃ।

ইহা যে কতদূর স্বাভাবিক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যখন কষ্টের কিছু লাঘব হয় তখন আমরা চুপেচাপে অবশিষ্ট কষ্ট টুকু উপভোগ করিতে থাকি। এই অবস্থায় আমাদের মুখ বিবর্ণ হয়; চক্ষু নিস্তেজ এবং ভাবহীন হইয়া ঢলিয়া পড়ে; ভ্রূযুগল তের্চা হয়, কেননা তাহাদের মধ্যাবর্ত্তী দুই প্রান্ত উন্নত হয় এবং বাহিরের অপর প্রান্তদ্বয় ঝুলিয়া পড়ে; সেইহেতু ললাট-প্রদেশে কষ্ট-ব্যঞ্জক এক প্রকার সঙ্কোচ হইয়া থাকে। ওষ্ঠাধর ও কপোলের মাংসপেশীগুলি এবং মুখাকৃতির নিম্নঅস্থি (lower Jaw) গুরুত্ব হেতু আনত হয়; এই কারণ বশতঃ কষ্টের অতিশর্য্যে আমাদের মুখমণ্ডল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয় এবং এক পার্শ্বে অবনত হইয়া পড়ে। ক্রোধ এবং ভয়ের ন্যায় এ অবস্থাতেও আমাদের নাসারন্ধ্র স্ফীত ও রক্তবর্ণ হয়। মানসিক কষ্টের সময় আমাদের সমস্ত মাংসপেশী শিথিল হইয়া পড়ে বলিয়া শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই সময় হৃদয়ের কার্য্য দ্রুত হয়; অতি ধীরে নিশ্বাসপ্রশ্বাস বাহির হয় এবং তাহার মধ্যে যে এক একটি দীর্ঘনিশ্বাস সমুত্থিত হয় তাহাতে আমাদের আন্তরিক যাতনা জাজ্বল্যতররূপে প্রতিভাত হইতে থাকে।

এইগুলি গেল অপ্রীতি-জনক মনোবৃত্তি। এক্ষণে প্রীতিজনক মনোবৃত্তি হইতে মুখভাব কিরূপ হয় তাহার বিষয় সংক্ষেপে বলা আবশ্যক।

উল্লাস।—সুখজনক বস্তু কিম্বা ঘটনা হইতে আমাদের মনে যে ভাবের আবির্ভাব হয় তাহাই উল্লাসভাব। প্রিয়জনের সহিত সম্মিলন, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর লাভ, সুশ্রাব্য শ্রবণ, সুদৃশ্য দর্শন—ইত্যাদি গুলিই সেই ভাবের উৎপাদক। মানসিক কষ্টে আমাদের চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গমন যেমন অনিবার্য্য, উল্লাস ভাবে মুখে হাসি সেইরূপ অনিবার্য্য। Spencer বলেন যে প্রীতিউৎপাদক বৃত্তি প্রবল না হইলে আমাদের হাসি আসে না। মানুষে প্রথমে স্মিত হয় এবং ক্রমে হাসিয়া থাকে। অসংলগ্ন এবং আমোদপ্রদ ঘটনাবলি দর্শনে বা শ্রবণে আমরা হাসিয়া থাকি; যেমন, একটি স্থূলকায় ব্যক্তি হটাৎ যদি ভূমে পতিত হয়, তখন তাহার শরীরের হাস্যজনক অবস্থাবিশেষ দেখিয়া আমাদের মনে হাস্যরসের উদয় হয়। উক্ত লেখকটি ইহাও বলেন যে কতক সময় গুটিকতক স্নায়বীয়শক্তি উত্তেজিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে নূতন নূতন মানসিক ভাব বা বৃত্তি উৎপাদন করে না, তাহার কারণ এই যে তাহাদের গতি হটাৎ কেমন বন্ধ হইয়া যায়। তখন সেই উত্তেজিত শক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি নির্ব্বাহক-স্নায়ু বহিয়া অনেকগুলি মাংসপেশীকে সেইরূপ উত্তেজিত করিয়া ক্ষান্ত হয়; এবং ইহাই আমাদের হাস্যের গূঢ়তত্ব। উল্লাসে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা প্রবল হয়; সুন্দর সঙ্গীত শ্রবণে আমরা করতালি দিয়া থাকি; বালকেরা উল্লাসিত হইলে নৃত্য করিয়া থাকে, করতালি দেয়, এবং সময়ে সময়ে

হস্ত দ্বারা পদদ্বয় চাপড়াইয়া থাকে। Sir Charles Bell বলেন যে,সমস্ত উল্লাসজনক বৃত্তি হইতে চক্ষের পত্র, নাসারন্ধ্র এবং ওষ্ঠাধরের দুইপ্রান্ত উন্নত হয়; কষ্টজনক বৃত্তির উদয়ে ঠিক তাহার বিপরীত ভাব হইয়া থাকে। উল্লাসে আমাদের ভ্রূযুগল ঈষৎ উন্নত হয় বলিয়া ললাটপ্রদেশ তরঙ্গিত হয় না; চক্ষু পূর্ণমাত্রায় বিস্তৃত, ভাবপূর্ণ এবং উজ্জ্বল হয়; নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত হয়। এই ভাবে রক্তের চলাচল অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এবং প্রথম ইচ্ছ্বাসে হৃদয় অতিশয় উত্তেজিত হইয়া ক্রমান্বয়ে স্থির হইতে থাকে।

লজ্জা।—লজ্জা একটি স্বতন্ত্র প্রকারের বৃত্তি। ইহা প্রীতি এবং অপ্রীতিজনক বৃত্তির মধ্যবর্ত্তী, কিন্তু এরূপ লজ্জাও আছে যাহা একেবারে অপ্রীতিজনক। আমার রূপ কিম্বা গুণের বিষয় লইয়া কোন স্থলে আন্দোলিত হইলে এবং তথায় আমি উপস্থিত থাকিলে আমার মনে লজ্জাভাবের উদয় হয়; নব-প্রেমিকদিগের মনে যে এক প্রকার লজ্জা হয় তাহাকে আমরা "সরম" বলিতে পারি। অপরাধিরা তাহাদের পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া একপ্রকার লজ্জা অনুভব করে। যৌবনাবস্থায় লোকে অধিক লজ্জা পাইয়া থাকে; বৃদ্ধাবস্থায় বা শৈশবে মনে ততটা লজ্জা থাকে না। লাজুক যুবতীরা আপনাদের রূপের প্রশংসা শুনিলে কিম্বা পরপুরুষের দ্বারা একদৃষ্টে দ্রষ্ট হইলে লজ্জায় একেবারে মরিয়া যায়। লজ্জা হইলে আমরা কোন প্রকারে মুখ লুকাইতে চেষ্টা করি, কখন বা হাসিয়া থাকি, সময়ে সময়ে কতকগুলি যা-ইচ্ছা বকিয়া আপনার লজ্জা কোন প্রকারে ঢাকিবার চেষ্টা করি। মহাকবি কালিদাস রাজা দুষ্মন্তের মুখ হইতে বিদূষকের নিকট শকুন্তলার নব-অনুরাগ এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন;

"অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং
হসিতমন্যনিমিত্ত কথোদয়ং।"

নব প্রণয়ীদিগের মনে যে এইরূপ লজ্জা হইয়া থাকে তাহা সকলেই বিদিত আছেন। লজ্জিত হইলে আমাদের সমস্ত মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ কর্ণ,অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয়। ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্য রেখা দৃষ্ট হয়, এবং দৃষ্টি নত হয়। সচরাচর আমরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকি।

যোগভাব। উপাসনার সময় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইলে মনে যে ভাবের উৎপত্তি হয় তাহাকে যোগভাব বলে। যোগভাবে আমাদের মুখমণ্ডল উন্নত হয়। চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত হয় এবং চক্ষের তারা উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। Sir C. Bell বলেন যে নিদ্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে কিম্বা মূর্চ্ছার সময় আমাদের চক্ষের পাতা যেরূপ ঈষৎ চঞ্চল হয়, যোগভাবে সেইরূপ হইয়া থাকে। সেই সময় আমাদের হস্ত কেমন স্বভাবতঃই যুক্ত হইয়া পড়ে।

সমস্ত অবয়বের মধ্যে মানুষের মুখের উপর আমাদের বিশেষ লক্ষ্য, কেন না

সেই মুখ তাহাদের প্রকৃতি, তাহাদের মানসিক ভাব এবং বৃত্তি, তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশের ক্রীড়াস্থল। সেই মুখের ভাব হইতে কোন্ ব্যক্তি আমার সুখে সুখী, আমার দুঃখে দুঃখী, আমার ব্যথায় ব্যথী—তাহা স্পষ্ট জানিতে পারি। আমাদের বাক্য, আমাদের স্বরের তারতম্য, মনোভাবগত মুখভঙ্গি সমেত বাহির না হইলে তাহা বড় একটা অন্যের হৃদয়গ্রাহী হয় না। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে মুখভাব মনুষ্যজীবনে যে যথেষ্ট আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করে তাহা স্পষ্ট প্রতীতি হয়।

ভানুসিংহের কবিতা।

সখিলো, সখিলো, নিকরুণ মাধব
  মথুরাপুর যব্ যায়,
মনম করল পণ মানিনী রাধা
রোয়বে না সো না দিবে বাধা,
কঠিন-হিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
  শ্যামক দিবে স বিদায়!
মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা,
বয়ন পানে তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল' স চাহয়ি রহল,'
দণ্ড দণ্ড সখি চাহয়ি রহল,'
মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল'
  বিন্দু বিন্দু জল ধার!
মৃদু মৃদু হাসে বৈঠল পাশে,
কহল শ্যাম কত, মৃদু মৃদু ভাষে,
টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান,
গদ্ গদ আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
ফুকরয়ি কাঁদয়ি উঠইল রাধা,
গদ গদ ভাষ নিকাশল আধা,
শ্যামক চরণে বাহু পসারি
কহল, "শ্যামরে, শ্যাম হমারি,
রহ' তুঁহু, রহ তুঁহু, নাহ গ, রহ তুঁহু,
অনুখন সাথ সাথ রে রহ পঁহু,
তুঁহু বিনে শ্যাম গ, নাহ গ, পঁহু গো,
  আছয় কোন্ হমার!"
পড়ল ভূমি পর শ্যাম চরণ ধরি,
রাখল মুখ তছু শ্যাম চরণ পরি,
উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি
  রজনী করল প্রভাত!
শ্যাম স বৈসল, মৃদু মৃদু হাসল,
কত অশোয়াস বচন মিঠ ভাষল,
  ধরইল বালিক হাত!
সখিলো, সখিলো, বোল'ত সখিলো
  যত দুখ পাওল রাধা,
শ্যাম কিয়ে তব আপন মনমে
  পাওল সখি তছু আধা?
হাসয়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি
  বহুত স প্রবোধ দেল,
হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি

দূর—দূর চলি গেল !
সখি লো, সখি লো, শ্যাম স হাসল,
শ্যাম স কাঁদল না !
দারুণ মন-দুখ পাওল রাধা
তবহুঁ স কাঁদল না !
বসন্ত রাতে হাসয়ি যব্ সখি,
রাধা বনমে আসে,
সুনীল অঞ্চল, নয়ন বিচঞ্চল,
তব্ স কানু মৃদু হাসে ;
হাত ধরয়ি তছু হিয়য়ি ঢাকি মুখ
বালি রহই যব্ পাশে,
চুম্বয়ি চুম্বয়ি, কপোল চুম্বয়ি
তব্ স কানু মৃদু হাসে !
যব্ সখি আজ স রাধা কাঁদল,
তব্ সখি কাঁদল না !
বেড়ি চরণ তছু তিতল চরণতল
তবহুঁ স কাঁদল না !
অবহুঁ স মথুরাপুরক পন্থমে
ইঁহ যব্ রোয়ত রাধা,
যাতে যাতে অব্ মনে শ্যাম কিয়ে
পায় শোক তিল-আধা ?
যাতে যাতে অব্ পথ মে মাধব
সমরণ করয় কি বেরি
তাকর বিরহে আকুল রাধা
কাঁদি কাঁদি পথ হেরি ?
বরখি আঁখিজল ভানু কহে "অতি
দুখের জীবন ভাই !
হাসিবার তর সথা মিলে বহু
কাঁদিবার কো নাই !"

চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব।

(বাঙ্গালা, ত্রিপুরা ও আরাকাণ ইতিহাসের কিয়দংশ মাত্র।)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চট্টগ্রাম আরাকাণপতির কুক্ষিগত হইল। তাহার শাসন জন্য এক জন মগ শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইল। আরাকাণরাজ পর্টুগিজদিগকে চট্টগ্রামে স্থাপিত করিয়া, তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত রক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। কোন কোন ব্যক্তি রাজ সরকার হইতে বেতন ও ভূমি জায়গির প্রাপ্ত হইলেন। তাহারা বলের দ্বারা নিঃস্ব প্রজা ও ইতর লোকদিগকে খৃষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিল। অনেক দেশীয় পত্নী সংযোগে এক নূতন জাতীয় জীব সৃষ্টি করিল। সেই মন্ত্র-দীক্ষিত মানবগণ ও মিশ্র পর্টুগিজগণই "চাটগাঁয়ে ফেরিঙ্গি" নামে পরিচিত হইয়াছে। এই সকল ফেরিঙ্গিদিগের অবস্থা অদ্যাপি প্রায় সেইরূপই আছে। অতি অল্প লোকই

উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। অন্যেরা সাহেবদিগের সেবক, পাচক ও মদিরা বিক্রেতা।

মগগণ বাঙ্গালী সংযোগে আর একটী নূতন জাতি সৃষ্টি করিল; ইহারাই দেশীয় মগ বা রাজবংশী। কিছুকাল মগদিগের অধীনে থাকিয়া চট্টলবাসী হিন্দুসন্তানদিগের একটী সংস্কার জন্মে; সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অদ্যাপি তাহারা অন্যান্য জেলা বাসিদিগকে "বংদেই" (৩৭) (বঙ্গদেশী) বলিয়া থাকে।

মগ ও ফেরিঙ্গিগণ সময়ে সময়ে ত্রিপুরা ও বঙ্গ আক্রমণ করিত। বঙ্গীয় শাসন কর্ত্তা ইসলাম খাঁ মাশহুদি মগদিগের দুষ্কি্রয়ার দণ্ডবিধান জন্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। পরাক্রান্ত শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শাসনকর্ত্তা মুকুট রায় ১৫৬০ শকাব্দে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। মতান্তরে আরাকাণ-রাজ কোন গুরুতর দোষের জন্য দণ্ডবিধান করিতে উদ্যত হইলে মুকুটরায় নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মুসলমানদিগের সহিত সখ্যতা করিলেন। কিন্তু অল্পকাল অন্তেই আরাকাণ রাজ চট্টলোদ্ধার করিয়াছিলেন।

১৫৫২ শকাব্দে হর্বার্ট সাহেব, (Sir J. Herbert) চট্টগ্রাম শ্রীপুর (৩৮) বাকলা (চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী) ও সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি নগরগুলি গঙ্গাতীরস্থ প্রধান, বাণিজ্যোন্নত, সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও জনপূর্ণ লিখিয়াছেন।১৫৬১ শকাব্দে মণ্ডলস লুই রাজমহল, কাকা (ঢাকা) ফিলিপাট্টাম ও চাঁটিগাঁ বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান নগর লিখিয়াছেন। এই সকল বৈদেশিক সাক্ষীগণের বাক্য দ্বারা দুইশতাব্দী পূর্ব্বেও চট্টগ্রামের যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। শালিবাহনাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর একখানি মানচিত্রে (Blaev's map) চট্টগ্রাম ত্রিপুর রাজধানীর দক্ষিণ পশ্চিমদিকে এক নদীর তীরে নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু ব্রুকের (Mattheus ven den Broucke) মানচিত্রে এই দুইটী নগরী দুইটী পৃথক নদীর তীরে অঙ্কিত। প্রকৃতপক্ষে ব্রুকের লিখাই সত্য। ব্লেভের মানচিত্রে চট্টগ্রামের নিকট নদীর অপর তীরে "বাঙ্গলা" নামক একটী নগর দৃষ্ট হয়। পোরচাস লিখিয়াছেন,—গৌড় (বাঙ্গলার) রাজধানী, "বাঙ্গলা" একটী সুন্দর নগরী। কোন কোন লিখক অনুমান করেন এই "বাঙ্গলা" নগর হইতেই আমাদের জন্মভূমি "বাঙ্গলা দেশ' আখ্যা প্রাপ্ত

(৩৭) পশ্চাৎ চট্টগ্রামের ভাষা সমালোচন করা যাইবে।

(৩৮) শ্রীপুর মেঘনা ও পদ্মার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল। করাল রূপিনী মেঘনা ও কীর্ত্তিনাশা শ্রীপুরের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি গ্রাস করিয়াছেন। যে অন্তদ্বীপ সদৃশ ভূমিখণ্ড অদ্যাপি "শ্রীপুরের টেক" নামে পরিচিত ইহাই প্রাচীন শ্রীপুরের চিহ্ন স্বরূপ। ব্লকমান সাহেব ভ্রমক্রমে "রিকাবি বাজারের" পূর্ব্ব দিকস্থ "ফেরিঙ্গি বাজার"কে শ্রীপুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক সময়ে শ্রীপুরের যথেষ্ট উন্নতি ছিল। এস্থান হইতে বৈদেশিক বণিকগণ কার্পাশ বস্ত্র য়ুনানী মণ্ডলেও চীন প্রভৃতি দেশে লইয়া যাইতেন।

হইয়াছে। আমরা জন্মভূমি বাঙ্গলার একখানা ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাহাতে এই সকল বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচনা করা যাইবে। বিগত শতাব্দীর অন্তভাগে রেনেল সাহেব এই নগরের (বাঙ্গলা) অস্তিত্ব প্রমান করিতে পারেন নাই। ইবন বতোতিয়া, ফ্রেডিবিক রলফ ফিচ, ডি বরোস ও ব্রুকে প্রভৃতি বিশ্বস্ত লিখক ও ভ্রমণকারীগণ "বাঙ্গলা" নগরের উল্লেখ করেন নাই। অন্য প্রমানাভাবে পোবচাসেব লিখা গ্রাহ্য নহে। কারণ তিনি ভারতে পদার্পণ করেন নাই।

পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে মগগণ শাক দ্বীপ হইতে আসিয়া বিহারে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই জনাই সেই প্রদেশ অদ্যাপি "মগধ" নামে পরিচিত রহিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় মগগণ বিহার প্রদেশ হইতে তাড়িত হইয়া প্রথমত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ এইস্থানটীও এক সময়ে "মগধ" নামে পরিচিত ছিল। রেনেল ও ব্রুকের মানচিত্রে চট্টগ্রামের পূর্ব্বদিকে "কোডাভাস্কাম" (Codavascam) প্রদেশ লিখিত। কর্ণেল উইলফোর্ড বলেন(৩৯) পর্টুগিজগণ যাহাকে "কোডাভাস্কাম" লিখিয়াছেন আমি তাহাকে "কুতক্ষান্" (Cu teewa-shan) বিবেচনা করি। কুকি প্রদেশ তাক (বা সাক) জাতির আক্রমণ হইতে এই নাম পাইয়া থাকিবে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, কুকি প্রদেশের কিয়দংশ, সিন্দুজাতির বসতিস্থান ও উক্ত মগধ, কোডাভাস্কাম প্রদেশের অন্তর্গত বোধ হইতেছে। ব্রুকের মানচিত্রে চট্টগ্রাম ও কোডাভাস্কাম প্রদেশের প্রধান নগরী "কোডাভাস্কাম," চট্টগ্রাম নদীর (Xetigam Riv.) তীরে চিত্রিত। কোডাভাস্কাম নগরী ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোনে।

ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য দেব স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য দ্বারা রাজ্য চ্যুত হইয়া চট্টগ্রামে গমন করেন। (৪০) তিনি আরাকাণপতি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশে বাস করেন। গোবিন্দ মাণিক্য তথায় যে সকল অট্টালিকা উদ্যানাদি ও পুষ্করিণী খনন করেন, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি পর্ব্বত মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। (৪১) ১৫৮৩ শকাব্দে (১৬৬১ খৃঃ অঃ) সম্রাট

(৩৯) As. Researches, Vol XIV page 450.

(৪০) ছত্রমাণিক্য স্বাধীনতারত্ন বিক্রয় করিয়া সুজার নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ই ত্রিপুরা "সরকার উদয়পুর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

(৪১) Far in the jungles on the banks of the Myanee, an affluence of the Kassalong River, are found tanks, fruit-trees, and the remains of masonry building,—evidence that, at some bygone period, the land here was cultivated and inhabited by men of the plains. Tradition attributes these ruins to a former Rajah of Hill Tipperah who, it is said, was

সাহাজানের পুত্র সুলতান সুজা স্বীয় ভ্রাতা আওরংজীব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আরাকাণ যাইতেছিলেন। তিনি কুমিল্লা হইয়া ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটীতে (৪২) গমন করেন। তৎপর দুর্গম পার্ব্বত্য পথ দ্বারা তিনি রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্য দেবের কুটীরে উপনীত হন। (৪৩) সুজা, গোবিন্দ মাণিক্য হইতে তৎকালোপযুক্ত যথেস্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুজা আরাকাণ পতির আবাসে উপনীত হইলে, রাজা সুজা-পুত্রীর রূপে মোহিত হইলেন। সুজার জীবিতাবস্থায় তাঁহার বাসনা পূর্ণ হওয়া দুষ্কর জানিয়া রাজ্যমধ্যে প্রচার করিলেন, যে, সুজা কৌশলক্রমে আরাকাণের রাজাসন অধিকার করিতে আসিয়াছেন। আশু তাহার প্রাণবধ কর্ত্তব্য। বিনাযুদ্ধে রক্তপাত বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ; সুতরাং সুজাকে জলমগ্ন করা হইল। (৪৪) তাঁহার পত্নী ও কন্যাদ্বয় আত্মহত্যা দ্বারা পামরের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। কিন্তু সুজার তৃতীয় কন্যা রাজান্তঃপুরে স্থান অধিকার করিলেন। ক্রমে আরাকাণ রাজপামর "সন্দসুধর্ম্ম" (Tsan-da-thu-dhamma. ৪৫) এই অবলা বালার হৃদয়ও অধিকার করিয়াছিল। বর্ণিয়ারের লিখা পাঠে

---

driven from that part of country. Lewin's Hill Tracts of Chittagong page 6.

(৪২ ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত। ৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪৩) ডোস সাহেব স্বপ্রণীত ভারত ইতিহাস (Major Dows' History of Hindoostan) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সুজা পলায়ন কালে রাঙ্গামাটীয়ার অগম্য বন গিরি দিয়া আরাকাণে গমন করেন। কর্ণেল উইলফোর্ড বলেন "বোধ হয় মেজর ডোস ভ্রমক্রমে ত্রিপুরা পর্ব্বতকে "রাঙ্গামাটী" লিখিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ডোস ভ্রমে পতিত হন নাই। কর্ণেল উইলফোর্ডই ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী "রাঙ্গামাটীয়ার" নাম জ্ঞাত ছিলেন না। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশেও একটী "রাঙ্গামাটী" আছে। কিছুকাল এইস্থানে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ডিপুটী কমিসনরের রাজধানী ছিল।

(৪৪) পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও মণিপুরে রাজ বংশীয়দিগের প্রাণ দণ্ড জন্য একটী ভিন্ন প্রণালী দৃস্ট হয়। অপরাধী (কখন বা নিরপরাধী) ব্যক্তিকে একটী বৃহদাকার থলিয়ায় বন্ধন করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে। আমরা কতিপয় মণিপুরীয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া এরূপ উত্তর পাইয়াছি,—"রাজ বংশজদিগের রুধির বিন্দু ধারণ করিতে বসুন্ধরা অক্ষম; দৃষ্টান্ত স্থল—বিরাট রাজ সভাস্থ কঙ্ক ওরফে যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত ও তাহা স্বর্ণ পাত্রে ধারণ। এই জন্যই তাঁহাদিগকে এরূপে বধ করা হয়।" আমরা বিবেচনা করি বৌদ্ধ-মগদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে অনার্য্য মিতাই ভূমিতে (মণিপুরে) এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

(৪৫) আরাকাণ রাজ সাধুর (Tha do) মৃত্যু হইলে; তৎপুত্র "সন্দসুধর্ম্ম" ১০১৪ ব্রঃ অঃ (১৬৫২ খৃঃ অঃ) সিংহাসন আরোহণ করিয়া ক্রমে ৩২ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

জ্ঞাত হওয়া যায়, "তাইমোর বংশজ সুজা মৃত্যুকালেও স্বীয় বংশ গৌরব রক্ষা করিয়া, বীরের ন্যায় শত্রু হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার অসিধারণ ক্ষমতা তিরোহিত না হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত মগেরা তাঁহার নখাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

সুজার প্রতি আরাকাণ পতির নৃশংস আচরণ শ্রবণ করিয়া বোধ হয় নির্দ্দয় আওরংজীবেরও একবিন্দু অশ্রু পতিত হইয়াছিল। তিনি সত্বর মিব জুম্লাকে আরাকাণ ও চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতে লিখিলেন। প্রতিকূল ঘটনাবশতঃ জুম্লা সম্রাট-আজ্ঞা অবহেলন করিয়া কুঁচবিহার, কুঁচহাজু ও আসাম আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার জয় পরাজয় দুইই হইয়াছিল। অবশেষে আসাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে খিজিরপুরের দুই ক্রোশ উত্তরে ১০৭৩ হিজিরি অঃ ২রা রমজান (৩০ মার্চ, ১৬৬৩ খৃঃ অঃ) অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় জুম্লা লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

জুম্লার মৃত্যুর পর আওরংজীবের মাতুল সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার নবাবি পদে নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গে পদার্পণ করিয়াই আরাকাণ-পতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। এই সকল ঘটনাবলির বৈদেশিক চাক্ষুষ সাক্ষী বর্ণিয়ারের লিখা সমগ্র উদ্ধৃত কিম্বা অনুবাদ করিয়া আমরা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। সেই ভ্রমণকারী মহাত্মার লিখিত বিষয়ের সারাংশ মাত্র উদ্ধৃত করিব।

সায়েস্তা খাঁ পর্টুগিজদিগের জল-রণনৈপুন্য দর্শনে ওলন্দাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভেটিভিয়ার গবর্ণর বাঙ্গালায় বাণিজ্য সংস্থাপনের উত্তম সুযোগ পাইয়া, সায়েস্তা খাঁর সাহায্যার্থ এক বহর রণতরী প্রেরণ করিলেন। ওলন্দাজদিগের বঙ্গে পহুঁছিবার পূর্ব্বেই সায়েস্তা খাঁ উৎকোচ ও প্রলোভন দ্বারা চট্টগ্রাম বাসী পর্টুগিজদিগকে হস্তগত করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে অধিক পরিমানে বেতন, ও ভূমি জায়গির দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পর্টুগিজগণ লোভ পরবশ হইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলে তিনি তাহাদের সহায়তায় অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। কিন্তু সম্যক অধিকারের পূর্ব্বে বর্ষদ্বয় ব্যাপী সংগ্রাম স্বীকার করিয়া চট্টগ্রাম ও অনতিদূরবর্ত্তী বঙ্গোপসাগর এই উভয়কে নর রুধিরে রঞ্জিত করিতে হইয়াছিল। কথিত আছে এই যুদ্ধ মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক সন্দ্বীপ জয়ের সমবায়িক। এবং ইহাতে জনৈক বাঙ্গালী মুসলমান জমীদার অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৪৬) সায়েস্তা খাঁ পর্টুগিজদিগের সাহায্যে

(৪৬) ইনি প্রসিদ্ধ ভৌমিক ঈশাখাঁর প্রপৌত্র। (ময়মন সিংহ) হয়বৎ নগরের জমিদারদিগের পূর্ব্ব-পুরুষের নাম "দেওয়ান মনোয়ার খাঁ"। আওরংজীব তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সহস্র পদাতি ও পঞ্চশত অশ্বারোহী সেনার সেনানী মনসবদার উপাধি দান করেন।

জয়ী হইয়া আত্ম প্রতিশ্রুতি পালনে পরাঙ্‌মুখ হইলেন। (৪৭)

১৫৮৮ শকাব্দ (১৬৬৬ খৃঃ অঃ) চট্টগ্রাম রঙ্গভূমির দ্বিতীয় অভিনেতার অভিনয় শেষ হইল। আরাকাণ রাজ চট্টগ্রাম হারাইলেন। ক্রমে তাঁহার সৌভাগ্য ভাস্কর পশ্চিম গগণে ঝুলিয়া পড়িল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে, বিশাল আবা সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা মহাবীর আলংফ্রা ঐরাবতী তীরে জন্মগ্রহণ করেন। (৪৮) বোধ হয় পাঠকবর্গ মধ্যে অনেকেই এই মহা পুরুষের নাম জ্ঞাত আছেন। ইংরাজ লিখকগণ তাঁহাকে আলম্প্রা (Alompra) লিখিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহাঁর নাম "আলংফ্রা" কিম্বা কিম্বা "আলম্প্রা" নহে। "আলংফ্রা" উপাধি মাত্র। "ফ্রা" প্রভু শব্দের অপভ্রংশ। অনেকে বিবেচনা করেন, আলংফ্রা পঙ্কজাত পঙ্কজ সদৃশ নীচ কুলোদ্ভূত। ব্রহ্মাগণ বলে যে বংশে "রঘু" "রাম" প্রভৃতি মহাবীরগণ জন্মগ্রহণ করেন, আলংফ্রা সেই সূর্য্য বংশে দ্বিতীয় মিহির রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে উপকরণে উইলিয়ম অব অরেঞ্জ নির্ম্মিত,— যে উপকরণে নেপোলিয়ন বোনাপার্টী নির্ম্মিত,—বিধাতা সেই উপকরণে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাবীর শিবজীর বয়ঃ কনিষ্ঠ,কিন্তু গুণে তাঁহার সমতুল্য। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক জন ভারতের পশ্চিম প্রান্তে, ও খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দ্বিতীয় ব্যক্তি ভারতের পূর্ব্বসীমান্তে—ঐরাবতী প্রক্ষালিত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। আবা চিরকাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া কিছুকাল পিগুর দণ্ডাধীন ছিল। যে চিন্তা ডম্রেমির কৃষক বালিকার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে পৌরুষ দান করে, সেই চিন্তা পঞ্চ ফিট একাদশ ইঞ্চ দীর্ঘ একটী পুরুষের হৃদয় অধিকার করিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিল। তিনি ব্রহ্মাদিগের কর্ণে মৃত্যু-সঞ্জীবনী মন্ত্র দান করিলেন। পিগু পতি বিদ্রোহ দমনার্থে অস্ত্রধারণ করিলেন। যখন গিরিনন্দিনা তুঙ্গ শৃঙ্গ ভেদ করিয়া সাগরোদ্দেশে গমন করেন, তখন মানব মণ্ডলীর শীলা বন্ধনে কি তাঁহার গতি রোধ হইতে পারে?

তেলীয়দিগের ভুজবল চূর্ণ হইল। ব্রহ্মা জাতীয় স্বাধীনতার চিহ্ন ধারণ করিল। আলংফ্রা ছত্রধারী নৃপেন্দ্র বলিয়া ঘোষিত হইলেন। মহাবীর আলংফ্রা জন্মভূমি স্বাধীনতা রত্নে মণ্ডিত করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি চতুর্দ্দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পদে পদে বিজয় লক্ষ্মী

(৪৭) বর্ণিয়ার বলেন,—In regard to the Portuguese, Shaista treats them, not perhaps as he ought, but certainly as they deserve.—

Bernier's Travels Vol I. page 203.

(৪৮) এই মহাবীর যে পল্লিতে ভূমিষ্ঠ হন—তাহার নাম "মৈওয়াক মৈও"—myouk-myo)। এই গ্রামটী আবা নগরীর ৩০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম দিকে।

আলংফ্রার অঙ্কশায়িনী হইলেন; পিগু, প্রোম ও মার্তাবান প্রভৃতি দেশ সকল তাঁহার কুক্ষিপ্রবিষ্ট হইল। শ্যাম-যুদ্ধ-যাত্রা কালে—৫০ বৎসর বয়ক্রমে ১৬৮২ শকাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বীরসিংহ রণজিতের উত্তরাধিকারীর ন্যায় অকালকুষ্মাণ্ড দায়াদের হস্তে রাজদণ্ড অর্পিত হয় নাই। উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে তিনি বালাজী বিশ্বনাথের ন্যায় ভাগ্যবান্। ক্রমে তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ চতুর্দ্দিকে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। ১৭০৪ শকাব্দে (১৭৮২-৩ খৃঃ অঃ) আলংফ্রার তৃতীয় পুত্র হদোফায়া (অন্য নাম তরফুমা) আরাকাণ অধিকার করেন। আরাকাণ বাসী মগগণ বলে, ব্রহ্ম-রাজ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রভাবে আরাকাণ অধিকার করিয়াছিলেন। তাহাদের বাক্যের একতা নাই। কোন কোন ব্যক্তি বলেন ব্রহ্মসৈন্যগণ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শনের ছল করিয়া আরাকাণ রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিল। (৪৯) কিন্তু লেউইন সাহেব্ আরাকাণ হইতে তাড়িত মগদিগের নিকট অন্য রূপ শ্রুত হইয়াছেন। (৫০) ব্রহ্মার ইতিহাসে লিখিত আছে,—ব্রহ্মরাজ ৪০০০০ সহস্র সৈন্যের বাহুবলে আরাকাণ জয় করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ।

(৪৯) Outline History of Burma, page 56.

(৫০) Lewin's Hill Tract of Chittagong, page 13.

দণ্ডিনাচার্য্য।*

(উপসংহার)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি দণ্ডীর কাব্যাদর্শে মহারাষ্ট্রী ভাষায় লিখিত "সেতুবন্ধের" নামোল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক রহস্য প্রণেতা রামদাস বাবু বলেন "দণ্ডিকৃত কাব্যাদর্শে মহাকবি কালিদাস প্রণীত "সেতু-কাব্যের" উল্লেখ আছে। (২২) তাঁহার মতে এই "সেতু কাব্য" প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। কিন্তু আমরা কাব্যাদর্শের দুই সংস্করণ ছত্রে ছত্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, ইহাতে "সেতু-কাব্য" এই কথাটী স্পষ্টাক্ষরে কোথাও নাই। বোধ হয় ঐতিহাসিক প্রণেতা "সেতুবন্ধকেই" "সেতু-

* ভ্রমক্রমে আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ মুদ্রিত করিয়া শেষাংশ মুদ্রিত করি নাই। ভ্রম উপলব্ধি করিয়া এবার প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করিলাম। লেখক মহাশয় ও পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

(২২) ঐতিহাসিক রহস্য। ১ম ভাগ, ২য় সংস্কঃ, ৪৭ পৃষ্ঠ।

কাব্য” বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই। কেননা কবি চন্দবর্দাই কৃত পৃথ্বী রাজ চৌহানরাস, (২৩) রামদাস প্রণীত “সেতু প্রবন্ধ” নামক কাব্যের টীকা, (২৪) এবং কাণ্যকুব্জেশ্বর হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্যের সভাসদ্ সুপ্রসিদ্ধ বাণভট্ট কৃত “হর্ষ চরিত” (২৫) হইতে ঐতিহাসিক রহস্য প্রণেতা যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দ্বারা আভাস পাওয়া যায় যে কালিদাস “সেতুবন্ধ,” “সেতুপ্রবন্ধ” বা “সেতু কাব্য” নামক কাব্যের প্রণেতা ছিলেন। “বারাণসী-দর্পণের” টীকাকার রামাশ্রমেরও নাকি ঐ মত (২৬)। যখন এতগুলি প্রাচীন গ্রন্থে কালিদাসকে “সেতু-বন্ধের” প্রণেতা বলা হইয়াছে তখন আমরা আর এ কথায় কোন আপত্তি করিতে পারি না। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রণেতা মাতৃগুপ্ত ও কালিদাসকে যে অভিন্ন ব্যক্তি প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন (কেবল তিনি নহেন, তিনি এ সম্বন্ধে জার্ম্মাণী ও বোম্বাই পণ্ডিতদের অন্তে-বাসী মাত্র) তাহাতে আমাদের কিছু আপত্তি আছে। ঐতিহাসিক প্রণেতা কোন্ যুক্তির বলে কালিদাসকে মাতৃগুপ্ত সাজাইয়াছেন, তাহার সারাংশ এই স্থলে গ্রহণ করিতেছি :—

উক্ত গ্রন্থ প্রণেতা একটী প্রবাদ শুনিয়াছেন যে, বিক্রমাদিত্য কালিদাসের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধ রাজ্য দিয়াছিলেন, এ দিকে রাজতরঙ্গিণীর মতে বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীর রাজ্য প্রদান করেন সুতরাং উভয়ের অবস্থা বেশ্ মিলে গেল। আর, রাজতরঙ্গিণীর মতে মাতৃগুপ্ত প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন এবং শকুন্তলার টীকাকার রাঘবভট্ট তৎকৃত টীকায় মাতৃগুপ্তাচার্য্যের কৃত কতিপয় অলঙ্কারের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই শ্লোক গুলি কালিদাসের লেখনী-নিসৃত বলিলেও শোভা পায়। আবার, ইনিই (মাতৃগুপ্তই) মহাকবি কালিদাস এ কথা ভাওদাজীও লিখিয়াছেন। পরন্তু মাতৃগুপ্ত স্ত্রীর বিরহে কাতর ছিলেন, এটী মেঘদূতের ঘটনার সহিত ঐক্য হইলে কবির স্বীয় বিবরণ বলিলেও বলা যায়।—এই সকল কারণ অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক-প্রণেতা কালিদাস ও মাতৃগুপ্তকে অভিন্ন ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং তদনুসারে রাজতরঙ্গিণীর মত সমর্থন করিয়া কালিদাসকে

(২৩) “ছন্দঠং কলিদাস সুভাষা সুবন্ধং।
জিনৈ বাগবাণী সুবাণী সুবদ্দং॥
কিযো কলিকা মুষ্য বাসং সুমুদ্ধ।
জিনৈ সেতবন্ধো তি ভোজন-প্রবন্ধ॥

(২৪) বীরাণাং কাব্যচর্চ্চা চতুরিমবিধয়ে বিক্রমাদিত্যবাচা
যঞ্চক্রে কালিদাসঃ কবিমুকুট
বিধুঃ সেতু নাম প্রবন্ধং।

(২৫) কীর্ত্তিঃ প্রবর সেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা।
নির্গতাসুনবাকস্য কালিদাসস্য সুক্তিষু
প্রীতির্মধুরসাদ্রাসু মঞ্জরীষিব জায়তে॥

(২৬) ঐতিহাসিক রহস্য, ১ম ভাগ ২য় সংস্কঃ, ৪৭ পৃঃ।

প্রবর সেনের সমসাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মাতৃগুপ্ত এবং কালিদাসকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন বটে কিন্তু সন্দেহ দূর হয় নাই। কেন না তিনি উপসংহার স্থলে বলিয়াছেন:—"যদি কালিদাসের নামান্তর মাতৃগুপ্ত হয় তাহা হইলে তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।"

এ সকল বাহুল্য কথা ক্ষান্ত দিয়া এখন প্রকৃত প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করা যাউক। রাজতরঙ্গিণী পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় মহারাজ বিক্রমাদিত্য খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে উজ্জয়িণীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবং এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৪১ খৃঃ অব্দে পার্থিব লীলা সংবরণ করেন। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম; সুতরাং তিনি খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। দুর্গসিংহও ঠিক এই সময়ের লোক। যখন কালিদাস ও দুর্গসিংহ একই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; তখন মহাত্মা দণ্ডীকেও ঠিক সেই সময়ের লোক বলিতে হইবে। কারণ, দণ্ডীর কাব্যাদর্শে কালিদাসকৃত সেতু কাব্যের নামোল্লেখ আছে এবং দুর্গসিংহ কাব্যাদর্শ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস "সেতুবন্ধের" প্রণেতা; "সেতুবন্ধ" কিঞ্চিৎ প্রচররূপ হইলে দণ্ডী "কাব্যাদর্শ" প্রণয়ন করেন। কেন না কাব্যাদর্শে সেতুবন্ধের নামোল্লেখ আছে। দুর্গসিংহ কাব্যাদর্শ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন সুতরাং সেতুবন্ধ এবং কাব্যাদর্শ প্রচারিত হওয়ার অত্যাল্প কাল পরে কাতন্ত্রবৃত্তি প্রণীত হয়। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই তিনখানি গ্রন্থ ঠিক এক সময়ে বিরচিত হয় নাই। যদি এই তিন খানির এক এক খানি গ্রন্থ প্রণয়নের আনুমানিক ২০ বৎসর পরেও আর এক খানি গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকে; এবং দুর্গসিংহ যদি অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য যুগে কাতন্ত্রবৃত্তি প্রণয়ন করিয়া থাকেন, (২৭) তবে কালিদাসের "সেতুবন্ধ" খৃঃ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর সন্ধি স্থলে কিম্বা খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিরচিত হয়। (২৮) সুতরাং "অশেষ-কবি-বৃন্দ-বন্দনীয়" সুপ্রসিদ্ধ দণ্ডিনাচার্য্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতীয় সাহিত্য ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মহাত্মা দণ্ডী যে এতদপেক্ষা প্রাচীন-

(২৭) অমরকোষ প্রণীত হইবার পূর্ব্বে দুর্গসিংহ কাতন্ত্রবৃত্তি প্রণয়ন করেন সুতরাং কাতন্ত্র বৃত্তি প্রণয়ন কালকে এই সময় অপেক্ষা পশ্চাৎ স্থাপন করা যায় না।

২৮ Indian Antiquary.

ঐতিহাসিক প্রণেতার মতেও খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাস কর্ত্তৃক সেতুকাব্য (সেতুবন্ধ) প্রণীত হয়।

The *Setubandha*, a Prakrit epic probably composed not later than the sixth century of our era. Indian Antiquary, (under the article "Oriental Researches for 1872—73)" Vol III P. 327.

তম নহেন তাহার আর একটী প্রমাণ আছে। কাব্যাদর্শের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের এক স্থলে বিক্রমাদিত্যের নামোল্লেখ আছে। তথাহিঃ——

"চিত্রমাক্রান্ত বিশ্বোপি
বিক্রমস্তে ন তৃপ্যতি।"

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমে যে একটী শ্লোকময়ী কিংবদন্তী উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে জানা যায় দণ্ডী ও মহাকবি কালিদাস এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে দেখা যায় তাহা বাস্তবিক যথার্থ।

শ্রীযাদবানন্দ গুপ্ত

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।

আমি তিন চার দিন যাবৎ এখানে এসেছি। এসে ভালই হয়েছে। 'বন' নগরটি যদিও স্বাস্থ্য ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্য খ্যাত তথাপি বিদেশীয় ভাষানুশীলনের পক্ষে তত অনুকূল নয়। 'বনে' থাকিলে ফরাসি বিশেষতঃ অতি যত্ন-উপার্জ্জিত রুষীয় ভাষা ভুলে যেতে হত। সমস্ত 'বনে" একখানি রুষীয় কাগজও খুঁজে পাওয়া যেত না। পক্ষান্তরে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে রুষীয় ভাষার একজন অধ্যাপক, সংবাদ পত্রাগারে রুষীয় প্রধান প্রধান দৈনিক ও মাসিক পত্র, অতএব রুষীয় ভাষা চর্চ্চা করিবার বিশেষ সুবিধা দেখা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত এখানে অনেক ফরাসী ও ইটালিয়ন বাস করেন। অতএব ফরাসি ও ইটালি ভাষায় আলাপ ইত্যাদি করিবারও বিশেষ সুবিধা। এ স্থানের জল, বায়ু, প্রকৃতি ইত্যাদিও অতি মনোহর। চতুর্দ্দিকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা, মধ্যে একটি স্ফটিক সরোবর। এই সরোবরের জল সবুজ বর্ণ—এরূপ সচরাচর দেখা যায় না। আমি সাঁতার দিতে ও দাঁড় টানিতে বড় ভালবাসি। এখন সাঁতারের কাল অতীত হয়েছে। ক্রমে ক্রমে শীত দেখা দিতেছে। কিন্তু বৈকালে যখন সূর্য্যাতেজ একটুকু কমিয়া আসে তখন আমি অবকাশ মতে একটি ফরাসি বন্ধুকে নিয়ে দাঁড় টানিতে যাই। যখন হ্রদের মধ্যে উপস্থিত হোয়ে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে থাকি—সূর্য্য একটি অগ্নি গোলক হয়ে অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত শিখরে লুকায়িত হইতেছে—তখন চক্ষু যে সমস্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করে তার তুলনা পৃথিবীতে অতি অল্পই পাওয়া যায়। বন্ হইতে সমস্ত রাইন্ বাহিয়া মাইন্স পর্য্যন্ত আসিবার সময় অতি অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়াছি। কোব্লেন্স হইতে বিঙ্গেন (Bingen) পর্য্যন্ত প্রতি পদে যে শোভা, তার কি বর্ণনা করিব। বামে বিখ্যাত লোরেলাই নামক (Laurelei) শৈলটি দেখিলাম। দেখে হাইনের মধুর কবি-

তাঁটির কথা মনে পড়িল। উহা এখন লৌকিক গাথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মাইন্স হইতে হাইডেলবের্গ (Heidelberg) পর্য্যন্ত পথে কবিতা অথবা সৌন্দর্য্য বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু হাইডেলবের্গ একটি অতি মনোরম স্থান। হাইডেলবের্গের গড়টি জগৎ বিখ্যাত। উহা একটি পর্ব্বতের উপর Renaissance style অনুসারে নির্ম্মিত। এই স্টাইলের এমন একটি পূর্ণ হর্ম্ম্য পৃথিবীতে আর অতি অল্পই দেখা যায়। পারিসের লুব্‌রও (Louvre) এই ষ্টাইলের একটি অতি মনোহর দৃষ্টান্ত। হাইডেলবের্গের গড়টি একশত বৎসরের অধিক হইল এই ভগ্ন দশায় পতিত। বজ্রপাতে ইহাকে অনেকটা এই দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হয়। গড়ের টেরাস (terasse) থেকে গহ্বরস্থিত নগরটি ও অদূরবর্ত্তী বিচরণ-পথ (Promenades) ইত্যাদি অতি প্রীতিকর দেখায়। কবিবর গইটে হাইডেলবের্গে আসিলেই এই গড় সংলগ্ন উদ্যানের একটি বিশেষ স্থানে বসিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কবিতার অনুশীলন ও চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন। অভ্যাগতদিগকে এই স্থান প্রদর্শন করান হয়।

হাইডেলবের্গ ছেড়ে বাডেন-বাডেনে (Baden-Baden) আসি। ইহাও হাইডেলবের্গ, বিসবাডন ও ফ্রাইবুর্গের (Freiburg) ন্যায় পর্ব্বত-গহ্বরস্থিত। বাডেন-বাডেনে বিসবাডেনের (Wies-baden) ন্যায় কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবন আছে। শুনিলাম উক্ত স্থানে প্রস্রবনের সংখ্যা অনুমান ২০টা হইবে; আমি ছয় সাতটি দেখিলাম। জল পান করিলাম। জল আস্বাদ-বিহীন, অথবা চিকেন ব্রথের মত কেমন এক প্রকার আস্বাদ বিশিষ্ট। জল এত উষ্ণ যে পান করিবার জন্য একটু অপেক্ষা করিতে হয়। এই জলে স্নান করিতে (বিশেষতঃ খুব শীতের সময়) বড় আনন্দ বোধ হয়। আমি যে হোটেলে উঠেছিলেম, সেখানে ঐ জলে স্নান করিলাম। বড়ই স্ফূর্ত্তি বোধ হইতে লাগিল। এই জল পান ও জলে স্নান করিবার জন্য এখানে প্রতি বৎসর কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসে। আগত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনকে বেশ চিনিলাম। তিনি ঠিক আমার বিপরীত দিকে বসিয়াছিলেন। একটা কন্‌সর্ট হইতেছিল। তাঁর নাম প্রিন্স গোরচাকফ্‌ (Gorchakoff) দেখিতে বেশ সুস্থ বোধ হইল। অশীতিবর্ষীয় ডিপ্লোমাট তাঁহার যুবতী পুত্রবধু ও অপর একটি নারীর সহিত নানা প্রকার হাস্য পরিহাসে মত্ত ছিলেন।

বাডেন্‌-বাডেন্‌ ছেড়ে ফ্রাইবুর্গে পৌঁছাই। সেখানকার গথিক-ষ্টাইল নির্ম্মিত ভজনালয় অতি চমৎকার। আমি জানি না কেন, কিন্তু এই গথিক-ষ্টাইলের মধ্যে এমন কি আছে যা আমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলে। কলনের (Cologne) গথিক-মন্দিরটি দেখে আমি একেবারে বাক্যশূন্য হই। ঐ স্বর্গের দিকে প্রধাবিত উত্তুঙ্গ চূড়া ও শিখাগুলি যেন আমার অন্তরাত্মাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যায়।

"ভারতী" এখনো রুষিয়ায় পাঠানো হয় কেন?

রাগ বসু, হরু ঠাকুর, ইত্যাদির গান ও টপ্পা কি কিনিতে পাওয়া যায়? আমার বড় ইচ্ছা য়ুরোপীয়গণকে আমাদের লৌকিক গাথার কিঞ্চিৎ আভাস দি। এ পর্য্যন্ত ইহাঁরা অনেকেই মনে করেন, এই হিন্দুরা কেবল কঠোর দর্শন ও রোমহর্ষণ বৌদ্ধ-নির্ব্বাণ-মুক্তি চিন্তাতেই পটু। ইহাঁরা জানেন না যে, আমাদের হৃদয় কত মধুময় সঙ্গীত ও সরস কবিতাপূর্ণ! কলিদাসের কথা বলিলে উত্তর দেন, "সে ত গ্রীকদের অনুকরণ মাত্র।" হায়! হায়! বেবর (Weber) কি মতই প্রচারিত কোরে বসেছেন!

শ্রীনিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদকের বৈঠক।

একদিন সেরিডানের সঙ্গে তাঁহার পরিচিত দুই ডিটক্ যুবকের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের একজন ঠাট্টা করিয়া কহিলেন, "ওহে সেরী, এই মাত্র আমাদের তর্ক হচ্ছিল, তুমি পাজি কিম্বা গাধা, তোমার মতে কোন্টা ঠিক!" সেরিডন, নমস্কার করিয়া ঈষৎ হাসিয়া দুই জনের মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন "আমি দুয়েরি মধ্যে।"

থ্যাকারে, যশের বিষয়ে কোন কথা উঠিলে এই গল্পটি কহিতেন ;—এক দিন তিনি সেণ্ট্লুইসে ডিনার খাইতে গিয়াছিলেন;—তাঁহাকে দেখিয়া এক জন ভৃত্য আর এক জনকে কহিল; "জান ইনি কে?" সে উত্তর দিল "না।" প্রথম ভৃত্য কহিল "জান না? ইনিই হোচ্চেন, বিখ্যাত মিস্টর থ্যাকারে।" দ্বিতীয় ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল "কেন, উনি কিসের জন্য বিখ্যাত?" উত্তর—"তা কে জানে?"

চার্ল্স্ ডিকেন্স একদিন তর্ক করিতেছিলেন যে, যেরূপ অবস্থাতেই লোকে পড়ুক না কেন তাহার একটা না-একটা কিছু সুখের বিষয় থাকেই;—তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ গল্প করিলেন—"দুই জন লোকের নিউগেটে ফাঁসি হইবে। সকাল হইল। ফাঁসির সময় আসিল। বন্দীরা ফাঁসি কাঠের সমুখে আনীত হইল। দুই জনের গলায় দড়ি লাগান হইল। চারি দিকে অসংখ্য লোক জড় হইয়াছে। ঠিক এমন সময়ে একটা ষাঁড় দড়ি ছিঁড়িয়া তাহাদের মধ্যে ছুটিয়া আসিল, লোকেরা ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতে সুরু করিল; তাহা দেখিয়া এক জন বন্দী আর এক জনকে কহিল, "ভাগ্যিস্ আমরা ভিড়ের মধ্যে ছিলেম না!"

ইংলণ্ডে পল্লিগ্রামের একটি স্কুলের বালককে পরীক্ষক প্রশ্ন দেন যে, "যদি আমাদের বর্ত্তমান রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া জন্মিয়াই মরিয়া যাইতেন, তাহা হইলে কে রাজা হইতেন?" উত্তর—"তাঁহার বড় ছেলে।"

ওয়াল্টর-স্যাবেজ-ল্যাণ্ডরের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ফুল অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন কিন্তু . ছুঁইতেন না। এমন কি ফ্লরেন্সে স্ত গল্প উঠিয়াছিল (বোধ করি সত্য হ. না) যে,—একদিন ভোজনের কি ত্রুটি হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাঁধুনিকে জানালা হইতে নীচে ফেলিয়া দেন—সে ব্যক্তি ত হাত পা ভাঙ্গিয়া বিলাপ করুক—এমন সময়ে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "এই যাঃ! ওখানে বোধ করি ফুলের গাছগুলি আছে!"

ডাক্তার বিল্‌কিন্স্ একবার ডাক্তার হলকে "দেহ এবং আত্মা" নামক একটি বিখ্যাত বহি ধার দেন। অনেক দিন ফিরিয়া না পাওয়াতে তাঁহাকে চিঠি পাঠান—"ডাক্তার মহাশয়, আমার "দেহ ও আত্মা" শীঘ্র ফিরাইয়া পাঠাইবেন; উহা নহিলে আর আমার চলিতেছে না!" দৈবক্রমে সে চিঠি তাঁহার চাকর পড়ে, পড়িয়া সে ব্যক্তি নিতান্ত ভীত হইয়া অন্যান্য চাকরদের ডাকিয়া কহিল "এবাড়িতে থাকা পোষাইল না! আমাদের মনিব ডাক্তার উইল্‌কিন্সের দেহ ও আত্মা কি করিয়া হস্তগত করিয়াছেন! এখানে কি রূপে থাকা হয়!"

বিখ্যাত চিত্রকর হেডন্ গল্প করেন—যে, এক দিন সেরিডন্ সমর্সেট্ হৌসে ডিনার খাইতেছিলেন, এমন সময় এক জন চাকর ছুটিয়া আসিয়া কহিল—"মহাশয় বাড়িতে আগুন লাগিয়াছে।" সেরিডন নিশ্চিন্ত ভাবে কহিলেন—"আর এক বোতল ক্ল্যারেট মদ নিয়ে আয়! এ ত আর আমার বাড়ি নয়!"

এক একটা চর্চ্চে এক দিকে স্ত্রীলোক এবং অপর দিকে পুরুষেরা বসিয়া থাকে। একবার এইরূপ কোন এক গির্জ্জায় উপাসকদের মধ্যে কেহ কেহ কথোপকথন করিয়া গোল করিতেছিল। আচার্য্য এ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিলে স্ত্রীদলের মধ্য হইতে এক জন উঠিয়া কহিলেন "দেখুন, আমাদের দিক হইতে গোল হইতেছে না।" আচার্য্য কহিলেন "সেই এক সুবিধা; তবু ভরসা রহিল, এ গোল শীঘ্র থামিবে!"

এক জন ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুল্‌স্ পা—গ্রামের একটি এডেড্ স্কুলে এক্‌জামিন্ করিতেছিলেন। তিনি বালকদের যে একটি অঙ্কের প্রশ্ন দেন—সে প্রশ্নটি এই—"তোমার পিতার বয়স যখন ৯০ তখন তোমার জন্ম হয়;—তোমার বয়স যখন ৩০ তখন তোমার পিতার বয়স কত?" একটি বালকের স্লেটে যে উত্তর লেখা থাকে, সে উত্তরটি এই—"তখন বাবা মড়িয়া গিয়াছেন!" একটা বানান্ ভুল থাকুক্, কিন্তু উত্তরটি ঠিক হইয়াছিল!

মঙ্ক্‌লুইসের রচিত "The Castle Spectre" নামক নাটক অভিনয় করিয়া ড্রুরলেন নাট্যশালার অত্যন্ত লাভ হয়। এক দিন সেরিডনের সহিত মঙ্ক্‌লুইসের কি-একটা বিষয়ে তর্ক হইতেছিল। মঙ্ক্‌লুইস্ কহিলেন, "The Castle Spectre"-

এ যত টাকা হইয়াছে আমি তত টাকা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি যে, আমার কথাই সত্য! ষেরিডন কহিলেন, "আমি নিতান্ত গরীব, অত টাকা বাজি রাখিতে পারিব না। তবে, তোমামাদের হৃদয় যত টাকা পাওয়া উচিত ছি কবিতাপূর্ণ! বাজি রাখিতে প্রস্তুত আছি উত্তর দেন ত্র।" হ' মতই

গোলাপ-বালা।

(গোলাপের প্রতি বুল্‌বুল্‌)

রাগিণী—বেহাগ।

বলি,ও আমার গোলাপ বালা,
বলি,ও আমার গোলাপ বালা,
তোল' মুখানি, তোল' মুখানি,
কুসুম কুঞ্জ কর আলা।
বলি, কিসের সরম এত?
সখি, কিসের সরম এত?
সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি
কিসের সরম এত?
বালা, ঘুমায়ে পোড়েছে ধরা,
সখি, ঘুমায় চাঁদিমা তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্ বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগত যত।
সখি, বলিতে মনের কথা
বালা, এমন সময় কোথা?
প্রিয়ে, তোল' মুখানি আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত!
আমি এমন সুধীর স্বরে
সখি, কহিব তোমার কানে
প্রিয়ে, স্বপনের মত সে কথা আসিয়া
পশিবে তোমার প্রাণে!
আর কেহ শুনিবেনা, কেহ জাগিবেনা,
প্রেম-কথা শুনি প্রতিধ্বনি বালা
উপহাস সখি করিবেনা!
পরিহাস সখি করিবেনা।

তবে মুখানি তুলিয়া চাও!
সুধীরে মুখানি তুলিয়া চাও!
সখি একটি চুম্বন দাও!
গোপনে একটি চুম্বন চাও!
সখি তোমারি বিহগ আমি,
বালা, কাননের কবি আমি,
আমি সারারাত ধোরে, প্রাণ,
করিয়া তোমারি প্রণয় পান,
সুখে সারাদিন ধোরে গাহিব স্বজনি,
তোমারি প্রণয় গান!
সখি, এমন মধুর স্বরে
আমি গাহিব সে সব গান,
দূরে, মেঘের মাঝারে আবরি তনু
ঢালিব প্রেমের তান।
তবে— মজিয়া সে প্রেম গানে,
সবে চাহিবে আকাশ পানে,
তারা ভাবিবে গাইছে অপসর কবি
প্রেয়সীর গুণ গান।
তবে মুখানি তুলিয়া চাও!
সুধীরে মুখানি তুলিয়া চাও!
নীরবে একটি চুম্বন দাও
গোপনে একটি চুম্বন চাও!

সংশোধন।

ভারতী, চতুর্থ খণ্ড, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।

পৃথিবীর উৎপত্তি।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১২	১	১৬	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তে
৩১৩	,,	১২	যে	যেটি
৩১৪	,,	৬	সকল পদার্থেরি	আবর্ত্তমান সকল পদার্থেরি
,,	২	১৫	জ্যোতিষ্ক	জ্যোতিষ্ক, অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সকল ক্রমশঃ
,,	,,	১ (নোট)	খণ্ডের	খণ্ড
৩১৬	১	১০	নিয়মাবলীর দ্বারাই সমর্থিত	নিয়মাবলীর অনুযায়ী
,,	,,	১১	দ্বারা	দ্বারাও
,,	,,	৪ (নোট)	+	+
,,	,,	১০ (,,)	তাপ	চাপ
,,	,,	১৩ (,,)	+	+
,,	,,	১৪ (,,)	+	+
,,	,,	১৭ (,,)	বৎসর	ব্যাসের
,,	,,	১৮ (,,)	দ্বিগুণ হয়	দ্বিগুণ হয়। ভারতী সং
,,	২	৮	এখনকার যতদিন	যতদিন
,,	,,	১১	সূর্য্য	পৃথিবী সূর্য্য হইতে যে পরিমাণ উত্তাপ পায় সূর্য্য
৩১৭	১	১	ইহার কারণ এই,	সেই বাষ্পময়
	,,	৬	স্ফীত হইয়া	স্ফীত হইয়া উঠে।
,,	,,	১০	রেখাও	রেখার উপরিস্থিত স্থানও
,,	,,	,,	বিষুব রেখার নিকটস্থ বৃহৎ রেখাও	বৃহত্তর বিষুব রেখার উপরিস্থ স্থানও
,,	,,	১২	ক্ষুদ্র বৃহৎ	যদি দুই বস্তু ক্ষুদ্র বৃহৎ
,,	,,	,,	রেখা যদি	রেখাকে
,,	,,	১৩	রেখা	রেখা আবর্ত্তক বস্তু
,,	,,	১৫	দেশ	স্থান
,,	,,	১৬	দেশের	স্থানের
৩১৮	,,	১০	তাপমান	সেখানে তাপমান

চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব।

(বাঙ্গালা, ত্রিপুরা, ও আরাকাণ ইতিহাসের কিয়দংশ মাত্র।)

প্রথম অধ্যায়।

চট্টগ্রাম প্রদেশ কি সুন্দর। একবার [illegible] প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে [illegible] পারা যায় না। কেমন সুন্দর [illegible] শিখরমালা [illegible] "চন্দ্রনাথ পাহাড়" [illegible] ভগবান [illegible] কৈলাসনাথ বিরাজ করিতে-ছেন। (১) অনাদিকাল কলুষনাশিনী পাতাল [illegible] স্রোতস্বতী চন্দ্রশেখরের পরিচর্য্যার্থ [illegible] হইয়াছেন। তাহার প্রায় পাঁচ মাইল দূরে একটী কুণ্ডমধ্যে হুতাশন জলো[illegible] [illegible] (২) সীতাকুণ্ড [illegible] একটী জ্বালামুখী (লা[illegible] [illegible]) (৩) দৃষ্ট হইয়াছিল। পর্ব্বত মধ্যে স্থানে স্থানে লবণ-কূপ দৃষ্ট হয়।

এই প্রদেশের উত্তর সীমান্তে ফণী (৪) ত্রিপুরাকে চট্টগ্রাম হইতে পৃথক রাখিয়া ও মধ্যস্থলে কর্ণফুলী (৫) কয়েকটী উপনদীর সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীদ্বয়ের জন্মস্থান ত্রিপু-রাচল। শঙ্খনদী আরাকাণের (৬) উত্তর

(১) চট্টলে দক্ষিণ[illegible] [illegible] চন্দ্রশেখরঃ।
[illegible] ভৈরবী ভবানী [illegible] দেবতা।
[illegible] চন্দ্রশেখর।
(পীঠ নির্ণয়।

(২) বাড়বকুণ্ড। বঙ্গদেশস্থ তিনটী উষ্ণ প্রস্রবণের অস্তিত্ব আমরা জ্ঞাত আছি। এ-কটী উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়টী পার্ব্বত্য চট্ট-গ্রামস্থ "লিঙ্গশ্যাম" পর্ব্বতে। তৃতীয়টী বীরভূম প্রদেশে, নাম বক্রেশ্বর। বক্রেশ্বর তন্ত্রোক্ত পীঠস্থান। মুঙ্গের নগরের প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বে সীতাকুণ্ড নামে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। উহা বিহার দেশে।

(৩) ত্রিপুরা পর্ব্বত পার্শ্বে—"অষ্ট জঙ্গল" নামক স্থানে একটী জ্বালামুখী দৃষ্ট হইয়া-ছিল। মকং (বর্ত্তমান দ্বার ফিলিং) প্রদেশে "জ্বালাপাহাড়" শেখর শ্রেণী মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। বোধ হয় এই জ্বালাপাহাড়ই তন্ত্রোক্ত জ্বালামুখী।

(৪) কর্ণেল উইল ফোর্ড বলেন ইহার প্রাচীন নাম ঐরাবত-(—নাগ)-নদ।

(৫) প্রবাদ আছে চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তার কর্ণের কুণ্ডল ইহাতে পতিত হয়। তজ্জন্যই এই স্রোতস্বতী কর্ণফুলী নামে খ্যাত হইয়াছে। কর্ণেল উইল ফোর্ড ইহা-কে "কর্ম্মফুলী" লিখিয়াছেন। পৌরাণিক ভূগোলানুসারে এই নদী জয়াদ্রি হইতে উৎপন্ন।

(৬) এই প্রবন্ধে আমরা বারংবার আরা-কাণের নামোল্লেখ করিব। অতএব ইহার নাম-করণের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। এই প্রদেশে নরভুক

সীমান্ত পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া কর্ণফুলীর মোহনার প্রায় সাত মাইল দক্ষিণে সমুদ্রে পড়িতেছে। দক্ষিণ সীমান্তে "নাভিনদী" বা "সুবর্ণনদী" আরাকাণ ও চট্টগ্রামের সীমা রক্ষা করিতেছে। এই স্রোতস্বতীর আধুনিক নাম "নাফ" বা "টিকানাফ"। চট্টগ্রামের পূর্ব্বদিকে অত্যুচ্চ শিখর শ্রেণী। (৭) পশ্চিম দিকে অসীম অনন্ত জলরাশি। ইহার দৈর্ঘ উত্তর দক্ষিণে প্রায় দুই শত মাইল। পরিসর অনধিক ৬৪ মাইল। পরিমাণ ফল ৯৩৮৮ বর্গ মাইল। (৮) অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। বার্ষিক নিট রাজস্ব ২৪০৫২১৮ টাকা। এই প্রদেশটী দুইটী স্বতন্ত্র জেলায় বিভক্ত। পশ্চিম ভাগ "চট্টগ্রাম" (৯) পূর্ব্বভাগ চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ" (১০)। পার্ব্বত্য প্রদেশ আইন-বহির্ভূত শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছে।

এই সুন্দর ও বাণিজ্যোন্নত প্রদেশটী কোন্ সময়ে কোন্ নরপতির অধীন ছিল, তাহা পরিষ্কার রূপে লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত দুরূহ। রাজা তোড়লমল্ল চট্টগ্রাম প্রদেশ বাঙ্গলার দশম সরকারে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে ৭টী মহাল ও তাহার বার্ষিক রাজস্ব ২৮৫৬০৭ টাকা লিখিত হইয়াছে। আরব্য পারস্য ভাষাতত্ত্ববিদ মৃত মহাত্মা বুকমান সাহেব বলেন—"রাজা তোড়লমল্ল অন্যায় রূপে চট্টগ্রাম বঙ্গান্তর্গত লিখিয়াছেন।" রাজস্থানের ইতিহাসবেত্তা টড সাহেবের লিখা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে আকবরের সেনানী মহারাজ মানসিংহের বাহুবলে মোগল সাম্রাজ্য আরাকাণ অবধি বিস্তৃত হইয়াছিল। আমরা এরূপ উক্তির সত্যতা স্বীকার করিতে পারি না। রাজমালা, বিজাতীয় ইতিহাস ও বৈদেশিক ভ্রমণকারী সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্য্যালোচনায় বোধ হইতেছে-চট্টগ্রাম দীর্ঘকাল কোন এক রাজার অধীন ছিল না। ত্রিপুরাপতি ও আরাকাণরাজ ইহার আধিপত্য লইয়া নির-

---

রাক্ষসগণ বাস করিত বলিয়া পালি ভাষায় ইহাকে "রাক্ষপুরা" (রক্ষপুর) বলিত। পরে দেশীয়গণ অপভ্রংশে রাক্ষিয়াং—এবং বিদেশীয়গণ আরাকাণ করিয়াছেন। কর্ণেল ফেয়ার বলেন "এই প্রদেশে রাক্ষসগণ বাস করিত বলিয়া পালি ভাষায় ইহাকে রাক্ষছিক বলিত। ইহার অপভ্রংশ রাক্ষিয়াং—এবং তাহা হইতে আরাকান হইয়াছে।

(৭) উচ্চশৃঙ্গ—নীল পর্ব্বত ৫৬০০ ফিট—পিরামিড ৩০০০ ফিট—টিন ৩১০০ ফিট—রিরিঙ্গ ২৩৫০ ফিট—রাযুপর্ব্বত ২১৬০ ফিট—সুগারলোফ ১৩৪৯ ফিট উচ্চ।

(৮) মিরকাসিম যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চট্টগ্রাম প্রদান করেন ইংরাজগণ সে সময়ে ইহার পরিমাণ ফল ২৯৮৭ বর্গ মাইল স্থির করিয়াছেন।

(৯) চট্টগ্রামের উত্তর অক্ষান্তর ২০ অংশ ৪৫ কলা হইতে ২২ অংশ ৫৯ কলা,—পূর্ব্বদ্রাঘিমা ৯১ অংশ ৩০ কলা ৯২ অংশ ২৭ কলা।

(১০) পার্ব্বত্য প্রদেশের উত্তর অক্ষান্তর ২১ অংশ ১৩ কলা হইতে ২৩ অংশ ৪৭ কলা,—পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৯১ অংশ ৪৬ কলা হইতে ৯২ অংশ ৪৯ কলা।

ন্তর আহবে লিপ্ত ছিলেন। যবন রাজগণ সুবর্ণ গ্রামে পদার্পণ করিয়াই চট্টলাধিকারে লোলুপ হইলেন। দীর্ঘকালাবধি চট্টগ্রাম ভারতের পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তস্থ একটী প্রধান স্থান বলিয়া জগৎ সমক্ষে পরিচিত ছিল। (১১) পাশ্চাত্য বণিকগণ ইহাকে "পোর্টো গ্রাণ্ডো" (Porto Grando) বলিতেন। কিন্তু ১১১৬ শকাব্দে (১১৯৪ খৃঃ অঃ) ভূগোলবেত্তা এদ্রসী চট্টগ্রামকে "কর্ণবুল" লিখিয়াছেন। এই বন্দরের জন্মকাল নির্ণয় করা নিতান্ত সুকঠিন। শকাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও তথায় চীন ও আরব দেশীয় বনিকদিগের সমাগম হইত। (১২) অদ্যাপি বাণিজ্য বিষয়ে চট্টগ্রাম বঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে উন্নত। চট্টগ্রাম বাসীগণ নৌচালন বিদ্যায় চির পারদর্শী। পুরাকালে ইহারা ত্রিপুরার সমর তরীর (১৩) নাবি-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

কর্ণেল উইল ফোর্ড বলেন চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম "পুষ্পগ্রাম"। তন্ত্রে চট্টগ্রামের নামোল্লেখ আছে। তন্ত্রের বয়ঃক্রম ৩।৪ শতাব্দী মাত্র। কবিতায় চট্টগ্রামের পরিবর্ত্তে "চট্টল" লিখিত। আমরা তদনুসারে গদ্যেও পদ্যোচিত পদ ব্যবহার করিলাম। বোধ হয় প্রাচীন কালে "চট্ট ভট্ট" জাতি (১৪) চট্টগ্রামে বাস করিত। তাহাদের

(১১) আবোল ফাজেল লিখিয়াছেন—চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক শোভায় পূর্ণ (পর্ব্বত মধ্যস্থ) ও সাগর তীরবর্ত্তী একটী বৃহৎ নগরী। ইহা খৃষ্টান ও অন্যান্য বৈদেশিক বণিকদিগের প্রধান বাণিজ্য স্থান। (Gladwin's Ayeen Akbbery Vol. II, p. 10)

(১২) ডি, বারাস বলেন—পর্টুগিজদিগের চট্টগ্রামে পঁহুছিবার শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এদেশস্থ জনৈক ভদ্রলোক ২০০ শত সহচরের সহিত তথায় উপনীত হন। রাজ্যের তদানীন্তন অবস্থা দর্শনে তাহার হৃদয়ে একটী দুরাশা জন্মে। তিনি সেই আশায় মুগ্ধ হইয়া, একটী কুঠী খুলিয়া কারবার আরম্ভ করিলেন। ক্রমে দুই—দুইতে পাঁচ শত সৈনা সংখ্যা হইল। বণিক গৌড়েশ্বর নিকট পরিচিত হইয়া একবার উড়িষ্যা পতির বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি বঙ্গেশ্বরের শরীররক্ষক সেনাদলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তৎপর—আর কি—রাজার প্রাণবধ করিয়া বাঙ্গলার রাজাসন অধিকার।—ইনি হয় (হারসিরাজ শ্রেণীর) ফেরোজ—নয় হুসন সা।

(১৩) আমাদের দেশীয় রণতরীর বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। শকাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটী যুদ্ধ যাত্রায় কয়েক জন ইউরোপীয় নাবিক ও ভ্রমণকারী উপস্থিত ছিলেন। তাহারা যে "বহর" দর্শন করেন, সেই বহরে এই সকল রণতরী ছিল,—ঘরাব, কোস, জলবাস, পোরিন্দা, বজ্রা, পত্তিলা, লসব, পল্লিল, ভর, বালাম, খটগিরি, মহালগিরি, পলওয়ার। বোধ হয় এই সকল রণতরীর মধ্যে ঘরাবই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল। সেই সময় একখানি ঘরাব ১৪টী কামান বহন করিত। এইরূপ ১৪টী তোপ লইয়া সংগ্রাম করা সামান্য তরীর কার্য্য নহে। রণকালে চারি খানি কোস এক একখানি ঘরাবের সাহায্যের জন্য থাকিত।

(১৪) আধুনিক ভাট বা ভট্টজাতি বোধ হয় প্রাচীন কালে "চট্ট ভট্ট" নামে পরিচিত ছিল। পাল ও সেনরাজগণের অনুশাসন পত্রে "চট্ট ভট্ট" জাতির উল্লেখ আছে।

নামানুসারে সেই স্থান প্রথমতঃ চট্টের গ্রাম এবং তাহা হইতে ক্রমে চট্টগ্রাম হইয়া থাকিবে। কোন ও কোন ও ব্যক্তি চট্টগ্রাম নামকরণের অন্য রূপ ব্যাখ্যা ও করিয়া থাকেন।

চট্টগ্রাম প্রদেশ ত্রিপুরা রাজ্যের একটী অংশ মাত্র। ইহা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, (১৫) কর্ণেল উইল ফোর্ড বলেন, যে তিনটী নগরী হইতে "ত্রিপুরা" নিজ (Tripura or Triapura or three towns) (১৬) নাম প্রাপ্ত হয়। "চট্টল" তাহার অন্যতম। চট্টগ্রাম ত্রিপুরেশ্বরদিগের স্বত্ববিশিষ্ট সম্পত্তি, ইহা প্রাচীন বৈদেশিক ভ্রমণকারীদিগের ও বিশ্বাস ছিল। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের যত্নেই চট্টগ্রামে আর্য্যোপনিবেশ।

৮৭৫ শকাব্দে আরাকাণ রাজ ষোল সিংহ চন্দ্র ত্রিপুর সৈন্য জয় করিয়া চট্টলাধিকার করেন। তিনি উপল দ্বারা চট্টগ্রামে একটী জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কতকাল চট্টল তাহার হস্তে ছিল তাহার নির্ণয় নাই।

চট্টগ্রাম সদর ষ্টেশনের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তস্থ নসিরাবাদ নামক পল্লীতে একটী পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের কালে, একখানি তাম্রফল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ ৭॥ ইঞ্চ, প্রস্থ ৭ ইঞ্চ। উভয় পৃষ্ঠাই খোদিত অক্ষরে পূর্ণ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ সরস্বতী এম, এ মহোদয় ইহার সমগ্র পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে একাদশটী সংস্কৃত শ্লোকে একখানি ভূমির দান পত্র লিখিত। কিন্তু চতুঃসীমা গদ্যে লিখিত। অক্ষর বাঙ্গালা কিন্তু আজ কালিকার বাঙ্গালা নহে; যে দিবস বাঙ্গালা স্বীয় জননী মৈথিলীর ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছিলেন, এ সেকালের বাঙ্গালা। অক্ষরই তাহার প্রমাণ। তাম্রফলকের শীর্ষদেশে, প্রথম পৃষ্ঠায় ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ রাজচিহ্ন "চন্দ্র" "সূর্য্যের" প্রতি-

---

কোন ও কোন ও মহাত্মা চট্ট ভট্টের স্থানে "চণ্ড ভণ্ড" পাঠ করিয়া থাকেন। চণ্ড ভণ্ড জাতির অস্তিত্বই সন্দেহ স্থল। বিশেষত লক্ষ্মণসেন দেব প্রদত্ত—তর্পণ দীঘির তাম্রফলকের প্রকাশিত অনুলিপির (Photozincograph) দ্বিতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ পংক্তিতে "চট্ট ভট্ট" শব্দটী সুন্দররূপে পাঠ করা যায়। যে অক্ষরে ইহা লিক্ষিত তাহার বয়ঃক্রম ৭৬৭ বৎসর।

(১৫) হিয়োন সাঙের বাঙ্গলা ভ্রমণ। ভারতী, চতুর্থ ভাগ, ৪ সংখ্যা, ১৬৬ পৃষ্ঠা। সেনরাজগণ বাঙ্গলা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, যথা রাঢ়, বারেন্দ্র, বাগড়ি, বঙ্গ ও মিথিলা। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্বপ্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন "বঙ্গ লইয়াই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ।" প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের (চট্টগ্রাম বিভাগ) সহিত সেন শাসিত—বঙ্গের কোন সংশ্রব নাই। বোধ হয় রাজকৃষ্ণ বাবু ভ্রম ক্রমেই এরূপ লিখিয়াছেন।

(১৬) "ত্রিপুরা" নামক আর একটী প্রাচীন নগরী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা চেদি রাজ্যের রাজধানী। ঝব্বল' পুরের সন্নিকর্ষে "তিওয়ার" (Tewar) নামে একটী সামান্য পল্লিগ্রাম আছে। সেই "তিওয়ার"ই চেদির রাজধানী। See Journal—Am-Or-Society Vol. VI. page 516)

মূর্ত্তি, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় গরুড়ারূঢ় নারায়ণের মূর্ত্তি অঙ্কিত। প্রথমেই "শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১১৬৫"(**সুভমস্তু মকাব্দাঃ ১১৬৫।**) এতন্মধ্যে "শু, ম, স্তু, শ, কা, ১, ৬" অক্ষর ও অঙ্কগুলি আধুনিক বাঙ্গালা হস্তাক্ষরের ন্যায়। "ভ, ব্দা, ৫" বিকৃত। না মৈথিলী (ত্রিকুটে) না বাঙ্গালা। "৫" অঙ্কটীর সহিত ইং "5" অঙ্কের সাদৃশ্য আছে। মস্তকের উপরের টানটী না থাকিলে ঠিক বাঙ্গালা ছয় হইত। প্রথম শ্লোকটী নারায়ণের বন্দনামূলক। দ্বিতীয় শ্লোকটী রাজবংশের আদিপুরুষ ভগবান ঔষধিনাথের গুণানুবাদ মূলক। (১৭) দাতৃস্থলে "চক্রবর্ত্তী" শ্রীদামোদর দেবের নাম (১৮) গৃহীতা ধার্ম্মিক যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ শ্রীপৃথ্বীধর শর্ম্মা। দান "কামন পৌণ্ডিয়া" ও "কেতঙ্গ পাল" গ্রামস্থ পঞ্চ দ্রোণ ভূমি। (১৯)

এই দানপত্রের দ্বারা ১১৬৫ (কিম্বা ১১৬৬) শকাব্দে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা পতির হস্তে ছিল বলিয়া লিখা যাইতে পারে। (২০)

(১৭) অংস্থাজ্ঞ হরণনিপুণঃ
প্রেমদং কৈরবাণাং
চূড়াবত্নু ত্রিপুরজগিনঃ কেলি-
কাগারানিশায়াঃ।
লীলাগারং কুসুমধনুষো
বন্ধুরম্ভোজিনীনাং
শ্রীমানেকো জয়তি জগদা-
নন্দকারী মৃগাঙ্কঃ॥

(১৮) দামোদরের অপর নাম কীর্ত্তিধর, সিংহতুঙ্গ প্রভৃতি। ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে "সিংহতুঙ্গ" লিখিত হইয়াছে। ইতিবৃত্ত লিখিবার কালে পাঁচ খানি বংশাবলী আমাদের হস্তে ছিল। সে সমুদায়ে প্রায়ই নামের একতা নাই। ১৩২৯ শকাব্দের পূর্ব্বে ত্রিপুরার রাজকীয়-ঘটনাবলী রাজস্থানের ন্যায় কেবল চারণদিগের মৌখিক কবিতায় প্রকাশ পাইত। শ্রীধর্ম্ম মাণিক্যের রাজ্যাধিকার কালে ব্রাহ্মণ কুলজ পণ্ডিতদ্বয় শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর ইহা পুস্তকাকারে বাঙ্গালা পদ্যছন্দে লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তকই প্রাচীন "রাজমালা"।

(১৯) বিজ্ঞবর কোলব্রুক সাহেব "দ্রোণ" লইয়া কিছু গোলযোগ করিয়াছেন। আমরা পশ্চিম বঙ্গবাসী ভ্রাতৃবর্গকে দ্রোণের পরিচয় দিব। ত্রিপুরা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান, সমূহে ভূমি পরিমাণ-দ্রোণ, কানি, গণ্ড কড়ায় হইয়া থাকে। (কিন্তু শ্রীহট্টের মাপ স্বতন্ত্র।) "দ্রোণ" বোধ হয় শস্যের পরিমাপ (সংস্কৃত) হইতে ব্যবহার হইয়া থাকিবে। চারি কড়ায় এক গণ্ডা কুড়ি গণ্ডায় (একপণ) এককানি। ষোল কানিতে এক দ্রোণ। ১২ নল দীর্ঘ ও ১০ নল প্রস্থে (ইহার পুরণ অঙ্ক) ৭৷৷০ কাহন।) এক কানি প্রত্যেক নল /০ পন গণনা হইয়া থাকে। চারি প্রকার নলের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা—৭,—১৪,—১৮,—২২ হস্ত পরিমিত। ৭ হস্ত নলের এক দ্রোণ ভূমিতে ১৪৷৷৪ চৌদ্দ বিঘা চৌদ্দ কাঠা; ১৪ হস্ত নলের ১ দ্রোণ ভূমিতে ৫৮৷৷১ কাঠা; ১৮ হস্ত নলের এক দ্রোণ ভূমিতে ৯৭/৪ কাঠা; ২২ হস্ত নলের এক দ্রোণ ভূমি ১৪৫/৪ এক শত পঁয়তাল্লিশ বিঘা চারি কাঠা। কোলব্রুক সাহেব বলেন এক দ্রোণ প্রায় আট বিঘা ভূমির সমান। (Colebrook's Essays Vol. II, p, 245) বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন ৬৪ বিঘায় এক দ্রোণ।

(২০) এই শাসন পত্র খানি, পূর্ব্বোক্ত

আফ্রিকা দেশীয় বিখ্যাত পর্য্যটক ইবন বতোতিয়া ১২৭২ শকাব্দে বাণিজ্যোন্নত চট্টগ্রামে (Sadkawan) উপনীত হন।(২১) বাঙ্গালার প্রথম স্বাধীন যবন ভূপাল ফকি-রোদ্দিন আবোল মোজাফর মৌবারক সাহ সে সময়ে চট্টলাধিকারী ছিলেন। ঐ অব্দের অন্তে ইহা আরাকাণ রাজ মেঙ্গদির হস্তগত হয়। মেঙ্গদি ১০৬ বৎসর আরাকাণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৬৪১ ব্রহ্মা শকে (২২) (১২০১ শকাব্দে) সিংহাসন আরোহণ করেন, ৭৪৭ ব্রঃ শকে (১৩০৭ শকাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৩২৯ শকাব্দে আরাকাণ রাজ মেঙ্গতি সৈও মোওয়ান (বা নরমিত হলা) রাবা রাজ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া বাঙ্গলায় (সুরতন,

লক্ষ্মণ সেন প্রদত্ত—তর্পণদীঘির—শাসন পত্র হইতে ১৩০ বৎসরের কনিষ্ঠ। সেন রাজগণের যে কয়েক খানি তাম্র ও প্রস্তর ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বারিন্দার (বোধ হয় বারিন্দ্র) প্রস্তর ফলক সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ; তর্পণ দীঘির তাম্র শাসন দ্বিতীয়; বাখরগঞ্জে প্রাপ্ত (কেশবসেনের) দুই খানি তাম্র ফলক তৃতীয় ও চতুর্থ; বৌদ্ধ গয়ার অনুশাসন পত্র (সেন বংশের শেষ রাজা অশোক চন্দ্রের সমসাময়িক) পঞ্চম বা সর্ব্ব কনিষ্ঠ। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থে লক্ষ্মণ সেনের এক খানি তাম্র শাসনের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন "ত্রিবেণীর ৺ হলধর চূড়ামণী মহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ঐ সনন্দের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি ও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেন নাই।" অথচ দেখিতে পাওয়া যায় সেই সনন্দের প্রতিলিপি পূর্ণাবস্থায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্ধৃত প্রতিলিপির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না বলিয়াই, আমরা ইহাকে আমাদের তালিকা ভুক্ত করিলাম না। সেন রাজগণের শাসন পত্রের অক্ষর গুলি প্রায়ই মৈথিলী (তিরুটে)। আর ত্রিপুরেশ্বরদিগের শাসন পত্রের অক্ষর প্রায়ই বাঙ্গলা। এতদ্দ্বারা শকাব্দের একাদশ শতাব্দীর অন্ত ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বাঙ্গলা অক্ষরের জন্মকাল অনুমিত হইতেছে।

(২১) মূর পরিব্রাজক কতকগুলি "পিরের দরগা" দর্শন জন্য বাঙ্গলার পূর্ব্ব দিকস্থ পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে "বদরের দরগা" বিখ্যাত। বোধ হয় পাঠক মাত্রেই নাবিকদিগের মুখে বদরের নাম শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু বদর বতোতিয়ার পর সাময়িক। ১৩৬২ শকাব্দে বদরের মৃত্যু হয়। ইহার ৯০ বৎসর পূর্ব্বে মূর পর্য্যটক চট্টগ্রামে পদার্পণ করেন। কোনও কোনও লিখক (Sadkawan) কে সপ্তগ্রাম বিবেচনা করেন। বতোতিয়া পির বোরাহেনদ্দিনের দর্শন জন্য খানবালিক (পিকিন) নগরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্ণ গ্রামে চীনাবাণিজ্যতরী (Junik) আরোহণ করেন। বতোতিয়া দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের দূতরূপে চীন সম্রাটের দরবারে উপস্থিত—ও সম্মানের সহিত গৃহীত হন।

(২২) ব্রহ্মরাজ শিববংশীর অধিকার কালে প্রচলিত "ব্রহ্মা" বা "মঘি" শক প্রচলিত হইয়াছে। ব্রহ্মাগণ ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা করে। প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে ১৩ মাসে বৎসর ধরা হয়। অতিরিক্ত মাসটী ৩০ দিনে গণিত হইয়া থাকে। ইহাদের বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়।

(২৩) আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে সময় মহা রাজাধিরাজ রায় কংশনারায়ণ লস্কর (২৪) জোয়ান পুরের যবনরাজের সহিত আহবে লিপ্ত ছিলেন। আরাকাণরাজ বঙ্গেশ্বরের সৈন্য বলে পুনর্ব্বার আত্ম সিংহাসন লাভ

(২৩) আরাকাণের ইতিহাস "রাজোয়াং" গ্রন্থে স্থরতন (Thu-ro-tan) লিখিত। ফেয়ার সাহেব "স্থরতন" বাঙ্গলার নামান্তর বিবেচনা করেন। কিন্তু আমাদের একটু সন্দেহ আছে। কারণ ফেয়ার সাহেব "ত্রিপুরা" ও "বঙ্গের" মধ্যে কোন প্রভেদ রাখেন নাই। তিনি অনেক সময় নন্দীর মুণ্ড শিবের স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছেন।

(২৪) মহারাজ কংশ নারায়ণ রায় তাহির-পুরের রাজ বংশজ। তাহিরপুর বিথোরিয়ার অন্তর্ভূত (See E. I. Co.'s Fifth Report)। কংশ নারায়নের পিতামহ রাজা বিজয়,"লস্কর" উপাধি পাইয়াছিলেন। কংশ নারায়ণ বা-রেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের নিরাবিল পটীর নিয়ম বন্ধন করেন। তিনি বাহুবলে সামসুদ্দিনকে জয় করিয়া বাঙ্গলার রাজাসন অধিকার ক-রেন। প্রজারঞ্জন কংশ নারায়ণ সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। জনৈক নীচাশয় মুশলমান লিখক (গোলাম হুসন) বঙ্গকুলচূড় কংশের চরিত্র যেরূপ চি-ত্রিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমা-দের শরীর কণ্টকিত হইয়াছিল। এবম্প্রকার ঐতিহাসিক কুলকলঙ্কদিগের লিখায় হিন্দু-জাতি চিরকাল জর্জ্জরিত; গোলাম হুসন লিখিয়াছেন,"সামসুদ্দিন কয়েক বৎসর রাজ্য ভোগ—করিয়া পীড়াগ্রস্ত হন, সেই রোগে তাহার মৃত্যু হয়; কিম্বা সেই "অসুর" "কা-ফের" কংশ চক্রান্ত করিয়া তাহার প্রাণ বধ করে।" অন্যান্য ঐতিহাসিকদিগের মতানুসরণ করিয়া বুকমান সাহেব বলেন"মহারাজ কংশ ভুজবলে বাঙ্গলার রাজাসন অধিকার করিয়া-ছিলেন।" গোলাম হুসন লিখিত "রাই-য়াজ সুলতান" (নৃপালবর্গের উদ্যান) নামক গ্রন্থ এক প্রকার নূতন। ইহার বয়ঃক্রম ৯১ বৎসর মাত্র। জর্জ্জ উদেনি সাহেবের অনু-রোধ ক্রমে ১৭৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে ইহা লিখিত হয়। সুতরাং ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অতি অল্প। মার্সমেন, ওয়েষ্ট মেকৃট প্রভৃতি লিখকগণ "কংশ" কে গণেশ (দিনাজপুরের রাজা) লিখিয়াছেন। ফলে তাহা ভ্রমাত্মক। কর্ণেল ডেল্টন ভ্রম ক্রমে কংশকে কুঁচরাজা বিবেচনা করিয়াছেন। আরব্য পারস্য ভাষা তত্ত্ববিদ মৃত মহাত্মা বুকমান সাহেব হস্ত লিখিত গ্রন্থ সকল হইতে "কংশ" পাঠোদ্ধার করিয়াছেন—(But all MSS. spell the Raja's name—Kans, not Ganes; and I am inclined to adhere to the spelling of the MSS. and read the name as Kans or Kansa) বিজ্ঞবর লেড্‌লে সাহেব ও ইহাকে "রাজা কংশ" (Raja Kanis) লিখিয়াছেন। বুকমান সাহেব বলেন মহারাজ কংশের সময় হইতে বঙ্গের তদানীন্তন—রাজধানী বিভাগ "রাজ-সাহি" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কংশের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনারায়ণ (জিতমল্ল) পশ্চাৎ জেলালুদ্দিন পৈত্রিক আসন অধিকার করেন। যদু কংশের যবন উপপত্নীর গর্ভজ বলিয়া ষ্টুয়ার্ট সাহেব অনুমান করেন। কংশের পৌত্রের বাঙ্গলা শাসনকালে জনৈক চীনরাজদূত বাঙ্গলার রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কংশের অন্যতম পুত্রের বংশ-ধরগণ দীর্ঘকাল তাহিরপুর রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। শিবপ্রসাদ এই বংশের শেষ নরপতি। তাহিরপুরের রাজগণ, বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম। কংশ নারায়ণ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা কৃতজ্ঞ-চিত্তেও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিব।

করেন। আরাকাণ কিয়ৎকালের জন্য বাঙ্গালার অধীন ছিল।

১৪৩৪ শকাব্দে চট্টলের আধিপত্য লইয়া একটী তুমুল কাণ্ড হয়। হিন্দু, যবন ও মগ এই জতিত্রয়ের রুধিরে চট্টলাচল রঞ্জিত হইয়াছিল। ত্রিপুরসেনানী মহাবীর রায় চয়চাগ হনুমান-মূর্ত্তিলাঞ্ছিত পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন। আরাকাণ রাজ বৃষভ-ধ্বজ————, ও "কামরূপ ও কোমতা বিজয়ী" আলাউদ্দিন আবোল মোজাফর হুসন সার সৈন্য গণ্য মহম্মদীয় পতাকা লইয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। দীর্ঘকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল। অবশেষে যবন ও মগদিগের ভুজগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, রায় সেনানী বিজয়ী পতাকায় পরিশোভিত হইলেন। হুসন সা এই অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি দুইবার ত্রিপুরার ধ্বংস করিবার জন্য সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই।

রায় সেনানী যে সময় গোমতী সৈকত ভূমি যবন রুধিরে রঞ্জিত করিতে ছিলেন, তখন মগেরা চট্টগ্রাম অধিকার করে। তিনি প্রথমবার যবন জয় করিয়া আরাকাণ পতির প্রতিকূলে যাত্রা করেন। তিনি নাভি নদীর তীরে উপনীত হইয়া সংবাদ পাইলেন, হুসন সার সেনাদল পুনর্ব্বার ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে। তখনই তাহাকে কুমিল্লা আসিতে হইল। দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি যবন জয় করিয়াছিলেন (২৫); কিন্তু চট্টগ্রাম ত্রিপুরেশ্বরের হস্তস্খলিত হইল। ১৪৩৭ শকাব্দে মহারাজ শ্রীধন মাণিক্য দেবের মৃত্যু হয়। সেনাপতিগণ গৃহ বিরোধে সংলিপ্ত হইলেন।

১৪৩৯ শকাব্দে জন, ডি, সেলভেরা আরাকান রাজ কর্ত্তৃক আহূত হন। তিনি চট্টগ্রাম দিয়া গমন করিয়াছিলেন। সে সময় চট্টল আরাকাণ পতির হস্তে ছিল। (২৬) তাহার ৬ বৎসর পর ত্রিপুরেশ্বর দেব মাণিক্য দেব মগসৈন্য জয় করিয়া পুনর্ব্বার চট্টলাধিকার করেন।

মহাবীর রায় সেনানী হুসনসার হৃদয়ে যে আঘাত করেন, তাহার দারুণ বেদনা বঙ্গেশ্বর চিরকাল সহ্য করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ্ঞী মেরী "ক্যালে" "ক্যালে" শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। বঙ্গায় যবন ভূপাল-গণ-তিলক হুসন মুমূর্ষাবস্থায় তদ্রূপ চট্টগ্রামের নাম জপিয়াছিলেন। তাহার উপযুক্ত পুত্র নসরত, স্বর্গগত পিতার পরিতোষ জন্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। তিনি পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। অনেকেরই এরূপ সংস্কার যে নসরথ সা চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মহম্মদিয় ধর্ম্মপ্রচার করেন। প্রকৃত পক্ষেও তাহার অত্যাচারে পূর্ব্ব দক্ষিণ বঙ্গবাসী

(২৫) সুবর্ণ গ্রামের একটী মসজিদের দ্বারস্থ প্রস্তর ফলক পাঠে বোধ হয় হুসন সা ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

(২৬) See Phayri's History of Pegu (Journal—As. So. Bengal Vol. XLII. part I page 127).

নীচ শ্রেণীর মানবগণ প্রায়ই সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

ডি, বরোস (২৭) বলেন—গোয়ার পর্টুগিজ গবর্ণর মুনো, ডা, চোনা চট্টগ্রামে বাণিজ্য সংস্থাপনে অভিলাষী হইলেন। তিনি পাঁচ খানি জাহাজ দুইশত লোক ও ডি, মোল্লাকে তাহার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া ১৪৫৭ শকাব্দে (১৫৩৫ খৃঃ অঃ) চট্টলে প্রেরণ করেন। সে সময় চট্টল গৌড়েশ্বর মহম্মদের হস্তে ছিল। ডি, মোল্লা চট্টগ্রামে পঁহুছিয়া বঙ্গেশ্বর সন্নিধানে উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। মহম্মদ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শিশু ফিরোজশার শিরশ্ছেদ করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। কিন্তু তিনি সুখের অধিকারী হন নাই। পাপীর সন্দিগ্ধ অন্তঃকরণে কখনই শান্তি বিরাজ করিতে পারে না। মানব মাত্রই তাহার বিশ্বাসের অনাস্পদ ছিল। মেক্‌বত বা মহেন্দ্র মাণিক্য দেবের ন্যায় মহম্মদ অহোরাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। ডি, মোল্লার অনুচরগণ গৌড়ে উপনীত হইলে, মহম্মদ তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া, ডি, মোল্লাকে ধৃত করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তিনিও তাঁহার অবশিষ্ট অনুচরগণ রুদ্ধ হইয়া—নিষ্ঠুরতার সহিত গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল। এদিকে ব্যাঘ্র নিহন্তা "সের" বিশ্বাসঘাতক মহম্মদের দণ্ডবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মহম্মদ কারারুদ্ধ পর্টুগিজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুনো, ডা, চোনা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র চট্টগ্রামে বাণিজ্য সংস্থাপনের ইহা একটী উত্তম সুযোগ বিবেচনায়, তিন খানি রণতরী মহম্মদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। কহলগাঁর নিকট একটী যুদ্ধে পর্টুগিজগণ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে। মহম্মদ শা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের নিকট অতিরিক্ত সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। চোনা তদনুসারে পেরেজ, ডি, সামপিওকে নয়খানি রণতরীর সহিত বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। সামপিও বাঙ্গালায় পঁহুছিয়া শ্রুত হইলেন,—পাপী মহম্মদের প্রাণ বধ করিয়া মহাবীর সের রাজাসন অধিকার করিয়াছেন।

ত্রিপুরেশ্বর দেবমাণিক্য দেবের মৃত্যুর পর তাহার কুলতিলক পুত্র মহাবীর বিজয় মাণিক্য দেব অভ্যুদিত হইয়া স্বীয় "বিজয়" নাম সার্থক করিয়াছিলেন। তিনি কখনও কোনও সংগ্রামে বিজিত হন নাই। বিজয় চট্টগ্রাম অধিকার করেন। উড়িষ্যা বিজয়ী কর্‌রাণী বংশীয় সুলেমান চট্টলোদ্ধার জন্য দশ সহস্র পদাতি ও তিন সহস্র অশ্বারোহী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্রমে আট মাস যবন ও ত্রিপুর সৈন্যের রুধিরে চট্টলাচল রঞ্জিত হইয়াছিল। অবশেষে যবন সেনা পরাজিত হইলে সেনানী মহম্মদ খাঁকে চতুর্দ্দশ দেবতার (২৮) নিকট বলি দেওয়া হই-

(২৭) ইনি লিসবনস্থ ইণ্ডিয়া আফিসের অন্যতম কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ভারতে পদার্পণ করেন নাই। পর্টুগিজ গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্র হইতে আপন গ্রন্থ সংকলন করেন। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

(২৮) ত্রিপুর-রাজ-কুল দেবতা——

য়াছিল। বিজয় মাণিক্যের সময়ে আরাকাণপতিদিগের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা হয়। কিন্তু তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আরাকাণরাজ মেঘমুক্ত ভাস্করের ন্যায় প্রচণ্ড কিরণ জালে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। বিজয়ের মৃত্যুর পর আত্মকলহে ত্রিপুরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। (২৯)

"হয়োমা হরিমা ঋণী কুমারোগণকোবিধুঃ।
থাক্কি গঙ্গাশিখাঁকামোহিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশ।"
ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত। ৪ পৃঃ।

(২৯) কর্ণেল ফেয়ার লিখিয়াছেন—"In the reign of Meng Phaloung, father of the Meng Radzagi, the kings of Bengal had became weakened and he held Chittagong and the country as far as the Magna." যদি মূলগ্রন্থে এস্থলে "সুরতন" লিখিত হইয়া থাকে তবে ফেয়ার সাহেব আদ্যোপান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই সময়ের প্রত্যক্ষ দর্শী ইংলণ্ড দেশীয় পর্য্যটক রল্‌ফ ফিচ্ লিখিয়াছেন, "আমি, সপ্তগ্রাম হইতে ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্য দিয়া গমন করিয়াছিলাম আরাকাণ ও রামুবাসী মগদিগের সহিত ত্রিপুরনাথ অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ত্রিপুরার দুর্ব্বলতায় চট্টগ্রাম বারংবার আরাকাণ রাজের হস্তগত হয়।" (From Satagam I travelled by the country of the king of Tipara, with whom the Mogen have almost continual warres. The Mogen which be of the kingdome of Recon and Ramc, be stronger than the king of Tipara, so that Chatigau, or Porto Grando, is oftentimes under the king of Recon.)

ভিনিশীয় বণিক সিজার ফ্রেডরিক ১৪৮৫–১৫৩০ শকাব্দে আসিয়া মহাদেশ ভ্রমণ করেন। তাহার সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সে সময় পিগু হইতে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য চট্টগ্রামে আমদানি হইত। (৩০) বোধ হয় পিগু ও আসাম দেশীয় রৌপ্য দ্বারাই প্রাচীন কালে বাঙ্গালার মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইত। ফ্রেডেরিকের লিখা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে,—আমাদের দেশে প্রাচীন কালাবধি ১০।১২ বৎসরান্তে এক একটী ঝড় হইয়া আসিতেছে।

৯০২ ব্রঃ অব্দে (১৪৬২ শকাব্দে) পিগুর অধিপতি তাবংশিউয়তি, চক্রবর্ত্তী (Tsekyawati) উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র "মহাযুবরাজ" (পালি ভাষায় Maha-Upa-Radza, ব্রহ্ম ভাষায় Ein-She-meng) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবা, প্রোম, তেং গোষে, মার্ত্তাবান প্রভৃতি দেশের রাজগণ তাহার রাজাসন সমক্ষে মস্তক অবনত করিলেন। স্বাধীন আরাকাণের প্রতি সম্রাটের বিষদৃষ্টি পড়িল।

এই সময় আরাকাণ পতির মৃত্যু হয়। শিশু মহাধর্ম্মরীত পৈতৃক আসন অধিকার করেন। পিতৃহীন শিশু রাজপুত্রদিগের পিতৃব্য এক একটী দ্বিতীয় কৃতান্ত। জগ-

---

ফেয়ার সাহেব যে সময়ের ঘটনা লিখিয়াছেন, সে সময় মুসলমানগণ ফর্ণীতীর স্পর্শ করিতে পারে নাই।

(৩০) আমাদিগের প্রাচীনেরা পিগুকে "সুবর্ণ ভূমি" [illegible] ইহার নাম [illegible]।

ত্রের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। মৃত আরাকাণ রাজের ভ্রাতা ভ্রাতষ্পুত্রের প্রাণ বধ করিয়া সিংহাসন অধিকারে লোলুপ হইলেন। তিনি সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ৯০৮ ব্রঃ অব্দে সম্রাট আরাকাণ জয় করিতে চলিলেন। শিশু মহাধর্ম্মরীত ভয়াতুর হইয়া দেশপ্রথানুসারে "স্বর্ণ" ও "রৌপ্য"—"কুসুমাঞ্জলি" সম্রাট পাদ পদ্মে সমর্পণ করিলেন। সম্রাট বিনা যুদ্ধে আরাকাণ রাজকে করদ শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করিয়া স্বীয় রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রায় ৩০ বৎসর আরাকাণের সৌভাগ্যসূর্য্য দুর্ভাগ্য ঘনঘটায় আচ্ছাদিত ছিল। পুনর্ব্বার আরাকাণ রাজ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। ৯৪২ ব্রঃ অব্দে সম্রাট আরাকাণের বিরুদ্ধে আট সহস্র পদাতি ও তের রণতরী প্রেরণ করিলেন। ক্রমে এক বৎসর সংগ্রাম চলিল। পরবৎসর কার্ত্তিক মাসে আরও এক দল সেনা পূর্ব্বপ্রেরিত সেনার সাহায্যার্থে প্রেরিত হয়। এই যুদ্ধ যাত্রায় কুমার শ্রীশুধর্ম্মরাজ সেনানী হইয়াছিলেন। এই সময় পর্টুগিজ দিগের সহিত আরাকাণ রাজের সখ্যতা সংস্থাপিত হয়।

পিগুর ঈশ্বর ভোরেং নোয়েং কাল কবলিত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পৈতৃক আসন অধিকার করিয়া স্বীয় ভ্রাতাকে আরাকাণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লিখিলেন। তদনুসারে শ্রীশুধর্ম্ম সসৈন্যে পিগু যাত্রা করিলেন।

আরাকাণ রাজ বিপন্মুক্ত হইয়া মেঘমুক্ত ভাস্করের ন্যায় প্রখর প্রতাপাবলী বিস্তার করিলেন। ১৫০৩ শকাব্দে ত্রিপুরেশ্বর মহাবীর বিজয়মাণিক্য দেব কালকবলিত হন। ১৫০৪ শকাব্দ হইতে আরাকাণের প্রবল উন্নতি। ক্রমে আরাকাণের পরাক্রম এতদূর বৃদ্ধি হয়, যে ১৫২২ শকাব্দে আরাকাণ রাজ মেঙ্গরাযোগি রাজন্যবর্গ পূজিত পিগুর রাজাসন অধিকার করেন। (৩১) পর্টুগিজ ঐতিহাসিক গণ লিখিয়াছেন, তাহাদের সহায়তায় আরাকাণ রাজ এই কার্য্যটী সম্পাদন করিয়া, প্রত্যুপকার স্বরূপ পর্টুগিজদিগকে সিরাম নদীর মোহানাস্থিত সিরাম বন্দর দান করিয়াছিলেন।

১৫০৫ শকাব্দে খিজির পুরের (৩২)

---

(৩১) পর্টুগিজগণ মেঙ্গরাযোগিকে সেলিম সা (জেলিম জা) লিখিয়াছেন। পূর্ব্বোপদ্বীপ বাসীদিগের তিন প্রকার নাম দৃষ্ট হয়। দেশীয়, পালি ও যাবনিক। কোনও কোনও লিখক বলেন "আরাকাণ কিছুকাল বঙ্গের অধীন ছিল,"—যাবনিক নামই তাহার চিহ্ন বা ফল। আমরা ইহা সঙ্গত বোধ করি না। এই উক্তি সত্য হইলে কেবল একমাত্র আরাকাণে এরূপ যাবনিক নাম ও খাঁ উপাধি ব্যবহার হইত। সমগ্র পূর্ব্ব উপদ্বীপে এরূপ ব্যবহারের কোন কারণ ছিল না। আমাদের বিবেচনায় ইহা তাতার বংশীয়দিগের চীনাধিকারের ফল। মগগণ চীনাদিগের অনুকারী।

(৩২) বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরে "হাজিগঞ্জ" নামে যে স্থান আছে ঐ স্থানটী পূর্ব্বে খিজির পুর নামে পরিচিত ছিল। নবাব আবদুলগনি এই

(সুবর্ণ গ্রামের) ভৌমিক ঈশা খাঁ, আকবারের সেনানী সাহবাজ খাঁ কর্তৃক অধিকার চ্যুত হইয়া চট্টলে উপনীত হন। তিনি মগদিগের অনুকম্পায় তথায় একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন। সেই সেনাদলের সহিত তিনি খিজির পুরে পহুঁছিয়া মোগল সৈন্য ও কুঁচবিহারের রাজাকে জয় করেন।

ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্য দেব সিংহাসন আরোহণ করিয়া পুনর্ব্বার চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন। তিনি তথায় জলাশয় খনন ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৫৩২ শকাব্দে চট্টল পুনর্ব্বার মগদিগের হস্তগত হয়। আরাকাণরাজ পর্টুগিজ দিগের সাহায্যে ত্রিপুর সৈন্য জয় ও ত্রিপুরা লুণ্ঠণ করিয়া বাঙ্গলায় পদার্পণ করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র ইসলাম খাঁ সসৈন্য অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে সম্মিলিত মগ ও পর্টুগিজ গণ পরাজিত হইল। ইসলাম ফণী তীরাবধি তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম রঙ্গভূমির এক অভিনেতার অভিনয় ক্রিয়া শেষ হইল। ত্রিপুরেশ্বর চট্টগ্রাম হারাইলেন। ত্রিপুর রাজ-কিরীট হইতে উজ্জ্বল মণি খসিয়া পড়িল। ত্রিপুরার অধঃপতনের সুত্রপাত হইল। সময় সময় মগেরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়া যথেষ্ট অত্যাচার করিত। এই সকল দর্শন করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের একজন বৈদেশিক ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন ;—"ত্রিপুরা বা উদয়পুর (৩৩) রাজ্য স্বাধীন কিন্তু কোনও কোনও সময় সুবিখ্যাত মোগল ও আরাকাণ রাজ ইহা অধিকার করিয়াছেন।"' (Van den Broucke.)

ফলত মিবার ব্যতীত ভারতের অন্য কোন রাজ্য ত্রিপুরার ন্যায় উপদ্রব সহ্য করে নাই। (৩৪) ত্রিপুরার চির প্রতিদ্বন্দ্বী আরাকাণ রাজবংশ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। দুর্দ্দান্ত পাঠান মোগল গত হইয়াছে। ত্রিপুরা কখনই তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করে নাই। (৩৫) অল্পকাল হইল ত্রিপুরার প্রতি

স্থানে একটী সুন্দর পুষ্পবাটীকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

(৩৩) ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী। সুলতান সুজা ত্রিপুরা জয় করিয়া, ইহাকে "সরকার উদয় পুর" আখ্যা দান করেন। দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য দেব ভুজবলে স্বদেশের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সুজা ত্রিপুরার ললাটে যে কলঙ্ক রেখা অঙ্কিত করেন, তাহার লয় হইল না। ত্রিপুরা জগতে "সরকার উদয়পুর" বা "উদয়পুর রাজ্য" নাম পরিচিত রহিল।

(৩৪) This State was formerly of greater importance than it is at the present day. It was frequently involved in wars with Arracan on the one hand and the musalmans of Bengal on the other.

H. Beverley's Bengal Census Report of 1872, page 108.

(৩৫) Independent Tiperah is not held by gift from the British Government or its predecessors, or under any title derived from it or.

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বক্র দৃষ্টি পড়িয়াছে। কলিকাতায় রাজকীয় প্রাসাদে উপবেশন করিয়া জনৈক শ্বেতকায় মহাপুরুষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, "স্বাধীন ত্রিপুরা" পরিবর্ত্তে "পর্ব্বত ত্রিপুরা" লিখিত হইবে। কারণ উহা "জায়গীর মহাল" Feudatory State(৩৬)

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

them, never having been subjected by the Mugals.

Aitcheson's Treaties, Vol. I. p. 77.

(৩৬) ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গির মিবারকে "জায়গির মহাল" লিখেন। সম্রাট লিখিত বাক্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সহৃদয় টড লিখিয়াছেন—" Such was now the degraded title of the ancient, independent sovereign Mewar." আমরা এইরূপ বলিতে পারি কি? Such was now the degraded title of the ancient, independent sovereign Tripura.

পৃথিবীর উৎপত্তি।

"না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি
ঘোর দিগন্ত প্রসারি
ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল
জয় জয় মহিমা তোমারি।"

এই চিন্তা দ্বারা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব উত্তেজিত হইয়া উঠে এ চিন্তা দ্বারা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীবাসী ক্ষুদ্রতম মনুষ্য সৌরজগৎ অতিক্রম করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এ বিষয় চিন্তা করিবার সময় কেবলমাত্র উপরোক্ত বাক্য কয়েকটি অন্ধভাবে হৃদয়স্থ করিয়াই যে আমাদের উদ্দীপিত কৌতূহল নিবারিত হয়, তাহাও নহে, আমরা সাধ্যমত এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, এবং উৎপত্তির প্রণালী বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করিতে চেষ্টা করি।

পৃথিবী আমাদের বাসস্থান, সেই জন্ত পৃথিবীর উৎপত্তির তথ্য জানিতেই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মন উৎসুক। কিন্তু অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ-বিশিষ্ট সৌর জগতের প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের সহিত প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের এমনি বিশেষ সম্বন্ধ, যে একটির উৎপত্তির বিষয় জানিতে গেলেই, সমস্ত গুলির এক সঙ্গে জানিতে হয়।

সৌর জগৎ একটি বৃক্ষ স্বরূপ, সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ তাহার শাখা প্রশাখা। কোন একটি

শাখার উৎপত্তির বিষয় ভাবিতে গেলেই যেমন সর্ব্বাগ্রে বৃক্ষটির বিষয় ভাবিতে হইবে তেমনি কোন একটি গ্রহের উৎপত্তি দেখিতে গেলেই জগতের উৎপত্তি আগে দেখা আবশ্যক। জগতের উৎপত্তি দেখিলেই পৃথিবীর উৎপত্তি আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব।

অতি পুরাতন কাল হইতে প্রায় সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই সৃষ্টি সম্বন্ধে পৌরাণিক কিম্বদন্তি পাওয়া যায়। দু' এক জাতির কিম্বদন্তিতে সত্যের ছায়াও লক্ষিত হয়, কিন্তু সে সত্যের ছায়া এ স্থানে আলোচনা করা বাহুল্য, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর তত্ত্বানুসন্ধানের ফল নহে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে কল্পনার মানসসম্ভূত কন্যা।

প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর পর্য্যালোচনা দ্বারা এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় তাহাই বৈজ্ঞানিক জগতে পরিগৃহীত, এবং তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জার্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্ট প্রথমে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, সে বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েন।

এই যে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ছয়টি গ্রহ এবং নয়টি উপগ্রহ * চক্রাকারে আকাশে একই সমতলপথে ঘুরিতেছে ইহা কি কেবল একটি মাত্র দৈবঘটনা হইতে উৎপন্ন, কিম্বা কোন অবিদিত নিয়মের ক্রিয়া ফল? কাণ্ট ভাবিলেন, এতগুলি জ্যোতিষ্কের এরূপ একই পথে গতি এখনও দৈবাৎ হইতে পারে না, অবশ্য কোন এক সাধারণ নিয়ম বলে এই সমস্ত সৌরজগৎ একই পথে প্রধাবিত।

কিন্তু এমন একটি সাধারণ নিয়ম যাহা সমস্ত গ্রহ গুলির উপর খাটান যাইতে পারে তাহা কি?

কোন পদার্থ দ্বারা জ্যোতিষ্ক গুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকিলে তাহারা এইরূপ সমসূত্রে চালিত হইতে পারিত কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহারা পরস্পর অসংযুক্ত ভাবে শূন্যে ঘুরিতেছে। গ্রহগণ যে ইথার-ময় আকাশে ঘোরে, সে ইথার এত সূক্ষ্ম যে তাহা পদার্থ নামের বাচ্য হইতে পারে না। তবে কোন পদার্থ দ্বারা সংযুক্ত না হইয়া সমস্ত গ্রহ গুলির আশ্চর্য্যজনক একরূপ গতি হয় কেন? কাণ্ট অনুমান করিলেন, প্রথমে সৌরজগতের সমস্ত স্থান কেবল আবর্ত্তমান বিশৃঙ্খল জলন্ত বাষ্পময় পদার্থরাশিতে ব্যাপ্ত ছিল এবং সেই পদার্থ রাশির কোন, কোন স্থান অপেক্ষা কোন কোন স্থান ঘন থাকায় ক্রমে মধ্যাকর্ষণ বলে সেই বাষ্প জগতের লঘু অংশ, ঘন স্থান গুলির বাষ্পের সহিত মিলিয়া এক একটি গোলক রূপে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তিপ্রভাবে সকল বস্তুই সকল বস্তুকে টানে এবং মধ্যাকর্ষণ বলেই ঘন পদার্থ লঘু পদার্থকে টানিয়া আত্মসাৎ করে। কিন্তু কাণ্টের অনুমানের একটি এই বিশেষ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় যে

—যদি বিশৃঙ্খল পদার্থ রাশি, ঘন স্থান

---

* এই কয়টি গ্রহ উপগ্রহ মাত্র তখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

গুলিকে কেন্দ্রে করিয়া গোলক হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোলক না হইয়া একটি মাত্র গোলক হইবার কথা। কেননা সেই বিস্তৃত বাষ্পরাশির যে কয়েক স্থান অধিক ঘন ছিল, সেই স্থানে চারি দিকের লঘু বাষ্প মিশিতে গিয়া প্রথমে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোলক হইতে আরম্ভ হইলেও মাধ্যাকর্ষণ ও যন্ত্র বিদ্যার নিয়মানুসারে পরে সেই গুলি আবার একটি সাধারণ কেন্দ্রে আসিয়া একটি বৃহৎ গোলকরূপ ধারণ করিবে—অর্থাৎ ঐরূপে মিশিবার সময় যে সর্ব্বাপেক্ষা আবার ঘন হইবে, সেইটির আকর্ষণ দ্বারা কম ঘন স্থান গুলি তাহাতে মিশিয়া আবার একটি গোলক হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া এত গুলি গোলক তবে কি করিয়া হইল? এ সমস্যা সম্বন্ধে কাণ্ট কিছুই বলেন নাই। ইহা ছাড়া ছোট গোলক গুলি বড় গোলকের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার পথে ঘুরিবার তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহাও সন্তোষজনক নহে।

উইলিয়ম হারসেল্ যদিও অন্য যুক্তি দেখাইয়া বলেন, নীহাররাশি হইতে জগৎ অভিব্যক্ত, কিন্তু তিনি সৌর জগতের গতি দেখিয়া তাহা বলেন না। দূরবীণ যন্ত্র দ্বারা আকাশে জলন্ত বাষ্পময় নীহারিকা রাশির (Nebula) পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মনে হয় ক্রমে গাঢ় অংশের আকর্ষণে লঘু অংশ মিশিয়া এক একটি গোলক সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন এত এত সংখ্যক বাষ্পরাশি আবিষ্কৃত করেন যে তাহা হইতে তিনি এইরূপ একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। সেই হীনপ্রভ বিশাল বিস্তৃত বাষ্পরাশি যাহা এখনো জ্যোতিষ্কে পরিণত হইতে আরম্ভ হয় নাই, আবার তাহা হইতে যাহারা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও ছোট, যাহাদের মধ্যভাগ এতদূর জমাট বাঁধিয়াছে, যে শীঘ্রই একটি জ্যোতিষ্ক হইবে, এবং যাহারা জ্যোতিষ্ক হইতে সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে ও যাহারা সম্পূর্ণরূপে জ্যোতিষ্ক হইয়াছে—এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন বাষ্পখণ্ড দেখিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে জলন্ত নীহারিকা রাশি হইতেই জগৎ অভিব্যক্ত। এবং আকাশে যে সকল নীহারিকা এখন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও ক্রমে এক একটি জ্যোতিষ্ক রূপে পরিণত হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হয়। আধুনিক জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ দূরবীণ পরীক্ষা দ্বারা হারশেলের এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

লাপ্লাস আবার সৌরজগতের গতির আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলেন, আকাশে এখন যে গ্রহ উপগ্রহ সকল অবস্থিত তাহা এক সময় কেবল মাত্র সূর্য্যের বাষ্পীয় আবরণ দ্বারা পূর্ণ ছিল। কাণ্টের ন্যায় লাপ্লাস কল্পনা করেন না যে, সর্ব্বাগ্রে আকাশমণ্ডল বিশৃঙ্খল বাষ্পময় পদার্থ সমষ্টিতে ব্যাপ্ত ছিল, ক্রমে তাহা হইতে সৌরজগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে সৌরজগতের আদিম অবস্থায় জলন্ত বাষ্প পরিবেষ্টিত একটিমাত্র বিশাল সূর্য্য ছিল এবং সেই

সূর্য্য আপন বাষ্পাবরণের সহিত একটি আবর্ত্তন শলাকা অবলম্বন করিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরিত, ক্রমে ক্রমে এই উত্তপ্ত বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সঙ্কোচন অনুসারে সকল পদার্থেরি গতির বেগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং সূর্য্যেরও ক্রমে গতিবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং একটা ঘূর্ণমান গোলকের কোটীস্থ স্থানের গতি অপর সকল স্থান অপেক্ষা অধিক বলিয়া, গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের কোটীদেশস্থ পদার্থের কেন্দ্রাতিগ শক্তি অধিক বাড়িল, সন্দেহ নাই। এইরূপে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত বাষ্পময় সূর্য্যের বিষুবরেখা সন্নিহিত স্থল কেন্দ্রাতিগ শক্তি বৃদ্ধি হেতু কেন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি স্বতন্ত্র অঙ্গুরীয়াকার চক্ররূপ ধারণ করিল। অবশিষ্ট অংশ হইতে আবার এই রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ সূর্য্যের অতি বিস্তৃত বাষ্পাবরণ কতকগুলি স্বতন্ত্র চক্রে পরিণত হইল।

চক্রের ঘন স্থানের আকর্ষণে চারিদিকের লঘু অংশ সকল মিশিয়া ক্রমে আবার সেই চক্র একটি একটি গ্রহ রূপ ধারণ করিল। (১) সূর্য্যের পরিত্যক্ত অতি বিস্তৃত চক্রের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্বতন্ত্র হইয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক হইয়াছে তাহারা উপগ্রহ। যদি এমন হয় যে কোন চক্রের সকল স্থানের ঘনত্ব এবং সেইহেতু আকর্ষণ সমান, তাহা হইলে তাহার পদার্থরাশি এক স্থানে আসিয়া জমিতে না পাইয়া গোলক রূপে পরিণত হইতে পারে না, হয় তাহা চক্রাকারেই গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, যেমন শনিগ্রহের চক্র, নয় সে চক্র হইতে খসিয়া খসিয়া ছোট ছোট গ্রহমালা সৃজিত হয়।

লাপ্লাসের এই বিখ্যাত মতটি লইয়াই বৈজ্ঞানিক জগতে এত হুল স্থূল। এই মত অনুসারে সৌর জগতের সূর্য্য আদিম জ্যোতিষ্ক সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে। যদিও কোন কোন বৈজ্ঞানিক লাপ্লাসের এই মতের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে চাহেন, কিন্তু স্থূলতঃ ইহা বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে সমাদৃত। জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যত প্রকার মত বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে এই মতটিই জগতের দৃশ্যমান অবস্থার কারণ দর্শাইতে অধিক সক্ষম। জগতের আদিম অবস্থা কল্পনা করিয়া অবরোহী প্রণালীতে লাপ্লাস যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন, আরোহী প্রণালী

(১) আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন একটি চক্র না ভাঙ্গিয়া অখণ্ড ভাবে একটি গোলক রূপে পরিণত হওয়া তেমন যুক্তি সঙ্গত নহে। তাহারা বলেন কাল ক্রমে অঙ্গুরীয়কাকার চক্রের ক্ষীণ অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়া অনেক খণ্ড হইল কিন্তু সকল খণ্ডের সমান ভারবিশিষ্ট এবং সমান দূরস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশের অধিক সংখ্যক একত্রে মিশিয়া একটী বৃহৎ বৃহৎ গোলকে পরিণত হইয়াছে।

অবলম্বন দ্বারা আধুনিক পণ্ডিত সারউইলিয়ম টমসন ও হেলমহলট্‌স্, সেই একই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন।

এই পৃথিবীর উপরে যে সকল কাজ হইতেছে সকল কার্য্যেই সূর্য্যের উত্তাপ ব্যয়িত হয়। কি একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষ নাড়া, আর কি একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বত চূর্ণ হওয়া, সকলি সূর্য্য উত্তাপ দ্বারা সম্পাদিত। একদিন সূর্য্য হইতে উত্তাপ না আসিলেই পৃথিবীর সকল কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। এই যে পৃথিবীর জীবন-রক্ষণকারী উত্তাপ, যাহা আমাদের পক্ষে অপরিমিত বলিয়া মনে হয় তাহা সূর্য্যের হিসাবে অতি সামান্য। আমরা সূর্য্য হইতে যত উত্তাপ পাই সর্ব্বশুদ্ধ সূর্য্য তাহার ২১,৭০০,০০,০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকীরিত করিতেছে।

কিছুকাল হইতে একটা কথা উঠিয়াছে এইরূপ উত্তাপ বিক্ষেপ হেতু ক্রমশঃ সূর্য্যের উত্তাপের ভাণ্ডার ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা; যে হেতু শক্তির ক্ষয় ব্যতীত উত্তাপ-সঞ্চয় হওয়া সম্ভব নহে। এদিকে বিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি মূল সত্য এই যে, আপনা হইতে নূতন শক্তি উৎপন্ন হয় না—শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র।

তাহা হইলে সূর্য্য সেই আদিম কাল হইতে উত্তাপ রূপে যতটা শক্তি ব্যয় করিতেছে, সেই শক্তি আবার ত অমনি আপনা হইতে জন্মাইতে পারে না, তবে কেমন করিয়া সে ক্ষতি পূরণ হইয়া সূর্য্যে উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতেছে? আমাদের পৃথিবীতে আগুন জ্বালাইয়া রাখিবার নিমিত্ত ক্রমশই যেরূপ নূতন ইন্ধনের আবশ্যক সূর্য্যেরও ত সেইরূপ কিছু চাই এবং গ্রহখণ্ড সূর্য্যের উপর মাঝে মাঝে দ্রুতবেগে পড়িয়া কতক পরিমাণে সেইরূপ ইন্ধনের কাজ করিয়াও থাকে। কিন্তু যে পরিমাণে গ্রহখণ্ড সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে, তাহা সূর্য্যের উত্তাপ সমভাবে রক্ষা করিবার মত প্রচুর নহে।

সূর্য্য যে পরিমাণ উত্তাপ বিক্ষেপ করে তাহা সমভাবে রক্ষা করিতে গেলে প্রত্যেক ১০০ শত বৎসরে পৃথিবীর মত একটি বিশাল আয়তনের গ্রহ তাহার উপর পড়া চাই, তাহা হইলেই তাহার ১০০ বৎসরের উত্তাপ জমা থাকে, কিন্তু তাহা যেকালে পড়ে না, তবে কোথা হইতে সূর্য্যের উত্তাপ রক্ষা হইতেছে?

ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে, বাষ্প শীতল হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ বিক্ষেপ করে। সূর্য্যেরও বাষ্প-গোলক শীতল হইয়া ক্রমশঃ যতই সঙ্কুচিত হইতেছে ততই তাহা হইতে আবার নূতন উত্তাপ নির্গত হইয়া বাহিরের উত্তাপ সমান রাখিতেছে। শীতল হইবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িতেছে শুনিলেই হঠাৎ কেমন ধাঁধা লাগে। কিন্তু শীতল হইবার অর্থই উত্তাপ বিক্ষেপ করা। কোন বস্তু যতই শীতল হইতে থাকে ততই আপন অঙ্গ হইতে বাহিরে উত্তাপ ফেলিয়া দেয়, এইরূপে তাহার উত্তাপ কমিয়া সে শীঘ্র শীতল হয় বটে কিন্তু তাহার ক্ষিপ্ত উত্তাপ চতুপার্শ্বস্থ বস্তুর উপর কার্য্য করে—কোন বাষ্পীয় পদার্থে

এই নিয়মটি বিশেষ রূপে খাটে—এখনকার বাষ্পময় সূর্য্য একেবারে শীতল হইয়া যতদিন ঘন না হইবে, ততদিন এই নিয়মানুসারে সে উত্তাপ দিবে, ঘন হইয়া গেলে এ নিয়ম তাহাতে সম্পূর্ণ রূপ আর খাটিবে না। * এইরূপে উত্তাপ বিক্ষেপ দ্বারা সূর্য্য যে উত্তাপ হারাইতেছে, আবার নূতন সঙ্কোচনের দ্বারা সে ক্ষয় পূরণ হইতেছে। উত্তাপ রক্ষণের এই মতটি যে কেবল প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর দ্বারাই সমর্থিত তাহা নহে, অঙ্ক গণনা দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণীকৃত হয়।

সূর্য্য কত উত্তাপ-শক্তি ব্যয় করে, তাহা বিদিত বলিয়া সমভাবে উত্তাপ রক্ষা করিতে প্রতিবৎসর সূর্য্যের কতটুক সঙ্কুচিত হইবার আবশ্যক তাহাও স্থির করিতে পারা যায়। এখন সূর্য্যের যেরূপ আয়তন, এই আয়তনে প্রত্যেক বৎসরে ২২০ ফিট সূর্য্যব্যাস সঙ্কুচিত হইলেই এখনকার উত্তাপ পরিমাণ রক্ষা হইবে। এই নিয়মানুসারে সূর্য্য ২৫ বৎসরে ১ মাইল ও এক শতাব্দীতে ৪ মাইল সঙ্কুচিত হইবার কথা। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, এখনকার যত দিন সূর্য্যের অধিকাংশ বাষ্পময় থাকিবে, ততদিন শীতলপ্রবণ সূর্য্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরের উত্তাপ শক্তি সমভাবে রক্ষা করিবে। সূর্য্য এখন ২১৭০০০০০০০ গুণ উত্তাপ বৎসরে বিকীর্ণ করে, এবং এই পরিমাণে উত্তাপ দিতেছে বলিয়া স্থির হইয়াছে, সূর্য্য আদিমকাল হইতেই এই সম পরিমাণ উত্তাপ দিবার নিমিত্ত প্রত্যেক শতাব্দীতে সূর্য্যের ৪ মাইল সঙ্কুচিত হয়। এই সকল জানিয়া গণনা দ্বারা অতীত কালের সূর্য্যব্যাস স্থির করা আমাদের পক্ষে এখন কঠিন নহে। এই নিয়মানুসারে ১০০ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য ৪ মাইল বড় ছিল, দুশ বৎসরে ৮ মাইল, এই রূপে এক সময়ে সূর্য্য বুধের কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তৎপূর্ব্বে পৃথিবীর কক্ষ পর্য্যন্ত এবং আরো পূর্ব্বে সমস্ত সৌরজগৎময় ব্যাপ্ত থাকিবার কথা! এইরূপে আরোহী প্রণালী অবলম্বন করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা পরিশেষে লাপ্লাসের কল্পিত জগৎব্যাপী সূর্য্যের বাষ্পাবরণেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সূর্য্য পরিত্যক্ত বাষ্পীয় চক্র ক্রমে একটী গোলক রূপ ধারণ করিয়া পরে কিরূপে গ্রহ হইয়া দাঁড়ায় এইবার দেখা যাউক।

---

* এ কথাটা বোধকরি বেশ পরিষ্কার হইল না। মনে কর একটা বাষ্পীয় গোলকের উত্তাপের পরিমাণ উ ও তাহার ঘনত্ব ঘ তাহা হইলে তাহার চাপ=উ+ঘ। তাহার পর যখন গোলকের ব্যাস অর্দ্ধেক হইয়া গেল তখন তাহার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা চারি গুণ কমিয়া গেল এবং কেন্দ্র হইতে পরিধির দূরত্ব হ্রাস হেতু চাপের পরিমাণ চতুর্গুণ হইল। সুতরাং বস্তুতঃ পক্ষে পূর্ব্বে যেখানে যত পরিমাণ তাপ ছিল এখন তাহার ১৬ গুণ হইল কিন্তু এই গোলকের ঘনত্ব ৮ গুণ বাড়িল মাত্র। সুতরাং

১৬ চাপ=৮ ঘ+উ (নূতন উত্তাপের পরিমাণ অর্থাৎ ১৬ উ+ঘ=উ×৮ ঘ।

১৬ উ=৮ উ।

উ=২ উ।

অর্থাৎ বৎসর অর্দ্ধেক কমিয়া গেলে বিক্ষিপ্ত উত্তাপের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়।

ইহার কারণ এই, গোলকটি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শীতল হইয়া ঘন অর্থাৎ তরল হইতে থাকে। তরল গোলক ঘুরিলে যন্ত্রবিদ্যার নিয়মানুসারে তাহার দুই মেরু ঈষৎ দমিয়া যায়, এবং তাহার বিষুবরেখার সন্নিকটস্থ প্রদেশ স্ফীত হইয়া গোলকের আবর্ত্তনকালে তাহার সকল অংশই সমান আবর্ত্তন করে; মেরুর নিকটস্থ ক্ষুদ্র রেখাও যে সময়ে একবার ফিরে, বিষুব রেখার নিকটস্থ বৃহৎ রেখাও সেই এক সময়ে একবার আবর্ত্তন করে। ক্ষুদ্র বৃহৎ দুইটি রেখা যদি একই সময়ে আবর্ত্তন করে তবে বৃহৎ রেখাটি যে অধিক দ্রুতগামী তাহার সন্দেহ নাই। এক কথায় মেরু সন্নিহিত দেশ অপেক্ষা কোটী সন্নিহিত দেশের কেন্দ্রাতিগ গতি অধিক বলিয়া কেন্দ্রানুগ শক্তি অর্থাৎ কেন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া স্ফীত হইয়া ওঠে এবং উভয় মেরু বিষুবরেখা অভিমুখে দমিয়া দুই দিক চাপা হইয়া পড়ে।

পৃথিবীর সূর্য্য পরিত্যক্ত বাষ্প চক্রটিও এই নিয়ম অনুসরণ পূর্ব্বক এইরূপ একটি গোলক হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবীর গতির পরিমাণ অবলম্বন করিয়াই নিউটন পৃথিবীর বিষুব রেখাস্থ প্রদেশের উন্নতি এবং মেরু সন্নিহিত প্রদেশের অবনতির যে পরিমাণ স্থির করেন, পরে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত মাপিয়া তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক সভা কর্ত্তৃক ক্লেইরো কামু লেমনিয়ে লাপ্লণ্ড দেশে প্রেরিত হন। সেখানে তাঁহারা আবিউটিয়েও শেলস্যাসের সহিত একত্রে যখন পৃথিবীর একটি Arc মাপেন তখন সেই এক সময়েই বুগে ও কঁদামিন দক্ষিণ আমেরিকায় বিষুবরেখার পরিমাণ স্থির করেন। এই দুইটি পরিমাণ অবলম্বন দ্বারা অঙ্ক গণনা করিয়া নিউটনের গণনায় ফল নির্ভুল বলিয়া স্থির হয়।

পৃথিবীর মেরুদ্বয় চাপা ও কোটীদেশ স্ফীত বলিয়া এক প্রকার নিশ্চয় বলা যায় পৃথিবী এক সময় তরল বস্তু ছিল, কেননা একটা কঠিন বস্তু (যেমন প্রস্তর ইত্যাদি) চিরকাল ঘুরিলেও তাহার কোন স্থান চাপা কোন স্থান স্ফীত হইত না। কিন্তু তরল পদার্থ নির্ম্মিত গোলক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঘুরিলে তাহার উপর নিম্ন হইতে পদার্থ সকল নামিয়া মধ্যদেশ স্ফীত করিয়া তুলিবে।

এইরূপে বাষ্পময় পৃথিবী শীতল হইয়া ক্রমে যখন ঘন অবস্থায় আসিল, তখন সমস্ত বাষ্পচয় তরল হইল এমন নহে, বাষ্প অবস্থাতেই কতকটা পৃথিবীর উপরে রহিয়া গেল, এবং তাহার কতকাংশ এখনো পৃথিবীর উপরে রহিয়াছে, তবে যে সময়কার কথা হইতেছে সে সময়ে এখনকার অপেক্ষা যে অনেক দূর পর্য্যন্ত সে বাষ্প বিস্তৃত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। পৃথিবীর তখনকার বাষ্পাবরণ প্রায় চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই তরল অবস্থায় পৃথিবীর উত্তাপ সেনটিগ্রেড ডিগ্রির ২০৮০ পরিমাণ ছিল (তাপমান যন্ত্রের ১০০ ডিগ্রি উত্তাপেই জল ফুটিতে থাকে ১০০° উত্তাপই জীব জন্তুর প্রাণ নাশক) ২০০০ হাজার ডিগ্রি উত্তাপের ফল

কি ভয়ানক তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। লৌহ প্রভৃতি ধাতুময় দ্রব্য এবং অপর যে সকল বস্তু এই ভয়ানক উত্তাপে বাষ্পাকার হইয়া যায় তাহারা বাষ্পীয় অবস্থায় পৃথিবীর উপরে ভাসিতে লাগিল।

এই ২০০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেট উত্তাপ লইয়া দ্রব পৃথিবী শীতল আকাশ পথে ঘুরিতে লাগিল। যে আকাশে এখন গ্রহগণ অবস্থিত, সেখানকার উত্তাপ অতি অল্প। লাপ্লাসের মতে তাপমান যন্ত্রের—শূন্য ডিগ্রির নীচের একশত ডিগ্রি অপেক্ষা অধিক উত্তাপ থাকে না। এই শীতল আকাশ সংস্পর্শে আয় ব্যয়ের নিয়মানুসারে পৃথিবীর উত্তাপ অনেক কমিতে লাগিল, এবং শীতলতা বশতঃ ভূপৃষ্ঠের তরল পদার্থ ক্রমে ঘন হইয়া চটচটে হইতে লাগিল। আর একটি কথা এই, জোয়ার ভাঁটার সাহায্যেও পৃথিবীর শীতল হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল। কোন তরল বস্তুকে নাড়িয়া দিলে সে উত্তাপ ফেলিয়া দিয়া শীঘ্রই শীতল হয়, জোয়ার ভাঁটার কার্য্যগুণে পৃথিবীর সকল অংশই এক একবার উপরিভাগে উঠিয়া শীঘ্র শীতল হইতে লাগিল। এইরূপে সময়ে পৃথিবী যখন কিছু শীতল হইল তখন মেরু সন্নিহিত সমুদ্রে ভাসমান নীহার রাশির ন্যায়, অর্দ্ধ তরলাবস্থাপন্ন জমাট পদার্থ রাশি ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে তরল পৃথিবীর সমস্ত পৃষ্ঠদেশ এইরূপ জমাট পদার্থ রাশিতে আবৃত হইয়া তাহার উপরের দিব্য এক আবরণ সৃজিত হইল। কিন্তু এই সূক্ষ্ম আবরণে অভ্যন্তরিক জোয়ার ভাঁটা হতে করা অসম্ভব, সুতরাং সেই আবরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে তরল পদার্থরাশি প্রচণ্ড বেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তখনকার পৃথিবীর অবস্থা—সেই উত্তপ্ত পদার্থ রাশির ভীষণ বলে কম্পমান পৃথিবীর অবস্থা বর্ণনা অসম্ভব। সেই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ রাশিই ক্রমে শীতল হইয়া পর্ব্বত শ্রেণীরূপে শোভিত হইল।

আমরা এখন পর্ব্বতশ্রেণী সমাকীর্ণ, বাষ্প রাশি আবৃত উত্তপ্ত মরুময় পৃথিবী দেখিতে পাইতেছি। এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে একবিন্দু জল নাই। পৃথিবীর উত্তাপ যখন আরো হ্রাস হইল যখন শূন্যে ভাসমান জলীয় বাষ্পের বাষ্পাকারে থাকা অসম্ভব হইল, তখন সেই বাষ্প রাশি জমিয়া উত্তপ্ত জলাকারে পৃথিবীতে পতিত হইল। পৃথিবীর উপর প্রথম বৃষ্টিপতন এক নূতন যুগের আরম্ভ। উষ্ণ পৃথিবীর উপর বৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহা আবার উষ্ণ বাষ্পাকারে উঠিয়া গেল, শীতলাকাশের সংস্পর্শে আবার শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে পড়িল। জলের এইরূপ ঘন ঘন অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনিতে ও বিদ্যুতালোকে, অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী তোলপাড় হইয়া উঠিল।

এইরূপ ভীষণ কোলাহলময় ভৌতিক যুদ্ধ যে কতদিন চলিল তাহার স্থির নাই, এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় বলা যায় যে জলই শেষে বিজয়ী হইয়া সমস্ত পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইল। এইরূপে পৃথিবীর বাষ্পাবরণ কিছু পাতলা হইয়া আসিলে, সেই দিগন্তব্যাপী অন্ধকার

ইহর্ণ করিয়া সদর্পে দুএকটি সূর্য্যকররেখা দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সেই জল-প্লাবিত পৃথিবী সূর্য্যালোক প্রভাবে এখন কার অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

কাব্যের উদ্দেশ্য।

কিছুকাল হইল ইউরোপে হিতবাদী নামক এক দল দার্শনিক উঠিয়াছেন। শুনা যায় ইহাদের একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন, যখন কাব্যের উদ্দেশ্য আমোদ দেওয়া তখন কাব্যে ও Pushpin খেলায় প্রভেদ কি? এই কথায় ভীত হইয়া কেহ কেহ শশব্যস্তে তাড়াতাড়ি করিয়া উদোর বোঝা বেচারা বুধোর ঘাড়ে চাপান; ইঁহারা সভয়ে বলিয়া উঠেন, কাব্য পুলিসম্যান ও ধর্ম্মোপদেষ্টার সহকারী, নীতি সংরক্ষণ করা ইহার কার্য্য। এরূপ একটা গম্ভীর আওয়াজ শুনিয়া অন্ধকারে ভীতি জন্মাইতে পারে কিন্তু দিবসের আলোকে দেখিলে ভয়ের কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কাব্যের আমোদ দেওয়া উদ্দেশ্য বলিয়াই কি উহা Pushpin-এর সমান দরের বস্তু? আমার রাম কৃষ্ণ চাকরও মনুষ্য, বেদব্যাসও মনুষ্য বলিয়া কি এ দুজনের ভিতর বিশেষ প্রভেদ নাই? এরূপ কথা বেন্থাম না বলিলেই ভাল হইত; তাঁহার প্রতিভার সূর্য্যে ইহা কলঙ্ক মাত্র। একজন ন্যায় শাস্ত্রের ক-খ অধ্যায়ীও এরূপ যুক্তির ভ্রম ধরিতে পারে। আমোদ দেওয়াটা কি একটা তাচ্ছিল্য-ভাজন কাজ? আচ্ছা, যদি একজন হিতবাদীকে জিজ্ঞাসা করি, শাসন তন্ত্র প্রভৃতি পৃথিবীর মহামান্য বস্তুর কার্য্য কি? তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন যে মানুষের দুঃখের অপনয়ন করা ও সুখের বৃদ্ধি করাই এই সকল বস্তুর উদ্দেশ্য। এখানে মানুষের সুখ-দুঃখ অর্থে মানুষের বাহ্য সুখ-দুঃখ অর্থাৎ মানুষের আরাম। যদি বাহ্য দুঃখের হ্রাস ও সুখের বৃদ্ধি করিয়া একটা বস্তু মহামান্য হইতে পারে, তবে মনের দুঃখ অপনোদন ও সুখের বৃদ্ধি সাধন করিলে কেন না একটা বস্তু আরো মহামান্য হইবে? শরীর অপেক্ষা মনের প্রাধান্য বিষয়ে কাহার ত সন্দেহ নাই।

কাব্য প্রবেশ মাত্র অকুলীন বলিয়া সভা হইতে বহিষ্কৃত হইতেছিল, সে বিষয় ত এক প্রকার মীমাংসা হইল। এখন দেখিতে হইবে যে কাব্য ধর্ম্মোপদেষ্টা ও পুলিসম্যানের অনুচর কিনা। একজন বিখ্যাত চিন্তাশীল কবির এ বিষয়ে মত, "It (Poetry) is an art (or whatever better word our language may afford) of representing

in words external nature, and human thoughts and affections, by the production of as much immediate pleasure in parts as is compatible with the largest sum of pleasure in the whole." এখানে শুধু আমোদের কথাই আছে, নীতির কথা আদতেই নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কোল্‌রিজ নীতিশিক্ষা দেওয়া কবিতার উদ্দেশ্য বলিয়া ধরেন নাই। কিন্তু এরূপ একটা বড় নামের দ্বারে শরণাগত না হইয়া এ বিষয় সবিস্তরে আলোচনা করিলে কি দাঁড়ায় দেখা যাউক।

এক শ্রেণীর কাব্য আছে যাহা কোমর বাঁধিয়া নীতিশিক্ষা দিতে বসে; সেরূপ কাব্যের মূল্য সর্ব্বত্র বিদিত, তাহা আমাদের এখানকার আলোচ্য নহে। কাব্যের উদ্দেশ্য কি ইহা দার্শনিক তর্কের দ্বারা স্থির করিতে সচেষ্ট হওয়া বড় বিবেচনার কার্য্য নহে। ওরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে কিনা সন্দেহের স্থল। যে সকল গ্রন্থ সর্ব্বত্র, সকল সময়ে, অবিসম্বাদে কাব্য বলিয়া পরিগৃহীত হয় সেই সকল গ্রন্থ হইতে কাব্যের উদ্দেশ্য কি স্থির করা উচিত। এ প্রণালী কখনই অমূর্ব্বর হইতে পারে না, ইহাতে নিশ্চয়ই ফল লাভ হইবে। বর্ণনা-প্রধান কাব্য যাহাতে বাহ্যপ্রকৃতি যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্যের সহিত যে নীতির অতি দূরতম সম্বন্ধ নাই, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। এরূপ কাব্য খুব উচ্চ শ্রেণীর নহে বটে কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে কাব্যের উদ্দেশ্য নীতি শিক্ষা নহে—"নীতি জ্ঞানেরও যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য" নহে। কাব্যের যাহা উদ্দেশ্য কাব্য নামের বাচ্য সকল বস্তুতেই তাহা জলজলাট থাকিবে। এখন উচ্চ শ্রেণীর কাব্যের উদ্দেশ্যের সহিত নীতি জ্ঞানের কিরূপ সম্পর্ক? সকলেই স্বীকার করেন, কালিদাসের কুমার সম্ভবের তৃতীয় সর্গ অতি উচ্চ শ্রেণীর কবিতা কিন্তু ইহাতে কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে? পাঠকেরা কেহই কুমারের তৃতীয় সর্গে কোন নীতি দেখিতে পান না সুতরাং ধরিতে হইবে যে তাহাতে কোন নীতিজ্ঞান সন্নিবেশিত হয় নাই। শেলির Skylark, ওয়ার্ডস্বার্থের Peel castle in a storm অতি উৎকৃষ্ট কাব্য কিন্তু ইহাদের নৈতিক উদ্দেশ্য কি? রামায়ণ, মহাভারতের স্থানে স্থানে নৈতিক উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারত ও বাইবেলের জোবের উপাখ্যান একই শ্রেণীর কাব্য। কেহ যেন মনে না করেন যে কাব্যাংশে আমরা রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের অসম্মান করিতেছি। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে এক শ্রেণীর কতক গুলি কাব্যগ্রন্থে নৈতিক উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় বলিয়া কাব্যের উদ্দেশ্য নৈতিক নহে।

পৃথিবীর ঘটনাচক্রপরম্পরা পরস্পর এমনি সম্বদ্ধ যে একটাকে চালাইয়া দিলে অপর সকল গুলিই চলে। এই ঘটনাচক্রের গতিবিধি আলোচনা করা কাব্যের একটি কার্য্য; কাব্য আমাদিগকে মানুষের কার্য্য কারখা-

নার কল কৌশল দেখাইয়া আমোদ দেয়। এই কল চক্রের ঘর্ষণে মানুষ—ভালই হউক আর মন্দই হউক—সময় সময় পেষিত হইয়া যায়। মন্দলোক পেষিত হইলেই অমনি কাব্যের নৈতিক উদ্দেশ্যের একটা দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া দাঁড়ায়, আর যখন একজন ভাল লোক সেই চক্রে চূর্ণ চূর্ণ হন তখন সব চুপ্ চাপ্। ম্যাকবেথ মনস্তত্ত্বের কি অমোঘ নিয়মানুসারে স্ত্রীর উত্তেজনায় ও উচ্চাশার ছলনায় অন্তরাত্মার কথা অবহেলা করিয়া ত্রিবিধ বন্ধন অবহেলা করিয়া ডনক্যানকে হত্যা করিল ও একবার রক্তের নদীতে ঝাঁপ দিয়া আর কুলে উঠিতে পারিল না, এই নিয়ম আলোচনায় আমাদের বুদ্ধি মনস্তত্ত্বের একটা সমস্যার মীমাংসা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে ম্যাক্‌বেথ একটি চক্রে হাত দিয়া কিরূপে সকল চক্র গুলি চালাইয়া দেয়, এই বুদ্ধিগত আমোদ না থাকিলে ম্যাক্‌বেথের হত্যা কাণ্ডের তালিকা পড়িয়া আমাদের ভাল লাগিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

কেহ এরূপ বলিতে পারেন, যে কাব্যের গল্প রচনায় নৈতিক উদ্দেশ্য না থাকিতে পারে কিন্তু চরিত্র চিত্র সকল নৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ। ম্যাক্‌বেথের কিম্বা ওথেলোর চরিত্রের উপর আমাদের এরূপ বিরাগ জন্মে যে আমরা কখন তাহাদের ন্যায় কার্য্য করিতে পারি না। অলক্ষিত ভাবে আমাদের মনের সহিত এই নৈতিক উপদেশ এমনি মিশিয়া যায় যে, আমরা আপনা হইতে কাব্যে বর্ণিত অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হই। এ বিষয়ে প্রথম কথা এই যে, বাস্তবিক পক্ষে কখন এরূপ হইয়াছে তাহার প্রমাণাভাব। দ্বিতীয় যদি কাব্য এই উদ্দেশ্যে রচিত হয়, তাহা হইলে ম্যাকবেথ, ইয়াগোর ন্যায় চরিত্র চিত্রিত করিবার বিশেষ ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। (উহাদের মত অবস্থায় মানুষ সচরাচর পড়ে না সুতরাং অতি অল্প লোকেরই উপর ওরূপ চরিত্র চিত্রের দ্বারা সুফল উৎপন্ন হইবার কথা।)

এখানে এমন একটা কথা উঠিতে পারে যে, যে কাব্যে মন্দ লোক শাস্তি পায় তাহার নৈতিক উদ্দেশ্য, সেই লোকের মন্দতা হইতে আমাদিগকে বিরত করা। আর যাহাতে ভাল লোক কষ্ট পায় তাহার উদ্দেশ্য আমাদের মনে এই সকল ভাল লোকের কষ্টের নিদানভূত ষড়যন্ত্রকারী লোকদিগের চরিত্রের উপর বিরাগ জন্মান। কিন্তু এ সকল কথা যুক্তির অগ্নি পরীক্ষায় টেকিবে না। এমন কি কাব্য নাই যাহাতে ভাল লোক অদৃষ্ট কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছে; যাহাতে ভাল লোক খুবই কষ্ট পাইয়াছে, কিন্তু কোন লোককেই তাহার কষ্টের কারণ বলিয়া দাঁড় করান যায় না? কিম্বা যাহাতে ভাল লোক এমন লোক হইতে কষ্ট পাইয়াছে, যাহাদের উপর আমাদের অনুমাত্র বিরাগ জন্মায় না? কর্ডিলিয়া কাহা হইতে কষ্ট পাইয়াছে? যদি কোন লোক কর্ডিলিয়ার অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকে ত সে তাহার বৃদ্ধ পিতা লিয়ার কিন্তু তাহা বলিয়া কি কাহারও হৃদয় লিয়ারের সম্পর্কে রুদ্ধদ্বার হয়? এরূপ বলা যাইতে

পারে যে, কাব্যে ভাল লোক কষ্ট পাইলেও তাহার প্রতি আমাদের এমন টান হয় ও মন্দলোক সুখ পাইলেও তাহাদের চিত্র এরূপ ঘৃণা করিয়া চিত্রিত হয় যে, দুঃখ সংযুক্ত ভালও আমরা প্রার্থনীয় মনে করি আর সুখময় মন্দকেও পরিত্যজ্য মনে করি। ইহাতে ফল হয় এই যে, বাস্তব জীবনে আমরা মন্দতার প্রলোভনে সুপথ হইতে বিচ্যুত হই না। কিন্তু কাব্য মাত্রেই এরূপ দেখা যায় না। ঈডিপাস অদৃষ্ট নিপীড়িত। গ্রীকরা বিশ্বাস করিতেন যে কোন লোক দুষ্কর্ম্ম করিলে সে কিম্বা তাহার অধস্তন পুরুষের মধ্যে কেহ না কেহ স্বকীয় দুষ্কৃতির ফলভোগ করিবে। ঈডিপাস উক্ত মতানুসারে রচিত। এরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে আমাদের নীতি বিরুদ্ধ কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা ঈডিপাসের কাব্য রস উপভোগ করিতে পারি না? ঈডিপাসকে আমরা খুব ভাল লোক মনে করি উহার কষ্টে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হয় কিন্তু আমরা কেহই ঈডিপাসের মত ভাল হইবার জন্য তাহার সহিত আমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে অভিলাস করি না। আমরা মনে মনে প্রার্থনা করি যেন ঈডিপাসের মত অবস্থা আমাদের না হয়। একটা কল্পিত অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক নিয়মাধীনে কিরূপ কার্য্য করে ইহা দেখিয়াই আমরা আমোদ পাই। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া আনন্দাভিষিক্ত হই। ঈডিপাসের নীতিশিক্ষা দেবার যাহা কিছু ছিল তাহা এখন একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে তবুও আমরা ঈডিপাস্‌কে এক খানি উৎকৃষ্ট কাব্য মনে করি। কাব্যের উদ্দেশ্য যে নীতি শিক্ষা দেওয়া নহে, ইহা একটি তাহার প্রমাণ স্থল। আর একটি প্রমাণ এই যে Comedy অপেক্ষা Tragedy আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু এরূপ কাব্যে পরিণামে ভাল লোকই কষ্ট পায়।

ওথেলো, ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতি হইতে যিনি যে নীতি সংগ্রহ করুন না কেন উহার নীতি শিক্ষা দেওয়া মুখ্য গৌণ কোন উদ্দেশ্যই নহে। কাব্যে মনস্তত্ত্বের দুরূহ সমস্যার মীমাংসা দেখিয়া আমরা আমোদ পাই এবং দুর্নীত না হইলে তাহার নীতির কথা কিছুই ভাবি না।

কাব্যের উদ্দেশ্য আমোদ দেওয়া কিন্তু আনুষঙ্গিক রূপে তাহার দ্বারা মানুষের অনেক উপকার সাধিত হয়। তাহার মধ্যে নীতির উন্নতি একটি। কিন্তু যে কাব্য যত প্রত্যক্ষ পক্ষে নীতি শিক্ষা দিতে যত্নশীল তাহা কাব্যাংশে তত নিকৃষ্ট।

নীতির মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় উহা সামঞ্জস্যের উপর অবস্থিত। সৌন্দর্য্যের মূলেও সামঞ্জস্য সুতরাং নীতির বিরোধী হইলে আমাদের অপ্রীতিকর হয়। মানুষ স্বভাবতঃ নীতি জ্ঞান সম্পন্ন। আমরা মৌলিক নীতির কথা বলিতেছি, লৌকিক নীতির কথা বলিতেছি না। যে নীতি সকল দেশে, সকল সময়, প্রচলিত তাহা মৌলিক নীতি ও যাহা সময় বিশেষে,

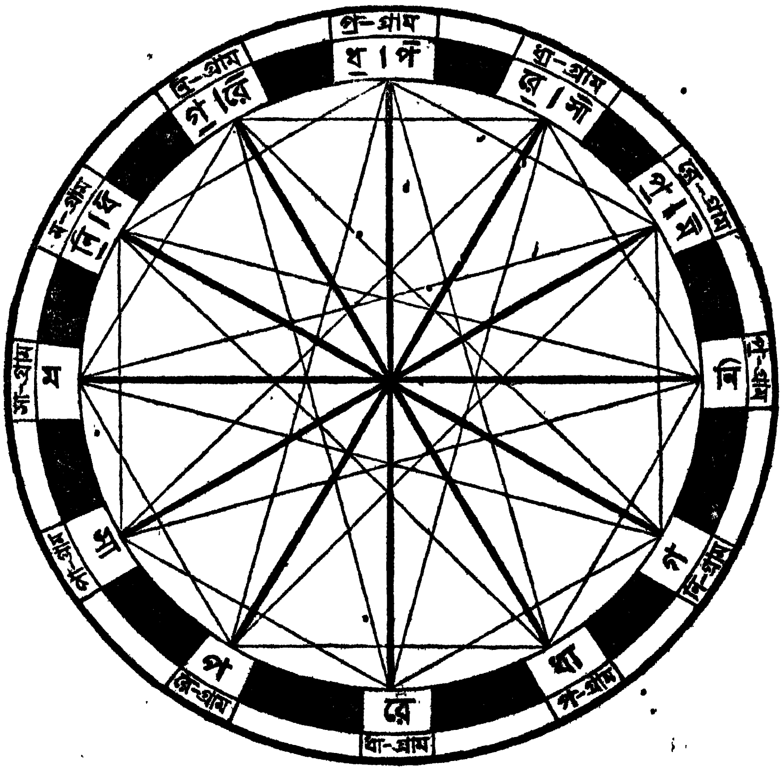
দেশ বিশেষে আদৃত তাহা লৌকিক নীতি। দু এক স্থানে হঠাৎ ইহার ব্যভিচার বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, মৌলিক নীতি ভঙ্গ করিলে কখনই আমাদের ভাল লাগে না ও লৌকিক নীতি ভঙ্গ করিয়া মৌলিক নীতি বজায় রাখিলেও আমাদের ভাল লাগে। বায়রণের প্যারিসিনা ইহার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। প্যারিসিনায় লৌকিক নীতিভঙ্গ হইয়াছে কিন্তু ইহাতে মৌলিক নীতির ব্যভিচার হয় নাই বলিয়া ইহা আমাদের নিকট কষ্টকর নহে। কিন্তু শেলির চেঞ্চি নামক উৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্য মৌলিক নীতিভঙ্গ হেতু অপ্রীতিকর। বিলাসময় (Voluptuous) কাব্য মানুষের ভাল লাগে কেন? আমরা ওরূপ কাব্যের নায়কের সহিত নিজেকে মিশাইয়া তাহার লীলাখেলার অংশীদার হইয়া পড়ি—তাহাই আমাদের বিলাসময় কাব্য ভাল লাগে। মানুষ সহস্র নীতি জ্ঞান সত্বেও এ জাতীয় মনোবৃত্তির সম্পর্কে আদিম অবস্থাপন্ন। ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ফরাসী পণ্ডিত টেন বলেন, কার্য্যতঃ মানুষ ভোগবিলাসে সম্পূর্ণ বিরত হইলেও উক্তরূপ বিষয়ে কল্পনা করিয়া আমোদ পায়—এরূপ কল্পনা অবশ্য কোন নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে না। এখানে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত, যৌনিক নীতি (sexual morality) মৌলিক নীতি শ্রেণীভুক্ত নহে। আর এক প্রকার গ্রন্থ চলিত ভাবানুসারে নীতি বিগর্হিত হইলেও আমাদের অপ্রীতিকর হয় না। একটা খুব সাহসিক ডাকাতি কিম্বা একটা সুচতুর চুরির কথা পড়িতে আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু এখানে ভাল লাগে কি? না, সাহসিকতা, এবং চাতুর্য্য। ডাকাইতি ও চুরি যদিও দুর্নীত কিন্তু ইহা এত সাধারণ যে ইহাতে কেহই চমকিয়া উঠেন না সুতরাং আস্তে আস্তে ইহা চক্ষুর আড়াল হইয়া যায় ও আমরা সাহসিকতা ও দক্ষতার বিবরণ টুকুমাত্রই পাঠ করিয়া সুন্তুষ্ট হই। দস্যু রবিন হুডের বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হই কিন্তু যদি দেখিতাম, যে রবিন একটি অসহায়া স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিত, তাহা হইলে কিরূপ হইত? ইহা হইতেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে কাব্য নীতির অনুযায়ী না হইলে প্রীতি পদ হয় না, সুতরাং কাব্যে নীতি বজায় রাখিতে হয়। কাব্যের উদ্দেশ্য আমোদ দেওয়া। নীতি ভিন্ন কাব্য হইতে পারে কিন্তু আমোদ ভিন্ন কাব্য নাই।

এখন অন্য জাতীয় কাব্য আলোচিত হইতেছে। সেক্সপিয়ারের ওথেলো কি নীতিশিক্ষা দিতেছে? না, স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া উচিত। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে স্ত্রীকে কোন নীতি বিগর্হিত কার্য্য করিতে দেখিলেও কি তাহার প্রতি সন্দেহ করা অন্যায়? যদি তাহা না হয় ত ওথেলোর ব্যবহার কি জন্য অন্যায় হইবে? ওথেলো মনে করিতেন ইয়াগো তাঁহার পরম হিতৈষী মিত্র, তাঁহার শান্তিভঙ্গের জন্য ইয়াগোর চেষ্টা করা কোন মতেই সম্ভব নহে। সে যাহা বলিতেছে

ও করিতেছে তাহা ওথেলোর নিতান্ত অনুরোধে ও তাঁহার হিতেরই জন্য। এরূপ মিত্রের কথায় কাহারো কখন অবিশ্বাস জন্মিতে পারে না। সেক্সপিয়রের কবিত্বের এটি সামান্য পরিচয় নহে যে, ওথেলোর পাঠক মাত্রেরই মনে হয়, ইয়াগো তাহাকেও ঐরূপ ঠকাইতে পারিত। আমরা কেহ ওথেলোর কার্য্য দুর্নীত মনে করি না। ওথেলো More sinned against than sinning। তবে যদি বল যে ওথেলো হইতে এই নীতিটি সংগ্রহ করা উচিত যে, কপট মিত্রকে বিশ্বাস করা অন্যায়। কিন্তু কোন মিত্রকে একবার কপট বলিয়া জানিতে পারিলে তাহাকে যে অবিশ্বাস করিব এ কথা আর আমাদের বলিয়া দিতে হইবে না। আর যদি এরূপ বল যে যাহার উপর ভাল, তাহার ভিতর ভালো না হইলেও হইতে পারে ইহাই ওথেলোতে উপদিষ্ট হইতেছে, তবে আমি বলি এ উপদেশ নিতান্ত হানিজনক। যদি আমরা এই নীতি অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রাণের বন্ধুকেও সম্ভবতঃ কুলোক বলিয়া সন্দেহ করি তাহা হইলে জীবনে কষ্টের আর শেষ থাকে না। কেহ এরূপ তর্ক করিতে পারেন যে, লোকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে শাস্তি পাইতে হয়—ইয়াগোর চরিত্র মধ্যে সেক্সপিয়র যত্ন করিয়া এই সত্যটি লুকাইয়া রাখিয়াছেন। ওথেলোর কোন পাঠক এই নৈতিক সত্যটি উহা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন কি না জানিলে কৃতার্থ হইব। সেক্সপিয়ার ওথেলোর শোকে মগ্ন। ইয়াগোর শাস্তি লইয়া তিনি বিশেষ আড়ম্বর করেন নাই। ইয়াগোর শাস্তি সামাজিক নিয়মানুসারে হইবে বলিয়াই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

আসল কথাটা এই—কিরূপ অবস্থাতে কিরূপ মনের ভাব হয় তাহাই প্রকাশ করে বলিয়া আমরা কাব্য হইতে আমোদ পাই। কাব্যে যদি এমন কিছু বর্ণিত হয়, যাহাতে আমাদের আমোদ না হয়, তাহা অকাব্য বা কুকাব্য। দুর্নীতির প্রতি আমাদের নাকি বিরাগ, এই নিমিত্তই কবি যখন দুর্নীতিকে কষাঘাত ও সুনীতিকে পূজা করেন তখন আমাদের আমোদ বোধ হয়, তাহার উল্টা হইলে আমাদের খারাপ লাগে। অতএব কাব্যে যে, সুনীতিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা পাঠকদিগকে আমোদ দিবারই জন্য। অতএব দেখা যাইতেছে, কাব্যের প্রাণ আমোদ দেওয়া। যদি আমোদ দিবার জন্য কাব্যে স্থান বিশেষে নীতি কথার বিশেষ আবশ্যক করে তবেই তাহাকে কবি আদর করেন। নতুবা তাহার সহিত কবির কোন সম্পর্কই নাই।

স্বররহস্য ।



উপরের ঐ চক্রটিতে সমস্ত গ্রামের সমস্ত বিবরণ নথ-দর্পণের মধ্যে পাওয়া যাইবে;—কেবল নিম্নলিখিত গুটিকত সংকেত জানিবার অপেক্ষা।

ঐ চক্রের বহিঃপ্রদেশস্থিত সাদা বেষ্টন-পথে দ্বাদশটি গ্রামের নাম ছোট অক্ষরে লিখিত আছে এবং তাহার অন্তর্নিহিত কালো বেষ্টন-চক্রের সাদা ঘর-গুলিতে দ্বাদশটী সুরের নাম বড় অক্ষরে লিখিত আছে।

দ্বাদশটি সুরের নাম-সম্বলিত কালো বেষ্টন-চক্রটি স্বর-চক্র এবং দ্বাদশটি গ্রামের নাম-সম্বলিত সাদা বেষ্টন চক্রটি গ্রাম-চক্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

স্বর-চক্রের অন্তর্গত বড় অক্ষরের দ্বাদশটি ঘর স্বর-স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

স্বর-চক্রের যে যে স্বর-স্থানে দুই-দুইটি সুর রহিয়াছে দেখিতেছ তাহা আর কিছু নয়—এক-একটি সুরের দুই-দুইটি নাম;—যাহাকে বলে নি (কোমল নিখাদ) তাহাকেই বলে ধা (তীব্র ধৈবত), যাহাকে বলে গ (কোমল গান্ধার) তাহাকেই বলে রে (তীব্র রেখাব) ইত্যাদি; এইরূপ দুই-নাম-সংজ্ঞিত সুর-গুলি দ্বিনামক সুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। দেখিবে যে, স্বর-চক্রে পাঁচটি বই আর দ্বিনামক সুর নাই, অবশিষ্ট সাতটি সুরের সকল গুলিই শুদ্ধ সুর।

ঘড়ি চলিবার সময় তাহার কাঁটা যে যে ঘণ্টা-স্থান হইতে যে যে ঘণ্টা-স্থানে ঘুরিয়া যায়, স্বর-চক্রের অথবা গ্রাম-চক্রের সেই সেই স্থান হইতে সেই সেই স্থানে ঘুরিয়া যাওয়ার নাম অনুলোম-ক্রমে চলা, আর ঘড়ির কাঁটার উল্টা চালে উক্ত চক্রের এক স্থান হইতে আর এক স্থানে ঘুরিয়া যাওয়ার নাম বিলোম-ক্রমে চলা; এই কথাটি মনে করিয়া না রাখিলে পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। উদাহরণ;—সা-ম-ক্রম (অর্থাৎ সা-হইতে ম-য়ের দিকে ঘুরিবার ক্রম) অনুলোম-ক্রম, ম-সা-ক্রম বিলোম-ক্রম, সা-প-ক্রম বিলোম ক্রম, পা-সা-ক্রম অনুলোম-ক্রম ইত্যাদি।

দেখিবে যে সা'র দুই পার্শ্বের দুইটি স্বর-স্থানে ম এবং প অবস্থিতি করিতেছে, তাহার মধ্যে ম অনুলোম-ক্রমে (অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার কাল-নির্ণায়ক গতি অনুসারে) সা'র নিকটতম, এবং প বিলোম-ক্রমে (অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার পশ্চাদ্‌গতি অনুসারে) সা'র নিকটতম, এ জন্য ম সা'র অনুলোম-পার্শ্বের এবং প বিলোম-পার্শ্বের সুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

সা'র যেমন দেখা গেল তেমনি—যে কোন সুর হউক তাহার দুই পার্শ্বের স্বর-স্থানের দুইটি সুরের মধ্যে যেটি অনুলোম-ক্রমে নিকট-তম তাহা অনুলোম পার্শ্বের সুর এবং যেটি বিলোম-ক্রমে নিকটতম তাহা বিলোম পার্শ্বের সুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। গ্রাম চক্রেরও এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইবার ঐ দুই প্রকার ক্রম অনুলোম এবং বিলোম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

দেখিবে যে, স্বর চক্রের যেখান হইতে হউক না কেন—উত্তরোত্তর সাতটি স্বর স্থান গ্রহণ করিলেই স্বর-চক্রের অর্দ্ধাংশ পরিমাণ একটি অর্দ্ধ চক্র গ্রহণ করা হয়; যথা ম-স্থান-হইতে বিলোম-ক্রমে ম সা প রে ধ গ নি এই সাতটি স্বর-স্থান স্বর-চক্রের অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া একটি অর্দ্ধচক্রে অবস্থিতি করিতেছে; তেমনি আবার অনুলোম-ক্রমে ঐ স্বর-স্থান-হইতে ম নি গ ধা রে প নি এই সাত সুর স্বর-চক্রের অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ-চক্রে অবস্থিতি করিতেছে।

সা হো'ক, ম হো'ক, প হো'ক, নি হো'ক, যেখান হইতে অনুলোম বা বিলোম ক্রমে সাতটি স্বর-স্থান উত্তরোত্তর ক্রমে গ্রহণ করিবে, সেই খান হইতেই সেই সাত সুর সম্বলিত একটি অর্দ্ধ-চক্র ধরিয়া পাইবে।

গ্রাম-চক্রের যেখানে যে-গ্রামের নাম ছোটো অক্ষরে লিখিত আছে সেইখানকার স্বর-স্থান হইতে (অর্থাৎ বড় অক্ষরের স্থান হইতে) বিলোম ক্রমে (অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার উল্টা চালে) একটি অর্দ্ধচক্র গ্রহণ করিলেই সেই অর্দ্ধচক্রের সাতটি ঘরে সেই গ্রামের সাতটি স্বর বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে ; প্রত্যেক গ্রামের সেই সাতটি স্বর গ্রামস্থ স্বর এবং সেই সাত স্বর বাদে অবশিষ্ট পাঁচটি স্বর গ্রাম-বহির্ভূত স্বর— জানিবে।

গ্রাম-চক্রে যেখানে ছোটা অক্ষরে সা গ্রামের নাম লিখিত আছে, সেইখানকার বড় অক্ষরের স্থান হইতে বিলোম-ক্রমে ম সা প রে ধা গ নি এই অর্দ্ধ চক্রটি গ্রহণ কর, দেখিবে যে, তথাকার সাতটি ঘরের সাতটি স্বরই শুদ্ধ স্বর—সুতরাং সা-গ্রামের অধিকার-ভুক্ত ; আর অবশিষ্ট পাঁচটি স্বর-দ্বিনামক স্বর—সুতরাং সা-গ্রামের গ্রাম-বহির্ভূত।

যেখানে ছোটো অক্ষরে সা-গ্রাম লিখিত আছে তাহার অনুলোম-পার্শ্বে ম-গ্রাম এবং বিলোম-পার্শ্বে প-গ্রাম ছোটো অক্ষরে লিখিত আছে দেখিবে ; ম-গ্রাম যেখানে ছোট অক্ষরে লিখিত আছে সেখানকার বড় অক্ষরের স্থান-হইতে বিলোম-ক্রমে সাতটি স্বর লইলে ম-গ্রামের সাতটি স্বর পাওয়া যাইবে ; এবং প-গ্রাম যেখানে ছোটো অক্ষরে লিখিত আছে সেখানকার বড় অক্ষরের স্থান-হইতে বিলোম ক্রমে সাতটি স্বর লইলে প-গ্রামের সাতটি স্বর পাওয়া যাইবে, ইত্যাদি। দেখিবে যে, ম-গ্রাম এবং পা-গ্রাম উভয়েই গ্রাম-চক্রে মধ্যে সা-গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম, তাই ও-দুই গ্রামের প্রত্যেক গ্রামে শুদ্ধ কেবল একটি-মাত্র দ্বিনামক স্বর—তাহার অধিক নহে।

সা-গ্রাম হইতে তাহার অনুলোম পার্শ্বের ম-গ্রাম ডিঙাইয়া নি-গ্রামে এবং বিলোম পার্শ্বের প-গ্রাম ডিঙাইয়া রে-গ্রামে দেখিবে যে, ও-দুই গ্রামের প্রত্যেক গ্রামে দুইটি দ্বিনামক স্বর।

সা গ্রাম হইতে তাহার অনুলোম-পার্শ্বের দুই গ্রাম ডিঙাইয়া গ-গ্রামে এবং বিলোম-পার্শ্বের দুই গ্রাম ডিঙাইয়া ধা-গ্রামে দেখিবে যে, ও দুই গ্রামের প্রত্যেক গ্রামে তিনটি দ্বিনামক স্বর।

সা-গ্রাম হইতে তাহার অনুলোম পার্শ্বের তিন গ্রাম ডিঙাইয়া ধা-গ্রামে এবং বিলোম পার্শ্বের তিন গ্রাম ডিঙাইয়া গ-গ্রামে দেখিবে যে, ও-দুই গ্রামে চারিটি দ্বিনামক স্বর।

সা-গ্রাম হইতে তাহার অনুলোম-পার্শ্বের চারিটি গ্রাম ডিঙাইয়া রে-গ্রামে এবং বিলোম-পার্শ্বের চারিটি গ্রাম ডিঙাইয়া নি-গ্রামে দেখিবে যে, ও-দুই গ্রামের প্রত্যেক গ্রামেই পাঁচটি দ্বিনামক স্বর।

সা-গ্রাম হইতে তাহার অনুলোম এবং বিলোম উভয় পার্শ্বের পাঁচ স্বর ডিঙাইয়া প-গ্রামে দেখিবে যে, সেখানেও পাঁচটি দ্বিনামক স্বর। স্বরচক্রে মোটে পাঁচটি বই আর দ্বিনামক স্বর নাই ; এ জন্য কোন

গ্রামেই দ্বিনামক স্বরের সংখ্যা পাঁচের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না।

সা-গ্রামের অনুলোম হইতে অনুলোম পার্শ্বের ম, নি, গ, ধা, রে এই পাঁচটি গ্রামে দ্বিনামক স্বরের কোমল নাম গুলি, এবং তাহার বিলোম হইতে বিলোম পার্শ্বের প, রে, ধা, গ, নি, এই পাঁচটি গ্রামে দ্বিনামক স্বরের তীব্র নাম-গুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ও সা-গ্রাম হইতে অনুলোম-বিলোম উভয় ক্রমেই সমদূর স্থিত প-গ্রামের দ্বিনামক স্বর গুলির চাই তীব্র নাম গুলি বাদ দিয়া কোমল নাম-গুলি, চাই কোমল নাম গুলি বাদ দিয়া তীব্র নাম-গুলি ব্যবহার কর, সমানই কথা।

স্বর-চক্রের প্রত্যেক স্বর-স্থান হইতে (বড় অক্ষরের ঘর-হইতে) যে-সকল সরল-রেখা অন্যান্য স্বর-স্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে দেখিতেছ, তাহাদের মধ্যেকার অপেক্ষা-কৃত স্থূল রেখাটি স্থূল-রেখা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে, অবশিষ্ট রেখা-গুলি সূত্র নামে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

যে যে সূত্র দেখিতেছ উত্তরোত্তর চারিটি স্থূল রেখা কর্ত্তন করিয়াছে, সেই সেই সূত্র দূরগামী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে, এবং যে যে সূত্র দেখিতেছ একটিমাত্র স্থূল রেখা কর্ত্তন করিয়াছে সেই সেই সূত্র পার্শ্বগামী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। যে কোন স্বর হইতে যে-কোন স্বর পর্য্যন্ত দূর-গামী সূত্র প্রসারিত দেখিবে সে দুটি স্বরের মধ্যে অর্দ্ধমাত্রা স্বর-ব্যবধান জানিবে; আর— যে কোন স্বর হইতে যে কোন স্বর পর্য্যন্ত পার্শ্বগামী-সূত্র প্রসারিত দেখিবে, সে দুটি স্বরের মধ্যে একমাত্রা স্বর-ব্যবধান জানিবে। প্রত্যেক গ্রামের তৃতীয় এবং চতুর্থ-স্বরের মধ্যে তথা সপ্তম এবং অষ্টম স্বরের মধ্যে নাকি অর্দ্ধমাত্রা স্বর-ব্যবধান এ জন্য ইহার পরেই দেখিবে যে, ঐ ঐ স্বরদ্বয়ের মধ্যে কেবল দূরগামী সূত্র অবস্থিতি করে, নহিলে গ্রামের আর সমস্ত স্বরদ্বয়ের মধ্যেই পার্শ্বগামী সূত্র অবস্থিতি করে। দেখিবে যে, দ্বিনামক স্বর মাত্রই স্বস্থান-হইতে প্রসারিত দুইটি দূরগামী সূত্র দ্বারা আপনার দুই নামের দুইটি শুদ্ধ স্বরের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে; যথা,—নি।ধা এই দ্বিনামক স্বরটি দুইটি দূরগামী সূত্র দ্বারা ধা, নি, এই দুটি শুদ্ধ স্বরের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে,—ঐ দ্বিনামক স্বরটি (স্বরের মাত্রা-তারতম্য হিসাবে) ধা'র উপরের স্বর বলিয়া ধা (অর্থাৎ তীব্র ধৈবত) এবং নি'র নীচের স্বর বলিয়া নি (অর্থাৎ কোমল নিখাদ) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

যদি কোন গ্রামের (যেমন সা-গ্রামের) সাত স্বর আরোহী ক্রমে অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এইরূপ পরম্পরা-ক্রমে এবং তাহার পর অবরোহী ক্রমে অর্থাৎ সপ্তম ষষ্ঠ পঞ্চম চতুর্থ তৃতীয় দ্বিতীয় প্রথম এইরূপ পরম্পরা-ক্রমে পাইতে চাও, তবে পূর্ব্বোক্ত সংকেতানুসারে সেই গ্রামের নাম যেখানে ছোটো অক্ষরে লিখিত আছে সেই স্থানকার বড় অক্ষরের স্বরস্থান-হইতে

প্রতিলোম-ক্রমে সাতটি গ্রামস্থ সুর গ্রহণ কর, অবশিষ্ট পাঁচটি সুর হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখ; তাহার পর যে-সুরটি দেখিবে গ্রামের নাম-বাচক (যেমন সাগ্রামের সা, ম-গ্রামের ম, পা-গ্রামের পা, ইত্যাদি) সেইটি জানিবে গ্রামের প্রথম সুর; সেই প্রথম সুরের সহিত যে যে গ্রামস্থ (গ্রাম-বহির্ভূত নহে—হস্তাবৃত নহে) সুর পার্শ্বগামী সূত্র পরম্পরায় গ্রথিত রহিয়াছে দেখিবে, সেই গুলি উত্তরোত্তর গ্রহণ করিবে,—যেখানে ঠেকিবে (অর্থাৎ যেখানে দেখিবে যে, পার্শ্বগামী সূত্র গ্রামস্থ অপর কোন সুরে লইয়া যাইতে পারে না) সেখানে দুর-গামী সূত্র অবলম্বন করিয়া গ্রামস্থ যে সুরে যাইতে পার সেই সুর গ্রহণ করিবে,—যে পর্য্যন্ত না স্বস্থানে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইস সেই পর্য্যন্ত ঐরূপ করিতে থাকিবে, তাহা হইলেই আরোহী ক্রমে গ্রামের প্রথম সুর হইতে সপ্তম সুর পর্য্যন্ত একে একে সম্মুখে উপস্থিত হইবে এবং সর্ব্বশেষে প্রথম সুর অষ্টম সুরের পদারূঢ় হইয়া পুনরাগমন করিবে; তাহার পর সেই অষ্টম সুর হইতে দুরগামী সূত্র-পথ দিয়া সপ্তম সুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, এবং সেই সপ্তম সুরের সহিত যে যে সুর পার্শ্বগামী সূত্র পরম্পরায় গ্রথিত রহিয়াছে সেই গুলি উত্তরোত্তর গ্রহণ করিবে, যেখানে ঠেকিবে সেখানে দুরগামী সূত্র অবলম্বন করিয়া গ্রামস্থ যে-সুরে যাইতে পার সেই সুর গ্রহণ করিবে,—যে পর্য্যন্ত না স্বস্থানে ফিরিয়া আইস সে পর্য্যন্ত ঐরূপ করিবে, তাহা হইলেই অবরোহী ক্রমে গ্রামস্থ সমুদায় সুর উত্তরোত্তর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রথম সুরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইবে।

যদি গ্রাম-নির্ব্বিশেষে সমস্ত স্বরচক্র আরোহী ক্রমে পর্য্যটন করিতে চাও তবে যে-সুর হইতে যাত্রারম্ভ করিবে সেই সুর হইতে দূরগামী সূত্রপথ দিয়া অনুলোম-পার্শ্বস্থ অর্দ্ধচক্রের যেখানে পার যাইবে, আর যদি অবরোহী ক্রমে চাও তবে দূরগামী সূত্র পথ দিয়া বিলোম পার্শ্বস্থ অর্দ্ধচক্রের যেখানে পার যাইবে, তাহার পর যে পর্য্যন্ত না স্বস্থানে ফিরিয়া আইস সে পর্য্যন্ত ক্রমাগত উত্তরোত্তরবর্ত্তী দূরগামী সূত্র পথ অবলম্বন করিয়া যে সুর হইতে যে সুরে যাইতে পার সেই সুর হইতে সেই সুরে যাইবে তাহা হইলেই সমস্ত স্বরচক্র যথাক্রমে পর্য্যটন করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিবে। যদি সা-হইতে আরোহী-ক্রমে যাত্রারম্ভ কর তবে নিম্ন লিখিত ক্রমে দ্বাদশটি সুর উত্তরোত্তর প্রাপ্ত হইবে যথা—

সা, রে রে, গ গ, ম, প প, ধা ধা, নি নি। পরিশেষে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিবে।

বড় অক্ষরে লিখিত যে কোন সুর হউক্ না কেন, দেখিবে যে, তাহার অনুলোম-পার্শ্বে স্ব-গ্রামের মধ্যম এবং তাহার বিলোম পার্শ্বে স্ব-গ্রামের পঞ্চম অবস্থিতি করিতেছে; যথা,—সা'র অনুলোম পার্শ্বে সা-গ্রামের মধ্যম ম এবং বিলোম পার্শ্বে সা-গ্রামের পঞ্চম প অবস্থিতি করিতেছে। অনুলোম-ক্রমে দেখিতে পাইবে যে, ম-গা-

মের মধ্যম নি, নি-গ্রামের মধ্যম গ, গ গ্রামের মধ্যম ধা, ধা-গ্রামের মধ্যম রে, রে-গ্রামের মধ্যম প, প-গ্রামের মধ্যম নি, নি-গ্রামের মধ্যম গ, গ গ্রামের মধ্যম ধা, ধা-গ্রামের মধ্যম রে, রে-গ্রামের মধ্যম প, প-গ্রামের মধ্যম সা; বিলোম-ক্রমে দেখিতে পাইবে যে, সা-গ্রামের পঞ্চম প, প-গ্রামের পঞ্চম রে, রে-গ্রামের পঞ্চম ধা, ধা-গ্রামের পঞ্চম গ, গ গ্রামের পঞ্চম নি, নি-গ্রামের পঞ্চম প, প-গ্রামের পঞ্চম রে, রে-গ্রামের পঞ্চম ধা, ধা-গ্রামের পঞ্চম গ, গ গ্রামের পঞ্চম নি, নি-গ্রামের পঞ্চম ম, ম গ্রামের পঞ্চম সা।

ছোটো অক্ষরে লিখিত যে কোন গ্রাম হউক্, দেখিবে যে, তাহার অনুলোম-পার্শ্বে তাহার মধ্যম সুরের গ্রাম, এবং প্রতিলোম-পার্শ্বে তাহার পঞ্চম-সুরের গ্রাম ছোটো অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে;—যথা সা-গ্রামের অনুলোম-পার্শ্বে ম-গ্রাম এবং বিলোম পার্শ্বে প-গ্রাম লিখিত রহিয়াছে। স্বগ্রামের অনুলোম-পার্শ্বের গ্রাম (অর্থাৎ স্ব-গ্রামের মধ্যম সুরের গ্রাম) এক গ্রাম উঁচু এবং স্বগ্রামের বিলোম-পার্শ্বের গ্রাম (অর্থাৎ স্বগ্রামের পঞ্চম সুরের গ্রাম) এক গ্রাম নীচু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রত্যেক গ্রামের ১ম, ৩য় ৫ম, এই তিনটি সুর সংবাদী; ও প্রত্যেক গ্রামের এক গ্রাম নীচের (অর্থাৎ বিলোম-পার্শ্বস্থ গ্রামের) তিনটি সংবাদী সুর ও স্ব-গ্রামের মধ্যম, এই চারিটি সুর বিবাদী; আর একটি কথা বলিবার আছে এই,—প্রত্যেক গ্রামের এক গ্রাম উপরের (অর্থাৎ অনুলোম পার্শ্বস্থ গ্রামের) তিনটি সংবাদী সুর স্বগ্রামের অনুবাদী।

সা-গ্রাম এবং তাহার অনুলোম বিলোম দুই পার্শ্বস্থ দুই গ্রাম এই তিন গ্রামের তিন জাতীয় সুর নিম্নে লতা-বদ্ধ হইল; দেখিবে যে সংবাদী সুর গুলি—প্রথমে একবার এবং শেষে এক বার—দুইবার আবৃত্তি করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে গীতের উপক্রমণিকা এবং উপসংহার উভয় স্থলেই সম্বাদী সুর একান্ত আবশ্যক, এবং যখনই সংবাদী সুরে আসিয়া বিশ্রাম করিবার অথবা একেবারে গীতে বিরাম দিবার প্রয়োজন হয় তখনই বিবাদী সুরের দ্বার দিয়া সংবাদী সুরে প্রবেশ করিতে হয়, —তা' ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নাই।

	সম্বাদী	অনুবাদী	বিবাদী	সম্বাদী
সা-গ্রাম	সা গ প	ম ধা সা	প নি রে সা	সা গ প
ম-গ্রাম	ম ধা সা	নি রে ম	সা গ প নি	ম ধা সা
প-গ্রাম	প নি রে	সা গ প	রে ম ধা সা	প নি রে

উপরের লতায় দেখিবে যে, ম-গ্রামের সংবাদী=সা-গ্রামের অনুবাদী, ও প-গ্রামের সংবাদী=সা-গ্রামের বিবাদী; বিবাদীর কোটায় নিম্ন-গ্রামের তিনটি সংবাদী সুর ছাড়া আর একটিকে ধরা হইয়াছে দেখিবে, সেটি স্ব-গ্রামের মধ্যম; স্ব গ্রামের মধ্যম যে কি সূত্রে বিবাদি শ্রেণী-ভুক্ত হইল তাহা পরে প্রকাশ পাইবে; কিন্তু এইটি বিশেষ করিয়া মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যে পর্য্যন্ত না স্পষ্ট-রূপে স্বগ্রামের বিবাদী-সুরের সোপান দিয়া স্বগ্রামের সম্বাদী সুরে প্রবেশ করা যায় সে পর্য্যন্ত তাহা স্বগ্রামের সংবাদী সুর কি আর কোন গ্রামের আর কোন জাতীয় সুর তাহার ঠিকানা হইতে পারে না; তাহা কেবল নয়—বিবাদী সুরের মধ্যে এমন একটি সুর বাছিয়া সংবাদী সুরের সোপান করা আবশ্যক, যাহা স্বগ্রামের গ্রাম পরিচায়ক। যদি কড়ি মধ্যমের দ্বার দিয়া পা'তে প্রবেশ করা যায় তবে পা আর সা গ্রামের পঞ্চম থাকে না—তাহা পঞ্চম গ্রামের প্রথম সুরের পদারূঢ় হয়; কেননা এক ত সা গ্রামে কড়ি মধ্যম নাই, তাহাতে আবার কড়ি মধ্যম পা-গ্রামের ৭ম—সুতরাং বিবাদী, এবং পা-গ্রামের সেই বিবাদী সুরের দ্বার দিয়া তাহার সংবাদী শ্রেণীস্থ পা'তে পদার্পন করা হইয়াছে—এজন্য আর তাহা সা-গ্রামের পঞ্চম নাই—তাহা পা-গ্রামের প্রথম-সুর। তেমনি যদি, সা রে গ ম প ধা এইরূপ ক্রমে ধা'তে আরোহণ কর তবে ধা সা-গ্রামের অনুবাদী সুর ভিন্ন আর কিছুই

বুঝাইবে না ; কিন্তু যদি তাহার পরে কোমল নিখাদে পদার্পন করিয়া ধা'তে প্রত্যাবর্ত্তন কর, তবে আর ধা'কে সা'গ্রামের ষষ্ঠ সুর বলিতে পারিবে না—তখন তাহা ম-গ্রামের তৃতীয় সুর,—কেননা নি সা-গ্রামের কেহই নহে কিন্তু তাহা মগ্রামের মধ্যম এবং মধ্যম বিবাদী শ্রেণীস্থ,—অতএব ম-গ্রামের সেই বিবাদী শ্রেণীস্থ নি হইতে তথাকার সংবাদী শ্রেণীস্থ তৃতীয় সুর ধা'তে অবতরণ করিয়াছ, এজন্য ধা আর সা-গ্রামের অনুবাদী সুর বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না—এখন তাহা ম-গ্রামের তৃতীয় সুর। সেইজন্য স্থূল-রেখা-বেষ্টিত ম-এবং-প গ্রামের প্রথম কোটার সংবাদী সুর গুলি সা-গ্রামের অনুবাদী এবং বিবাদী সুরের পদবী ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই ; কিন্তু শেষ-বারকার সংবাদী সুরের কোটায় উহারা স্ব স্ব গ্রামের বিবাদী সুরের অব্যবহিত পরে বসিয়াছে বলিয়া—বিশেষত সা-গ্রামের গ্রাম-বহির্ভূত সুতরাং সম্পর্কাতীত নি এবং ম'র পরে বসিয়াছে বলিয়া তাহারা স্ব স্ব গ্রামের (ম-গ্রাম এবং প গ্রামের) সংবাদী পদে বিধি-মতে আরূঢ় হইয়াছে।

আর একটি দেখা যাইতেছে এই যে, (লতা দেখ) পা-গ্রামের সম্বাদী সুর যেমন= সা-গ্রামের বিবাদী সুর, তেমনি সা-গ্রামের সংবাদী সুর=ম-গ্রামের বিবাদী সুর ; কেননা পা'র মধ্যম যেমন সা—সা'র মধ্যম তেমনি ম ; এজন্য সা-গ্রামের সম্বাদী সুরকে সোপান করিয়া ম-গ্রামের সংবাদী সুরে পদার্পন করিলে ম-গ্রামের বিবাদী সুর হইতে ম-গ্রামের সংবাদী সুরে পদার্পন করা হয়—যাহা বিধান সঙ্গত তাহাই করা হয়, সুতরাং তাহা করিতে কিছু মাত্র বাধা নাই ; ম-গ্রামের সংবাদী সুর সা-গ্রামের এইরূপ নিকট সম্পর্কীয় হওয়াতে তাহা সা-গ্রামের অনুবাদী বলিয়া উক্ত হয়। যে সূত্রে সংবাদী সুর বিবাদী সুরের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে সেই সূত্রেই অনুবাদী সুর সম্বাদী সুরের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে ; কেননা পা'র মধ্যম সা, সা'র মধ্যম ম ; সুতরাং পা-গ্রামের সংবাদী সুর যেমন সা গ্রামের বিবাদী সুর, সেইরূপ সা-গ্রামের সংবাদীসুর=ম গ্রামের বিবাদী সুর ; আর ম-গ্রামের সংবাদী সুর যেমন সা-গ্রামের অনুবাদী সুর, সেইরূপ সা গ্রামের সংবাদী সুর পা-গ্রামের অনুবাদী সুর। আর একটি রহস্য এই দেখিতে পাওয়া যায় যে সা-গ্রামের নিম্নস্থিত পঞ্চম-গ্রামের বিবাদী-সুর—কিনা সা-গ্রামের বিবাদী-সুরের বিবাদী সুর-রে ম ধা সা এই চারিটি, এবং সাগ্রামের অনুবাদী-সুর ম ধা সা এই তিনটী ; সা-গ্রামের বিবাদীর বিবাদীকে সংক্ষেপে বি-বি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে এবং অনুবাদীকে সংক্ষেপে অ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় যথা,—

বি-বি ॥ রে ম ধা সা।

অ ॥ ম ধা সা ॥

বিবাদী সুরের বিবাদী সুরের সঙ্গে অনুবাদী সুরের এইরূপ অনেকটা মিল আছে বলিয়া অনুবাদী সুরকে এক প্রকার বিবাদী সুরের বিবাদী সুর বলিয়া ধরা যাইতে পারে ; এ-

জন্য অনুবাদী সুরকে সোপান করিয়া বিবাদী সুরে পদার্পন করিতে কোন বাধা নাই; সুতরাং সংবাদী হইতে অনুবাদী, অনুবাদী হইতে বিবাদী, বিবাদী হইতে পুনর্ব্বার সংবাদীতে আসিয়া বিশ্রাম করিলে নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। তাহার মধ্যে এইটি জানা উচিত যে অনুবাদী সুর চাই দেও চাই না দেও—যাহা ভাল বুঝ তাহাই করিতে পার কিন্তু সংবাদী এবং বিবাদী সুরের উলট্ পালট্ করা চাই-ই-চাই—নহিলে গীত-ই হইবে না। স্বরচক্র দৃষ্টে যে কোন গ্রাম হউক্ তাহারই সম্বাদী বিবাদী এবং অনুবাদী সুরের অতি সহজে সন্ধান মিলিতে পারে—তাহার সঙ্কেত এইরূপ;———

যে কোন গ্রাম হউক তাহার সাত সুর যে অর্দ্ধ-চক্রের মধ্যে অবস্থিতি করে সেই অৰ্দ্ধচক্রের দুই প্রান্ত-স্থানীয় দুইটি সুর অঙ্গুলি দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট পাঁচটি গ্রামস্থ সুরের মধ্যে যে সুরটি দেখিবে গ্রামের নাম-বাচক অর্থাৎ প্রথম সুর, আর যেটী দেখিবে স্বর-চক্র-মধ্যে সেই প্রথম সুরের নিকট-তম স্থানীয় এবং যেটী দেখিবে সেই প্রথম সুরের দূরতম স্থানীয়,—সেই তিনটী সুর, জানিবে, সেই গ্রামের সম্বাদী সুর। উদাহরণ,—সা-গ্রামের সাতটী সুর ম-সা-প-রে-ধা-গ-নি-এই-অৰ্দ্ধচক্রের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, আর ম এবং নি এই দুটী সুর ঐ অর্দ্ধ চক্রের প্রান্ত স্থানীয়,—ঐ দুটী সুর অঙ্গুলি দিয়া ঢাকিয়া রাখ; অবশিষ্ট পাঁচটী গ্রামস্থ সুরের মধ্যে সা হচ্ছে গ্রামের নাম-বাচক প্রথম সুর, উহাদের মধ্যে পা স্বরচক্রাভ্যন্তরে সা'র নিকট-তম স্থানীয় এবং গ সা'র দূরতম স্থানীয়—অতএব উপরি-উক্ত সংকেতানুসারে সা প গ এই তিনটী সুর সা'র সম্বাদী সুর।

গ্রামস্থ সাত সুরের যে তিনটী সুর দেখিবে স্বরচক্র মধ্যে প্রথম সুরের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী এবং যেটী দেখিবে প্রথম সুর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী. সেই চারিটী সুর, জানিবে গ্রামের বিবাদী সুর; উদাহরণ,—সাগ্রামের ভিতর ম প রে এই তিনটী সুর স্বরচক্র-মধ্যে সা'র সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী এবং সা হইতে নি. সর্ব্বাপেক্ষা দূর-বর্ত্তী; অতএব উপরি-উক্ত সংকেতানুসারে ম প রে নি এই চারিটি সুর সা-গ্রামের বিবাদী সুর।

গ্রামের সাত সুরের যে দুটি সুর স্বর-চক্র-মধ্যে প্রথম সুর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরতম-স্থানীয় সে দুটি অঙ্গুলিদ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট পাঁচটী গ্রামস্থ সুরের মধ্যে যে দুটী দেখিবে দুই প্রান্তে অবস্থিতি করিতেছে সেই দুটী সুর এবং প্রথম সুর এই তিনটী সুর গ্রামের অনুবাদী সুর।

সা গ্রামস্থ সাত সুরের মধ্যে নি এবং গ এই দুটি সুর সা-হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরমতম-স্থানীয়,—ও দুটী সুর অঙ্গুলি দিয়া ঢাকিয়া রাখ, তাহা হইলে দেখিবে যে অবশিষ্ট পাঁচটী গ্রামস্থ সুরের এক প্রান্তে ম এবং অপর প্রান্তে ধা অবস্থিতি করিতেছে; ঐ দুটী সুর এবং প্রথম সুর সা এই তিনটী সুর সা-গ্রামের অনুবাদী সুর। সকল গ্রামেরই স্বর-প্রীতি-নির্ব্বাচনের প্রণালী ঐ রূপ জানিবে।

সম্বাদী-সুর গীতের গৃহ, বিবাদী সুর সেই গৃহের দ্বার বা সোপান এবং অনুবাদী সুর গৃহের বাহিরে কিয়ৎ কালের জন্য আড্ডা করিবার স্থান। সম্বাদী বিবাদী এবং অনুবাদী সুরের ওলট্ পালট্ যে কি প্রকারে হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত-চ্ছলে নিম্নে একটী বেহাগ রাগের গীত বিন্যস্ত হইল। যেখানে দেখিবে এক বা অনেক ক্ষুদ্র কসি-চিহ্ন সেখানে পূর্ব্ব সুরের অনুবৃত্তি বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক অক্ষর এবং প্রত্যেক কসিকা (অর্থাৎ ক্ষুদ্র কসি) এক মাত্রা কাল-স্থায়ী জানিবে। কোন সুরের পরে যদি একটী কসিকা থাকে তবে সেই সুরের অক্ষরের একমাত্রা এবং কসিকার একমাত্রা সব-শুদ্ধ ধরিয়া সেই সুর দুই মাত্রা কাল স্থায়ী—জানিবে; কোন সুরের পর দুইটী কসিকা থাকিলে তাহা তিন মাত্রা কাল স্থায়ী, তিনটী কসিকা থাকিলে তাহা চারি মাত্রা কাল স্থায়ী, সাতটী কসিকা থাকিলে আট-মাত্রা কাল স্থায়ী ইত্যাদি। কোন সুরের পরে যদি আদবেই কসিকা না থাকে তবে শুদ্ধ কেবল তাহার অক্ষরের মাত্রা লইয়া তাহা এক-মাত্রা কাল স্থায়ী—এই রূপ বুঝিতে হইবে। অর্দ্ধ মাত্রা, সিকি মাত্রা, প্রভৃতির সংকেত আপাততঃ অনাবশ্যক। উপর-সপ্তকের সুরের—উপরে, এবং নীচু-সপ্তকের সুরের—নীচে, বিন্দু চিহ্ন দেওয়ারি নিয়ম করা হইল। গীতের বচন-বিন্যাস এবং স্বর-বিন্যাস দুই পংক্তিস্থ হইলেও তাহারা এক পংক্তিস্থ বলিয়া গণ্য হইবে। প্রত্যেক পংক্তিকে চারিটি দাঁড়ি দ্বারা চারি ভাগে বিভক্ত করা গেল,—ঐ চারি ভাগের প্রত্যেক ভাগ স্ব-স্ব পংক্তির এক-একটি ঘর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রথম পংক্তিটী ধুয়া এজন্য ৪র্থ পংক্তির, ৮ম পংক্তির, ১২শ পংক্তির, ১৬শ পংক্তির পরে তাহা এক এক বার পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে।

গীত।

(সা-গ্রাম)

স - স - । গ - ম ম । গ - - - । - - - - ।
ম - ঙ্গ - । ল - - নি । দা - - - । - - - ন ।

প - প - । প - প - । প - ধ - । ধা - প - ।
বি - ঘ্নে - । র - ক্ত - । পা - - - । - - - ণ ।

ম - ম - । ম প - ম । গ - - - । - - - - ।
মু - ক্তি - । র - - সো । পা - - - । - - - ন ।

ম - প - । ম - গ - । গ - - - । গ - সা - ।
অ - - - । ন্ত - কে - । বা - - - । - - - - ॥

প - নি - । সং সং সং - । সং - - - । - - - - ।
সং - সা - । - র দু - । র্দ্দি - - - । - - - ন ।

সং - সং - । সং - নি - । প - নি - । - - - - ।
শা - ন্তি - । সূ - র্য্য - । হী - - - । - - - ন ।

সং - সং - । সং - - - । নি - প - । - - ধ - ।
কা - টি - । দে - - য় । দি - - - । - - - ন ।

নি - - - । প - প - । ম - গ - । গ - সা - ।
অ - - - । ন্য - কে - । বা - - - । - - - - ।

স - স - । ম প - প । প - - - । - - ম - ।
দু - খ - । ক্লে - - শ । ভা - - - । - - - র ।

ধ - - ধ । ধ ধ প - । প - ম - । গ - - - ।
প - - র্ব্ব । ত আ কা - । - - - - । - - - র ।

গ - গ - । ম প ম - । গ - - - । - - - - ।
ক - রে - । প - - রি । হা - - - । - - - র ।

ম প - - । ম - গ - । গ - - - । সা - - - ॥
অ - - - । ন্ত - কে - । বা - - - । - - - - ॥

প - প - । সঁ - - সঁ । সঁ - - - । - - - - ।
কা - রে - । ডা - - কি । আ - - - । - - - র ।

সঁ - সঁ - । সঁ – নি - । প - নি - । - - - - ।
যা - ই - । কা - র - । দ্বা - - - । - - - র ।

সঁ - সঁ - । সঁ - – সঁ । নি - প - । - - ধ - ।
স - হা - । য় - - আ । মা - - - । - - - র ।

নি - – - । প - প - । ম - গ - । গ - সা - ॥
অ - - - । ন্ত - কে - । বা - - - । - - - – ॥

উপরিস্থিত গীতের প্রত্যেক পংক্তির প্রত্যেক ঘরে স্বরের বা স্বর-সমষ্টির চারি মাত্রা করিয়া স্থিতি-কাল, এ জন্য প্রত্যেক ঘরে অক্ষরের সংখ্যা, কসিকার সংখ্যা, কিংবা অক্ষর এবং কসিকা উভয়ের সংখ্যার সমষ্টি চারি মাত্রার ন্যূনাধিক হইতে পারে না। প্রত্যেক ঘরের প্রথম দুই মাত্রা স্থানই মুখ্য স্থান; সেই স্থানের স্বর যে জাতীয়, সেই ঘর সেই জাতীয় স্বরের ঘর বলিয়াই ধর্ত্তব্য; অবশিষ্ট দুই মাত্রা স্থানে সে জাতীয় স্বর বসুক্ বা না বসুক্ তাহাতে কিছু আইসে যায় না। প্রত্যেক ঘরের প্রথম দুই মাত্রা স্থান পূর্ব্বার্দ্ধ স্থান, এবং অবশিষ্ট দুই মাত্রা স্থান শেষার্দ্ধ স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। কোন ঘরের শেষার্দ্ধ স্থানে যদি পূর্ব্বার্দ্ধ স্থানীয় স্বরের স্বজাতীয় স্বর না বসানো যায় তবে এমন কোন স্বর তথায় বসানো কর্ত্তব্য যে স্বর হইতে উত্তর-বর্ত্তী ঘরের প্রথম স্বরে সহজে যাওয়া যাইতে পারে।

উপরিস্থিত গীতের প্রথম পংক্তির প্রথম ঘরে সংবাদী শ্রেণীস্থ সা। ঐ পংক্তির দ্বিতীয় ঘরের পূর্ব্বার্দ্ধ স্থানে গ, শেষার্দ্ধ স্থানে ম; গ সংবাদী স্বর ও তাহা পূর্ব্বার্দ্ধে বসিয়াছে, এজন্য দ্বিতীয় ঘর-ও সংবাদী স্বরের ঘর; ম বিবাদী-স্বর এজন্য ম'র দ্বার দিয়া প্রথম পংক্তির তৃতীয় এবং চতুর্থ ঘরের সংবাদী শ্রেণীস্থ গ'তে উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষণকাল থাকা বিধান-সঙ্গত হইয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তির ১ম, ২য়, ৩য়, ঘরের প্রত্যেকের পূর্ব্বার্দ্ধ স্থানে পা; পা সংবাদী এবং বিবাদী উভয় জাতীয়, এজন্য ঐ তিন ঘরকেই সংবাদী স্বরের ঘর বলিয়া ধরা যাইতে পারে অথবা বৈচিত্র্য হেতু ৩য় ঘরের স্বরকে বিবাদী শ্রেণীর মধ্যে ধরিলেও হইতে পারে। ২য় পংক্তির ৪র্থ ঘরের স্থানে অনুবাদী-শ্রেণীস্থ ধা, এজন্য ও-ঘর অনুবাদী জাতির ঘর। ম অনুবাদী এবং বিবাদী উভয়-জাতীয় এজন্য ৩য় পংক্তির ১ম ঘর অনুবাদী, ২য় ঘর বিবাদী, ৩য় এবং ৪র্থ ঘর সংবাদী। ৪র্থ পংক্তির ১ম ২য় ঘর

বিবাদী; ৩য় এবং ৪র্থ ঘর সংবাদী। ৫ম পঙ্ক্তির ২ম ঘর বিবাদী; ২য়, ৩য়, ৪র্থ ঘর সংবাদী। ৬ষ্ঠ পংক্তির ১ম, ২য় ঘর সংবাদী; ৩য়, ৪র্থ ঘর বিবাদী। ৭ম পংক্তির ১ম, ২য় ঘর সংবাদী; ৩য়, ৪র্থ ঘর বিবাদী; ৭ম পংক্তির ৪র্থ ঘরের শেষার্দ্ধে অনুবাদী শ্রেণীস্থ ধা রহিয়াছে, যদি উহা তাহার প্রথমার্দ্ধে থাকিত তবে ও ঘর অনুবাদী হইত; কিন্তু শেষার্দ্ধের ঐ ধা হইতে সহজে উত্তরবর্ত্তী ঘরের বিবাদী শ্রেণীস্থ নি'তে পৌঁছানো যায়,—তাহাতে আবার অনুবাদী সুরকে সোপান করিয়া বিবাদী সুরে যাওয়া নিয়ম সঙ্গত, এজন্য ধা'টি ঠিক্ জায়গায় বসিয়াছে। ৮ম পংক্তির ১ম, ২য়, ৩য় ঘর বিবাদী জাতীয়; ৪র্থ ঘর সংবাদী জাতীয়। ৯ম পংক্তির ১ম ঘর সংবাদী; ২য় ঘর বিবাদী; ৩য়, ৪র্থ ঘর সংবাদী। ১০ম পংক্তির ১ম, ২য় ঘর অনুবাদী; ৩য় ঘর বিবাদী; ৪র্থ ঘর সংবাদী। ১১শ পংক্তির ১ম ঘর সংবাদী; ২য় ঘর বিবাদী; ৩য়, ৪র্থ ঘর সংবাদী। ১২শ পংক্তির ১ম, ২য় ঘর বিবাদী; ৩য়, ৪র্থ ঘর সংবাদী। ৫ম পংক্তির ১ম ঘর হইতে ৮ম পংক্তির ৪র্থ ঘর পর্য্যন্ত যেরূপ, ১৩শ পংক্তির ১ম ঘর হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবিকল সেইরূপ।

ক্রমশঃ।

ভগ্ন-হৃদয়।

(গীতি কাব্য)

ভূমিকা।

নিম্ন-লিখিত কাব্যটিকে কাহারো যেন নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়। দৃশ্যকাব্য ফুলের গাছের মত; তাহাতে ফুল ফুটে, কিন্তু সে ফুলের সঙ্গে শিকড়, কাণ্ড, শাখা, পত্র, কাঁটাটি পর্য্যন্ত থাকা আবশ্যক। নিম্নলিখিত কাব্যটি ফুলের তোড়া। গাছের আর সমস্ত বাদ দিয়া কেবল মাত্র ফুল গুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্ত স্বরূপেই ফুলের কথা উল্লেখ করা হইল।

কাব্যের পাত্র।

কবি।

অনিল।

মুরলা—অনিলের ভগ্নী ও কবির বাল্যসহচরী

ললিতা—অনিলের প্রণয়িনী।

নলিনী—এক চপল স্বভাবা কুমারী।

সুরেশ বিনোদ প্রমোদ অশোক প্রভৃতি	}	নলিনীর বিবাহ ও প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

চপলা—মুরলার সখি।

লীলা সুরুচি মাধবী প্রভৃতি	}	নলিনীর সখীগণ।

উপহার।

রাগিণী—ছায়ানট।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক' পথহারা।
যেথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো
আকুল এ আঁখিপরে ঢাল'গো আলোক ধারা।
ও মুখানি সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে
আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা।
কখনো বিপথে যদি, ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।
চরণে দিনুগো আনি—এ ভগ্ন-হৃদয় খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিত ধারা।

ভগ্ন-হৃদয়।

প্রথম সর্গ।

দৃশ্য—বন। চপলা ও মুরলা।

চপলা—

সখি, তুই হলি কি আপনা-হারা?
এ ভীষণ বনে পশি, একেলা আছিস বসি
খুঁজে খুঁজে হোয়েছি যে সারা!
এমন আঁধার ঠাঁই—জনপ্রাণী কেহ নাই
জটিল মস্তক বট চারিদিকে ঝুঁকি।
দুয়েকটি রবি-কর সাহসে করিয়া ভর
অতি সন্তর্পণে যেন মারিতেছে উঁকি।
অন্ধকার চারিদিক হ'তে মুখ পানে
এমন তাকায়ে রয় বুকে বড় লাগে ভয়,
কি সাহসে রোয়েছিস্ বসিয়া এখানে?

মুরলা—

সখি, বড় ভালবাসি এই ঠাঁই!
বায়ু বহে হুহু করি, পাতা কাঁপে ঝর ঝরি
স্রোতস্বিনী কুল কুল করিছে সদাই!
বিছায়ে শুকানো পাতা, বট মূলে রাখি মাথা,
দিনরাত্রি পারি সখি শুনিতে ও ধ্বনি।
বুকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উথলিয়া
বুঝায়ে বলিতে তাহা পারিনা স্বজনী!
যা সখি, একটু মোরে রেখে দে একেলা,
এ বন-আঁধার ঘোর, ভাল লাগিবেনা তোর,
তুই কুঞ্জ বনে সখি কর গিয়ে খেলা!

চপলা—

মনে আছে, অনিলের ফুল-শয্যা আজ ?
তুই হেথা বোসে র'বি, কত আছে কাজ ;
কত ভোরে উঠে, বনে গেছি ছুটে,
মাধবীরে নোয়ে ডাকি,
ডালে ডালে যত ফুল ছিল ফুটে
একটি রাখিনি বাকি !
শিশিরে ভিজিয়ে গিয়েছে আঁচল
কুসুম-রেণুতে মাখা,
কাঁটা বিঁধে সখি হোয়েছিনু সারা
নোয়াতে গোলাপ-শাখা !
তুলেছি করবী, গোলাপ গরবী
তুলেছি টগর গুলি,
যুঁই কুঁড়ি যত বিকেলে ফুটিবে
তখন আনিব তুলি।
আয়, সখি, আয়, ঘরে ফিরে আয়,
অনিলে দেখসে আজ ;
হরষের হাসি অধরে ধরেনা
কিছু যদি আছে লাজ !

মুরলা—

আহা সখি, বড় তারা ভালবাসে দুইজনে !

চপলা—

হাঁ সখি, এমন আর দেখিনিত বর-কোনে !
জানিস্ত সখি, ললিতার মত,
অমন লাজুক মেয়ে ;
অনিলের সাথে দেখা করিবারে
প্রতি দিন যায় বিপাশার ধারে
সরমের মাথা খেয়ে।
কবরীতে বাঁধি কুসুমের মালা,
নয়নে কাজল-রেখা ;
চুপি চুপি যায়, ফিরে ফিরে চায়
বন পথ দিয়ে একা !
দূর হোতে দেখি অনিলে, অমনি
সরমে চরণ সরে না যেন !
ফিরিবে ফিরিবে মনে মনে করি
চরণ ফিরিতে পারেনা যেন !
অনিল অমনি দূর হোতে আসি
ধরি তার হাত খানি,
কহে যে কত কি হৃদয় গলানো
সোহাগে মাখানো বাণী।
আমি ছিনু সখি লুকায়ে তখন
গাছের আড়ালে আসি,
লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিতেছিলেম
রাখিতে পারিনে হাসি !
ললিতার হাত কাঁপে থর থর
আঁখি দুটি নত মাটির উপর
ভূমি হোতে এক কুসুম তুলিয়া
ছিঁড়িতেছে শত ভাগে।
লাজ-নত মুখ ধরিয়া তাহার,
অনিল রাখিল বুকের মাঝার
অনিমিষ আঁখি মেলিয়া যুবক
চাহি থাকে মুখ বাগে !
আদরে ভাসিয়া ললিতার চোখে
বাহিরে সলিল-ধার,
সোহাগে সরমে প্রণয়ে গলিয়া
আঁখি দুটি তার পড়িল ঢলিয়া
হাসি ও নয়ন-সলিলে মিলিয়া
কি শোভা ধরিল মুখানি তার !
আমি সখি আর নারিনু থাকিতে
সুমুখে পড়িনু আসি,

করতালি দিয়ে উপহাস কত
করিলাম হাসি হাসি!
ললিতা অমনি চমকি উঠিল
মুখেতে একটি কথা না ফুটিল
আকুল ব্যাকুল হইয়া সরমে
লুকাতে ঠাঁই না পায়,
ছুটিয়ে পলায়ে এলেম অমনি
হেসে হেসে আর বাঁচিনে সজনি,
সে দিন হইতে আমারে হেরিলে
ললিতা সরমে মরিয়া যায়!

মুরলা—

আহা,কেন,বাধা দিতে গেলি তাহাদের কাছে?

চপলা—

বাধা না পাইলে সখি সুখেতে কি সুখ আছে?

মুরলা—

সূর্য্যমুখী ফুল সখি আমি ভালবাসি বড়,
দু চারিটি তুলে এনে আজিকে করিস্ জড়!
মনে বড় সাধ তার দেখে রবি-মুখ পানে,
রবি যেথা, মাথা তার লোয়ে যায় সেইখানে;
তবু মনোআশা হায়, মনেই মিশায়ে যায়
মুখানি তুলিতে নারে সরমেতে জড়সড়!
সাজাবি সে ফুল সাজে দেহ-খানি ললিতার,
লজ্জাবতী পাতা দিয়ে ঢাকিবি শয়ন তার;
কমল আনিয়া তুলি,রাঙা-পানা পাপ্‌ড়ি গুলি
গাঁথি গাঁথি নিরমিয়া দিবি ঘোমটার ধার!
পাতা-ঢাকা আধ-ফুটো,লাজুক গোলাপ দুটো
আনিস্ দুলায়ে দিবি সুচারু অলকে তার!
সহসা রজনী-গন্ধা প্রভাতের আলো দেখে
ভাবিয়া না পায় ঠাঁই কোথা মুখ রাখে ঢেকে
আকুল সে ফুল গুলি, যতনে আনিস্ তুলি
তাই দিয়ে গেঁথে গেঁথে বিরচিবি কণ্ঠহার।

চপলা—

তুই সখি আয়, একেলা আমার
ভাল নাহি লাগে—একিলো জ্বালা,
দুটি সখি মিলি হাসিতে হাসিতে
গুণ্ গুণ্ গান গাহিতে গাহিতে
মনের মতন গাঁথিব মালা!
বল্ দেখি সখি হ'ল কি তোর?
হাসিয়া খেলিয়া কুসুম তুলিয়া
করিবি কোথায় ভাবনা ভুলিয়া
কুমারী জীবন ভোর—
তা না, একি জ্বালা? মরমে মিশিয়া
আপনার মনে আপনি বসিয়া
সাধ কোরে এত ভাল লাগে সখি
বিজনে ভাবনা-ঘোর!
তা' হবেনা সখি, না যদি আসিস্
এই কহিলাম তোরে—
যত ফুল আমি আনিয়াছি তুলি
আঁচল ভরিয়া ল'ব সব গুলি
বিপাশার স্রোতে দিবলো ভাসায়ে
একটি একটি কোরে!

মুরলা—

মাথা খা, চপলা, মোরে জ্বালাস্‌নে আর!

চপলা—

ভাল সই; জ্বালাবনা চলিনু এবার
(গমনোদ্যম; পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া)
না না সখি এই আঁধার কাননে
একেলা রাখিয়া তোরে
কোথায় যাইব বল্ দিখি তুই
যাইব কেমন কোরে?
তোরে ছেড়ে আমি পারি কি থাকিতে?
ভালবাসি তোরে কত,

আমি যদি সখি হোতেম তোমার
পুরুষ মনের মত,
সারাদিন তোরে রাখিতাম ধোরে
বেঁধে রাখিতাম হিয়ে,
একটুকু হাসি কিনিতাম তোর
শতেক চুম্বন দিয়ে!
অমিয়া-মাখানো মুখানি তোমার
দেখে দেখে সাধ মিটিত না আর,
ওমুখানি লোয়ে কিযে করিতাম
বুকের কোথায় ঢেকে রাখিতাম,
ভাবিয়া পেতাম তা'কি?
সখি কার তুমি ভালবাসা তরে
ভাবিছ অমন দিনরাত ধোরে
পায়ে পড়ি তব খুলে বল তাহা
কি হবে রাখিয়া ঢাকি?

মুরলা—

ক্ষমা কর মোরে সখি শুধায়োনা আর।
মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার!
যে গোপন কথা সখি, সতত লুকায়ে রাখি
ইষ্ট-দেবতার মন্ত্র সে যেন আমার,
তাহা মানুষের কানে,ঢালিতে যে লাগে প্রাণে
লুকানো থাক্ তা সখি হৃদয়ে আমার!
ভালবাসি, শুধায়োনা কারে ভালবাসি!
সে নাম কেমনে সখি কহিব প্রকাশি!
আমি তুচ্ছ হোতে তুচ্ছ,সে নাম যে অতি উচ্চ
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার!
ক্ষুদ্র ওই কুসুমটি পৃথিবী কাননে,
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে—
দিন দিন পূজা করি, শুকায়ে পড়ে সে ঝরি
আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার—
তেমনি পূজিয়া তারে, এ প্রাণ যাইবে হা-রে
তবুও লুকানো রবে একথা আমার!

(নেপথ্যে চাহিয়া)—

জীবন্ত স্বপ্নের মত ওই দেখ্ কবি
একা একা ভ্রমিছেন আঁধার অটবী।
ওই যেন মূর্ত্তিমান ভাবনার মত
নত করি দুনয়ন, শুনিছেন একমন
স্তব্ধতার মুখ হোতে কথা কত শত!

(কবির প্রবেশ)

কবি—

বন-দেবীটির মত এইযে মুরলা,
প্রভাতে কাননে বসি ভাবনা বিহ্বলা!
প্রকৃতি আপনি আসি লুকায়ে লুকায়ে,
আপনার ভাষা তোরে দেছে কি শিখায়ে?
দিনরাত কলস্বরে, তটিনী কি গান করে—
তাহা কি বুঝিতে তুই পেরেছিস্ বালা?
তাই হেতা প্রতিদিন আসিস্ একালা!
মুরলা—আজিকে তোরে,
বনবালা মত কোরে
চপলা সাজায়ে দিক্ দেখি একবার।
এলোথেলো কেশপাশে লতা দে বাঁধিয়া
অলক সাজায়ে দেলো তৃণফুল দিয়া—
ফুলসাথে পাতা গুলি, একটী একটী তুলি
অযতনে দেলো তাহা আঁচলে গাঁথিয়া!
হরিণ শাবক যত ভুলিবে তরাস
পদতলে বসি তোর চিবাইবে ঘাস।
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি, মুখে তার দিবি তুলি
সবিস্ময়ে সুকুমার গ্রীবাটী বাঁকায়ে
অবাক্ নয়নে তারা রহিবে তাকায়ে!
আমি হোয়ে ভাবে ভোর, দেখিব মুখানি তোর
কল্পনার ঘুম ঘোর পশিবে পরাণে!

যতদূর মনে পড়ে তাতে আমি যে তোমার ওপর কোন প্রকার কুব্যবহার কোরেছিলুম, তা'ত মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ যদি বা তোমার কতক গুলি প্রশ্নের ভাল রকম উত্তর না দিয়ে দু চার কথা বোলে উড়িয়ে দিয়ে থাকি, তা'তেই বা আমার দোষ কি? সে রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারই বা তোমার কি আবশ্যক ছিল?" তোমার প্রথম কথার কোন উত্তর দেওয়া যায় না। সত্যইত, তুমি আমার সঙ্গে কোন কুব্যবহারই করনি। যত গুলি কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলুম, সকল গুলিরই তুমি একটা-না-একটা উত্তর দিয়েছিলে, তা'ছাড়া হেসেওছিলে, গল্পও কোরেছিলে। তোমার কোন রকম দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তবু তুমি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করনি; সে তোমাকে বা আর কাউকে আমি বোঝাতে পারব না সুতরাং তার আর বাহুল্য উল্লেখ করব না। দ্বিতীয় কথাটি হোচ্চে, কেন তোমাকে ও রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরেছিলুম। আচ্ছা ভাই তোমার ত হৃদয় আছে, একবার তুমিই বিবেচনা কোরে দেখনা—কেন জিজ্ঞাসা কোরেছিলুম। তোমার ভালবাসার উপর সন্দেহ হোয়েছিল বোলেই কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, যে, "আমাদের কি মনে পোড়ত" কিম্বা "আমাদের কি ভাল লাগ্চে", না তোমার ভালবাসার ওপর সন্দেহ তিলমাত্র ছিলনা বোলেই জিজ্ঞাসা কোরেছিলুম? যদি স্বপ্নেও জান্‌তুম যে, আমাকে তোমার মনে পোড়ত না, কিম্বা আমাকে তোমার ভাল লাগচে না, তা'হলে কি ওরকমের কোন প্রশ্ন উত্থাপন কোত্তুম। তোমার মুখে শোন্‌বার ভারি ইচ্ছা ছিল যে, বিদেশে আমাকে তোমার প্রায়ই মনে পোড়ত। কেবল মাত্র ঐ কথা টুকু নয়, ঐ কথা থেকে তোমার আরো কত কথা মনে আস্‌ত। আমার বড় ইচ্ছা ছিল যে, তুমি বোল্‌বে—"অমুক জায়গায় আমি একটি সুন্দর উপত্যকা দেখ্‌লুম; সেখেনে একটি নির্ঝর বোয়ে যাচ্ছিল, জায়গাটা দেখেই মনে হ'লে, আহা ভা—যদি এখেনে থাক্‌ত তা'হলে তার বড় ভাল লাগ্‌ত!" একটা ছোট প্রশ্ন থেকে এই রকম কত উত্তরই শুন্‌তে পাবার সম্ভাবনা ছিল। যখন প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা কোরেছিলুম তখন মনের ভিতর এই রকম অনেক কথা চাপা ছিল!

আমি তোমার কাছে দুঃখ করবার জন্যে এ চিঠিটা লিখ্‌চিনে; কিম্বা তোমার কাছে অভিমান করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি ভাই, কোন কোন লোকের মত ঢাক ঢোল বাজিয়ে অভিমান কোর্‌তে পারিনে; যার প্রতি অভিমান কোরেছি, তার কাছে গিয়ে "ওগো আমি অভিমান কোরেছি গো, আমি অভিমান কোরেছি" বোলে হাঁকাহাঁকি কোর্‌তেও ভাল বাসিনে। যদি আমি অভিমান করি ত সে মনে মনে। আমার অভিমানের অশ্রু কেউ কখনো দেখ্‌তে পায় না, আমার অভিমানের কথাও কেউ কখনো শোনে নি; অভিমান আমার কাছে এমনই গোপনের সামগ্রী। তাই বোলচি তোমার কাছে আজ আমি অভি-

মান কোত্তে বসিনি। তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলি তর্ক আছে, তা'র মীমাংসা কোত্তে আমার ভারি ইচ্ছে।

তোমার সমস্ত চিঠিটার ভাব দেখে আমার এই মনে হ'ল যে, তোমার মতে যারা নিস্বার্থ ভালবাসে তারা আর ভালবাসা ফেরত পা'বার আশা করেনা। যে খানে ভালবাসার বদলে ভালবাসা পা'বার আশা আছে সেই খানেই স্বার্থপরতা আছে। এ সম্বন্ধে তোমাকে একটি কথা বলি শোন'। আমরা অনেক সময়ে ভাল কোরে অর্থ না বুঝে অনেক কথা ব্যবহার কোরে থাকি। মুখে মুখে কথা গুলো এমন চলিত, এমন পুরানো, হোয়ে যায় যে, সে গুলো আমরা কানে শুনি বটে কিন্তু মনে বুঝিনে। নিস্বার্থ ভালবাসা কথাটাও বোধ করি সেই রকম একটা কিছু হবে। যখন আমরা শুনে যাই তখন আমরা কিছুই বুঝিনে, একটু পীড়াপীড়ি কোরে বোঝাতে বোল্লে হয়ত দশজনে দশ রকম ব্যাখ্যা করি। স্বার্থপরতা কথা সচরাচর আমরা কি অর্থে ব্যবহার কোরে থাকি? আহার করা বা স্নান করাকে কি স্বার্থপরতা অতএব নিন্দনীয় বলে? আহার না করা বা স্নান না করাকে কি নিস্বার্থপরতা অতএব প্রশংসনীয় বলে? মূল অর্থ ধোরতে গেলে আহার বা স্নান করাকে স্বার্থপরতা বলা যায় বৈকি? কিন্তু চলিত অর্থে তাকে স্বার্থপরতা বলে না। সকল মানুষেই মনে মনে এমন সামঞ্জস্য বাদী, যে, যখন বলা হয় যে, "আহার করা 'ভাল" তখন কেউ এমন বোঝেন না, বিরাম বিশ্রাম না দিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাব্বিশ ঘণ্টাই আহার করা ভাল। তেমনি যখন আমরা স্বার্থপরতা কথা ব্যবহার করি, তখন কেউ মনে করে না যে, নিশ্বাস গ্রহণ করা স্বার্থপরতা, বা বাতাস খাওয়া স্বার্থপরতা। যা' কিছু পঙ্ক-জ তাকে যেমন পঙ্কজ বলেনা, যা' কিছু অ-চল তা'কে যেমন অচল বলেনা, তেমনি যা' কিছু স্বার্থপরতা তা'কেই স্বার্থপরতা বলে না। খাওয়া দাওয়াকে স্বার্থপরতা বলে না, কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল মাত্র খাওয়া দাওয়া করে আর কিছু করে না, কিম্বা যার খাওয়া দাওয়াই বেশী, পরের জন্য কোন কাজ অতি যৎসামান্য, তা'কে স্বার্থপর বলা যায়। আবার তার চেয়ে স্বার্থপর হোচ্চে যারা পরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিজে খায়। এ ছাড়া আর কোন অর্থে, কোন ভাবে স্বার্থপর কথা ব্যবহার করা হয় না। তা' যদি হয় তা' হ'লে নিস্বার্থ ভালবাসা বোল্‌তে কি বুঝায়? যদি মূল অর্থ ধর' তা'হ'লে ভাল বাসাই স্বার্থপরতা। যখন এক জনকে দেখ্‌তে ভাল লাগে, তা'র কথা শুন্‌তে ভাল লাগে, তার কাছে থাকতে ভাল লাগে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তা'কে না দেখ্‌লে, তার কথা না শুন্‌লে ও তার কাছে না থাক্‌লে কষ্ট হয়, তার সুখ হ'লে আমি সুখী হই, তার দুঃখ হ'লে আমি দুঃখী হই, তখন অতগুলো ভাবের সম্মিলনকেই ভাল বাসা বলে। ভালবাসার আর একটা উপাদান হোচ্চে, সে আমাকে ভাল বাসুক, অর্থাৎ তার চোখে আমি সর্ব্বাংশে প্রীতিজনক হই এই

বাসনা। ভেবে দেখ্‌তে গেলে এর মধ্যে সকল গুলিই স্বার্থপরতা। এত গুলি স্বার্থপরতার সমষ্টি থেকে একটি স্বার্থপরতা বাদ দিলেই কি বাকী টুকু নিঃস্বার্থ হোয়ে দাঁড়ায়? কিন্তু যেটিকে বাদ দেওয়া হ'ল সেটি অন্যান্য গুলির চেয়ে কী এমন বেশী অপরাধ কোরেছে? তা'ছাড়া এর মধ্যে কোনটাকেই বাদ দেওয়া যায় না। এর একটি যখন নেই তখন বোঝা গেল যে, যথার্থ ভালবাসাই নেই। যাকে তোমার দেখ্‌তে ভাল লাগেনা, যার কথা শুন্‌তে ইচ্ছে করে না, যার কাছে থাক্‌তে মন যায়না তাকে যদি ভালবাসা সম্ভব হয় তা'হোলেই যার ভালবাসা পেতে ইচ্ছে করে না তাকে ভালবাসাও সম্ভব হয়। যাকে দেখ্‌তে, শুন্‌তে ও যার কাছে থাক্‌তে ভাল লাগে, কোন কোন ব্যক্তি দুদিন তাকে দেখ্‌তে শুন্‌তে না পেলে ও তার কাছে না থাক্‌লে তাকে ভুলে যায় ও তার ওপর থেকে তার ভালবাসা চোলে যায়, তেমনি আবার যার ভালবাসা পেতে ইচ্ছে করে তার ভালবাসা না পেলেই কোন কোন ব্যক্তির ভালবাসা তার কাছে থেকে দূর হয়; তাদের সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, তা'দের গভীররূপে ভালবাস্‌বার ক্ষমতা নেই। এটা নিশ্চয় বলা যায় যে, ভালবাসার যত গুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উল্লেখ কোল্লুম, ভালবাসা যেখেনে থাকে তাঁরাও সেইখানে থাক্‌বেই থাক্‌বে। তাদের মধ্যে একটাকে বাদ দিয়ে বাকীটুকুকে নিঃস্বার্থ ভালবাসা বলাও যা আর ঘড়ির কল বা তা'র কাঁটা বা তা'র সময়-চিহ্ন বাদ দিয়ে তা'কে খাঁটি ঘড়ি বলাও তা'। এখন এক এক সময় হয় বটে, যখন ভালবাসার প্রতিদান পাবার কথা মনেই আসে না,—যেমন দ্বার-শূন্য বাতায়ন-শূন্য আলোক-শূন্য জন-শূন্য কারাগারে রুদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির কথা কল্পনাতেই আসে না। কিন্তু সেই কারারুদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির কথা মনে আসে না বোলে বলা যায় না যে, স্বাধীনতার ইচ্ছা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ নহে। তেমনি যখন আমার ভালবাসার পাত্র আকাশের জ্যোতির্ম্ময় জলদ-সিংহাসনে, আর আমি পৃথিবীর মৃত্তিকায় একটি সামান্য কীট ধূলায় অন্ধ হোয়ে বিচরণ করচি,—যখন তার পদ-জ্যোতির একটু মাত্র আভাস দেখা, যখন সঙ্গীত নয় কথা নয়, কেবল অতি দূর থেকে তাঁর কণ্ঠের অস্ফুট স্বরটুকু মাত্র শোনা আমার অদৃষ্টে আছে, যখন তার নিশ্বাস বহন কোরে তাঁর গাত্র স্পর্শ কোরে তার কুন্তল উড়িয়ে বাতাস আমার গায়ে অমৃত সিঞ্চন করে, ও সেইটুকু সুখেই আমার চোক ঢ'লে পড়ে, আমার গা শিউরে ওঠে, তার চেয়ে আমার আর কোন আশা নেই, তখন যদি আমার ভালবাসার প্রতিদান পা'বার কথা মনে না আসে ত তাথেকে বলা যায় না যে, ভালবাসার প্রতিদান পা'বার আশা স্বভাবতই ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে যে থাক্‌বে এমন নয়; সেরকম অবস্থায় ভালবাসার প্রতিদান পাবার আশা মনে স্পষ্ট না আসুক,

তবু কি সে. ব্যক্তির মনে তৃপ্তি থাকে? সর্ব্বদাই কি তার মনটা হাহাকার কোর্‌তে থাকে না? তার মনের মধ্যে কি এমন-একটা নিদারুণ অভাব, ঘোরতর শূন্যতা থাকে না, যে-শূন্য সমস্ত জগৎ গ্রাস কোরেও পূর্ণ হ'তে পারে না? তার হৃদয়ের সে মরু-ভাব কেন? সে কি, তার প্রতিদানের মর্ম্ম-ভেদী আশাকে নিরাশার সর্ব্বব্যাপী বালুকার তলে নিহিত কেরে ফেলা হোয়েছে বলেই না? এমন কোন অমানুষিক মানুষকে কি কেউ দেখেছে, যে, ভালবাসার প্রতিদান না পেয়েও, প্রতিদানের আশা বা কল্পনা না কোরেও মহা যোগীর মত মনের আনন্দে আছে। প্রতিদানের আশা ত্যাগ কোরেও অনেকে ভালবাসে বটে, কিন্তু ভাল বেসে কি সুখী হয়? আচ্ছা তর্কের অনুরোধে মনেই করা যাক্ যে, ভালবাসার প্রতিদান পাবার আশা যে, ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেই তা'নয়, কিন্তু তাই বোলে কি প্রতিদান পাবার একটা ইচ্ছা মাত্রই স্বার্থ-পরতা? যোগাভ্যাস-ক্রমে কোন যোগী ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে দূর কোরে নিষ্কাম হোয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা কি স্বার্থপরতা? আমার শরীরের ধর্ম্মই এই যে, অবস্থা বিশেষে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্রেক হয়, সে উদ্রেক-টুকু অবশ্য স্বার্থ-পরতা নয়; কিন্তু আমার সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে আর একজন ক্ষুধিত ব্যক্তিকে যদি তার আহার থেকে বঞ্চিত করি, তা'হলে আমার স্বার্থপরতা হয় বটে! আমার মনের ধর্ম্ম এই যে, ভালবাসার প্রতিদান পেতে ইচ্ছে করে কিন্তু সেই ইচ্ছা টুকুই স্বার্থপরতা নয়; তবে যদি সেই ইচ্ছায় অন্ধ হয়ে এমন অন্যায় উপায়ে আমার ভালবাসার পাত্রের কাছে প্রতিদান পাবার চেষ্টা করি যে, সে তাতে কষ্ট পায় বা বিপদে পড়ে তা হলেই সেটা স্বার্থপরতা হোয়ে দাঁড়ায়।

তোমার চিঠি পোড়ে একটা কারণে বড় হাসি পে'লে। ভাবে বোধ হয় যে. তোমার মতে যারা নিঃস্বার্থ ভালবাসে তারা ভালবাসার পাত্রের কাছে যে আদর না পেয়েও কেবল সুখী থাকবে তা' নয়, অনাদর পেয়েও তারা কষ্ট পাবে না। যে রকম অবস্থা হোক্ না তারা কেবল নিজে ভাল বেসেই সুখী থাকবে। ভালবাসার লোকের মিষ্টি হাসি মুখখানি দেখলে যদি নিঃস্বার্থ প্রেমিকের আনন্দ হয় তবে তার কাছে আদর পেলেই বা কেন না হবে। তার মুখখানি না দেখলে যদি কষ্ট হয় তবে আদর গেলেই বা কষ্ট না হবে কেন?

আমি কাকে স্বার্থপর ভালবাসা বলি জান? যে ভালবাসা খাঁটি ভালবাসা নয়। ভালবাসার গিল্টি করা ইন্দ্রিয়-বিকার। সে ভালবাসায় ভালবাসার চাকচিক্য আছে, ভালবাসার সুবর্ণ বর্ণ আছে, কেবল ভাল-বাসা নেই। সে রকম ভালবেসে যে তোমার ভালবাসার পাত্রকে তোমার চক্ষে অত্যন্ত নীচ কোরে ফেল্‌চ তা'তে তোমার বুকে লাগে না। তোমার চক্ষে যে সে রক্ত-

মাংসের সমষ্টি একটা উপভোগ্য সামগ্রী বই আর কিছুই দাঁড়াচ্চে না, তা'তে তোমার কিছুমাত্র আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না ! যখন তার প্রতিমাকে তোমার হৃদয়ের মধ্যে আনো, তখন তোমার হৃদয়ের মধ্যে এমন এক তিল নির্ম্মল স্থান রাখ নি যেখানে তাকে বসাতে পারো ! তোমার বীভৎস দুর্গন্ধময় হৃদয়ে সে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা কোরে, দিন রাত তার পদে কুৎসিত লালসা ও কলুসিত কল্পনা উপহার দিচ্চ, তেমন বীভৎস প্রতিমা পূজাকে যদি ভাল বাসা নিতান্তই বোল্‌তে হয় তা হোলে একেই আমি স্বার্থপর ভালভাসা বলি। আমার মত এই যে, দৈত্যদের যেমন দৈত্যই বলে, কুদেবতা বা কোন রকম বিশেষণ-বিশিষ্ট দেবতা বলে না, তেমনি উপরি-উক্ত ব্যবহারকে স্বার্থপর ভালবাসা না বোলে তার যা যথার্থ নাম তাকে সেই নামেই ডাকা উচিত; তার জাল-নাম ভালবাসা তার যথার্থ নাম ইন্দ্রিয়পরতা। ভালবাসার চক্ষে যাকে দেখা যায়, কল্পনা তাকে স্বর্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে, তার চার দিকে স্বর্গের কিরণ দীপ্তি পেতে থাকে,—আর ইন্দ্রিয়পরতার চক্ষে যাকে দেখ, সে যদি স্বর্গীয় হয় তবু তোমার কল্পনা তাকে সে স্বর্গের আসন থেকে নামিয়ে পৃথিবীর আবর্জ্জনা মধ্যে স্থাপন করে, এ'র চেয়েও কি স্বার্থপরতা আর আছে ?

সংশোধন।

ভারতী, চতুর্থখণ্ড, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।

হিয়োন সাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৮	২	২৮	২০৬	১০৬
,,	,,	৩২	Travels	Itinerary
৬৯	১	১০।১১	লেড্‌লে ও বিল সাহেবের	এই সকল
,,	,,	১৬	1648	1848
৭০	১	৫	(Sei-she)	(Fei-she)
,,	,,	৯	কিবণসুবণের	কিরণসুবর্ণের
৭১	১	২৪	Brodlo's	Broadleys
,,	,,	২৫।২৬	111 and 1V	111
,,	,,	২৮	rains	ruins
৭৩	২	১১	সুক্ষ "সুক্ষ	সুহ্ম "সুহ্ম
,,	,,	২৯	হল	উইলসন
,,	,,	৩০	সুক্ষম	সুহ্ম
৭৪	১	১৫	সময়কে	সারাংশ
,,	,,	৩৩	হল	উইলসন
,,	২	৩৩	For (ban	Tar (pon
৭৫	১	২৬	XLV1	XL1V.
,,	২	৩১	XLV11	XPIV.
১১৭	১	২৭	I	J.
,,	,,	৩২	para	part
১২০	১	২৬	sooth	south
১২১	১	২৩	I	J.
,,	২	৬	লোট প্রস্তাবের	লাটপ্রস্তরেব
,,	,,	৮	Pholozinograph	Photozincograph
১২৩	২	২০	লক্ষ্মণ	লাক্ষ্মণেয়
১২৪	২	১	সমতল	সমতট
১৬৪	২	১৪	বৃন্দ্র	বৃন্দ
১৬৬	১	৯	প্রচলিত	প্রচলিত হইবার
১৬৭	২	১৭	১৮৯	১৪৮৯
১৬৮	১	২৭	Kei-to-na-suta-ta-na	Kei-lo-na-sufa-la-na.

ভূগর্ভ।

পৃথিবীর অভ্যন্তর কি প্রকার? আমরা পৃথিবীর উপরিভাগ যেরূপ দেখিতেছি, পৃথিবীর অন্তর প্রদেশও কি সেইরূপ? প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া যায় না। পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল কিম্বা ১৮৪৮০০০০ ফুট, তাহার মধ্যে কেবল ৫০০০ হাজার ফুট মানুষের চক্ষুর্গোচর হইয়াছে মাত্র। ইহা অপেক্ষা অধিক দূর নিম্নে খনন করিয়া দেখিবার কোন উপায় এখনো বাহির হয় নাই, সুতরাং কেন্দ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী-গর্ভ যে কি পদার্থে নির্ম্মিত তাহা কেহ [illegible] নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন [illegible], তবে যতদূর দেখা গিয়াছে তাহা[illegible] উপর যুক্তি খাটাইয়া, এবং বৈজ্ঞানিক [illegible] দ্বারা সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতেরা ভূ[illegible]ম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান—[illegible]

(১) পৃথিবীর আবরণ কঠিন [illegible] নিম্নে কেন্দ্র পর্য্যন্ত দ্রবপদার্থম[illegible]

(২) পৃথিবী [illegible] পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ [illegible] হউক প্রায় কঠিন।

(৩) পৃথিবীর আবরণ যেরূপ কঠিন তাহার কেন্দ্রও তদ্রূপ, কেবল ভূপৃষ্ঠ ও কেন্দ্রের মধ্যবর্ত্তীস্থল দ্রবপদার্থময়।

(৪) ভূ-পৃষ্ঠ কঠিন কিন্তু নিম্নে কেন্দ্র পর্য্যন্ত বাষ্পময়।

পৃথিবীর যতদূর নিম্ন পর্য্যন্ত মানুষের পরীক্ষার অন্তর্ভূত হইয়াছে কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ভূবেত্তাগণ প্রথম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পৃথিবীর নানা স্থান খনন দ্বারা যে পাঁচ হাজার ফুট মানুষের পরীক্ষাধীন হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, নিম্নতা অনুসারে ক্রমশই উত্তাপ বাড়িতে থাকে। এই উত্তাপ বৃদ্ধির পরিমাণ যদিও পৃথিবীর সকল স্থানে ঠিক সমান নহে, নানা স্থানীয় কারণে (Local causes) ইহার অল্প স্বল্প বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, কিন্তু বহু সংখ্যক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে পৃথিবীর অন্তরে প্রবেশ করিলে সাধারণতঃ প্রত্যেক ১০০ ফুটে তাপমান যন্ত্রের ন্যূনাধিক ১॥ ডিগ্রি উত্তাপ বাড়ে। উত্তাপ বৃদ্ধির এই নিয়মানুসারে ভূগর্ভে এত উত্তাপ জমিবার কথা যে কেন্দ্র পর্য্যন্ত দ্রব-পদার্থময় হইবারই সম্ভাবনা। ইহা ছাড়া এ মতের পক্ষে আরো অনেক বলবান কারণ আছে। পৃথিবীতে এরূপ অনেক বহুদূরব্যাপী স্তর সংস্থিতি (Alternate deposit of sedimentary rocks) দেখিতে পাওয়া যায় যে ভূগর্ভকে তরল মনে করিয়া না লইলে

সে সংস্থিতির কোন কারণ নির্দ্ধারিত করা যায় না। ইহা ছাড়া পৃথিবীর কোন অংশ উচ্চ হইয়া উঠিলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর অংশ নীচু হইয়া পড়ে। ভূগর্ভ তরল না হইলে এরূপ হইত না। কারণ তরল পদার্থের সাধারণ একটি গুণ এই যে তাহার কোন এক স্থানে অধিক চাপ পড়িলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান উচ্চ হইয়া উঠে।

এই সকল এবং অপরাপর কারণে ভূবেত্তাগণ ভূগর্ভকে দ্রব-পদার্থময় বলেন।

ভূগর্ভ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি জ্যোতিষিক গণনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হপকিন্স সর্ব্বতোভাবে এক সমান দুইটি দোলক যন্ত্র (Pendulum) লইয়া একটার নিম্নস্থ ধাতব গোলকের বদলে একটি সমান ভারের পারদ পূর্ণ কাঁচের গোলক বসাইয়া দেন। এই দুইটির গতিবিধি আলোচনা করিয়া তিনি দেখেন ধাতব দোলক অপেক্ষা পারদপূর্ণ দোলকটি শীঘ্র-গামী হয়। পৃথিবীর স্বকক্ষ ভ্রমণের উপর এই দৃষ্টান্ত খাটাইয়া, নানা প্রকার জ্যোতিষিক গণনা ও যুক্তি দ্বারা তিনিই প্রথমে সাব্যস্ত করেন যে ভূগর্ভ; কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় সংঘাত-কঠিন। তিনি বলিলেন তাহার অন্যথা হইলে, অর্থাৎ দ্রব-পদার্থ-পূর্ণ হইলে, পৃথিবী এখনকার অপেক্ষা শীঘ্রগামী হইত; তাহা হইলে পৃথিবীর কতকগুলি গতি (Precession ও Nutation) এখন যেরূপ আছে নিশ্চয়ই সেরূপ থাকিত না। পরে সার উইলিয়ম টম্‌সন্‌ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব আরচ্‌ডিকন প্র্যাট্‌ অন্য নানা রূপ যুক্তি দ্বারা হপ্‌কিন্সের এই মতটির পক্ষ সমর্থন করেন। যত দিন ফরাসি পণ্ডিত ডিলনে এই মতের ভ্রম প্রমাণ না করেন ততদিন পর্য্যন্ত ভূবেত্তাগণ আপনাদিগের প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিপক্ষেও হপ্‌কিন্স প্রভৃতি গণিতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কথা ঘাড় পাতিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভূবেত্তাদিগের মধ্যে এক জনও এমন অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশারদ ছিলেন না যিনি হপ্‌কিন্স প্রভৃতি অসাধারণ গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের গণনার ভুল ধরিতে পারেন। ফরাসী পণ্ডিত ডিলনে অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে হপকিন্সদিগের এক জন সমকক্ষ ব্যক্তি। তিনি উপরি-উক্ত মতটির সমালোচনা করিয়া তাহার অসারত[illegible] দেখাইয়া বলিলেন, পৃথিবী দ্রবপদার্থে [illegible]র্ণ হইলে তাহার গতির ব্যতিক্রম ঘটিবার [illegible] কোন সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া হপ্‌[illegible]র দোলক যন্ত্রের পরীক্ষা পৃ[illegible]র সম্পর্কে কেমন করিয়া খাটিবে? প্রথমতঃ, দোলকের গোলক [illegible]ও অবলম্বন করিয়া দোলে ও পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের [illegible]র্ত্তন করে। সুতরাং দোলক যন্ত্রের গতির দৃষ্টা[illegible] পৃথিবীর গতি নিরূপিত হইতে[illegible] না। দ্বিতীয়তঃ, কাঁচে পারদ যেরূপ অসংলিপ্ত থাকে ভূগর্ভস্থ পদার্থ তাহার উপরিস্থ আবরণের সহিত সেরূপ বিচ্ছিন্ন থাকিলে হপ্‌কিন্‌সের সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইত, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে পৃথিবীর

আবরণের সহিত ভূগর্ভের পদার্থ এমনি সংলিপ্ত যে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সত্বেও উভয়ে কঠিন-পদার্থ নির্ম্মিত একটি বস্তুর ন্যায়ই কার্য্য করে।

পৃথিবী কেন্দ্র পর্য্যন্ত সংঘাত-কঠিন মানিয়া লইলে আর একটি গোল বাধে। তাহা হইলে জ্বালামুখীর * অগ্ন্যুৎ-পাতের কি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যাঁহাদের মতে ভূগর্ভ কঠিন তাঁহারা বলেন, জ্বালামুখীর অগ্ন্যুৎপাত স্থানীয় কারণ-প্রসূত। পর্ব্বতগর্ভে যে সকল পদার্থ নিহিত থাকে, কালে তাহাই উদ্গীরিত হয়, সে সকল পদার্থ সাধারণ ভূগর্ভের নহে। কিন্তু ইহাতে অনেক আপত্তি আছে। বহু-সংখ্যক রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে কি ইয়ুরোপ, কি আসিয়া, কি আফ্রিকা, কি আমেরিকা, পৃথিবীর সকল স্থানের জ্বালামুখী হইতে একই প্রকার পদার্থ উদ্গীরিত হয়। সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থিত জ্বালামুখী হইতে স্থানীয় কারণ বশতঃ একই প্রকার পদার্থ নির্গত হওয়া সম্ভবপর নহে। ইহা ছাড়া জর্ম্মাণ বৈজ্ঞা[illegible]াইমেনস্ গত বৎসর বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়া ভূগর্ভের তরলতার পক্ষে অতি সারগর্ভ যুক্তি দেখাইয়াছেন।

তিনি বিসুবিয়াস পর্ব্বতে গিয়া দেখেন, পর্ব্বতের গহ্বর মধ্য হইতে দুই তিন সেকেণ্ড অন্তর সশব্দে বাষ্প নির্গত হইতেছিল। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। পর্ব্বতের খুব গভীর প্রদেশে বাষ্প প্রস্তুত হইয়া যদি হঠাৎ উর্দ্ধে উঠে তাহা হইলেই ঐরূপ হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে প্রত্যেক বারের বাষ্পোদ্গীরণের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত ধাতুস্রোত (Lava) উত্থিত হইবার কথা, এবং পর্ব্বতের ধূমনলের ভিতর উপযুক্ত পরিমাণ ধাতব পদার্থ জমিবার জন্য সময় আবশ্যক। কাজেই তাহা হইলে দুই তিন সেকেণ্ডের মধ্যে সশব্দে কেবল মাত্র বাষ্প উদ্গীর্ণ হইত না। অন্য সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া সাইমেনস্ এইরূপ বাষ্পোদ্গীরণের এই কারণ দেন যে, নিম্নোত্থিত বিশুদ্ধ কিম্বা বিমিশ্র জলজান বাষ্প উপরের বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিয়া সশব্দে জ্বলিতে থাকে। এবং নানা যুক্তি দেখাইয়া তিনি বলেন, যদি ভূগর্ভ দ্রব-পদার্থময় না হইত তাহা হইলে ভূগর্ভে এত প্রচুর পরিমাণে জলজান বাষ্প জন্মাইত না।

অপর কতকগুলি বৈজ্ঞানিকেরা অন্য প্রকার যুক্তি দেখাইয়া ভূগর্ভের কাঠিন্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক জেম্‌স্ টমসন্ গণনা করিয়া বলেন যে চাপের আধিক্য হইলে কোন বস্তুকে গলাইতে ও দ্রব অবস্থায় রাখিতে

* সচরাচর বাঙ্গালা ভাষায় "আগ্নেয় গিরি" এই নূতন-সৃষ্ট [illegible]টি Volcanoর প্রতিশব্দ বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু সংস্কৃত শকুন্তলায় "জ্বালামুখী" শব্দ যখন ঐ অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায় তখন তাহার পরিবর্ত্তে কোন নূতন কথা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই।

অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তাপের আবশ্যক করিবে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বুন্‌সেন মোম ও গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্যের উপর পরীক্ষা করিয়া এই মতের পোষকতা করেন। পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হপকিন্‌স্ নিজে ঐ সকল দ্রব্যে পরীক্ষা করিয়া ভূগর্ভ যে কঠিন—এই মতটি অভ্রান্ত বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করেন। এই পরীক্ষা অবলম্বন করিয়া বুন্‌সেন বলেন পৃথিবী কেন্দ্র পর্য্যন্ত সংঘাত-কঠিন না হইয়া থাকিতে পারে না। মোমকে উপর্য্যুপরি থাক্-থাক্ করিয়া রাখিলে, তাহার সর্ব্ব প্রথম থাক্ গলাইতে যে উত্তাপ লাগে, দ্বিতীয় থাক্ গলাইতে তাহা অপেক্ষা অধিক উত্তাপ লাগিবে, তৃতীয় থাক্ গলাইতে আরো অধিক, এই রূপে যতই নিম্নের থাকে আসা যায় ততই তাহাকে গলাইতে অধিক উত্তাপের আবশ্যক হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে এত অধিক চাপ যে তথাকার কোন পদার্থকে যে-সে উত্তাপ গলাইতে পারে না। যে পরিমাণ উত্তাপে কেন্দ্রস্থ পদার্থ গলিতে পারে তত প্রচণ্ড উত্তাপ ভূগর্ভে থাকিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং ভূগর্ভ সংঘাত-কঠিন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি আছে। মোম, গন্ধক প্রভৃতি যে সকল পদার্থের উপর পরীক্ষা দ্বারা উপরিউক্ত মতটি স্থাপিত, বাস্তবিক পক্ষে, পৃথিবী সে সকল পদার্থে নির্ম্মিত নহে।

এখন দেখা উচিৎ পৃথিবী যেরূপ পদার্থে নির্ম্মিত সেই রূপ ধাতব ও আকরিক পদার্থে পরীক্ষা করিলে কি ফল দাঁড়ায়? সার্ উইলিয়াম্ টম্‌সন্ ও হপ্‌কিন্স্ পরে আবার ধাতব দ্রব্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, জেম্‌স্ টম্‌সনের মতটি সকল দ্রব্যের সম্বন্ধে খাটে না। যে সকল পদার্থ তরল অবস্থা হইতে ঘন অবস্থা পাইবার সময় বিস্তৃত হয় চাপবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল বস্তুকে গলাইতে ও দ্রব অবস্থায় রাখিতে অল্প উত্তাপের আবশ্যক করে, এবং যে সকল বস্তু ঐরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় সঙ্কুচিত হয় চাপাধিক্য সহকারে তাহাদিগকে গলাইতেই অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয়।

গতবৎসরের প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সাইমেনস্ এ বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। জর্ম্মান দার্শনিক কাণ্ট প্রথমে অনুমান করেন যে জ্বলন্ত বাষ্পরাশি ক্রমে শীতল হইয়া পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ হইয়াছে। পরে ফরাসী গণিতজ্ঞ লাপ্লাস্ এই মতটিকে অনেক অকাট্য যুক্তির উপর দাঁড় করান। এখনকার বিজ্ঞান মণ্ডলীতে সর্ব্বত্রই এই মতটি সমাদৃত। জ্বলন্ত বাষ্পরাশি উত্তপ্ত তরল পদার্থে পরিণত হইয়া ক্রমে আরো শীতল [illegible] আরম্ভ হইলে দুই প্রকার হইবার সম্ভাবনা। (১) হয়, [illegible] পৃষ্ঠ শীতল ও কঠিন হইয়া ভিতরের অংশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তরল অবস্থায় [illegible]বে (যেমন সীসের গোলা ঢালাই করিবার কারখানায় সুন্দর রূপে দেখিতে পাওয়া যায়)। (২) নয় তাহার ভিতরের পদার্থ কঠিন হইয়া ক্রমে উপর পর্য্যন্ত কঠিন হইবে। উত্তপ্ত

তরল পদার্থ শীতল হইবার সময় তাহার উপরের স্তর ঘন হইয়া নিম্নে ডুবিয়া পড়ে, এই ঘনীভূত পদার্থ আভ্যন্তরিক তাপে আবার তরল হইয়া যদি উপরে উঠে তাহা হইলেই প্রথমোক্ত অবস্থা হয়। কিন্তু উপরের ঘনীভূত পদার্থ নিম্নে ডুবিয়া গেলে যদি আর তরল না হয় তাহা হইলে সেইখানেই তাহা উত্তরোত্তর গাঢ় হইতে থাকে। পৃথিবী যদি প্রথমোক্তরূপে শীতল হইয়া থাকে তাহা হইলে ভূগর্ভ তরল, যদি শেষোক্তরূপে শীতল হইয়া থাকে তবে ভূগর্ভ কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় কঠিন। এখন দেখিতে হইবে পৃথিবী যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহা উক্তরূপে নিমগ্ন হইয়া গেলে আবার তরল হইয়া উপরে উঠিবে কিম্বা নিম্নে পড়িয়া ক্রমশঃ সেখানে গাঢ়তর হইতে থাকিবে?

যে বস্তু তরল হইতে দৃঢ় অবস্থা পাইবার সময় বিস্তৃত হয় তাহাই লঘু হইয়া একবার নীচে ডুবিয়া গেলেও আবার তরল হইয়া উপরে উঠে এবং যাহা পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় সঙ্কুচিত হয় তাহা আর উপরে উঠে না। সুতরাং দেখা আবশ্যক, পৃথিবী যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় বিস্তৃত কিম্বা সঙ্কুচিত হয়। যদি বা সঙ্কুচিত হয়, সে সঙ্কোচনের পরিমাণ কত? সঙ্কোচনের মাত্রা যত কম হইবে, ততই কোন বস্তুকে গলাইবার জন্য কম উত্তাপের আবশ্যক। বিসকফ্ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন পৃথিবীর পদার্থ তরল হইতে ঘন হইবার সময় শতকরা ২০ ভাগ সঙ্কুচিত হয়। এই পরীক্ষার উপরে গণনা করিয়াই সার উইলিয়ম টম্সন বলেন ভূগর্ভ কঠিন। কিন্তু ম্যালেট্ বড় বড় লৌহের কারখানায় দেখিয়াছেন মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থ শতকরা ৬ ভাগ সঙ্কুচিত হয়। সাইমেনস্ বলেন তিনি তাহার ভ্রাতার ড্রেস্ডেন্ নগরস্থ কাঁচের কারখানায় দেখিয়াছেন, যে দ্রব কাঁচ শীতল হইবার সময় প্রথম খুব সঙ্কুচিত হয় কিন্তু কিছু পরে তাহার সঙ্কোচনের মাত্রা কমিয়া যায়, এমন কি বোধ হয় শেষে দৃঢ় হইবার মুহূর্ত্তে তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পৃথিবী যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহা কাঁচের সমধর্ম্মী, সুতরাং ভূগর্ভের পদার্থ চাপবৃদ্ধি হেতু যে কঠিন হইবে এমন বলা যায় না।

ভূগর্ভ সম্বন্ধে আর যে দুইটি মত বলিবার আছে তাহার যুক্তি গুলি অপেক্ষাকৃত সামান্য। একটির স্থূল মর্ম্ম এই পৃথিবী প্রকাণ্ড হাঁসের ডিমের মত। ডিম্বস্থ শ্বেত পদার্থ যেমন তাহার উপরিস্থ খোলা এবং অভ্যন্তরের লোহিতাংশের মধ্যে অবস্থিত, তেমনি পৃথিবীর আবরণ ও কেন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী-স্থান দ্রব পদার্থ পূর্ণ হইয়া পৃথিবীর উপর নিম্ন দুই ভাগকে বিযুক্ত করিতেছে।

বুন্সেন্ মোম গন্ধক প্রভৃতি পদার্থের উপর পরীক্ষা করিয়া বস্তুর দ্রাবনের সম্পর্কে উত্তাপের প্রভাবের বিষয়ে যাহা বলেন তাহাকেই অবলম্বন করিয়া উপরি উক্ত মতটি অবস্থিত। এই মতের প্রবর্ত্তকেরা বলেন, পৃথিবীর যত নীচে যাইবে ততই অধিক চাপ

আর চাপাধিক্য সহকারে কোন বস্তুকে গলাইতে যে কালে উত্তরোত্তর অধিক উত্তাপ লাগে, সেকালে নিম্নের পদার্থকে দ্রব অবস্থায় রাখিতে ক্রমশ অধিক উত্তাপের আবশ্যক। কেন্দ্রে সর্ব্বাপেক্ষা চাপ অধিক; তথাকার পদার্থকে গলাইতে যে প্রচণ্ড উত্তাপের আবশ্যক, তাহা কি কেন্দ্রে আছে? তাঁহারা বলেন কেন্দ্রে অতিশয় উত্তাপ আছে বটে, কিন্তু তথাপি সেখানকার পদার্থকে দ্রব অবস্থায় রাখিবার উপযুক্ত প্রচণ্ড উত্তাপ সেখানে নাই, কাজেই তাহা সংঘাতকঠিন। কিন্তু তেমনি কেন্দ্র হইতে যত উপরে আসা যায় তত চাপ কমে, সেই হেতু ক্রমশ অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপেই তৎস্থানীয় পদার্থ দ্রব হয়, কাজেই কেন্দ্র ও পৃথিবীর আবরণের মধ্য স্থলে যে পরিমাণে উত্তাপের প্রভাব তাহাতেই সেই স্থানের পদার্থ দ্রব হইবে।

ভূবেত্তারা উপরি উক্ত মতে কোন আপত্তি করেন না; সম্পূর্ণ তরল না বলিয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত ভূগর্ভ তরল বলিলেই তাঁহাদের আর কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু উপরি উক্ত মতের যুক্তি সকল এত সামান্য যে তাহার মূল্য বড় কম। ইহা ব্যতীত পৃথিবী যে প্রকারে উৎপন্ন বলিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে স্থির হইয়াছে তাহার সহিত এ মতটী সম্পূর্ণ বিরোধী। সংঘাত হইবার কার্য্য যে পৃথিবীর কেন্দ্র স্থান হইতে আরম্ভ হয় না তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

চতুর্থ মতানুসারে পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন, কিন্তু ভূগর্ভ কেন্দ্র পর্য্যন্ত বাষ্পময়। ইহার পক্ষপোষক যুক্তি গুলি নিতান্ত আনুমানিক, পূর্ব্বের মতের অপেক্ষা এই গুলি আরো অসার। এ মতের প্রবর্ত্তকেরা বলেন পৃথিবীর ঘনত্ব (Mean density) জলের ৫½ গুণ মাত্র। কিন্তু ভূগর্ভে এত বেশী চাপ, যে পৃথিবীর উপরিস্থ কঠিন পদার্থের দ্বারা ভূগর্ভ নির্ম্মিত হইলে চাপের আধিক্য বশতঃ ভূগর্ভস্থ পদার্থ এত ভারী হইত যে গড়ে পৃথিবী জল অপেক্ষা ৫½ গুণের অধিক ঘন হইত। কিন্তু তাহা যে কালে হয় না তখন ইহা স্থির যে, ভূগর্ভ এমন পদার্থে নির্ম্মিত যাহা পৃথিবীর উপরি ভাগে আনিলে অত্যন্ত লঘু হইবে। চাপের আধিক্যে বস্তুর যে ঘনত্বের বৃদ্ধি হয় এই সত্যের উপরেই উপরি-উক্ত অনুমানটি স্থাপিত।

এই নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর ৮০ মাইল নিম্নে বাতাস জলের মত ভারী হইবে, জল আবার ৩৬০ মাইল নীচে পারদের ন্যায় ভারী হইবে, এবং কর্দ্দম যাহার প্রত্যেক ঘন ফুটের ভার পৃথিবীর উপরি ভাগে ১ মন ২১ সের ৩৬০ মাইল নীচে তাহার ভার ১৬৮ মন ৩০ সের হইবে, কিন্তু তাহা যেকালে হয় না তখন ভূগর্ভ কেন্দ্র পর্য্যন্ত মাটীর মতন কঠিন দ্রব্যে নির্ম্মিত নহে; সম্ভবতঃ ভূগর্ভ বাষ্পময়। সেই বাষ্প পৃথিবীর উপরে অত্যন্ত লঘু, কিন্তু চাপাধিক্য-বশতঃ ভূগর্ভে তাহাতেই বেশ ভার হয়।

কিন্তু এই মতের প্রবর্ত্তকেরা যাহা

বলেন প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় না, বাষ্পীয় পদার্থের উপর চাপ অর্পণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে চাপ বৃদ্ধি সহকারে ক্রমিকই যে ভারের বৃদ্ধি হইবে এমন নহে। বরঞ্চ দেখা যায় ক্রমাগত চাপ বাড়াইলে শীঘ্রই এমন এক অবস্থা আসে যখন চাপাধিক্য অনুসারে তাহার আর ঘনত্ব বাড়ে না। যাহা হউক চাপ-বৃদ্ধির দ্বারা যে কি হয় তাহা এখনো সম্পূর্ণ রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। পূর্ব্বে মনে হইত সমুদ্রের তলায় যেরূপ অধিক চাপ তাহাতে জীব জন্তু কিম্বা কর্দ্দম থাকিতে পারে না, কিন্তু আটলাণ্টিক সাগরের তলা হইতে প্রাণী ও নরম কাদা উঠান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখিয়া ওরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। মানুষের আয়ত্তাধীন চাপ প্রয়োগেই সমস্ত বাষ্পীয় পদার্থ যখন জলাকারে পরিণত হইয়াছে তখন এত ভয়ানক চাপে ভূগর্ভে বাষ্প থাকা সম্ভাব্য নহে।

এইতো একটি একটি করিয়া চারিটি মত সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইহাদের সকলের সমর্থনকারী যুক্তি সকল দেখিলে মনে হয় ভূগর্ভ যে তরল দ্রবপদার্থ-পূর্ণ ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভবপর।

ইহা ছাড়া ইতালিয় বৈজ্ঞানিক পালমিয়েরি বলেন, তিনি ঈটনা নামক জ্বালামুখীর গর্ভে জোয়ার ভাঁটা দেখিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ের সত্যতা এখনো নিশ্চিত হয় নাই। এ বিষয়টি সপ্রমাণ হইলে ভূগর্ভের তরলতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিকদিগের শীর্ষ-স্থান-স্থিত রাজকীয় জ্যোতির্বেত্তা Sir G. Airy এ বিষয়ে বলেন, "I do think that a large portion of the central part of the earth is fluid and hot."—On the Probable Condition of the Interior of the Earth by Sir George Airy, K. C. B., F. R. S. &c.

বাঙ্গালী কবি নয় কেন ?

"বাঙ্গালী কবি নয় কেন ?" এ প্রশ্ন লইয়া গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিতে বসিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের হয়ত ঈষৎ হাস্য রসের উদ্রেক হয়। তাঁহারা বলিবেন, প্রথম প্রশ্ন হউক "বাঙ্গালী কি" পরে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইবে, "বাঙ্গালী কি নয়"! যদি জিজ্ঞাসাই করিতে হইল, তবে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করা যায় "বাঙ্গালী দার্শনিক নয় কেন," "বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক নয় কেন" "বাঙ্গালী শিল্পী নয় কেন" "বাঙ্গালী বণিক্

নয় কেন” ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঙ্গালী জাতির মত এমন একটা অভাবাত্মক গুণ-সমষ্টির সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করা যায় যে বাঙ্গালীতে অমুক বিশেষ গুণের অভাব দেখা যায় কেন, তাহা হইলে শ্রোতারা সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিবেন বাঙ্গালীতে কি গুণের ভাব দেখিতে পাইতেছ? এরূপ ঘটনায় আমাদের মনে আঘাত লাগিতে পারে কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কি আমাদের একটি কথা কহিবার আছে? “বাঙ্গালী কি” ইহা অপেক্ষা দুরূহ সমস্যা কি আর কিছু হইতে পারে? ও বাঙ্গালী কি নয় ইহা অপেক্ষা সহজ প্রশ্ন কি আর আছে?

তবে আজ, বাঙ্গালী কবি নয় কেন, এ প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিতে বসিবার তাৎপর্য্য কি? তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আজ কাল শত সহস্র বঙ্গীয় বালক আধ পয়সা মূলধন লইয়া (বিদেশী মহাজন-দিগের নিকট হইতে ধার করা) দিন রাত প্রাণপণ পূর্ব্বক বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কবিত্ব চাষ করিতেছেন; আজ যখন দেখিলেন বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্র তাঁহাদের যত্নে কাঁটা গাছ ও গুল্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহারা কপালের ঘাম মুছিয়া হর্ষ-বিস্ফারিত নেত্রে দশ জন প্রতিবাসীকে ডাকিয়া কহিতেছেন, “আহা, জমী কি উর্ব্বরা!” বঙ্গবাসীগণ স্বপ্নেও স্বজাতিকে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বলিয়া অহঙ্কার করিয়া বেড়ান না, অতএব সে বিষয়ে তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি লক্ষিত হয় না; কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি তাঁহারা রাশীকৃত অসার কবিত্বের খড় তাঁহাদের কাক পুচ্ছে গুঁজিয়া দিন রাত্রি প্রাণপণে পেখম তুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করেন, এমন কি ভাল ভাল কুলীন ময়ূরদের মুখের কাছে অম্লান বদনে পেখম নাড়িয়া আসেন; অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ময়ূর বলিয়া তাঁহাদের মনে মনে অত্যন্ত অভিমান হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে দশ জন লোক নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছে, যাহারা অগ্রে অগ্রে যাইয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতে থাকে, “আমাদের পশ্চাতে যাঁহাদের দেখিতেছ, তাঁহারা কাক নন, তাঁহারা ময়ূর!” আজ কাল ত এই রূপ দেখিতেছি। বহু দিন হইতে ভাবিতেছি, বাঙ্গালী কেন আপনাকে কবি বলিয়া এত অহঙ্কার করে, জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে বলে, “দেখিতেছ না, আজ কাল বাঙ্গালার সকলেই কবিতা লেখে!” সকলেই মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙ্গালা বর্ণমালা কাগজে গাঁথিতেছে, তাহা দেখিয়াই যদি বাঙ্গালী জাতিকে বিশেষ রূপে কবি জাতি আখ্যা দেও, হে চাষা, ক্ষেত্রে অগণ্য কাঁটা গাছ দেখিয়া ফসল ভ্রমে যদি তোমার মনে বড় আনন্দ হইয়া থাকে, তবে তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমার সে ভ্রম ভাঙ্গা আবশ্যক।

যদি এমন একটা কথা উঠে যে, ইংরাজ কবি কেন, তবে তাহা লইয়া দুই দণ্ড আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে। ভাবিয়া দেখিলে কি আশ্চর্য্য বোধ হয় না যে, সে

ইংরাজেরা এমন কাজের লোক, বাণিজ্য বৃত্তি যাহাদের ব্যবসায়, সময়কে যাহারা কান ধরিয়া খাটাইয়া লয়, একটি মিনিটকেও ফাঁকি দিতে দেয় না, জীবিকার জন্য যাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হয়, বাহ্য সুখ সম্পদই যাহাদের উপাস্য দেবতা, যাহারা রাজ্যতন্ত্রীয় মহাসাগরে দিন রাত মগ্ন থাকিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুচ্ছ আস্ফালনে সেই সমুদ্রকে অবিরত ফেনিত প্রতিফেনিত করিতেছে, তাহারা এমন কবি হইল কিরূপে? ইংলণ্ড দেশে, অমন একটা ঘোরতর কাজের ভিড়ের মধ্যে, হাট বাজারের দর-দামের মধ্যে, বড় রাস্তার ঠিক পাশেই—যেখানে আমদানি ও রপ্তানির বোঝাই করা গাড়ি দিন রাত আনাগোনা করিতেছে,—সেখানে কি করিয়া কবিতার মত অমন একটি সুকুমার পদার্থ নিজের সাধের নিকেতন বাঁধিল? আর আমরা যে, এই বঙ্গদেশে সূর্য্যাতপে বসিয়া ঘুমন্ত ঝিমন্ত স্বপ্নন্ত জীবন বহন করিতেছি, শত সহস্র অভাব আছে অথচ একটি অভাব অনুভব করি না, বাঁচিয়া থাকিলেই সন্তুষ্ট, অথচ ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার আবশ্যক বিবেচনা করি না, আমরা কেন উচ্চ শ্রেণীর কবি হইলাম না? অনেক কারণ আছে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে উত্তেজনা নাই। উত্তেজনা নাই বলিতে বুঝায়, আমরা কিছুই তেমন গভীর রূপে, তেমন চূড়ান্ত রূপে অনুভব করিতে পারি না। ঘটনা ঘটে, আমাদের হৃদয়ের পদ্মপত্রের উপর পড়িয়া তাহা মুহূর্ত্তকাল টলমল করে, আবার পিছলিয়া পড়িয়া যায়। এমন কিছুই ঘটিতে পারে না, যাহা-আমাদের হৃদয়ের অতি মর্ম্ম স্থলে প্রবেশ করিয়া সেখানে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে। আমরা সন্তুষ্ট প্রকৃতির লোক। সন্তুষ্ট-প্রকৃতির অর্থ আর কিছুই নহে, তাহার অর্থ এই যে, আমাদের অনুভাবকতা তেমন তীব্র নহে, আমরা সুখ ও দুঃখ তেমন প্রাণপণে অনুভব করিতে পারি না! সুখ যদি আমাদের চক্ষে তেমন স্পৃহনীয় ঠেকিত, দুঃখ যদি আমাদের নিকট তেমন ভীতিজনক দন্ত বিকাশ করিত, তাহা হইলে কি আমরা অদৃষ্ট নামে একটা বল্‌গা রজ্জু হীন ছুটন্ত অন্ধ অশ্বের উপর চড়িয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঢুলিতে পারিতাম? আমাদের ঘৃণা নাই, আমাদের ক্রোধ নাই, অন্তর্দাহী জ্বলন্ত আগ্নেয় পদার্থের ন্যায় চিরস্থায়ী প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নাই। একটা অন্যায় ব্যবহার শুনিলে ঘৃণায় আমাদের আপাদ মস্তক জ্বলিতে থাকে না, একটা অন্যায়াচরণ পাইলে আমরা ক্রোধে আত্মহারা হই না, ও যত ক্ষণ না তাহার প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারি ততক্ষণ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রক্ত ফুটিতে থাকে না। আমাদের ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীরে অত উত্তেজনা সহিবেই বা কেন? আমাদের এই অল্প-পরিসর বক্ষের মধ্যে, আমাদের এই জীর্ণ-জর্জ্জর হাড় কখানির ভিতরে অত ঘৃণা, অত ক্রোধ যদি জ্বলিতে থাকে, সুখে ও

দুঃখে যদি অত তরঙ্গ তুলিতে থাকে, তবে আমাদের পঞ্চাশ বৎসরের পরমায়ু কত সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে! আমাদের মত এমন একটি ভগ্নপ্রবণ এঞ্জিনে অত অগ্নি, অত বাষ্প সহিবে কেন? মুহূর্ত্তে ফাটিয়া যাইবে। আমাদের হৃদয়ে বিস্ফারক মনোবৃত্তি সকল যেমন হীনপ্রভ, সঙ্কোচক মনোবৃত্তি সকল তেমনি স্ফূর্ত্তিমান। আমরা ভয়ে জড়সড় হই, লজ্জায় মাটিতে মিশাইয়া যাই। সে লজ্জা আবার আত্মগ্লানি নহে, আত্মগ্লানির দাহকতা আছে; দোষ করিয়া নিজের নিকট নিজে লজ্জিত হওয়াত পৌরুষিকতা। আমাদের লজ্জা, দশ জনের চোখের সুমুখে পড়িয়া জড়সড় হইয়া যাওয়া, পরের নিন্দা-সূচক ঘৃণার দৃষ্টিপাতে মরমর' হইয়া পড়া, একটা ঘোমটা থাকিলেই আর এ সকল লজ্জা থাকিত না। যে সকল মনোবৃত্তিতে উত্তেজিত করে ও একটা কোন কার্য্যে উদ্যত করে তাহা আমাদের নাই, কিন্তু যে সকল মনোবৃত্তিতে আমাদের সঙ্কুচিত করে ও সকল কার্য্য হইতে বিরত করে তাহা আমাদের আছে। আমাদের দেশে রাগারাগী হইয়া তৎক্ষণাৎ একটা খুনাখুনি হইয়া যায় না। বলবান জাতিদের মত বিশেষ রাগ হইলেই অমনি ঘুষি আগেই লাফাইয়া উঠে না; রাগ হওয়া ও হাতাহাতি হওয়ার মধ্যে একটি দীর্ঘ ব্যবধান গালাগালিতেই কাটিয়া যায় এবং আমাদের দুর্ব্বল-শরীর ক্রোধ সেই সময়ের মধ্যেই প্রায় প্রাণ ত্যাগ করে। কেবল রাগ নহে আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তিই এত দুর্ব্বল যে তাহারা তাহাদের ক্ষীণ হস্তে ধাক্কা মারিয়া আমাদের কোন একটা কাজের মধ্যে ঠেলিয়া দিতে পারে না। যদি বা দেয় ত সে কাজ সমাপ্ত হইতে'না হইতে সে নিজে পলায়ন করে; যদি বা লিখিতে ব'স তবে বড় জোর কর্ত্তা ও কর্ম্ম পর্য্যন্ত লিখা হয়, কিন্তু ক্রিয়া কোন কালে লেখা হয় না; যেমন, যদি লিখিতে চাও যে, "বঙ্গনন্দন বাবু দেশলাই প্রস্তুত করিতেছেন" তবে বড় জোর "বঙ্গনন্দন বাবু" ও "দেশলাই" পর্য্যন্ত লেখা হয়, কিন্তু "প্রস্তুত করিতেছেন" পর্য্যন্ত আর লিখা হয় না। বলাই বাহুল্য যে, যাহার মনোবৃত্তি সকল অত্যন্ত দুর্ব্বল, সে কখনো কবি হইতে পারে না। যে বিশেষরূপে অনুভব করে না সে বিশেষ রূপে প্রকাশ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে ভাবের অর্থাৎ অনুভাবকতার গভীরতা, বলবত্তা নাই, তাহা যদি থাকিত তবে কার্য্যের এত দরিদ্র-দশা কেন থাকিবে? অতএব বাঙ্গালী জাতি যদি না ভাবে ত সে প্রকাশ করিবে কিরূপে? কবি হইবে কিরূপে?

আমরা যে এত অনুভব কম করি কেবলমাত্র অনুভাবকতার অল্পতা তাহার কারণ নহে। তাহার কারণ আমাদের কল্পনার দৃষ্টি অতি সামান্য। যে ব্যক্তির কল্পনা অধিক, সে ব্যক্তির অনুভাবকতাও তেমনি তীক্ষ্ণ। কল্পনা আমাদের হৃদয়ে দর্পণের ন্যায় বর্ত্তমান। যাহার কল্পনা মার্জ্জিত ও মসৃণ তাহার

হৃদয়ে প্রতিবিম্ব অতি সমগ্র ও সম্পূর্ণ হয়; প্রতিবিম্বও সত্য পদার্থের মত প্রতিভাত হয়, কিন্তু মলিন কল্পনায় প্রতিবিম্ব অতি অস্পষ্ট হয়, ভাল করিয়া দেখা যায় না। একটা ঘটনা যদি হৃদয়ে ভাল করিয়া প্রতিবিম্বিতই না হইল, যদি তাহা ভাল করিয়া দেখিতেই না পাইলাম, তবে তজ্জনিত সুখ বা দুঃখ হইবে কেন? একজন কাল্পনিক ব্যক্তি যখন বহুদিন পরে বিদেশ হইতে দেশাভিমুখে যাত্রা করে, তখন দেশে আসিলে তাহার আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট কিরূপ সমাদর পাইবে, তাহার এমন একটি জাজ্জ্বল্যমান চিত্র তাহার কল্পনাপটে অঙ্কিত হয় যে, সে আনন্দে অধীর হইয়া পড়ে। সে চক্ষু মুদিয়া স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, যেন সে তাহার সেই পুরাতন বাটির প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই সম্মুখে আতা গাছটি রহিয়াছে, এক পাশে গাভীটি বাঁধা রহিয়াছে, ছোট মেয়েটি দাওয়ায় বসিয়া খেলা করিতেছে, সে তাহাকে দেখিয়া কি বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, মা কি বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, বাড়িতে কিরূপ একটা কোলাহল পড়িয়া গেল, সমস্ত সে দেখিতে পায়; কে তাহাকে কি প্রশ্ন করিবে তাহা সে কল্পনা করিতে থাকে এবং সে তাহার কি উত্তর দিবে তাহা পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া রাখে। কল্পনা যদি এমন জাজ্বল্যমান না হয়, তবে সে কখনো স্পষ্ট সুখ অনুভব করিতে পারে না। যখন একজন ভাবী দারিদ্র্য-দুঃখ ভাবিয়া আত্মহত্যা করে, তখন সে তাহার ভবিষ্যৎ দুঃখের দশা বর্ত্তমানের মত অতি স্পষ্ট ও জীবন্ত করিয়া দেখে, নহিলে আত্মহত্যা করিতে পারে না।

যে ব্যক্তির অনুভাবকতা অধিক সে ব্যক্তি কাজ করে, সে কখনো নিরুদ্যম থাকিতে পারে না। সুখ তাহাকে এত আনন্দ দেয় যে, সুখের জন্য সে প্রাণপণ করে, দুঃখ তাহাকে এত কষ্ট দেয় যে, দুঃখের হাত এড়াইতে সে বিধিমতে চেষ্টা করে। বাঙ্গালীরা কাজ করিতে চাহে না, কেন না তাহারা জানে যে, কোনরূপে দিনপাত হইয়া যাইবে। কষ্ট হউক্ দুঃখ হউক্ কোন রূপে দিন পাত হইলেই সন্তুষ্ট! যাহাদের অনুভাবকতা অধিক, তাহাদের কি এরূপ ভাব? এমন হয় বটে, যে, অনেক সময় আমরা অনুভব করি কিন্তু শরীরের দৌর্ব্বল্য বশতঃ সে অনুভাবকতা আমাদের কাযে নিয়োগ করিতে পারে না। কিন্তু তেমন অবস্থায় ক্রমেই আমাদের অনুভাবকতা কমিয়া যায়। অনবরত যদি দুঃখের কারণ ঘটে, অথচ তাহার প্রতিকার করিতে না পারি; চুপ চাপ বসিয়া দুঃখ সহিতেই হয়, জানি যে, কোন চারা নাই, তাহা হইলে মন হইতে দুঃখবোধ কমিয়া যায় ও অদৃষ্টবাদ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মে। যেমন করিয়াই হউক্ অনুভাবকতার হ্রাস হয়ই!

বহুকাল হইতে একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, কাজের সহিত কল্পনার মুখ-দেখাদেখি নাই। কল্পনা যদি এখানে থাকে ত কাজ ওখান দিয়া চলিয়া

যায়। সচরাচর লোকে মানুষকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে, কাজের লোক ও কল্পনাপ্রধান লোক। কাজের লোক যদি উত্তর মেরুতে থাকে ত কল্পনাপ্রধান লোক দক্ষিণ মেরুতে থাকিবে। কিন্তু ভাবনা ও প্রকাশের মধ্যে যেরূপ অকাট্য সম্বন্ধ কল্পনা ও কাজের মধ্যে কি ঠিক তেমনি নহে? তুমি একটি ছবি আঁকিতে চাও, আগে কল্পনায় সে ছবি না উঠিলে কি রূপে তাহা আঁকিবে? মাটির উপর তোমাকে একটি বাড়ি গড়িতে হইবে কিন্তু তাহার আগে শূন্যের উপর সে বাড়ি না গড়িলে চলে কি? যদি কাজের বাড়ি গড়িবার পূর্ব্বে কল্পনার বাড়ি গড়া নিতান্তই আবশ্যক, তবে কল্পনার বাড়ি যত পরিস্কার ও ভাল করিয়া গড় কাজের বাড়িও তত ভাল হইবে সন্দেহ নাই। কল্পনার ভিত্তিতে বাড়ি যদি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ না হয় তবে মাটীর উপর গড়িতে তাহা পাঁচবার করিয়া ভাঙ্গিতে হইবে। *

অতএব দেখা যাইতেছে, যে কল্পনা কাজের বাধা জনক নহে বরঞ্চ শ্রীবৃদ্ধি সাধক। তবে কেন কল্পনার নামে অনর্থক এরূপ একটা বদনাম হইল? বোধ হয় তাহার কারণ এই যে, যাহারা নিত্যনিয়মিত ধরাবাঁধা কাজ করে, যে কাজে একটা যন্ত্রের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি থাকিবার আবশ্যক করে না, কালও যাহা করিয়াছিলাম আজও তাহা করিতেছি, আর কালও তাহাই করিতে হইবে, তাহাদের কল্পনা খোরাক

---

* অনেকে ভুল বুঝিতে আশ্চর্য্য রূপে পটু। তাঁহাদের ধন্য বলিতে হইবে। তাঁহাদের যদি বলা যায় যে, কামানের গোলা লাগিলে মানুষ মরিয়া যায়, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠেন, "বিলক্ষণ! এই সে দিন দেখিলাম সাতকড়ি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইল, কিন্তু বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি কামান ছিল না!" এত ক্রোধ যে, তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মারিতে উদ্যত। তাঁহাদের বলা গেল যে, কবি হইতে গেলে শিক্ষার আবশ্যক, তাঁহারা বলিলেন "কই, শিক্ষিত ব্যক্তিরা ত কবি হয় না!" তাঁহাদের প্রতি লেখকের এই নিবেদন যে, যখন তাঁহাদের বলা হয় যে, "আগুনের উপর না চড়াইলে পায়স প্রস্তুত হয় না" তখন তাঁহারা মনে না করিয়া বসেন যে, আগুনের উপর জল চড়াইলেও পায়স প্রস্তুত হয়। বক্তার এই বলা অভিপ্রায় যে, আগুনের উপর দুধ ও চাল চড়াইলেই তবে পায়স হয়। বক্তা জানিতেন যে, যাহাকে বলা হইতেছে সে জানে কি কি পদার্থে পায়স প্রস্তুত হয়, কেবল জানে না যে, আগুনের উপর চড়ান' পায়স প্রস্তুত করনের একটা অঙ্গ। যাহার কবিত্ব আছে শিক্ষায় সেই কবি হয়। বর্ত্তমান লেখক যাঁহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কবির কল্পনা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কেবল তাঁহারা অস্বীকার করেন যে, কবির প্রকাশক্ষমতা ও শিক্ষার আবশ্যক, এই জন্য কল্পনার বিষয়ে কিছুই বাহুল্য উল্লেখ করা হয়নি। যাহা হউক, উপরি উক্ত শ্রেণীর পাঠকদিগের জন্য কি এমন একটি বাহুল্য কথা বলিতে হইবে যে, কল্পনা থাকিলেই যে, ভাল বাড়ি গড়া হয় তাহা নহে; দুই সমশ্রেণীর কারিকরের মধ্যে যাহার কল্পনা অধিক সেই অপরের অপেক্ষা ভাল বাড়ি গড়িবে!

না পাইয়া অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। এবং যাহাদের কল্পনা অধিক, তাহারা এরূপ কাজ করিতে সম্মত হয় না। তাহারা এমন কাজ করিতে চায় যাহাতে কিছু সৃষ্টি করিবার আছে, ভাবিবার আছে। একজন কাল্পনিক পুত্রকে যখন তাঁহার পিতা কহেন "ইহার কিছু হইবে না" তখন তাঁহার কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ হতভাগ্যের পুত্র কেরাণী হইতে পারিবে না বা হিসাব রাখিবার সরকার হইতে পারিবে না। কিন্তু একটা মহান কাজ মাত্রেই কল্পনার আবশ্যক করে তাহা বলাই বাহুল্য। নিউটন বা নেপলিয়নের কল্পনা কি সাধারণ ছিল? ইংলণ্ডের লোকেরা কাজের লোক! এ কথা সত্য বটে কাজের লোক বলিতে বুঝায় যে তাহার মধ্যে অধিকাংশই চিঠি কাপি করা হিসাব রাখা প্রভৃতি ধরাবাঁধা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাহা হইতে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়? যে দেশে যন্ত্রের বাহুল্য সে দেশে যন্ত্রীর বাহুল্য। একজন বা দুই জন বা কতকগুলি লোকে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড কাজের সৃজন ও স্থাপন করে ও তাহাতেই দশ জনে মিলিয়া খাটে। অন্ধকারে যদি কেবল দেখিতে পাও যে, দুইটি হাত ভারি কাজে ব্যস্ত আছে, তৎক্ষণাৎ জানিবে কাছাকাছি একটা মস্তক আছে। যে শরীরের মাথা নাই, সে শরীরের হাতে কোন কাজ থাকে না। ইংলণ্ডে অত্যন্ত কাজের ভিড় পড়িয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণ হইতেছে ইংলণ্ডের মাথা আছে। যখন তুমি দেখ যে শরীরের অধিকাংশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না ভাবিয়া যন্ত্রের মত কাজ করে, পা চলিতেছে কিন্তু পায়ের ভিতরে মস্তিষ্ক নাই, পা ভাবিয়া চিন্তিয়া চলে না, অন্যান্য প্রায় সকল অঙ্গই সেইরূপ, তখন তুমি মনে কর না যে সে শরীরটায় মস্তিষ্ক নাই। একজন ব্যক্তির কল্পনা আছে বলিয়া দশজন অকাল্পনিক লোক কাজ পায়। ইংলণ্ডে যে এত কাজ দেখিতেছি তাহার অর্থ ইংলণ্ডে অনেক কাল্পনিক লোক আছে। এক জন দরিদ্র ইংরাজ যে তাহার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অতি দূরদেশে গিয়া ধন সঞ্চয় করিয়া সম্পত্তিশালী হইয়া উঠে তাহার কারণ তাহার কল্পনা আছে। এই কল্পনায় ইংরাজদের কোথায় না লইয়া গিয়াছে বল দেখি। কোথায় আফ্রিকার রৌদ্রতপ্ত জ্বলন্ত হৃদয়, আর কোথায় উত্তর মেরুর তুষারময় জনশূন্য মরু প্রদেশ, কোথায় তাহারা না গিয়াছে? যাহা অনুপস্থিত, যাহা অনধিগম্য, যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা কষ্টসাধ্য, অকাল্পনিক লোকেরা তাহার কাছ দিয়া ঘেঁসিবে না। যাহা উপস্থিত নাই অকাল্পনিক লোকদের কাছে তাহার অস্তিত্বই নাই। বর্ত্তমানে যাহার মূল নিতান্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ না হইতেছে, এমন কিছু তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না, এমন কি অনুভব করিতে পারে না। এই জন্য অকাল্পনিক লোকেরা একটা কিছু সৃষ্টিছাড়া আশা করে না। সুতরাং কাল্পনিক লোকেরা যেমন অনেক বিষয়ে

ঠকে,এক একটা সৃষ্টিছাড়া খেয়ালে নিজের ও পরের সর্ব্বনাশ করে, অকাল্পনিকদের তাহার কোন সম্ভাবনা নেই। এই জন্যও বোধ করি কাল্পনিকদের একটা নাম-খারাপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে সে ব্যক্তির ঐ বাহিরের কূপটার মধ্যে পড়িয়া মরিবার কোন সম্ভাবনা নাই কিন্তু সে ব্যক্তির ঐ ফুলবাগানে বেড়াইবার বা বিদেশে গিয়ে টাকা রোজগার করিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। একজন কাল্পনিক ব্যক্তির বুদ্ধি না থাকিলে সে অনেক হানিজনক কাজ করে, কিন্তু সে তাহার বুদ্ধির দোষ না কল্পনার দোষ? এক কথায় পৃথিবীতে যত বড় বড় কাজ হইয়াছে সকলি কল্পনার প্রসাদে। তবে কেন আজ, কাজ অমন মুখ ভার করিয়া কল্পনার প্রতি মহা অভিমান করিয়া বসিয়া আছে?

যে দেশে সেক্‌সপিয়র জন্মিয়াছে সেই দেশেই নিউটন জন্মিয়াছে, যে দেশে অত্যন্ত বিজ্ঞান দর্শনের চর্চ্চা, সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাব, ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, কল্পনার কাজ কেবল মাত্র কবিতা সৃজন করা নয়। যে দেশে কাল্পনিক লোক বিস্তর আছে, সে দেশের লোকেরা কবি হয়, দার্শনিক হয়, বৈজ্ঞানিক হয়; সকলি হয়, বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক নয়, বাঙ্গালী দার্শনিক নয়, বাঙ্গালী কবিও নয়।

লোকেরা যে মনে করে যে, অকেজো লোকেরা অত্যন্ত কাল্পনিক হয় তাহার একটী কারণ এই হইবে যে, যাহাদের হাতে কাজ নাই তাহারা কল্পনা না করিয়া আর কি করিবে? নানা লঘু অস্থায়ী ভাবনা খণ্ডের ছায়া মনের উপর পড়াকেই যদি কল্পনা বল, তবে তাহারা কাল্পনিক বটে। কিন্তু সেরূপ কল্পনার ফল কি বল? সেরূপ কল্পনায় লোককে কবি করিতে পারে না। মনে কর এক ব্যক্তি যতক্ষণ বসিয়া থাকে ততক্ষণ সে নখ দিয়া ধীরে ধীরে মাটিতে আঁচড় কাটিতে থাকে, ইহাতে তাহার অতি ঈষৎ পদচালনা হয়; চলিতে আরম্ভ করিলে তাহার মাটিতে আঁচড় কাটিবার অবসর থাকে না কিন্তু তাহাই বলিয়া কি বলা যাইতে পারে যে, বসিয়া থাকিলেই তাহার যথার্থ পদচালনা হয়? কাজ করিতে যে কল্পনার আবশ্যক করে তাহাই পদচালনা, বসিয়া থাকিলে যে কল্পনা আপনা হইতে আসে তাহা মাটিতে আঁচড় কাটা। যদি কিছুতে সে পদের বলবৃদ্ধি করে, তবে সে চলাতেই। একটি কবিতা লিখিতে হইলে কল্পনাকে একটি নিয়মিত পথে চালন করিতে হয়, তখন তাহার একটি ক্রম থাকে, একটি পরিমাণ থাকে, শুদ্ধ তাহাই নহে সে সময়ে কল্পনা অলস-কল্পনা অপেক্ষা অনেকটা গভীর ও বিশেষ শ্রেণীর হওয়া আবশ্যক করে। যাঁহার সর্ব্বদা কবিতা লেখা অভ্যাস আছে, সে যখন কবিতা নাও লিখিতেছে, তখনও মাঝে মাঝে হয়ত সেই ক্রমানুযায়িক, পরিমিত, বিশেষ শ্রেণীর কল্পনা মনে মনে চালনা করিতে থাকে। সেরূপ চালনাতেও মনো-

নিবেশ আবশ্যক করে, পরিশ্রম বোধ হয়। অলস ব্যক্তি, ও যে কখনো কবিতা লেখে না, সে কখনো অবসর কাল এরূপ শ্রমসাধ্য কল্পনায় অতিবাহন করে না। স্বপ্ন ও সত্য ঘটনায় যত তফাৎ অলস ও কাজের কল্পনায় তাহা অপেক্ষা অল্প তফাৎ নয়। অতএব কাজের লোকের কল্পনা অলস লোকের কল্পনা অপেক্ষা অধিক জাগ্রত। যে জাতির মধ্যে বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব, বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার হয়, দর্শনের আলোচনা চলে, সে জাতির মধ্যে কল্পনার অত্যন্ত চর্চ্চা হয় ও সব-সুদ্ধ ধরিয়া কল্পনার ভাণ্ডার অত্যন্ত বাড়িতে থাকে; সুতরাং সে দেশে অলস দেশ অপেক্ষা কবি জন্মিবার অধিক সম্ভাবনা। বাঙ্গালী কাজও করে না, বাঙ্গালী কল্পনাও করে না।

স্বাভাবিক আলস্য, স্বাভাবিক নির্জ্জীব ভাব, সকল বিষয়ে বৈরাগ্য, ইহারাই বাঙ্গালীকে মানুষ হইতে দিতেছেনা। আমরা সকল দ্রব্যই অর্দ্ধেক চক্ষু মুদিয়া দেখি। আমাদের কৌতূহল অত্যন্ত অল্প। হাতে একটা দ্রব্য পড়িলে তাহা উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে ইচ্ছাই হয় না। কোন স্থান দিয়া যখন যাই তখন দুই দিকে চাই না, মাটির দিকেই নেত্র। সত্য জানিবার জন্য কৌতূহল নাই। আমি জানি, ইংলণ্ডে সামান্য শ্রমজীবীদিগের জন্য নানা সভা আছে। সেখানে সন্ধ্যাবেলা নানা বিষয়ে বক্তৃতা হয়। সমস্ত দিনের শ্রমের পর ৬ পেন্স খরচ করিয়া কত গরিব লোক শুনিতে আসে। একজন হয়ত ইজিপ্টের প্রাচীন দেবদেবীদের বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন। একজন নিরক্ষর শ্রমজীবীর যে, সে বিষয় শুনিতে কৌতূহল হইবে ইহা আমাদের কাছে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হয়। সামান্য কৌতুকের বিষয় হইলে ছোট বড় সকল লোকে একেবারে ঝাঁকিয়া পড়ে। যুরোপে যেখানে যাহা কিছু দেখিবার আছে, সেই খানেই ইংরাজদের হোটেল নিশ্চয়ই আছে, এবং অন্যান্য বিদেশীয়দের মধ্যে ইংরাজদেরই আধিক্য। এটনার গর্ত্তের মধ্যে একজন ইংরাজই প্রথম অবতরণ করেন, এবং ইটালিয়নরা বলিয়াছিল এ ব্যক্তি হয় ইংরাজ নয় সয়তান হইবে। আমাদের সাধারণতঃ কৌতূহলের অভাব। সেই জন্য আমরা যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহার সমস্তটা আমাদের চক্ষে পড়ে না। সুতরাং সে দ্রব্যটা আমরা সম্পূর্ণ রূপে উপভোগ করিতেই পারি না। ইংরাজেরা একটা ভাল দ্রব্যের প্রতি খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত উপভোগ করে। সুইজর্লণ্ডের দৃশ্য রমণীয় বলিয়া তাহারা অবসর পাইলেই সেখানে যায়। সেখানে আবার একটা বিশেষ পর্ব্বত-শিখর হইতে সূর্য্যোদয় অতি সুন্দর দেখায়; সেই সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া হয়ত সেখানে যাত্রা করে, ঠিক্ পাঁচটার সময় সেখানে গিয়া পোছায়, সূর্য্যোদয় টুকু দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসে। তাহারা সেই উদয়োম্মুখ সূর্য্যের চতুর্দিকস্থ প্রতি মেঘ খণ্ড আলোচনা করে। আমাদের দেশে কত দিন রমণীয় সূর্য্যোদয় ও

সূর্য্যাস্ত হয়, কিন্তু কয়জন একবার চাহিয়া দেখে? এমন সকল উদাসীন, বাহ্য বিষয়ে নির্লিপ্ত লোকদের জন্য কেন এমন সুন্দর দেশ সৃষ্ট হইয়াছিল? কয়জন বাঙ্গালী কেবলমাত্র চক্ষু চরিতার্থ করিবার জন্য হিমালয়ে যায়? আমাদের পাঠকদের মধ্যে কয়জন ঘাটগিরি দেখিয়াছেন, ইলোরার গুহা দেখিয়াছেন? একটু কৌতূহল থাকিলে দেখিবার শত সহস্র অবসর ও উপায় পাইতেন। বাহ্য দৃশ্য আমরা উপভোগ করিতেই জানি না। একটি সামান্য গুল্মের পর্ণ যতই সুন্দর হউক্ না কেন, আমরা তাহা মাড়াইয়া যাই; কখনো একবার নত হইয়া দেখি? আর আমার পার্শ্বস্থ আমার ইংরাজ সহচরটি কেন তাড়াতাড়ি সেটি তুলিয়া লইয়া শুকাইয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দেয়? বাহ্য বিষয়ে ঔদাসীন্য বোধ করি আমাদের কুলক্রমাগত গুণ। সংসার অনিত্য, সংসার স্বপ্ন। একটা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, উহাতে অত মনোনিবেশ করিয়া কি দেখিতেছ? উহাত দু-দণ্ডেই শুকাইয়া পড়িবে! সকলই তুচ্ছ, কিছুই চক্ষু মেলিয়া দেখিবার নাই। যাহা কিছু দেখিবার আছে, সকলই চক্ষু মুদিয়া। জীবনের কূট সমস্যা সকল মীমাংসা কর! কিন্তু ইহা কি বুঝিবে না, ঐ অস্থায়ী ফুল যাহা শিক্ষা দেয় তাহা চিরস্থায়ী! সুন্দর দ্রব্যের প্রতি ভালবাসার চর্চ্চা, যেমন শিক্ষা তেমন শিক্ষা আর কি হইতে পারে? এই বাহ্য প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্য আমাদের কবিতাতে স্পষ্টই লক্ষিত হয়। যে ভাল কবি অর্থাৎ যাহার মনে সৌন্দর্য্য জ্ঞান বিশেষ রূপে আছে, সে কি কখনো এমন সুন্দর জগতের বাহ্য মুখশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে? আমাদের বাঙ্গলা কবিতাতে এমন কেন দেখা যায় যে, এক জন কবি একটি কাননের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আর এক জনও ঠিক সেই রূপ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, যখন আমরা একটি কানন দেখি তখন সে কাননের মুখের দিকে আমরা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি না; কাননের যে কি ভাব আছে তাহা আমরা বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন চোখে দেখি না। দেখিবার ইচ্ছাই নাই, দেখিবার ক্ষমতাই নাই। আমরা কেবল জানি যে, কানন অর্থে একটি ভূমি খণ্ড, যেখানে ফুলের গাছ আছে। আমরা জানি যে, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি ফুল দেখিতে ভাল, এবং কবিতায় সে সকল ফুলের নামোল্লেখ করিলে ভাল শুনাইবে; তাহা তুমিও জান, তাহা আমিও জানি। কিন্তু কাননের মুখে এমন সকল ভাব বিকাশ পায়, যাহা ভাগ্যক্রমে তুমিই দেখিতে পাও, আমি দেখিতে পাই না, তুমিই জানিতে পার, আমি জানিতে পারি না, সে সকল ভাব আমাদের চক্ষে পড়ে না। এই জন্যই বাঙ্গালা কাব্যে নিম্নলিখিত রূপে কানন বর্ণিত হয়—

মোহিনী মোহকর মহীরুহ রাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিশলয়ে সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি;
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।

কাঁপিল ঝর ঝর তরু শিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মরমর নাদে।
হাসিল ফুল কুল মঞ্জুল মঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ,
শোভিল সরোবরে সরোজিনী পুঞ্জ।
নাচিল চিত সুখে ময়ূর কুরঙ্গ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধু পানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা
স্তবয় অরধ, অরধ শশি শোভা।
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে;
বিরচিল হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।

ইহাতে না আছে কাননের শরীর না আছে কাননের প্রাণ। বীরবর সিংহের বর্ণনা করিতে গিয়া যদি তুমি বল যে, তাহার এক জোড়া হাত, এক জোড়া চোক ও এক জোড়া কান আছে, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত বীরবর সিংহের চিত্র আমাদের মনে যেরূপ উদিত হয়, উপরিউদ্ধৃত বর্ণনায় কাননের চিত্র আমাদের হৃদয়ে তেমনি উঠিবার কথা। বীরবর সিংহের ওরূপ হাস্যজনক বর্ণনা করিলে বলা যায় যে, বর্ণনাকারী বীরবরের চেহারা একেবারে কল্পনাই করেন নাই। বাহ্য আকার বর্ণনা ছাড়া আর এক প্রকারে বীরবরের বর্ণনা করা যাইতে পারে; বলা যাইতে পারে, বীরবরের দৃঢ়সংলগ্ন ওষ্ঠাধর তাহার স্থির প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে, তাহার জ্যোতির্ম্ময় নেত্রের দৃষ্টিপাত মর্ম্মভেদী, ও তাহার উন্নত ললাট ভাবনার ভরে যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এরূপ বর্ণনার গুণ এই যে, এক মুহূর্ত্তে বীরবরের সহিত আমাদের আলাপ হইয়া যায়। ইহাতে বুঝায়, বর্ণনাকারী বীরবরের চেহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন। Shelleyর কবিতা হইতে একটি দ্বীপের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ অসম্ভব।

"It is an isle under Ionian skies,
Beautiful as a wreck of paradise,
*   *   *   *
The light clear element which the isle wears
Is heavy with the scent of lemon flowers,
Which floats like mist laden with unseen showers;
And falls upon the eyelids like faint sleep;
And from the moss violets and jonquils peep,
And dart their arrowy odour through the brain
Till you might faint with that delicious pain.
And every motion, odour, beam, and tone,
With that deep music is in unison
Which is a soul within the soul: *
*   *   *   *
The winged storms, chanting their thunder psalm

To other lands, leave azure chasms of calm
Over this isle, or weep themselves in dew,
From which its fields and woods ever renew
Their green and golden immortality.
And from the sea their rise, and from the sky
There fall, clear exhalations, soft and bright,
Veil ofter veil, each hiding some delight:
Which sun or moon or zephyr draw aside.
Till the isle's beauty like a naked bride
Glowing at once with love and loveliness,
Blushes and trembles at its own excess.

* * * *

But the chief marvel of the wilderness
Is a lone dwelling, built by whom or how
None of the rustic island people know.

* * * *

And, day and night, aloof, from the high towers
And terraces, the earth and ocean seem
To sleep in one another's arms, and dream
Of waves, flowers, clouds, woods rocks, all that we
Read in their smiles, and call reality.'

অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিতে হইল এজন্য ইহার অত্যন্ত রসহানি করা হইয়াছে। Shelley এমন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, ঐ দ্বীপটি তিনি মনে মনে বিশেষ রূপে উপভোগ করিয়াছেন, বড় ভাল লাগিয়াছে তাই এত উচ্ছ্বাস। কেবল মাত্র কতকগুলি সত্যের উল্লেখ করিয়া যান নাই, প্রতি ছত্রে তাঁহার নিজের মনোভাব দীপ্তি পাইতেছে। যে দ্রব্য আমাদের ভাল লাগে, যে দ্রব্য আমরা প্রাণের সহিত উপভোগ করি, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে আমরা নানা বস্তুর সহিত তাহার তুলনা করিতে চাই; তাহার নানা প্রকার নামকরণ করি। আমরা আমাদের ভালবাসার লোককে, "নয়ন-অমৃত রাশি," "জীবন-জুড়ান' ধন," "হৃদি-ফুল হার" এবং এক নিশ্বাসে এমন শত প্রকার সম্বোধন করি কেন? সে যে, কত খানি আমাদের আনন্দদায়ক তাহা ঠিকটি প্রকাশ করিতে আমরা কথা হাতড়াইয়া বেড়াই, এটা একবার, ওটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি কিছুতেই মনস্তুষ্টি হয় না। আমাদের কল্পনার ভাণ্ডারে, তাহার সহিত

ওজন করিবার উপযুক্ত বাটখারা খুঁজিয়া পাই না। মনের আগ্রহে ছটাক হইতে মণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু হাতে পাইতেছি সমস্তই তুলাদণ্ডে চড়াইতেছি, কিন্তু কিছুতেই সমান ওজন হইতেছে না। মনে হয়, আমাদের ভাষার ডানা এমন লৌহময়, যে, আমার ভালবাসা যে উচ্চে অবস্থিত সে পর্য্যন্ত সে উড়িতে পারে না; বার বার করিয়া চেষ্টা করে ও বার বার করিয়া পড়িয়া যায়। একটি Nightingale-এর গানের বিষয়ে Shelley কি লিখিতেছেন পাঠ কর। কেবল মাত্র যদি বলা যায় যে, কোকিল অতি মিষ্ট গান করিতেছে, তাহার এক কবিতা, আর নিম্ন লিখিত বর্ণনার এক স্বতন্ত্র কবিতা।

A woodman whose rough heart was out of tune
Hated to hear, under the stars or moon,
One nightingale in an interfluous wood
Satiate the hungry dark with melody
And as a vale watered by a flood,
Or as the moonlight fills the open sky
Struggling with darkness—as a tube-rose
Peoples some Indian dell with scents which lie
Like clouds above the flowers from which they rose—
The singing of that happy nightingale
In this sweet forest, from the golden close
Of evening till the star of dawn may fail
Was interfused upon the silentness.
The folded roses and the violets pale
Heard her within their slumbers; the abyss
Of heaven with all its planets; the dull ear
Of the night-cradled earth; the loneliness
Of the circumfluous waters. Every sphere,
And every flower and beam and cloud and wave,
And every wind of the mute atmosphere,
And every beast stretched in its rugged cave
And every bird lulled on its mossy bough,
And every silver moth fresh from the grave
Which is its cradle * * *
* * * and every form
That worshipped in the temple of night.

Was awed into delight, and by the charm
Girt as with an interminable zone,
Whilst that sweet bird, whose music was a storm
Of sound, shook forth the dull oblivion
Out of their dreams. Harmony became love
In every soul but one."

মনে হয় না কি যে, গান শুনিতে শুনিতে কবির চক্ষু মুদিয়া আসিয়াছে, মনুষ্য হৃদয়ে যতদূর সম্ভব তত দূর পর্য্যন্ত উপভোগ করিতেছেন? এই মুহূর্ত্তে আমার হস্তে অবকাশরঞ্জিনী দ্বিতীয় ভাগ রহিয়াছে। সমস্ত বহি খুঁজিয়া দুই একটি মাত্র স্বভাব বর্ণনা দেখিলাম। তাহাও এমন নির্জ্জীব ও নীরস, যে, পড়িয়া স্পষ্ট মনে হয়, কবি যাহা বর্ণনা করিতেছেন, প্রাণের সহিত তাহা উপভোগ করেন নাই। লিখা আবশ্যক বিবেচনায় লিখিয়াছেন। একটি সন্ধ্যার বর্ণনা। মন্দগমনা, বিষণ্ন সায়াহ্নের মুখ যাহার বিশেষ ভাল লাগে, সে কখনো এরূপ নির্জ্জীব বর্ণনা করিতে পারে না। সূর্য্যের সহিত আলোকের অপসরণ, এই প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্রকে সে সন্ধ্যা বলিয়া জানে না। তাহার হৃদয়ে সন্ধ্যার একটি স্বতন্ত্র জীবন্ত অস্তিত্ব আছে। সন্ধ্যা তাহার মনের ভিতরে বসিয়া কথা কহে।

"আইল গোধূলি সৌর রঙ্গ ভূমে,—
নামিল পশ্চিমে ধীরে যবনিকা
ধূসর বরণা; ফুরাইল ক্রমে
দিনেশ দৈনিক গতি অভিনয়।
অষ্টমীর চন্দ্র—রজতের চাপ!
নভোমধ্য স্থলে বিষণ্ন বদনে
ভাসিল; লভিতে যেন প্রিয় রবি
আলিঙ্গন, ভ্রমি' অলক্ষেতে শশি
অর্দ্ধ সৌর রাজ্য বিরহেতে কৃশ,
নিরাশা মলিন।"

যখন তুমি বল, আমি অমুক স্থানে একটি মানুষকে দেখিলাম, তখন জানিলাম, তুমি খুব অল্পই দেখিয়াছ; যখন বল যে, হরিহরকে দেখিয়াছ, তখন জানিলাম, যে, হাঁ, একটু ভাল করিয়া দেখিয়াছ; আর যখন বল যে, হরিহরকে দেখিলাম তাহার চোখে ও অধরে ক্রোধ, ও সমস্ত মুখে একটি গুপ্ত সংকল্প প্রকাশ পাইতেছে, তখন বুঝিলাম যে, একটি মানুষকে যতদূর দেখিবার তাহা দেখিয়াছ। আমরা কবিতায় যেরূপ স্বভাব বর্ণনা করি, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, আমরা সেই মানুষটিকে মাত্র দেখিয়াছি, হরিহরকে দেখি নাই। যদি বা হরিহরকে দেখিয়া থাকি, অর্থাৎ সেই মানুষটির নাক কান চোক মুখ বিশেষ রূপে দেখিয়া থাকি, তথাপি তাহার নাক কান চোক মুখের মধ্যে আর কিছু দেখিতে পাই নাই। যখন আমরা একটি মানুষের ঠোঁটে, চোখে ও সমস্ত মুখে একটা কিছু বিশেষ ভাব দেখিতে পাই তখন আমরা কেবল মাত্র

সেই মানুষকে জীবন্ত বলিয়া দেখি না; তখন তাহার ঠোঁট ও চোখকে আমরা জীবন্ত করিয়া দেখি। তখন আমরা তাহার ঠোঁটের ও চোকের একটি হৃদয়, একটি প্রাণ দেখিতে পাই। এই হৃদয়, এই প্রাণ দেখিতে পাওয়া দেখিতে পাওয়ার চূড়ান্ত ফল। বাঙ্গলা কবিতার স্বভাব বর্ণনায় প্রকৃতির এই হৃদয়, এই প্রাণ দেখিতে পাই না।

"সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কহ্লার সহ
শরতে সুন্দর হোয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে।"

ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে একরূপ চক্ষুর আবশ্যক, আর—

"Then the pied wind flowers and the tulip tall,
And narcissi, the fairest among them all,
Who gaze on their eyes in the stream's recess
Till they die of their own dear loveliness"
And the rose, like a nymph to the bath addressed,
Which unveiled the depth of her glowing breast,
Till, fold after fold, to the fainting air
The soul of her beauty and love lay bare"

ইহা দেখিতে স্বতন্ত্র চক্ষুর আবশ্যক করে।

একটি narcissus ফুল, যে স্রোতের পার্শ্বে ফুটিয়া দিন রাত্রি জলের মধ্যে নিজের মুখখানি, নিজের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া মরিয়া যায়, তাহার সে একটি মিস্ট ভাব, অথবা একটি বিকাশোন্মুখ গোলাপের পাপড়ি গুলি যখন একটী একটি করিয়া খুলিতে থাকে অবশেষে তাহার অতুল রূপ একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়ে তখন তাহার সেই লাজুক সৌন্দর্য্য কয়জন লোক দেখিতে পায়? কিন্তু—

"মরাল আনন্দ মনে ছুটিল কমল বনে,
চঞ্চল মৃণাল দল ধীরে ধীরে দুলিল;
বক হংস জলচর ধৌত করি কলেবর
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল।"

এঘটনা গুলি দেখিতে কত টুকুই বা কল্পনার আবশ্যক করে? ইহা হয়ত সকলেই স্বীকার করিবেন, যাহাকে আমরা বিশেষ ভাল বাসি, যাহাকে আমরা বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করি, যাহাকে আমরা মুহূর্ত্তকাল আমাদের চক্ষের আড়াল হইতে দিই না, তাহার নাক চোক আমরা দেখিতে পাই না, অর্থাৎ দেখি না। তাহাকে যখন দেখি তখন তাহার মুখের ভাবটি মাত্র দেখি, আর কিছুই নয়। এই জন্যই সে মুখকে আমরা পদ্ম বলি বা চন্দ্র বলি। যখন আমরা মুখপদ্ম কথা ব্যবহার করি তখন তাহার অর্থ এমন নহে, যে, মুখ বিশেষে পদ্মের মত পাপড়ি আছে, তখন তাহার অর্থ এই যে, পদ্মেরও যে ভাব সে মুখেরও সেই ভাব। আমার প্রেয়সীর

মুখের গঠন বাস্তবিক ভাল কি মন্দ, তাহার নাক ঈষৎ চেপ্টা হওয়াতে ও তাহার ভুরু ঈষৎ বাঁকা হওয়াতে তাহাকে কত খানি খারাপ দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টা নিরীক্ষণ করিয়াও তাহা আমি বলিতে পারি না, অথচ একজন অচেনা ব্যক্তি মুহূর্ত্ত কাল দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারে আমার প্রেয়সীর গঠন বাস্তবিক কতখানি ভাল দেখিতে। তাহার কারণ,আমি তাহার মুখের ভাবটি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই না। যে কবি প্রকৃতিকে যত অধিক ভাল বাসেন সেই কবি প্রকৃতির নাক মুখ চোক তত অল্প দেখিতে পান। যে কবি গোলাপকে বিশেষরূপে দেখিয়াছেন ও বিশেষরূপে ভাল বাসেন, তিনি সেই গোলাপটীকে একটি আকার বিশিষ্ট ভাব মনে করেন, তাহাকে পাপড়ি ও বৃন্তের সমষ্টি মনে করেন না। এই জন্যই একটি লাজুক বালিকার সহিত একটি গোলাপের আকারগত সম্পূর্ণ বিভেদ থাকিলেও তিনি উভয়ের মধ্যে তুলনা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। এই জন্য শেলী একটি nightingaleএর কণ্ঠস্বরের সহিত স্রোতের বন্যা, জ্যোৎস্না ধারা, ও রজনীগন্ধার পরিমলের তুলনা করিয়াছেন। কোথায় পাখীর গান, আর কোথায় বন্যা, জ্যোৎস্না ও ফুলের গন্ধ? জড়ই হউক আর জীবন্তই হউক, একটি আকারের মধ্যে একটি ভাব দেখিতে যে অতি সূক্ষ্ম কল্পনার আবশ্যক, তাহা বোধ করি আমাদের নাই। যদি থাকিত, তবে কেন আমাদের বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না? বোধ করি অত সূক্ষ্ম ভাব আমরা ভাল করিয়া আয়ত্তই করিতে পারি না, আমাদের ভালই লাগে না। আমাদের খুব খানিকটা রক্তমাংস চাই, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাহা দুই হাতে লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করিতে পারি। আমাদের গণ্ডার-চর্ম্ম মন অতি মৃদু সূক্ষ্ম স্পর্শে সুখ অনুভব করিতে পারে না। এই জন্য আমরা বাইরনের ভক্ত। শেলীর জ্যোৎস্নার মত অতি অশরীরী কল্পনা খুব কম বাঙ্গালীর ভাল লাগে।

"দেখিয়াছি ভাগীরথী ভাদ্র মাসে ভরা,
পূর্ণ জোয়ারের জল মন্থর যখন;
দেখিয়াছি সুখস্বপ্নে নন্দনে অপ্সরা
কিন্তু হেন চারু চিত্র দেখিনি কখন।
বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে
ঢলিয়া পোড়েছে বামা কুসুমেষু শরে
কুসুম শয়নে; কিন্তু কুসুমে কি পারে
নিবাইতে যে অনল জ্বলিছে অন্তরে?
সুগোল সুবর্ণ নিভ চারু ভুজোপরে
শোভে পূর্ণ বিকশিত বদন কমল,
(রূপের কমল মরি কাম সরোবরে),
ভানুর বিরহে কিন্তু নিমীলিত দল!
শোভিতেছে অন্য করে বাক্য মনোহর,
স্খলিত অলকা রাশি, পয়োধর থর
বিশ্রামিছে অযতনে কাব্যের উপর,
পুণ্যবান কবি—কাব্য পুণ্যের আকর।
বিনোদ বদন চন্দ্র, বিনোদ নয়ন
পল্লবে আচ্ছন্ন, পাঠে স্থির সন্নিবেশ,

অতুল, বিনোদতম, ত্রিদিব মোহন,
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিলাস আবেশ।
বিলাস বঙ্কিম রেখা, কুহকী যৌবন
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে সর্ব্ব অঙ্গে মরি
পূর্ণতার পূর্ণাবেশ—সুনীল বসন
বিকাশিছে তলে তলে কনক লহরী।”

এমনতর একটা স্থূল নশ্বর মাংসপিণ্ড নহিলে বাঙ্গালী হৃদয়ের অসাড়, অপূর্ণ স্নায়ু বিশিষ্ট, কর্কশ ত্বকে তাহার স্পর্শই অনুভব হয় না। আর নিম্নলিখিত কবিতাটি পড়িয়া দেখ—

“Wherefore those dim looks of thine
Shadowy, dreaming Adeline.
Whence that aery bloom of thine
Like a lily which the sun
Looks thro' in his sad decline
And a rose-bush leans upon,
Thou that faintly smilest still.
As a Naiad in a well,
Looking at the set of day.

* * * * *

Wherefore those faint smile of thine
Spiritual Adeline ?
Who talketh with thee, Adeline ?
For sure thou art not all alone.
Do beating hearts of salient springs
Keep measure with thine own ?
Hast thou heard the butterflies
What they say betwixt their wings ?
Or in stillest evenings
With what voice the violet woos
To his heart the silver dews ?
Or when little airs arise
How the merry bluebell rings
To the moss underneath ?
Hast thou look'd upon the breath
Of the lilies at sunrise ?”

এমন জ্যোৎস্নাশরীরী প্রতিমাকে কি বাঙ্গালীরা প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে পারেন ? না ! কেন না, শুনিয়াছি নাকি যে, বাঙ্গালী কবিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় “কেন ভালবাস” তখন তিনি উত্তর দেন

“দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জ্জিত কুন্তল
সুকুন্তল কিরীটিনী, প্রেমের প্রতিমা খানি,
আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ রাশি
দেখিয়াছ কহ তবে, কেন ভাল বাসি ?”

“আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি” দেখিলে, “কেশের আঁধারে সেই রূপ কহিনুর” দেখিলে তবে যাঁহাদের প্রেমের উদ্রেক হয়, তাঁহারা অমন একটি ভাবটিকে কিরূপে ভাল বাসিবেন ? আর এদিকে চাহিয়া দেখ—

এক দিন দেব তরুণ তপন,
হেরিলেন সুর নদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনী দলে।
বিকসিত নীল কমল আনন,
বিলোচন নীল কমল হাসে,
আলো করে নীল কমল বরণ,
পূরেছে ভুবন কমল বাসে।
তুলি তুলি নীল কমল কলিকা,
ফুঁ দিয়া ফুটায় অফুট দলে ;

হাসি হাসি নীল নলিনী বালিকা,
মালিকা গাঁথিয়া পোরেছে গলে।
লহরী লীলায় নলিনী দোলায়
দোলেরে তাহায় সে নীলমণি;
চারিদিকে অলি উড়িয়ে বেড়ায়,
করি গুন্ গুন্ মধুর ধ্বনি।
চারিদিক দিয়ে দেবীরা আসিয়ে
কোলেতে লইতে বাড়ান কোল;
যেন অপরূপ নলিনী হেরিয়ে,
কাড়াকাড়ি করি করেন গোল।
তুমিই সে নীল নলিনী সুন্দরী,
সুরবালা সুর-ফুলের মালা;
জননীর হৃদি কমল উপরি,
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা।
হরিণীর শিশু হরষিত মনে,
জননীর পানে যেমন চায়;
তুমিও তেমনি বিকচ নয়নে,
চাহিয়ে দেখিতে আপন মায়।
শ্যামল বরণ, বিমল আকাশ;
হৃদয় তোমার অমরাবতী;
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।
কথা কহে দূরে দাঁড়ায়ে যখন,
সুরপুরে যেন বাঁশরী বাজে;
আলুথালু চুলে করে বিচরণ
মরিগো তখন কেমন সাজে!
মুখে বেশী হাসি আসে যে সময়
করতলে তুলি আনন ঢাকে;
হাসির প্রবাহ মনে মনে বয়,
কেমন সরেস দাঁড়ায়ে থাকে!"

ইহাতে নিবিড় কেশভার, ঘন কৃষ্ণ আঁখি তারা, সুগোল মৃণাল ভুজ নাই তাই বোধ করি ইহার কবি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে অপরিচিত, তাঁহার কাব্য অপঠিত। আন্ বিষ, মার ছুরী, ঢাল মদ,—এমনতর একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড না হইলে বাঙ্গালীদের হৃদয়ে তাহার একটা ফলই হয় না। এক প্রকার প্রশান্ত বিষাদ, প্রশান্ত ভাবনা আছে, যাহার অত ফেনা নাই, অত কোলাহল নাই অথচ উহা অপেক্ষা ঢের গভীর তাহা বাঙ্গালা কবিতায় প্রকাশ হয় না। উন্মত্ত আস্ফালন, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, "আর বাঁচিনা, আর সহে না, আর পারি না" ভাবের চট্‌ফটানি, ইহাইত বাঙ্গালা কবিতার প্রাণ। এমন সফরী অপেক্ষা রোহিত মৎস্যের মূল্য অধিক। বাঙ্গালীর কল্পনা চোখে দেখিতে পায় না, বাঙ্গালীর কল্পনা বিষম স্থূল। তথাপি বাঙ্গালী কবি বলিয়া বড় গর্ব্ব করে।

আর একটি কথা বলিয়া শেষ করি। যেখানে নানাপ্রকার কাজ কর্ম্ম হইতে থাকে, সেই খানেই মানুষের সকল প্রকার মনোবৃত্তি বিশেষরূপে বিকশিত হইতে থাকে। সেইখানে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, আশা, উদ্যম, আবেগ, আগ্রহ প্রভৃতি মানুষের মনোবৃত্তি গুলি ফুটিতে থাকে। সেখানে মানুষের অত্যাকাঙ্খা উত্তেজিত হয়, (বাঙ্গালা ভাষায় ambition-এর একটা ভাল ও চলিত কথাই নাই) ও অবস্থার চক্রে পড়িয়া তাহার সমস্ত আশা নির্মূল হয়। সেখানে বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন স্রোত একত্র হইয়া মিশে, তুমুল সঙ্ঘর্ষ

উপস্থিত হয়, আশা নিরাশা, আগ্রহ, উদ্যম, স্রোতের উপরিভাগে ফেনাইয়া উঠে। এই অনবরত সমুদ্র মন্থনে মহা মহা ব্যক্তিদের উৎপত্তি হয়। আর আমাদের এই স্তব্ধ অন্ধকার ডোবার মধ্যে স্রোত নাই, তরঙ্গ নাই, জল পচিয়া পচিয়া উঠিতেছে, উপরে পানা পড়িয়াছে, গুপ্ত নিন্দা ও কানাকানির একটা বাষ্প উঠিতেছে। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ভালবাসার একটা স্বাধীন আদান প্রদান নাই, ঢাকাঢাকি, লুকা-চুরি, কানাকানির মধ্যে ঢাকা পড়িয়া সূর্য্যের কিরণ ও বায়ুর অভাবে ভালবাসা নির্ম্মল থাকিতে পারে না, দূষিত হইয়া উঠে। আমাদের ভালবাসা কখন সদর দরজা দিয়া ঘরে ঢোকে না; খিড়কির সঙ্কীর্ণ ও নত দরজা দিয়া আনাগোনা করিয়া করিয়া তাহার পিঠ কুঁজা হইয়া গিয়াছে, সে আর সোজা হইয়া চলিতে পারে না, কাহারো মুখের পানে স্পষ্ট অসঙ্কোচে চাহিতে পারে না, নিজের পায়ের শব্দ শুনিলে চমকিয়া উঠে। এমনতর সঙ্কুচিত কুব্জ ভালবাসার হৃদয় কখনো তেমন প্রশস্ত হইতে পারে না। মনে কর, "পিরীতি" কথার অর্থ বস্তুতঃ ভাল, কিন্তু বাঙ্গালীদের হাতে পড়িয়া দুই দিনে এমন মাটি হইয়া গিয়াছে যে, আজ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ও কথা মুখে আনিতে লজ্জা বোধ করেন। বাঙ্গলা প্রচলিত প্রণয়ের গানের মধ্যে এমন গান খুব অল্পই পাইবে, যাহাতে কলঙ্ক নাই, লোক-লাজ নাই ও নব যৌবন নাই, যাহাতে প্রেম আছে. কেবল মাত্র প্রেম আছে, প্রেম ব্যতীত আর কিছুই নাই। আমাদের এ পোড়া দেশে কাজ কর্ম্ম নাই, অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম নাই, আলস্য তাহার স্থূল শরীর লইয়া স্থূলতর উপধানে হেলিয়া হাই তুলিতেছে, ইন্দ্রিয়পরতা ও বিলাস, ফুল মোজা, কালাপেড়ে ধুতি, ফিন্‌ফিনে জামা পরিয়া, বুকে চাদর বাঁধিয়া, পান খাইয়া ঠোঁট ও রাত্রিজাগরণে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গুড়্‌গুড়ি টানিতেছে, এইত চারিদিকের অবস্থা! এমন দেশের কবিতায় চরিত্র-বৈচিত্র্যই বা কোথায় থাকিবে, মহান্ চরিত্র-চিত্রই বা কোথায় থাকিবে, আর বিবিধ মনোবৃত্তির খেলাই বা কিরূপে বর্ণিত হইবে? সম্প্রতি বাহির হইতে একটা নূতন স্রোত আসিয়া এই স্থির জলের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। ইহা হইতে শুভ ফল প্রত্যাশা করিতেছি, ইতস্ততঃ তাহার চিহ্নও দেখা দিতেছে।

মনোবিকার।

প্রথম প্রস্তাব।

মানুষের শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ লইয়া দুই সম্প্রদায় বহুকাল হইতে দুই প্রকার মত বাহির করিয়াছেন। এক সম্প্রদায় বলেন যে মন দেহাভ্যন্তরস্থ পদার্থ বিশেষের কার্য্যফল। শরীরের সহিত ইহার জন্ম, শরীরের সহিত ইহার স্থিতি, শরীরের সহিত ইহার বৃদ্ধি, এবং শরীরের সহিত ইহার লয়; সংক্ষেপতঃ, শরীর হইতে ইহা অবিচ্ছিন্ন। পদার্থবাদীরা (Materialists) এই সম্প্রদায় ভুক্ত। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদীরা (Spiritualists) বলেন যে মন একটি আধ্যাত্মিক সার, শরীরের মধ্যে কতক সময়ের জন্য ইহার স্থিতি এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যখন শরীর ক্ষয় হইয়া ভূমিসাৎ হয় তখন ইহা স্বতন্ত্র হইয়া অবস্থিতি করে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের মত যে যথার্থ সে বিষয় লইয়া তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্যবহির্ভূত, শুদ্ধ এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, মন কারণই হোক্ বা কারণোপায়ই হোক্, এই পৃথিবীতে মনের সমস্ত কার্য্য শরীরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, এক কথায় শরীরের উপর মনের সম্পূর্ণ নির্ভর।

অনেকে মনের কার্য্য মস্তিষ্কে হয় ইহা স্বীকার করিয়াও হিতাহিত জ্ঞানকে এক স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। Dr. Abercrombie মনের কার্য্য মস্তিষ্কে ইহা নিশ্চিত জানিয়াও এই মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বোধ হয় উক্ত দার্শনিক এবং তাঁহার মতানুপোষক ব্যতীত একথা আর কেহই বলিবেন না। Dr Maudsley এ সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা আমাদের অনেকটা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন "When mind undergoes decadence, the moral feeling is the fiirst to suffer." তিনি আরও বলেন, " * * * disease will sometimes do as plain and positive damage to moral character as any which direct injury of the brain will do." ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে যদি কোন লোক কিছু কালের জন্যও কোন প্রকার রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে, তখন তাহার মনে কিছুমাত্র সুখ থাকে না, তাহার প্রকৃতি তখন অনেকটা বদলাইয়া যায়, সে খিট্‌খিটে হইয়া পড়ে। তাহার কারণ কি? তাহার শরীরের অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের অবসন্নতা উপস্থিত হয়, এবং মস্তিষ্কের অবসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে মন এবং হিতাহিত জ্ঞানের বিকৃত অবস্থা সম্পাদিত হয়। রোগ আবার অধিক দিন স্থায়ী হইলে মনুষ্যের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

যখন সামান্য শারীরিক রোগ হইলে মনের এত অসুস্থতা হয় তখন মস্তিষ্কের নিজের রোগ হইলে যে মনের ঘোরতর বিকার জন্মে তাহা সহজেই বুঝা যায়। সেই রোগের কথা লিখাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এমন আবশ্যকী পদার্থ মস্তিষ্ক যদি একবার বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় ত কি কষ্টের বিষয়! অনেকেই একথা স্বীকার করেন যে শারীরিক অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শীঘ্রই রোগগ্রস্ত হইতে পারে, কেন না ইহার পরিচালক মস্তিষ্ক আমাদের শারীরিক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মর্ম্মস্থল, এবং সেই মস্তিষ্ক লইয়াই আমাদের নাড়াচাড়া। মস্তিষ্ক রোগগ্রস্ত হইলে কাজেকাজেই মানুষের হিতাহিত জ্ঞান এবং বুদ্ধি-শক্তির বিচ্যুতি হয়; তাহা হইলেই মনোবিকার উপস্থিত হয়। Dr Beard বলেন যে মনের বিকৃত অবস্থা হইলে মানুষের মনের ভাব যেরূপ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করা যায় এমন আর সহজ অবস্থায় পারা যায় না।* বিকার প্রাপ্ত হইলে মানুষের মনের ভাব সকল উত্তেজিত হয় এবং মনের বৃত্তিসকল প্রবল হইয়া উঠে। তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি সেই সকল উত্তেজিত মনের ভাব দমন করিতে পারে না, তখন তাহার স্বভাবজ দোষ সকল গোপন করিয়া রাখিবার ক্ষমতা থাকে না; কিম্বা তাহার মনোবৃত্তি সকলকে বাহ্য চাক্‌চিক্য প্রদান পূর্ব্বক অন্যকে মোহিত করিবার চেষ্টা করে না। তখন সে ব্যক্তির নিজের মনের উপর তিলমাত্র প্রভুত্ব থাকে না। একই কল্পনা, একই ভ্রম, একই বিপদ, একই আপদ, অন্য লোকের সহিত সকল বিষয়ে এক হইয়া, একই পৃথিবীতে থাকিয়া কেবল মাত্র মনের বৈলক্ষণ্য হইলে যে মানুষে মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বে বলা হইল যে মস্তিষ্কের রোগ হইলে হিতাহিত জ্ঞানের বিচ্যুতি এবং মনের বিকৃতি হয়। দেখা গিয়া থাকে যে অনেক মহৎ লোকেরা জ্ঞানের অতিশয় চালনা দ্বারা জ্ঞান হারাইয়া বসেন। ইহাও দেখা যায় যে অনেকে জন্মাবধি জ্ঞানহারা হইয়া পৃথিবীর কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া ইহলোক হইতে অপসারিত হয়। এরূপ বুদ্ধিহীন লোকদের আমরা নির্ব্বোধ বলিয়া থাকি। নির্ব্বোধ লোক আবার নানা প্রকারের আছে। কাহারও হয়ত মস্তিষ্কের বিন্দুমাত্রও উন্নতি নাই, না আছে বুদ্ধি, না আছে স্মরণশক্তি, না আছে ইচ্ছা, না আছে কিছু। আবার কাহারও হয়ত খালি স্মরণশক্তিটুকুই আছে, হয়ত যুক্তির কথা তাহাদের মনে থাকে না, কেবল প্রত্যহ বাহিরে যাহা দেখিতেছে তাহারই প্রতিবিম্ব তাহাদের মনে জাগরূক থাকে মাত্র। কৌলিক প্রভাবে এবং মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণতা হেতু তাহারা

* "One of the Paradoxes of Psychology that we can best study the mysteries of the mind when that function is eclipsed by disease."

এইরূপ রোগগ্রস্ত হয়। কৌলিক প্রভাব যে কতদূর সত্য তাহা দেখা যাক্‌। মনে কর আমি একটি সাঁওতাল এবং একটি বাঙ্গালীকে বাল্যকাল হইতে একত্রে রাখিয়া একরূপ শিক্ষা এবং একরূপ উপদেশ দিয়া আসিলাম। এখন কেহ কি মনে ভাবিতে পারেন যে তাহাদের মনের পরিণাম একরূপ হইবে? তাহাদের দুই জনের প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র হইবে তাহাতে কোন ভুল নাই। তাহাদের কল্পনা তাহাদের মনোবৃত্তি তাহাদের ইচ্ছা তাহাদের সমস্তই ভিন্ন প্রকার। তাহাদের আকারের বৈলক্ষণ্য যেরূপ সত্য, তাহাদের প্রকৃতিরও বৈলক্ষণ্য যে লক্ষিত হইবেই তাহা সেইরূপ সত্য। কোন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে গোলাপ এবং ধুতুরার বীজ বপন করিলে, সেই উৎকৃষ্ট ভূমির গুণে ধুতুরার বীজে কিছু গোলাপ গাছ হইতে পারে না। সেইরূপ শিক্ষা এবং উপদেশ কিছু তাহাদের মনোবৃত্তিকে এক করিতে পারে না। তবে এ হইতে পারে যে সেই শিক্ষিত সাঁওতাল তাহার স্বজাতির মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ লোক, কিন্তু সেই শিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। সন্তান যেরূপ পিতা মাতার সাদৃশ্য অনেকটা প্রাপ্ত হয় সেই রূপ তাঁহাদের প্রকৃতির দ্বারা সে যে কতক অংশে গঠিত হইবে তাহা ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। Dr. Maudsley প্রণীত একখানি গ্রন্থের কোন স্থলে * বংশ-পরম্পরায় প্রকৃতির যে কতটুকু সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে তাহার একটি উদাহরণ আছে। একটি যুবা পুরুষের প্রপিতামহ অতিশয় পানদোষাক্রান্ত, দুর্নীতিপর, এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন; সেই যুবাপুরুষের পিতামহ তাঁহার পিতার ন্যায় পানদোষাক্রান্ত এবং বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন, এমন কি তাঁহাকে শেষে পক্ষাঘাতে মরিতে হয়। যুবা পুরুষের পিতা যদিও তাঁহার পিতার ন্যায় পানদোষে আক্রান্ত ছিলেন না বটে, তথাপি তিনি স্নায়ুবায়ু রোগে আক্রান্ত ছিলেন, তত্তাঁ কল্পনা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত। সেই যুবাপুরুষটি নিজে অত্যন্ত মূর্খ ছিল, ষোড়শ বৎসর বয়সে সে বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, এবং জীবনের অধিকাংশ সময় তাহাকে গারদে থাকিয়া কাটাইতে হয়। তাই বলিয়া যে রোগগ্রস্ত সকল পরিবারের মধ্যে এরূপ ঘটিয়া থাকে তাহা নহে। উক্ত চিকিৎসক বলেন যে তিনি এক পরিবারের অন্য সমস্ত ভ্রাতাকে মানসিক রোগে ভুগিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠটির মস্তিষ্কের এবং স্নায়ুসমূহের নির্ম্মাণ স্বতন্ত্র প্রকার হওয়ায় তিনি রোগ হইতে নিষ্কৃতি পান। কৌলিক প্রভাবে যে লোকে জ্ঞানহীন ও নির্ব্বোধ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণতা হেতু যে লোকে নির্ব্বোধ হয় তাহাও একটি সত্য কথা। ইংলণ্ডীয় প্রধান প্রধান শরীরবেত্তাদিগের এই ধ্রুববিশ্বাস যে মস্তিষ্কের ওজন

* Mind and Brain. Page 45.

পাঁচ পোয়ার (30ozs) কম হইলে লোকে নির্ব্বোধ হয়। আমরা সচরাচর ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বিশিষ্ট লোকদের নির্ব্বোধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। যাহাদের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র তাহাদের মস্তিষ্কের পূর্ণতা হয় নাই। কিন্তু মস্তিষ্কের লঘুত্ব কিম্বা তাহার ক্ষুদ্রতা যে নির্ব্বুদ্ধিতার কারণ তাহা নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মস্তিষ্ক প্রধান প্রধান স্নায়ুসমূহের উৎপত্তিস্থল। সেই সকল স্নায়ুর অভাবই নির্ব্বুদ্ধিতার কারণ মাত্র। ফরাসী দেশীয় শরীরবেত্তারা বলেন যে মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতা কিম্বা ইহার লঘুত্ব বুদ্ধিহীনতার কারণ নহে। মস্তিষ্কের রোগ হইতেই লোকে ঐ রূপ হইয়া পড়ে। ক্রমাগত ত্রিশ বৎসর তাঁহারা ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সমস্ত মূর্খ লোকের মধ্যে দশ আনার মস্তক অন্যান্য বিদ্বান লোকের মস্তক অপেক্ষা আকারে বৃহৎ এবং ওজনে ভারি। সুতরাং হইতে পারে যে মস্তিষ্কে এমন কোন রোগ উপস্থিত হয় যাহাতে ইহা ভারাক্রান্ত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করে। ইংলণ্ডের অনেক শরীরবেত্তারা যে ইহা অস্বীকার করেন তাহা নহে।

দুষ্টমতি এবং পাপপ্রকৃতিস্থ লোকদিগের মস্তিষ্কের অবস্থা অতি হীন এবং মন্দ। কৌলিক প্রভাব এবং মস্তিষ্কের পূর্ণতার অভাব যেরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার কারণ, সেইরূপ যদি লোকের কুপ্রবৃত্তি এবং পাপপ্রকৃতির উৎপত্তি বিষয়ে অন্বেষণ করা যায় ত একই কারণ লক্ষিত হয়। প্রায় সমস্ত দার্শনিকদিগের এই মত যে লোকে তাহাদের প্রকৃতি এবং শিক্ষা অনুসারে পাপ কর্ম্ম করিয়া থাকে। Plato বলেন যে যাহারা পাপ করিয়া দোষী হয় আমাদের উচিত তাহাদের প্রতি দোষারোপ না করা, তাহার জন্য তাহাদের পিতামাতা এবং শিক্ষকেরা দায়ী। গ্রীকদেশের পূর্ব্বতন চিকিৎসক হিপোক্রাটিস্ বলেন যে মনের বৈলক্ষণ্য না হইলে লোকে দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না। দুষ্কর্ম্ম কতক না কতক অংশে পাগলামির ফল। যাহাদের প্রকৃতি একবার কুদিকে চালিত হইয়াছে তাহাদের হাজার উপদেশ দেওয়া যাক্ না কেন, হাজার শাস্তি দেওয়া যাক্ না কেন, সে সমস্ত উপদেশ তাহাদের মনে স্থান পায় না, সে সকল শাস্তি তাহাদের অগ্রাহ্য। অন্যের ক্ষতি হইবে বা নিজের অতিরিক্ত আমোদ হইবে এ সকল তর্ক করিয়া যে সকল চোর চুরি করে তাহা নহে, চুরি করা তাহাদের কেমন স্বভাবসিদ্ধ। ভাল তাহাদের কাছে কেমন মন্দ বলিয়া অনুভূত হয়, এবং মন্দ তাহাদের নিকট ভাল। যে ব্যক্তি হত্যা করে সে কি জানে না যে সে যে কাজ করিতেছে সে কাজের শাস্তি আছে? তবে জানিয়া শুনিয়া এরূপ দণ্ডার্হ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় কেন? অবস্থাতে পড়িয়া তাহার মনের কেমন বিকার উপস্থিত হয়, তখন সে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে। ক্ষণ কালের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য যে ভবিষ্যতে শাস্তি পাইতে হইবে অপরাধীরা জ্ঞানহারা হইয়া তাহা মনে ধারণা করিতে পারে না।

তাহাদের মনের দৃঢ়তা নাই, বুদ্ধির প্রাখর্য্য নাই, তাহাদের স্বাভাবের উন্নত ভাব নাই। Mr. Chesterton বহুকাল ইংলণ্ডের কোন কারাগারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে, অপরাধীবা তাহাদের অপরাধের জন্য অনুতাপ করে না। ১০০ জনের মধ্যে যদি ১০জন অপরাধীও অনুতাপ করে ত যথেষ্ট হইল এবং দণ্ড পাইয়াও যে ভবিষ্যতে তাহাদের দুষ্কর্ম্ম করিতে সঙ্কোচ হইবে এমন ত তাঁহার বোধ হয় না। তিনি আরও বলেন যে একটি বন্দী তাঁহাকে বলিয়াছিল যে চুরি করার উপর তাহার বড় ভালবাসা পড়ে, যদি যে সহস্র মুদ্রারও অধিকারী হইত তথাপি চুরি করিতে কখন ক্ষান্ত থাকিত না। ইহারা দুষ্কর্ম্মকে প্রশ্রয় দেয় বলিয়াই পাগল হয় না, ইহাদের মস্তিষ্ক এমন কলুষিত হইয়াছে যে যদি দুষ্কর্ম্ম না করিত ত তাহারা প্রকৃত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত। "Report of the Lunatic Asylum of Bengal" পাঠ করিলে দেখা যায় যে স্ত্রী এবং পুরুষ সংখ্যা একত্রিত করা হইলে গড়ে শতকরা ১৬ জন এইরূপ পাপকর্ম্ম করিতে না পারিয়া এবং কোন প্রকার গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়া একেবারে প্রকৃত প্রস্তাবে উন্মাদ হইয়া পড়িয়াছে। Mr. Chestertonএর ন্যায় এই সকল অপরাধী উন্মাদ সম্বন্ধে এখানকার পাগলাগারদের তত্ত্বাবধায়কদিগের এই মত যে "there is great risk in setting such men at liberty until several years of good and rational conduct has elapsed, and it is doubtful if even then there is freedom from risk of relapse"

উন্মাদাবস্থা মনোবিকারের চরম সীমা। অল্পপরিমাণেও যদি লোকের মানসিক পীড়া হয় তবে তাহার উন্মাদ রোগ জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে; নির্ব্বোধ লোকেরা সেরূপ অবস্থায় পতিত হইলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। দুষ্কর্ম্ম করিয়া অধিকাংশ লোক যে উন্মাদ হয় তাহা আমরা মনুষ্য জীবনের অনেক ঘটনায় দেখিতে পাই।

মানসিক সমস্ত রোগ স্নায়ু-বিকারজাত। স্নায়বীয় সমস্ত রোগই কোন না কোন প্রকারে পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। প্রত্যক্ষ হয়তৌলিক প্রভাববশতঃ সন্তানেরা স্নায়ব রোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একজন ক্ষিপ্তের পুত্রের স্নায়ু-প্রণালী একজন সহজ লোকের স্নায়ু-প্রণালী হইতে ভিন্ন অবস্থাপন্ন। এমন ঘটনাও হইয়া থাকে যে বংশ পরম্পরায় স্নায়ব অবস্থা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট হইতে থাকে, অর্থাৎ একজন ক্ষিপ্তের পুত্র উন্মাদ-রোগগ্রস্ত না হইয়া অপস্মার (Epilepsy) রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কিম্বা হয়ত সেই অপস্মার রোগীর পুত্র কেবল স্নায়ব বেদনা ইহজীবন ভোগ করে। এই প্রকারে তাহার পুত্র হয়ত সামান্য কোন প্রকার স্নায়ব রোগে আক্রান্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সে বংশ হইতে হয়ত স্নায়ব রোগ একেবারে অন্তর্হিত হয়।

আমরা অনেক সময় ছিট্‌ওয়ালা লোক-

দের পাগলের দলে ফেলিয়া থাকি। ছিটগ্রস্ত লোকেরা, বলিতে গেলে, এক প্রকার পাগল বটে, কিন্তু যথার্থ পাগলের সহিত তাহাদের তুলনা করা হইলে তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়। পাগলেরা যেমন সহজ মানুষদের সহিত কোন বিষয়ে মেলে না, ছিট্‌গ্রস্ত লোকদের পক্ষে তাহা নহে। চিন্তাশক্তি, প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাহারা সহজ মানুষের সহিত সমকক্ষ হয় কিন্তু তাহাদের কল্পনা স্বতন্ত্র। তাহাদের কল্পনা অঙ্গহীন। হয় ত এইরূপ অবস্থায় তাহারা এক নূতন ধর্ম্মের আবিষ্কার করিয়া দেশ বিদেশে তাহা রাষ্ট্র করিতে লাগিল, কিম্বা হয় ত পৃথিবীর কোন অদ্ভুত পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া তাহার অন্বেষণে কৃতসঙ্কল্প হইল। যত তাহাদের মনের অবস্থার বৈলক্ষণ্য হয় ততই তাহাদের উৎসাহের পরিসীমা থাকে না। যদি সেই নূতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চারিদিক্ হইতে পোষকতা পায়, কিম্বা অদ্ভুত পদার্থান্বেষণে কৃতকার্য্য হইয়াছে মনে ভাবিয়া নিজে নিজেই খুব পরিতৃপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের রোগকে খুব কমই প্রশ্রয় দেওয়া হইল। আর যদি অভিলাষ পূরণে কৃতকার্য্য না হইল ত নিরাশ হইয়া প্রকৃত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সঙ্কল্প একবার সিদ্ধ হইলে তাহাদের কল্পনার আর বিরাম নাই, তাহাদের রুগ্ন মস্তিষ্ক হইতে উত্তরোত্তর আরো নানা অদ্ভুত দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে লাগিল। প্লেটো সক্রেটিসের বিষয় বলিতে বলিতে একস্থলে বলিয়াছেন, "দেবতাদিগের অনুগ্রহে যখন পৃথিবীতে উন্মাদরোগ আসিয়া জুটিল আমাদের তখন অনেক মঙ্গল হইতে লাগিল। কারণ (Delphi) ডেলফির যত দৈববক্তা এবং (Dodona) ডডোনার পুরোহিতগণ যখন ছিটগ্রস্ত হইলেন তখন তাঁহারা গ্রীসের জন্য অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন; সহজ অবস্থায় তাঁহারা কিছুই করেন নাই।" ছিট গ্রস্ত হইলে লোকে যে আপনার গোঁ ধরিয়া অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছেন তাহা ইতিহাসের অনেক স্থলে দেখা যায়। মহম্মদ তাঁহার এক স্বপ্ন হইতে কি না করিলেন। ইংলণ্ডীয় অনেক চিকিৎসকেরা বলেন যে মহম্মদ অপস্মার রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলিয়া ঐরূপ স্বপ্ন দেখেন; এটা যে কতদূর বিশ্বাস্য তাহা বলা যায় না। ছিট্‌রোগ যে স্নায়ব তাহা বলা বাহুল্য। অনেক উন্মাদ তাহার ঘোরতর রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ছিট্‌রোগে আক্রান্ত হয়, কারণ তাহার স্নায়ু কোন মতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। আমরা সচরাচর যাহাদের ছিট্ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি তাহারা সহজপ্রকৃতি ও উন্মাদপ্রকৃতির মধ্যবর্ত্তী এবং সংযোজক শৃঙ্খল মাত্র; তাহারা একপদ অবতরণ করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে উন্মাদ নামের বাচ্য হয়।

স্নস্তবায়ু মানসিক রোগ। ইহা উন্মাদাবস্থার একটি অঙ্গ। এই রোগে আ-

ক্রান্ত হইলে মস্তিষ্কের সমস্ত কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। না থাকে বুদ্ধির চালনা, না থাকে হিতাহিত জ্ঞান, না থাকে মনের বৃত্তি, না থাকে বাক্‌শক্তি, সামান্যতঃ এই রোগে আক্রান্ত হইলে মানুষে একটি বৃক্ষ হইতে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ হয় না। আহার পাইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে বটে, কিন্তু বৃক্ষের ন্যায় স্তম্ভিত থাকিয়া শুকাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কোন কোন লোক একটি বিষয় লইয়া পাগল এবং সেই একটি বিষয় হইতে সে যে কত প্রকার ভ্রান্তিমূলক কল্পনা বাহির করে তাহার সংখ্যা নাই। মনে কর কোন ব্যক্তি সাধারণের প্রিয়পাত্র ও তাহাদের বিশ্বাস্য হইবার জন্য প্রাণপণে চেস্টা করে এবং কতক পরিমাণে প্রীতি এবং বিশ্বাস পাইয়াও পরিতৃপ্ত হয় না, কল্পনা করে যে সে হয়ত কাহারও প্রীতি পাইবে না, পাইবার উপযুক্ত নয়,—লোকে তাহাকে বিশ্বাস করিবে কেন—ইত্যাদি নানা প্রকার ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্তিমূলক কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়া ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ঐ এক বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে করিতে তাহার স্মরণশক্তি লোপ পায়, মনের ভাব সকল নির্ব্বাণ হইয়া যায়, বুদ্ধিক্ষয় হইতে থাকে এবং সময়ে স্তম্ভবায়ুরোগে আক্রান্ত হইতে পারে। এই শ্রেণীর রোগকে ইংরাজীতে Monomania বলিয়া থাকে। অবষাদবায়ু (Melancholia) স্তম্ভবায়ুর আর একটি উৎপত্তি-স্থল। উপরি উক্ত কারণ বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজের কোন বিষয় লইয়া মনকে নিয়ত সেই এক কল্পনায় নিযুক্ত রাখে এবং আপনাকে অতিশয় হেয় মনে করিয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকে, সেই বিষাদ দূর করা তাহার ক্ষমতার অতীত হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার মন নৈরাশ্যভোগ করিয়া একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই রোগগ্রস্ত হয়। বিষাদযন্ত্রণা অসহনীয় হইলে এই রোগাক্রান্ত লোক বিকারাবস্থায় অনেক সময়ে আত্মহত্যা করিয়া থাকে।

অপস্মার রোগকে উন্মাদ রোগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিলে বেশি বলা হয় না। দেখা যায় যে অপস্মাররোগবিশিষ্ট পিতামাতার সন্তানসন্ততিদিগের অপস্মার রোগে আক্রান্ত হইবার যেরূপ সম্ভাবনা থাকে উন্মাদ হইবার তাহাদের সেইরূপ সম্ভাবনা; আর উন্মাদের বংশাবলি অপস্মার রোগে খুব সচরাচরই আক্রান্ত হইয়া থাকে। কৌলিক প্রভাব অপস্মার রোগের যেরূপ উৎপত্তির কারণ, সেইরূপ মস্তিষ্কে আঘাত কিম্বা স্নায়ুপ্রণালীর হঠাৎ বৈলক্ষণ্যও যে ইহার উৎপত্তি-স্থল তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। তাহার একটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত করা গেল। "কোন অষ্টম বৎসর বয়স্ক একটি সুস্থ বালক কোন সময় ১২ ফিট্ উচ্চ স্থান হইতে ভূমিতে পড়িয়া যায়, তাহাতে তাহার মস্তকে আঘাত লাগে। আঘাত প্রাপ্তে সে প্রায় ১৫ মিনিট অজ্ঞানাবস্থায় পতিত থাকে, ১০ মিনিটের পর তাহার আবার মূর্চ্ছা হয়। পড়িয়া যাওয়াতে সেই

বালকের মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের হাড় কিছু দমিয়া যায়। ক্ষতস্থান আরোগ্য হইলে সে প্রায় দেড়মাস সুস্থ অবস্থায় থাকিয়া তাহার পর হইতে ক্রমাগত উপর্য্যুপরি মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। মূর্চ্ছা যাইবার অগ্রে তাহার মুখ বামপার্শ্বে বাঁকিয়া যাইত, জ্ঞান ক্রমে লোপ পাইত, মুখ মলিন হইয়া আসিত, এবং সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকিত। বাইশ বৎসর বয়সে তাহার মনের ভাব এবং বুদ্ধি নির্দ্দিষ্টসীমাবদ্ধ হইল এবং স্মরণশক্তি তাহার মস্তিষ্ক হইতে একেবারে অপসৃত হইয়াছিল।" সচরাচর মূর্চ্ছা অর্থাৎ অজ্ঞানাবস্থা অপস্মার রোগের একটি প্রধান লক্ষণ। মূর্চ্ছার অগ্রে এবং পশ্চাতে অপস্মার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মনের যথেষ্ট বিকৃতি স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু সকলের মনের লক্ষণ যে একরূপ হয় তাহা নহে। কেহ কেহ বিষণ্ন, খিট্‌খিটে, বুদ্ধিহীন, ধারণাশক্তিহীন হইয়া পড়ে; কেহ বা মূর্চ্ছাভঙ্গের পর আবার বিপরীতভাব ধারণ করে, তাহারা আরো উল্লসিত হইয়া উঠে, বিষণ্নতার কোন চিহ্ন তাহাতে দৃষ্ট হয় না, অজ্ঞানাবস্থার অগ্রে সে যে সকল কথা কহিতেছিল, বা যে সকল কার্য্য করিতেছিল, তাহা পুনঃজ্ঞানপ্রাপ্তির পর মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মনে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তবে এরূপ ঘটনা খুব বিরল। বিষণ্নতা এবং মনের দুর্ব্বলতা অপস্মার রোগের যে অনিবার্য্য ফল তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

অপস্মাররোগজনিত উন্মত্ততা সময়ে সময়ে পরহত্যাপ্রবণ হইয়া দাঁড়ায়। যখন উক্তরোগবিশিষ্ট লোকের হত্যাকল্পনা মনে জাগরূক হয় তখন তাহার মনের গতি অত্যন্ত মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, তখন জানা যায় যে তাহার রোগ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি যথার্থ ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করা গেল। কোন একটি যুবা পুরুষ বাল্যকাল হইতে বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত অপস্মাররোগজনিত মূর্চ্ছাপন্ন হইত বলিয়া তাহাকে সৈন্যদল হইতে দূরীকৃত করিয়া দেয়, এবং তখন হইতে প্রায় ৪০ বৎসর তাহার রোগের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় নাই। যদিও বাহিরে তাহার কোন লক্ষণ ছিল না তথাপি ভিতরে ভিতরে তাহার স্নায়ুর ক্রমিক হীনাবস্থা হইতে ছিল। বাষট্টি বৎসর বয়সে হত্যাকল্পনা তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠে। তাহার মনের প্রথম এই সংস্কার হইল যে তাহার নির্দ্দোষী মাতাই তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য চেষ্টিত। কল্পনায় এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া সে এক দিবস তাহার বৃদ্ধ মাতার গলদেশে সজোরে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল। তাহার মাতা ভূমিতে পড়িয়া গেলে তাঁহার বক্ষে আরোহণ করিয়া যতক্ষণ না লোক জন আসিয়া পড়িল ততক্ষণ তাঁহার শরীরে আঘাত করিতে লাগিল। এরূপ শোচনীয় ঘটনা যে অনেক ঘটিয়া থাকে তাহা অনেক পুস্তকে পাঠ করা যায়।

উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা অধিকাংশ সময় অজ্ঞানাবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্বেই এইরূপ হত্যা করিয়া থাকে। হত্যা কল্পনা তাহাদের মনে মুহূর্ত্তের মধ্যে উদয়

হয়। অনেকে মূর্চ্ছাবস্থায় হত্যা না করুক সাংঘাতিক আঘাত করে, এবং মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তাহাদের মনের দুর্ব্বলতা হেতু সে সকল কল্পনা আর মনে স্থান পায় না। খুব অল্প লোকে মূর্চ্ছার অব্যবহিত পরে হত্যা এবং সময়ে সময়ে কষ্টের আতিশয্যহেতু আত্মহত্যা করিয়া থাকে। প্রমাণ স্বরূপ আর একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা গেল। অপস্মাররোগাক্রান্ত ত্রিশ বৎসর বয়স্ক একটি যুবা পুরুষ ফরাসীদেশীয় কোন গারদে আবদ্ধ ছিল। এক দিবস মূর্চ্ছার অব্যবহিত পরে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক গবাক্ষ হইতে পতিত হইয়াছিল। অন্য কোন অবসরে তাহার পিতাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই সকল ঘটনার কিছু পরে তাহার বেশ জ্ঞানের উদয় হইত, এবং সহজপ্রকৃতির মানুষের ন্যায় সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিত। সেই গারদের রক্ষকের উপর তাহার কিছু বিশেষ টান্ পড়ে, এবং রক্ষকও তাহাকে একটু বিশেষ যত্ন করিত। কিছু দিবস পরে তাহার রোগের কিছু বৃদ্ধি হইল, এমন কি দুই তিন দিবস তাহার উপর্য্যুপরি মূর্চ্ছা হইয়াছিল, সেই অবধি তাহার মনের গতি বিশেষ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থার পর এক দিন যখন সেই রক্ষকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহার হস্তে হস্ত সমর্পণ পূর্ব্বক "ঐক্য (union)" এই কথাটি উচ্চারণ করিল মাত্র; সেই সময় তাহার মনের কিম্বা আকৃতির যে বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়াছিল তাহা নহে। অন্য এক দিবস মূর্চ্ছার অব্যবহিত পূর্ব্বে রক্ষককে দেখিয়া তাহার নিজের পাতলে বেদনা হইয়াছে ছলপূর্ব্বক এই কথা বলাতে রক্ষক নত হইয়া যেমন তাহা নিরীক্ষণ করিতে যাইবে অমনি সজোরে তাহার বক্ষে এরূপ অস্ত্রাঘাত করিল যে তাহাতেই তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। এই ঘটনার পরই সেই রুগ্ন যুবা অজ্ঞান হইয়া পড়িল। হত্যার কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল যে ক্রমাগত দুই তিন রাত্রি হইতে কোন গুপ্ত সমাজভুক্ত কতকগুলি লোক তাহাকে এই বলিয়া যাইত 'রক্ষককে না মারিলে জীবনে তুমি সুখ পাইবে না' সেই নিমিত্ত রক্ষক সেই গুপ্তদলভুক্ত কিনা জানিবার জন্য "ঐক," এই সঙ্কেত বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল। এ সমস্তই তাহার কল্পনাপ্রসূত, এবং সেই সমস্ত কল্পনা তাহার রোগপ্রসূত। কথিত আছে তাহার পর হইতে তাহার রোগ আরো প্রবল হইয়াছিল, এবং যে সময়টুকু সে সুস্থাবস্থায় থাকিত সেই সময়টুকু সেই রক্ষকের কথা এবং হত্যার কথা মনে করিয়া মনে বড় কষ্ট পাইত। এই রোগ অধিক দিন স্থায়ী হইলে লোকে আত্মহত্যা-প্রবণও হয়।

J. Farlet বলেন "Whenever we meet with isolated acts of violence, outrages to persons, homicide, suicide, arson, which nothing seems to have instigated, and when, upon attentive

examination and thorough inquiry, we find a loss of memory after the perpetration of the act, with a periodicity in that recurrence of the same act, and a brief duration, we may diagnose larval epilepsy." *

প্রসবের পর অনেক স্ত্রীলোক অপস্মাররোগে আক্রান্ত হইয়া আপনাদের সন্তানদিগকে নষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু সেই রোগজনিত মূর্চ্ছা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়।

এতদ্ব্যতীত আরো কতকগুলি স্নায়ব রোগ আছে,যথা,স্নায়ব বেদনা (Neuralgia), পানেচ্ছা (Dipsomania), ইত্যাদি; ইহাদের বিশেষ বর্ণনার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না; শুদ্ধ এইটুকু জানিলে যথেষ্ট হইবে যে ইহারা উন্মাদরোগের সহিত খুব নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট। উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের বংশে এই রোগগুলি নিতান্ত বিরল নহে। যে যে বংশে এই রোগগুলি বর্ত্তমান সেই সেই বংশ সুবিবেচিত যৌননির্ব্বাচন (Judicious sexual selection) কিম্বা অন্য কোন প্রকার শোধনকারী উপায় দ্বারা শোধিত না হইয়া যদি প্রশ্রয়বশতঃ ক্রমশঃ উত্তরোত্তর অবনত হইতে থাকে তাহা হইলে সন্তানসন্ততিতে উন্মাদরোগ জন্মাইয়া বংশ ক্রমে একটি পাগলাগারদ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কিছু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্নায়বরোগগ্রস্ত বংশ এককালে রোগমুক্ত হইতে পারে; ইহা কেবল উপরিউক্ত এবং অন্যান্য শোধনকারী উপায় দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

শরতে প্রকৃতি।

কইগো প্রকৃতি রাণী দেখি দেখি মুখ খানি
কেন গো বিষাদ ছায়া রয়েছে অধর ছুঁয়ে ?
মুখানি মলিন কেন গো ?
এই যে মুহূর্ত্ত আগে হাসিতে ছিলে গো দেখি
পলক না পালটিতে সহসা নেহারি একি—
মরমে বিলীন যেন গো !
কেন তনু খানি ঢাকা, শুভ্র কুহেলিকা বাসে
মৃদু বিষাদের ভারে সুধীরে মুদিয়া আসে
নয়ন-নলিন হেন গো ?

ওই দেখ চেয়ে দেখ—একবার চেয়ে দেখ—
চাঁদের অধর দুটি হাসিতে ভাসিয়া যায় !
নিশীথের প্রাণে গিয়া সে হাসি মিশিয়া যায়।
সে হাসির কোলে বসি কানন গোলাপগুলি
আধ'আধ'কথা কহে সোহাগেতে দুলি দুলি !
সে হাসির পায়ে পড়ি নদীর লহরীগণ
যার যত কথা আছে বলিতে আকুল মন।
সে হাসির শিশু দুটি লতিকা মণ্ডপে গিয়া
আঁধারে ভাবিয়া সারা বাহিরিবে কোথা দিয়া !
সে হাসি অলসে ঢলি দিগন্তে পড়িয়া নুয়ে,
মেঘের অধর প্রান্ত একটু রয়েছে ছুঁয়ে।

* Annal Medico Psychological. Jan 1873.

বল তুমি কেন তবে, এমন মলিন র'বে ?
বিষাদ স্বপন দেখে হাসির কোলেতে শুয়ে।

ঘোমটাটি খোল'খোল'-মুখ খানি তোল'তোল'
চাঁদের মুখের পানে চাও একবার !
বল দেখি কারে হেরি এত হাসি তার !
নিলাজ বসন্ত যবে কুসুমে কুসুম ময়—
মাতিয়া নিজের রূপে হাসিয়া আকুল হয়,
মলয় মরমে মরি, ফিরে হাহাকার করি—
বনের হৃদয় হোতে সৌরভ-উচ্ছ্বাস বয় !
তারে হেরি হয় না সে এমন হরষে ভোর ;
কি চোখে দেখেছে চাঁদ ওই মুখ খানি তোর !
তুই তবু কেন কেন—দারুণ বিরাগে যেন
চাস্‌নে চাঁদের হাসি চাঁদের আদর !
নাই তোর ফুল বাস—নাইক প্রেমের হাস
পাপিয়া আড়ালে বসি শুনায় না প্রেম গান !
কি দুখেতে উদাসিনী যৌবনেতে সন্ন্যাসিনী ?
কাহার ধেয়ানে মগ্ন শুভ্র বস্ত্র পরিধান ?

এক কালে ছিল তোর কুসুমিত মধু মাস—
হৃদয়ে ফুটিত তোর অজস্র ফুলের রাশ ;—
যৌবন উচ্ছ্বাসে ভোর-প্রাণের সুরভি তোর
পথিক সমীরে সব দিলি তুই বিলাইয়া !
শেষে গ্রীষ্ম তাপে জ্বলি শুকাইল ফুল, কলি
সর্ব্বস্ব যাহারে দিলি সেও গেল পলাইয়া !
চেতনা পাইয়া শেষে হইয়া সর্ব্বস্ব-হারা
সারাটি বরষা তুই কাঁদিয়া হইলি সারা !
এত দিন পরে বুঝি শুকাইল অশ্রুধারা !
আজ বুঝি মনে মনে করিলি দারুণ পণ
যোগিনী হইবি তুই পাষাণে বাঁধিবি মন !

বসন্তের ছেলেখেলা ভাল নাহি লাগে আর !
চপল চঞ্চল হাসি ফুলময় অলঙ্কার !
এখন যে হাসি হাস' আজি বিরাগের দিন,
শুভ্র শান্ত সুবিমল বাসনা লালসা হীন।
এত যে করিলি পণ—তবুও ত ক্ষণে ক্ষণ
সেদিনের স্মৃতি-ছায়া হৃদয়ে বেড়ায় ভাসি।
প্রশান্ত মুখের পরে কুহেলিকা ছায়া পড়ে—
ভাবনার মেঘ উঠে সহসা আলোক নাশি—
মুহূর্ত্তে কিসের লাগি আবার উঠিস্ জাগি
আবার অধরে ফুটে সেই সে পুরাণো হাসি !

ঘুমায়ে পড়িস্ যবে বিহ্বল রজনী শেষে,
অতি মৃদু পা টিপিয়া উষা আসে হেসে হেসে,
অতিশয় সাবধানে দুইটি আঙুল দিয়া
কুয়াশা ঘোমটা তোর দেয় ধীরে সরাইয়া !
অমনি তরুণ রবি পাশে আসি মৃদুগতি
মুদিত নয়ন তোর চুমে ধীরে ধীরে অতি !
শিহরিয়া কাঁপি উঠি মেলিস্ নয়ন দুটি
রাঙা হোয়ে ওঠে তোর কপোল-কুসুম-দল
শরমে আকুল ঝরে শিশির-নয়ন-জল !

সুদূর আলয় হোতে তাড়াতাড়ি খেলা ভুলি
মাঝে মাঝে ছুটে আসে দুদণ্ডের মেঘ গুলি।
চমকি দাঁড়ায়ে থাকে ওই মুখ পানে চায়
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে কাঁদিয়া মরিয়া যায় !
কিসের বিরাগ এত কি তপে আছিস ভোর
এত কোরে সেধে সেধে-এত কোরে কেঁদে কেঁদে
যোগিনি, কিছুতে তবু ভাঙ্গিবে না পণ তোর ?
যোগিনী, কিছুতে কিরে ফিরিবে না মন তোর ?

অকারণ কষ্ট।

অকারণ কষ্ট নামে একটা রোগ আছে অনেকে হয়ত তাহা জানেন না; জন্মান্ধতার ন্যায় এ রোগ সারিবার নহে। যাহার হৃদয়ে এরূপ অঙ্গহীনতা আছে, এ জন্মে তাহার সে অঙ্গ আর পূর্ণ হইবার নহে। বাহিরের কোন দুর্ঘটনা হইতে ইহার জন্ম নহে। জীবনে এমন কিছুই ঘটে নাই, যাহা হইতে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি। বোধ করি, পূর্ব্বজন্ম হইতে যখন ইহজন্মে যাত্রা করিবার সমস্ত উদ্যোগ করিতেছিলাম, তখন তাড়াতাড়িতে, ভ্রমক্রমে, পূর্ব্বজীবনের কোন একটা দুঃখের, কোন একটা নৈরাশ্যের, কোন একটা অতৃপ্তির ভগ্নাংশ আমাদের তল্পীর মধ্যে দৈবাৎ রহিয়া গিয়াছিল; আধখানা দেখিয়া তাহার সমস্ত চেহারাটা আমাদের মনে পড়িতেছে না। আমরা যে মাঝে মাঝে শুনিতে পাই, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সহসা একটা বাঁশী করুণ স্বরে বাজিয়া উঠিল, তাহার কথা নাই, কেবল সুর সমষ্টি, তাহার রাগিণী ভুলিয়া গিয়াছি; বোধ করি সে বাঁশির মুখাগ্রভাগ পূর্ব্বজন্মের দিকে স্থাপিত, কোন একটি অতীত ঘটনার প্রেতাত্মা বসিয়া বসিয়া পূর্ব্ব জীবনের পূরবী রাগিণী বাজাইতেছে।

অনেকে হয়ত জানেন না, যে, তাঁহারা যে কষ্ট পাইতেছেন, তাহার যথার্থ কোন কারণ নাই। তাঁহারা যাহাকে তাহার কারণ মনে করিতেছেন, তাহা তাহার কারণ নহে। ভালবাসার লোকের কাছে ভালবাসা না পাইয়া, বন্ধুর কোন কার্য্যবিশেষ অন্যায় কল্পনা করিয়া তাঁহারা কাঁদেন, কিন্তু সেই জন্যই তাঁহারা কাঁদেন না। না কাঁদিলে তাঁহাদের আর গতি নাই, কারণ ঘটুক্ আর না ঘটুক্। যাহাকে তাঁহারা কারণ মনে করেন তাহা মন ভুলাইবার ওজর মাত্র। তাঁহাদের মনের স্বাভাবিক অবস্থাই কষ্ট পাওয়া। ঘটনাগুলি তাহার উপলক্ষ মাত্র। ঘটনাগুলি তাঁহাদের দুঃখের কারণ নহে দুঃখের আশ্রয়। ঘটনার জমী ফুঁড়িয়া গাছের মত তাঁহাদের দুঃখ ভিতর হইতে উঠে নাই, তেমন একটা সুবিধামত ঘটনা দেখিলেই অমনি তাঁহাদের দুঃখ তাড়াতাড়ি বাহির হইতে গিয়া তাহার উপর দখল করিয়া বসে ও ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে আপনার শিকড় ছড়াইতে থাকে, এমনতর গাছ কি কোথাও দেখা যায়? তাঁহাদের দুঃখের একটা কারণ সরাইয়া দেও, তিন দিনে তাঁহারা আর একটা কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবেন। তাঁহাদের দুঃখ একটি ঘটনার দ্বার হইতে তাড়া খাইলে আর একটা ঘটনার

উপর গিয়া বাসা বাঁধে। তাঁহাদের মত লোক যদি বা জানেন যে, প্রণয়িনী তাঁহাদের ভাল বাসে, তথাপি তাহার প্রতি খুঁটি-নাটি লইয়া তাঁহারা খুঁৎ খুঁৎ করিবেন। বলিবেন, আজ চলিয়া যাইবার সময় সে আমা হইতে দেড় ফুট তফাৎ দিয়া গেল কেন, আর চার ইঞ্চি কাছে আসিলে কি হানি হইত? চারি ইঞ্চি কাছ দিয়া গেলেই যে, তাঁহাদের সকল যন্ত্রণা দূরে যাইত, তাহা মনে না করা হয়। কোন রূপে তাঁহারা তাঁহাদের প্রণয়িনীর ভালবাসায় ঈষৎ অবিশ্বাস করিতে চান। তাহা না করিলে তাঁহাদের চলে কিরূপে? প্রাণ কাঁদিতেছে, কিন্তু কাঁদেন কাহার দোহাই দিয়া? আর কিছু নয়, হয়ত তাঁহাদের হৃদয়ে একটা ক্ষমতা, একটা প্রতিভা নিহিত আছে, কিন্তু ঘটনার শত্রুতায় তাহা বাহিরে বিকাশ পায় নাই। তাহারা মাথা তুলিতে পারে নাই বটে কিন্তু মরিয়া যায় নাই। তাঁহারা যে মাঝে মাঝে হৃদয়ের কারাগার হইতে একটা অধীর শিকল নাড়ার শব্দ শুনিতে পান, মনের লৌহ পিঞ্জরের দ্বারে কে যেন পদাঘাত করিতেছে মনে হয়, সহসা একটা আর্ত্তনাদ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস কানে আসে, তাহার কারণ কি সেই কারারুদ্ধ ক্ষমতার অধীরতাই নহে? একটা কিছু কাজ করিতে পারিতাম, কিন্তু করা হইল না, কি কাজ করিব ভাবিয়া পাই না, এমন অবস্থা নহে যে, কাজ করি, এই ভাবই কি অলক্ষিত ভাবে তাঁহাদের বুকের মধ্যে বসিয়া দিন রাত নিশ্বাস ফেলিতেছে? কি জানি কি, কিন্তু হৃদয় কাঁদে। মনের একটা অসহায় অবস্থা, অসন্তোষ, অতৃপ্তি, একটা অত্যন্ত নিরাশ্রয় ভাব ভূতের মত এই হৃদয়ের শূন্য ঘরে হা হা করিয়া বেড়ায়। দুই প্রহরের রৌদ্রে যখন চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকে, একলা চুপটি করিয়া জানালার কাছে বসিয়া থাকেন, কিম্বা জ্যোৎস্না রাত্রে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, শয়ন ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া জনশূন্য রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকেন, তখন এই নিরাশ্রয়, অসহায়, অতৃপ্ত ভাব তাঁহাদের হৃদয় ভেদ করিয়া যেন ফুটিয়া উঠে, বুক যেন ফাটিয়া যায়, ইচ্ছা করেন এমন এক জন প্রাণের লোককে পান, যাহাকে, বুকের কথা ঢালিয়া বলিতে পারেন। অথচ, একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পান, তাঁহাদের কিছুই বলিবার কথা নাই। হঠাৎ মনে হয় কত সহস্র নিরাশা অতৃপ্ত কত সহস্র যন্ত্রণায় তাঁহাদের প্রাণটা হাহাকার করিতেছে! একটা হৃদয়ের লোক পাইলে তাহার বুকে মাথা রাখিয়া মনের জটিল বিশৃঙ্খল ভাবের গ্রন্থি গুলা একে একে খুলিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া দেখান, কিন্তু একটু স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পান তাঁহাদের এমন একটি যন্ত্রণা নাই, একটি নিরাশা নাই, যাহার জন্য তাঁহাদের বুক ফাটিতে পারে, একটি কথা নাই যাহা আর এক জনের কাছে দুই দণ্ড ধরিয়া বলিতে পারেন; সেই জন্যই তাঁহাদের ইচ্ছা করে, এমন একটা ধরিবার

ছুঁইবার জিনিষ পান, যেটাকে উপলক্ষ করিয়া, কেবল অন্যের কাছে নয় নিজের কাছেও, দুই দণ্ড ধরিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া, চোখের জল ফেলিয়া বাঁচেন। আমি কষ্ট পাইতেছি অথচ তাহার কারণ পরকে বুঝাইতে পারিতেছি না এবং নিজেও বুঝিতেছি না, ইহা অপেক্ষা আর কষ্ট কি হইতে পারে? যদি বা সে কষ্ট কেহ বুঝে, তথাপি কেহ অনুভব করে না। এই জন্যই তঁাহারা এমন একটি ঘটনা অন্বেষণ করিতে থাকেন, যাহাকে তিরস্কার বলিয়া বলিতে পারেন, দেখ দেখি, তোমার জন্যই ত আমার এইরূপ হইল। তাঁহারা একজন কাহাকেও দায়ী করিতে চাহেন। সংসারে খুঁৎ ধরিতে গেলে অজস্র পাওয়া যায়; সুতরাং একটা-না-একটা কিছু হাতে থাকেই, যাহা লইয়া তাঁহারা নাড়াচাড়া করিতে পারেন। আসল কথা এই, তাঁহাদের দুঃখের নিজের একটা বাড়ি ঘর নাই, এই জন্য সে ঘর খুঁজিয়া বেড়ায়; একটা দুয়ার দেখিলেই অমনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসঙ্কোচে নিজের ঘরকন্না ফাঁদিয়া বসে। এইরূপ অনধিকার প্রবেশ করে বলিয়া কোথাও সে ভাল মুখে আতিথ্য পায় না, জোর জবরদস্তি করিয়া থাকিতে হয়, গালাগালি কানে না আনিয়া পিঠে দুই এক ঘা লাঠি খাইয়াও তাহাকে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। বেচারী কোথায় যায় বল? এমন সৃষ্টিছাড়া দুঃখ যাঁহাকে পোষণ করিতে হয় তাঁহার কি যন্ত্রণা? তিনি নিজেও সুখী হন না, তাঁহার আপনার লোকদেরও সুখী করিতে পারেন না। যাহাকে তিনি ভালবাসেন, তাহাকেই তিনি অধিক জ্বালাতন করেন। তাহার প্রতিকাজে তিনি খুঁটিনাটি ধরেন, প্রতি ক্ষুদ্র কথায় অভিমান করেন ও প্রতি পদে তাহার ভালবাসায় স্পষ্ট অবিশ্বাস প্রকাশ করেন। অবশেষে তাহার ফল এই হয় যে, ক্রমে সত্যই তাহার ভালবাসা চলিয়া যায়। এরূপ লোককে ভালবাসা বৃথা, কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না। ইহার হাতে কাজ রাখিলে তবে ইহাকে কিছু শান্ত করা যায়। যদি তুমি তোমার সমস্ত ভালবাসা ইঁহার কাছে প্রকাশ না কর, কিছু বাকী রাখিয়া দেও, তবে ইঁহার হাতে কাজ পড়ে, তোমার সমস্ত ভালবাসা পাইবার জন্য ইঁহার দিন রাত চেষ্টা থাকে। মনটা কাজে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু যখনি তোমার সমস্ত ভালবাসা পাইলেন, তখনিই তাঁহার অন্যান্য নানা খুঁটিনাটি ধরিবার অবসর হয়। হাতে তখন কাজ নাই কি করেন। প্রাণের ভিতর কাঁদিতে থাকে ও কাঁদিবার নানা উপলক্ষ খুঁজেন। ইহাদের ভালবাসাও প্রায় স্থায়ী হয় না, ক্রমিক স্থান পরিবর্ত্তন করে। কিসে যে মন সন্তুষ্ট হইবে ভাবিয়া পান না, ইহা উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান। ইহাঁরা দুঃখের ঘটনা অত্যন্ত বাড়াইয়া দেখেন ও বাড়াইয়া বলেন। এই জন্য যখন অতি সামান্য কারণ লইয়া ইহাঁরা অত্যন্ত ঘোরতর হাহুতাশ করেন, সহসা মনে হয় যে, নাজানি কি সর্ব্বনাশই হইয়া গিয়াছে, তখন আমাদের অত্যন্ত

আশ্চর্য্য বোধ হয়। উচ্ছ্বাসের প্রকৃত কারণ আমরা জানিতে পারি না। আসল কথা এই যে, যে সামান্য কারণ লইয়া তাঁহারা দুঃখ করিতে থাকেন তাহাই যদি সত্য তাঁহাদের দুঃখের কারণ হইত, তবে তাঁহারা এত দুঃখ করিতেন না। যেমন দুঃখের সম্বন্ধে সুখের সম্বন্ধেও সেইরূপ। যখন একটা সুখের কারণ ঘটে, সেটাকে অত্যন্ত প্রকাণ্ড করিয়া দেখেন ও একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। একটানা দুঃখের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে একটা তৃণ পাইলেও তাহা প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরেন। একটা কিছু ছুঁইতে পারিলেই অমনি তাড়াতাড়ি আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া মনে করেন এবার বুঝি একটা কিনারা পাইলাম। কিন্তু সে যে বালীর কিনারা, যতই দৃঢ় মুষ্টিতে তাহা ধরিতে চেষ্টা করা যায়, ততই শিথিল বালুকা খসিয়া খসিয়া পড়ে কিছুতেই আঁকড়িয়া ধরা যায় না। এইরূপে ইহাঁরা সুখের কারণ ও দুঃখের কারণ দুই বাড়াইয়া দেখেন। সমস্ত জীবন আত্মপ্রতারণা করিয়াই কাটাইতে হয়। তাঁহারা যে নিজে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া আপনাকে প্রবঞ্চনা করেন, তাহা নহে। তাঁহাদের মন তাহার নিজের চক্ষে নিজে ধূলা দেয়, ইহাতে তাঁহাদের কোন হাত নাই, তাঁহারা জানিতেও পারেন না। তাঁহাদের সমস্ত জীবনটাই একটা মহা ভুল। ভুল লইয়াই তাঁহারা কাঁদেন, ভুল লইয়াই তাঁহারা হাসেন, ভুলই তাঁহাদের মনের ক্রীড়া, ভুলই তাঁহাদের মনের আহার! "সে ভুল প্রাণের ভুল, মর্ম্মে বিজড়িত মূল!" ভুলের উপরেই তাঁহাদের জীবনের ভিত্তি স্থাপিত। ভারতীর তৃতীয় খণ্ডে একটি গান প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই ভাব সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে।

"ওকথা বোল না তারে, কভু সে কপট নারে
আমার কপাল দোষে চপল সে জন।
অধীর হৃদয় বুঝি, শান্তি নাহি পায় খুঁজি
সদাই মনের মত করে অন্বেষণ।
ভাল সে বাসিত যবে করে নি ছলনা,
মনে মনে জানিত সে, সত্য বুঝি ভালবাসে
বুঝিতে পারেনি তাহা যৌবন কল্পনা।
হরষে হাসিত যবে হেরিয়া আমায়,
সে হাসি কি সত্য নয়? সে যদি কপট হয়,
তবে সত্য বলে কিছু নাহি এ ধরায়!
স্বচ্ছ দর্পণের মত বিমল সে হাস
হৃদয়ের প্রতি ছায়া করিত প্রকাশ,
সে কি কপটতাময়? কখন—কখন নয়
কে আছে সে হাসি তার করে অবিশ্বাস?
ওকথা বোলনা তারে, কভু সে কপট না রে
আমার কপাল দোষে চপল সে জন,
প্রেম মরীচিকা হেরি ধায় সত্য মনে করি,
চিনিতে পারেনি সে যে আপনারি মন।"

অর্থাৎ যথার্থ ভালবাসা না হইতেই অকারণ-কষ্টগ্রস্তেরা কল্পনা করে যে, তাহারা ভালবাসিতেছে। তাহারা মনে করে এই ভালবাসা পাওয়ার অভাবেই তাহাদের যত কষ্ট। এই ভালবাসা পাইলেই তাহাদের সকল কষ্ট দূর হইবে। ভালবাসিবার অবসর পাইলেই ইহারা মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি মনোগত ইচ্ছার

অনুকূল কল্পনা করিতে থাকে। যত দিন ভালবাসা না পায় তত দিন মনটা এক রূপ ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু ভালবাসা পাই-লেই তাহাদের অন্তঃকরণ বুঝিতে পারে যে, এখনো সেই সর্ব্বগ্রাসী অভাব বিকট বদন বিস্তার করিয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। আবার খুঁৎখুঁৎ করিতে আরম্ভ করে। মনে করে, যাহাকে ভাল-বাসি তাহার দোষেই আমি সুখী হইতে পারিতেছি না। সে যদি এই রূপ না করিত তাহা হইলে আমি কষ্ট পাইতাম না, সে যদি এইরূপ করিত তাহা হইলে আমি সুখী হইতাম। সে যদি এইরূপ না হইয়া এইরূপ হইত, তাহা হইলেই আর কিছু কথা কহিবার থাকিত না। যাহার ভালবাসা ইহারা অনুগ্রহ মনে করে, তাহাকে ভাল বাসিয়াই ইহারা যথার্থ সুখী হইতে পারে। এ জীবনে ইহারা এমন কাহাকেও ভাল বাসিতে পারিবে না, যাহার ভালবাসায় ইহাদের অধিকার আছে। অর্থাৎ যাহাকে ভালবাসিলে ইহাদের সুখী হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাকে ইহারা ভাল বাসিতে পারিবে না। ভাল বাসিয়া সুখ না পাইলেই তবে ইহারা অপেক্ষাকৃত সুখে থাকিতে পারিবে।

এরূপ লোকদের কি কেহই মমতা করিবে না? সন্ধ্যাবেলায় যখন একলাটি বসিয়া একটি তারার দিকে চাহিতে চাহিতে ইহাদের চক্ষে জল আসে, তখন কি কেহই ইহাদের দোষর হইবার নাই? কেহই কি এক মুহূর্ত্তের জন্য পাশে বসিয়া বলিবে না "আহা কাঁদিওনা!" যখন স্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রে বসন্তসমীরে ইহাদের হৃদয় হাহা করিতে থাকে তখন জ্যোৎস্নাও হাসিবে বসন্ত রাত্রিও হাসিবে, কিন্তু এমন কি একটি হৃদয় থাকিবে না যে কাঁদিবে?

আর একদল লোক আছে তাহারা দুঃখ ভালবাসে বলিয়া দুঃখ করে। তাহারা কোন অবস্থায় স্বীকার করিতে চায় না যে তাহারা ভাল আছে। যখন তাহারা খুব হাসিতেছে খেলিতেছে, তখন তাহাদের বল, এখন ত তুমি বেশ সুখে আছ, তাহারা অপ্রস্তুত হয় ও তাড়াতাড়ি Byron আও-ড়াইয়া বলে—

যদিও বা ত্যজি বিরামের আশা,
যখন গভীর রাতি,
হাসি আলাপেতে থাকি নিমগন
আমোদে প্রমোদে মাতি।
তবু সে ভগন প্রাসাদের মত
লতায় পাতায় পোরা,
বাহিরেতে তার হরিত নবীন
ভিতরেতে ভাঙ্গা চোরা!

তাহারা নিজে জানিতে চায় যে তা-হারা দুঃখী, তাহারা সকলকে জানাইতে চায় যে, তাহারা দুঃখী। দুঃখে দুঃখেই যে তাহাদের জীবন কাটিল, সকলেই যে তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে, অদৃষ্টের সমুদয় ঝড় তাহাদেরি উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, সমুদয় বজ্র তাহা-দেরি দিকে বিদ্যুদ্দন্ত বিকাশ করিতেছে, ও মধ্যে সেই নিপীড়িত, অত্যাচরিত, নির্দ্দোষী ব্যক্তিরা অনাবৃত মস্তকে ধৈর্য্য

ধরিয়া বসিয়া আছে; তাহাদের মুখে কথাটি নাই; ঝড় বহে বহুক, বজ্র পড়ে পড়ুক, নিজের এইরূপ একটি আদর্শ চিত্র তাহাদের চখের সম্মুখে দিন রাত্রি জাগিয়া আছে। এই নিমিত্ত অদৃষ্টের সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিলে ইহারা বড়ই ডরায়। অদৃষ্টের ভ্রূকুটি ইহারা মনে মনে ভাল বাসে। মাঝে মাঝে ইহাদের বড়ই দুঃখ হয় যে, ইহাদের তহবিলে দুঃখ নাই। মাঝে মাঝে ইহাদের বড়ই কান্না আসে যে, ইহাদের কাঁদিবার কোন একটা ঘটনা ঘটিতেছে না। এমন করিবার কারণ কি? ইহারা লোকের মমতা পাইতে বড় ভাল বাসে। যেমন অনেক ভিক্ষুক অন্ধ ভান করিয়া অর্থ ভিক্ষা করে, ইহারা তেমনি দুঃখী ভান করিয়া মমতা ভিক্ষা করে, কেবল প্রভেদ এই, ইহাদের অনেকে নিজেই নিজেকে দুঃখী মনে করিয়া প্রতারিত হইয়াছে। ইহারা চায় যে, লোকে মনে করে, "আহা এ ব্যক্তির বড় কষ্টের জীবন, কাহারো নিকট হইতে ভাল ব্যবহার পায় নাই!" সকল লোকের নিকটে মমতা যদি বা না চায়, তবে নিদেন, যাহাদের ভালবাসে তাহাদের মনে একটা করুণা উদ্রেক করিতে চায়। তাহাও যদি না হয় তবে আপনার কাছেই আপনি মমতার পাত্র হইতে তাহার অভিপ্রায়। সে নিজের মুখের দিকে চাহিয়া করুণ স্বরে বলিতে চায়; "আহা, এ সংসারে তোকে মমতা করিবার কেহই নাই। চোখের জলেই তোর জীবন অবসান হইল!" করুণার পাত্র হইতে তাহার একান্ত ইচ্ছা। তা,' সকলের কাছেই হউক্ বা ভালবাসার লোকের কাছেই হউক্ বা নিজের কাছেই হউক্!

ইহারা যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে পদে পদে জানাইতে চায় "তুমি আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতেছ।" তাহাকে কথায় কথায় অপরাধী সাব্যস্ত করিতে চায়। মনে করে,সে নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। সে বলিবে, "আহা, বেচারার পরে বড় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি!" ও অধিকতর যত্ন ও আদর করিবে। কিন্তু ইহারা যে উদ্দেশ্যে এরূপ করে প্রায়ই তাহার বিপরীত ফল ফলে। এই মমতা ভিক্ষুকেরা যত অল্প মমতা পায়, এমন আর কেহ নহে। ইহাদের অশ্রুর আর মূল্য থাকে না। ইহাদের দুঃখ উপেক্ষিত হইতে থাকে। এমন কি, ক্রমে হাস্য ভাজন হইতে ইহারা বিরক্তি ভাজন হইয়া উঠে। তখন তাহারা কাঁদিয়া আর আদর পায় না, আদর না পাইয়া আরো কাঁদে, আরো আদর পায় না। একটা যে অমূলক দুঃখের গাছ সে বাহির হইতে আনিয়া মনের মধ্যে রোপণ করিয়াছিল, ক্রমে তাহার মূল বাহির হইতে থাকে। এককালে যাহা অকারণ ছিল ক্রমে তাহাই সকারণ হইয়া দাঁড়ায়। অবশেষে অশ্রুজলে দিন কাটিতে থাকে, অশ্রু জলের আর বিরাম নাই, অথচ আদর পায় না, মমতা পায় না, কেহই একটি কথা জিজ্ঞাসা

করে না, সুকলেই বলে উহার ঐরূপ দশা। এইরূপে "কিছুই-না"কে মানুষ করিয়া "কিছু" করিয়া তুলিয়া তাহারি হাতে মারা পড়িতে হয়।

হর-হৃদে কালিকা।

কে তুইলো হর হৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে,
ভিখারীর সর্ব্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে?
নাই হোথা সুখ আশা, বিষয়ের কামনা,
নাই হোথা সংসারের—পৃথিবীর ভাবনা!
আছে শুধু ওই রূপে বুকখানি ভরিয়ে—
আছে শুধু ওইরূপে মনে মন মরিয়ে।
বুকের জ্বলন্ত শিরে রক্ত রাশি নাচায়ে,
পাষাণ পরাণ খানি এখনও বাঁচায়ে,
নাচিছে হৃদয় মাঝে জ্যোতির্ম্ময়ী কামিনী,
শোণিত তরঙ্গে ছুটে প্রস্ফুরিত দামিনী।
ঘুমায়েছে মন খানা ঘুমায়েছে প্রাণ গো
এক স্বপ্নে ভরা খালি হৃদয়ের স্থান গো!
জগতে থাকিয়া আমি থাকি তার বাহিরে,
জগৎ বিদ্রূপ ছলে, পাগল ভিখারী বলে
তাই আমি চাই হোতে আর কিবা চাহিরে!
ভিখারী করিব ভিক্ষা বাঘাম্বর পরিয়ে
বিমোহন রূপখানি হৃদি মাঝে ধরিয়ে।

*   *   *   *   *

একদা প্রলয় শিঙ্গা বাজিয়া রে উঠিবে!
অমনি নিভিবে রবি, অমনি মিশাবে তারা
অমনি এ জগতের রাশ রজ্জু টুটিবে।
আলোক-সর্ব্বস্ব হারা, অন্ধ যত গ্রহ তারা
দারুণ উন্মাদ হোয়ে মহা শূন্যে ছুটিবে!
ঘুম হোতে জাগি উঠি রক্ত আঁখি মেলিয়া
প্রলয়ী, জগৎ লোয়ে বেড়াইবে খেলিয়া।
প্রলয়ের তালে তালে ওই বামা নাচিবে,
প্রলয়ের তালে তালে এই হৃদি বাজিবে!
আঁধার কুন্তল তোর মহা শূন্য জুড়িয়া
প্রলয়ের কাল ঝড়ে বেড়াইবে উড়িয়া!
অন্ধকারে দিশাহারা, কম্পমান গ্রহ তারা
চরণের তলে আসি পড়িবেক গুঁড়ায়ে,
দিবি সে জগৎ-চূর্ণ নিঃশ্বাসেতে উড়ায়ে!
এমনি রহিব স্তব্ধ ওই মুখে চাহিয়া—
দেখিব হৃদয় মাঝে, কেমনে ও বামা নাচে
উন্মাদিনী, প্রলয়ের ঘোর গীতি গাহিয়া!
জগতের হাহাকার যবে স্তব্ধ হইবে—
ঘোর স্তব্ধ, মহা স্তব্ধ, মহা শূন্য রহিবে—
আঁধারের সিন্ধু রবে অনন্তেরে গ্রাসিয়া—
সে মহান্ জলধির নাই উর্ম্মি নাই তীর
সেই স্তব্ধ সিন্ধু ব্যাপি রব আমি ভাসিয়া;
তখনো রহিবি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে—
ভাবনা বাসনা হীন এই বুক মাড়ায়ে!

সম্পাদকের বৈঠক।

(ডাকিনী। ম্যাক্‌বেথ্)

দৃশ্য। বিজন প্রান্তর। বজ্র বিদ্যুৎ।

তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা—ঝড় বাদলে আবার কখন
মিল্‌ব মোরা তিনটি জনে।
২য় ডা—ঝগড়া ঝাঁটি থাম্‌বে যখন,
হার জিত সব মিট্‌বে রণে।
৩য় ডা—সাঁঝের আগেই হবে সে ত;
১ম ডা—মিল্‌ব কোথায় বোলে দে ত।
২য় ডা—কাঁটা খোঁচা মাঠের মাঝ।
৩য় ডা—ম্যাক্‌বেথ সেথা আস্‌চে আজ।
১ম ডা—কটা বেড়াল! যাচ্চি ওরে!
২য় ডা—ঐ বুঝি ব্যাং ডাক্‌চে মোরে!
৩য় ডা—চল্ তবে চল্ ত্বরা কোরে!
সকলে—মোদের কাছে ভালই মন্দ,
মন্দ যাহা ভাল যে তাই,
অন্ধকারে কোয়াশাতে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই!

প্রস্থান।

দৃশ্য। এক প্রান্তর। বজ্র।

তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা—এতক্ষণ বোন কোথায় ছিলি?
২য় ডা—মারতেছিলুম শুয়োর গুলি।
৩য় ডা—তুই ছিলি বোন, কোথায় গিয়ে?
১ম ডা—দেখ্, একটা মাঝির মেয়ে
গোটাকতক বাদাম নিয়ে
খাচ্ছিল সে কচ্‌মচিয়ে
কচ্‌মচিয়ে
কচ্‌মচিয়ে—
চাইলুম তার কাছে গিয়ে,
পোড়ার মুখী বোল্লে রেগে
"ডাইনি মাগী যা' তুই ভেগে।"
আলাপোয় তার স্বামী গেছে,
আমি যাব পাছে পাছে।
বেঁড়ে একটা ইঁদুর হোয়ে
চালুনীতে যাব বোয়ে—
যা বোলেছি কোর্‌ব আমি
কোর্‌ব আমি—
নইক আমি এমন মেয়ে!
২য় ডা—আমি দেব বাতাস একটি
১ম ডা—তুমি ভাই বেশ লোকটি!
৩য় ডা—একটি পাবি আমার কাছে।
১ম ডা—বাকি সব আমারি আছে।

* * * * *

খড়ের মত একেবারে
শুকিয়ে আমি ফেল্‌ব তারে।
কিবা দিনে কিবা রাতে
ঘুম রবে না চোকের পাতে।
মিশ্‌বেনা কেউ তাহার সাথে।
একাশি বার সাত দিন
শুকিয়ে শুকিয়ে হবে ক্ষীণ।
জাহাজ যদি না যায় মারা
ঝড়ের মুখে হবে সারা।

বল্, দেখি বোন, এইটে কি !
২য় ডা—কই, কই, কই, দেখি, দেখি।
১ম ডা—একটা মাঝীর বুড় আঙুল
রোয়েচে লো বোন, আমার কাছে,
বাড়িমুখো জাহাজ তাহার
পথের মধ্যে মারা গেছে।
৩য়—ঐ শোন্ শোন্ বাজ্‌ল ভেরী
আসে ম্যাকেথ, নাইক দেরী।

দৃশ্য—গুহা। মধ্যে ফুটন্ত কটাহ।
বজ্র। তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা—কালো বেড়াল তিনবার
করেছিল চীৎকার।
২য় ডা—তিনবার আর একবার
সজারুটা ডেকেছিল।
৩য় ডা—হার্পি বলে আকাশ তলে
"সময় হোল" "সময় হোল!"
১ম ডা—আয় রে কড়া ঘিরে ঘিরে
বেড়াই মোরা ফিরে ফিরে।
বিষ মাখা ওই নাড়ি ভুঁড়ি
কড়ার মধ্যে ফেল্ রে ছুঁড়ি'।
ব্যাং একটা ঠাণ্ডা ভুঁয়ে
একত্রিশ দিন ছিল শুয়ে,
হোয়েছে সে বিষে পোরা
কড়ার মধ্যে ফেল্‌ব মোরা।
সকলে—দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
২য়—জলার সাপের মাংস নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
গির্গিটি-চোক ব্যাঙের পা,
টিক্‌টিকি-ঠ্যাং পেঁচার ছা।
কুত্তোর জিব, বাদুড় রোঁয়া,
সাপের জিব আর শুওর শোঁয়া।
শক্ত ওষুধ কোরতে হবে
টগ্‌বগিয়ে ফোটাই তবে।
সকলে—দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
৩য়—মকরের আঁশ, বাঘের দাঁত,
ডাইনি-মড়া, হাঙ্গর ব্যাং,
ইযের শিকড় তুলেছি রাতে,
নেড়ের পিলে মেশাই তাতে,
পাঁঠার পিত্তি, শেওড়া ডাল
গেরণ-কালে কেটেছি কাল,
তাতারের ঠোঁট, তুর্কি নাক,
তাহার সাথে মিশিয়ে রাখ।
আন্‌গে রে সেই ভ্রূণ-মরা,
খানায় ফেলে খুন-করা,
তারি একটি আঙুল নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
বাঘের নাড়ি ফেলে তাতে
ঘন কর আগুন-তাতে।
সকলে—দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে,
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
দ্বি ডা—বাঁদর ছানার রক্তে তবে
ওষুধ ঠাণ্ডা কোরতে হবে—
তবেই ওষুধ শক্ত হবে।

নক্ষত্র আলোক।

আমরা একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্কার রাত্রে যে সকল তারা আকাশে বিস্তৃত দেখিতে পাই তাহাদের সকল গুলি কিছু এক বর্ণের নয়। শীতকালে ভোরের সময় আমরা যে বড় উজ্জ্বল তারাটি দেখিতে পাই তাহার নাম শুক্র; ইহার বর্ণ উজ্জ্বল সাদা। আর বসন্তকালে সন্ধ্যার পর আমরা যে একটা তিন-কোনা তারা দেখিতে পাই তাহার নাম মঙ্গল। মঙ্গল গ্রহের বর্ণ প্রধানত লাল কিন্তু মধ্যে মধ্যে সবুজের আভা যুক্ত। শুক্র ও মঙ্গল এদুইটিই গ্রহ। ইহাদের হ্রাস বৃদ্ধি আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা ব্যতীত স্থির নক্ষত্রদিগেরও সকলের একরূপ বর্ণ নয়। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে নক্ষত্রের বর্ণের উপর তাহার শ্রেণী নির্ভর করে। প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র সকল উজ্জ্বল সাদা, দ্বিতীয় শ্রেণীর গুলি পীতবর্ণ, তৃতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র লাল, চতুর্থের বর্ণ সবুজ।

নক্ষত্রের এরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইবার কারণ কি? অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, মঙ্গলে যে সকল উদ্ভিদ জন্মায় তাহার বর্ণ লাল সেই জন্য মঙ্গল লাল। আর যে সবুজ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সমুদ্র। কিন্তু আমরা যে সকল নক্ষত্রের বর্ণানুসারে শ্রেণী বিভাগ করিবার কথা উপরে উল্লেখ করিলাম তাহারা যে উদ্ভিদশালী এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরঞ্চ তাহার বিপরীত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। অল্প দিন হইল Spectroscope বলিয়া একটি যন্ত্র বাহির হইয়াছে তাহা দ্বারা আমরা অতি দূরস্থ বস্তুরও আলোকের বর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করিতে পারি। সূর্য্যের আলোকের ন্যায় নক্ষত্রের আলোকেও রামধনু-বর্ণ আছে; কেবল গ্রহের উপরকার আচ্ছাদক বাষ্পীয় আবরণ সেই গ্রহ-বিকীরিত আলোকের যে বর্ণের গতি রোধ করে বিশ্লিষ্ট আলোকের বর্ণ সপ্তকের মধ্যে সেই বর্ণের স্থানে কাল কাল রেখা সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে যে নক্ষত্রের আলোক বিশ্লেষণ করিলে লাল রঙের স্থলে কাল রেখা দেখা যায় তাহার লাল রঙের অধিকাংশ আলোক অন্তর্হিত হইয়াছে কাজে কাজেই সে নক্ষত্রের আলোকে নীল, পীত ও সবুজ এই তিন বর্ণের প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ ইহার আলোক নীলাভাময়। আবার যাহার আলোকের বর্ণ শ্রেণীতে পীত বর্ণের স্থানে কাল রেখা দেখিতে পাওয়া যায় সে নক্ষত্রের বর্ণ লাল আভাময়। শুক্র গ্রহের বাষ্পীয় আবরণের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত সূর্য্যালোক

অবাধে চলিয়া আসে সেই জন্য শুক্রের উজ্জ্বল সাদা রঙ্। যত দিনের কথা আমরা জানিতে পারি তাহাতে এইরূপ মনে করা যায় যে চিরকালই শুক্রের বর্ণ একরূপ। সংস্কৃত, গ্রীক ও লাটিন এই সকল ভাষাতেই এই তারার নামের অর্থ সাদা। কিন্তু আকাশের উত্তর কেন্দ্রের নিকট সিরিয়স্ অথবা কুকুর নক্ষত্র নামক যে একটা অতি উজ্জ্বল তারা আছে তাহার সম্বন্ধে প্রাচীন সময়ের লোকেরা বলেন উহার বর্ণ হরিদ্রার আভাযুক্ত ছিল। সিরিয়সের এই আলোক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে সিরিয়স নক্ষত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তপ্ত হইয়াছে এই জন্য তাহার আলোক উজ্জ্বলতর, আবার অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন যে সিরিয়স ক্রমশঃ পৃথিবীর নিকটে আসিয়া পড়িতেছে সেই জন্য তাহার আলোক আমাদের চক্ষে উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর ঠেকিতেছে। এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার কারণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

এখন সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইবে যে আদৌ বর্ণের উৎপত্তি কিরূপে হয়। যে সকল বস্তু আমরা দেখিতে পাই তাহা হয় নিজে আলোক বিক্ষেপ করিতেছে এবং সেই আলোক আমাদের চক্ষে আঘাত করিতেছে কিম্বা অন্য কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন আলোক সেই বস্তুতে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়িতেছে। আলোক বিক্ষেপ করিবার আর কোন অর্থ নাই কেবল এই যে সেই বস্তুর ভিতরে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে চারিদিগের Etherএ বিস্তৃত হইয়া অবশেষে আমাদের চক্ষের উপর আসিয়া আঘাত করিতেছে। যেরূপ আন্দোলন Etherএ পরিব্যাপ্ত হইয়া আলোক উৎপন্ন করে তাহা ঠিক নদীর ঢেউয়ের ন্যায়। কোন একটা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কয়টা ঈথরের ঢেউ আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে তাহার উপরে আলোকের বর্ণ নির্ভর করে। ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের ঢেউ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রঙ উৎপন্ন হয়। সাত প্রকার ঢেউ সামঞ্জস্য ভাবে আমাদের চক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমরা সাদা রঙ দেখিতে পাই। আবার যখন কোন একটা রঙের ঢেউ অতি দেরিতে কিম্বা অতি শীঘ্র আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে তখন আমরা তাহা আদতেই দেখিতে পাই না। সাধারণতঃ আমরা সূর্য্যের বিশ্লিস্ট আলোকে বায়লেট রঙের পর আর কোন রঙ দেখিতে পাই না। কিন্তু একখণ্ড কাগজকে কুইনীন মিশ্রিত জলে চুবাইয়া সেখানে ধরিলে আগে যেখানে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না, সেখানে রঙ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কারণ এই যে এই বায়লেটের পরবর্ত্তী-বর্ণের ঢেউ সকল এত দ্রুত-তরঙ্গিত যে তাহা আমাদের দর্শন ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু উক্ত প্রকারে তাহার গতি লাঘব করিলে তাহা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়।

এখন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে

যে একটা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কয়টা আলোকের ঢেউ আমাদের চক্ষের উপর আসিয়া আঘাত করে তাহারি উপর প্রজ্জলিত বস্তুর আলোকের বর্ণ নির্ভর করে। মনে কর যে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ১০টা ঢেউ আমাদের চক্ষে আসিলে আমরা লাল রঙ দেখিতে পাই, আর মনে কর যে ঐ সময়ের মধ্যে ১১টা ঢেউ আসিলে আমরা পীত বর্ণ দেখিতে পাই। এখন মনে কর যে,তুমি একটা নদীর মধ্যে দাঁড়াইয়া আছ আর কিছু দূর হইতে অন্য এক জন লোক স্রোতের মুখে সমান সময়ান্তর একটা একটা করিয়া কতকগুলি জবাফুল তোমার দিকে ভাসাইয়া দিতেছে। তুমি যদি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক তাহা হইলে মনে কর যেন ১০টা জবা ফুল প্রতি সেকেণ্ডে তোমার নিকট আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু যেদিক হইতে জবাফুল ভাসিয়া আসিতেছে সাঁতার দিয়া সেই দিকে গেলে মনে কর ১১ টা জবাফুল তোমার কাছে উপস্থিত হইতেছে। কেন না তুমি চুপ করিয়া থাকিলে যে দশটা ফুল তোমার নিকটে উপস্থিত হইত তাহারা তোমার কাছে আসিবেই তাহা ছাড়া যেটা তোমার কাছে পোঁছাইত না তুমি অগ্রসর হইয়া তাহার নিকট গিয়া পোঁছাইবে। এখন যদি আমরা জানিতে পারি যে, নদীর জল কিরূপ বেগে বহিতেছে আর তুমি স্রোতের বিপরীত দিকে কি রূপ বেগে সাঁতার দিতেছ তাহা হইলে আমরা ঠিক বলিতে পারি যে কয়টা জবাফুল তুমি বেশী পাইবে। কিম্বা নদীর বেগ ও ফুলের সংখ্যা পাইলে আমরা তোমার সাঁতারের বেগ স্থির করিতে পারি; সংক্ষেপতঃ, ইহার কোন দুইটা জানিতে পারিলে আমরা তৃতীয়টা বাহির করিতে পারি। এ গণনাতে অঙ্ক শাস্ত্রের অতি অল্পই সাহায্য প্রয়োজন হয়। অগ্রসর হইবার ও অধিক সংখ্যক জবাফুল পাইবার বিষয় যাহা বলা হইল পিছাইয়া যাইবার ও অল্প সংখ্যক ফুল পাইবার বিষয়েও সে যুক্তি সংলগ্ন হইবে।

নক্ষত্র হইতে আমরা যে আলোক পাই তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধেও ঐরূপ। জবাফুল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল ঐরূপ তাহাদের সম্বন্ধেও বলা যায়। পৃথিবী কোন একটা নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী হইলে পূর্ব্বকার অনুমান অনুসারে তাহার পূর্ব্বকার লাল বর্ণ পীত বর্ণে পরিণত হইবে। আমরা আলোকের গতির বেগ জানি আমরা ঢেউয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিও জানিতেছি সুতরাং কিরূপ বেগে নক্ষত্র পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাহা আমরা অঙ্কে জানিতে পারি।

সিরিয়স নক্ষত্র পীত বর্ণ হইতে এখন ক্রমে সাদা হইয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে সাদা হইবার জন্য যে বর্ণের আলোকের অভাব ছিল অন্য বর্ণ এখন সেই বর্ণে পরিণত হইয়া সাদা বর্ণ উৎপন্ন করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রূপ ও অন্যান্য প্রকার গণনা দ্বারা কিরূপ বেগে সিরিয়স পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এক প্রকার তারা আছে তাহাদের আ-

লোক নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে পরিবর্ত্তিত হয়; ইহারা প্রথমত উজ্জ্বল থাকে তাহার পর ক্রমশ মলিন হইয়া যায়, পরে আবার উজ্জ্বল হয়।

তিমি (Whale) রাশিতে এইরূপ একটা তারা আছে যাহার নাম Mira অর্থাৎ "অদ্ভুত"। এগার মাসের মধ্যে ইহার এই সমস্ত পরিবর্ত্তন হয়। প্রথম এক পক্ষ ইহা উজ্জ্বলতাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাদের সমান থাকে তাহার পর তিন মাস ধরিয়া ইহা ক্রমশ মলিন হইতে থাকে শেষে একেবারে অদৃশ্য হয়। খালি চক্ষের কথা দূরে থাকুক অত্যন্ত ক্ষমতাশালী দূরবীনের দ্বারাও উহাকে আর দেখিতে পারা যায় না। এইরূপ পাঁচ মাস ইহা অদৃশ্য থাকে তাহার পর আবার তিন মাস ধরিয়া আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হইতে থাকে এবং পনের দিন দ্বিতীয় শ্রেণীর তারার ন্যায় কিরণ দিয়া আবার মলিন হইতে আরম্ভ হয়।

পারসিয়ুস রাশিতে Algol নাম একটা তারা আছে তাহারও আলোকের পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু এই পরিবর্ত্তন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হয় এবং ইহা কখনো একেবারে অদৃশ্য হয় না। তিন দিনের অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে Algol দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত হইয়া যায়।

কাল পুরুষের (Orion) পায়ের কাছে একটা তারা আছে তাহার নাম Betelgeuse, তাহার ঐরূপ পরিবর্ত্তন ২০০দিনের মধ্যে হয় এবং সর্প রাশির মধ্যে একটা তারা আছে তাহার ছয় দিনের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন হয়।

ইহা ব্যতীত সুমেরুর নিকট Al-Thuban বলিয়া একটা তারা আছে প্রাচীন Chaldeans ও মিশর নিবাসীদের বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে উহা তাহাদের সময় আমাদের এখনকার মেরু নক্ষত্র (Polestar) অপেক্ষাও অধিক উজ্জ্বল ছিল কিন্তু এখন উহা তৃতীয় শ্রেণীর তারা অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল নহে।

আমাদের সূর্য্যও বোধ হয় দূরস্থ অন্য কোন গ্রহ হইতে এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া বোধ হইবে। সূর্য্যে অনেক কাল কাল দাগ আছে। সূর্য্য আপনার চারিদিকে ঘুরিতেছে কাজেই যখন কোন গ্রহ হইতে সূর্য্যের কেবল মাত্র এই কাল দাগযুক্ত অংশ দেখিতে পাওয়া যায় তখন অন্য সময়ের অপেক্ষা ইহাকে মলিন দেখিতে হইবে। এইরূপ কারণবশতই উপরে উল্লিখিত তারা সকলের আলোক পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া বোধ হয়।

আর কতক তারা আছে যাহাদের আলোকের উজ্জ্বলতা ক্রমশ এমনি মিলাইয়া গিয়াছে যে, তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ইহাদের ভিতরকার আগুণ একেবারে নিভিয়া গিয়াছে কিম্বা ইহারা এত দূরে গিয়া পড়িয়াছে যে ইহাদের আলোক আর পৃথিবীতে পৌঁছাইতে পারে না কিম্বা ইহাদের অন্ধকার দিক আমাদের দিকে ফিরাইয়াছে। হয়ত আবার অনেক দিন পরে ঘুরিয়া উজ্জ্বল অংশ দেখা দিবে। ১৫৭২

খৃঃ অব্দে এইরূপ এক আশ্চর্য্য তারা দেখিয়া জ্যোতির্বেত্তারা বিস্মিত হইয়াছিলেন। ধূমকেতুকে যে তারা বলিয়া ভুল হইয়াছিল এরূপ নহে কেননা যে তারার কথা হইতেছে তাহার কেতু অর্থাৎ লেজ ছিল না এবং তাহাকে কখনো স্থান পরিবর্তন করিতে দেখা যায় নাই। এই তারা বৃহস্পতি ও সিরিয়স অপেক্ষাও অধিক উজ্জ্বল ছিল এমন কি শুক্র গ্রহ অপেক্ষাও বোধ হয় ইহার কিরণের অধিক তেজ ছিল কেননা কথিত আছে যে দুই প্রহর বেলার সময়ও ইহাকে অতি পরিস্কার রূপ দেখিতে পাওয়া যাইত। ক্রমশ ইহার আলোক মলিন হইতে লাগিল এবং অল্প দিনের মধ্যে ইহা একেবারেই মিলাইয়া গেল।

অনেক জ্যোতির্বেত্তা এইরূপ বলেন যে কোন ধূমকেতু বা গ্রহখণ্ড কোন সূর্য্যের উপর পড়িলে কিছু দিনের জন্য তাহার আলোক উজ্জ্বলতর হয়। ইহা কতদূর সত্য বলিতে পারা যায় না।

“চাঁদা আয় আয় আয়!”

রাগিণী পরজ কালাংড়া।

বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে।
ধরে না হাসি রাশি আননে।
ঝুরু ঝুরু মৃদুবায়
কুন্তল উড়িয়ে যায়,
“চাঁদা আয়, আয় আয়” চায় গগনে।
ধরিয়ে মায়ের গলে
“দেখায়ে চাঁদ দে মা” বলে,
কাঁদ' কাঁদ' আধ' আধ' বচনে।
কাছে কাছে গাছে গাছে
ফুল সব ফুটিয়াছে
করতালি দিয়ে নাচে সঘনে!
হেসে হেসে দুলে দুলে
চুম খায় ফুলে ফুলে
চুম' খায় ধেয়ে মায়ের বদনে।

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

হৃদয় মন্থন।

জনৈক সন্ন্যাসী প্রেরিত।

আমরা হরিদ্বারের মেলা দেখিয়া এখন কেদারেশ্বরের মন্দিরে যাত্রা করিতেছি। হরিদ্বার হইতে কেদারেশ্বরের মন্দির প্রায় ১৫।১৬ ক্রোশ উত্তরে, এবং সে স্থান হইতে হিমাচলের দৃশ্য অতি মনোহর। এক দিকে হরিদ্বর্ণ তরুশ্রেণী স্তরে স্তরে হিমালয়ের চরণদিকে নিম্নগামী হইয়াছে, আবার অন্যদিকে শৈলের উপর শৈল মালা, শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গরাজি, অনন্ত তুষারাবৃত হইয়া প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে আকাশ ভেদ করিয়া কোথায় যে উঠিয়াছে তাহা যেন দেবতারাও বলিতে পারেন না। সৌন্দর্য্য ও মহান্ ভাবের এমন সম্মিলন-স্থল আর কোথাও নাই। একদিকে সৌন্দর্য্য ও মর্ত্ত্যলোক, অপর দিকে মহান্ গাম্ভীর্য্য ও অমর লোক,—এই বিচিত্র সন্ধিস্থলে দেব দেব কেদারেশ্বর অধিষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু কেদারেশ্বরের মন্দিরে পৌঁছিতে এখনো আমাদের দুই তিন দিন লাগিবে। এত দিনে আমরা হরিদ্বার হইতে প্রায় দশ ক্রোশ উত্তরে আসিয়াছি।

আজ পূর্ণিমার রাত্রি। এখানে আমি, পুণ্যবতী ও সুরেন্দ্র একটি পুরাতন মহীরুহের তলায় বসিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া এই দ্বিপ্রহর রাত্রে পরস্পরের মনের কথা কহিতেছি। বলা বাহুল্য যে সুরেন্দ্রকেও আমরা সহযাত্রী করিয়া লইয়াছি। এই গভীর নিশীথে এরূপ স্থানে অগ্নি জ্বালাইয়া হৃদয় খুলিয়া হৃদয়ের কথা বিনিময় করিতে যে কি অপার আনন্দ হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা অনুভবও করিতে পার না। সাগরে নিক্ষিপ্ত ছিন্ন তৃণ যেমন তরঙ্গবেগে বেলাভূমিতে আসিয়া পড়িয়া থাকে, আমরাও সেইরূপ সংসারের তরঙ্গে বিতাড়িত হইয়া নির্জ্জন এই হিমালয় প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি। এখান হইতে আমাদের রোদন সংসারের আর কেহই শুনিতে পাইবে না, সংসারের আর কাহারও রোদন আমরাও শুনিতে পাইব না। বাস্তবিক আমরা কি সুখী। একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি—দেখি যে চারিদিক যেন এক অপূর্ব্ব মোহমন্ত্রে মুগ্ধ, সমস্ত প্রকৃতি জ্যোৎস্নাময়, সেই জ্যোৎস্না যেন নিদ্রাময়,—সেই নিদ্রা যেন স্বপ্নময়—সেই স্বপ্ন যেন প্রমোদময়। সুদূরে সূত্রবৎ জাহ্নবী দেবী চূর্ণিত চন্দ্রমা মাখিয়া সুষুপ্ত রহিয়াছেন। কোথাও নিকটস্থ লতাপল্লবে সেই নিদ্রিত জ্যোৎস্না, থাকিয়া থাকিয়া যেন উত্তর বাতাসে চমকিয়া উঠিতেছে, আবার কোথাও বা সুদূরে নীহাররাশির মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া শীতলতা-প্রভাবে সেই জ্যোৎস্না যেন জমাট হইয়া গিয়াছে। আ-

বার চক্ষু নিমীলন করিয়া দেখি—দেখি যে হৃদয়েও সেই স্বপ্নময় জ্যোৎস্নাভাস। সমস্ত হৃদয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখি—দেখি যে, তাহাতে শত সহস্র লোকের মন রাখিয়া চলিবার হীন অভিলাষ, ধন বা সম্মান উপার্জ্জনের অকিঞ্চিৎকর লালসা, দীন হীন ভিক্ষুকদের পর্য্যন্ত নিন্দাভাজন হইবার ভয়, এসকল কিছুই আর নাই—সুদূরে ঐ মন্দাকিনী যেমন শতমুখী হইয়া সাগর-গর্ভে পড়িয়াছেন, হৃদয়ের সহস্র ভাবও সেইরূপ এখানে কেবল সেই মহামায়ার চরণে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। এখানকার বায়ু পৃথিবীর নিঃশ্বাসে দূষিত নহে, এখানকার পবিত্রতা পৃথিবীর স্পর্শে কলঙ্কিত নহে। এখানে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়,ত সে জীবন কেবল মহামায়ার আরাধনায় যাপিত হইবে, আর এখানে যদি মরিতেও হয়, ত সে জীবন কেবল মহামায়ার চরণেই অর্পিত হইবে। এখানে জীবদ্দশায় আনন্দ, মৃত্যুতেও নিশ্চিন্ততা, সেই নিশ্চিন্ততাতেই স্বর্গ-সুখ।

কিন্তু সুরেন্দ্রের কথা সকল শুনিয়া অবধি আমার মনে এক দারুণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এখনও আমি সুরেন্দ্রের সকল কথা শুনি নাই—সুরেন্দ্র কেন যে চন্দন গ্রামের ধনশালী সদ্বংশীয় ভূম্যধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও কঠোর-হৃদয় দস্যুদের নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি আমি শুনি নাই। সুরেন্দ্র সকল কথা বলিতে এখন লজ্জিত হন। তোমরা মনে করিতে পার যে সুরেন্দ্র তত সরল ও মুক্তকণ্ঠ নহেন। কিন্তু সে কথা আমি স্বীকার করি না। সরলতা ও মুক্তকণ্ঠতা তোমাদের মতে যতই প্রশংসার সামগ্রী হউক না কেন; আমার মতে পূর্ণমাত্রায় সরলতা ও মুক্তকণ্ঠতা সংসারে অসম্ভব। এ কথা অবশ্য আমি স্বীকার করি যে, ব্যক্তি-বিশেষের কাছে—হৃদয়ের প্রণয়িনীর কাছে, প্রাণের বন্ধুর কাছে সরল ও মুক্তকণ্ঠ হওয়া যাইলেও যাইতে পারে, কিন্তু তাহাই বা কতদূর সম্ভব? আশৈশব বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত মানুষের মনে কি এমন ভাব উদয় হয় না, ভ্রম বা অদূরদৃষ্টি-বশত বা মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার আতিশয্য বশত সেই সকল ভাব কি এমন কার্য্যে পরিণত হয় না যে সেই সকল ভাব বা সেই সকল কার্য্য স্বীয় স্মৃতিপটে পুনরুদ্দীপিত দেখিতে বা স্বীয় হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীকে জানাইতে পর্য্যন্ত শরীরের রক্ত তুষারময় হইয়া যায়? তোমরা মনে করিতে পার যে আমি কি ভয়ানক গূঢ় কথা ভাবিয়াই এত কথা বলিতেছি—কিন্তু তোমরাই বল দেখি যে হৃদয় বিশেষে একটি সামান্য অন্যায় কার্য্য পর্য্যন্ত কি ভয়ানকরূপে মর্ম্মঘাতী হইয়া দাঁড়ায়? যদি আপনাকে আপনি জানিতেই অনেক সময়ে লজ্জিত হইতে হয়, তাহা হইলে অন্যের নিকটে পূর্ণমাত্রায় মুক্তকণ্ঠ হওয়া কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং এ বিষয়ে সুরেন্দ্রকে আমি কোন মতেই দোষী করিতে পারি না। কিন্তু যাহাই হউক। সুরেন্দ্রের যে সকল

কথা শুনিয়াছি তাহাতেই আমার হৃদয় কেমন একপ্রকার চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিদ্রাবেশে একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখিয়া সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেমন সেই অলীক স্বপ্নটীও কতকটা বাস্তবিক বলিয়া প্রতীত হয়, সেই রূপ সুরেন্দ্রের মুখে পৃথিবীর নানা প্রসঙ্গ শুনিয়া আমার সহসা মনে হইতে লাগিল যে আমি যেন সেই কঠোর পৃথিবীতে আজও আছি। কোথায় হিমালয়ের প্রশান্ত ও অটল গাম্ভীর্য্য,আর কোথায় বা সেই পৃথিবীর তরল তরঙ্গভঙ্গ! কিন্তু এই মহান্ প্রদেশে থাকিয়াও কেন আমার উদাসীন হৃদয় আজ সুরেন্দ্রের কথায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। বোধ হয় আমি আজিও প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাসী হইতে পারি নাই, নহিলে কেন আজ সন্ন্যাসীর কঠোর ব্রতের বিঘ্ন করিয়া সংসারের স্বপ্নময় মোহদৃশ্য সকল আমার স্মৃতিপটে সজীব ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল! কোথায় সেই হৃদয়ের বন্ধু—কোথায় সেই প্রাণের প্রণয়িনী—কোথায় সেই আদরের কুসুম-কলিকা—আহা, সে সকল কেন আবার জাজ্জ্বল্য ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। —দেব হিমালয়! কেনই বা তুমি এই মৃত্তিকা-ময় দুর্ব্বল-হৃদয় মানুষকে আশ্রয় দিয়া তোমার মহত্বের অবমাননা করিতেছ? উঃ, আমি কোন কালেই কাহারও যোগ্য হইতে পারি নাই ও পারিলাম না! ইহা আমি বুঝিয়াছিলাম—ইহার জন্যই আমি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে—হে হিমাচল! আমি তোমারও অযোগ্য! এখনো যদি তোমার কঠোর মহান্ ভাবে আমার হৃদয়ের শৈশব ক্রীড়া শমিত না হইল, এখনো যদি তোমার এই বিকট বিজনতায় হৃদয় বৈরাগ্যে দীক্ষিত না হইল, এখনো যদি তোমার এই প্রশান্ত দেব-ভাবে মনের পার্থিব ভাব সকল নির্ম্মূল না হইল, তবে আমার সন্ন্যাস-ব্রত আড়ম্বরমাত্র। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী হইলেও মানুষ ত বটে, মানুষ বলিয়াই দুর্ব্বল-হৃদয়, দুর্ব্বল-হৃদয় বলিয়াই আজ সংসারের নানা কথা শুনিয়া এরূপ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছি। শৈশবে যে সংসার আমাদের শুশ্রূষার স্থল—বাল্য কালে যাহা আমাদের ক্রীড়ার বিনোদ-ক্ষেত্র—যৌবনে যাহা আমাদের প্রমোদের আনন্দ-কানন—সে সংসার আমরা সহজে কেমন করিয়া ভুলিতে পারি? বন্ধুদের চপলতায় ভগ্নহৃদয় হইয়া—মমতাময়ীদের নির্ম্মমতায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া—মর্ম্মঘাতী অভিমানে জর্জ্জরিত হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করা সহজ বটে—কিন্তু রীতিমত পালন করা কি কঠিন ব্যাপার! দুঃখের বিষয়-এই যে, এই সংসারে পরাধীনতাই আমাদের সুখের নিদান। যাহারা যশঃপ্রার্থী, তাহারা সামান্য দাস-দাসীদের পর্য্যন্ত দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাসের অধীন, যাহারা ধন ভালবাসে, তাহারা সামান্য পণ্যবাহকদের পর্য্যন্ত হিসাবের অধীন, যাহারা উচ্চ পদ ভাল বাসে, তাহারা অকিঞ্চিৎকর উচ্চপদস্থ লোকদের অনুজীবীদিগের পর্য্যন্ত অধীন,

ইহার উপরে আবার সকলেই অদৃষ্টের অধীন, অথচ "স্বাধীনতা. স্বাধীনতা" করিয়া পৃথিবীর মধ্যে মহা হুলস্থূল! কোন্ বিষয়ে আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা আছে? অর্থাৎ, কোন্ বিষয়ে স্বাধীনতা নিবন্ধন আমাদের প্রকৃত সুখ আছে? দিব্য চক্ষুতে দেখিতে গেলে দেখিতে পাইবে যে পরাধীনতাতেই মানুষের প্রকৃত সুখ! মনে কর, আমার এই হৃদয় এখনো স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেছে,—স্থল-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের অধীন না হইয়া অসীম আকাশে বিচরণ করিতেছে! —কিন্তু এই স্বাধীন হৃদয় লইয়া আমি কি সুখী? না, কখনই না! স্বাধীন হইয়াও আমি এই পরাধীনতার অভিলাষ করি যে, আমার মনের মত কেহ আমার এই স্বাধীন-প্রাণ হৃদয়কে পিঞ্জরাবদ্ধ করুক—অসীম আকাশে আলুলায়িত এই স্বাধীন হৃদয়কে চতুর্দিক হইতে সংযত করিয়া কারারুদ্ধ করুক ও এই অসংযত হৃদয়ের চরণে অবিচ্ছেদ্য শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখুক।—ইহাই সংসারে প্রেমের সুখ এবং ইহাই এই হিমাচলে-ধর্ম্মের সুখ!

ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল—তখন আমি সুরেন্দ্র ও পুণ্যবতীকে বলিলাম যে "গুরুদেব বীরশ্রেষ্ঠ আমাদের অগ্রে হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ দূর কন্দরে বাস করিতেছেন, আজও পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই,—আইস, অবশিষ্ট রাত্রি তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রালাপে কাটাইয়া দেই"। এই কথাতে সুরেন্দ্রের মুখ অতিশয় গম্ভীর—অতিশয় বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিল। তাহা দেখিয়া আমি সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "সুরেন্দ্র! গুরুদেবের সহিত এই রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে তোমার কি ইচ্ছা নাই?"

সু। না,—আরও কিছু দিন না অতীত হইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার কোন মতেই সাহস হইবে না। আমার মত পাপিষ্ঠকে তাঁহার সম্মুখে লইয়া যাইয়া কেন তাঁহার অপমান করিবেন?

আ। কিন্তু এখন তুমি যখন আমাদের মতই সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছ; তখন তুমি আর কেন এতদূর সঙ্কুচিত হইতেছ! মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া পাপে লিপ্ত কে না হয়? এক দিকে পৃথিবীর ভয়ানক প্রলোভন, অপর দিকে হৃদয়ের দারুণ দুর্ব্বলতা, ইহাতে মনুষ্য যে ক্ষুব্ধ সাগরে জীর্ণ নৌকার ন্যায় ভগ্ন চূর্ণ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! অনেকে বিস্তর আড়ম্বর করিয়া আপনাদের অন্যায় কার্য্য সকল ঢাকিতে যায় বটে, অনেকে ন্যায়শাস্ত্রের কুটিল তর্কবিতর্ক দ্বারা আপনাদের অন্যায় কার্য্য সকল ন্যায়-কার্য্য রূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহে বটে, অনেকে আপনাদের মনকে পর্য্যন্ত প্রবঞ্চনাময় যুক্তি দ্বারা প্রতারিত করিয়া অনুতাপের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে প্রয়াস পায় বটে, কিন্তু হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বদাই জাগ্রত রহিয়াছেন,—সেই দেবীকে কে প্রবঞ্চনা করিতে পারে? তবে সু-

রেন্দ্র! তুমি পাপিষ্ঠ বলিয়া কেন আজ গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এত সঙ্কুচিত হইতেছ?

সু। কেবল পাপিষ্ঠ বলিয়া নয়, কিন্তু দেব! আমি তাঁহারই কাছে ঘোর অপরাধে অপরাধী আছি, সেই জন্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোন মতেই আমার সাহস হইতেছে না।

আ। সে কি, সুরেন্দ্র! আমি ত তোমার কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সু। দেব! আমি তাঁহার কাছে যে অপরাধে অপরাধী তাহা এখন স্মরণ করিতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

পুণ্য। না, সুরেন্দ্র! তোমার সে বিষয়ে কিছুই ভয় নাই। তুমি কি মনে কর আমার পিতা এতদূর কঠোর-হৃদয় যে এখন তিনি তোমার সেই অপরাধ মনে করিয়া তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন? কখনই নয়! যাঁহার হৃদয় মমতায় গঠিত, ধর্ম্মে উজ্জ্বল, বৈরাগ্যে প্রসারিত, স্বর্গ-লোকের চিন্তায় উন্নত, তিনি কি আজ তোমার অনুতাপের পবিত্র হোমাগ্নি দেখিয়াও পূর্ব্বভাবে থাকিবেন?

সু। পুণ্যবতি! তোমার কি সেই ভাদ্রমাসের অমাবস্যার গভীর রাত্রি মনে নাই?

পুণ্য। না, আমার কিছুই মনে নাই—আমার মনে থাকিবার কথা নাই—কারণ, আমি কে? কিন্তু সেই অমাবস্যার গভীর রাত্রি আজও পর্য্যন্ত আমার মর্ম্মস্থল ছাইয়া আছে—উঃ—কি ভয়ানক রাত্রি।

আ। পুণ্যবতি! তোমার অভিমানের এই অসংলগ্ন কথাতেই, তোমার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু—

পুণ্য। দেব! আপনি আমার হৃদয়ের ভাব ভুল বুঝিয়াছেন।—অভিমান? অভিমান আর আমার নাই—কারণ পার্থিব প্রেম-লালসা আর আমার হৃদয়ে নাই—এখন আমি এই হিমাচল অপেক্ষাও কঠোর—ঐ তুষাররাশি অপেক্ষাও শীতলতর! অথচ—অথচ—অথচ—সেই ভয়ঙ্কর অমাবস্যার দ্বিপ্রহরা রাত্রি এখনো আমার মর্ম্মের স্তরে স্তরে—

আ। পুণ্যবতি! যদি সেই রাত্রির কথা এই নির্জ্জন স্থানে আমাকে বলিতে এতই তোমরা উভয়েই সঙ্কুচিত হও তাহা হইলে আর সে কথায়—

পুণ্য। দেব! আপনি রাগ করিবেন না, আমি সকল কথা বলিতেই প্রস্তুত আছি। কিন্তু সুরেন্দ্র—সুরেন্দ্র

সু। ভাই পুণ্যবতি! তুমি কেন এত সঙ্কুচিত হইতেছ? বল, বল, আমাদের সকল কথাই তুমি বল—দেখিব, আজ সকল কথা বলিয়াও যদি এই অশান্তিময় হৃদয় শান্ত হয়।

পুণ্য। ভাল, আমিই তবে সকল কথা বলিতেছি। যে কথা আমি এত দিন পর্য্যন্ত মরমের নিভৃত গহ্বরে নিহিত রাখিয়াছিলাম, তাহা আজ প্রকাশ করিতে অনুমতি পাইয়াছি—তবে আর আমার কিসের সঙ্কোচ? কিন্তু দেব! সে সকল কথা তুলিতে গেলে পুরাতন যাতনা আবার

যেন নূতন তেজে জ্বলিয়া উঠে! তবে যদি বলিতেই হয়, ত সকল কথাই বলিব,—তাহা হইলেও বোধ হয় হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক যাতনার অনেক উপশম হইবে। দেব! পিতা আমার জন্মাবধিই প্রকৃত সন্ন্যাসী —আমার অষ্টম বৎসর বয়সে মাতার মৃত্যু হয়—সেই অবধি তিনি লোকালয়ে আর বাহির হইতেন না, কাহারও সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখিতেন না, সদা সর্ব্বদাই কঠোর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। আমরা কুলে শীলে চন্দনগ্রামের মহা প্রবল জমিদারদিগের সমকক্ষ ছিলাম, কিন্তু আমরা দরিদ্র, আর তাঁহারা ধনবান! কিন্তু আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা দরিদ্র হইলেও, আমাদের ঐশ্বর্য্যও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল না। আনত মুখে আমাদিগকে কখন কাহার দ্বারস্থ হইতে হইত না। আমাদের বিজন ভবন, আমাদের সসাগরা পৃথিবী ছিল;—সঙ্কীর্ণ তুলসীমণ্ডপই আমাদের ধর্ম্মের নন্দনকানন ছিল, পিতার সহবাসই আমার পক্ষে দেবতার সহবাস ছিল!—আহা, কি সুখের সময়!—আমি আপনার মনে খেলিতাম, আপনার মনে নৃত্য করিতাম, আপনার মনে আনন্দে চীৎকার করিয়া পিতার ধ্যানভঙ্গ করিতাম,—কিন্তু মমতাময় পিতা ধ্যানভঙ্গে বিরক্ত না হইয়া বরং ঈষৎ-বিস্ফারিত নেত্রে ইঙ্গিতে আমাকে ডাকিয়া, আমাকে অঙ্কে লইয়া, আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আমাকে যেন মর্ম্মে বিজড়িত করিয়া উচ্ছ্বসিত স্নেহে আমাকে চুম্বন করিতেন——উঃ কি স্বর্গ-সুখই আমি হারাইয়াছি! কখন বা পিতা আমার অর্থশূন্য—উদ্দেশ্য-শূন্য কৌশল-শূন্য রঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া, আমার দিকে সজল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া যেন অতি কষ্টে বলিয়া উঠিতেন—"বুদ্ধদেব! তুমিই ধন্য!"—আমি একথার অর্থ কিছুই বুঝিতাম না, তবুও যেন এই কথা গুলি উচ্চারণেই আমি কেমন এক প্রকার জড়সড় হইয়া পড়িতাম। কিন্তু জনকের পরক্ষণের আদরেই আমি সকল ভুলিয়া যাইয়া এই ভাবিতাম যে আমার মত কে আর সুখী আছে! পিতা প্রায়ই আমাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া সস্নেহ ভাবে বলিতেন যে "মা, তোমাকে একটি উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিয়া আমি চির জীবনের জন্য সংসারের কাছে বিদায় লইব!" এইরূপে বিমল স্নেহের ক্ষেত্রে, মনের বিমল আনন্দে আমার দ্বাদশ বর্ষ কাটিয়া গেল! আমিও বাড়ির বাহিরে কোথাও যাইতাম না, পিতাও শেষ রাত্রে গঙ্গাস্নান ব্যতীত বাটীর বাহিরে কোথাও যাইতেন না। এক দিবস পিতার অসুখ হওয়াতে আমি তাঁহার জন্য গঙ্গাজল আনিতে গঙ্গায় গিয়াছিলাম,—তখন প্রভাত হয় নাই। গঙ্গাতীরে আসিয়া দেখিলাম যে একটি অতি কদাকার যুবক ও একটি অতি সুন্দরী যুবতী গঙ্গার ঈষৎ আন্দোলিত উর্ম্মিমালা ভঙ্গ করিয়া গঙ্গার বক্ষে সন্তরণ করিতেছে। উভয়ের হাসির ধ্বনিতে গঙ্গা প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে; উভয়ের উল্লাসে সমস্ত গম্ভীর ধরণী যেন প্রগল্ভ হইয়া উঠিতেছে—এবং উভয়ের আনন্দ

কিরণে যেন সমস্ত অন্ধকার আলোকিত হই-তেছে। আমি পিতার জন্য গঙ্গাজল তুলিয়া আনিতেছি, এমন সময় সেই যুবক আসিয়া আমার অঞ্চল ধরিয়া কহিল "সুন্দরি, কোথায় যাইতেছ।" আমি পশ্চাদ্ভাগে ফিরিয়া দেখি যে সেই উল্লাসময় কদাকার যুবক আজ———পিছনে দণ্ডায়মান! আমার মুখে আর কথা সরিল না, সেই বিকটাকার পিশাচকে দেখিয়া আমার প্রাণ যেন প্রাণের ভিতর শুষ্ক হইয়া যাইল।—এখনও তাহার সেই জবাফুল-সদৃশ নয়নদ্বয়, সেই উগ্র বরাহের মত মাথার কুন্তল-কণ্টক, সেই বিকট দশন ও সেই পীনোন্নত গণ্ডস্থল আমার মনে যেন জাগরূক রহিয়াছে। তাহাকে আমার অঞ্চল ধারণ করিতে দেখিয়াই আমি ভয়ের আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম; আর অমনি সে পাষণ্ড আমার অঞ্চল ছাড়িয়া দিল। তখন আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু গৃহের কবাট রুদ্ধ করিতে গিয়া দেখিলাম যে সেই নিশাচর অদূরে একটি বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া আমাদের বাড়ির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। সেই পাষণ্ডের ভয়ে আমি প্রায়ই আর গঙ্গাতীরে যাইতাম না, কদাপি কখন নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃ যখনই যাইতাম, তখনই দেখিতাম যে সে আমাকে অনুসরণ করিতেছে। পরিশেষে পিতাকে আমি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনি গঙ্গাতীরে যাইতে আ-মাকে বিশেষরূপে নিষেধ করিলেন। আমিও সেই নিষেধ অনুসারে গঙ্গাতীরে যাওয়া দূরে থাকুক, বাটীর বহির্দ্বারেও আর যাইতাম না।

এইরূপে দুই এক বৎসর গত হইল। আমি পিতার সেবাতেই থাকি, পিতাও আমাকে আদর করিয়া ও পূজাধ্যানে আসক্ত থাকিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন শারদীয় প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলেই শুনিলাম যে রাজপুত্র সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যা-অধ্যয়ন শেষ করিয়া বারাণসী হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। লোকদের আর আহ্লাদের সীমা নাই, নহবতের আকাশ-ভেদী শব্দে, প্রজাদের আনন্দ-নিনাদে, দিকদিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমি পিতার কাছে এই অনুনয় করিলাম যে আমি রাজপুত্রকে এক দিন দেখিব। তাহাতে পিতা বলিলেন যে "বৎসে, তা-হাকে তুমি কিরূপে দেখিবে? তিনি যখন আমোদ আহ্লাদ পরিত্যাগ করিয়া কেবল আপন মনে মাতার জন্য গম্ভীর চিন্তায় বিরলে দিন যাপন করেন, তখন তাঁহাকে কোথায় আর দেখিবে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে তাঁহার এই বিষাদের কারণ কি? তাহাতে তিনি বলিলেন যে "রাজ-কুমার সুরেন্দ্রের মাতা অনেক দিন হইল আত্মঘাতী হইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। রাজার প্রধান দেওয়ান—আপন সুন্দরী কন্যার সহিত রাজার বিবাহ দিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য প্রধানা রাণীর বিরুদ্ধে বিস্তর ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। পতিব্রতা ইন্দুমতীর নামে দেশ বিদেশে

অশ্রাব্য নিন্দা প্রচার করিতে থাকে, সেই সকল নিন্দাধ্বনির প্রতিধ্বনি নানা প্রকার অলঙ্কারে স্ফীত হইয়া রাজার শ্রবণে প্রবেশ করে। কিন্তু অজ্ঞান শিশু, উন্মাদ, সুরা-উন্মত্ত ব্যক্তি ও বৃদ্ধ বয়সে প্রণয়-কাঙ্গাল একই উপাদানে গঠিত। তাহারা বিন্দুমাত্র বিচার না করিয়া আপনাদের মনের ঝোঁকে লোক-প্রবাদ বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করে। বৃদ্ধ রাজা ইন্দুমতীর কলঙ্কের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। পতিব্রতা ইন্দুমতী, আপন প্রেমের অপমান দেখিয়া, বৃদ্ধ রাজার স্নেহে অবনতি দেখিয়া, দেশ বিদেশে আপন নামের কলঙ্ক রটনা দেখিয়া, অভিমানে আত্মহত্যা করিলেন। তখন রাজকুমার সুরেন্দ্রনাথ বারাণসীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি এ সকল কথার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। তিনি কেবল এই মাত্র জানিতেন যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু দেশে ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পারিলেন যে,অমূলক লোকপ্রবাদে তাঁহার মাতা স্বহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমি কুমারের বাল্যকালে কুমারকে অত্যন্ত ভাল বাসিতাম এবং অত্যন্ত যত্নে তাঁহাকে সংস্কৃত শিখাইতাম। তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়সে রাজা তাঁহাকে বারাণসী ধামে প্রখ্যাতনামা মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপক সোমাচার্য্যের নিকট বেদান্ত দর্শন ও সাহিত্য পাঠ করিতে প্রেরণ করেন। আজ দ্বাদশ বৎসরের পরে আবার সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমি সে দিন গোপনে কুমারের সহিত পূর্ব্ব অনুরাগ বশতঃ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু কুমারের অতুল ব্যুৎপত্তি ও বুদ্ধির অতুল প্রাখর্য্য দেখিয়া যেমন আহ্লাদিত হইলাম, তেমনি আবার তাঁহার সেই প্রশস্ত ললাটের বিষাদ-রেখা ও আকর্ণ-বিস্ফারিত চক্ষুর সজল ভাব দেখিয়া মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলাম। তরল মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণ চন্দ্রের মত তাঁহার মুখের সুদীন বিষন্ন ভাব মনে পড়িলে এখন আমার চক্ষে জল আইসে—আহা, লোক নিন্দায় পতিব্রতা ইন্দুমতী যে দিন আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইলেন সেই দিনের কথা আজও যেন আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে—

আ। কিন্তু লোকনিন্দায় কেনই বা রাণী ইন্দুমতী প্রাণত্যাগ করিলেন?—অকিঞ্চিৎকর ইতর লোকদের নিন্দায় এক জন সহৃদয় ব্যক্তি কেনই বা এতদূর অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমার জীবনের যদি সমস্ত সুখ প্রত্যেক সামান্য ব্যক্তির সামান্য অপেক্ষাও সামান্যতর নিঃশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে আমার জীবনের মূল্য?

আমি লোক-নিন্দার অমোঘ শক্তির কথা পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমাদের সহচর সন্ন্যাসীদের নিকটে শুনিয়া ছিলাম বটে কিন্তু মনের সহিত তাহা কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতেই পারি নাই,—আজ ইন্দুমতীর আত্মহত্যার কথা শুনিয়া আমি বাস্তবিক স্তম্ভিত হইয়াছি।

সু। দেব!—আপনি কেন যে স্তম্ভিত হইলেন, তাহাই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আজ এই মহান-মূর্ত্তি হিমালয়ের নিভৃত হৃদয়ে বসিয়া লোকনিন্দাকে তৃণ-জ্ঞান করিতে পারেন বটে, কিন্তু আপনি আজই যদি সংসারের কোলাহলময় তরঙ্গ ভঙ্গের উপরে ঝাঁপ দিয়া পড়েন, ত দেখিতে পাইবেন যে চন্দ্র যেমন সূর্য্যের আলোকে আলোকিত, ও সূর্য্যের অদর্শনে অন্ধকারময়, সেই রূপ অপরের নিঃশ্বাসই আমাদের জীবনের সুখ দুঃখের নিদানভূত। আপনি এই কঠোর অথচ প্রশান্ত প্রদেশ ছাড়িয়া যদি পৃথিবীর সমস্ত শ্মশানক্ষেত্র বিচরণ করেন, এবং বিচরণ করিয়া প্রত্যেক জ্বলন্ত বা নির্ব্বাপিত চিতা তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন, ত দেখিতে পাইবেন, শত সহস্র পতিব্রতার চিতা ধূম এই কথা জগৎ সমীপে প্রচার করিতেছে যে "আমরা আজ অন্যায় নিন্দায় প্রাণত্যাগ করিলাম!" উঃ, সে সব কথা থাক্!—দেব! কেবল আমি এই আপনাকে বলিতে চাই যে সংসারে কাহারও জীবন নিজের জীবন নহে,—নিজের জীবন অন্যের কথায়, নিজের আয়ুঃ অন্যের নিঃশ্বাসে, নিজের সুখ দুঃখ অন্যের কল্পনা অথবা অন্যের "খেয়ালে" নির্ভর করে!

আ।—আমি আপনার কথা মানিলাম! সামাজিক ব্যক্তিরা সমাজের প্রতি-হিল্লোলে আন্দোলিত হয়,কিন্তু ছিন্ন তৃণের মত সংসারের প্রতি-লহরীতে আলোড়িত হওয়া অপেক্ষা বদ্ধমূল পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা কি জীবনের মহান ভাবের পরিচয় নহে? এই মহান ভাব না থাকিলে গেলিলিয়োর দ্বারা পৃথিবীর গতি নির্ণয় হইত না, এই মহান ভাব না থাকিলে লুথরের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের সারাংশ কখনই প্রচারিত হইত না। পৃথিবীর সকল উন্নতিই পৃথিবীর সামান্য লোকদের নিঃশ্বাসে মুহূর্ত্ত কালের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে—পৃথিবীর সকল উন্নতিই অবশেষে সেই সামান্য লোকদের নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। যদি আজ অকিঞ্চিৎকর লোকদের ঈর্ষামেয় নিঃশ্বাসের দ্বারা পৃথিবীর উন্নতির গতিরোধ হইতে পারিত, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্য জন্মাইয়া, ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিষয়ে কোপর্নিকস্ বা লাপ্লাস্ জন্মাইয়া সমাজে একটি ক্ষুদ্র উর্ম্মিও উত্থাপিত করিতে পারিতেন না।

পু। কিন্তু আমি পৃথিবীর মহান্ উন্নতির কথা কহিতেছি না। আমি কেবল সামান্য সুখ দুঃখের কথা কহিতেছি—আপনি যদি আজই সমাজে ফিরিয়া যান, ত দেখিতে পাইবেন যে দয়ার প্রত্যেক হিল্লোল, প্রেমের প্রত্যেক বিকম্পন, অপরের নিঃশ্বাসের উপরই নির্ভর করিতেছে।

আ। এ কথা যদি সত্য হয় ত সাংসারিক বা সামাজিক জীবনকে আমি হৃদয়ের সহিত হেয় জ্ঞান করি।

সু।—কিন্তু আপনাদের তর্কে আমি পড়িতে চাই না;—আমি পৃথিবীর মধ্যে

এই মাত্র কেবল জানিতে চাই যে আমি যাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি, তিনি আমাকে কতদূর ভাল বাসেন। ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হইতে পারে, সমাজ সমাজ হইতে পারে, বিস্তর লোক বিস্তর লোক হইতে পারে, কিন্তু প্রেমিকে প্রেমিকে মিলন হইলে, উভয়ের হৃদয়ই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাণ্ড, উভয়ের মর্ম্মান্তিক কথাবার্ত্তাই পৃথিবীর সমগ্র নিঃশ্বাস, এবং উভয়ের হৃদয়-হিল্লোলেই সমস্ত ত্রিভুবনের অস্তিত্ব! আমার জীবনের ঘটনা হইতেই আমি তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু আপনাদের তর্ক-স্রোতে আমি ত স্থলই পাইতেছি না।

আ। পুণ্যবতি! বল, তোমার জীবনের কথাই বল,—আমি শুনিব।

পু। ভাল, আমি বলিয়া যাইতেছি—শ্রবণ করুন!

এই সময়ে পশ্চিম দিকে এক খানি মেঘের রেখা দেখিতে পাইলাম, দেখিতে না দেখিতে তাহা গাঢ়তর—অন্ধকারতর—উন্নততর হইয়া দিগন্তব্যাপিনী হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে উত্তর বায়ু দ্বিগুণ প্রতাপে বহিতে লাগিল, হিমালয়ের শিখর-চ্যুত শিলা-রাশি সদর্পে কন্দরভূমিকে বিকম্পিত করিতে লাগিল, সমগ্র হিমালয়-প্রদেশ বিভীষিকা মূর্ত্তি ধারণ করিল,—আমাদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, সুতরাং পুণ্যবতীর কথা আর অধিক শুনা হইল না।

ক্রমশঃ

পৃথিবীর পরিণাম।

পৃথিবী-জাত সকল বস্তুই পরিবর্ত্তন-নিয়মের-বশবর্ত্তী হইয়া জন্ম, জীবন ও মৃত্যু, এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সকল বস্তুই যে সমান সময়ে এই তিন অবস্থা পায় এমন নহে। আমরা যে সময়কে এক মুহূর্ত্ত বলি সেই সময়ের মধ্যেই অনেক কীট পতঙ্গ এই তিন অবস্থা অতিক্রম করে। জন্ম হইতে মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী কালকে জীবন কহা যায়। পৃথিবী-জাত সকল বস্তুই এই নিয়মের অধীন, কিন্তু পৃথিবী নিজে এই নিয়মের অধীন কি না? পৃথিবীর জীবনের বিষয় আমরা জানি কিন্তু ইহার মৃত্যু হইবে কি না তাহা আমরা জানি না; আবহমান কাল হইতে পৃথিবীকে আমরা যেরূপ সমভাবে চলিতে দেখিয়া আসিতেছি তাহাতে আপাততঃ মনে হয় পৃথিবী মৃত্যুর আয়ত্তাধীন নহে।

এখন, দেখা যাক পৃথিবীর ন্যায় একটা গ্রহের জীবন ও মৃত্যু বলিলে কি বুঝায়। পৃথিবীর এখনকার অবস্থাই

ইহার জীবনের অবস্থা। এখন পৃথিবীতে উদ্ভিজ্জ জন্মাইতেছে, নদী বহিতেছে, সমুদ্র তরঙ্গিত হইতেছে; এখন দিনের পর রাত আসিয়া, ঋতুর পর ঋতু আসিয়া, পৃথিবীকে জীব জন্তুর বাসোপযোগী করিয়াছে; এক কথায়, এখন পৃথিবীতে যাহা হইতেছে তাহাতেই তাহার জীবনের অস্তিত্ব জাজ্জ্বল্যমান। এই অবস্থার অভাবের নামই মৃত্যু। এই অবস্থার অভাব হেতুই চন্দ্রকে আমরা মৃত গ্রহ বলি। *

পৃথিবীর বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম বস্তু ভেদ করিয়া যাইতে হইলেও তাহাতে বাধা পাইয়া আলোকের তির্য্যগ্ গতি (Refraction) হয়। কিন্তু চন্দ্র হইতে আলোক আসিবার সময় তাহার তির্য্যক গতি হয় না। ইহা হইতেই জানিতে পারা যায় যে চন্দ্রে বায়ু নাই, আর যদিই বা থাকে, তাহা অত্যন্ত লঘু। অত্যন্ত লঘু বায়ুতে জীবজন্তু বাঁচিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে চন্দ্রে বায়ু নাই, জলও নাই। আমরা যাহাকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলি তাহা প্রকাণ্ড গহ্বর মাত্র, ঐ সকল গহ্বর পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল, এখন শুকাইয়া ঐরূপ গহ্বর হইয়াছে। চন্দ্র এরূপ মন্দ-গতি যে নিজের চারিদিকে ঘুরিতেই উহার ১৫ দিন লাগে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে Proctor প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলেন যে চন্দ্রে উদ্ভিজ্জ কিম্বা প্রাণী নাই। যে গ্রহের চন্দ্রের মত অবস্থা হয় তাহাকেই মৃত কহা যায়।

পৃথিবীর মৃত্যু সম্ভব কিনা জানিতে হইলে দেখা আবশ্যক, পৃথিবীতে এমন কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে কি না যাহাতে তাহার জীবনী-শক্তির হানি করে। দেখা আবশ্যক, পৃথিবীর জীবনী-শক্তির সঙ্গে এমন কোন প্রতিকূল শক্তি অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে কি না যাহার অনিষ্ট-জনক কার্য্য অলক্ষিত ভাবে পৃথিবীর পরমায়ু হ্রাস করিতেছে। যদি আমরা সেইরূপ প্রতিকূল শক্তি দেখিতে পাই তবে তাহার কার্য্য এখন অতীব সূক্ষ্ম হইলেও তাহা হইতে কালে পৃথিবীরও যে চন্দ্রের মত মৃত দশা হইবে না—এরূপ কে বলিতে পারে?

গ্রহের জীবনের একটি প্রধান কারণ, বৈষম্য। বৈষম্য না থাকিলে কোন কার্য্যই হইতে পারে না; যদি সমস্ত পৃথিবী সমতল হইত অর্থাৎ পৃথিবীতে কিছু উঁচু নীচু না থাকিত, তাহা হইলে নদী বহিত না; নদীর গতির কারণ মাধ্যাকর্ষণ বটে, কিন্তু উঁচু নীচু না থাকিলে মাধ্যাকর্ষণ জলরাশিকে কোথা হইতে কোথায় টানিয়া আনিত? উষ্ণতার বৈষম্যই বায়ুর গতির কারণ। যদি সমস্ত বায়ু সমান গরম হইত তাহা হইলে বায়ু বহিত না। বায়ুর কোন একস্থান অধিক উষ্ণ হইলে,

---

* আমাদের দেশের নামকরণ অনুসারে চন্দ্রকে গ্রহ বলা হইল। কিন্তু আসলে, যে সকল জ্যোতিষ্ক সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহাদিগকেই গ্রহ কহে; আর যাহারা কোন একটি গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারা উপগ্রহ। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করে, সেই নিমিত্ত ইহা প্রকৃত পক্ষে একটি উপগ্রহ।

তাহা লঘু হইয়া উপরে উঠে এবং তাহাদের পরিত্যক্ত স্থানে চতুষ্পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু আসিতে থাকে; এইরূপে বায়ু বহে। জলের উষ্ণতার বৈষম্যই সমুদ্রের স্রোতের প্রধান কারণ। সমস্ত সমুদ্রের জল যদি সমান গরম হইত তাহা হইলে জলাশয়ের ন্যায় সমুদ্র নিশ্চল থাকিত। সমুদ্রে স্রোত বহিত না। ঔপসাগরিক স্রোত (Gulf stream) দ্বারাই ইংলণ্ড মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে। যদি ঔপসাগরিক স্রোত হইতে ইংলণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদ্র উষ্ণ জল না পাইত তাহা হইলে ইংলণ্ড প্রায় মেরুসন্নিহিত দেশের মত শীতপ্রধান হইত। (১) পৃথিবীর কোটি সন্নিহিত প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের উত্তাপ বেশী, এ জন্য সেখানকার জল হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাষ্প উঠিতে থাকে; এবং সেই বাষ্পে পরিণত জলরাশির স্থান গ্রহণ করিবার জন্য মেরুর নিকটস্থ শীতল জলের স্রোত বহিতে থাকে। এক কথায় বলিতে এই, জগতে যদি উষ্ণতার বৈষম্য না থাকিত তাহা হইলে জগতের সমস্ত জীবন-রক্ষণ-কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। অথচ উষ্ণতার একটি বিশেষ গুণ এই দেখিতে পাওয়া যায় যে চতুষ্পার্শ্বে সমান ভাবে বিস্তৃত হইবার দিকে ইহার প্রবণতা। কোন স্থানে কোন একটা অত্যন্ত উষ্ণ বস্তু রাখিলে ক্রমে তাহার উষ্ণতা চারিপাশে সমান ভাবে বিস্তৃত হইতে থাকে। একটা গরম ও একটা শীতল বস্তু এক সঙ্গে রাখিলে কিছুক্ষণ পরে উভয়েরই উষ্ণতা সমান হয়, শীতল বস্তু যতটা উষ্ণতা পায়, উষ্ণ বস্তু ততটা হারায়। ইহাকেই বৈজ্ঞানিকেরা আয়-ব্যয়ের নিয়ম (Law of Exchange) বলেন। এবং সকল প্রকার তেজই (Energy) ক্রমে উষ্ণতায় পরিণত হইবার দিকে উন্মুখ। কাজে কাজেই মনে হয় যে, এমন এক সময় আসিবে যখন সকল প্রকার তেজই উষ্ণতায় পরিণত হইয়া জগৎময় সমভাবে বিস্তৃত হইবে। সে অবস্থায় পৃথিবী যে, কেবল চন্দ্রের ন্যায় মৃত হইবে, তাহা নহে, তাহার প্রলয় হইবে।

প্রলয়ে গ্রহের মৃতদেহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। আমরা জীবন, মৃত্যু কাহাকে বলে দেখিয়াছি; এখন, প্রলয় কাহাকে বলে তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইতেছে।

সকলেই জানেন যে দুই শক্তির কার্য্য-ফলে গ্রহ স্বীয় কক্ষ হইতে বিচ্যুত না হইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। প্রথম, সূর্য্যের

(১) ব্যারণ দে লেসেপ যে পানামার যোজকে খাল কাটিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, এক খানি আমেরিকা-দেশীয় সংবাদ পত্র তাহাতে একটি গূঢ় অভিসন্ধি দেখিয়া বলেন যে, ফ্রান্সের চিরশত্রু ইংলণ্ডের অনিষ্ট সাধনের জন্যই এ প্রস্তাব। পানামার খাল কাটা হইলে ইংলণ্ডের জীবন রক্ষক ঔপসাগরিক উষ্ণ স্রোত এই নূতন পথে প্রবাহিত হইয়া ইংলণ্ডকে বাসের অযোগ্য করিবে। ইহা বোধ করি, কবি রামদাস শর্ম্মার ভারত-উদ্ধারের পাশ্চাত্য সংস্করণ। সং

নিজাভিমুখে আকর্ষণ অথবা কেন্দ্রানুগ শক্তি, (Centripetal force)। দ্বিতীয়, সৌর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া গ্রহের সরল রেখা পথে পলায়নের চেষ্টা অথবা তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি (Centrifugal force)। যদি কখনও কোন জ্যোতিষ্কের এমন অবস্থা হয় যে তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি অতীব অল্প হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সূর্য্যের আকর্ষণের প্রভাব বৃদ্ধিহেতু সেই জ্যোতিষ্ক ক্রমে সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে এবং তাহার প্রচণ্ড উত্তাপে তাহা বাষ্পাকারে পরিণত হয়। (২) এইরূপ সূর্য্যের গ্রাসে পতিত হওয়াকেই গ্রহের প্রলয় বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীতে যখন উত্তাপের সাম্য হইবে, তখন পৃথিবী গতি শক্তিহীন হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিনষ্ট হইবে। (৩)

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, একটা জ্যোতিষ্কের জীবন রক্ষণের প্রধান কারণ তাহার গতি ; কাজেই পৃথিবীর মৃত্যু চিন্তা করিতে গেলে তাহার গতির বিষয় আলোচনা আবশ্যক। যদি আবহমান কালের মধ্যে পৃথিবীর গতির কোন বৈলক্ষণ্য না দেখা গিয়া থাকে তাহা হইলে পৃথিবীর পরিণামের বিষয় এ সূত্র হইতে কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না। কিন্তু বহুকালব্যাপী জ্যোতিষিক অনুসন্ধান দ্বারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর গতির কিছু লাঘব হইয়াছে। যদিও ইহার মাত্রা চুলের মত বই নয়, তথাপি ইহা হইতে পৃথিবীর গতিহ্রাস সপ্রমাণ হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল অপেক্ষা চন্দ্রের গতি এখন কিছু বৃদ্ধিশীল বলিয়া হঠাৎ মনে হয়। ইংরাজি ভাষায় ইহাকে Secular acceleration of the Moon's mean motion বলে। কিন্তু চন্দ্রের গতি বৃদ্ধি হওয়া অতিশয় অসম্ভব বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করিয়াছেন। চন্দ্রের গতি আসলে বাড়ে নাই, পৃথিবীর গতি হ্রাস হেতু চন্দ্রের গতি বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন চন্দ্রের গতিবৃদ্ধির কোন কারণই তাঁহারা দেখেন নাই। গতি বৃদ্ধির অর্থই কার্য্যের বৃদ্ধি, ও শক্তি না হইলে কার্য্য হইতে পারে না—অতএব চন্দ্রের গতি বৃদ্ধির অর্থই এক নূতন শক্তির আবির্ভাব। কিন্তু কোথা হইতে এ নূতন শক্তির আবির্ভাব হইবে? জগতের শক্তি-সমষ্টির কখনও বৃদ্ধি হইতে পারে না ; ইহা

---

(২) জ্যোতির্বেত্তারা বলেন ধূমকেতু ও গ্রহ-খণ্ড মাঝে মাঝে সূর্য্যের উপর এইরূপে পড়িয়া তাহার চিরন্তন প্রচণ্ড উত্তাপ সমান ভাবে রক্ষা করিতেছে।

(৩) এইরূপে অনেক গুলি গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যের সহিত মিশিয়া গেলে সেই মিশ্রিত পদার্থ সমষ্টির কতক অংশ আঘাত জনিত উত্তাপে বাষ্পাকারে পরিণত হয়; ক্রমে আবার তাহা হইতে নূতন গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি হইতে পারে। অনেক বৈজ্ঞানিকদিগের মত যে বর্ত্তমান গ্রহ উপগ্রহ এইরূপ জ্বলন্ত বাষ্পরাশি হইতে ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে, এই মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই একেবারে বিনষ্ট হয় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র।

জগতে চিরকাল সমান আছে ও থাকিবে। শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র, তাহার ক্ষয় বৃদ্ধি সম্ভবে না—ইহাকেই বৈজ্ঞানিকেরা শক্তি-সংরক্ষণ (Conservation of Energy) কহেন। এরূপ না হইলে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী নিত্য সমান ভাবে রক্ষিত হইত না, তাহাতে বৈলক্ষণ্য হইত; প্রাকৃতিক নিয়মের নিত্যতার (Uniformity of Natural Laws) উপরেই সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র অবস্থিত। এবং যে হেতু চন্দ্রের গতি-বৃদ্ধির কোন কারণ দেখা যায় না, অতএব ইহা নিশ্চয় যে, চন্দ্রের গতি বৃদ্ধি হয় নাই। তবে গতি-বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় কেন? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পৃথিবীর গতি হ্রাস হইয়াছে বলিয়া ঐরূপ মনে হয়। কিন্তু এই রূপ কেবল একটা অনুমান কথন কোন একটা মতের ভিত্তি হইতে পারে না। পৃথিবীর গতি হ্রাস করিতে প্রত্যক্ষ পক্ষে যত্নশীল কোন বিশেষ কারণ দেখিতে না পাইলে আমরা উপরি উক্ত যুক্তিকে নিতান্ত আনুমানিক বলিয়া অবহেলা করিতে পারিতাম; কিন্তু ঐরূপ একটি প্রত্যক্ষ কারণ বৈজ্ঞানিকেরা নির্দ্ধারিত করিতে পারিয়াছেন।

সমুদ্রের জলের এক প্রকার গতি আছে যাহাকে আমরা জোয়ার ভাঁটা বলি। এই জোয়ার ভাঁটা পৃথিবীর গতি অপহরণ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশে যত্নশীল। পৃথিবীর স্থলীয় ও জলীয় অংশের উপর চন্দ্রের আকর্ষণের বৈষম্যই (Differential attraction) এই জোয়ার ভাঁটার প্রধান কারণ।* সূর্য্য এতদূরে অবস্থিত যে তাহার জল ও স্থলের উপর প্রায় সমানই আকর্ষণ,

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তৃতীয় ভাগ চারুপাঠের ১২৭ পৃঃ "জোয়ার ভাঁটা" শীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছেন, "চন্দ্র অবশ্যই পৃথিবীর স্থল জল উভয় ভাগই আকর্ষণ করে, কিন্তু স্থল ভাগ কঠিন ও দৃঢ়, এ নিমিত্ত বিচলিত হয় না। জল ভাগ অতিশয় তরল এই জন্য চন্দ্রের আকর্ষণে চলিত ও স্ফীত হয়।" ঐ পুস্তকের ১২৯ পৃঃ তিনি আবার বলিয়াছেন "পৃথিবীর কেন্দ্র * * চন্দ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের দিকে উত্থিত হয়" এই দুইটির অর্থ পরস্পর-বিরোধী। বোধ হয় কেবল ভাষা সংক্ষেপ করিবার জন্যই ওরূপ অর্থের বৈপরীত্য হইয়াছে। তবে অক্ষয় বাবু যে বলিয়াছেন যে চন্দ্রের আকর্ষণে জল "চলিত" হয়—ইহা ঠিক নহে। এবিষয় মূল প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

অসল কথাটা এই, আকর্ষক ও আকৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দূরত্ব বাড়িলে আকর্ষণের প্রভাব হ্রাস হয়, এবং তরল বস্তুর কোন এক অংশ অপর অংশ হইতে সহজেই বিচ্ছিন্ন হয় কিন্তু দৃঢ় বস্তুর সে রকম হয় না। এই কারণে কোন তরল বস্তু আকৃষ্ট হইলে, তাহার উপরিভাগেই আকর্ষণের কার্য্য আরম্ভ হইয়া সে তরল বস্তুকে সহজে স্ফীত করে, এবং দৃঢ় বস্তু আকৃষ্ট হইলে তাহার কেন্দ্রে আকর্ষণের কার্য্য আরম্ভ হইয়া তাহার সমুদায় অংশকে এক সময়ে সমানভাবে (as a whole) আকর্ষণ করে। কিন্তু জলের উপরিভাগ হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৩৫০০ মাইল বলিয়া জল অপেক্ষা স্থল ভাগের উপর চন্দ্রের আকর্ষণের প্রভাব কম হয়, সেই জন্য স্থল অপেক্ষা জলভাগ অধিক স্ফীত হইয়া উঠে। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব এত অধিক যে তাহার তুল-

তাহার বৈষম্য অতি কম; সেই জন্য সূর্য্যের সহিত জোয়ার ভাঁটার গৌণ সম্পর্ক। চন্দ্র জলরাশিকে আকর্ষণ দ্বারা ফাঁপাইয়া তোলে কিন্তু কোথা হইতে সে জলরাশির পার্শ্ব-গামী গতি হয়? চন্দ্র ত আর তাহাকে অন্য কোন দিকে গতি দিতে পারে না, এবং বাহিরের কোথা হইতেও গতি পাইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে এ গতি কোথা হইতে আসে?

চন্দ্র কর্ত্তৃক উন্নমিত এই জলরাশি পৃথিবীর ঘুরিবার সময় তাহার কঠিন স্থল অংশের সহিত ঘর্ষণে সেই স্থলভাগের গতি লইয়া গতি পায়।—এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখানো যাউক।

একটি গোলা চালাইয়া একটি স্থির গোলাকে আঘাত করিলে যেমন সেই গমনশীল গোলার শক্তি পাইয়া স্থির গোলাটি চলিতে থাকে তেমনি পৃথিবীর ঘূর্ণমান কঠিন অংশের আঘাতে গতি পাইয়া জলরাশি চলিতে থাকে। পৃথিবী যে জলকে এইরূপ গতি দেয়, পৃথিবী এ শক্তি কোথা হইতে পায়? সে ত আর

নায় ৩৫০০ মাইল কিছুই নহে, কাজেই জল স্থলের উপর সূর্য্যের আকর্ষণের বৈষম্য অতি অল্প। সেই জন্য বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীর উপর সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি চন্দ্রের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহাতে চন্দ্রের আকর্ষণের মত জলকে স্ফীত করিতে পারে না। চন্দ্র অপেক্ষাকৃত পৃথিবীর অনেক নিকটে অবস্থিত বলিয়া ৩৫০০ মাইলেই তাহার আকর্ষণের অনেক তারতম্য হয়।

অন্য কোন স্থান হইতে নূতন শক্তি পাইয়া জলকে চালাইতে পারে না, নিজের গতিশক্তিরই অংশ দিয়া জলকে চালায়। ইহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এইরূপে পৃথিবীর গতি শক্তির কিছু লাঘব হয়। পূর্ব্বের দৃষ্টান্তে উল্লিখিত গোলার মধ্যে যদি দুইটিরই সমান ভার ও আয়তন হয়, তাহা হইলে স্থির গোলাকে চালাইতে গিয়া গমনশীল গোলা শীঘ্রই থামিয়া যায় এবং তাহার গতি পাইয়া স্থির গোলা চলিতে থাকে। যদি পৃথিবীর স্থলীয় অংশ ও তাহার সহিত যে জল রাশির ঘর্ষণ হয়, এ দুয়ের ভার সমান হইত তাহা হইলে পৃথিবীর গতিও থামিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইত। সমান নহে বলিয়াই তাহার গতির কেবল অল্প মাত্র বেগহ্রাস হয়। এবিষয়ে আর একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। যদি একটি দ্রুতগামী চাকার উপর এক খণ্ড প্রস্তর কোন প্রকারে রাখা যায় তাহা হইলে চাকার গতি পাইয়া সেই প্রস্তর খণ্ড দূরে চলিয়া যায়, কিন্তু এই কার্য্যে যতটুকু শক্তি ব্যয়িত হয়, তাহা চাকার গতির হিসাবে খরচ পড়ে। উহাতে দ্রুতগামী চাকার কিছু বেগ কমিয়া যায়। সেই রূপ দেখা যায়, পৃথিবীর গতিশক্তি পূর্ব্বোক্ত কারণে কিছু কমিয়া গিয়াছে। এখন, পৃথিবীর নিজের চারিদিকে ঘুরিতে পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক সময় লাগে কাজে কাজেই দিবসের দৈর্ঘ্য এখন কিছু বাড়িয়াছে। এই জন্যই চন্দ্রের গতির বৃদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংখ্যক দিবসে চন্দ্র ঘুরিতেছে মনে হয়।

ইহা ব্যতীত পৃথিবীর গতি-লাঘব হইবার আর একটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা স্থির হইয়াছে যে আকাশের এমন কোন স্থানই নাই যেখানে ঈথর (Ether) না আছে। যদিও ঈথর এত সুক্ষ্ম যে উহা মাধ্যাকর্ষণের অধিকারবহির্ভূত বলিয়া কল্পিত হয়, তথাপি বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে ঈথরের সহিত ঘর্ষণেও শক্তির হানি হয়; এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, এন্‌কি দ্বারা আবিষ্কৃত একটি ধূমকেতুর কক্ষ ক্রমশই ছোট হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ ক্রমশই ঐ ধূমকেতুর কেন্দ্রাতিগ গতি কমিয়া যাইতেছে। ইহার অন্য কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না; কাজেকাজেই বৈজ্ঞানিকেরা ঐরূপ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি একটী জ্যোতিষ্ক ঈথর ঘর্ষণে শ্লথগতি হইতে পারে তবে অন্যান্য জ্যোতিষ্কই বা কেন সেরূপ না হইবে? এই কারণ হইতে যদিও অতি অল্পই ফল হইবার সম্ভাবনা তথাপি ইহাও পৃথিবীর মৃত্যুর অন্য কারণের সহায়তা করিতে পারে।

এইত দেখিতে পাওয়া গেল পৃথিবীর গতি কমিবার দিকে উন্মুখ। এই কার্য্য অপ্রতিহত ভাবে চলিলে কালে যে পৃথিবী সূর্য্যে মিশাইয়া যাইবে—ইহাই সম্ভাব্য। বলিবার আবশ্যক নাই এই ঘটনার অনেক পূর্ব্বেই পৃথিবীতে আর জীবের বসতি থাকিবে না, পৃথিবী চন্দ্রের মত হইয়া পড়িবে।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুসারে পৃথিবীর বিনাশ এক প্রকার নিশ্চিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে নূতন সত্যের আবিষ্ক্রিয়া সহকারে এত অধিক বৈজ্ঞানিক মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে সে বিষয়ে উদাহরণ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। এখন উপরে সন্নিবেশিত মত গুলি যে কালে পরিবর্ত্তিত কিম্বা পরিত্যক্ত হইবে না—ইহাই বা কে নিশ্চয় বলিতে পারে? চন্দ্র যে প্রকার মন্দগতি হইয়াছে তাহাতে বৈজ্ঞানিকদিগের উপরি উক্ত মতানুসারে পৃথিবীর আগেই তাহার অস্তিত্ব লোপ হইবার সম্ভাবনা। এবং চন্দ্র না থাকিলে জোয়ার ভাঁটার প্রভাব অনেক কমিয়া যাইবে, সুতরাং এ কারণ হইতে পৃথিবীর জীবন হ্রাসের সম্ভাবনাও অনেক কমিয়া যাইবে। কিন্তু পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের যে প্রকার সম্পর্ক তাহাতে চন্দ্র না থাকিলে পৃথিবীর যে আবার কত প্রকার অনিষ্ট হইবে তাহা এখানে বলা বাহুল্য।

বাঙ্গালি কবি নয়।

একটা কথা উঠিয়াছে, মানুষ মাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব আছে, যে দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি। কথাটা খুব নূতনতর। সচরাচর লোকে কবি বলিতে এমন বুঝে না। সচরাচর লোকে যাহা বলে তাহার বিপরীত একটা কথা শুনিলে অনেক সময় আমাদের ভারি ভাল লাগিয়া যায়। যাহার মনোবৃত্তি আছে সেই কবি, এ কথাটা এখনকার যুবকদের মধ্যে অনেকেরই মুখে শুনা যায়। কবি শব্দের ঐরূপ অতি-বিস্তৃত অর্থ এখন একটা ফ্যাষাণ হইয়াছে বলিলে অধিক বলা হয় না। এমন কি নীরব-কবি বলিয়া একটি কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, ও সে কথা দিনে দিনে খুব চলিত হইয়া আসিতেছে। এত দূর পর্য্যন্ত চলিত হইয়াছে যে, আজ যদি আমি এমন একটা পুরাতন কথা বলি যে, নীরব কবি বলিয়া একটা কোন পদার্থই নাই, তাহা হইলে আমার কথাটাই লোকের নূতন বলিয়া ঠেকে। আমি বলি কি, যে নীরব সেই কবি নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার যা' মত অধিকাংশ লোকেরই আন্তরিক তাহাই মত। লোকে বলিবে "ও কথা ত সকলেই বলে, উহার উলটাটা যদি কোন প্রকারে প্রমাণ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড় ভাল লাগে।" ভাল ত লাগে, কিন্তু বিষয়টা এমনতর যে, তাহাতে একটা বই দুইটা কথা উঠিতে পারে না। কবি কথাটা এমন একটা সমস্যা নয় যে তাহাতে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ খেলানো যায়; "বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ" এমন একটা তর্কের খেলেনা নয়। ভাব প্রকাশের সুবিধা করিবার জন্য লোক সাধারণে একটি বিশেষ পদার্থের একটি বিশেষ নামকরণ করিয়াছে, সেই নামে তাহাকে সকলে ডাকিয়া থাকে ও অনেক দিন হইতে ডাকিয়া আসিতেছে, তাহা লইয়া আর তর্ক কি হইতে পারে? ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য লোকে পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া কটি দেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত অঙ্গকে পা বলিয়া থাকে, তুমি যদি আজ বল যে, পদতল হইতে আর ় করিয়া স্কন্ধদেশ পর্য্যন্তকে পা বলা যায় তাহা হইলে কথাটা কেমন শোনায় বল দেখি? পুণ্ডরীকাক্ষ নিয়োগী তাহার এক ছেলের নাম ধর্ম্মদাস, আর এক ছেলের নাম জন্মেজয়, ও তৃতীয় ছেলের নাম শ্যামসুন্দর রাখিয়াছে, তুমি যদি তর্ক করিতে চাও যে, পুণ্ডরীকাক্ষের তিন ছেলেরই নাম জন্মেজয় নিয়োগী, তাহা হইলে লোকে বলে যে, বৃদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষ তাহার তিন ছেলের যদি তিন স্বতন্ত্র নাম রাখিয়া থাকে,

তুমি বাপু কে যে, তাহাদের তিন জনকেই জন্মেজয় বলিতে চাও? লোকে কাহাকে কবি বলে? যে ব্যক্তি, বিশেষ শ্রেণীর ভাব সমূহ, (যাহাকে আমরা কবিতা বলি) ভাষায় প্রকাশ করে।* নীরব ও কবি দুইটি অন্যোন্য-বিরোধী কথা, তথাপি যদি তুমি বিশেষণ নীরবের সহিত বিশেষ্য কবির বিবাহ দিতে চাও, তবে এমন একটি পরস্পর-ধ্বংশী দম্পতির সৃষ্টি হয়, যে, শুভ দৃষ্টির সময় পরস্পর চোখাচোখি হইবা-মাত্রেই উভয়ে প্রাণ ত্যাগ করে—উভয়েই উভয়ের পক্ষে ভস্মলোচন। এমনতর চোখাচোখিকে কি অশুভ দৃষ্টি বলাই সঙ্গত নয়, অতএব এমনতর বিবাহ কি না দিলেই নয়? এমন হয় বটে, যে, তুমি যাহাকে কবি বল, আমি তাহাকে কবি বলি না; এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তুমি বলিতে পার বটে যে, "যখন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন লোকে কবি বলিয়া থাকে তখন কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কবি বলিতে সকলেই এক অর্থ বুঝে?" আমি বলি কি, একই অর্থ বুঝে। যখন গদ্য-পুণ্ডরীকের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রাম বাবুকে তুমি কবি বলিতেছ, আমি কবি বলিতেছি না, ও কবিতা-চন্দ্রিকার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শ্যাম বাবুকে আমি কবি বলিতেছি তুমি বলিতেছ না, তখন তোমাতে আমাতে এই তর্ক যে, "রাম বাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" বা "শ্যাম বাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" রাম বাবু ও শ্যাম বাবু এক স্কুলে পড়েন, তবে তাঁহাদের মধ্যে কে ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়েন, কে লাস্ট ক্লাশে পড়েন তাহাই লইয়া কথা। রাম বাবু ও শ্যাম বাবু যে এক স্কুলে পড়েন, সে স্কুলটি কি? না প্রকাশ করা। তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? না প্রকাশ করা লইয়া। বৈসাদৃশ্য কোথায়? কিরূপে প্রকাশ করা হয়, তাহা লইয়া! তবে, ভাল কবিতাকেই আমরা কবিতা বলি, কবিতা খারাপ হইলে তাহাকে আমরা মন্দ কবিতা বলি, সুকবিতা হইতে আরো দূরে গেলে তাহাকে আমরা কবিতা না বলিয়া শ্লোক বলিতে পারি, ছড়া বলিতে পারি, যাহা ইচ্ছা, যথা,

হরপ্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।

ইত্যাদি।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবকে আমরা মানুষ বলি, তাহার কাছাকাছি যে আসে তাহাকে বনমানুষ বলি, মানুষ হইতে আরো তফাতে গেলে তাহাকে মানুষও বলি না, বনমানুষও বলি না, তাহাকে বানর বলি। এমন তর্ক কখনো শুনিয়াছ যে Wordsworth শ্রেষ্ঠ কবি না ভজহরি (যে ব্যক্তি লেখনীর আকার কিরূপ জানে না) শ্রেষ্ঠ কবি? অতএব এটা দেখিতেছ, কবিতা প্রকাশ না করিলে

---

* এ প্রবন্ধটির মধ্যে আড়ম্বর করিয়া কবিতা কথাটির একটি দুরূহ সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে বসা' সাজে না বলিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম।

কাহাকেও কবি বলা যায় না। বিশ্বব্যাপী ঈথর-সমুদ্রে যথোপযুক্ত তরঙ্গ উঠিলে তবে আমাদের চক্ষে আলোক প্রকাশ পায়। তবে কেন অন্ধকারে বসিয়া আমরা বলি না যে, আমরা আলোকের মধ্যে বসিয়া আছি? সর্ব্বত্রই ত ঈথর আছে ও ঈথরের মধ্যে ত আলোক প্রকাশের গুণ আছে, এমন কি হয়ত আমাদের অপেক্ষা উন্নততর চক্ষুষ্মান জীব সেই অন্ধকারে আলোক দেখিতেছে। কেন বলি না শুনিবে? অতি সহজ উত্তর। বলি না বলিয়া। অর্থাৎ লোকে ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য বস্তু-প্রকাশক শক্তি বিশেষের নাম আলোক রাখিয়াছে। চক্ষে প্রকাশিত না হইলে তাহাকে আলোক বলিবে না, তা' তুমি যাহাই বল আর যাহাই কর। ইহার উপর আর তর্ক আছে? তোমার মতে ত বিশ্ব শুদ্ধ লোককে চিত্রকর বলা যাইতে পারে। এমন ব্যক্তি নাই, যাহার মনে অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত না রহিয়াছে, তবে কেন মনুষ্যজাতির আর এক নাম রাখ না চিত্রকর? আমার কথাটি অতি সহজ কথা। আমি বলি যে, যে ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ হয় নাই তাহা কবিতা নহে, ও যে ব্যক্তি ভাব বিশেষ ভাষায় প্রকাশ করে না, সেও কবি নহে। যাঁহারা নীরব কবি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্ব চরাচরকে কবিতা বলেন। এ সকল কথা কবিতাতেই শোভা পায়। কিন্তু অলঙ্কারশূন্য গদ্যে অথবা তর্কস্থলে বলিলে কি ভাল শোনায়? একটা নামকে এরূপ নানা অর্থে ব্যবহার করিলে দোষ হয় এই যে, তাহার দুইটা ডানা বাহির হয়, এক স্থানে ধরিয়া রাখা যায় না ও ক্রমে ক্রমে হাতছাড়া এবং সকল কাজের বাহির হইয়া বুনো হইয়া দাঁড়ায়, "আয়" বলিয়া ডাকিলেই আর খাঁচার মধ্যে আসিয়া বসে না। আমার কথাটা এই যে, আমার মনে আমার প্রেয়সীর ছবি আঁকা আছে বলিয়াই আমি কিছু চিত্রকর নই, ও ক্ষমতা থাকিলে আমার প্রেয়সীকে আঁকা যাইতে পারিত বলিয়া আমার প্রেয়সী একটি চিত্র নহেন।

অনেকে বলেন, সমস্ত মনুষ্য জাতি সাধারণতঃ কবি, ও বালকেরা, অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি। এ মতের পূর্ব্বোক্ত মতটির ন্যায় তেমন বহুল প্রচার হয় নাই। তথাপি তর্ককালে অনেকেরই মুখে একথা শুনা যায়। বালকেরা যে কবি নয়, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কবিতাময় ভাষায় ভাব প্রকাশ করে না। অনেকে কবিত্ব অনুভব করেন, কবিত্ব উপভোগ করেন, যদি বা বলপূর্ব্বক তুমি তাঁহাদিগকেও কবি বল, তথাপি বালকদিগকে কবি বলা যায় না। বালকেরা কবিত্ব অনুভব করে না, কবিত্ব উপভোগ করে না, অর্থাৎ বয়স্ক লোকদের মত করে না। অনুভব ত সকলেই করিয়া থাকে; পশুরাও ত সুখ দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু কবিত্ব অনুভব কয়জন লোকে করে? যথার্থ সুন্দর ও যথার্থ কুৎসিত কয়জন ব্যক্তি পরখ করিয়া, তফাৎ করিয়া দেখে ও বুঝে? অধিকাংশ লোক সুন্দর চিনিতে ও উপভোগ

করিতেই জানে না। সুন্দর বস্তু কেন সুন্দর তাহা বুঝিতে পারা, অন্য সমস্ত সুন্দর বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে তাহার যথাযোগ্য আসন দেওয়া, একটা সুন্দর বস্তু হইতে দশটা সুন্দর বস্তুর কথা মনে পড়া, অবস্থা বিভেদে একটি সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য বিভেদ কল্পনা করিতে পারা কি সকলের সাধ্য? সকল চক্ষুই কি শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী কি-একটি দেখিতে পায়? অল্পই হউক আর অধিক হউক কল্পনাত সকলেরই আছে। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে? কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জ্জিত, সুশিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে যথাপথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাকা আবশ্যক করে। পূর্ণ চন্দ্র যে হাসে, বা জ্যোৎস্না যে ঘুমায়, এ কয়জন বালকের কল্পনায় উদিত হয়? এক জন বালক যদি অসাধারণ কাল্পনিক হয়, তবে পূর্ণ চন্দ্রকে একটি আস্ত লুচি বা অর্দ্ধচন্দ্রকে একটি ক্ষীর পুলি মনে করিতে পারে। তাহাদের কল্পনা সংলগ্ন নহে, কাহার সহিত কাহার যোগ হইতে পারে, কোন্ কোন্ দ্রব্যকে পাশাপাশি বসাইলে পরস্পর পরস্পরের আলোকে অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারে, কোন দ্রব্যকে কি ভাবে দেখিলে তাহার মর্ম্ম, তাহার সৌন্দর্য্য চক্ষে বিকাশ পায়, এ সকল জানা অনেক শিক্ষার কাজ। একটি দ্রব্য অনেক ভাবে দেখা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এক ভাবে জগৎ দেখেন, দার্শনিকেরা এক ভাবে দেখেন ও কবিরা আর এক ভাবে দেখেন। তিন জনে তিন প্রকার পদ্ধতিতে একই বস্তু দেখিতে পারেন। তুমি কি বল, উহার মধ্যে দুই প্রকার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে শিক্ষার আবশ্যক করে, আর তৃতীয়টিতে করে না? শুদ্ধ করে না তাহাই নয়, শিক্ষাতেই তাহার বিনাশ! কোন্ দ্রব্য কোন্ শ্রেণীর, কিসের সহিত তাহার ঐক্য ও কিসের সহিত তাহার অনৈক্য, তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে নির্ণয় করা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও কবি তিন জনেরই কাজ। তবে, একটা দ্রব্যের তিনটি দিক আছে, তিন জন তিন বিভিন্ন দিকের ভার লইয়াছেন। তিন জনের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ, আর কিছু প্রভেদ আছে কি? অনেক ভাল ভাল কবি যে ভাবের পার্শ্বে যে ভাব বসানো উচিত, স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া শিক্ষার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন। Marlowর Come live with me and be my love" নামক সুবিখ্যাত কবিতাতে ইহা লক্ষিত হয়।

"র'বি কি আমার প্রিয়া, র'বি মোর সাথে?
অরণ্য, প্রান্তর, নদী, পর্ব্বত, গুহাতে
যত কিছু, প্রিয়তমে, সুখ পাওয়া যায়,
দুজনে মিলিয়া তাহা ভোগ করি আয়!

শুনিব শিখরে বসি পাখী গায় গান,
তটিনী শবদ সাথে মিশাইয়া তান;
দেখিব চাহিয়া সেই তটিনীর তীরে
রাখাল গরুর পাল চরাইয়া ফিরে।

রচি দিব গোলাপের শয্যা মনোমত ;
সুরভি ফুলের তোড়া দিব কত শত ;
গড়িব ফুলের টুপি পরিবি মাথায়,
আঙিয়া রচিয়া দিব গাছের পাতায়।

লয়ে মেষ শিশুদের কোমল পশম
বসন বুনিয়া দিব অতি অনুপম ;
সুন্দর পাদুকা এক করিয়া রচিত,
খাঁটি সোনা দিয়ে তাহা করিব খচিত।

কটি-বন্ধ গড়ি দিব গাঁথি তৃণ-জাল,
মাঝেতে বসায়ে দিব একটি প্রবাল।
এই সব সুখ যদি তোর মনে ধরে
হ' আমার প্রিয়তমা, আয় মোর ঘরে।

হস্তি-দন্তে গড়া এক আসনের পরে,
আহার আনিয়া দিবে দু জনের তরে,
দেবতার উপভোগ্য, মহার্ঘ্য এমন,
রজতের পাত্রে দোঁহে করিব ভোজন।

রাখাল-বালক যত মিলি একত্তরে
নাচিবে গাইবে তোর আমোদের তরে।
এই সব সুখ যদি মনে ধরে তব,
হ' আমার প্রিয়তমা, এক সাথে রব'।

এ কবিতাতে একটি বিশেষ ভাবকে সমগ্র রাখা হয় নাই। মাঝ খানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যে বিশাল কল্পনায় একটি ভাব সমগ্র প্রতিবিম্বিত হয়, যাহাতে জোড়া-তাড়া দিতে হয় না, সে কল্পনা ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত একটা ভাব সম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহার পরে আর একটি ভাব গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুই ভাবের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য যে, উভয়ে পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি থাকিয়াও উভয়ের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে, উভয়েই ভাবিতেছে, "এ এখানে কেন? পরস্পরের মধ্যে গলাগলি ভাব নাই। অরণ্য, পর্ব্বত, প্রান্তরে যত কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহাই যে রাখালের আয়ত্তাধীন, যে ব্যক্তি গোলাপের শয্যা ফুলের টুপি ও পাতার আঙিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিবার লোভ দেখাইতেছে সে স্বর্ণ খচিত পাদুকা, রজতের পাত্র, হস্তি-দন্তের আসন পাইবে কোথায়? তৃণ-নির্ম্মিত কটিবন্ধের মধ্যে কি প্রবাল শোভা পায়? আমাদের পাঠকদের মধ্যে যে কেহ কখনো কবিতা লিখিয়াছেন, সকলেই বলিয়া উঠিবেন, আমি হইলে এরূপ লিখিতাম না। সে কথা আমি বিশ্বাস করি। তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, তাঁহারা শিক্ষা পাইয়াছেন। কবিতা রচনায় তাঁহারা হয়ত অমন একটা জাজ্জল্যমান দোষ করেন না, কিন্তু ঐ শ্রেণীর দোষ সচরাচর করিয়া থাকেন। যাঁহারা বাস্তবিক কবি, অন্তরে অন্তরে কবি, তাঁহারা এরূপ দোষ করেন না; কিসের সহিত কিসের ঐক্য অনৈক্য আছে তাহা তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম রূপে দেখিতে পান। কবিকঙ্কনের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তি গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে, যে, আমাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়।* শিক্ষিত, সংযত,

* অনেকে তর্ক করেন যে, গণেশকে

মার্জ্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদ্গীরণ কোন মতেই একত্রে উদয় হইতে পারে না। ইহাতে কেহ না মনে করেন, আমি কবিকঙ্কনকে কবি বলি না। যে বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার অভাব ছিল, সেই বিষয়ে তাঁহার পদস্খলন হইয়াছে; এই মাত্র। পরিমাণ-সামঞ্জস্য, যাহা সৌন্দর্য্যের সার, সে বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি।

কল্পনারো শিক্ষা আবশ্যক করে। যাহাদের কল্পনা শিক্ষিত নহে, তাহারা অতিশয় অসম্ভব, অলৌকিক কল্পনা করিতে ভাল বাসে; বক্র দর্পণে মুখ দেখিলে নাসিকা পরিমাণাধিক বৃহৎ এবং কপাল ও চিবুক নিতান্ত হ্রস্ব দেখায়। তাহাদের কুগঠিত কল্পনা-দর্পণে স্বাভাবিক দ্রব্য যাহা কিছু পড়ে তাহার পরিমাণ ঠিক থাকে না; তাহার নাসা বৃহৎ ও তাহার কপাল খর্ব্ব হইয়া পড়ে। তাহারা অসঙ্গত পদার্থের জোড়াতাড়া দিয়া এক একটা বিকৃতাকার পদার্থ গড়িয়া তোলে। তাহারা শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী ভাব দেখিতে পায় না। তথাপি যদি বল' বালকেরা কবি, অর্থাৎ বালকদের হৃদয়ে বয়স্কদের অপেক্ষা কবিতা আছে, তবে নিতান্ত বালকের মত কথা বলা হয়। প্রাচীন কালে অনেক ভাল কবিতা রচিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়, এই মতের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে যে, অশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশেষ রূপে কবি। তুমি বল দেখি, ওটাহিটি দ্বীপবাসী বা এস্কুইমোদের ভাষায় কয়টা পাঠ্য কবিতা আছে? এমন কোন্ জাতির মধ্যে ভাল কবিতা আছে, যে জাতি সভ্য হয় নাই? যখন রামায়ণ মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তখন প্রাচীনকাল বটে, কিন্তু অশিক্ষিত কাল কি? রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া কাহারো মনে কি সে সন্দেহ উপস্থিত

দুর্গা এক একবার করিয়া চুম্বন করিতে ছিলেন, তাহাই দূর হইতে দেখিয়া ধনপতি গজাহার ও উদ্গীরণ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। কারণ কবিকঙ্কন চণ্ডীতেই আছে, যে, চৌষট্টি যোগিনী পদ্মের দলরূপ ধারণ করিল, ও জয়া হস্তিনী রূপে রূপান্তরিত হইল। অতএব গণেশের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই। কেহ বা তর্ক করেন যে, যখন কবির উদ্দেশ্য বিস্ময় ভাবের উদ্দীপন করা, তখন, বর্ণনা যাহাতে অদ্ভুত হয়, তাহারই প্রতি কবির লক্ষ্য। কিন্তু এ কথার কোন অর্থ নাই। সুকল্পনার সহিত বিস্ময় রসের কোন মনান্তর নাই।

যখন অগাধ সমুদ্রের মধ্যে মরাল শোভিত কুমুদ কহ্লার পদ্ম বনের মধ্যে এক রূপসী ষোড়শী প্রতিষ্ঠিত করিলেন; সমস্তই সুন্দর; নীল জল, সুকুমার পদ্ম, পুষ্পের সুগন্ধ, ভ্রমরের গুঞ্জন, ইত্যাদি ইত্যাদি তখন মধ্য হইতে এক গজাহার আনিয়া আমাদের কল্পনায় অমন একটা নিদারুণ আঘাত দিবার তাৎপর্য্য কি? সুন্দর পদার্থ যেমন কবিত্ব-পূর্ণ বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারে, এমন কি আর কিছুতে পারে? অপার সমুদ্রের মধ্যে পদ্মাসীনা ষোড়শী রমণীই কি যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ নহে? তাঁহার মস্তকের চারিদিকে ইন্দ্রধনুর মণ্ডল স্থাপন কর, তাঁহার করে তারকার বলয়, গলে তারকার হার বসাইয়া দেও দেখিয়া কে না আশ্চর্য্য হইবে?

হইতে পারে? উনবিংশ শতাব্দীতে যে মহা মহা কবিরা ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতায় কি উন বিংশ শতাব্দীর প্রভাব লক্ষিত হয় না? Copleston কহেন "Never has there been a city of which its people might be more justly proud, whether they looked to its past or to its future than Athens in the days of Æschylus."

অনেকে যে কল্পনা করেন যে, অশিক্ষিত অবস্থায় কবিত্বের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার একটি কারণ এই বোধ হয় যে, তাঁহারা মনে করেন যে, একটি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানিলে তাহাতে কল্পনার বিচরণের সহস্র পথ থাকে। সত্য একটি মাত্র, মিথ্যা অগণ্য। অতএব মিথ্যায় কল্পনার যে রূপ উদর পূর্ত্তি হয়, সত্যে সেরূপ হয় না। পৃথিবীতে অখাদ্য যত আছে, তাহা অপেক্ষা খাদ্য বস্তু অত্যন্ত পরিমিত। একটি খাদ্য যদি থাকে ত সহস্র অখাদ্য আছে। অতএব এমন মত কি কোন পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছ যে, অখাদ্য বস্তু আহার না করিলে মনুষ্য বংশ ধ্বংশ হইবার কথা?

প্রকৃত কথা এই যে, সত্যে যত কবিতা আছে, মিথ্যায় তেমন নাই। শত সহস্র মিথ্যার দ্বারে দ্বারে কল্পনা বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু এক মুষ্টি কবিতা সঞ্চয় করিতে পারে কিনা সন্দেহ, কিন্তু একটি সত্যের কাছে যাও, তাহার দশগুণ অধিক কবিতা পাও কি না দেখ দেখি? কেনই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে বল? আমরা ত প্রকৃতির কাছেই কবিতা শিক্ষা করিয়াছি, প্রকৃতি কখনো মিথ্যা কহেন না। আমরা কি কখনো কল্পনা করিতে পারি যে, লোহিত বর্ণ ঘাসে আমাদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইতেছে? বল দেখি, পৃথিবী নিশ্চল রহিয়াছে ও আকাশে অগণ্য তারকারাজি নিশ্চল ভাবে খচিত রহিয়াছে, ইহাতে অধিক কবিত্ব, কি সমস্ত তারকা নিজের পরিবার লইয়া ভ্রমণ করিতেছে তাহাতে অধিক কবিত্ব; এমনি তাহাদের তালে তালে পদক্ষেপ যে, এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া দিতে পারেন, কাল যে গ্রহ অমুক স্থানে ছিল আজ সে কোথায় আসিবে? প্রথম কথা এই যে, আমাদের কল্পনা প্রকৃতি অপেক্ষা কবিত্ব পূর্ণ বস্তু সৃজন করিতে অসমর্থ, দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যে অবস্থার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহার বহির্ভূত সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি না।

অনেক মিথ্যা, কবিতায় আমাদের মিস্ট লাগে। তাহার কারণ এই যে, যখন সেগুলি প্রথম লিখিত হয় তখন তাহা সত্য মনে করিয়া লিখিত হয়, ও সেই অবধি বরাবর সত্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। আজ তাহা আমি মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছি, অর্থাৎ জ্ঞান হইতে তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু হৃদয়ে সে এমনি শিকড় বসাইয়াছে যে, সেখানে হইতে তাহাকে উৎপাটন করিবার যো নাই। আমি কবি, যে, ভুত বিশ্বাস না করিয়াও ভুতের বর্ণনা করি, তাহার তাৎপর্য্য কি? তাহার অর্থ এই যে,

ভূত বস্তুতঃ সত্য না হইলেও আমাদের হৃদয়ে সে সত্য। ভূত আছে বলিয়া কল্পনা করিলে যে, আমাদের মনের কোন্ খানে আঘাত লাগে, কত কথা জাগিয়া উঠে, অন্ধকার, বিজনতা, শ্মশান, এক অলৌকিক পদার্থের নিঃশব্দ অনুসরণ, ছেলেবেলাকার কত কথা মনে উঠে এ সকল সত্য যদি কবি না দেখেন ত কে দেখিবে ?'

সত্য এক হইলেও যে, দশ জন কবি সেই এক সত্যের মধ্যে দশ প্রকার বিভিন্ন কবিতা দেখিতে পাইবেন না—তাহা ত নহে। এক সূর্য্য কিরণে পৃথিবীতে কত বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে দেখ দেখি! নদী যে বহিতেছে, এই সত্য টুকুই কবিতা নহে। কিন্তু এই বহমানা নদী দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে যে ভাব বিশেষের জন্ম হয় সেই সত্যই যথার্থ কবিতা। এখন বল দেখি, এক নদী দেখিয়া সময় ভেদে কত বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়। কখনো নদীর কণ্ঠ হইতে বিষণ্ণ গীতি শুনিতে পাই, কখনো বা তাহার উল্লাসের কলস্বর, তাহার শত তরঙ্গের নৃত্য আমাদের মনকে মাতাইয়া তোলে! জ্যোৎস্না কখনো সত্য সত্যই ঘুমায় না, অর্থাৎ সে, দুটি চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে না, ও জ্যোৎস্নার নাসিকা-ধ্বনিও কেহ কখনো শুনে নাই। কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না দেখিলে মনে হয় যে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে ইহা সত্য। জ্যোৎস্নার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তন্ন তন্ন রূপে আবিষ্কৃত হউক; এমনো প্রমাণ হউক্ যে জ্যোৎস্না একটা পদার্থই নহে, তথাপি লোকে বলিবে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে। তাহাকে কোন্ বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিবে বল দেখি ?

কেহ কেহ যদি এমন করিয়া প্রমাণ করিতে বসেন, যে, সমুদয় মনুষ্যই কবি, বাঙ্গালী মনুষ্য, অতএব বাঙ্গালী কবি; অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষ রূপে কবি, বাঙ্গালী অশিক্ষিত, অতএব বাঙ্গালী বিশেষ রূপে কবি, তবে তাঁহাদের যুক্তি গুলি নিতান্ত অপ্রামাণ্য। তাহা ব্যতীত, তাঁহাদের প্রমাণ করিবার পদ্ধতিই বা কি রূপ ? কবিত্ব কিছু একটা অদৃশ্য গুণ নহে, তাহা Algebraর xনহে যে, অমন অন্ধকারে হাঁতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে। যদি, বাঙ্গালী কবি কিনা জানিতে চাও, তবে দেখ, বাঙ্গালী কবিতা লিখিয়াছে কি না ও সে কবিতা অন্য অন্য জাতির কবিতার তুলনায় এত ভাল কি না যে, বাঙ্গালা জাতিকে বিশেষ রূপে কবি জাতি বলা যাইতে পারে। তুমি জান যে, অতিরিক্ত মোটা মানুষেরা সহজে নড়িতে চড়িতে পারে না ও অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়ে। দৃশ্যমান ব্যক্তি-বিশেষ মোটা কিনা, জানিতে হইলে, তুমি কি প্রথমে দেখিবে সে ব্যক্তি সহজে নড়িতে চড়িতে পারে কি না ও অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়ে কি না, ও তাহা হইতে মীমাংসা করিয়া লইবে সে ব্যক্তি মোটা ? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর ত আমি বলি, তাহা অপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে, তাহার প্রকাশমান শরী-

রের আয়তন দেখিয়া তাহাকে মোটা-স্থির করা।

বাঙ্গালা ভাষায় কয়টিই বা কবিতা আছে? এমন কবিতাই বা কয়টি আছে, যাহা প্রথম শ্রেণীর কবিতা' বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কয়টি বাঙ্গালা কাব্যে এমন কল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ যে কল্পনার ক্রীড়াস্থল। যে কল্পনা দুর্ব্বল-পদ শিশুর মত গৃহের প্রাঙ্গন পার হইলেই টলিয়া পড়ে না? যে কল্পনা' সূক্ষ্ম দ্রব্যেও যেমন অনুপ্রবিষ্ট, তেমনি অতি বিশাল দ্রব্যকেও মুষ্টির মধ্যে রাখে। যে কল্পনা বসন্ত বায়ুর অতি মৃদু স্পর্শে অচেতনের মত এলাইয়া পড়ে, এবং শত ঝটিকার বলে হিমালয়ের মত অটল শিখরকেও বিচলিত করিয়া তোলে। যে কল্পনা, যখন মৃদু তখন, জ্যোৎস্নার মত, যখন প্রচণ্ড তখন ধূমকেতুর ন্যায়। কোন বাঙ্গালা কাব্যে কি মনুষ্য চরিত্রের আদর্শ চিত্রিত দেখিয়াছ? নানা প্রকার বিরোধী মনোবৃত্তির ঘোরতর সংগ্রাম বর্ণিত দেখিয়াছ? এমন মহান্ ঘটনা জীবন্তের মত দেখিয়াছ যাহাতে তোমার নেত্র বিস্ফারিত ও সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে? কোন বাঙ্গলা কাব্য পড়িতে পড়িতে তোমার হৃদয়ে এমন ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, যাহাতে তোমার হৃদয়ে পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিয়াছে, অথবা পুষ্প-বাস-স্নিগ্ধ এমন মৃদু বায়ু সেবন করিয়াছ যাহাতে তোমার হৃদয়ের সমস্ত তরঙ্গ শান্ত হইয়া গিয়াছে, নেত্র মুদিয়া আসিয়াছে ও হৃদয়কে জীবন্ত জ্যোৎস্নার মত অশরীরী ও অতি প্রশান্ত আনন্দে মগ্ন মনে করিয়াছ?

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে মহা-কাব্যই নাই। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীকে কি মহাকাব্য বল? তাহাকে উপাখ্যান বলা যাইতে পারে কিন্তু তাহা কি মহাকাব্য? কালকেতু নামে এক দুঃখী ব্যাধ কোন দিন বা খাইতে পায় কোন দিন বা খাইতে পায় না। যে দিন খাইতে পায়; সে দিন সে চারি হাঁড়ি ক্ষুদ, ছয় হাঁড়ি দাল ও ঝুড়ি দুই তিন আলু ওল পোড়া খায়। "ছোট গ্রাস তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল।" "ভোজন করিতে গলা ডাকে হড় হড়।" এই ব্যক্তি চণ্ডীর প্রসাদে রাজত্ব পায়। কিন্তু তাহার রাজ সভায় ও একটি ছোট খাট জমিদারী কাছারীতে প্রভেদ কিছুই নাই। তাহার রাজত্বে "হানিফ গোপ" ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন করে; ভাঁড়ু দত্ত বলিয়া এক মোড়ল আসিয়াছে, তাহার

"ফোটা কাটা মহা দম্ভ, ছেঁড়া যোড়া কোঁচালম্ব
শ্রবণে কলম খরশাণ।"

ধনপতি নামে এক সদাগর আছে; সোনার পিঞ্জর গড়াইতে সে ব্যক্তি গৌড় দেশে যায়, তাহার দুই পত্নী ঘরে বসিয়া চুলাচুলি করে। দুর্ব্বলা বলিয়া তাহাদের এক দাসী আছে, সে উভয়ের কাছে উভয়ের নিন্দা করে, ও দুই পক্ষেই আদর পায়। সমস্ত কাব্যই এইরূপ। গ্রন্থারম্ভে দেব দেবীদের কথা উত্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু কবিকঙ্কণের দেব দেবীরাও নিতান্ত মানুষ, কেবল মাত্র মানুষ নহে,

কবিকঙ্কণের সময়কার বাঙ্গালী। হরগৌরীর বিবাহ, মেনকার খেদ, নারীগণের পতিনিন্দা, হরগৌরীর কলহ পড়িয়া দেখ দেখি। কবিকঙ্কণ মহাকাব্য নহে। আয়তন বৃহৎ হইলেই কিছু তাহাকে মহাকাব্য বলা যায় না। ভারতচন্দ্রের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। তাহার মালিনী মাসী, তাহার বিদ্যা, তাহার সুন্দর, তাহার রাজা ও কোটালকে মহাকাব্যের বা প্রথম শ্রেণীর কাব্যের পাত্র বলিয়া কাহারো ভ্রম হইবে না। বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কাহারো মনে কখনো মহান্ ভাব বা যথার্থ সুন্দর ভাবের উদয় হয় নাই। কিন্তু এ গ্রন্থটি বাঙ্গালী পাঠকদের রুচির এমন উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, যে, বঙ্গীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতার ইহা অতি উপাদেয় হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর যত লোকে পড়িয়াছে, তত লোকে কি শ্রেষ্ঠতর কাব্য কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়িয়াছে? বাঙ্গালী জাতি কত খানি কবি, ইহা হইতেও কি তাহার একটা পরিমাণ পাওয়া যায় না? এই সকল প্রাচীন বঙ্গীয় গ্রন্থে কল্পনা বঙ্গ রমণীদের মত অন্তঃপুরবদ্ধ। কখনো বা খুব প্রখরা, মুখরা, গাল ভরা পান খায়; হাতনাড়া ঘন ডাক, সতীনের "কেশ ধরি কিল লাথী মারে তার পিঠে" কখনো বা স্বামী আসিবে বলিয়া

"পরে দিব্য পাট শাড়ি, কনক রচিত চুড়ি
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।"

কখনো বা স্বামী প্রবাসে, সতীনের নিগ্রহে ভাল করিয়া খাইতে পায় না, ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া থাকিতে হয়। কত অল্প আয়তন স্থানে কল্পনাকে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। ধনপতি একবার বঙ্গদেশ ছাড়িয়া সিংহলে গিয়াছিল বটে, কিন্তু হইলে হয় কি, স্বর্গে গেলেও যদি বাঙ্গালী ইন্দ্র, বাঙ্গালী ব্রহ্মা দেখা যায়, তবে সিংহলে নূতন কিছু দেখিবার প্রত্যাশা কি রূপে করা যায়? কবিকঙ্কণচণ্ডী অতি সরস কাব্য সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীরা এ কাব্য লইয়া গর্ব্ব করিতে পারে, কিন্তু ইহা এমন কাব্য নহে, যাহা লইয়া সমস্ত পৃথিবী গর্ব্ব করিতে পারে, অত আশায় কাজ কি, সমস্ত ভারতবর্ষ গর্ব্ব করিতে পারে। তখনকার বঙ্গবাসীর গৃহ অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। কবিকঙ্কনের কল্পনা তখনকার হাটে, ঘাটে, মাঠে, জমিদারের কাছারিতে, চাষার ভাঙ্গা কুঁড়েতে, মধ্যবিত্ত লোকের অন্তঃপুরে যথেষ্ট বিচরণ করিয়াছে। কোথায় ব্যাধের মেয়ে

"মাংস বেচি লয় কড়ি, চাল লয় ডালি বড়ি
শাক বাইগুণ কিনয়ে বেসাতি।"

কোথায় চাষার—"ভাঙ্গা কুঁড়িয়া, তাল পাতার ছাউনি" আছে, সেখানে অল্প "বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় ভাসিয়া যায় বাণ।" কোথায় গাঁয়ের মণ্ডল ভাঁড়ু দত্ত হাটে আসিয়াছে—

"পসারী পসার লুকায় ভাঁড়ুর তরাসে।
পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি,
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি"

তাহা সমস্ত তিনি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু এই হাট মাঠই কি কল্পনার বিচরণের পক্ষে যথেষ্ট? কল্পনার, ইহা

অপেক্ষা উপযুক্ততর ক্রীড়াস্থল আছে। যে কল্পনা রাম, সীতা, অর্জ্জুন সৃষ্টি করে, তাহার পক্ষে কি, কালকেতু, ভাঁড়ুদত্ত ও লহনা, খুল্লনাই যথেষ্ট ? পর্ব্বতে, সমুদ্রে, তারাময় আকাশে জ্যোৎস্নায়, পুষ্পবনে যাহার লীলা, হাট, বাজার, জমিদারীর কাছারীতে তাহাকে কি তেমন শোভা পায় ? কবিকঙ্কণের কাব্য অতি সরস কাব্য। কিন্তু উহা লইয়াই আমরা বাঙ্গালী জাতিকে কবি জাতি বলিতে পারি না। যাহাতে আদর্শ সৌন্দর্য্য, আদর্শ মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত আছে, বৈচিত্র্যহীন বঙ্গ-সাহিত্যে এমন কবিতা কোথায় ?

আধুনিক বাঙ্গালী কবিতা লইয়া তেমন বিস্তারিত আলোচনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সাধারণ কথায় বলিতে হইলে বলা যায়, কবির সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে; সজনি, প্রিয়তমা, প্রণয়, বিরহ, মিলন লইয়া অনেক কবিতা রচিত হইয়া থাকে, তাহাতে নূতন খুব কম থাকে এবং গাঢ়তা আরো অল্প। আধুনিক বঙ্গ কবিতায় মনুষ্যের নানাবিধ মনোবৃত্তির ক্রীড়া দেখা যায় না। বিরোধী মনোবৃত্তির সংগ্রাম দেখা যায় না। মহান ভাব ত নাইই। হৃদয়ের কতকগুলি ভাসা-ভাসা ভাব লইয়া কবিতা। সামান্য নাড়া পাইলেই যে জল-বুদ্বুদ গুলি হৃদয়ের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে তাহা লইয়াই তাঁহাদের কারবার। যে সকল ভাব হৃদয়ের তলদেশে দিবানিশি গুপ্ত থাকে, নিদারুণ ঝটিকা উঠিলেই তবে যাহা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সহস্র ফেনিল মস্তক লইয়া তীরের পর্ব্বত চূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসে সে সকল আধুনিক বঙ্গকবিদের কবিতার বিষয় নহে। তথাপি কি করিয়া বলি বাঙ্গালী কবি ? হইতে পারে বাঙ্গালায় দুই একটা ভাল কবিতা আছে, দুই একটি মিষ্ট গান আছে, কিন্তু সেই গুলি লইয়াই কি বাঙ্গালী জাতি অন্যান্য জাতির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিতে পারে যে, বাঙ্গালী কবি ?

—:০:—

কামিনী ফুল।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

ছিছি সখা কি করিলে ? কোন প্রাণে
পরশিলে ?
কামিনী কুসুম ছিল বন আলো করিয়া,
মানুষ পরশ তাহা, সহিতে না পারি আহা
অমনি শতধা হোয়ে পড়িল গো ঝরিয়া।
জানত কামিনী সতী—কোমল কুসুম অতি
দূর হোতে দেখিবারে-পরশিতে নহে গো,
দূর হোতে বায়ু তার, এনে দেয় বাস ভার,
কাছে গেলে মানুষের শ্বাস নাহি সহে গো!
মধুপের পদক্ষেপে পড়িতেছে কেঁপে কেঁপে,
কাতর হোতেছে কত প্রভাতের সমীরে,
পরশিতে রবি কর—শুকাইছে কলেবর
শিশিরের ভরটুকু সহিছেনা শরীরে!
হেন কোমলতাময় ফুল কি না ছুঁলে নয়!
হা সখা, কেমন বন ছিল আলো করিয়া,
মানুষ পরশ তাহা সহিতে না পারি আহা,
অমনি শতধা হোয়ে পড়িল গো ঝরিয়া!

স্বর রহস্য।

গত বারে স্থির হইয়াছে যে, সপ্তকের সাতটি স্বরের মধ্যে সা গা এবং পা এই তিনটি স্বর সম্বাদী নামের যোগ্য,—কেননা সা বাজাইলে তাহার সঙ্গে এক সপ্তক উচ্চের পা এবং দুই সপ্তক উচ্চের গা (অর্থাৎ প্রথম সপ্তকের সা' বাজাইলে দ্বিতীয় সপ্তকের পা এবং তৃতীয় সপ্তকের গা) সুক্ষ্মরূপে অনুরণিত হইয়া থাকে,—কেন যে এরূপ হয় তাহা পরে দেখা যাইবে। কিন্তু একা কেবল সম্বাদী স্বরে কিছুই হয় না,—এমন এক দল স্বর থাকা চাই যাহার সঙ্গে তাহার পাল্লা দেওয়া চলে, এই দলের স্বরকেই আমরা বিবাদী নামে নির্ব্বাচন করিতেছি;—বিবাদী স্বরের সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে সম্বাদী স্বরের মাধুর্য্য খোলে না —রজনীর সন্নিকর্ষ বশতই উষার রূপ লাবণ্যের এতাধিক মর্য্যাদা। বিবাদী স্বর যে, পদার্থটা কি তাহা জানিতে হইলে অগ্রে গ্রাম কাহাকে বলে তাহা জানা আবশ্যক; কেননা পরে দেখা যাইবে যে, এক-গ্রাম নিয়স্থিত সংবাদী স্বর-ত্রয় স্বগ্রামের বিবাদী স্বরের দলভুক্ত।

একটি কথা পূর্ব্বাহ্নে বলিয়া রাখি;—আমরা সংবাদী বিবাদী বা অনুবাদী বলিয়া যাহা কিছু ধার্য্য করিতেছি বা ভবিষ্যতে করিব, তাহার সহিত সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রায় সকল বিষয়েই মিলিবে কেবল নামে মিলিবে না; সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থে ঐ নাম-গুলি ব্যবহৃত হইয়াছে—কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পরে খুলিয়া দেওয়া যাইবে;—সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে মা এবং পা সা'র সম্বাদী স্বর বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, আমরা যে অর্থে পা'কে সা'র সম্বাদী স্বর বলিয়া ধার্য্য করিতেছি, সংস্কৃত সঙ্গীত-শাস্ত্রকারেরা বুঝি-বা সেই অর্থে পা'কে সা'র সম্বাদী-শ্রেণীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন;—সা এবং পা'র মধ্যে যদি সম্বাদি-সম্বন্ধ থাকিল তবে মা এবং সা'র মধ্যে তাহা ত থাকিবেই; কেননা সা হইতে পা যত দূর উচ্চে অবস্থিতি করে, মা হইতে সা ঠিক তত দূর উচ্চে অবস্থিতি করে, যথা—
(১) সা, (২) রে (৩) গ, (৪) ম, (৫) প,—
(১) ম, (২) প, (৩) ধ, (১) নি, (৫) সা; সা'র পঞ্চম যেমন পা, মা র পঞ্চম তেমনি সা—সুতরাং সা এবং পা'র মধ্যে যদি সম্বাদী সম্বন্ধ থাকে, তবে মা এবং সা'র মধ্যে তাহা না থাকা হইতেই পারে না; তাই বুঝি সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে পা এবং মা এই দুটি স্বর সা'র সম্বাদী স্বর বলিয়া গৃহীত হইয়াছে,—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রকার যে অমন ধারা একটা কাঁচা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন—

ইহা অসম্ভব; তাঁহারা যে,আমাদের অত্রত্য অভিপ্রায়ানুসারে সম্বাদী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন নাই, তাহার প্রমাণ এই,—

যে সুরকে সপ্তকের প্রথম-স্থানে বরণ করা যায় তাহাকে বাদী সুর বলিয়া ধরা হউক্; সা'কে যদি বাদী সুর বল তবে পা তাহার পঞ্চম সুর; সা বাজাও আর অমনি পা তাহার সঙ্গে অনুরণিত হইবে; আর মা'কে যদি বাদী সুর বল—তবে সা তাহার পঞ্চম সুর, যথা (১) ম, (২) প, (৩) ধ, (৪) নি, (৫) সা; এ জন্য সা বাজাইলে যেমন প অনুরণিত হয়, মা বাঝাইলে সেই রূপ সা অনুরণিত হয়; এখানে এইটি বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, শেষোক্ত কারণে সা এবং মা'র মধ্যে যদিও সম্বাদী সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তা বলিয়া আমাদের এখানকার অভিপ্রায় মতে মা'কে সা'র সম্বাদী-সুর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না,—কারণ সা বাজাইলে পা-ই অনুরণিত হয়,—মা অনুরণিত হয় না;—মনে কর—ক'র পুত্র খ, খ'র পুত্র গ, তাহা হইলে দাঁড়াইবে যে, পিতা-পুত্র সম্বন্ধ ক-খ'র মধ্যেও বর্ত্তিতেছে, খ গ'র মধ্যেও বর্ত্তিতেছে,—কিন্তু তা' বলিয়া গ-কে যেমন খ'য়ের পুত্র বলিতেছ, ক-কে তেমন কিছু আর খ'য়ের পুত্র বলিতে পার না; যেমন ক খ গ তেমনি মা সা পা; সা'র সহিত পা'র-ও সম্বাদি-সম্বন্ধ, মা'র-ও সম্বাদী সম্বন্ধ, কিন্তু তা' বলিয়া পা যেমন সার সম্বাদী, মা'কে তেমন সা'র সম্বাদী বলিতে পার না,—সা-কেই মা'র সম্বাদী বলিতে পার। অতএব আমাদের এখানকার অভিপ্রায় মতে পা এবং মা উভয়ই সা'র সম্বাদী সুর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না—মা'কে বাদ দিতে হয়; কিন্তু সা বাজাইলে পা যেমন অনুরণিত হয় গা-ও তেমনি অনুরণিত হয়, এ জন্য আমাদের এখানকার অভিপ্রায়ানুসারে পা এবং গা উভয়ই সা'র সম্বাদী সুর বলিয়া ধর্ত্তব্য। এইরূপ দেখা যাইতেছে যদি আমাদের এখানকার অভিপ্রেত অর্থে সম্বাদী শব্দ ব্যবহার করা যায় তবে, পা এবং মা উভয়ই সা'র সম্বাদী এ কথা আর টেঁকিতে পারে না; অতএব যদি মানিতে হয় যে,প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রকারেরা সঙ্গীতের মূল বিবরণ-গুলি অবগত ছিলেন, তবে তাঁহারা যে আমাদের ঐ অর্থে সম্বাদী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভবে না। আপাততঃ এই অভাবপক্ষীয় (Negative) প্রমাণ-টুকুতেই সন্তোষ অবলম্বন করা হউক্;—প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা যে কি অর্থে সম্বাদী-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে; এখানে প্রমাণের যে কিছু অভাব রহিল তখন তাহার পূরণের আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না। জটিলতা এড়াইবার মানসে আমরা নূতন নাম-করণে বাধ্য হইতেছি—কিন্তু নামে কি আইসে যায়, ফলের না ব্যত্যয় হইলেই আর কোন চিন্তা নাই। সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের মতানুসারে গ্রাম শব্দে কি বুঝায় তাহা পরে বলিব; গ্রাম শব্দে এখন আমরা যাহা বুঝিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছি, তাহাই নিম্নে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

সা রে গ ম পা ধা নি সা এই আটটি সুরের নি পর্য্যন্ত ধরিলে তাহা সা-গ্রামের সপ্তক এবং সা পর্য্যন্ত ধরিলে তাহা ঐ গ্রামের অস্টক বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। দ্বিতীয় সা টি উপর-সপ্তকের সা। সা-হইতে রে যত মাত্রা উচ্চে অথবা রে-হইতে সা যত মাত্রা নীচে অবস্থিতি করে তাহাকে আমরা পূর্ণ-মাত্রা ব্যবধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিব, এবং উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ব্যবধানকে অর্দ্ধমাত্রা ব্যবধান কহিব। প্রথম সা হইতে অস্টম সা পর্য্যন্ত আটটি সুরের মধ্যে ব্যবধানের নিয়ম এইরূপ, যথা,—সা এবং রে-র মধ্যে যেরূপ ব্যবধান, রে এবং গ-র মধ্যেও তেমনি ব্যবধান—অর্থাৎ পূর্ণ ব্যবধান, কিন্তু গ এবং মা'র মধ্যেকার যে ব্যবধান তাহা অর্দ্ধেক মাত্রা বই নহে; আর-একটি অর্দ্ধেক মাত্রার ব্যবধান নি এবং সা'র মধ্যে দৃস্ট হয়, এই দুই স্থান ব্যতীত অস্টকের আর কোনখানেই পূর্ণ মাত্রা ভিন্ন অর্দ্ধ মাত্রা ব্যবধান স্থান পাইতে পারে না। অস্টকের কোন স্বরদ্বয়ের মধ্যেকার ব্যবধান নির্দ্দেশার্থে নিম্ন-প্রকার সংকেত ধার্য্য করা হইল যথা,—

সা-(১)-রে ইহার অর্থ সা এবং রে-র মধ্যে পূর্ণ মাত্রা ব্যবধান; সা-(২)-গ ইহার অর্থ সা এবং গ-র মধ্যে দুই পূর্ণ-মাত্রা ব্যবধান, কেননা সা এবং গা'র মধ্যে দুইটি পূর্ণ ব্যবধান যথা সা-(১)-রে-(১)-গ; গ-(॥০)-ম ইহার অর্থ গ' এবং ম'র মধ্যে অর্দ্ধ-মাত্রা ব্যবধান। এইরূপ ব্যবধান-চিহ্ন-সমেত সা-গ্রামের অস্টক নিম্নে বিন্যস্ত হইল।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭.
সা (১) রে (১) গ (॥০) ম (১) প(১) ধ(১)নি(॥০)সা

উপরে সাত জায়গাকার সাতটি ব্যবধানের স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাহাদের মস্তকোপরি স্ব স্ব-স্থানোচিত অঙ্কপাত করা হইল। উপরে দেখিবে যে তৃতীয় ব্যবধান এবং সপ্তম-ব্যবধান উভয়েই অর্দ্ধ মাত্রা—এই যা' কেবল, নহিলে আর সমস্ত ব্যবধানই পূর্ণ মাত্রা। এখানে এই যে ব্যবধানের কথা বলা হইতেছে তাহা যে একেবারে শুভঙ্করের বচন তাহা মনে করিলে চলিবে না; অর্দ্ধ মাত্রার অর্থ অর্দ্ধেকের একটু আধটু কম, পূর্ণ-মাত্রার অর্থ কোথাও বা পূর্ণ মাত্রা কোথাও বা তাহার একটু আধটু কম; গণিতের অভ্রান্ত বচন অনুসারে অস্টকের ব্যবধান-গুলি কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা যথা-সময়ে আসিবে, এখন ও-সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে কতকগুলা জটিলতায় জড়াইয়া-পড়িয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে করিতেই প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হইবে,—প্রকৃত বক্তব্য যাহা তাহা নিরুদ্দেশ হইয়া পলায়ন করিবে।

সা-হইতে আরম্ভ করিয়া অস্টম পর্য্যন্ত অর্থাৎ উচ্চেকার সা পর্য্যন্ত উঠিলে যেমন একটি অস্টক প্রস্তুত হয়, তেমনি যে-কোন স্বর হউক্ না কেন তথা-হইতে (ঐ একই নিয়মানুসারে) তাহার অস্টম স্বর পর্য্যন্ত উঠিলে তেমনি-ধারা আর একটি অস্টক প্রস্তুত হইবে; কিন্তু ব্যবধান-মাত্রার নিয়ম যাহা ইতি পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার যেন ব্যত্যয় না হয়—

অর্থাৎ নূতন অস্টকটির তৃতীয় ব্যবধান এবং সপ্তম ব্যবধান যেন অর্দ্ধ-মাত্রা হয় ও অবশিষ্ট পাঁচটি ব্যবধান যেন পূর্ণমাত্রা হয়, —এটির যেন ব্যত্যয় না হয়। যে অস্টকের আরম্ভ স্থানে সা তাহাই সা-গ্রাম বলিয়া উক্ত হইবে, যাহার আরম্ভস্থানে রে তাহা রে-গ্রাম,—ইত্যাদি-ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম ভিন্ন ভিন্ন নামে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

সা-গ্রামের তৃতীয় ব্যবধান গ-(॥০)-ম এবং সপ্তম ব্যবধান নি-(॥০)-সা এই দুটি, ব্যবধান অর্দ্ধমাত্রা আর অবশিষ্ট পাঁচটি ব্যবধান পূর্ণমাত্রা,—এই তথ্যটি মনে জাগরূক রাখিয়া এইখানে এ-টি এক বার মিলাইয়া দেখা অতীব আবশ্যক যে, সা-গ্রামের সকল সুর অবিকৃত ভাবে অন্য কোন গ্রামে (যেমন ম-গ্রামে) স্থান পাইতে পারে কি না? অর্থাৎ সা রে গ ম পা ধা নি সা এ যেমন সা-গ্রামের অস্টক, এইরূপ ম প ধ নি সা রে গ ম—ম-গ্রামের অস্টক হইতে পারে কি না? যদি শেষোক্ত আটটি স্বরের তৃতীয় এবং সপ্তম ব্যবধান অর্দ্ধ মাত্রা হয়—অর্থাৎ ঐ দুই ব্যবধান-স্থানে যদি গ-[॥০]ম কিংবা নি-(॥০)-সা বসে, তবেই শেষোক্ত আটটি সুর ম-গ্রামের অস্টক পদে আরূঢ় হইতে পারে; কেন না তাহা হইলে অস্টকের যে-যে স্থানে যে-যে মাত্রা ব্যবধান থাকা নিয়ম-সঙ্গত সেই-সেই স্থানে সেই সেই মাত্রা ব্যবধান বর্ত্তিবে, তাহা হইলেই হইল—অস্টকের তা ভিন্ন আর কিছুই চাই না। কিন্তু সা রে গ ম প ধ নি সা-র যে-যে স্থানে যে-যে মাত্রা ব্যবধান, ম প ধ নি সা রে গ ম'রও কি সেই-সেই স্থানে সেই-সেই মাত্রা ব্যবধান?—কই? সা রে গ ম পা ধা নি সা'র সহিত ম প ধ নি সা রে গ ম মিলাইয়া দেখিলে ব্যবধান বিষয়ে উহাদের মধ্যে যে মূলেই অনৈক্য নাই ইহা বলিতে পারা যায় না, যথা,

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

স্য(১)রে(১) গ(॥০) ম (১) প (১)ধ (১)নি(॥০)সা

ম (১) প (১) ধ (১) নি (॥০)সা (১) রে(১)গ(॥০)ম

দেখ প্রথম পংক্তির তৃতীয় ব্যবধান ॥০ মাত্রা যথা—গ (॥০)-ম, দ্বিতীয় পংক্তির তৃতীয় ব্যবধান ১ মাত্রা যথা—ধ-(১)-নি; চতুর্থ ব্যবধান-স্থানেও উপরের পংক্তিতে ১ মাত্রা ও নীচের পংক্তিতে ॥০ মাত্রা দেখা যাইতেছে; এ জন্য ম প ধ নি সা রে গ ম সর্ব্বাংশে ম-গ্রামের অস্টক নহে। ম-গ্রামের অস্টক তবে কি তাহা দেখা যাউক্;—নিম্ন-পংক্তিস্থিত নি'কে যদি অর্দ্ধ মাত্রা কমানো যায় তাহা হইলে ধ-(১)-নি'র পরিবর্ত্তে ধ-(॥০)-নি হয় এবং নি (॥০)-সার পরিবর্ত্তে নি-(১)-সা হয়, তাহা হইলেই উপর-পংক্তি এবং নিচের পংক্তির মধ্যে আদবেই কোন ব্যবধান-বৈষম্য থাকে না। কোন স্বরকে অর্দ্ধ মাত্রা নীচু করিলে তাহার নাম সেই স্বরই থাকে কেবল তাহাতে কোমল-উপাধি বর্ত্তে; যথা, শুদ্ধ-নিখাদকে যদি অর্দ্ধ মাত্রা নীচে নাবানো যায় তবে তাহা কোমল নিখাদ হইয়া দাঁড়ায়; কোমল সুরের নীচে কসিচিহ্ন দেওয়া যাইবে যথা নি = কোমল নি। কোন সুরকে

অর্দ্ধমাত্রা উচ্চে উঠাইলে তাহা তীব্র উপাধি প্রাপ্ত হয়,—তীব্র সুরের মস্তকোপরি কসি চিহ্ন দেওয়া যাইবে যথা,—ম্ব =তীব্র মধ্যম বা কড়ি মধ্যম। সা-গ্রাম এবং ম-গ্রাম নিম্নে মিলাইয়া দেখা যাইতেছে,—

১ ২ ৩. ৪ ৫ ৬ ৭
সা(১) রে(১) গ(॥০) ম(১) প(১) ধ(১) নি(॥০)সা
ম(১) প(১) ধ(॥০) নি(১) সা(১) রে(১) গ(॥০) ম্ব

উপরে দেখ, প্রথম পংক্তির যে স্থানে ১মাত্রা ব্যবধান—দ্বিতীয় পংক্তিরও সেই স্থানে ১ মাত্রা ব্যবধান, ও প্রথম পংক্তির যে স্থানে ॥০মাত্রা ব্যবধান—দ্বিতীয় পংক্তির ও সেই স্থানে ॥০মাত্রা ব্যবধান; ব্যবধানের নিয়ম দুই গ্রামেই সমান বলবৎ রহিয়াছে—দুই গ্রামেরই তৃতীয় এবং সপ্তম ব্যবধান ॥০ মাত্রা, অবশিষ্ট পাঁচটি ব্যবধান পূর্ণ-মাত্রা। উপরে দেখ, দেখিবে যে সা-গ্রামের আর সকল সুরই মগ্রামে অবিকৃত ভাবে প্রবেশ পাইয়াছে—কেবল নি'কে কোমল হইয়া ম-গ্রামে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। ম—সা'র চতুর্থ, কিন্তু সা—ম'র পঞ্চম যথা (১)ম, (২)প (৩)ধ (৪) নি, (৫) সা; এজন্য ম'কে যদি প্রথম সুর সা বলিয়া ধরা যায়, তবে সা'কে পা বলিতে হয়, যেহেতু সা ম'র পঞ্চম; অতএব ম-গ্রামকে যদি প্রথম গ্রাম বলিয়া ধরা যায় তবে সা-গ্রামকে পঞ্চম গ্রাম বলিতে হয়; উপরে দেখিবে যে প্রথম-গ্রামের সুর পঞ্চম গ্রামে লইয়া যাইতে হইলে (যেমন ম-গ্রামের অষ্টককে সা-গ্রামে লইয়া যাইতে হইলে) সেই প্রথম গ্রামের (ম-গ্রামের) মধ্যমকে (নি'কে) তীব্র করিতে হয় অর্থাৎ অর্দ্ধ-মাত্রা উচ্চে উঠাইতে হয় (কোমল নি'কে শুদ্ধ নি করিতে হয়); এবং প্রথম গ্রামের অষ্টককে মধ্যম গ্রামে লইয়া যাইতে হইলে (যেমন সা-গ্রামের অষ্টককে ম-গ্রামে লইয়া যাইতে হইলে) সেই প্রথম গ্রামের (সা-গ্রামের) সপ্তমকে কোমল করিতে হয়। পুনশ্চ স্ব-গ্রামের নিখাদ কোমল হইয়া মধ্যম-গ্রামের মধ্যম-স্থানে বসে (যেমন সা-গ্রামের নি কোমল হইয়া মধ্যম গ্রামের মধ্যম স্থানে নি হইয়া বসিয়াছে) এবং স্ব-গ্রামের মধ্যম তীব্র হইয়া পঞ্চম গ্রামের সপ্তম স্থানে বসে (যেমন মধ্যম গ্রামের মধ্যম (নি) তীব্র হইয়া অর্থাৎ অর্দ্ধ মাত্রা উচ্চ হইয়া, নি—নি হইয়া সা-গ্রামে বসিয়াছে)।

এখন ইহা বলা বাহুল্য যে সা-গ্রামের অষ্টক পা-গ্রামে লইয়া যাইতে হইলে সা-গ্রামের মধ্যমকে তীব্র করিয়া প-গ্রামের সপ্তম স্থানে বসাইতে হয়, যথা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
সা(১) রে(১) গ(॥০) ম(১) প(১) ধ(১)নি(॥০)সা
পা(১) ধ(১) নি(॥০) সা(১) রে(১)গ(১) ম্ব(॥০)প

যদি নীচের পংক্তিতে ম্ব'র পরিবর্ত্তে ম বসানো হইত তাহা হইলে উপরে ৬ষ্ঠ এবং

৭ম ব্যবধান যেমন উভয় পংক্তিতেই সমান তাহা না হইয়া এইরূপ দাঁড়াইত, যথা,

৬ ৭

ধ (১) নি (৷৷০) সা

গ (৷৷০) ম (১) পা

এখানে দেখ উপরের ব্যবধান যেখানে ১-মাত্রা, নীচের ব্যবধান সেখানে ৷৷০মাত্রা, আর উপরের যেখানে ৷৷০মাত্রা, নীচের সেখানে ১মাত্রা।

এখানে এইটি বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, ব্যবধান বিষয়ে ৭

প(১) ধ(১) নি(৷৷০) সা, = সা(১) রে(১) গ(৷৷০)ম
সুতরাং প (২৷৷০) সা, = সা (২৷৷০) ম

অর্থাৎ পা হইতে সা ২৷৷০ মাত্রা উচ্চে অবস্থিতি করে, সা হইতে ম ২৷৷০ মাত্রা উচ্চে অবস্থিতি করে, পা (২৷৷০) সা (২৷৷০) ম; সুতরাং সা-হইতে, ম যত-মাত্রা উচ্চে অবস্থিতি করে, পা ঠিক্ তত মাত্রা নীচে অবস্থিতি করে; এ জন্য মধ্যম-গ্রামকে যদি সা-গ্রামের এক গ্রাম উচ্চ বলিয়া ধরা যায় তবে পঞ্চম গ্রামকে তাহার এক গ্রাম নীচে বলিয়া ধরিতে হয়; এতদনুসারে দাঁড়াইতেছে যে, স্ব-গ্রামের সপ্তম (যেমন সা গ্রামের নি) কোমল হইয়া উপর-গ্রামের (যেমন মধ্যম-গ্রামের) মধ্যম পদ প্রাপ্ত হয় এবং স্ব-গ্রামের মধ্যম (যেমন সা-গ্রামের ম) তীব্র হইয়া নিম্ন-গ্রামের (যেমন প-গ্রামের) সপ্তম পদ-প্রাপ্ত হয়। উপরের ঐ দুই বিবরণ হইতে গ্রাম পরিভ্রমণের এই দুটি নিয়ম নিষ্কর্ষণ করিয়া পাওয়া যাইতেছে যথা—

• প্রথম নিয়ম। স্ব-গ্রামের সপ্তককে এক গ্রাম উচ্চে (অর্থাৎ স্ব-গ্রামের সপ্তককে স্বীয় চতুর্থ-স্বরের গ্রামে) লইয়া যাইতে হইলে স্বীয় সপ্তমকে কোমল করিয়া গম্য গ্রামের চতুর্থ (অর্থাৎ মধ্যম) পদে বসাইতে হয়—তদ্ভিন্ন আর কোন স্বর পরিবর্ত্তন করিতে হয় না।

দ্বিতীয় নিয়ম। স্ব-গ্রামের সপ্তককে এক গ্রাম নীচে (অর্থাৎ স্বগ্রামের পঞ্চম-স্বরের গ্রামে) লইয়া যাইতে হইলে স্বীয় মধ্যমকে তীব্র করিয়া গম্য গ্রামের সপ্তম পদে বসাইতে হয়—তদ্ভিন্ন আর কোন স্বর পরিবর্ত্তন করিতে হয় না।

এই দুই নিয়ম অল্প কথায় বলিতে হইলে এই দাঁড়ায়,—প্রথম, স্বগ্রামের সপ্তম কোমল হইয়া উচ্চ গ্রামের মধ্যম হয়; দ্বিতীয় স্বগ্রামের মধ্যম তীব্র হইয়া নিম্ন গ্রামের সপ্তম হয়।

নি = মধ্যম গ্রামের মধ্যম,—এজন্য (প্রথম নিয়মানুসারে) সা-গ্রামের সপ্তম নি যেমন কোমল হইয়া ম-গ্রামের মধ্যম-পদে আরূঢ় হয়, সেইরূপ ম-গ্রামের সপ্তম (গ) কোমল হইয়া নি গ্রামের মধ্যম পদে আরূঢ় হয়; নি গ্রামে একে নি কোমল তাহার উপর আবার গ কোমল হইয়া দাঁড়ায়। সা-গ্রামের এক-গ্রাম উচ্চে ম-গ্রাম তাই ম-গ্রামে একটি মাত্র কোমল স্বর—নি; সা-গ্রামের দুই গ্রাম উচ্চে মধ্যমের মধ্যম-গ্রাম—নি গ্রাম, তাই নি-গ্রামে দুইটি কোমল স্বর—নি, গ; সা-গ্রামের তিন গ্রাম উচ্চে মধ্যমের-মধ্যম-তস্য-মধ্যম গ্রাম—গ-গ্রাম, তাই গ-গ্রামে তিনটি কোমল স্বর—নি, গ, ধ;—এইরূপ করিয়া যতই উপর-উপর গ্রামে উঠা যাইবে, ততই এক-এক করিয়া কোমলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে; যখন কোমল-পঞ্চম-গ্রামে পৌঁছানো যাইবে—তখন দেখিবে যে, কোমলের সংখ্যা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত

হইয়াছে। এমনি আবার (উপরি-উক্ত দ্বিতীয় নিয়মানুসারে) সা গ্রাম হইতে পঞ্চম গ্রামে, পঞ্চম হইতে পঞ্চমের পঞ্চম গ্রামে, তথা হইতে তাহারো আবার পঞ্চম গ্রামে, এইরূপ করিয়া যত নীচে নীচে নাবা যাইবে ততই এক-একটি করিয়া তীব্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, এবং পরিশেষে যখন শুদ্ধ নিখাদ-গ্রামে পদার্পণ করা যাইবে তখন দেখিবে যে, তীব্রের সংখ্যা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। নিম্নস্থিত গ্রাম-তালিকায় সমস্ত গ্রামের সমস্ত বিবরণ মিলাইয়া পাওয়া যাইবে ;—তাহার মধ্যেকার কোন একটা গ্রাম —যেমন রে-গ্রাম লও, তাহার সপ্তম স্বর কি—দেখ,—রে-গ্রামের সপ্তম স্বর সা ; সা-কে কোমল কর, অর্থাৎ অর্দ্ধ-মাত্রা নীচে নাবাও—সা কর ; দেখিবে যে, রে-র স্ব-গ্রামের সেই কোমল-সপ্তম (সা) উপর গ্রামের (উপর-পংক্তিস্থ প গ্রামের) মধ্যম (কি না চতুর্থ) পদে বসিয়াছে ; এমনি আবার দেখিবে যে, রে-গ্রামের মধ্যম (কি না পা) তীব্র হইয়া—পা-হইয়া—নিম্ন-গ্রামের (নিম্ন-পংক্তিস্থ ধ-গ্রামের) সপ্তম পদে বসিয়াছে। পুনশ্চ, দুইটি অঙ্গুলি-চিহ্ন-স্থানে প্রত্যেক গ্রামেরই ॥০ ব্যবধান, তদ্ব্যতীত আর সকল স্থানেই ১ ব্যবধান জানিবে।

গ্রাম তালিকা।

		১	২	৩	☟	৪	৫	৬	৭	☟	৮	তীব্র কোমলের সংখ্যা
(১)	সা-গ্রাম।	সা,	রে,	গ,		ম,	প,	ধ,	নি,		সা	(০)
(২)	পা-গ্রাম।	প,	ধ,	নি,		সা,	রে,	গ,	ম,		প	(১ তীব্র)
(৩)	রে-গ্রাম।	রে,	গ,	ম,		প,	ধ,	নি,	সা,		রে	(২ ঐ)
(৪)	ধা-গ্রাম।	ধা,	নি,	সা,		রে,	গ,	ম,	প,		ধ	(৩ ঐ)
(৫)	গা-গ্রাম।	গ,	ম,	পা,		ধ,	নি,	সা,	রে,		গ	(৪ ঐ)
(৬)	নি-গ্রাম।	নি,	সা,	রে,		গ,	ম,	পা,	ধ,		নি	(৫ ঐ)
(৭)	প-গ্রাম।	প,	ধা,	নি,		নি,	রে,	গ,	ম,		প	(৬ কোমল)
(৬)	রে-গ্রাম।	রে,	গ,	ম,		প,	ধ,	নি,	সা,		রে	(৫ ঐ)
(৫)	ধা-গ্রাম।	ধ,	নি,	সা,		রে,	গ,	ম,	পা,		ধ,	(৪ ঐ)
(৪)	গ-গ্রাম।	গ,	ম,	প,		ধ,	নি,	সা,	রে,		গ,	(৩ ঐ)
(৩)	নি-গ্রাম।	নি,	সা,	রে,		গ,	ম,	প,	ধ,		নি,	(২ ঐ)
(২)	ম-গ্রাম।	ম,	প,	ধ,		নি,	সা,	রে,	গ,		ম	(১ ঐ)
(১)	সা-গ্রাম।	সা,	রে,	গ,		ম,	প,	ধ,	নি,		স	(০)

উপরে সা-গ্রাম; এক গ্রাম নীচে প-গ্রাম,—প-গ্রামের পঞ্চম—রেখাব, এজন্য প-গ্রামের এক গ্রাম নীচে রে-গ্রাম, রে-গ্রামের পঞ্চম—ধৈবত, এজন্য তাহার এক গ্রাম নীচে ধা-গ্রাম; এইরূপ পঞ্চম, তাহার পঞ্চম, তস্য পঞ্চম করিয়া নীচে নামিয়া চলিলে অবশেষে ম-গ্রামের পঞ্চম সা-গ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে; আর সর্ব্ব নীচেকার সা-গ্রাম হইতে যদি মধ্যম, তাহার মধ্যম তস্য মধ্যম করিয়া উচ্চে উচ্চে আরোহণ করা যায় তাহা হইলে অবশেষে পঞ্চমের মধ্যম সা-গ্রামে উপনীত হইতে হইবে; উপর-হইতে সর্ব্ব-নীচে নামিলেও সা-গ্রাম, আর নীচে হইতে সর্ব্বোচ্চে উঠিলেও সা-গ্রাম, প্রভেদ কেবল এই যে আরোহণ-কালে মধ্যম হইতে মধ্যম পরম্পরাকে সোপান করিতে হয়, অবরোহণ কালে পঞ্চম হইতে পঞ্চম পরম্পরাকে সোপান করিতে হয়; পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার মানসে স্বদেশ ছাড়িয়া দূর হইতে দূর দেশে যত যাও ততই স্বদেশের নিকটবর্ত্তী হইতে হইবে, এবং অবশেষে তোমাকে স্বদেশে আসিয়া উপনীত হইতে হইবে, তেমনি উপরের এক গ্রাম ছাড়িয়া দূর হইতে দূরতর গ্রামে প্রয়াণ কর, দ্বাদশটি গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়াছ কি আর অমনি স্বস্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছ।

এখন, বিবাদী-স্বর যে কি পদার্থ তাহা বলিবা-মাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে—আর কিছু নহে এক গ্রাম নীচেকার সম্বাদী স্বর-ত্রয় স্বগ্রামের বিবাদী স্বরের দলভুক্ত এবং সেই তিন স্বর-ভিন্ন আর একটি স্বরও বিবাদী-শ্রেণী-ভুক্ত,—সে-টি এক গ্রাম নীচেকার কোমল সপ্তম সুতরাং স্ব-গ্রামের মধ্যম (কোমল সপ্তমের যে একটি দূর-সম্পর্কীয় সম্বাদিতা আছে তাহা যথা-সময়ে প্রদর্শিত হইবে, এখন সে বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করা বিবেচনা-সিদ্ধ নহে)। প্রত্যেক গ্রামেরই প্রথম তৃতীয় এবং পঞ্চম স্বর তাহার সম্বাদী স্বর এবং সম্বাদী স্বর তিনটির মধ্যে প্রথম স্বরটি বাদী স্বর বলিয়া উক্ত হয়—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; এখন জানা আবশ্যক যে প্রত্যেক গ্রামের পঞ্চম সপ্তম এবং দ্বিতীয় স্বর তাহার নিম্ন গ্রামের (গ্রাম-তালিকা দেখ) প্রথম তৃতীয় এবং পঞ্চম (সুতরাং সংবাদী) স্বর, ও স্ব-গ্রামের মধ্যম স্বর নিম্নগ্রামের কোমল সপ্তম স্বর; এই সূত্রে স্ব-গ্রামের দ্বিতীয় (নিম্ন গ্রামের পঞ্চম), মধ্যম (নিম্ন-গ্রামের কোমল সপ্তম), পঞ্চম (নিম্ন-গ্রামের প্রথম) এবং সপ্তম (নিম্ন গ্রামের তৃতীয়) এই চারিটি স্বর বিবাদী স্বরের পদারূঢ় হইয়াছে। সা-গ্রামের সংবাদী-বিবাদী-স্বর নিম্নে শ্রেণীবদ্ধ হইল এবং (১) (২) প্রভৃতি অঙ্কদ্বারা স্বরস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল যথা।

সংবাদী	বিবাদী
(১) সা	(২) রে
(৩) গ	(৪) ম
(৫) প	(৫) প
	(৭) নি

যেমন সা-গ্রামের তেমনি প্রত্যেক

গ্রামের (১) অর্থাৎ প্রথম স্বর, (৩) অর্থাৎ তৃতীয় স্বর, (৫) অর্থাৎ পঞ্চম স্বর তাহার স্ব-গ্রামের সংবাদী শ্রেণী-ভুক্ত ও তাহার (২) (৪) (৫) (৭) তাহার স্ব-গ্রামের বিবাদী শ্রেণী ভুক্ত ; দেখ, পঞ্চম স্বর সংবাদী এবং বিবাদী উভয় শ্রেণী ভুক্ত। যদি সংবাদী স্বরের দুই দিকে [ ] এইরূপ ঘের দেওয়া যায়, বিবাদী স্বরের দুই দিকে ( ) এইরূপ ঘের দেওয়া যায়, এবং উভয় জাতীয় স্বরের দুইদিকে [( )] এইরূপ উভয়-প্রকার ঘের দেওয়া যায়, তাহা হইলে সা-গ্রামের সপ্তক এইরূপ দাঁড়ায় যথা, [সা] (রে) [গ] (ম) [(প)] ধ (নি) ; যেমন সাগ্রামের তেমনি সকল গ্রামেরই সপ্তকের [১-ম] (২-য়) [৩-য়] (৪র্থ) [(ম-ম)] ৬ষ্ঠ (৭-ম)।

এখন বক্তব্য এই যে সংবাদী এবং বিবাদী স্বরের পর্য্যায়-সাধন পূর্ব্বক—তরঙ্গ-ভঙ্গি-ক্রমে স্বর-মালা গ্রথিত হইলে তবেই তাহা গীতাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়। সামান্যত গীত বাঁধিবার নিয়ম এই যে যেখানে জোর দেওয়া আবশ্যক সেইখানেই সংবাদী স্বর এবং যেখানে তাহার সঙ্গে লেজুড়-দেওয়া চাই সেইখানে বিবাদী স্বর বসানো কর্ত্তব্য ; সংবাদী এবং বিবাদী স্বরের পর্য্যায় যে কিরূপ—নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ; যে যে স্বরের মস্তকে বিন্দু-চিহ্ন দেখিবে তাহা উচ্চ সপ্তকের স্বর, ও যে যে স্বরের নিম্ন-স্থানে বিন্দু দেখিবে তাহা নিম্ন সপ্তকের স্বর—এই রূপ জানিবে।

০ (সম্বাদী) ১ (বিবাদী)
স স গ গ । ম পঁ প প।
ল লি ত ল । ব - অ ঙ্গ ল।

২ (সম্বাদী) ৩ (বিবাদী)
পা— প 'প । পা— নি নি।
তা-আ প রি । শী-ঈ ল ন।

০ (সম্বাদী) ১ (বিবাদী)
সা— স স । নি প প ম।
কো-ও ম ল । ম ল য় স।

২ (সম্বাদী) ৩ (বিবাদী)
গা— সা— । নি— পা—।
মী-ঈ রে-এ । এ-এ এ-এ।

০ (সম্বাদী)। ১ (বিবাদী) । ২ (সংবাদী)
স স গ গ। ম প প প। পা——
ল লি ত ল। ব- অ ঙ্গ ল। তা——

উপরে বেহাগ-রাগের একটি উদাহরণ (যত সোজা হইতে পারে তাহার মত' করিয়া) গড়িয়া দেওয়া হইল ; জয়দেবের "ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল মলয়-সমীরে" এই অংশটুকু সাদা-সীধা রকমে বেহাগরাগে বসানো হইল। প্রত্যেক তালের আরম্ভ-স্থানে সেই তালের সংখ্যা-বাচক অঙ্ক (ফাঁকের জায়গায় ০, প্রথম তালের জায়গায় ১, দ্বিতীয় তালের জায়গায় ২, এবং তৃতীয় তালের জায়গায় ৩) বসানো হইল ; যে-যে স্বরের পরে কসি টানা হইয়াছে তাহার কাল-মাত্রা দীর্ঘ, তদ্ভিন্ন আর সকল স্বরেরই কাল-মাত্রা হ্রস্ব ; অর্থাৎ উচ্চারণ

কাল সম্বন্ধে ই-কার-হইতে ঈকার যত মাত্রা দীর্ঘ, (স। এই হ্রস্ব স্বর হইতে (স—) এই কসি-রেখা-যুক্ত দীর্ঘ স্বর তত মাত্রা দীর্ঘ জানিবে। ইহার পরে আসিতেছে অনুবাদী স্বর,—আগামী বারে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা যাইবে; কিন্তু পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে সংবাদী প্রভৃতি শব্দের অর্থ—এমন কি গ্রাম শব্দেরও অর্থ—আর-এক-প্রকার করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে—তাহা যে কিরূপ তাহা যথা-সময়ে প্রদর্শিত হইবে। আমাদের এখানকার সম্বাদী বিবাদী স্বরের এবং গ্রামের নিয়ম অগ্রে না আয়ত্ত করিলে, সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রকারদিগের সিদ্ধান্ত-গুলির মর্ম্ম গ্রহণ করা সুকঠিন; এজন্য আপাততঃ সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের চর্চ্চায় বিরত হইয়া স্বদেশ-বিদেশ-নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা যাইতেছে।

ক্রমশঃ

দণ্ডিনাচার্য্য।

"পূজ্যতমঃ কবীন্দ্রাণাং
দণ্ডী চ কালিদাসবৎ।"

অমৃতপ্রস্রবিণী বিশালকলেবরা সংস্কৃত ভাষা সুপ্রসিদ্ধ দণ্ডিনাচার্য্যের তূলিকা-সংস্পর্শে অনেক পরিমাণে সুরঞ্জিতা হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত "দশকুমার-চরিতে" সুভাবব্যঞ্জক ললিত পদ বিন্যাস দেখিয়া কোন্ সহৃদয় মহাত্মা না বিমোহিত হইয়াছেন? কে না তাঁহাকে এক জন অতি শীর্ষ-স্থানীয় সংস্কৃত-গদ্য-লিখক বলিয়া অন্তরের সহিত অর্চ্চনা করিয়াছেন? কাদম্বরী, দশকুমারচরিত, এবং বাসবদত্তা—এই তিন খানিই সংস্কৃত গদ্য কাব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তন্মধ্যে দণ্ডি কৃত দশকুমার-চরিতই সর্ব্বাদিম ও উৎকর্ষতায় বাণভট্টের কাদম্বরীর অব্যবহিত নিম্নাসনে অবস্থিত। আচার্য্য সময়ে মহাত্মা দণ্ডীই অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রথম সূত্র-পাত করেন। তাঁহার "কাব্যাদর্শকে" অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রথম আবিস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাব্যাদর্শ প্রণয়ন করিয়া দণ্ডী অলঙ্কার শাস্ত্রে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই প্রস্তাবে সেই বুধ-কেশরী আচার্য্য-প্রধান দণ্ডীর সময় বিনির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইব :—

অনেকের বিশ্বাস, মহাত্মা দণ্ডী খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন।[১] বোধ

১ জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

হয় ভোজপ্রবন্ধ প্রণেতা বল্লালই লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন। কেননা, বল্লাল, ভোজরাজ-প্রদত্ত একটী সমস্যা পূরণ করিবার জন্য মহাকবি কালিদাস, ভবভূতির নিকট দণ্ডীর মুখেঃ—

"চলতি শিশির-বাতে
মন্দ মন্দ প্রভাতে।" ২

এই শ্লোকার্দ্ধ ব্যক্ত করাইয়াছেন।

পুনশ্চ, এদেশে একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে; যাহাতে মহাকবি কালিদাস ও দণ্ডী একই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া প্রতীতি হইবে। সে কিংবদন্তীটী এইঃ—

একদা কালিদাস ও দণ্ডী এক সময়ে একত্র এক গণিকাগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দণ্ডী ও কালিদাসের কবিত্ব পরীক্ষার অভিপ্রায়ে সেই গণিকা কালিদাসকে একটী খদির-সারশূন্য তাম্বূল এবং দণ্ডীকে একটী চূণ (চূর্ণ)-শূন্য তাম্বূল খাইতে দেয়। খয়ের শূন্য পান পাইয়া কালিদাস গণিকাকে একটী শ্লোক দ্বারা এই কথা বলিলেনঃ—

"বিনা খদিরসারেণ
হারেণ হরিণীদৃশাম্।
নাধরে জায়তে রাগো
নানুরাগঃ পয়োধরে॥

আচার্য্য দণ্ডীও গণিকাকে আর একটী শ্লোক বলিলেন যথাঃ—

তূর্ণ মানীয়তাঞ্চূর্ণং
পূর্ণচন্দ্র-নিভাননে।
বিনা চূর্ণেন পর্ণানি
স্বর্ণবর্ণানি জায়তে?॥"

গণিকা দুই কবির মুখে এই দুইটী শ্লোক শ্রবণ করিল। কালিদাস অপেক্ষা দণ্ডীর শ্লোক সুললিত ও সুভাবব্যঞ্জক হওয়াতে কালিদাস অপেক্ষা দণ্ডীকেই শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রশংসা করিল। কালিদাস নিজেও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে তাহার শ্লোক অপেক্ষা বাস্তবিকই দণ্ডীর শ্লোক অধিক কবিত্বপূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং ন্যায়ের অনুরোধে অপার্য্যমানে বলিয়া উঠিলেন "আমা অপেক্ষাও আমার ভক্ত দণ্ডী অধিক কবি" ৩। বঙ্গীয় পণ্ডিতাভিমানী ভট্টাচার্য্যগণ এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া এখনো কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া দণ্ডীকে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

কিন্তু উল্লিখিত মতদ্বয়ের কোনটী অনুসরণ করিয়াই দণ্ডীর কাল সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ মনে একটী অভ্রান্ত সীমায় অবস্থান করা যায় না। কেননা প্রথমোক্ত মত ভোজ-প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। ভোজপ্রবন্ধের ঐতিহাসিক সত্যের যে একটুকুও মূল্য নাই তাহা অনেকেই জানেন। শেষোক্ত

২ সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত "ভোজ-প্রবন্ধ" ১২১ পৃষ্ঠা।

৩ এই কিংবদন্তীটী সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র প্রকাশিত "দশকুমার চরিতের বিজ্ঞাপনে কিছু রূপান্তরিত করিয়া লিখিত হইয়াছে।

মতটী মৌখিক কিংবদন্তী হইতে গৃহীত। ৪ সুতরাং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বলবৎ প্রমাণ প্রদর্শন না করিতে পারা যায় সে পর্য্যন্ত উহার সামগ্রিক-সংলগ্নতা বাস্তবিক হইলেও তাহা অপ্রামাণিক ও কাল্পনিক বলিয়া পরিগণিত। আমরা দণ্ডি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন সময়ের গ্রন্থ সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ বিবৃত করিতেছি। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলেই দণ্ডীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক আভাষ পাওয়া যাইবেঃ—

(ক) সুপ্রসিদ্ধ মল্লিনাথ সুরি তদীয় টীকা সকলে পুনঃ পুনঃ দণ্ডীর নাম ও তদীয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মল্লিনাথ, মাধব বৃত্তির নামোল্লেখ করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং মল্লিনাথকে খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যাইতে পারে না। ৫ খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সমকালেও দণ্ডী বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় এক জন বিখ্যাত লেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহাতে এই জানা গেল যে দণ্ডী ঐ সময় অপেক্ষাও অনেক প্রাচীনতম লোক।

(খ) দক্ষিণাবরনাথ-প্রণীত রঘুবংশের টীকায় দণ্ডীর নাম দৃষ্ট হয়। ৬ ঐ টীকায় হলায়ুধের (খৃঃ ১১০২ হইতে ১১২১ অব্দে যিনি বর্ত্তমান ছিলেন) নাম উল্লেখ আছে। আবার কোলাচল মল্লিনাথ সুরি দক্ষিণাবরের টীকা অবলম্বন করিয়া তাঁহার টীকা প্রণয়ন করেন। সুতরাং দক্ষিণাবরনাথ হলায়ুধ ও মল্লিনাথের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ সম্ভবতঃ খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশের কিম্বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধের লোক। দণ্ডী এ সময় অপেক্ষাও প্রাচীনতম লোক।

(গ) "ভোজ প্রবন্ধে" দণ্ডীর নাম উল্লেখ আছে। পণ্ডিত শেষগিরির মতে ১২০০ খৃঃ অব্দে বল্লাল "ভোজ প্রবন্ধ" প্রণয়ন করেন। "পৃথ্বীরাজ চৌহানরাসে" কবি চন্দবর্দাই ভোজ প্রবন্ধের নাম লিখিয়াছেনঃ—

"কিযৌ কলিকা মুয্য বাসং সুসুদ্ধ।
জিনৈ সেতবন্ধৌ তি ভোজন-প্রবন্ধ॥"

চাঁদ কবি খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের লোক; যথন তাঁহার গ্রন্থে ভোজ-প্রবন্ধের বিষয় দৃষ্ট হয়, তখন ঐ গ্রন্থ ১২০০ খৃঃ অব্দে লিখিত হইবে তাহাতে আমরা আশ্চর্য্য হই না। সুতরাং দণ্ডী উক্ত সময়েও ভবভূতি কালিদাস প্রভৃতির ন্যায় এক জন সুপ্রসিদ্ধ কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দণ্ডী খৃ ১২০০ অব্দেরও অনেক পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

(ঘ) "বিশ্বগুণাদর্শ" প্রণেতা বেদান্তাচার্য্যের সময়ও দণ্ডী এক জন ভারতীয় অতি শীর্ষস্থানীয় কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ

৪ ইহার প্রসঙ্গ কোন প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আছে কি না জানি না।

৫ বাবু রামদাস সেনের মতে মল্লিনাথ বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা প্রায় পাঁচ শত বৎসরের পূর্ব্বের লোক। ঐতিহাসিক রহস্য, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ২৭ পৃষ্ঠা।

৬ বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিতের লিখিত "কালিদাস"। বঙ্গদর্শন, ১ম খণ্ড ৪৭০ পৃষ্ঠা।

ছিলেন। তিনি দণ্ডী প্রভৃতিকে প্রশংসা করিয়াছেন, যথা—.

"শ্রীদণ্ডী-ডিণ্ডিমাখ্যঃ শ্রুতিকুটক গুরুর্ভল্লটো ভট্টবাণো।
খ্যাতশ্চান্যো সুবন্ধাদয় ইতি কৃতিভির্বিশ্ব মাহ্লাদয়ন্তি।"

(ঙ) 'সাহিত্য দর্পণ' প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থে দণ্ডী একজন প্রাচীন আলঙ্কারিক বলিয়া পরিচিত। ঐ সকল গ্রন্থে "কাব্যা-দর্শের" নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইয়াছে।

আমরা কেবল সাধারণ-প্রচলিত মত প্রদর্শন করিবার জন্য উল্লিখিত বিবরণ গুলি উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু দণ্ডীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমরা একটী বলবৎ অকাট্য প্রমাণ প্রকটন করিতে সমর্থঃ—৭

(চ) দুর্গসিংহ কাতন্ত্রের কৃৎ প্রকরণে "দুহকোঘশ্চ" এই সূত্রের বৃত্তির উদাহরণ জন্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ৮। এতদ্ব্যতীত দণ্ডীর গ্রন্থাদি হইতে দুর্গসিংহ আরও অনেক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্যই সুষেণ কবিরাজ প্রভৃতি কাতন্ত্র টীকাকারগণ বলিয়াছেনঃ—

"দণ্ডিনঃ পদমাশ্রিত্য
দুর্গেনাপি উদাহৃতঃ।"

৭ খৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীর পরের অনেক গ্রন্থাদিতে দণ্ডীর নাম পাওয়া যায়, অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করিলাম না।

৮ আমরা "কাতন্ত্র জীবনী" প্রস্তাবে একথা উল্লেখ করিয়াছি।

দুর্গসিংহ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি যখন দণ্ডীর গ্রন্থ হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তখন দণ্ডীকে দুর্গসিংহের পূর্ব্ব-সাময়িক বা সমসাময়িক বলিতে হইবে। যখন আমরা দুর্গসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থাদিতে দণ্ডীর নাম দেখিতে পাই নাই তখন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীকে দণ্ডীর কাল নিরূপণ করিবার জন্য একটী চরম-সীমা বলিয়া গ্রহণ করিলাম। দণ্ডী এই পঞ্চম শতাব্দীতে কি ইহার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা বিচার সাপেক্ষ; অতএব তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া লই।

দণ্ডীর গ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাতে এরূপ কোন সুপরিচিত গ্রন্থ কি গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় না যদ্দ্বারা তাঁহাকে কোন গ্রন্থকারের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দণ্ডিকৃত গ্রন্থাবলী হইতে যে সকল প্রসঙ্গ লইয়া তদীয় আবির্ভাব কাল বিনির্ণয় করা যাইতে পারে তাহা এত প্রাচীন ও সাধারণতঃ এত অপরিচিত ঘটনায় আবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক সোপানে পদবিক্ষেপ করিলে পদে পদে পদস্খলন হইবে বলিয়া মনে মহা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। দণ্ডী কাব্যা-দর্শে বলিয়া লইয়াছেন :—

"পূর্ব্ব শাস্ত্রাণি সংহৃত্য
প্রয়োগানুপলক্ষ্য চ।

যথাসামর্থ্যমস্মাভিঃ
ক্রিয়তে কাব্য-লক্ষণং ॥
২য় শ্লো, ১ ম পরিচ্ছেদ।

"কিন্তু বীজ-বিকল্পানাং
পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ প্রদর্শিতম্।
তদেব প্রতিসংস্কর্ত্তু
ময়মস্মৎপরিশ্রমঃ ॥
(২ য় শ্লো, ২য় পরিঃ)

" ... ...
ইতি বাচামলঙ্কারা
দর্শিতাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ ॥ "
(৭ ম শ্লো, ২য় পরিঃ)

তিনি যে এই কথা গুলি কার্য্যে পরিণত করেন নাই তাহা নহে। কাব্যাদর্শের উদাহরণস্থলে অনেক গুলি শ্লোক আছে যাহা উদ্ধৃত শ্লোক বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু সে সকল প্রচলিত কাব্য-সাহিত্যাদিতে দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় প্রাচীনত্ব নিবন্ধন ঐ সকল গ্রন্থাদি এক্ষণে লুপ্ত-প্রায়। দণ্ডী, পূর্ব্বাচার্য্য ও পূর্ব্বশাস্ত্রাদি হইতে যুক্তি প্রয়োগ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও সেই সকল গ্রন্থ বা গ্রন্থকারদের নামোল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ঐ সকল অবলম্বন করিয়া দণ্ডীর সময় আলোচনা করা একরূপ অসম্ভব।

মহাত্মা দণ্ডী যদি মহাকবি কালিদাসাদির পরবর্ত্তী হইতেন তবে আমরা তাঁহার কাব্যাদর্শে কালিদাস প্রভৃতির নাম ও তাঁহাদের কৃত কাব্যাদির শ্লোক ইত্যাদি অবশ্য দেখিতে পাইতাম। কেন না তিনি কোন কোন অপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন গ্রন্থের নামও উল্লেখ করিয়াছেন; যদি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ গুলি তাঁহার সময়ে প্রচলিত থাকিত,তাহা হইতে দুই এক স্থল অবশ্য উদ্ধৃত করিতেন। যখন করেন নাই তখন দুর্গসিংহ-সংসৃষ্ট যুক্তির উপর আমাদের আরো আস্থা জন্মিতেছে। সুতরাং সেই বলবৎ প্রমাণে পদাঘাত করিয়া ভোজ-প্রবন্ধ প্রভৃতি কাল্পনিক গ্রন্থের যুক্তি সমর্থন করিয়া দণ্ডিনাচার্য্যকে একাদশ শতাব্দীর লোক বলিতে কদাপি সাহসী হই না।

দণ্ডী প্রসঙ্গক্রমে কাব্যাদর্শে যে যে ঘটনা ও গ্রন্থাদির নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে দণ্ডীর সময় আলোচনা করিবার উপযোগী কয়েকটী বিষয় গ্রহণ করিতেছি। এতৎ সম্বন্ধে নিম্নের কয়েকটী বিষয় আমাদের নিকট অধিক সারবান বলিয়া বোধ হয়।

১ "বৃহৎ কথা" নামক ভূতভাষা-লিখিত উপকথা মূলক গ্রন্থ—৯ তথাহি—

"ভূতভাষাময়ীম্প্রাহু
রদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাং।"

(২) মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত "সেতুবন্ধ" নামক কাব্যের উল্লেখ ১০

মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং
প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।

৯ Bibliotheca Indica Edition of Ka´bya´darsa P., 35.

১০ I bid P. 81.

সাগরঃ সুক্তিরত্নানাং
সেতুবন্ধাদি যন্ময়ং।

(৩) বুদ্ধ দেব এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে উল্লেখ—১১

"সত্যমেবাহ সুগতঃ
সংস্কারানবিনশ্বরাণ্॥"

(৪)সাংখ্যকার কপিলের মত সম্বন্ধে উল্লেখ—১২

"কপিলৈরসদুৎপত্তি
স্থান এবোপবর্ণ্যতে।'

(৫) হেতু বিদ্যা—ন্যায় শাস্ত্র ১৩

"বিরোধে হেতুবিদ্যাসু
ন্যায়াখ্যাসু নিদর্শ্যতে।"

(৬) রাজবর্ম্মা নৃপতির নামোল্লেখ ১৪

একখানি হস্তলিখিত কাব্যাদর্শে রাজ বর্ম্মার স্থলে "কীর্ত্তিবর্ম্মা" লিখিত আছে—

"————
রাজ্ঞো যৎ কীর্ত্তিবর্ম্মণঃ॥"

(৭) কাঞ্চীশ্বর পুণ্ড্রক নামা নৃপতির নামোল্লেখ। ১৫

এতদ্ব্যতীত দণ্ডীর কাব্যাদর্শে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির কোন কোন ঘটনায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বিষ্ণুর দশাবতার পরশুরামের ক্ষত্রিয়কুল-নির্ম্মূল প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে কিন্তু অনাবশ্যক বোধে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

উল্লিখিত উদ্ধৃত স্থল গুলি পর্য্যালোচনা করিলে এই মাত্র জানা যায়, রামায়ণ, মহাভারত, ন্যায়শাস্ত্রকার গৌতম ও সাংখ্যকার কপিলের দার্শনিক মত প্রচার এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতির পর দণ্ডি কর্ত্তৃক "কাব্যাদর্শ" প্রণীত হয়। এই সকল সুপরিচিত ঘটনার মধ্যে বুদ্ধ দেবের প্রসঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা পর সাময়িক। সাধারণ মতে ৫৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বে বুদ্ধদেব বর্ত্তমান ছিলেন। ভট্ট মোক্ষমূলরের মতে ৪৭৭ খৃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয় ১৬। অন্যান্য পুরাবৃত্তজ্ঞদের মতে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে বুদ্ধের তিরোভাব হয় ১৭। মহাবংশের মতেও পরবর্ত্তী যুক্তিই প্রামাণ্য ১৮।

দুর্গসিংহ দণ্ডীর গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; দণ্ডী আবার স্বয়ং বুদ্ধের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং দণ্ডী, খৃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভের পূর্ব্বে এবং খৃ পূঃ ৫৫০ অব্দের পরে—কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত সময়ের আদি হইতে অন্ত কালের পরিমাণ গণনা করিলে প্রায় ৯৫০ কি ১০০০ বৎসর হয়। এত সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনুমানে কোন একটী সময় নির্ণয় করিলে নিতান্তই

১১ Ibid P. 440.
১২ Ibid P. 440.
১৩ Ibid P. 480.
১৪ Ibid P. 255.
১৫ Ibid P. 399.

১৬ Muller's "Ancient Sanskrit Literature" P. 298.

১৭ Turnour's "Mahawanso" Appendix P. IX.

১৮ Muller's An: San: Lit: P. 341

স্খলিত পদ হইবার কথা। সুতরাং এই দীর্ঘ সময়কে আরও সংকীর্ণ করিতে হইবে।

উপরে কাব্যাদর্শোল্লিখিত প্রসিদ্ধ ঘটনা লইয়া দণ্ডীর আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল ; এখন অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ এবং অপরিচিত ঘটনা লইয়া দণ্ডীর কাল নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইব।

কাব্যাদর্শে রাজবর্ম্মা (পাঠান্তরে কীর্ত্তি বর্ম্মা) এবং কাঞ্চীশ্বর পুণ্ড্রক নৃপতির নামোল্লেখ আছে। আমরা যতদূর জানি কোন পুরাতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাই এই দুই নৃপতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। এবং আমরা প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও ইহাদের প্রসঙ্গ দেখি নাই। এই দুই নৃপতি বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী তাহা নির্দ্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব। সুতরাং দণ্ডীর গ্রন্থে ইহাদের নামোল্লেখ থাকিলেও তদ্দ্বারা দণ্ডীর সময় আলোচনা করিবার উপায় নাই।

কাব্যাদর্শের একস্থলে "পঞ্চতন্ত্রের নামোল্লেখ আছে ১৯। পঞ্চতন্ত্র প্রাচীন গ্রন্থ। ৫৩১ হইতে ৫৭৯ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে এই গ্রন্থ পারস্য নৃপতি নশিরবাণের আদেশে অনুবাদিত হয়। মূল পঞ্চতন্ত্র ইহার ও কত পূর্ব্বের গ্রন্থ তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। সুতরাং এই গ্রন্থের উল্লেখ থাকিলেও তদ্দ্বারা দণ্ডীর সময় নিরূপণ করিবার একটী অভ্রান্ত সোপান পাওয়া গেল না।

কিন্তু দণ্ডীর গ্রন্থে ভুতভাষা-লিখিত "বৃহৎ কথার" উল্লেখ অবলম্বন করিয়া দণ্ডীর সময় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথিত আছে কত্যায়ণ মুনি এই সপ্তলক্ষশ্লোকাত্মক বৃহৎকথা প্রণয়ন করিয়া কাণভূতিকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পরে এই গ্রন্থের সারাংশ অবলম্বন করিয়া খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে ২০ সোমদেব ভট্ট অনন্ত-পত্নী—সূর্য্যবতীর তুষ্টিসাধন জন্য কথা সরিৎ সাগর প্রণয়ন করেন। কাহার মতে গুণাঢ্য এই ভুতভাষাময়ী "বৃহৎ কথার" রচয়িতা—"বৃহৎকথা ভুতভাষাখ্যে গ্রন্থভেদঃ ; গুণাঢ্যস্তৎকর্ত্তা।

"ভুতভাষাপ্রণীতাসৌ
গুণাঢ্যকবিরুচ্যতে"

(নরসিংহ ধৃত বাক্য)

কতিপয় অলৌকিক উপাখ্যান ব্যতীত আমরা গুণাঢ্যের সময়াদি সম্বন্ধে কিছুই জানি না। ভূতভাষা-লিখিত বৃহৎকথা যদি কাত্যায়ণ-প্রণীত হয় এবং এই কাত্যায়ণ সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ কাত্যায়ণ বররুচি হয়েন তবে দণ্ডীর সময় নির্ণয় করা অতি সহজ কথা। আমারা "কাতন্ত্র জীবনী" নামক প্রস্তাবে কাত্যায়ণ শীর্ষক অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছি যে কাত্যায়ণ বররুচি খৃঃ পূঃ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হইতে খৃষ্টের জন্মের সমকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণ যদি দণ্ডীর আবির্ভাব কালকে কাত্যায়ণের পর এবং

১৯ Bibliotheca Indica Edition of Kabyadarsa p 301.

২০ কাহার মতে ১০৫৯ খৃং অঃ সঙ্কলিত হয়। ঐতিহাসিক রহস্য। ১ম ভাগ। দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৩ পৃষ্ঠা।

দুর্গসিংহের পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে অথবা তাহার কিছু পরে) স্থান দিই তবে দণ্ডী খৃষ্টীয় প্রথম হইতে পঞ্চম শতাব্দীর কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তাহাই হয় তবে আমরা প্রস্তাবের প্রারম্ভে যে দণ্ডীর সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি লিখিয়াছি, তদনুসারে তাহাকে মহা কবি কালিদাসের সমকালিক বলিয়া বিশ্বাস করিলেও নিতান্ত অযৌক্তিক হয় না। কিন্তু যখন বৃহৎ কথার প্রণেতা লইয়া গোলমাল আছে এবং তিনি কাত্যায়ণ হইলেও সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ কাত্যায়ণ বররুচি কি না তৎসম্বন্ধেও নিশ্চয়তা নাই তখন আমরা কেবল এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।

চীনের সাংগ্রামিক শক্তি।

মোগলদিগের বিপুল সাম্রাজ্য আসিয়ার এখন তিনটী প্রধান সাম্রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—বৃটিষ, রুষ ও চীন। ঘটনা পরম্পরা অতি শীঘ্রই মধ্য আসিয়ার হিন্দুকুশ পর্ব্বত শ্রেণীর তিন পার্শ্বে এই তিনটী প্রবল সাম্রাজ্যকে পরস্পর সন্নিকট করিতেছে; এই রূপ সান্নিকট্যে যে আসিয়ার ভবিষ্য ইতিহাস রূপান্তরিত হইবে তাহা বলিতে আর দৈব জ্ঞানের আবশ্যক নাই। এ অবস্থায় আমাদের পুরাতন প্রতিবাসী চীনের বর্ত্তমান অবস্থা কখনই বিরাগভাজন হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের প্রতিবাসী চিরকাল যেরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে তাহাতে তাহার বিষয়ে বিশ্বাস-যোগ্য সম্বাদ পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। সৌভাগ্য বশতঃ সম্প্রতি এই বিষয়ে দুই এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং সাময়িক পত্রেও এবিষয়ে দুই একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে।

কাপ্তান ব্রিজ যে বিষয়ে প্রবন্ধ * লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ জ্ঞাতব্য ও সে বিষয়ে তাঁহার নিজের বহুদর্শিতা আছে; তিনি অনেক দিন চীন সাগরে এক খানি ইংরাজ রণতরীর নেতৃকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। চীনেরা যে একেবারে উন্নতিবিরোধী এই সাধারণ কুসংস্কারের ভ্রম প্রতিপন্ন করাই তাঁহার প্রবন্ধের এক প্রধান উদ্দেশ্য। কাপ্তান ব্রিজ সাধারণের এই বিশ্বাসের ভ্রম প্রতিপন্ন করিতে যে সর্ব্বপ্রথমে কিম্বা একাই চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু একটা ভ্রমাত্মক সংস্কার একবার সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ব্যতীত তাহা উৎপাটিত হওয়া অসম্ভব।

আসিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিবাসীশালী সাম্রাজ্যের বাস্তবিক ও সম্ভাবিত সাংগ্রামিক ক্ষমতা নিশ্চিত রূপ জানিতে পারিলে কার্য্যাগত অনেক ফল হইতে পারে। উপরি উক্ত তিন রাজ্যের মধ্যে এখন বৃটিষ আফ্‌গানিস্থানে রুষের অগ্রগামী ছায়া দেখিতে পাইয়া তথায় যুদ্ধে সংলিপ্ত হইয়াছেন ও আরো উত্তর পূর্ব্বে রুষ ও চীন অসি উন্মুক্ত করিয়াছেন সুতরাং এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আগমন না করা বড় বিবেচনার কার্য্য নহে। বুলজার তাঁহার মধ্য এসিয়া

* Revival of the Warlike Power of China by Captain Bridge R. N. (Fraser's Magazine for June 1879,)

বিষয়ক পুস্তকে * বলেন যে সম্প্রতি চীনেরা কিয়ালজা নগর ও তাহার সন্নিহিত প্রদেশ ব্যতীত সমস্ত পূর্ব্ব তুর্কীস্থান সম্পূর্ণ রূপ পুনরধিকার করিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহাদের স্বাভাবিক দুর্বল অংশেও জাতীয় জীবন পুনর্ব্বার বলবান হইয়া উঠিতেছে। কিয়ালজা নগর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ এক্ষণে রুষদিগের হস্তগত; দশ বৎসর অতীত হইল রুষেরা উহা এই বলিয়া অধিকার করেন যে তুর্কীস্থানে শান্তি পুনঃস্থাপিত হইলে তাহারা যথার্থ অধিকারীকে উক্ত প্রদেশ ও নগর পুনরর্পণ করিবেন। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারাই হউক আর কৌশল দ্বারাই হউক রুষ কোন একটা রাজ্য গ্রাস করিয়া যে পুনরুদ্ধার করিবে তাহার বড় সম্ভাবনা নাই; চীনেরাও তাহাদের পুরাতন জাতীয় অধ্যবসায় হারায় নাই। এইরূপ পরস্পর বিরোধী-স্বত্ব বিশিস্ট দুই পরাক্রমশালী জাতির মধ্যে যদিও বর্ত্তমান যুদ্ধের সূত্রপাত অন্তর্হিত হইয়াছে তথাপি বহুকাল যে উহাদের মধ্যে কি প্রকারে শান্তিরক্ষিত হইবে বুঝিতে পারা সহজ নহে। রুষেরা কি তাহাদের বিশেষ রূপে অভিলষিত পদার্থ ফিরাইয়া দিবে? না, অহঙ্কারী চীনেরা তাহাদের পুরাতন স্বত্ব ত্যাগ করিবে?

আবার এদিকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে তুর্কীস্থানের সহিত বাণিজ্যে চীনেরা হস্তক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় বৃটিষ বণিকেরা উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে। এটা কিন্তু একটা অতি প্রাচীন পীড়ার নূতন আকার মাত্র। যে অবধি বৃটিষ সাম্রাজ্য নেপাল, ভুঁটান ও তিব্বত প্রভৃতি চীনের করদ ও মিত্র রাজ্যের দ্বারা উত্তরে ও ব্রহ্মদেশ দ্বারা পূর্ব্বদিকে সীমাবদ্ধ হইয়াছে সেই অবধি বৃটিষেরা চীনের নিকট হইতে বাধা ও প্রতিবন্ধক ব্যতীত আর কিছুই পান নাই। চীনেরা কখন তাহাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য গোপন করিবার চেষ্টাও করে নাই সুতরাং বৃটিষরা চীনের নিকট হইতে অন্য কোন ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারেন না। অহিফেনের দ্বারা স্বদেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে দেখিয়া চীনেরা অহিফেনের আঁমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল; ইংরাজের ইহাতে যথেষ্ট আয় কমিয়া যায়। কাজে কাজেই ইংরেজ বলিয়া উঠিলেন যে, "যদ্যপি তোমরা ঐরূপ সর্ব্বনাশ না হইতে দাও ত তোমাদের সহিত যুদ্ধ হইবে।" তাহাই হইল। এক্ষণে ইংলণ্ডে অনেকেই এইরূপ ব্যবহারের দোষ দেখিতে পাইয়া Canterburyর Archbishop এর উপদেশ অনুসারে অহিফেনের ব্যবসা বন্ধ করিবার জন্য Parliamentএ আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু বণিক-রাজ্যে ওরূপ আবেদন গ্রাহ্য হইবে কেন? চীন সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরাজয় দ্বারা মন হইতে শত্রুতা একেবারে দূর হইতে পারে না। যাহা হউক এইরূপ স্বাতন্ত্র্য যদি যুদ্ধের কারণ (Casus belli) হইতে পারে তাহা হইলে আর কিছু নূতন উত্তেজনার আবশ্যক হইবে না, কেবল অল্প পরিমাণে অধৈর্য্যের বৃদ্ধি হইলেই যথেস্ট হইবে। কিছু কাল পরস্পর বাক্যযুদ্ধ পর ভারতবর্ষ কিছুতেই আর তুর্কীস্থানের সহিত বাণিজ্য বিষয়ে চীনের প্রতিবন্ধকতা সহ্য করিতে চাহিবে না; এবং উক্ত দেশে যথেচ্ছা গমনাগমনের জন্য স্বাধীন পথ স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। কিন্তু আবার ভারতবর্ষ ও চীনই কেবল এই বিষয়ে লিপ্ত নহে এ বিষয়ে রুষেরও স্বার্থ আছে। দক্ষিণ দিক হইতে ইংরেজেরা যে রূপ

* Central Asia by C. E. Boulger London, 1879.

চেষ্টা করিবে উত্তর দিক হইতে রুষেরাও ঠিক তাহাই করিবে। ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এই দুই বলবান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে চীন কিছুই করিতে পারিবে না। ১০ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈনিক না থাকিলে অপরিসীম বিস্তৃতি ও অসংখ্য অধিবাসী লইয়াও চীন কোন এক বলবান ইয়ুরোপীয় জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে অপারগ। পূর্ব্বে চীনেরা কখনো উক্ত রূপ সৈন্য সংগ্রহের জন্য চেস্টা করে নাই কিন্তু ইহা দেখিয়া যেন এরূপ মনে না হয় যে চীনেরা এই রূপ চেস্টা করিতে অক্ষম, কিম্বা তাহারা এইরূপ চেস্টা করিবে না। যদি তাহারা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারে যে জাতীয় উন্নতি কিম্বা আত্মরক্ষার জন্য ইয়ুরোপীয় যুদ্ধকৌশল অনুকরণ করা আবশ্যক তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবে। আমরা চীনদেশের যত বিবরণ পাঠ করি সকল গুলিই অধিবাসীদিগের অধ্যবসায়ের বিশেষ পরিচয় দেয়। চীন দেশের সুবিখ্যাত প্রাচীরই চীনেদের অধ্যবসায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ। বুলজার গত বারের Nineteenth Centuryতে চীনের বাস্পীয় শকট প্রস্তুত না করিবার এই কারণ দেখাইয়াছেন যে বাণিজ্য দ্বারা চীন এত ধনশালী হইয়াছে যে তাহাদের লৌহবর্ত্মের দ্বারা আভ্যন্তরিক বাণিজ্য বাড়াইবার আবশ্যক নাই, সেই জন্য তাহারা অকারণে বিদেশীয় লোকদিগকে স্বদেশে আনিতে চাহে না।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত শেষ যুদ্ধের পর হইতে চীনেরা সৈন্য সংস্কারের যদিও নিয়মিতরূপ চেস্টা করে নাই তথাপি উহার দ্বারা চীন সৈন্যের ভিতর ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ কৌশল ও উন্নত ইয়ুরোপীয় আগ্নেয় অস্ত্র সকল সমাদৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বিপদের ভার পড়িলে কিম্বা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির উত্তেজনা উপস্থিত হইলে চীন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তমরূপ সুসজ্জিত সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবে। চীনের অধিবাসী সংখ্যা কার্যাত এক রকম অক্ষয় এবং তাহারা অতি পরিমিত আহারী। কর্ণাল গর্ডন* স্ব-প্রণীত চীনের বিবরণ গ্রন্থে বলেন যে অতি অল্প আয়াসেই চীনদিগকে খাওয়ান ও শাসন করা যাইতে পারে। কাজে কাজেই চীনের একটী বিশেষ সুবিধা এই যে অন্যান্য সভ্য জাতির ন্যায় ইহাদিগকে কমিস্যারিয়েটের জন্য বিশেষ চিন্তা করিতে হয় না; চীনের সৈন্য করিবার জন্য লোকের ত কোনই অভাব নাই এখন যুদ্ধের অস্থি মজ্জা—অর্থ—বিষয়ে চীনের কিরূপ সুবিধা দেখা যাউক। যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কলনের জন্য চীন অতি অনায়াসেই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। Sir W. Medhurst তাঁহার Nineteenth Centuryতে প্রকাশিত প্রবন্ধে† বলেন যে চীনেদিগের আমেরিকা, মলাক্কা এবং ভারত ও প্রশান্ত সাগরের অন্যান্য দ্বীপে অতি সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে এবং বিদেশীয় বাণিজ্যের দ্বারা তাহারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। আমেরিকায় ইংরাজ ভ্রমণকারীদিগের পুস্তক ‡ পাঠে অবগত

* যিনি আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেলের Private Secretary পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়া আবার শীঘ্রই এই পদ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

† The Chinese as Colonists by Sir William Medhurst. (Nineteenth Century No 11, for June, 1878.)

‡ New America by Hepworth Dixon 2Vols. London.
Life and Liberties in America by Charles Mackay London ইত্যাদি

হওয়া যায় যে নূতন পৃথিবীতে চীনেরা অধিবাসীদিগকে বাণিজ্য ক্ষেত্রে এবং শিল্প ও পরিশ্রমে বিশেষরূপে পরাভূত করিতেছে; ইউনাইটেডষ্টেটসে যত পরিশ্রমের কাজ সকলই চীনেদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। Sir William Medhurst তাহার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে চীনেরা আমেরিকায় যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে সেই বিষয়েই অধিবাসীদিগের উপর জয় লাভ করিয়াছে এমন কি অধিবাসীদিগের পরামর্শানুসারে ইউনাইটেডষ্টেট্‌সের শাসন কর্ত্তারা তাহাদের দেশে চীন, হইতে কেহ আসিলে তাহার নিকট হইতে ৫০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় এক হাজার টাকা আদায় করেন; এরূপ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়াও চীনেরা আমেরিকায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। এরূপ ধনী দেশে রাজা যখন তখন ঋণ পাইতে পারেন। ইহা ব্যতীত চীনের গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় বাণিজ্যের শুল্ক আদায়ের জন্য সম্প্রতি ইরোপীয় তত্ত্বাবধারণের অধীনে একটা Custom House স্থাপন করিয়াছে, ইহা হইতে নিয়মিতরূপে বাৎসরিক অন্ততঃ ৫০ লক্ষ টাকা নিশ্চিত আদায় হয়। এই আয় বন্ধক দিয়া বিদেশ হইতেও অক্লেশে চীন প্রয়োজনীয় টাকা ঋণ লইতে পারেন। চীনের অসংখ্য ধনী অধিবাসীদিগের নিকট হইতে যুদ্ধকর স্বরূ[illegible] টাকা আদায় হইতে পারে তাহার আর উল্লেখ করা হইল না।

ইহাও একটা চীনেদিগের বি[illegible]ক্ষণতার পরিচয় স্থান যে তাহারা সর্ব্বাগ্রে তাহাদের সমুদ্র-উপকূ[illegible]স্থ প্রদেশের রক্ষণার্থে দুর্গ শ্রেণী (Seaboard defences) প্রস্তুত করিতেছে ও সমুদ্র যুদ্ধের উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহে সচেষ্ট। চীন যুবকেরা বৎসর বৎসর ভিন্ন দেশে গিয়া জলযুদ্ধ শিক্ষা করিয়া আসিতেছে। কাপ্তেন ব্রিজ তাঁহার উপরি উক্ত প্রস্তাবে বলেন যে ১৮৬১ খৃ অব্দে চীনেরা Sherard Osborne নামক এক জন আমেরিকের নেতৃত্ব অধীনে জল যুদ্ধের উপযোগী জাহাজাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া ছিল কিন্তু পেকীনের সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী ইয়ুরোপীয় জাতিগণের ঈর্ষা বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেই অবধি চীনেরা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছে এবং এক প্রকার কৃতকার্য্যও হইয়াছে। সেই অবধি তাহারা ক্রোর ক্রোর টাকা ব্যয় করিয়া ইয়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে নূতন রকমের উৎকৃষ্ট রণতরী সকল ক্রয় করিয়াছে এবং যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করিবার জন্য স্বদেশে বৃহৎ বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিয়াছে।

১৮৬৭ খৃ অব্দে শ্যাংহেই নগরের সন্নিকটে স্থাপিত জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা হইতে ইতি মধ্যে প্রায় বিশ হাজার টন বোঝাইয়ের উপযুক্ত দুই খানা অতি উৎকৃষ্ট যুদ্ধ-জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে এবং তিন বৎসর অতীত হইল সেখান হইতে নদীতে গতায়াত করিতে পারে এমন একখানি ক্ষুদ্র বর্ম্মাচ্ছাদিত রণতরি ভাসান হইয়াছে। এই কারখানার সামীল ও ইহার নিকটে যুদ্ধের উপকরণ নির্ম্মাণের কয়েকটা কারখানা আছে; সেখানে ছোট বড় কামান ও ব্রীচ-লোডিং বন্দুক এবং তদুপযুক্ত বারুদ, গোলা গুলি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হয়। তুর্কীস্থান বিজয়ী ত্ সো-ত্ স্যাং ত্যাং ও তেপিং-বিজয়ী লি-হুং- চ্যাং-উভয়েই অতি উৎকৃষ্ট রাজনীতি কুশল যোদ্ধা। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত জন ফুচৌনগরের নিকট যুদ্ধের উপযোগী সামগ্রী নির্ম্মাণের একটী বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন। চীন-সাগরে একখানি ফরাসী রণতরীর নায়ক কাপ্তানজিকে (Giquel) ইহার তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই

কারখানাটী অতি উৎকৃষ্ট ইয়ুরোপীয় কারখানা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এই কারখানা হইতে ইহার মধ্যে পোনর খানা প্রথম শ্রেণীর রণতরী নির্ম্মিত হইয়াছে।

লি-হুং-চ্যাং পেইহো নদীর উপকূলস্থ তিয়ান্‌সিন্‌ নগরে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ উলিচের কারখানার আদর্শ অনুসারে একটা বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দ অবধি উলিচ হইতে আনীত উৎকৃষ্ট কারিগরেরা এখানে কর্ম্ম করিতেছে। এত বৃহৎ কাণ্ড করিয়াও পেকীনের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও সমুদ্র উপকূলস্থিত প্রদেশের শাসন কর্ত্তারা সন্তুষ্ট হন নাই। পেইহো নদীর উপকূলস্থ দুর্গ সকল বিখ্যাত প্রুশিয় অস্ত্র শিল্পী ক্রূপ কর্তৃক নির্ম্মিত অতি বৃহৎ বৃহৎ কামানের দ্বারা কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে এবং এই সমস্ত স্থানে বৈদ্যুতিক উপায়ে নদীর অপর পার্শ্বস্থিত কামানে অগ্নি সংযোগ করিবার সুবিধারও অভাব নাই। এ সকল ব্যতীত যুদ্ধের জন্য ষ্টীমারও ক্রয় করা হইয়াছে। সম্প্রতি চীনেরা কামান বহিবার উপযোগী অতি উৎকৃষ্ট জাতির কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ প্রস্তুত করাইতেছে। সচরাচর ইয়ুরোপে যে সকল জাহাজ ব্যবহৃত হয় তাহাদের সহিত এ গুলির অনেক প্রভেদ আছে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে * অবগত হই যে ইহাদের আবরণ সচরাচরের ন্যায় ঢালা লৌহের না হইয়া উৎকৃষ্ট ইস্পাতে নির্ম্মিত; সচরাচরের অপেক্ষা ইহারা প্রায় দেড়গুণ দ্রুতগামী এবং ইহাদের দুই মুখ। ইহাদের আর একটী বিশেষ প্রভেদ এই যে ইহাদের যন্ত্র সকল জাহাজের যে অংশে স্থিত তাহা কখনই জলের উপরি ভাগে দেখা দেয় না, কাজে কাজেই এই রূপে জাহাজ কখনো বিপক্ষ দ্বারা একেবারে বিনষ্ট কিম্বা সহজে বিশেষরূপ আহত হইতে পারে না। এই সকল জাহাজের কামান সচরাচরের অপেক্ষা লঘু বটে কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট।

এই প্রস্তাব পাঠে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রাচীন মোগল, তাতার ও চীন জাতির সংগ্রামিক ক্ষমতা একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। এই সকল জাতিই জঙ্গীশ খাঁর নায়কত্ব অধীনে দল বদ্ধ হইয়া পীত সাগর হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত একটী সাম্রাজ্যে গাঁথিয়া ছিল ইহাদের দ্বারা ভারতবর্ষে স্থাপিত আধিপত্যের শেষ চিহ্ন কেবল কুড়ি বৎসর হইল সিপাহী যুদ্ধে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহারাই চীনের বর্ত্তমান রাজবংশের রাজত্বকালে নেপাল ভূটান ও তির্ব্বত অর্দ্ধজয় করিয়াছে এবং ব্রহ্মদেশে কর স্থাপন করিয়াছে। চীন কোন প্রকারেই বার্দ্ধক্যে জরা গ্রস্ত হইয়া পড়ে নাই। আসিয়ার তিন সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অভিসন্ধি যাহাই হোক না কেন, আর অব্যবহিত ভবিষ্যতে তাহাদের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন [illegible]তিন সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান সাংগ্রামিক অবস্থা বিশেষত অতি [illegible]চীনের সাংগ্রামিক ক্ষমতা জানিলে যে আমাদের কেবল মাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইবে এরূপ নহে। বিবেচনা করিয়া [illegible]লে ইহাতে কার্য্যতও অনেক ফল হইতে পারে।

* Capt Bridge's Revival of the Warlike Power of China.

রাজসূয়যজ্ঞ।

রাজসূয় যজ্ঞে সাধারণের অধিকার নাই। ইহা গুণবান, বলবান, ধনবান ক্ষত্রিয় রাজা ভিন্ন অন্যের অসাধ্য। কি প্রকার গুণসম্পন্ন রাজা এ যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারেন, তাহা মহাভারতের সভাপর্ব্বে সবিস্তরে বর্ণিত আছে।

শতপথব্রাহ্মণে এই যজ্ঞের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তন্মতে ইহার প্রধান অঙ্গ ইষ্টি, পশু, সোম, ও দর্ব্বী হোম। অগ্রে পবিত্র নামক সোম-যাগ, পরে অভিষেচনীয় যাগ, তৎপরে দশপেয় যাগ, অনন্তর কেশবপনীয়, তদনন্তর ব্যুষ্টি, তৎপরে দ্বিরাত্র এবং অবশেষে ক্ষত্রধৃতি নামক যাগ।

এই সাতটী যজ্ঞের সমষ্টিই রাজসূয়। "যো রাজসূয়েন যজতে দেবস্তোবা এষ যজ্ঞ ক্রতুঃ—"ইত্যাদি ক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কাণ্ডে বিবৃত আছে। এতদনুসারে কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে রাজসূয়ের বিশেষ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যথা—

"রাজ্ঞোরাজসূয়ঃ (১) অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞে রাজারই অধিকার। "অনিষ্টিনো বাজপেয়েন"। (২) যিনি বাজপেয় নামক যজ্ঞ করেন নাই তিনি এই যজ্ঞের অধিকারী। "ইষ্টিসোমপশবো ভিন্নতন্ত্রাঃ কালভেদাৎ"। (৩) আনুমতি প্রভৃতি ইষ্টি নামক যাগ, পবিত্র নামক সোম যাগ, পশু যাগ, এই যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন কালে বিহিত আছে। ইত্যাদি—

আপস্তম্বসূত্রে ইহার বিস্পষ্ট বিধি আছে। "রাজা স্বর্গকামোরাজসূয়েন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামী রাজা রাজসূয় নামক যজ্ঞ করিবেন।

অথর্ব্ববেদের বৈতানসূত্র সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ১৩টী সূত্র দ্বারা ইহার সংক্ষিপ্ত ক্রম নির্ণীত আছে। যথা—

"অথ রাজসূয়ঃ" (১) "তৈষ্যাঃ পুরস্তাৎ পবিত্রঃ" (২) পৌষী পূর্ণিমার পূর্ব্বে পবিত্র নামক সোমযাগ। "মাসান্তরেষু দশসংসৃপঃ" (৩) মাসান্তরে দশসংসৃপ নামক কার্য্য। "মাঘ্যা অভিষেচনীয়ঃ" (৪) মাঘী পূর্ণিমায় অভিষেচনীয় যাগ। "মরুত্বতীয়াদ্বার্হস্পত্যেষ্টিঃ" (৫) মরুত্বতীয় নামক কার্য্যের পর বৃহস্পতিসব নামক যাগ। "হবির্ধানয়োঃ পুরস্তাদ্বৈয়াঘ্রং চর্ম্ম" (৬) হবির্ধান নামক মণ্ডপের সম্মুখে ব্যাঘ্র চর্ম্ম স্থাপন। ইত্যাদি—

ফলতঃ এই যজ্ঞে বেদবিহিত হোম ও বলিদানাদি দ্বারা দেবগণের পূজা, দ্যূত ক্রীড়া, দিগ্বিজয়, শুনঃশেফীয় উপাখ্যান

শ্রবণ, * পঞ্চ বিধ সোম যাগ, † প্রভৃতি অনেক গুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত। সুতরাং ইহা বহুদিন-সাধ্য।

"পবিত্র" নামক সোমযাগটী ইহার প্রথম অঙ্গ। ইহা বিধানানুসারে সমাপ্ত হইলে "চাতুর্ম্মাস্য" যাগ করিতে হয়। পরে "দেবিকা' নামধেয় "ইষ্টির" অনুষ্ঠান, তৎপরে " অরত্নিহোম " নামক হোম করিতে হয়। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাগ-স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বিবৃত করা যাইবে। তৎপশ্চাৎ "অভিষেচনীয়" নামক সোম যাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ‡ এই দিবসে সমুদ্র, নদ, নদী, পুণ্য সরোবর, পুণ্য হ্রদ, এবং বিবিধ তীর্থ হইতে জল আনীত হইয়া, তদ্দ্বারা চারি প্রকার কাষ্ঠময় পাত্র মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রপূরিত করা হয়। পাত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে একটী পলাশ কাষ্ঠের, একটী উডুম্বর কাষ্ঠের, একটী অশ্বত্থ কাষ্ঠের এবং একটি বট কাষ্ঠের দ্বারা গঠিত। এই তীর্থ-জল-পরিপূরিত চারিটা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কলস চাতুর্বর্ণ্য সভার চারিদিকে স্থাপিত করা হয়। *

সভার মধ্যস্থানে খদির কাষ্ঠের অথবা উডুম্বর কাষ্ঠের মঞ্চ, তাহা ব্যাঘ্রচর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তদুপরি সুবর্ণ-নির্ম্মিত ফলক বা পীঠ ন্যস্ত করিয়া তাহার উপরে সহস্র-ছিদ্রযুক্ত এক সুবর্ণ কলস (অভিষেকের নিমিত্ত) স্থাপন করা হইত।

অনন্তর "ব্রহ্মা" নামক পুরোহিত যজমানকে আগ্নীধ্র মণ্ডপের বাহিরে আনিয়া কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করাইতেন। সে সকল মন্ত্র কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ১ কাণ্ডীয় ৮ প্রপাঠকের ১২ অনুবাকে উক্ত আছে। তাহার একটী মন্ত্র এই——

মাভৃত মাস্বন্তঃ ক্ষত্রস্যোল্বমসি ক্ষত্রস্য যোনিরস্যাবিন্নো অগ্নির্গৃহপতিরাবিন্ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা আবিন্নঃ পূষা বিশ্ববেদা আবিন্নৌ মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবাবিন্নে। ইত্যাদি

* এই উপাখ্যান ঋগ্বেদে আছে। তাহা পুনরায় ব্যাসদেব মহাভারতে বিস্তার রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

† পবিত্র, চাতুর্ম্মাস্য, দেবিকা, অরত্নি হোম এবং অভিষেচনীয়।

‡ এই দিবসে অর্ঘ দ্বারা সমাগত রাজগণের সৎকার করা হয়। ইহা "ততোঽভিষেচনীয়েঽহ্নি ব্রাহ্মণা রাজভিঃ সহ। অন্তর্বেদীং প্রবিবিশুঃ সৎকারার্হা মহর্ষয়ঃ।" ইত্যাদি ক্রমে সভা পর্ব্বীয় অর্ঘ্যাহরণ পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষেই শিশুপাল বধ হইয়াছিল।

* রাজসূয় সভায় চারি বর্ণেরই আগমন হইত। মহাভারতের বর্ণনা দৃষ্টে বোধ হয় বর্দ্ধিষ্ণু ও অন্ত্যজ বর্ণেরাও সভায় প্রবেশ করিত। যথা—"আমন্ত্রয়ধ্বং রাষ্ট্রেষু ব্রাহ্মণান্ ভূমিপানথ। বিশশ্চ মান্যান্ শূদ্রাংশ্চ সর্ব্বানানয়তেতি চ।" পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাত্মা সহদেবকে অনুমতি করিলেন, তিনি "রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং মানার্হ শূদ্র সকলকে আমন্ত্রণ কর এবং আনয়ন কর" ইহা বলিয়া দিয়া দেশে দেশে দূত প্রেরণ করিলেন।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অগ্নি যেমন যজ্ঞের দ্বারাই গৃহপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইন্দ্র যেমন যজ্ঞের দ্বারা পূর্ণকীর্ত্তি হইয়াছেন, পুষাদেব যেমন সর্ব্বশিল্পজ্ঞানী, মিত্রাবরুণ নামক দেবতাদ্বয় যেমন সত্যসন্ধ, পৃথিবী যেমন ধারণ-শক্তি-সম্পন্না এবং অদিতি যেমন সর্ব্বদেবস্বরূপিণী অর্থাৎ সর্ব্বদেব-মাতা হইয়াছেন, সেইরূপ অমুক রাজার পুত্র, অমুক রাজার পৌত্র, অমুক নামা এই যজমান, এই যজ্ঞের দ্বারা এই রাজ্যের সমস্ত প্রজার উপর মহাধিপত্য ও মহারাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং এই রাজ্যের মধ্যে মহাকুলত্ব লাভ করিলেন।

স্বর সহকারে মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে পর, রাজা তাঁহার অভিপ্রেতার্থ প্রকাশ করত বলিতে থাকেন যে, "যজ্ঞফলদাতুঃ পরমেশ্বরস্য প্রসাদফলমিতি ভবন্তাঃ সূচয়ামি নত্বহং গর্ব্বোক্তিং ভনামীতি বিদন্তু ভবন্তঃ" অর্থাৎ আমি গর্ব্বোক্তি করিতেছি না। ইহা যজ্ঞফলদাতা পরমেশ্বরের অনুগ্রহের ফল, আমি ইহাই আপনাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি।

যাগপ্রবৃত্ত রাজা এইরূপ বলিলে, ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ সভাস্থ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ব্যক্তি সমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকেন,—"ভো ভারতাঃ অয়ং বঃ সর্ব্বেষাং রাজা সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা।" হে ভারতবাসিগণ! ইনি আপনাদের সকলেরই রাজা, সোম (লতা) আমাদের সকল ব্রাহ্মণের রাজা। †

অনন্তর রাজা দিগ্বিজয়ার্থ গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন ‡ সমস্ত ঋত্বিক একত্রিত হইয়া যজমানের সর্ব্বত্র রক্ষা এবং জয়াশীর্ব্বাদ-সূচক বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। অগ্রে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে হোম, পরে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা, তৎপরে আশীর্ব্বাদ ও দেবতা-প্রসন্নতা-বোধক কতিপয় বেদমন্ত্র জপ করেন।

এই কার্য্যের পর যজমান পত্নী-সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোল্লিখিত স্নানপীঠে উপবিষ্ট হন। পরে "অধ্বর্য্যু" প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সভাবর্গ একত্রিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক এক সহস্রছিদ্র অভিষেক-পাত্র দ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিতে থাকেন। এই অভিষেকের কতকগুলি বৈদিক মন্ত্র আছে, অনাবশ্যক বিধায় তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা হইল না।

অভিষেক সমাপ্ত হইলে রাজা বিভব অনুসারে, বস্ত্র, মালা, ও আভরণে ভূষিত হইয়া, যদি শত্রু থাকে তবে তাহাকে জয় করিতে ইচ্ছুক হন এবং যে দিকে তাঁহার

† ইহাতে একটি গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে, রাজা রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা সকল প্রজার উপর আধিপত্য লাভ করিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিলেন না এবং তাহাই তাঁহারা কৌশল দ্বারা সভাস্থলে ব্যক্ত করিলেন।

‡ দিক সকল যদি পূর্ব্ব হইতে বিজিত থাকে, তবে এখন কেবল ইচ্ছা মাত্র প্রকাশ করা হয়, অবিজিত থাকিলেই তাহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; যুধিষ্ঠির পূর্ব্বেই দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন।

শক্র বাস করে, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া সসৈন্যে গমন করেন। যুদ্ধ ঘটিলে তাঁহাকে জয় করিয়া মহাসমারোহে নিজ রাজধানীতে আগমন করেন। (শক্র না থাকিলে এই প্রয়াণ কার্য্যটীর অনুষ্ঠান হয় না)।

অনন্তর সভার চতুর্দ্দিকে পঁক্তি ক্রমে মঞ্চ সকল বিন্যস্ত করা হয়। মধ্যস্থলে এক উন্নত সুবর্ণ পীঠ স্থাপন করা হয়। রাজা সেই সৌবর্ণ মঞ্চে উপবিস্ট হন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উন্নত বিভিন্ন বর্ণেরা যথাযোগ্য নিম্নতন প্রদেশে উপবেশন করেন এবং তাঁহার বিজয়-প্রশস্তি বা যশোগান করিতে থাকেন। এই সময়ে দ্যূতক্রীড়া করিবার বিধান আছে। ইহার পণ "অন্ন"।

এবম্প্রকারের রাজসূয় যজ্ঞটী যেমন পবিত্র নামক সোম যাগ দ্বারা আরম্ভ হয়, সেইরূপ সৌত্রামনী নামক অপর একটী যাগ দ্বারা সমাপ্ত করা হয়। এই সৌত্রামনী যাগের বিধি ব্যবস্থা কল্পসূত্রে আছে। সাধারণ সোমযাগ অপেক্ষা ইহাতে বিশেষ এই যে অশ্বিনীকুমার, সরস্বতী, সুত্রামা এবং ইন্দ্র ইহার প্রধান দেবতা। কাষ্ঠনির্ম্মিত তিনটী "সোম-পাত্র" এবং মৃত্তিকানির্ম্মিত তিনটী "সুরা-পাত্র"।

পিতৃউদ্দেশে যাগ এবং যাগের পর সুরাপান বিহিত আছে। "সৌত্রামন্যাং সুরাং পিবেৎ" এই শ্রুতিবাক্য সফল করিবার নিমিত্ত সুরা পীন করা হইত, আমোদ উপভোগের নিমিত্ত নহে।

পূর্ব্বকালের রাজারা এইরূপ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া আত্মাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান এবং সম্রাট-উপাধি ধারণ করিতেন। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ও এবম্বিধানে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহার অভ্যন্তরে "অর্ঘ্যাহরণ" "সমাগত সৎকার" "রাজার্হনা" প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে বাহুল্য ভয়ে গ্রথিত করা হইল না।

অশ্বমেধ।

রাজসূয় অপেক্ষা অশ্বমেধ যজ্ঞটী সমধিক প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, ঋগ্বেদসংহিতা যাহা ভট্টমোক্ষমূলার দ্বারা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে রাজসূয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু অশ্বমেধের প্রসঙ্গ আছে। *

বস্তুতঃ আদিমতম কালে এ সকল যজ্ঞের প্রচার ছিল না, শ্রৌত কালেই এ সকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই জন্যই পৌরাণিক কালের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন "তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং যজ্ঞমুচ্যতে"।

রাজসূয়ের ন্যায় অশ্বমেধেও রাজা ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথব্রাহ্মণের উত্তর ভাগগত পাঁচটি অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আছে। ১৩ প্র, ১, ৩, ৮=১,

* "অশ্বমেধস্য দানাঃ সোমা ইব আশিরঃ"

"ইন্দ্রাগ্নী শতদাব্যাশ্বমেধে সুবীর্য্যং"

ব্রাহ্মণে "প্রজাপতিরশ্বমেধমসৃজত।" প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। "প্রজাপতিরকাময়ত অশ্বমেধেন যজেয়মিতি" প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন, আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব। "রাজা বা এষ যজ্ঞানাং যদশ্বমেধঃ।" এই যে অশ্বমেধ, ইহা সকল যজ্ঞের রাজা, ইত্যাদি মন্ত্রে, ক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞের উৎপত্তি, ইতিহাস, ইতিকর্ত্তব্যতা, এবং তাহার ফল প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এতদনুসারেই অথর্ব্ববেদীয় বৈতান সূত্র রচিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ যেরূপ ক্রমে বলিয়াছেন, বৈতানসূত্রও সেই রূপ ক্রমে লিখিত আছে। যথা——সপ্তমাধ্যায়ে "অথাশ্বমেধঃ। ১৪। ফাল্গুন্যা ব্রহ্মৌদনমুদ্দাতৃ চতুর্থেভ্যোদদাতি। ১৫। হুতায়াং প্রাতরাহুতৌ ব্রহ্মণে বরম্। ১৬। আগ্নেয়ীষ্টিঃ পৌষ্ণী চ। ১৭। বাতরংহা ভবত্যশ্বম্ নিযুজ্যমানমনুমন্ত্রয়তে। ১৮। ইত্যাদি ২।

কাত্যায়নীয় শ্রৌত সূত্রের বিংশতিতম অধ্যায়েও এই যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উপাধ্যায় কর্কাচার্য্য তাহার উত্তম বৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। "রাজ যজ্ঞোঽশ্বমেধঃ সর্ব্বকামস্য।" এইটীই তাহার প্রথম সূত্র। অত্র কর্কাচার্য্য—"রাজশব্দোঽভিষেকবতি ক্ষত্রিয়ে বর্ত্তত ইত্যুক্তং প্রদেশান্তরে। তথাচ ক্ষত্রিয়যজ্ঞং যদশ্বমেধঃ (১৩, ৪, ১, ২) তস্মাদ্রাষ্ট্র্যশ্বমেধেন যজেতেতি (১, ৬, ৩) রাজ্ঞো যজ্ঞঃ রাজযজ্ঞঃ ন ব্রাহ্মণবৈশ্যয়োরিতি। অশ্বমেধ ইতি ত্রিরাত্রস্য যজ্ঞক্রতোর্ণামধেয়ম্। স সর্ব্বকামস্য ভবতি"। ইত্যাদি।

অর্থাৎ রাজ শব্দের অর্থ অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়। অশ্বমেধ তাহাদেরই যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের নহে। "অশ্বমেধ" এই শব্দটী যজ্ঞ বিশেষের নাম, অশ্ব. থাকাতে নামের সার্থক্যও আছে। ইত্যাদি।

যাহা এই যজ্ঞের প্রধান অংশ তাহাই এস্থলে শতপথব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় যজুঃসংহিতা, বৈতান সূত্র, কাত্যায়ন সূত্র ও জৈমিনীয়াশ্বমেধ, এই সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিলাম। উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় হইতে উহার ক্রম-পরিপাটী ও প্রধান প্রধান দ্রব্য ও দেবতার বিষয় সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান করিতেছি।

এই যজ্ঞের প্রধান পশু অশ্ব। তদ্ভিন্ন ছাগ প্রভৃতি অন্যান্য পশুও এই যজ্ঞে আবশ্যক হইয়া থাকে। যজ্ঞমণ্ডপের দ্বারদেশে এক বিংশতি যূপ উচ্ছ্রিত করা হয়।*

এই সকল যূপের মধ্যবর্ত্তী যূপস্তম্ভে যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করা হয়। অন্যান্য পশু অন্যান্য যূপে আবদ্ধ করা হয়। অনন্তর কএকটী বেদমন্ত্রের দ্বারা সেই যজ্ঞীয় অশ্বের

* কৃষ্ণ যজুঃ সংহিতায় ১ কাণ্ডের ৪ প্রপাঠকে ৪৫ অনুবাকের ভাষ্যে লিখিত আছে "এক যূপো বৈকাদশিনী বা অন্যেষাং যজ্ঞানাং যূপা ভবন্তি। এক বিংশিন্যশ্বমেধস্য" ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্যান্য যজ্ঞে এক অথবা একাদশ যূপ, কিন্তু অশ্বমেধে একবিংশতি যূপ আবশ্যক হয়।

সংস্কার সমাধা করিয়া যথেচ্ছ সঞ্চরণের নিমিত্ত তাঁহাকে মহারাজের আজ্ঞা ক্রমে মুক্ত করা হয়। রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্রধারী বীর রাজকুমারগণ তাহার অনুগমন করেন। যাঁহারা অশ্বরক্ষক হন, মহারাজা তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ অনুজ্ঞা করেন—তোমরা এই অশ্বকে বাড়বানল, দাবানল, জল, বিবিধ সঙ্কট স্থান হইতে সাবধানে রক্ষা করিবে। এ যখন পররাজ্যে সঞ্চরণ করিবে তখন যদি কোন রাজা ইহাকে নিরুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাহাকে পরাজয় করিয়া অশ্বের উদ্ধার করিবে। যে যে ইহার বিরোধী হইবে, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রতিবিধান করিবে। যজ্ঞাশ্ব রক্ষা করার ফল আছে, যাও, তোমাদের কুশল হউক।”

অনন্তর রাজকুমারেরা সকল দিকেই অশ্বকে সঞ্চারিত করিয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থানে আনয়ন করেন। এই কার্য্যে অন্যূন ছয় মাস, অনধিক এক বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসাই বিধি, বিঘ্নক্রমে অধিক কাল হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে হয়। যিনি রাজাধিরাজ মহারাজ ক্ষত্রিয়চূড়ামণি, তিনিই এই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার প্রতাপবলে ইহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অশ্ব ফিরিয়া আসিলে সংজ্ঞপন ধর্ম্মে তাহাকে বধ এবং হোমকার্য্য সমাপ্ত করা হয়।

জৈমিনীয়াশ্বমেধ গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে যেরূপ বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহাও এস্থলে প্রদান করিতেছি।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাকাঃ দক্ষিণা কীদৃশী ক্রতৌ।
হয়শ্চ কীদৃশো ভাব্যস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥৩৮

ব্যাস উবাচ।

দ্বিজা বিংশতিসাহস্রা মখাদৌ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কুলীনাঃ সম্মতাঃ প্রাজ্ঞা বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
একৈকস্মৈ দ্বিজায়াত্র দক্ষিণাং প্রবদামি তে।৩৯
একোগজো রথশ্চৈকোহয়শ্চৈকঃ সকাঞ্চনঃ।
প্রত্যেকং গোসহস্রঞ্চ রত্নপ্রস্থং সকাঞ্চনম্। ৪০
ভারশ্চ কাঞ্চনস্যেকঃ প্রদেয়া দক্ষিণা মখে।
যস্মিন্ দিনে হয়ো রাজন্ মুচ্যতে প্রথমাহিসা। ৪১
দক্ষিণা কথিতা রম্যা তুরগং কথয়ামি তে।
গোক্ষীরসমবর্ণঞ্চ কুন্দেন্দুহিমসন্নিভম্। ৪২
পীতপুচ্ছং শ্যামকর্ণং সর্ব্বতোগতিমুত্তমম্।
শ্যামঞ্চাপি মহীপাল যজ্ঞেঽস্মিন্ তুরগং বিদুঃ। ৪৩
চৈত্র মাসস্য রাকায়াং মোচ্যোঽয়ং তুরগো নৃপ।
বর্ষমাত্রং রক্ষণীয়ঃ সর্ব্বযোধৈ র্মহাবলৈঃ।৪৪
পুত্রো বা বান্ধবঃ শূরো রক্ষণার্থং নিযুজ্যতে।
স্বয়ং যঃ কুরুতে যজ্ঞ মসিপত্র ব্রতং চরেৎ।৪৫
নিয়তঃ সচ রাজেন্দ্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা।

ইষ্টভোগান্ বর্ষমাত্রং সেবন্ নারীবিবর্জিতাম্। ৪৬

একত্র শয়নং কার্য্যং পত্ন্যা সহ নরাধিপ।
যাবদাগমনং তস্য পুনরেব প্রজাপতে। ৪৭
তাবৎ প্রযত্নবান্ কর্ত্তা নিবসেৎ ধৈর্য্যসংযুতঃ।
হয়ঃ পুরীষং মূত্রংবা কুরুতে যত্র যত্র চ।৪৮
গোসহস্রং প্রদেয়ংহি কর্ত্তব্যংহবনং দ্বিজৈঃ।
পূজনীয়াশ্চ তে বিপ্রা দক্ষিণাভির্ন সংশয়ঃ।৪৯
ললাটে তুরগস্যাপি পত্রং সংলিখ্য কাঞ্চনম্।
বদ্ধা স্বনামসংযুক্তং স্বপ্রতাপ সমন্বিতম্। ৫০
কথনীয়মিদং বাক্যং ময়ায়ং তুরগোত্তমঃ।
বিমুক্তোস্তি নৃপঃ কশ্চিৎ প্রতিগৃহ্লাতু চেৎ বলী। ৫১
যস্তু তং প্রতিগৃহ্লাতি স জেতব্যো বলাৎ স্বয়ম্।
অনেন বিধিনা বীর ক্রতুরেষ প্রজায়তে।৫২
অসিপত্রব্রতযুতো বহুপুণ্যফলপ্রদঃ।
এবমেব পুরা শক্রশ্চক্রে হয়ক্রতোঃ শতম।৫৩

(ইতি প্রথম অধ্যায়ঃ॥)

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই (অশ্বমেধ) যজ্ঞে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কিরূপ দক্ষিণা এবং কি প্রকার অশ্ব আবশ্যক হয় তাহা বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করুন। ৩৮

ব্যাস কহিলেন এই যজ্ঞে বিংশতাধিক সহস্র ব্রাহ্মণের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহারা সৎকুলসম্ভূত, সকলের মান্য, প্রাজ্ঞ, এবং বেদশাস্ত্রে পারগ। এই যজ্ঞে প্রত্যেকের উদ্দেশে যেরূপ দক্ষিণা বিহিত আছে তাহা বলিতেছি। ৩৯

এক হস্তী, এক রথ, এক কাঞ্চনভূষিত অশ্ব, সহস্র গো, (অথবা মূল্য) প্রস্থ-পরিমিত কাঞ্চনান্বিত রত্ন, এবং কেবল সুবর্ণও দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। মহারাজ! যে দিনে অশ্ব ত্যাগ করা হয়, সেই দিনের দক্ষিণা প্রথম দক্ষিণা। ৪১

হে মহীপাল! এই যজ্ঞে দক্ষিণার কথা বলা হইল, এক্ষণে মনোজ্ঞ অশ্বের কথা বলিতেছি। দুগ্ধ, কুন্দফুল, কিংবা চন্দ্ররশ্মির সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, পীতপুচ্ছ, শ্যামবর্ণ, সর্ব্বপ্রকার ও উত্তম গতিশক্তিসম্পন্ন অশ্ব আবশ্যক হয়। শ্যামবর্ণ অশ্ব হইলেও হানি নাই। ৪৩

রাজন্! চৈত্রী পূর্ণিমা তিথিতে অশ্ব মোচন করিতে হয়। এক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধবিশারদ মহাবল ক্ষত্রিয় সমূহ দ্বারা তাহার রক্ষা করিতে হয়। ৪৪

পুত্র কি অন্য কোন শূর বান্ধবকে অশ্ব রক্ষাণার্থে নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞকর্ত্তা স্বয়ং "অসিপত্র" ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। হে রাজেন্দ্র! সংযত থাকিয়া এই কার্য্য করিবেক, কোন প্রকার বিচারণা করিবেক না। এই এক বৎসর নারীভোগ ব্যতীত অন্যান্য অভীপ্সিত বস্তু ভোগ করিতে পারিবেক। ৪৬

অশ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ভোগ বিমুখ হইয়া নারীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে হইবেক। ইহা বড় সহজ ব্রত নহে—(ইহা খড়্গাধারে শয়নের তুল্য বলিয়া অসিপত্র নামে খ্যাত) ৪৭

অশ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অতিশয়িত

যত্ন ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিবেক। যে যে কালে অশ্ব পুরীষ অথবা মূত্র পরিত্যাগ করিবেক, সেই সেই স্থানে গোদান ও হোম করা কর্ত্তব্য। যাহারা হোম করিবেক, দক্ষিণা দান দ্বারা তাহাদিগকে পূজা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সংশয় নাই। ৪৮—৪৯ অশ্বের ললাট প্রদেশে আপনার নাম ও প্রতাপ-চিহ্ন-যুক্ত কাঞ্চন-পত্র বাঁধিয়া দিবেক। এবং এই বাক্য উচ্চারণ করিবেক যে, "আমি এই উৎকৃষ্ট অশ্ব বিমুক্ত করিলাম, যদি কেহ বলবান রাজা থাকেন তবে তিনি ইহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। ৫০—৫১। পরে যে ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিবেক, তাহাকে বলপূর্ব্বক জয় করিতে হইবেক। হে বীর! এইরূপ বিধানেই এই যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। "অসিপত্র" ব্রতযুক্ত এই অশ্বমেধ যজ্ঞে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ইন্দ্র এইরূপ বিধানে শত অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। ৫৩।

উল্লিখিত বিধানে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করিয়া যজমান মহাসমারোহে স্নান করিয়া থাকেন। এই স্নানের নাম "অবভৃথ"। সমস্ত মহাযজ্ঞেই এই স্নান বিহিত আছে। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"শিষ্ট্বা বা ভুমিদেবানাং নরদেবসমাগমে।
স্বমেনোঽবভৃথে স্নাত্বা হয়মেধে বিশুধ্যতে।"

ঋত্বিক্‌ ও যজমান একত্র মিলিত হইয়া যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নান করেন, তখন অন্য পাপীও তৎসঙ্গে, স্নান করিলে (আপনার পাপ খ্যাপন পূর্ব্বক) বিশুদ্ধ হইতে পারেন।

প্রাচীন কালের অশ্বমেধ যজ্ঞ এই, পরন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল এস্থলে গ্রথিত করিলাম না।

পুরুষমেধ যজ্ঞ।

ইহা একটী ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার। প্রাচীন কালে ইহা অনুষ্ঠিত হইত কি না, তাহা জানি না কিন্তু শুক্ল যজুর্ব্বেদে * এ বিষয়ের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন নরবলি তান্ত্রিক কাল হইতেই প্রচলিত কিন্তু তাহা নহে; উহা বৈদিক কালের পুরুষমেধের রূপান্তর মাত্র। কারণ মাধ্যন্দিনী শাখার শত পথ ব্রাহ্মণে এই যজ্ঞের বিস্পষ্ট উপদেশ আছে।

যথা—"অথ যস্মাৎ পুরুষমেধো নাম। ইমে বৈলোকাঃ পুরুষমেব পুরুষো যোঽয়ং পবতে সোঽস্যাং পুরিশেতে তস্মাৎ পুরুষস্তস্য যদেষু লোকেষন্নং তদস্যান্নং মেধঃ—" ইত্যাদি—

(উত্তরভাগের ষষ্ঠাধ্যায় দেখ)। অর্থ এই যে, যে কারণে যজ্ঞের "পুরুষ মেধ" নাম, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই

* আমরা ইহার প্রমাণ আর্য্য সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

লোক পূর্ণ করিতেছেন বলিয়া "পুরুষ"। এই যিনি বাহিরে পবিত্র করিতেছেন (অর্থাৎ বায়ু) তিনিই এই পুরি অর্থাৎ শরীরে বাস করিতেছেন। এই হেতু ইহার নাম পুরুষ। এইরূপে, ক্রমে "পুরুষ" শব্দের নিরুক্তি, "মেধ" শব্দের নিরুক্তি, যজ্ঞের উপর "পুরুষমেধ" নামের প্রবৃত্তি, এবং এতাদৃশ যজ্ঞে কি কি কার্য্য করিতে হইবে সমস্তই এই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার শ্রৌত সূত্রে এই যজ্ঞের কার্য্যবিভাগ সমস্ত উত্তম রূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—" পুরুষমেধস্ত্রয়োবিংশতি দীক্ষোঽতিষ্টা কামস্য।" (১) "ব্রাহ্মণ রাজন্যয়োঃ" (২) অগ্নিষ্টোমাবন্তরেনাতিরাত্র উকৃথা যজ্ঞঃ"। (৩) "তাবন্তোঽগ্নিষোমীয়াঃ" (৪) (ইত্যাদি একবিংশ অধ্যায় দেখ।)

উল্লিখিত কাত্যায়ন-সূত্র-নিচয়ের দ্বারা পুরুষমেধের এইরূপ সংক্ষেপ সংকলন করা যায়। "সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ হইব" এইরূপ কামনা-বিশিষ্ট পুরুষেরা পুরুষমেধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই উভয় জাতিই এই যজ্ঞের অধিকারী; বৈশ্য ও শূদ্রেরা করিতে পারেন না। ইহা এক প্রকার পঞ্চরাত্র যজ্ঞ। ইহার আদ্যন্তে "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ এবং মধ্যে "অতিরাত্র" যজ্ঞ। এই যজ্ঞের পশু ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় হওয়া আবশ্যক। যাজক ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণ পশু, ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয় পশু †। এই যজ্ঞের দক্ষিণা অশ্বমেধের সমান কিন্তু ব্রাহ্মণ যাজক হইলে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়, পশ্চাৎ অরণ্য প্রবেশ অর্থাৎ সন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়।

অথর্ব্ববেদের বৈতান সূত্রেও এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—

"পুরুষমেধোঽশ্বমেধবৎ" (১০) "যজমানস্য বিজিতং সর্ব্বং সমৈত্বিতি জনপদমুচ্চৈঃ শ্রাবয়তি (১৩) পুরুষমেধ অশ্বমেধের ধর্ম্ম ক্রমেই অনুষ্ঠিত হইবেক। যাজকের সমস্তই জয় করা হইয়াছে, পুরোহিত ইহা জনপদবাসীকে শ্রবণ করাইবেন।

যাজক যদি ব্রাহ্মণ হন, তবে ব্রাহ্মণ পশু এবং ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয় পশু, অলাভ হইলে শত্রু জয় করিয়া তাহাকেই পশু করিয়া এই যজ্ঞ করিবেক। (১৬) তাহাকে স্নান করাইয়া, অলঙ্কার পরাইয়া, উৎসর্গ করিবেক, এবং "সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ দ্বারা আমন্ত্রণ করিবেক (১৯) ইত্যাদি ইত্যাদি (সপ্তম অধ্যায় দেখ)

"হরিনীভি শামিত্রে স্ত্রিয়মানম্" "হরিনীভি" ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র পাঠ করিলে বধস্থানেতে লইয়া যাইবেক। "স্যোনাশ্মে

---

† কাত্যায়ণ সূত্রের বৃত্তিকার কর্কাচার্য্য একটী শ্রুতি প্রমাণ দিয়া বলিয়াছেন, যে, পুরুষ পশু বধ করিতে হয় না, পর্য্যাগ্নিকৃত করিয়া উৎসর্গ মাত্র করিতে হয়। যথা—" কপিঞ্জলাদিবদুৎসৃজন্তি ব্রাহ্মণাদীন্" (শ্রুতি) "পর্য্যাগ্নিকৃতানুৎসৃজন্তীত্যর্থঃ" (বৃত্তি) অর্থাৎ "কপিঞ্জল পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় ইহাকে পর্য্যাগ্নিকৃত করিয়া উৎসর্গ (ত্যাগ) করিবেক।

ভব পৃথিবী” ইত্যাদি ক্রমে ঋক মন্ত্র দ্বারা নিপাতন এবং “সহস্র বাহু যায় সারস্বতে” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সংজ্ঞপ্ত অর্থাৎ বধ করিবেক।

এই যজ্ঞের অপর নাম “প্রাজাপত্য ইষ্টি”। এই ভয়ানক যজ্ঞকাণ্ড বৈদিক কালেই লোপ হইয়াছে।

শ্রীরামদাস সেন।

হিয়োন সাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ।

চতুর্থ ভাগ, ৩ সংখ্যা ১২৫ পৃষ্ঠার পর।

শিলাচল।

(She-li-cha-ta-lo.)

হিয়োনসাঙ সমতটের পূর্ব্বদিকে কতিপয় রাজ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে গুলি তিনি দর্শন করেন নাই। প্রথমেই “সি-লি-চ-ট-ল”। ইহা সমতটের উত্তর পূর্ব্ব দিকে। ফরাসী পণ্ডিত ইহাকে “শ্রীক্ষেত্র” অনুমান করেন। কনিংহাম সাহেব “শ্রীক্ষেত্র” কে “শ্রীহট্ট” নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার এবম্প্রকার নির্দ্দেশের প্রতি ফারগিউসন সাহেব একটু সন্দিহান হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নহে। পুরাতত্ত্বালোচনায় “সিলিচটল” কে হেরম্ব রাজ্যের রাজধানী “সিলাচল” অনুমান করিবার জন্য আমাদের হৃদয় নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে। হেরম্ব যে একটী প্রাচীন রাজ্য ইহা একপ্রকার অসন্দিগ্ধ বিষয়। (৬৮) শ্যান ইতিহাস আলোচনায় অনুমিত হয়, শকাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্ত কামরূপ, হেরম্ব ও ত্রিপুরা দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময় শ্যানদিগের পরাক্রমে সমস্ত পূর্ব্বোপদ্বীপ কম্পিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় তাহারা, বীরেন্দ্র-বৃন্দ্র-রক্ষিত প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর স্বরূপ কামরূপ হেরম্ব ও ত্রিপুরা অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

হিয়োনসাঙ শিলিচটল রাজ্যটী সমুদ্র (বা হ্রদ) তীরবর্ত্তী লিখিয়াছেন। অদ্যাপি শ্রীহট্ট প্রদেশের যেরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা প্রায় ১২।১৩ শত বৎ-

---

(৬৮) বঙ্গ দর্শন, ষষ্ঠ খণ্ড, আশ্বিন, ২৬৫ পৃষ্ঠা। মল্লিখিত “মণিপুরের বিবরণ” দ্রষ্টব্য, মুদ্রাকর-ভ্রমবশতঃ সেই প্রবন্ধের কোনও কোনও স্থানে এই রূপ অক্ষর ও বাক্য সংযোগ করা হইয়াছে যে তৎপাঠে স্থানে স্থানে আমার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ বোধ হইয়া থাকে, সুতরাং পাঠক মহাশয়েরা তাহা সাবধানে পাঠ করিবেন।

সর পূর্ব্বে যে ইহা একটী সমুদ্র ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বহু প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধানে ইহা বিশিষ্ট রূপে প্রতীত হয় এবং মহাভারতেও অনেক স্থলে কামরূপপতি ভগদত্ত সাগরতীরবাসী নরপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সত্য বটে শ্রীহট্টের উত্তর, পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগ পার্ব্বত্য প্রদেশ। আমরা ইহা বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছি, যে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে ত্রিপুরা ও কাছারের অংশ লইয়া শ্রীহট্টের অঙ্গপুষ্টি করা হইয়াছে। (৬৯) উত্তর ভাগটী অবশ্য কামরূপেরই অধীন ছিল। মুসলমানদিগের ভারতপ্রবেশ-কালে শ্রীহট্ট দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যথা "গৌড়" ও "লাউড়"। গৌড় নগরী জয়ন্তীয়া পর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত ছিল। লাউড় খশ পর্ব্বতে, আধুনিক চড়াপুঞ্জীর পশ্চিম দিকে ছিল বলিয়া অদ্যাপি সেই পর্ব্বতকে "লাউড়ের পাহাড়" বলে। ইহার পূর্ব্বে শ্রীহট্ট নামক স্বতন্ত্র রাজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। "শ্রী হট্ট" নামের অর্থ সুন্দর—হাট (বা বাজার)। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীহট্ট গৌড় (জয়ন্তীয়া) রাজ্যের একটী নগরী ছিল। দেবানুগ্রহে সাহজালাল ১৩০৬ শকাব্দে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবিশারদ গৌড়েশ্বর গোবিন্দ (৭০) কে জয় করিয়া শ্রীহট্ট অধিকার করেন। জাতীয় কিম্বা বিজাতীয় ইতিহাসে ইহার পূর্ব্বে শ্রীহট্টের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কবিবর ভারতচন্দ্র পাঠমালায় শ্রীহট্টের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সংস্কৃত পীঠ নির্ণয়ে শ্রীহট্টের নামটী দৃষ্ট হয় না। কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হইলেও তাঁহাকে আমরা শ্রীহট্টের প্রাচীনত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ এবম্প্রকার তন্ত্রের বয়ঃক্রম ৩।৪ শতাব্দীর অধিক নহে। শ্রীহট্টের প্রাচীনতত্ত্বের প্রমাণাভাবে আমরা "শিলিচটল" কে হেরম্ব রাজ্যের রাজধানী সিলাচল নির্ণয় করিলাম। ইংরাজগণ সিলাচলকে "সিলচর" কহে।

(৬৯) প্রাচীন কথা উল্লেখের প্রয়োজন কি। কাপ্তান পেম্বাবটন প্রভৃতি ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রাচীন মানচিত্রের সহিত—১৮৬৩-৬৪ খৃস্টাব্দের অঙ্কিত ত্রিপুরা ও ব্রিটীষ রাজ্যের সীমা-নির্ণায়ক কর্ত্তৃপক্ষদিগের—মানচিত্রের—তুলনা করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন এই অল্পকাল মধ্যে ত্রিপুরার কলেবর কতদূর খর্ব্ব হইয়াছে।

(৭০) মুসলমানগণ শ্রীহট্টবাসীদিগকে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবিশারদ বলিয়া বড় ভয় করিত। যবন ঐতিহাসিকগণ শ্রীহট্ট ও কামরূপবাসীদিগকে যাদুকর বলিয়া গালি দিয়াছেন। শ্রীহট্টবাসীগণ নিতান্ত দুশ্চরিত্র ছিল। প্রাচীন কালে শ্রীহট্ট হইতে খোজা ভারতের সর্ব্বত্র রপ্তানি হইত। সম্রাট জাঁহাঙ্গির এই কুপ্রথা উঠাইয়া দেন। মুসলমানগণ বাঙ্গালাকে "ভুস্বর্গ" বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীহট্টের এই সকল দুষ্কার্য্যের উল্লেখ করিয়া পারস্যবাসীগণ বাঙ্গলাকে "নরক" লিখিয়াছেন। এক সময় শ্রীহট্ট বঙ্গের কলঙ্কস্বরূপ ছিল। বোধ হয় কালে শ্রীহট্ট বঙ্গের গৌরব স্বরূপ হইবে।

কমলাঙ্ক।

('Kia-mo-lang-kia.)

সমতটের পূর্ব্বদিকে "কিয়ামোলাঙ্কিয়া" রাজ্য। ইহা বোধ হয় ত্রিপুরার তদানীন্তন রাজধানী "কমলাঙ্ক"। আধুনিক কুমিল্লা তাহার অপভ্রংশ। শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে ত্রিপুরার রাজপাট কুমিল্লাতে ছিল। গণনা দ্বারা নির্ণীত হইতেছে ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত ৪০ বৎসর অন্তে হিয়োনসাঙ কাবুলে উপনীত হন। মহারাজ বীররাজদেব ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত করেন। সম্ভবত তাঁহার পুত্রের রাজ্য-শাসন-কালে হিয়োনসাঙ ভারত ভ্রমণ করিতেছিলেন।

হিয়োনসাঙ কমলাঙ্ক রাজ্য বৃহৎ উপসাগরের তীরবর্ত্তী লিখিয়াছেন। মহাভারতেও ত্রিপুরা সাগরতীরবর্ত্তী লিখিত আছে। কবিচূড়ামণি কালিদাস সুহ্ম বা ত্রিপুরা 'মহাসাগরের তালীবনশ্যাম উপকণ্ঠ' বর্ণন করিয়াছেন। (তালীবনশ্যাম মুপকণ্ঠং মহোদধেঃ।) বলা বাহুল্য যে ত্রিপুরারাজ্য—এক সময়ে—কামরূপের সীমান্ত হইতে নিগ্রহ অন্তরীপ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। চট্টগ্রাম ও আরাকাণ ইহার অন্তর্ভূত ছিল। ডাক্তর ফারগিউসন ত্রিপুরাকে সমতটের অন্তর্নিবিষ্ট লিখিয়া চট্টগ্রাম ও আরাকান প্রভৃতি কমলাঙ্ক রাজ্য লিখিয়াছেন। সমুদ্র গুপ্তের লাট প্রস্তরের প্রিনসেপ-কৃত ভ্রমাত্মক অনুবাদই এইরূপ অনুমানের মূল সূত্র। যাহা হউক এস্থলে আমরা ত্রিপুরা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিতে অভিলাষী নহি। দেশীয় ও বৈদেশিক গ্রন্থাদি হইতে আমরা ত্রিপুরার নিম্নলিখিত নামগুলি সংগ্রহ করিয়াছি।

কিরাত রাজ্য
সুহ্ম রাজ্য
ত্রিপুরা রাজ্য
কমলাঙ্ক রাজ্য
পাটিকুকারা রাজ্য
উদয়পুর রাজ্য
অমরপুর রাজ্য
জাহাজ নগর রাজ্য
মরুৎ রাজ্য
তথ্লেঙ রাজ্য

হিয়োনসাঙ কমলাঙ্ক রাজ্যের পূর্ব্ব দিকে আরও কয়েকটী রাজ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সে গুলির সহিত বাঙ্গালা কিম্বা ভারতের কোন সম্পর্ক নাই।

তাম্রলিপ্ত।

(Tan-mo-li-ti.)

সমতট হইতে ১৫০ মাইল (৯০০ লি) গমন করিয়া হিয়োনসাঙ তাম্রলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তি নগর প্রাপ্ত হন। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত অদ্যাপি তামলুক নামে পরিচিত রহিয়াছে। তামলুক এক সময়ে বাণিজ্য দ্বারা জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। দিগ্‌দেশীয় বণিকগণ বাণিজ্যার্থে তামলুকে সম্মিলিত হইতেন। বাঙ্গালী বণিকগণ এস্থান হইতে পোতারোহণে "সমুদ্রের বুকে পদাঘাত" করিয়া দেশ দেশান্তরে গমন করিত। একবিংশ শতাব্দী

পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মাশোকের দূত তাম্রলিপ্ত নগরে অর্ণবযান আরোহণ করত সিংহল দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। শকাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে পরিব্রাজক ফাহিয়ান তাম্রলিপ্ত দর্শন করেন। তাঁহার "ভ্রমণবৃত্তান্তে" লিখিত আছে তিনি সহচরদ্বয়ের সহিত চম্পা নগরী হইতে প্রায় ৫০ যোজন পূর্ব্বমুখে গমন করিয়া তাম্রলিপ্তে উপনীত হন। বঙ্গোপসাগরের অগাধ জলরাশি এই নগরের পাদ মূল প্রক্ষালন করিত। এই রাজ্যে ২৪টী বিহার ছিল। বিহার সকল শ্রমণগণের দ্বারা পূর্ণ থাকিত। এস্থানে বৌদ্ধ বিধি উন্নত ভাবে প্রচলিত ছিল। পরিব্রাজক দুই বৎসর তাম্রলিপ্তে বাস করিয়া ধর্ম্ম গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও বৌদ্ধদেব-মূর্ত্তি চিত্র করিয়াছিলেন।" বিন সাহেব বলেন ফাহিয়ান তামলুকে বসিয়া তাহার "সূত্রগ্রন্থ" লিখিয়াছেন। জনৈক বাঙ্গালী বণিকের বৃহৎ অর্ণবপোত আরোহণে ফাহিয়ান সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। ক্রমে চতুর্দ্দশ দিবারাত্র সমভাবে গমন করিয়া সেই বাণিজ্যতরী সিংহলে পঁহুছিয়াছিল। ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তবাসীদিগের নিকট শুনিয়াছিলেন যে "সিংহল তাম্রলিপ্তির সাত শত যোজন দূরবর্ত্তী একটী দ্বীপ। ইহার পূর্ব্ব পশ্চিম দৈর্ঘ্য ৫০ যোজন, পরিসর ৩০ যোজন। এই দ্বীপে নানা প্রকার মণি মুক্তা পাওয়া যায়। সিংহলের পার্শ্বে কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।"

পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ বলেন,—"তাম্রলিপ্তি রাজ্যের পরিধি ২৫০—৩০০ মাইল (১৫০০ লি) (৭১) ইহার অন্তর্ব্বাণিজ্য স্থলপথে ও বহির্ব্বাণিজ্য জলপথে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই রাজ্যটী ক্ষুদ্র, কিন্তু শস্যশালী। ইহার ভূমি উর্ব্বরা ও প্রায় সর্ব্বদাই আর্দ্র দৃষ্ট হয়। এই রাজ্যে ১০টী মঠ আছে। তাহাতে প্রায় সহস্র শ্রমণ

(৭১) সেই মহাভারতের সময় হইতে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও তাম্রলিপ্ত একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। ক্রমে তাহার এতদূর বলবৃদ্ধি হইয়াছিল যে তত্রত্য নরপতি ১০৫৩ শকাব্দে কেশরীবংশীয়দিগকে জয় করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। তথাকার বিজয়ী বাঙ্গালী রাজবংশ "গঙ্গারাঢ়ী" নামে পরিচিত। সেই সময় কয়েক শতাব্দী তাম্রলিপ্ত আত্ম সন্তান কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াও অধীন রাজ্যমধ্যে পরিগণিত ছিল। ১৮৯ শকাব্দে গঙ্গারাঢ়ীবংশের হস্ত হইতে উড়িষ্যার রাজদণ্ড স্খলিত হইলে, হিঙ্গুলায় (আধুনিক হিজলী) একটী স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপিত হয়। তাম্রলিপ্ত সে সময়ে হিঙ্গুলার অধীন ছিল এরূপ অনুমিত হয়। রাজা তোড়ল মল্ল সুবে উড়িষ্যা ৫টী সরকারে বিভক্ত করেন। সরকার 'মেদিনীপুর' হিঙ্গুলা' তাহার অন্যতম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১৫৫২ শকাব্দার পূর্ব্বে হিঙ্গুলা যবনসাম্রাজ্য ভুক্ত হয় নাই। সুলতান সুজা স্বীয় শাসনকর্ত্তৃত্ব সময়ে হিঙ্গুলা সুবে উড়িষ্যা হইতে পৃথক করিয়া তথায় একটী স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। (F Valentyan Vol V.) ১৫৫২ শকাব্দে হিঙ্গুলা রাজ্যের বিধিসঙ্গত অধিকারী যবন কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া ভুজবলে স্বদেশ উদ্ধার করেন। কিন্তু তৎপর বৎসর আওরঙজীব উলান্দাজদিগের সহায়তায় হিঙ্গুলাপতিকে পুনর্ব্বার কারারুদ্ধ করেন।

বাস করেন। এই রাজ্যে বিধর্ম্মিদিগের (হিন্দু) ৫০টী দেবমন্দির আছে।" তাম্র- লিপ্ত নগরপ্রান্তে মহারাজ অশোক লব্ধ- নির্ব্বাণ বুদ্ধচতুষ্টয়ের সম্মানার্থ একটী উৎকৃষ্ট স্তম্ভ ও অন্যান্য স্মরণার্থ চিহ্ন সংস্থাপন করিয়া যান। হিয়োনসাঙ সেই সকলের ভগ্নাবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন।

অদ্যাপি তামলুক মেদিনীপুরস্থ একটি বাণিজ্য-স্থান। ইহা রূপনারায়ণের খাড়ির তীরে অবস্থিত। তামলুক ভাগীরথী ও রূপ- নারায়ণ উপনদের সঙ্গম-স্থল হইতে দ্বাদশ মাইল দূরবর্ত্তী। তামলুক জেলা মেদিনী পুরস্থ একটী উপবিভাগের প্রধান নগরী।

প্রাচীন তাম্রলিপ্তি রাজ্যের উত্তর সীমান্ত বর্দ্ধমান ও পূর্ব্বদিকে "হুগলি নদী দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া কনিংহাম সাহেব অনুমান করেন। আমরাও এই অনুমানকেই সঙ্গত বোধ করি। কিন্তু ফরগিউসন সাহেব "ব" কারাকৃতি প্রদেশের কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত লিখিয়াছেন। প্র- কৃত পক্ষে ইহা ভ্রমাত্মক।

কিরণ সুবর্ণ।

Kee-to-na-suta-ta-na

পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ তাম্রলিপ্ত হ- ইতে ১১৭—১৪০ মাইল (৭০০লি) উত্তর পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া "কি য়ে লো না সুফলনা' রাজধানী প্রাপ্ত হন। (৭২) পণ্ডিত মণ্ডলী ইহাকে "কিরণ সুবর্ণ" নগর অনুমান করেন। এই রাজধানী উড়িষ্যার রাজধানীর উত্তর পূর্ব্ব দিকে ও ৭০০ লি দূরবর্ত্তী। (কিরণ সুবর্ণ নগরের স্থান নির্ণয় জন্য আমাদিগকে জ্যামিতি শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। হিয়োনসাঙের নির্দ্দেশ অনুসারে তামলুক, কিরণ সুবর্ণ ও উড়িষ্যার রাজধনী হইতে পরস্পরস্পর্শী এক একটী রেখা অঙ্কিত করিলে; ৭০০ লি দীর্ঘ বাহু সমন্বিত একটী সুন্দর সমবাহু ত্রিভুজ হইতে পারে। আমরা "তামলুক' ও "জাজপুর" সেই সম- বাহু ত্রিভুজের দুইটী কোন স্থিত 'বিন্দু' স্থির রাখিয়া বাঙ্গলার মানচিত্রোপরে একটী সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত করিয়াছি- লাম। তদনুসারে 'কিরণ সুবর্ণ' আধুনিক সিংহভুম জেলার প্রধাননগরী চৈবসার প্রায় ১০ ক্রোশ উত্তর দিকে নির্ণীত হই- তেছে।) কনিংহাম সাহেব বলেন 'কিরণ সুবর্ণ' আধুনিক সিংহভুম ও বীরভুম প্রদে- শের কোন স্থানে সুবর্ণ রেখা নদীতীরে অবস্থিত ছিল।' তিনি "বড় বাজারের' নিকটবর্ত্তী স্থানে কিরণসুবর্ণের স্থান নির্ণ- য়ের প্রয়াস পাইয়াছেন।

বিজ্ঞবর ফারগিউসন সাহেব বলেন, "মোগল শাসিত বঙ্গের রাজধানী মুরশিদা- বাদ নগরের দ্বাদশ মাইল, দক্ষিণদিকস্থ "রাঙ্গামাটী" ই প্রাচীন "কিরণ সুবর্ণ" নগরী। কাপ্তান লেয়ার্ড এসিয়াটিক সো- সাইটীর জর্ণেলে রাঙ্গামাটীর পুরাতত্ত্ব

(৭২) ফারগিউসন সাহেবের মতে পরি- ব্রাজক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কিরণ সুবর্ণ দর্শন করিয়া সমতটে গমন করিয়াছিলেন।

মূলক একটী প্রবন্ধ লিখেন। (৭৩) লেয়ার্ড বলেন বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন নরপতি "করণ সেন" বা "কর্ণসেন" যে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন তাহার প্রকৃত নাম "কর্ণ সেনপুরী" কিন্তু সাধারণত এই রাজধানী "কর্ণসেনকা ঘর' বলিয়া উক্ত হইত। এই কর্ণসেনপুরীই বর্ত্তমান সময়ে রাঙ্গামাটী নামে পরিচিত হইয়াছে। ফারগিউসন সাহেব এই "কর্ণসেন কা ঘর" কেই কিরণ সুবর্ণ নগর স্থির করিয়াছেন। তাহার এবম্প্রকার উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য অতি সামান্য।

সুবর্ণরেখা নদীর তীরস্থ আধুনিক "ডুলমি" ও "সুফরাণ" "সুইস্যা" নামক পল্লিদ্বয়কে বিজ্ঞবর বেগলার সাহেব প্রাচীন "কিরণ সুবর্ণ" নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার যত্ন নিতান্ত অমূলক নহে। অধিকন্তু তিনি বলেন তৎপ্রদেশস্থ উপবিভাগ "করণপুর" ও সুইস্যার ৩ মাইল দূরবর্ত্তী পল্লি "সুফবাণের" নাম হিয়োন সাঙের "কিয়েলো না সুফল না" হইতেই উৎপন্ন। ডুলমি সুফরাণ ও সুইস্যা পল্লিতে প্রাচীন অট্টালিকাদির রাশীকৃত ভগ্নাবশেষই তাহার প্রাচীন উন্নতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। (৭৪)

হিয়োনসাঙ শস্যশালিনী উর্ব্বরা কিরণসুবর্ণ রাজ্যের পরিধি ৭০০—৯০০ মাইল (৪০০০—৪৫০০লি) লিখিয়াছেন। এই রাজ্য একদিকে দামোদর ও অপর দিকে বৈতরিণী দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বোধ হয় মেদিনীপুর ও সরগুজার মধ্যবর্ত্তী রাজ্যগুলি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।

শকাব্দার ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে মহারাজ শশাঙ্ক কিরণসুবর্ণের রাজাসনের গৌরববর্দ্ধন করিতেছিলেন। যাঁহার ভুজবলে সমস্ত ভারত কম্পিত হইয়াছিল, আজি সেই শশাঙ্ক কোথায়, যাঁহার নাম শ্রবণে বৌদ্ধ নৃপমণ্ডলীর হৃৎকম্প হইত, সেই প্রাতঃস্মরণীয় বীরেন্দ্র বাঙ্গালী আজি কোথায়, সম্রাট রাজ্যবর্দ্ধনের প্রাণহন্তা গৌড়েশ্বর (৭৫) শশাঙ্ক আজি কোথায়, বৌদ্ধগয়া হইতে ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি উৎপাটন কিম্বা চূর্ণ করিবার জন্য যাঁহার অলঙ্ঘনীয় অনুজ্ঞা ঘোষিত হইয়াছিল, সেই বীরকেশরী বাঙ্গালী আজি কোথায়, তিনি অনন্ত ধামে গমন করিয়াছেন। বঙ্গবাসীগণ সেই প্রাতঃস্মরণীয় বীর পুরুষের নামটী পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। যে রাজ্য এক সময়ে বেদজ্ঞ মহর্ষিদিগের আবাস-ভূমি ছিল অধুনা সে স্থানে কেবল কোল, ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্য জাতি ও বন্য পশু পক্ষীদিগের বাসস্থান হইয়াছে। অদ্যাপি কিরণ সুবর্ণ রাজ্যের

(৭৩) Journal Asiatic Society of Bengal Vol XX11 Page 281—282.

(৭৪) See the Arch. Survey Report of India Vol VI11 page 186-87-88-89-90-91 and the plate II1.

(৭৫) কোন কোন গ্রন্থে শশাঙ্ক নরপতির "গৌড়েশ্বর" উপাধি দৃষ্ট হয়। বোধ হয় বাঙ্গলার পরাক্রান্ত প্রদেশাধিপতিগণই এই উপাধি ধারণ করিতেন।

কোন কোন স্থানে দেবমন্দিরের অসংখ্য ভগ্নাবশেষ স্তূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিয়োনসাঙের ভ্রমণকালে বাঙ্গালায় অনার্য্য সংখ্যা অধিক কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

ওড্র উড়িষ্যা।

(Ucha or Oda)

কামরূপের সহিত বাঙ্গালার যে সম্পর্ক উড়িষ্যার সহিতও তাহাই বটে। চীন পর্য্যটক উভয় স্থানের ভাষাই পার্শ্ববর্ত্তী (বাঙ্গালা) স্থানের ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন লিখিয়াছেন। কিঞ্চিদধিক দ্বাদশ শতাব্দী অন্তে আমরাও চীন পর্য্যটকের উক্তি পোষণ করিতেছি। কিন্তু আসামী ও উড়িয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষার সহিত নিঃসম্পর্ক আমরা এরূপ বলিতে প্রস্তুত নহি। আমেরিকা দেশীয় পরিব্রাজক রেবারেণ্ড ব্রাউণ লিখিয়াছেন আসামী ভাষায় শত ভাগের পঞ্চাশ ভাগ বাঙ্গলা। (৭৬) আমরাও ব্রাউণের উক্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি। আমাদের বিবেচনায় উড়িয়া ভাষায় ও প্রায় শতভাগে পঞ্চাশ ভাগ বাঙ্গালা।(৭৭)

কিরণ স্থবর্ণ হইতে ৭০০ লি গমন করিয়া পরিব্রাজক উড়িষ্যার রাজধানী প্রাপ্ত হন। কিন্তু কনিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন "বোধ হয় পর্য্যটক কিরণস্থবণ হইতে তামলুকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথা হইতে উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন। তামলুক হইতেও এই রাজধানী ৭০০ লি দূরবর্ত্তী। দূরতানুসারে এই রাজধানীটী বৈতরণী নদীর তীরস্থ অনুমিত হইতেছে। অতি প্রাচীন কালে মহানদী তীরস্থ "কটক" উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। কিন্তু শালিবাহনপ্রচলিত অব্দের চতুর্থ শতাব্দীর অন্ত ভাগে বৌদ্ধ (তাম্রফলকে বৌদ্ধের পরিবর্ত্তে "যবন" লিখিত) দিগকে জয় করিয়া শৈব নরপতি যযাতিকেশরী উড়িষ্যা অধিকার করেন। বোধ হয় তিনি মগধেশ্বর ভবগুপ্তের করাধীন ছিলেন। (৭৮) যযাতি কেশরী বৈতরিণী নদীর তীরস্থ স্বনাম-খ্যাত নগরী "যযাতিপুর" নির্ম্মাণ করেন। সাধারণতঃ এই রাজভবন "চৌদুয়ারি" নামে পরিচিত ছিল। যযাতি কেশরীর সময় হইতে অবিচ্ছেদে পাঁচ শত বৎসর উড়িষ্যার রাজপাট যযাতিপুরে সংস্থাপিত ছিল। ঐ কালের পর ৯১১ শকাব্দে নৃপকেশরী রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সেই যযাতিপুরই অধুনা "যাযপুর" নামে পরিচিত। এতাবতা স্থির হইল হিয়ানসাঙের ভ্রমণকালে ও যাযপুরই উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। অধিকন্তু যদি লেখনীর বক্রগতিতে পবিত্র ইতিহাস কলু-

(৭৬) See Journal As society of Bengal Vol V1 p. 1028.

(৭৭) পরিশিষ্ট দেখ।

(৭৮) See copper plate grant found in the record office of the Cuttac callectorate journal Asiatic society of Bengal Vol XLVI part 1 (No 2) p 149 to 158.

বিত না হইয়া থাকে, তবে ইহাও বলিতে পারি যে মহারাজ ললিতেন্দ্রকেশরী সেই সময় কৈলাস-ধাম-সমন্বিত ভুবনেশ্বর নামক প্রসিদ্ধ শৈব ক্ষেত্রের জগদ্বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির অদ্যাপি কেশরীবংশের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্যে এক শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল। যযাতি-কেশরী ইহার ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া যান, ললিতেন্দ্রকেশরী কর্ত্তৃক ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দির যেরূপ বৃহৎ সেরূপ প্রশস্ত। এরূপ সুশ্রী মন্দির জগতে অতি অল্পই আছে।

ভুবনেশ্বরের ৫ মাইল দূরে উড়িষার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কীর্ত্তি-নিলয় 'খণ্ডগিরি" ও "পুষ্পগিরি" বিরাজিত রহিয়াছে। ইহা কটকের প্রায় ২০ মাইল দূরে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে। ইহার গিরি-গহ্বর-খোদিত দ্বিতল ত্রিতল প্রশস্ত গৃহাদি দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পুরাতত্ত্ববিদগণ বলেন শ্রীধর্ম্মা শোকের সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্বে এই সকল খোদিত গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। (৭৯) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ফাহিয়ান ও হিয়োন সাঙ এইরূপ একটী কীর্ত্তি-পুঞ্জময় পুণ্য ভূমির কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় অল্পকাল মধ্যেই শৈবগণ বৌদ্ধদিগকে প্রায় নির্জ্জীব করিয়া তুলিয়াছিল।

হিয়োনসাঙ উড়িষ্যা রাজ্যের পরিধি ৭০০০ লি (১১৬৭ মাইল) লিখিয়াছেন ইহা পূর্ব্ব দক্ষিণ মহাসাগর দ্বারা সীমাবদ্ধ। "ছি-লি-টা-লোছিং" নামক বাণিজ্যোন্নত সাগর-তীরবর্ত্তী প্রধান নগরী এই রাজ্যের অন্তর্গত। অনুবাদকগণ ইহাকে "চরিত্রপুর" আধুনিক "পুরী" অনুমান করেন।

হিয়োনসাঙ উড়িষ্যা হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। সমুদয় ভারত পর্য্যটন করিয়া তিনি সুস্থ শরীরে ৫৬৭ শকাব্দের বসন্ত ঋতুতে পশ্চিম চীনের রাজধানীতে পহুঁছিয়াছিলেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ইংলণ্ডে স্বাধীনতার উন্নতি।

চতুর্থ জর্জের রাজত্বকালের আরম্ভ হইতে, মুদ্রাযন্ত্রের উপর সাধারণ লোকের এতদূর বিশ্বাস ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল, যে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার প্রতি কঠোর অত্যাচার করিতে আর সাহস পাইলেন না, ক্রমে উহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৩০।৩১ খৃষ্টাব্দে কর্ত্তৃপক্ষগণ মুদ্রাযন্ত্রের লোকদিগের নামে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করেন, সেই অভিযোগই শেষ অভিযোগ। তাহার পর

(৭৯) খণ্ড গিরির কতকগুলি তাম্র ফলকের বিবরণ এসিয়াটীক সোসাইটীর জর্ণলে

হইতেই ইংলণ্ডের রাজসরকার প্রজাদিগকে রাজনৈতিক বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার অসংযত স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্থাপনের পরেই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞাপনের শুল্ক ও সংবাদ পত্রের মাস্থল এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কাগজের শুল্ক রহিত হইল। উপর্য্যুপরি এই কয়েকটি বাধা অপসারিত হওয়ায় মুদ্রাযন্ত্র স্বীয় স্বাভাবিক উদ্যম লাভ করিল। এইরূপে মতের স্বাধীনতা উন্মুক্ত হওয়ায় সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই রাজনৈতিক বিষয় সকল মুক্তভাবে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এই প্রকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং মুদ্রাযন্ত্রের উদ্যম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সাধারণ শিক্ষারও উন্নতি হইল। কেবল যে রাজনৈতিক বিষয়ের প্রবন্ধ মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশ হইত এরূপ নহে। বিজ্ঞান সাহিত্য, এবং শিল্পবিদ্যা যাহাতে সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর সুপাঠ্য, বুদ্ধিগম্য ও সুলভ হয়, এই প্রকার গ্রন্থ সকল প্রচার হইতে লাগিল। সাধারণ মানবমণ্ডলী অবাধে বিদ্বানদিগের ঐশ্বর্য্যের অংশভাগী হইল। "প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রচারিণী" সভার অধ্যাপকগণ—Lord Brougham, Mr Mathew Davenport Hill, এবং Mr Charles Knight—এই হিতকর কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর ছিলেন— তাঁহাদিগের পর "খৃষ্টীয় জ্ঞানোন্নতিসাধিনী সভা"। পরে Messrs Chambers এই মহৎ ব্রতে ব্রতী হয়েন। বিদ্যালয় সকল শিক্ষার পত্তন ভূমি স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞানালোক সাধারণের মধ্যে বিস্তার হওয়ার কারণ একমাত্র মুদ্রাযন্ত্র।

মুদ্রাযন্ত্র ব্যতীত সাধারণ মত প্রকাশের আর একটি পথ প্রসারিত হইতেছিল। রাজনৈতিক সম্মিলন ও সাধারণ লোকের সভার সংখ্যা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তৃতীয় জর্জের রাজত্বের প্রাক্‌কাল হইতেই আন্দোলনের এই সকল ভীষণ যন্ত্র সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল সভার আন্দোলন-প্রভাবেই লোকপ্রিয় wilkesএর পক্ষ সমর্থিত হয়, পার্লেমেণ্টের সংস্কার সাধিত হয়, Lord George Gorden এবং তাঁহার সহচরদিগের উন্মত্ত প্রটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, এবং দাস-ব্যবসায় রহিত হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দির শেষাশেষি যে রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝটিকা উত্থিত হয়, সেই বিপ্লব-ঝটিকাতেই এই সকল সাধারণ লোকের আন্দোলন বন্ধ হইয়া গেল। শান্তির সময় যে সকল সভার অধিবেশনে আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই, তাহা এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিরুৎসাহিত ও প্রতিরুদ্ধ হইল। বিশৃঙ্খলা, রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র নিবারণ করিবার উদ্দেশে কিয়ৎকালের জন্য সাধারণের স্বাধীনতা অপহৃত হইল।

কিন্তু এ অবস্থা চিরস্থায়ী হইবার নহে

প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত দুই খানি প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত। এই ২ খানির বয়ঃক্রম অনূ্যন ২২।২৩ শতাব্দী অনুমিত হয়।

See J. A, S. B. V1 pp. 1072. 1085.

সাধারণের মত আবার শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণের মত অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। মুদ্রাযন্ত্রের শক্তি ও স্বাধীনতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভার প্রভাবও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সাধারণ মতের উপর মুদ্রাযন্ত্র যে প্রভাব প্রকটিত করে, তদপেক্ষা সাধারণ সম্মিলনের প্রভাব অনেক গুণে অধিক সন্দেহ নাই। সভাস্থলে শুদ্ধ মতের বল নয়, শারীরিক শক্তি ও সংখ্যার বলও নেত্র-সমক্ষে দেদীপ্যমান প্রকাশ পায়, শুদ্ধ সংখ্যার বল নহে—অধিক সংখ্যক লোকের সম্মিলিত উৎসাহের বলও প্রকাশ পায়। মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের সংস্পর্শেই উৎসাহ-অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। নিভৃত শাস্ত্রালোচনায় নূতন নূতন ভাব ও মতের সৃষ্টি হইতে পারে বটে কিন্তু সাধারণ সম্মিলনে বাদানুবাদ, সংক্রামিত উৎসাহ ও নেতৃগণের জ্বলন্ত বক্তৃতা ব্যতীত—জাতিসাধারণের শিরায় শিরায় এই সকল ভাব ও মত প্রবিষ্ট করিয়া দিবার আর অন্য উপায় নাই।

সাধারণ লোকের আন্দোলনের ফল একমাত্র মত প্রচার নহে। কোন এক বিষয়ের জন্য বহুসংখ্যক লোক একত্র সম্মিলিত হইলে শারীরিক বলের বিরুদ্ধে শারীরিক বল প্রদর্শিত হয়। এই রূপে মারামারি দাঙ্গা উপস্থিত হইবারও আটক নাই। বিশেষতঃ গ্রেট ব্রিটেনের লোকারণ্য নগর সকলের মধ্যে এই প্রকার বহুসংখ্যক লোকের সম্মিলনে জীবন-সম্পত্তি ও রাজ্য পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে। সাধারণ লোকে যুক্তিবলে সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে বাহু-বলের আশ্রয় লইতে পারে। ইতর লোককৃত বিপ্লবের বীজ এই সকল সাধারণসম্মিলনের মূলে নিহিত এবং এইরূপেই অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ ফ্রান্সে এই সকল বীজ হইতেই দারুণ বিপ্লব-কাণ্ড উৎপন্ন হয়। প্রজাবর্গের কষ্ট, উগ্রচণ্ড অন্ধ-উৎসাহী নেতৃগণ, লোক-বিদ্বিষ্ট রাজশাসন, এবং কর্ত্তৃপক্ষদিগের দুর্ব্বলতাই যে আকস্মিক রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে রাজ্যে যে পরিমাণে রাজশাসন উৎকৃষ্ট সেই রাজ্যে সেই পরিমাণে বিপ্লবের আশঙ্কা কম। যে রাজ্যের রাজশাসন ও বিচার-কার্য্যে প্রজাবর্গের বিশ্বাস আছে—যেখানে অধিক সংখ্যক লোকে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, যে রাজ্যের জাতীয় সভায় বিজ্ঞতা, সুবিচার ও মিতব্যবহারের আধিপত্য, সে রাজ্যে বিপ্লবের আশঙ্কা সর্ব্বাপেক্ষা কম সন্দেহ নাই। গত পঞ্চাশৎ বৎসরের ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে এই সকল সত্যের দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা কি করিয়া মহৎ মহৎ ব্যাপারে কৃতকার্য্যতা লাভ হয় এবং রাজশাসনে বিশ্বাস ও রাজনিয়মে প্রজাদিগের ভক্তি অবিচল থাকিলে বৈপ্লবিক শক্তি সকল কিরূপে দমনে থাকে তাহা ইংলণ্ডের ইতিহাসে বিলক্ষণ প্রকাশ পায়।

রাজনৈতিক আন্দোলনের কতদূর বল ও তাহাতে কি প্রকার বিপদের সম্ভাবনা

তাহা আমরা বলিয়াছি—একণে ইংলণ্ডের তৎসংক্রান্ত আধুনিক ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিব। যদিও সমস্ত বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞেরাই, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কতকগুলি বিশেষ ফৌজদারি আইন স্থাপন করা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মুখে স্বীকার করিতেন কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই সকল আইন জারি ছিল। এবং সেই সকল আইন রহিত করিবার জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া পার্লেমেণ্টে ও সংবাদ পত্রে আন্দোলন হইতেছিল। কিন্তু পার্লেমেণ্টের অধিকাংশ সভ্য চিরাগত সংকীর্ণ নীতির পক্ষাবলম্বী থাকায় তাহা রহিত হইতে পারে নাই। অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, ক্যাথলিকদিগকে অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য একটি দলবন্ধন হইল—এই দল সমস্ত আয়র্লাণ্ডে ছাইয়া পড়িল।

তাহাদিগের প্ররোচনায় সমস্ত ক্যাথলিক অধিবাসীগণ সমস্বরে স্বীয় সত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। ডব্লিন নগরে একটা বৃহৎ প্রতিনিধি-সভা স্থাপিত হইল। তাহারা পার্লেমেণ্টের অনুকরণে কার্য্য করিতে লাগিল। পল্লীতে পল্লীতে তাহাদিগের সংকল্প-উদ্দেশে চাঁদা সংগ্রহ হইতে লাগিল—সংবাদ পত্র সকল সাধারণ প্রজাবর্গকে উত্তেজিত করিয়া দিতে লাগিল—ক্যাথলিক ধর্ম্ম-মন্দির সকল পাত্রিদিগের জ্বলন্ত বক্তৃতায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যেমন একদিকে ক্যাথলিকগণ এই রূপে আন্দোলন করিতেছিল, ও দিকে আবার প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায় নানা সভা স্থাপন করিয়া উৎসাহের সহিত তাহাদিগের প্রতিবন্ধকাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে একটি ধর্ম্মযুদ্ধ আসন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। পাছে শান্তিভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় পার্লেমেণ্ট, কি প্রটেষ্টাণ্ট কি ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ের সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু এই উপায়ে বিপদ নিবারণ হইল না। আইনকে বঞ্চনা করিয়া ছলে কৌশলে সভার অধিবেশন হইতে লাগিল এবং তিন বৎসরের মধ্যে ঐ আইন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। এক্ষণে বিপদের চূড়ান্ত সময় উপস্থিত। উত্তেজিত প্রজাবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সভা সকল আরও উগ্রচণ্ড হইয়া উঠিল—এবং বহুসংখক ক্যাথলিকদিগের একত্র সম্মিলন হইতে লাগিল; তাহাদিগের মধ্যে যুদ্ধ-শাস্ত্রানুযায়ী দল বন্ধন ও ইঙ্গিত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মত প্রকাশ অপেক্ষা বাহুবল প্রদর্শনই এই সকল সভার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। যদি তাহাদিগের পথে কোন প্রতিবন্ধক না দেওয়া হয় তাহা হইলে সাধারণ শান্তির ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা এবং গবর্ণমেণ্ট ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়, আর যদি তাহাদিগকে সৈন্য-বল দ্বারা দমন করিতে হয়, তাহা হইলেও সৈনিকগণের সহিত সাধারণ প্রজামণ্ডলীর যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। উভয় দিকেই সঙ্কট। যাহাই হউক অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষগণ, পাছে শান্তি-ভঙ্গ প্রজাবর্গের মধ্যে ত্রাস উপস্থিত হয়, এই জন্য ঐ

সভা বন্ধ করিয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত বল-পরীক্ষা করিতে অনিচ্ছু হইয়া এবং অধিকাংশ লোকের মত গবর্ণমেণ্টের অনুকূল বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, ঐ কাথলিক সভা শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন।

এইরূপে, কর্ত্তৃপক্ষ-দলের দৃঢ়তা ও ক্যাথলিক নেতাদিগের বিজ্ঞতা নিবন্ধন রক্তপাত পূর্ব্ব হইতেই নিবারিত হইল। কিন্তু ক্যাথলিকদিগকে অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য অধিকতর উদ্যম সহকারে আন্দোলন চলিতে লাগিল।

পার্লেমেণ্টের অধিকাংশ সভ্য ও মন্ত্রিদল প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত হওয়ায় ক্যাথলিকদিগের প্রার্থনা-বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে প্রতিবাদ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু সাধারণের মধ্যে এরূপ ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল, যে তাহার প্রতিরোধ করিতে আর তাঁহারা সাহস পাইলেন না। সাধারণ প্রজাবর্গ রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের উপর জয়লাভ করিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাথলিকগণ রাজনৈতিক অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিল। ন্যায়ের পক্ষ, ধর্ম্মের পক্ষই জয়লাভ করিল। সংকীর্ণ রাজনীতি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কুসংস্কার অনেক দিন পর্য্যন্ত উহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু পার্লেমেণ্ট ও দেশের প্রাজ্ঞ ও উদার ব্যক্তিগণ ঐ পক্ষের সহায় ছিলেন। এই সকল ঘটনার মধ্যে এইটি দেখা যায় যে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সাধারণ মতের উপর নির্ভর করিয়াই বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিলেন, এবং বিনা রক্তপাতে কেবল সাধারণের আন্দোলন দ্বারাই ন্যায়ের পক্ষ জয়লাভ করিল।

ইহার পর পার্লেমেণ্টের সংস্কার লইয়া আর একটি ঘোরতর জাতীয় আন্দোলন উপস্থিত হইল। ফ্রান্সের অভিনব বিপ্লবকাণ্ডে ইতর সাধারণ প্রজাবর্গের অত্যন্ত উৎসাহ হইয়াছিল, এবং তৎকালীন ইংলণ্ডের অবস্থাও সেই উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিবার পক্ষে অনুকূল ছিল। সাধারণ প্রজাবর্গকে রাজনৈতিক অনধিকার হইতে মুক্তি দিবার জন্য তৎকালীন লোক-প্রিয় মন্ত্রিদল একটি আইন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—কিন্তু যে পুরাতন দল, প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সংকীর্ণ প্রণালী এবং মুখাপেক্ষী পার্লেমেণ্টের দ্বারাই এত দিন ইংলণ্ডকে শাসন করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে এক দল লোক এতদূর প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন যে ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিন্তু সাধারণ প্রজাবর্গ অতিমাত্র আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে তৎসমর্থনার্থ অগ্রসর হইল। সংবাদপত্র সকল উগ্রভাব ধারণ করিল; রাজনৈতিক সম্মিলন সকল সংগঠিত হইবার উপক্রম হইতে লাগিল—সাধারণ লোকের প্রকাণ্ড অশ্রুতপূর্ব্ব সভা সকলের অধিবেশন হইতে আরম্ভ হইল। রাষ্ট্র-বিপ্লব আসন্ন। এই সময় হাউস অফ্ লর্ড্সের টোরি দল দুর্দ্দমনীয় সাধা-

রণ মতের নিকট অবশেষে মস্তক অবনত করিলেন। এইরূপে বিপ্লব নিবারিত হইল। সম্ভ্রান্ত দল পরাভূত ও নতশির হইলেন, সাধারণের আন্দোলন আবার প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু এই পরাজয় প্রকৃত কর্ত্তৃপক্ষ দলের পরাজয় নহে। যেহেতু রাজ্যের মন্ত্রিদল, হৌস অফ্ কমন্সের অধিকাংশ এবং পার্লেমেণ্টের সম্ভ্রান্ত বিভাগেরও কিয়দংশ সভ্যগণ-প্রস্তাবিত সংস্কার আইনের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। এই ব্যবস্থার কল্পনা বিপ্লবপ্রিয় ইতর লোকদিগের উষ্ণ মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হয় নাই, স্বকার্য্যদায়ী প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞেরা, যাঁহাদিগের উপর সাধারণ প্রজাবর্গের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহারাই উহার প্রবর্ত্তক। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও ভদ্র লোকেরা এই আন্দোলনের নেতা; এবং মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবি লোকেরাও এই আন্দোলনের সহযোগী ছিল। ইহার দ্বারা কোন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই—সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ প্রতিনিধিত্বের অধিকারী, এই মতটি মুখেই এতদিন অবস্থিতি করিতেছিল এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল এই মাত্র। যদি সম্ভ্রান্ত দল অনেক দিন ধরিয়া অধ্যবসায় সহকারে উহার প্রতিরোধী না হইতেন, তাহা হইলে সাধারণের মধ্যে এরূপ ঘোরতর আন্দোলন উত্তেজিত হইত না—পার্লেমেণ্টের মধ্যেই তর্কবিতর্ক হইয়া যা হয় একটা নিস্পত্তি হইয়া যাইত। অতএব এবারও দেখা যাইতেছে যে বৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া ন্যায়ের পক্ষ জয়লাভ করিল।

যৎকালে ইংলণ্ডে এই সঙ্কটাবহ আন্দোলন চলিতেছিল, সেই একই সময়ে ইংলণ্ড ও আয়রল্যাণ্ডের সম্মিলন (Legislative union) রহিত করিবার জন্য আর একটি ঘোরতর আন্দোলন আয়রলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হয়। ক্যাথলিক পক্ষের সহায় ও নেতা Mr O' Connel অনতিপূর্ব্বে ক্যাথলিকদিগের অধিকার সমর্থন পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া, এক্ষণে আবার এই সম্মিলনের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু এবার তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিলেন তাহা পূর্ব্বাবলম্বিত পক্ষ হইতে অনেক ভিন্ন। এ পক্ষের কোন প্রাজ্ঞ নেতা ছিল না, কেবল কতকগুলি নির্ব্বোধ ইতর দলপতি মাত্র ছিল—সকল দলের রাজনীতিজ্ঞেরাই এই জন্য এই প্রস্তাবটিকে অগ্রাহ্য করিলেন এবং সমস্ত রাজ্যের লোকে এই প্রস্তাবের দোষ দর্শাইতে লাগিল। রহিতকারী দল নানা প্রকার বাহ্য কোলাহল আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ পার্লেমেণ্ট ও সমস্ত দেশের সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন।

কএক বৎসর পরে আবার এই বিষয় লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইল। এবার আরও বিস্তৃত ভাবে দল প্রস্তুত হইল, এরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড "রাক্ষস" সভার অধিবেশন হইতে লাগিল যে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। কিন্তু শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ পুনর্ব্বার এই আন্দোলনকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন।

ন্যায়সঙ্গত নহে বলিয়া উহা সর্ব্বসাধারণের রুচিজনক হয় নাই—সুতরাং সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইল।

এইরূপে Orang Lodges দিগেরও দলকে অনায়াসেই দমন করা হইল। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ঘৃণা ও দলাদলীর উগ্রভাব এই দলের পত্তন ভূমি হওয়ায়—শীঘ্রই সাধারণের শান্তিভঙ্গ এবং রাজকার্য্যের ব্যাঘাত হইবার উপক্রম হইল, সাধারণের মতও ঐদলের পোষক ছিল না—সুতরাং উহাও অচিরাৎ ধরাশায়ী হইল।

যেমন এক দিকে কতকগুলি অযোগ্য বিষয়ের আন্দোলন নিস্ফল হইল—তেমনি আর এক দিকে "দাসত্ব-বিরোধী সভা" শান্তভাবে স্বদেশীয় লোকদিগের উচ্চভাব জাগরূক করিয়া কেমন আস্তে আস্তে স্বীয় সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ করিলেন—সমস্ত ব্রিটিস রাজ্যের দাসদিগকে মুক্তিদান করিলেন।

যৎকালে আয়রলণ্ডে সম্মিলন রহিত করিবার আন্দোলন চলিতে ছিল ইংলণ্ডে Chartistsদিগের দল ক্রমে জাঁকিয়া উঠিতে ছিল। সমস্ত শ্রমজীবিরাই প্রায় এই দলভুক্ত। তাহারা তাহাদের charter এর পাঁচটি বিষয় মনোনীত করিয়াছিল;—প্রতিনিধিত্বের সার্ব্বজনিক অধিকার (Universal suffrage)—Ballot দ্বারা সম্মতিদান (vote) পার্লেমেণ্টের বাৎসরিক অধিবেশন—সভ্যদিগের বেতন নির্দ্দেশ এবং সম্পত্তি অনুসারে প্রতিনিধির অধিকার নিরূপণ রহিত করা। সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাঁহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের হাল বন্দবস্তে সন্তুষ্ট ছিলেন, বিশেষত যাঁহারা শ্রমজীবিদিগের নিয়োজক, তাঁহাদিগের নিকট এই প্রস্তাবটি আদৌ আদরণীয় হইল না। কিন্তু অসন্তুষ্ট শ্রমজীবিগণ আইনের দ্বারা স্বীয় হীন অবস্থার উন্নতি করিতে উৎসুক হইয়া এবং অন্যান্য আন্দোলনের সফলতায় উৎসাহিত হইয়া বড় বড় সভা করা—বড় বড় দরখাস্ত দাখিল করা প্রভৃতি চিরপরিচিত উপায় সকল অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল।

অনেক সময় তাহাদিগের উদ্যম উৎসাহ দাঙ্গায় পরিণত হইত এবং তৎক্ষণাৎ ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। তাহাদিগের সংখ্যা কম ছিল না—এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহাদিগের দল অটুট ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যখন ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব বাধিয়া উঠে, সেই সময় এই চার্টিস্ট দল তাহাদিগের চার্টরের অনুকূলে বৈপ্লবিক আন্দোলন পুনরায় উপস্থিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। তাহাদিগের আবেদন সকল অনাদৃত হওয়ায় তাহারা আর একটা দরখাস্ত পাঁচ লক্ষ লোক দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া দল বল সমভিব্যাহারে হউস্ অফ্ কমন্সে যাত্রা করিবার জন্য স্থির করিল। এই উদ্দেশে Kensington Common এ ১০ই আপ্রিলে একটি বৃহৎ সভা আহূত হইল। সেই স্থান হইতে সকলের একত্র যাত্রা করিবার কথা ছিল।

প্যারিস নগরে, এ প্রকার বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইলে রাষ্ট্রবিপ্লব উপ-

স্থিত হয়। কিন্তু লণ্ডনে সাধারণ-মত-বিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলন সকল কি প্রকারে সমাজ ও কর্তৃপক্ষগণের বলবৎ শাসনে প্রতিরুদ্ধ হয়, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ সেই দিনকার ব্যাপারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ আহূত সভা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা-পত্র দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। শান্তিরক্ষার জন্য, এই বিশেষ উপলক্ষে নূতন ১৭০,০০০ চৌকিদার নিযুক্ত হইল। Westminister Bridge এবং পার্লেমেণ্ট্ বাটীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের চতুর্দ্দিকে কামান ও পদাতিক সৈন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থাপিত হইল। সভার কার্য্য ভণ্ডুল হইয়া গেল। Westminister Bridge দিয়া যাত্রা নিষিদ্ধ হইল এবং সমাগত লোকেরা কোন প্রকার উৎপাত না করিয়া হতাশ হইয়া আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

এই চার্টিষ্ট দলের কার্য্যপ্রণালী অপরিপক্ক ছিল। তাহাদিগের নেতৃগণের তেমন আন্তরিক উৎসাহ ছিল না এবং তাহারা অক্ষম ও ভীরু ছিল। উৎকৃষ্ট নেতা থাকিলেও তাহাদিগের সঙ্কল্প নিষ্ফল হইবার কথা—তাহাদিগের সহিত অন্য শ্রেণীর সহৃদয়তা ছিল না—পার্লেমেণ্টের কোন সভ্য দলই তাহাদিগের সহায় ছিল না—তাহারা সংখ্যায় বলবান ছিল কিন্তু সমাজ ও রাজ্যের সমবেত বল তাহাদিগের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল—তাহারা কিয়ৎকালের জন্য শান্তিভঙ্গ করিতে পারিত এই মাত্র কিন্তু কখনই স্বীয় সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারিত না। ইতিমধ্যে আর একটি আন্দোলন উপস্থিত হইয়া পরিণামে জয় লাভ করিল। উহা শস্য-আইন-বিরোধী সম্মিলনের (Anti-Corn-Law League) আন্দোলন। যে প্রস্তাব সমর্থনার্থ এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ন্যায়সঙ্গত ও জাতি-সাধারণ-সম্মত—সুতরাং তাহা সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইল। এই বিষয়ে শ্রমনিয়োজক ও শ্রমজীবি উভয় দলেরই সমান স্বার্থ হওয়ায় তাহারা একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল। এই আন্দোলনের নেতা—Mr Cobden এবং Mr Bright উভয়ই সুযোগ্য এবং লোক-প্রিয় বক্তা—তাঁহারা বার্ত্তাশাস্ত্রের সত্য সকল পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যা করিতে যেরূপ সক্ষম, লোকদিগের মনকে উত্তেজিত করিতেও তেমনি সমর্থ। এবং অনেক দিন হইতে দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ এবং পার্লেমেণ্টের একদল তাহাদিগের মত পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন—ইহাঁদের মধ্যে Mr Charles Villiers প্রধান ছিলেন। কিন্তু ইহাঁদের বিরুদ্ধ মতের লোকও অসংখ্য ছিল। বিদেশীয় বাণিজ্যের অবরোধ দ্বারা দেশীয় বাণিজ্য সংরক্ষণ (Protection) অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য-নীতির একটি স্থির মত ছিল। জমিদার ও ধনী কৃষকগণ (Farmers) মনে করিত বিদেশ হইতে ইংলণ্ডে শস্য মুক্তভাবে আমদানি হইবার পথে প্রতিবন্ধক প্রয়োগ করাই ব্রিটিশ কৃষিকার্য্যের উন্নতি পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। স্বাধীন বাণিজ্য কতদূর সু-

ফলপ্রদ, তাহা কারখানা-অধ্যক্ষেরা প্রথমে তেমন বুঝিতে পারেন নাই। পার্লেমেণ্টের বহুসংখ্যক সভ্য উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের অনুকূলে প্রভূত উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে আন্দোলন চলিতে লাগিল। তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও এই আন্দোলনের অনুকূল ছিল—বিশেষত আয়রলণ্ডের দুর্ভিক্ষের আলোচনায় স্বাধীন বাণিজ্যের উপকারিতা লোকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিল। ৮ বৎসরের মধ্যে সাধারণের মত ফিরিয়া গেল। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিজ্ঞেরা,এমন কি পার্লেমেণ্ট পর্য্যন্ত অবশেষে স্বাধীন বাণিজ্যের মতে দীক্ষিত হইলেন।

সাধারণ লোকের বল যেরূপ এই আন্দোলনে প্রকাশ পায়, স্বাধীন রাজ্যে বুদ্ধি জ্ঞানের কতদূর প্রভাব তাহাও বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। দেশের সমস্ত প্রজাবর্গ এবং কর্ত্তৃপক্ষগণ বিচার করিয়া একটি সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন—এস্থলে বাহুবলে নহে, জ্ঞানবলেই জয় লাভ হইল।

ইহার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রজাসাধারণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে ১৮৬৬খৃষ্টাব্দে আইন সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টের সংস্কারের প্রস্তাব পুনরুদ্দীপিত হওয়ার সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে একটা ঘোঁট পড়িয়া গেল। "সংস্কার সম্মিলন সভা" (Reform League) ঘোষণা করিয়া দিলেন যে ২৩ জুলাই মাসে Hyde Park নামক স্থানে তাহাদিগের একটি অধিবেশন হইবে। কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহা নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু নিষেধ আজ্ঞা বলবৎ রাখিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল, তাহার প্রতি মনোযোগী না হওয়ায় Hyde Parkএর রেলিং ভঙ্গ করিয়া ইতর লোকেরা কিরূপে ঐ প্রখ্যাত উদ্যান অধিকার করিয়াছিল তাহা সংবাদ পত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তাহার পর বৎসরে সভার আর একটি অধিবেশন নিষিদ্ধ হয় কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণের নিষেধ সত্ত্বেও ঐ সভা বসিয়াছিল। এই দুই বারেই সাধারণ প্রজাবর্গ কর্ত্তৃপক্ষগণের উপর জয়লাভ করে। রাজশাসনকে সাধারণ প্রজাবর্গ যে এইরূপে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ হইল তাহার প্রকৃত কারণ কর্ত্তৃপক্ষগণের দুর্ব্বলতা ও দৃঢ়সঙ্কল্পবিহীনতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই অবধি হাইড্ পার্কে সভার উদ্দেশে লোকসমাগম একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই বটে—কিন্তু তৎসম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে।

কিয়ৎ বৎসর পরে আর একটি ছোটখাটো আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে Chancellor of the Exchequer উপস্থিত বৎসরের আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবে দেশলাইয়ের উপর কর স্থাপন করিবার প্রস্তাব করায়, দেশলাইয়ের প্রধান কারখানাওয়ালারা হঠাৎ তাহাদিগের লোকদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন—এই শ্রমজীবীগণ একত্র সমবেত হইয়া এই ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিবার জন্য Westminster পর্য্যন্ত যাত্রা করিল। এই সামান্য

কর একটি বিশেষ শিল্পের উপর হওয়ায় সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে.ও হাউস অফ্ কমন্সে এই করের প্রস্তাব আদরের সহিত গৃহীত হইল না—গরিব দেশ্‌লাইওয়ালাদিগের প্রতি সাধারণ লোকের মমতা উপস্থিত হইল। এবং এই প্রস্তাব অচিরাৎ পরিত্যক্ত হইল।

ইংলণ্ডের আইন ও ব্যবস্থার উপর সাধারণ লোকের কতদূর প্রভাব, তাহা এই সকল আন্দোলন হইতে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। ইতর লোক সমাগমে অনেক সময় শান্তি ভঙ্গ হইবার উপক্রম হয়—লোকপূর্ণ নগর সকল বহু সংখ্যক ইতর লোকের একত্র সমাগম যে সঙ্কটাবহ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায়—যে, যে সকল বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তাবের আন্দোলন ন্যায়ের উপর স্থাপিত এবং পার্লেমেণ্টে কোন দল বিশেষ যাহার সহায়—অনেকটা সাধারণ মত যাহার পরিপোষক—এবম্বিধ প্রস্তাব সকলই পরিনামে জয়যুক্ত হইয়াছে। এই রূপে সাধারণ লোকের ইচ্ছাক্রমে অনেক সময়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ হিতকর প্রস্তাব সকল গ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং যে সকল প্রস্তাব অন্যায়মূলক, তাহার জন্য লোকে হাজার চীৎকার করুক—গবর্ণমেণ্ট ও পার্লেমেণ্ট দৃঢ়তা সহকারে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন।

ক্রমশঃ

দেশ-কাল এবং তাহার অতীত প্রদেশ।

তত্ত্বান্বেষণ করিবার দুইটি প্রণালী;—(১) সূক্ষ্ম বস্তু-সকলের যোগাযোগ দ্বারা স্থূল বস্তু গড়িয়া তোলা, (২) স্থূল বস্তু ভাঙিয়া চুরিয়া সূক্ষ্ম অংশাবলিতে পরিণত করা। প্রথম প্রণালী অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রণালী সহজ—গড়া অপেক্ষা ভাঙা সহজ। কিন্তু তাহার মধ্যে একটা কথা আছে,—জীবন্ত একটা জন্তুকে কাটিয়া কুটিয়া তাহার ভিতরকার নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেস্ তন্ন তন্ন করিয়া দেখানো যাইতে পারে—কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তখন তাহার প্রাণ প্রস্থান করিয়াছে। ভাঙা সহজ কিন্তু যাহার জন্য ভাঙা তাহা হস্তে পাওয়া—আসল ভিতরের বস্তু তলাইয়া পাওয়া অতীব কঠিন। হাজার হউক্ দ্বিতীয় প্রণালীটি বুঝিবার বুঝাইবার পক্ষে সবিশেষ উপযোগী, আর তাহা আমাদিগকে চরম গম্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে না পা-

রুক্—কতকটা পথ বেস্ নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। এই সমস্ত কারণে আপাততঃ দ্বিতীয় প্রণালীটি অবলম্বন করা যাইতেছে—স্থূল বস্তুতে গোড়া-পত্তন করিয়া ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইতেছে; স্থূল জড় বস্তু ভাঙিয়া দেশ-কাল-ঘটিত সূক্ষ্ম-তত্ত্বে উপনীত হইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

জড়-বস্তুর সত্তাকে প্রথমে ধরা যাউক;—জড় জগৎ স্থায়ী কি অস্থায়ী?

জড়-বস্তু-মাত্রই আকাশে বিস্তৃত; এ-জন্য, যদি তাহার ধ্বংস সম্ভব হয় তবে তিনটি বই আর তাহার পথ নাই,—(১) বিকীরণ (অর্থাৎ বিকীর্ণ হওয়া), (২) সংকীরণ (অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ হওয়া), (৩) বিভাজন,—এই তিনটি পথ। মনে কর তূল-রাশি অগ্নি-সংযোগে ধূমাবশিষ্ট হইয়া অল্প পরিমাণ স্থান হইতে ক্রমশই অধিক পরিমাণ স্থানে বিকীর্ণ হইতেছে; যতই তাহার বিস্তার বাড়িতেছে ততই তাহার গাঢ়তা বা ঘনত্ব কমিতেছে; যদি তাহার বিস্তার কোন-কালে অসীম হয়, তবেই তাহার গাঢ়তা একেবারে শূন্যাবশিষ্ট হইয়া যাইবে—সর্ব্ব-সমেত অসীম আকাশ-রূপে পরিণত হইবে। বাহ্য-বিষয়কে দিয়া অসীম আকাশের সংজ্ঞা করিতে হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, সেই বাহ্য-বিষয় যাহা ব্যাপ্তিতে অসীম বৃহৎ ও গাঢ়তায় অসীম অল্প তাহারই নাম অসীম আকাশ। কিন্তু বিকীরণ দ্বারা অসীম আকাশে পরিণত হওয়া সীমাবদ্ধ বস্তুর পক্ষে অনন্ত-কাল সাপেক্ষ—কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যেই তাহা সম্ভবে না, সুতরাং কোন কালেই তাহা সম্ভবে না। এ যেমন—তেমনি আবার উহা বিভাজন-দ্বারা খণ্ড আকাশ-বিশেষের অসংখ্যক বিন্দু-সমষ্টিতে পরিণত হইয়া (এক কথায় এই যে খণ্ড আকাশ-বিশেষে লয় প্রাপ্ত হইয়া) বিলুপ্ত হইতে পারে না; কেননা উহাকে অর্দ্ধেক তদর্দ্ধেক তস্য অর্দ্ধেক করিয়া অনন্ত-কাল ধরিয়া বিভাগ না করিলে আর তাহা সম্ভবে না; অতএব তাহাও কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে হইতে পারে না—সুতরাং কোন কালেই হইতে পারে না। এমনি আবার—উহাকে নিপীড়ন দ্বারা আকাশের একটি-মাত্র বিন্দুতে পরিণত করিয়া বিলুপ্ত করা যায় না; এক ত যদি কোন বস্তুর কোন পরমাণু-দ্বয়ের মধ্যে আদবেই কোন ছিদ্র না থাকে তবে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার উপর প্রভূত বল প্রয়োগ করিয়াও তাহাকে আর অধিক সংহত করিতে পারা যাইবে না (কেননা নিপীড়নের মাত্রা যত বাড়াও প্রতি-ঘাতের মাত্রা তত বাড়িবে, তাহাতে করিয়া কোন কার্য্য হইবে না); আর যদি বল যে, কোন বস্তুর কোন অংশ একেবারেই নিশ্ছিদ্র হইতে পারে না তবে ত আর কথাই নাই;—কোন বস্তুর কোন অংশ-দ্বয়ের মধ্যে যত ক্ষণ পর্য্যন্ত ছিদ্র থাকে—আকাশের ব্যবধান থাকে,—তত ক্ষণ তুমি বলিতেই পার না যে, উহা একটি মাত্র অসীম ক্ষুদ্র আকাশ-বিন্দুতে সংক্ষিপ্ত হই-

য়াছে,—ছিদ্র আছে যখন বলিতেছ, তখন প্রকারান্তরে ইহাই বলা হইতেছে যে, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ পরমাণুগণ একটি মাত্র আকাশ-বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত নহে। অতএব স্থির হইল যে, সঙ্কীরণ-দ্বারা একটি মাত্র বিন্দুত্ব প্রাপ্ত হওয়া জড় বস্তুর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এইরূপ,—জড়-বস্তুর বিলোপ-সম্ভাবনার যে তিনটি পথ বই আর পথ নাই (বিকীরণ, বিভাজন, এবং সঙ্কীরণ) সে তিনটি একে একে রুদ্ধ হইয়া গেল। জড়-বস্তুগণের মধ্যে বাষ্পীয় পদার্থে বিকীরণের—জলীয় পদার্থে বিভাজনের—এবং ভূপ্রস্তরাদি সংহত পদার্থে সঙ্কীরণের—বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রকরণ-তিনটির একটিরও অসীম মাত্রাধিক্য সম্ভবে না। বিলোপের ভাব না হউক্ বিলোপের ভান শুদ্ধ কেবল বাষ্পীয় পদার্থেই দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে—বিকীরণ দ্বারা অদৃশ্য হওয়াকেই আমরা বিলোপ কহিয়া থাকি, কিন্তু বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে ও-কথার কোন মূল্য নাই।

পূর্ব্ব পক্ষ। ভাল, ও তিন প্রকারে না হউক্, আর এক রূপ করিয়া ত জড়বস্তু লোপ পাইতে পারে। জড়বস্তু-মাত্রই আকর্ষণ এবং বিক্ষেপ এই দুট পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়ার উপর ভর করিয়া স্থিতি করিতেছে; যদি কোন উপায়ে কোন জড়বস্তুর মধ্য হইতে আকর্ষণ-ক্রিয়া সমূলে অপহৃত হয়, তবে বিক্ষেপ ক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ করিবার কেহ না থাকাতে উক্ত বস্তু একেবারেই অসীম আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার সহিত তন্ময় হইয়া যায় সুতরাং বিলুপ্ত হয়; আর তাহার মধ্য-হইতে যদি কোন উপায়ে বিক্ষেপ-ক্রিয়া সমূলে অপহৃত হয় তবে (আকর্ষণ-ক্রিয়ার বাধক-বিরহে) বস্তুটি তাহার ভারকেন্দ্রে সংক্ষিপ্ত হইয়া—বিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়া—বিলুপ্ত হয়; আর যদি উভয়-ক্রিয়া বিলুপ্ত হয় তবে আকর্ষণের অভাব প্রযুক্ত তাহার কোন অংশ-দ্বয়ের মধ্যে বাঁধুনি না থাকাতে তাহা বিন্দু বিন্দু হইয়া স্বকীয় আকাশ-খণ্ডে বিলয় প্রাপ্ত হয় সুতরাং বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব জড় বস্তু হইতে উক্ত ক্রিয়াদ্বয়কে বা তাহার কোনটিকে অপহরণ করিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা সমূল বিনাশ পায়;—তবে আর কেমন করিয়া বলি যে, তাহার ধ্বংস আদবেই সম্ভবে না!

উত্তর পক্ষ। কোন জড় বস্তু-হইতে উক্ত ক্রিয়াদ্বয় অপহরণ করা অসম্ভব। আকাশ-ব্যাপী বস্তুর লোপ যেমন অসম্ভব, কাল-ব্যাপী ক্রিয়ার লোপও সেই রূপ অসম্ভব। আকর্ষণ এবং বিক্ষেপ উভয়ই গতি-ক্রিয়া, গতি-ক্রিয়া কোন কালেই বিলুপ্ত হইবার নহে। যদি একটা গোলা বাধা বিহীন শূন্য প্রদেশে একবার চালিত হয় তাহা হইলে যতক্ষণ না তাহা কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হইবে ততক্ষণ ক্রমাগতই চলিতে থাকিবে, কেন না তাহা পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত হইতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যখন চলিয়াছে, তখন বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত হইতে পর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেন যে চলিবে না তাহার কোন কারণ নাই; তবে যদি সম্মুখে একটা কোন

উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইয়া তাহার গতি-রোধ করে—তবেই তাহার গতি-রোধ হইবে—নচেৎ নহে; কেন না বিশেষ কোন কারণাভাবে বিশেষ কোন কার্য্য সম্ভবে না। কিন্তু সে গতি-রোধ—গতির রোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে—গতির লোপ নহে; গতি-রোধ যদি ক্ষণিক হয় তবে দুই দ্বন্দ্বী-পক্ষ স্ব স্ব উপচয় (mass) অনুসারে পরস্পর গতি-বিনিময় করিয়া দুই বিপরীত দিকে বা একই দিকে সমবেগে বা দ্রুত-মন্দ বেগে ক্রমাগতই চলিতে থাকিবে; ঠেকা-ঠেকির পরে একটির যদি গতি-মাত্রা (momentum) বৃদ্ধি হয় তবে অপর-পক্ষের গতি-মাত্রা সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে; সুতরাং মোট গতি-মাত্রা পূর্ব্বেও যা ছিল পরেও তাই থাকিবে, তাহার বিন্দু মাত্রও ধ্বংস হইবে না,—গতি-মাত্রা যা একটু কমিতে দেখা যায় তাহা উত্তাপ-রূপ ধারণ করিয়া উভয়ের পরমাণুগণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে;—এ একরূপ অজ্ঞাত-বাস—ধ্বংস নহে। আবার, কোন বস্তুকে যদি এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে দেখা যায়, তথাপি ইহা বলিতে পারা যায় না যে, তাহা নিশ্চেস্ট রহিয়াছে, কেন না তখনও তাহার পরমাণু-গণের মধ্যে আকর্ষণ এবং বিক্ষেপ-শক্তি এক মুহূর্ত্তও কার্য্যে ক্ষান্ত নাই। মনে কর খড়ের গাদার উপর একটা লোহার গোলা রহিয়াছে তাহা হইলে তুমি বলিবে যে, গোলাটার গতি-ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে—কিন্তু তাহা বলিতে পার না; কেননা প্রতি-মুহূর্ত্তই তাহা পৃথিবীর দিকে গতি-প্রবণ হইয়া রহিয়াছে; শক্তির কার্য্য-করাকে যদি ক্রিয়া বলা যায় তবে তাহার গতি-ক্রিয়া প্রতিমুহূর্ত্তই চলিতেছে—তাহার গতি-শক্তি তাহার অভ্যন্তরে প্রতি মুহূর্ত্তই কার্য্য করিতেছে; কেবল খড়ের গাদার প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর হইতেছে না; খড়ের গাদা আগুণ দিয়া জ্বালাইয়া দেও, অমনি তাহার সেই গতি ক্রিয়া প্রকটীভূত হইবে। সেই গোলা এবং তদাশ্রিত আকাশ উভয়ই ত প্রথমে খড়ের গাদার উপর ছিল, কিন্তু খড়ের গাদা অগ্নিসাৎ হইয়া গেলে গোলা ভূতলে পড়িল তদাশ্রিত আকাশ যে খানকার সেই খানেই রহিল; ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, গোলা উক্ত আকাশ-খণ্ডের ন্যায় নিশ্চেস্ট ছিল না,—গোলার গতি-চেস্টা ক্রমাগতই ছিল; সে চেস্টা আর কিছু নহে গতিক্রিয়ার প্রথম আরম্ভ,—কিন্তু তা' বলিয়া তাহাকে গতি-ক্রিয়ার বিলোপ বলিতে পার না। গতি-ক্রিয়া এবং প্রতিঘাত-ক্রিয়া উভয়কে যদি ভৌতিক ক্রিয়া বলিয়া এক নামে নির্দ্দেশ করা যায় তবে বলা যাইতে পারে যে ভৌতিক ক্রিয়ার কিছুতেই বিলোপ সম্ভবে না। একটা গোলাকে যথাসাধ্য জোরে নিক্ষেপ কর তাহা দৌড়িয়া চলিবে—একটা রেল গাড়ির পিছন দিক হইতে তাহার উপর সেই জোরে একটা ধাকা মারো তাহা অতি ধীরে ধীরে চলিবে, কিন্তু ভৌতিক ক্রিয়া দুয়েরই সমান—একটার যেমন প্রতিঘাত ক্রিয়া (অর্থাৎ গতি-বাধকতা কার্য্য) অধিক তেমনি

তাহার গতি ক্রিয়া অল্প, অন্যটির যেমন গতি-ক্রিয়া অধিক তেমনি প্রতিঘাত-ক্রিয়া অল্প,—হরে দরে একই দাঁড়াইতেছে। গতি-ক্রিয়া যখন অধিক বাধা অতিক্রমণে নিযুক্ত থাকে তখন তাহার বেগ-মান্দ্য হয়, যখন অল্প বাধা অতিক্রমণে নিযুক্ত থাকে তখন তাহার বেগাধিক্য হয়, কিন্তু কোন গতি-ক্রিয়া কোন অবস্থাতেই বিলুপ্ত হইতে পারে না। মনে কর আমি দ্রুতবেগে একটা গোলা গড়াইয়া দিলাম; আমার হস্তের সেই যে গতি তাহা কোন কালেই ধংস হইবে না, ক্রমাগতই চলিতে থাকিবে; আমার হস্তের গতি যেমন গোলাতে সংক্রমিত হইয়া তাহার বাধা অতিক্রমণ করিল তেমনি গোলার গতি গোলা হইতে চলিয়া গিয়া আর আর নানা প্রকার বাধা অতিক্রমণে নিযুক্ত হইতে পারে,—হয়-ও তাই; চলন্ত গোলা চারিদিকের বস্তুতে গতি বাঁটিয়া দিতে দিতে যায়, সুতরাং সে যত চলে ততই তাহার গতির পুঁজি ফুরাইয়া আসে; তাহার সে গতি কতক বা অন্যের হস্তে কতক বা আপনার উদরাভ্যন্তরে (উত্তাপ-রূপে) নিঃশেষে সঁপিয়া দিয়া তবে তাহা স্থৈর্য্য অবলম্বন করে, নচেৎ নহে। চালিত গোলা ভূমি ঘর্ষণ করিয়া চলাতে তাহার গতি মন্দীভূত হয়,—কেন? না ভূমি তাহার নিকট গতি আদায় না করিয়া তাহাকে অমনি যাইতে দেয় না; ভূমি গতি লইয়া এমনি এক নিভৃত স্থানে চাবি দিয়া রাখে যে তাহা সহজে কেহ খুঁজিয়া পায় না; কোথায় সে? না পরমাণুর ভিতরে,—কি আকারে? না উষ্ণতা-বৃদ্ধি আকারে। উত্তাপ একরূপ পারমাণব গতি, তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভূমি যেমন, বায়ুও তেমনি একটি গতি-তস্কর—কে যে তাহা নয় তাহা বলা দুষ্কর। কিন্তু গোলা যে বিনা-মূল্যে তাহার আশপাশে গতি বিলাইতে থাকে তাহা নহে,—সেই সঙ্গে সে নিজেও উত্তাপ-রূপী পারমাণব গতি কুড়াইতে থাকে; গোলার গতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়,—(১) ভূতল-প্রভৃতি বহির্ব্বস্তুর উষ্ণতা এবং তাহার নিজের উষ্ণতা;—সে গতি অদৃশ্য হইয়া যায় এই পর্য্যন্ত—ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। বারুদ যেমন অগ্নি-সংযোগে অদৃশ্য হয়—বিলুপ্ত হয় না উহাও সেইরূপ। এই রূপ করিয়া গতি-ক্রিয়া নানা হস্তে ফিরে,—তাহার ব্যয় হইতে পারে কিন্তু তাহার ধ্বংস কোন ক্রমেই সম্ভবে না। এই একটা কথা এখানে উঠিতে পারে যে, চালিত গোলা যেন চালকের হস্ত হইতে গতি উপার্জ্জন করিল কিন্তু চালকের হস্ত যে গতি বিলাইয়া দিল তাহা সে উপার্জ্জন করিল কোথা হইতে? আয় ব্যতিরেকে ত আর ব্যয় সম্ভবে না। ইহার উত্তর এই যে, অবশ্য চালকের হস্ত তাহা কাহারো না কাহারো নিকট হইতে উপার্জ্জন করিয়াছে; আমাদের এই যে শরীর, গতির ইহা একটি অদ্বিতীয় ভাণ্ডার; রক্ত না চলুক দেখি—শরীরের ভিতরকার উষ্ণতা কমুক দেখি—গতির ভণ্ডার শূন্য হউক দেখি—তখন দেখিবে যে হস্ত চাল-

নার উপর তোমার আর হস্ত নাই। রক্ত-ও কিছু আপনা হইতে গতি সৃষ্টি করিয়া পায় নাই, কালের যেমন মূলান্বেষণ করা—গতির-ও তেমনি মূলান্বেষণ করা অতএব তাহাতে ক্ষান্ত দেওয়া যাক্। এ ত দেখা গেল যে, গতিক্রিয়ার ধ্বংস নাই,—তবে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে তাহার ব্যয় হইতে না পারে এমন নয়; কিন্তু এখনো প্রস্তাব সাঙ্গ হয় নাই;—গতির ব্যয় হয় বটে কিন্তু গতির বিনিময়েই গতির ব্যয় হইতে পারে—বিনা-মূল্যে নহে; এজন্য কোন বস্তু হইতে গতি-ক্রিয়া একেবারের নিঃশেষিত হইয়া যাইতে পারে না; কিরূপ সে? না মনে কর যেন বড় ছোটো গোলা গুলি দুই বিপরীত দিক্ হইতে দ্রুত বেগে পরস্পরের উপর নিক্ষিপ্ত হইল, আর মনে কর যেন সে-গুলি কাচ-নির্ম্মিত, তাহা হইলে উহারা পরস্পরের আঘাত-প্রত্যাঘাতে ভাঙিয়া চুরিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া চারিদিকে ছট্‌কিয়া পড়িবে; তাহাদের মধ্যেকার মোট গতিক্রিয়া হইতে ন্যায্য-মতে যাহার যেটুকু পাওনা তাহা সে আদায় করিবে,—বড়-বস্তুকে ছোটো বস্তু অল্প গতি প্রদান করিয়া তাহার নিকট হইতে অধিক গতি প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু তা বলিয়া এমন হইতে পারে না যে, উপরিউক্ত কোন ভগ্ন-খণ্ড আদবেই কোন প্রকার গতি (অন্ততঃ উষ্ণতা-রূপ পারমানব গতি) অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ না করিয়া আপনার সমস্ত গতি অন্যকে বিলাইয়া দিয়াছে; প্রকৃতির ন্যায়-রাজ্যে বিনা-মূল্যে অন্যের নিকট হইতে কেহ যে কিছু আত্মসাৎ করিবে তাহার জো নাই। ইতি পূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে যে, ভূতলোপরি চলন্ত গোলা শুদ্ধ যে কেবল ভূমিকে উষ্ণ করে তাহা নহে আপনি সেই সঙ্গে উষ্ণতা উপার্জ্জন করে; গোলার গতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, (১) ভূলতের উষ্ণতা এবং (২) তাহার আপনার উষ্ণতা। অন্যকে গতি প্রদান করিলে আপনাকেও গতি ভোগ করিতে হয়; খুব জোরে ইঁট ছুঁড়িলে ইঁটের যেমন গতি-সাধন হয়—হস্তাভ্যন্তরেও সেইরূপ প্রযত্ন-জনিত পারমাণব গতি সাধিত হয়; যাঁহাতক ক্রিয়া তাঁহাতক প্রতিক্রিয়া—একটিকে ছাড়িয়া অন্যটি থাকিতে পারে না।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গতির আয় ব্যতিরেকে—বিনা মূল্যে—গতির ব্যয় সম্ভবে না; সুতরাং কি আকর্ষণ-ক্রিয়া কি বিক্ষেপ ক্রিয়া কোন গতিক্রিয়ার বিলোপ দূরে থাকুক্ আয়াতিরিক্ত ব্যয় পর্য্যন্তও সম্ভবে না। বাহ্য বস্তু যেমন আকাশ ব্যাপিয়া স্থিতি করে তাহাদের গতি ক্রিয়া (অর্থাৎ স্থান পরিবর্ত্তন ক্রিয়া) সেইরূপ কাল ব্যাপিয়া স্থিতি করে; আর উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপ যে, একটি ব্যতীত অন্যটি থাকিতে পারে না।

জড়-বস্তু যদিচ বিকীরণ প্রণালী অনুসারে আকাশত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না, কিন্তু ইহা আমাদের জ্ঞানের একটি সুনিশ্চিত তত্ত্ব যে, যদি কোন জড়-বস্তু অসীম আকাশে বিকীর্ণ হয় তবে তাহা আর জড়-

বস্তু থাকে না। মনে কর যেন এক মুষ্টি বারুদ অগ্নি-সংযোগে আকাশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—পূর্ব্বে তাহা দৃশ্য পদার্থ ছিল এখন তাহা অদৃশ্য পদার্থ হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত; এখন জিজ্ঞাসা এই যে, যদি একেবারেই অসীম আকাশে বিকীর্ণ হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইত, তাহা হইলে কি রূপ হইত? এখন বারুদ এবং সেই বারুদ যে-আকাশ-টুকু ব্যাপিয়া আছে—সংক্ষেপে বারুদ এবং তদাকাশ—উভয়ের একটিকে আর একটি হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবা যাইতে পারে; বারুদ যদি স্থানান্তরিত হয় তাহা হইলে তদাকাশ যেখানকার সেই খানেই থাকিবে; কিন্তু যখন তাহা অসীম বিকীর্ণ হইয়া শূন্যাবিশিষ্ট হইয়াছে তখন বারুদ বিলুপ্ত হইয়া তাহার স্থানে কেবল মাত্র এক অসীম আকাশ—সংক্ষেপে মহাকাশ—দাঁড়ায়। অসীম আকাশ—মহাকাশ—যদিচ কোন জড়-বস্তুর ব্যাপ্তি-গম্য নহে কিন্তু তাহা আমাদের জ্ঞানের প্রত্যয়-গম্য; আমাদের জ্ঞানেতে ইহার এক বিন্দুও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, আকাশ অসীম। জড়-বস্তু-ব্যাপ্য আকাশকে যদি জড়াকাশ বলা যায়—তবে অসীম আকাশকে কোনমতেই জড়াকাশ বলা যাইতে পারে না (কেননা তাহা জড়বস্তুর ব্যাপ্য নহে),—তাহাকে জ্ঞানাকাশ বলাই যুক্তি-সঙ্গত।

পূর্ব্বপক্ষ। অসীম আকাশকে কিংবা জড়বস্তু-নিলিপ্ত বিশুদ্ধ আকাশকে আমরা একত কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না—না পারি চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতে, না পারি হস্ত-দ্বারা স্পর্শ করিতে; তাহাতে আবার মন দ্বারা ভাবিয়া উঠিতেও পরাস্ত মানি—যতই কেন বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর আকাশ ভাবি অসীম আকাশ হইতে তাহা অসীম পশ্চাতে পড়িয়া থাকে; আবার খণ্ড-আকাশ ভাবিতে গেলে হয় তাহাকে জড়াকাশ (অর্থাৎ জড়-বস্তু-সমাশ্রিত আকাশ) বলিয়া ভাবিতে হয়, নয় তাহাকে জড়-বস্তু দ্বারা পরিবৃত বলিয়া ভাবিতে হয়; প্রথম পক্ষে তাহা ত বিশুদ্ধ আকাশ নহেই—দ্বিতীয় পক্ষে তাহার সীমা-প্রদেশ জড়-বস্তুতে সংক্রমিত সুতরাং সে পক্ষেও তাহা সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ নহে; শুদ্ধ কেবল জড় বস্তু দ্বারাই আকাশ সীমাবদ্ধ হয়,—সুতরাং জড়-বস্তু-নির্লিপ্ত বিশুদ্ধ আকাশ ভাবিতে হইলে সীমাবদ্ধ আকাশ ভাবিলে চলে না; কিন্তু উপরে দেখা গেল যে, সীমাবদ্ধ আকাশ ভিন্ন অসীম আকাশ ভাবিয়া ওঠা আমাদের সাধ্যাতীত, কাজেই বিশুদ্ধ আকাশও আমাদের ভাবনার গম্য হইতে পারে না; এরূপ যখন—তখন কেমন করিয়া আমরা বলিব যে, আকাশ অসীম ইহা সুনিশ্চিত; যাহা আমারা ভাবনাতেও আয়ত্ত করিতে পারি না তাহার অস্তিত্বে আমরা কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি?

উত্তর পক্ষ। আমি আরব-দেশ চক্ষে দেখি নাই। কিন্তু তত্রত্য আকাশের অস্তিত্বের প্রতি আমার বিশ্বাস একেবারেই অটল; আমার সম্মুখে আমি যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস যেমন দৃঢ়, আরব দেশের

অস্তিত্বে তাহা তেমন দৃঢ় না-ও হইতে পারে—ইতি পূর্ব্বে আমার অজ্ঞাত-সারে আরব দেশ জল-মগ্ন হইয়া গিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে,—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নিকট-তম আকাশে—আমার শরীরাকাশে—আমার যেমন বিশ্বাস, আরব দেশীয় আকাশে আমার বিশ্বাস তেমনিই—তাহার এক বিন্দুও ন্যূন নহে; আকাশের দূরত্ব নৈকট্য অনুসারে তাহার প্রতি আমাদের বিশ্বাসের একটুও হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। নেত্র-পথবর্ত্তী দূরতম-নক্ষত্র-সমাশ্রিত আকাশের প্রতি আমাদের যেমন বিশ্বাস—আমাদের নেত্রপথাতীত তাহা-অপেক্ষাও-দূরবর্ত্তী নক্ষত্র যে-আকাশে কল্পিত হইতে পরে সে আকাশের প্রতিও আমাদের তেমনি বিশ্বাস,—আমাদের সম্মুখস্থিত ঘটাকাশ যেমন সুনিশ্চিত, উহাও তেমনি সুনিশ্চিত—তাহা অপেক্ষা এক বিন্দুও ন্যূন নহে। অতএব এমন কোন নিয়ম নাই যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিলেই আকাশ আমাদের অধিক প্রত্যয়-ভাজন হইবে, তাহার ওদিকে থাকিলে তদপেক্ষা অল্প প্রত্যয়-ভাজন হইবে, আর অমুক স্থান উত্তীর্ণ হইলে তাহা আদবেই আমাদের প্রত্যয়-ভাজন হইবে না। কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকার উপর যখন আকাশের বিশ্বসনীয়তা এক বিন্দুও নির্ভর করিতেছে না, তখন তাহার অসীমতার প্রতি বিশ্বাস করিবার প্রতিবন্ধকতা কিছুই আর রহিল না; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বদ্ধ আছে তাহার ওদিকে নাই—আকাশকে এরূপ মনে করা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং আকাশ অসীম—ইহা বিশ্বাস করিতে কেবল যে কোন বাধা নাই তাহা নহে, তাহাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধা যৎপরোনাস্তি দৃষ্ট হইতেছে,—সুতরাং আকাশ অসীম ইহা বিশ্বাস করিতে বাধা নাই কেবল নয়—উহা বিশ্বাস না করিলেই নয়।

পূর্ব্ব পক্ষ। তা যেন মানিলাম, কিন্তু কেমন করিয়া—কি সূত্রে—অসীম আকাশ আমাদের জ্ঞান-গম্য হয় তাহা যতক্ষণ না ঠিক্ হইতেছে ততক্ষণ অন্ধকারে ঢেলা মারা হইতেছে; আমি বেস্ জানিতেছি যে চক্ষু-দ্বারা রূপ দর্শন করিতেছি কর্ণ-দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিতেছি, মন দ্বারা পরিমিত বস্তু-সকলের চিন্তা করিতেছি কিন্তু কোন্ যে বৃত্তি দ্বারা অসীম আকাশ অবধারণ করিতেছি তাহা ত আমি খুঁজিয়া পাই না। এই জন্যই আমার বোধ হয় যে, অসীম-আকাশ-ঘটিত বিশ্বাসের ভিতর একটা কোন গলদ্ আছে—আমরা তাহা দেখিতে পাই আর না-ই পাই।

উত্তর পক্ষ। অসীম আকাশের অস্তিত্বের প্রতি তুমি অবিশ্বাস করিতেছ না—কোন্ পথ দিয়া তাহা আমাদের জ্ঞানে প্রবেশ করে, তাহাই কেবল জানিতে চাও। সীমাবদ্ধ বস্তু-সকল কোন্ কোন্ পথ দিয়া আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ান্তরে প্রবেশ করে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। বাহির হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর কিংবা শরীরের এক প্রদেশ-হইতে আর এক প্র-

দেশের উপর গতিক্রিয়া উপস্থিত করিয়াই সীমাবদ্ধ বস্তু-সকল আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে প্রবেশ করে; আলোকের স্পন্দন আমাদের চক্ষুর অভ্যন্তরে সংক্রমিত হইয়া দৃশ্য-বস্তুকে আমাদের জ্ঞানের নিকট পরিচিত করিয়া দেয়; রক্তের গতি-দ্বারা সর্ব্ব শরীরে নাড়ী-স্পন্দন হয়—এবং স্নায়ু সকল দূত-স্বরূপ হইয়া তাহার সমাচার মস্তিষ্কে বহন করে; শরীরের যেখানকার যে অংশ আমাদের জ্ঞান-গোচর হয় তাহা ঐ প্রকার স্পন্দন-পথ দিয়াই হইয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে অসীম আকাশ কোন্ পথ দিয়া আমাদের জ্ঞানে প্রবেশ করে;—সীমাবদ্ধ বস্তু সকল যে পথ দিয়া তথায় প্রবেশ করে সে পথ দিয়া ত তাহা সম্ভবে না,—তবে কোন্ পথ দিয়া? অবশ্য তাহার বিপরীত পথ দিয়া। স্নায়ু স্পন্দনের পথ দিয়া নহে—কিন্তু অবিচলিত জ্ঞানের পথ দিয়া। একদিকে আমরা পুস্তকের লেখা চক্ষে দেখি, আর এক দিকে তাহা আমরা মনে মনে আবৃত্তি করি; সেই রূপ এক দিকে আমরা পরিমিত বাহ্য-বস্তু প্রত্যক্ষ করি, আর এক দিকে আমরা জানি যে তাহা অসীম আকাশের অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছে। বুদ্ধি মন প্রভৃতি বহির্মুখী জ্ঞান-বৃত্তি দ্বারা আমরা পরিমিত বস্তু সকলের সত্তা উপলব্ধি করি—অন্তর্মুখী জ্ঞান-বৃত্তি দ্বারা আমরা অসীম আকাশের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। এই যে অন্তর্মুখী জ্ঞান-বৃত্তি তাহা দার্শনিক ভাষায় প্রত্যক্-জ্ঞান অথবা প্রত্যক্ বোধ বলিয়া উক্ত হয়। প্রত্যক্ কি না বিষয়-প্রাতিকূল্যেন অঞ্চতি গচ্ছতি—বিষয়ের প্রতিকূল পথে যায়—তাই প্রত্যক্। অসীম আকাশ জড় বস্তুর কেহই নহে—জড়বস্তু কেবল সীমাবদ্ধ আকাশ-বিশেষ অধিকার করিয়া স্থিতি করে। বিশুদ্ধ আকাশ—অসীম আকাশ—জ্ঞানেরই একটা অবয়ব;—অলঙ্কার-চ্ছলে বলা যাইতে পারে যে তাহা জ্ঞানের হস্ত; জ্ঞান বহির্ব্বস্তু যখন যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়—সেই হস্তের মুষ্টির মধ্যেই তাহা প্রাপ্ত হয়। আমাদের সম্বন্ধে আমাদের দেহাকাশই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম আকাশ—তথা হইতে যে আকাশ যতদূরে ততদূর পর্য্যন্ত (পদ-দ্বারা না পারি কল্পনা-দ্বারা) গমন করিয়া আমরা তাহা পাই। কিন্তু অসীম আকাশকে আমরা ওরূপ করিয়া দূর হইতে দূর তর প্রদেশে গিয়া পাইতে পারি না। অসীম আকাশের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের স্ব স্ব শরীরকে ছাড়িয়া দিয়া ভাবিলে তবেই তাহার যা' কিছু ভাব-গ্রহ সম্ভবে। বহির্বিষয় যেমন আমাদের ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে গতি-ক্রিয়া উত্থাপন করিয়া আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হয়, বিশুদ্ধ আকাশ সেরূপ করিয়া প্রতিভাত হয় না; বিশুদ্ধ আকাশ আমাদের জ্ঞানেতে অবিচলিত-রূপে সংলিপ্ত রহিয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন বহির্ব্বস্তু যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গৃহীত হইতে পারে তেমনি একটি গ্রহণ-ক্ষেত্ররূপে সংলিপ্ত রহিয়াছে। শরীরাকাশ মহাকাশের একটা খণ্ডাংশ-মাত্র, সুতরাং শরীরের দিক্ হইতে মহাকাশ আমাদের জ্ঞান-গম্য হয়

না; অশরীরী আত্মার দিক্ হইতেই তাহা জ্ঞান-পথে উপস্থিত হয়। অশরীরী আত্মার সম্বন্ধে কোন বস্তুর দূরত্ব নৈকট্য থকিতে পারে না—কেননা বিশেষ এমন কোন একটি আকাশ-খণ্ডে তিনি বদ্ধ ন'ন, যাহা অন্যান্য সমস্ত বহিরাকাশ অপেক্ষা তাঁহার নিকটতম ও যেখান-হইতে আপনা-সম্বন্ধে অনান্য বস্তুর দূরত্বের মাত্রা নির্দ্ধারিত হইবে,—তিনি শরীরাকাশে বদ্ধ ন'ন। অশরীরী আত্মার নিকট সকল আকাশ-খণ্ডেরই দূরত্ব-নৈকট্য সমান সুতরাং সেখানে এক-ক্রোশ চলা আর দশ-ক্রোশ চলার মধ্যে প্রভেদ নাই, চলা আর না চলা উভয়ই সমান—তিনি চলেন না অথচ সর্ব্বগত। খণ্ড আকাশ যেমন মহাকাশে—তেমনি শরীরী আত্মা অশরীরী আত্মাতে বদ্ধমূল রহিয়াছে; সেই অশরীরী আত্মার ভাব হইতে অসীম আকাশের ভাব আমাদের প্রত্যক্ জ্ঞানে উদিত হয়। মহাকাশের মুষ্টির অভ্যন্তরে যেমন আমাদের শরীরাকাশ অবস্থিতি করিতেছে, অশরীরী আত্মার মুষ্টির অভ্যন্তরে সেইরূপ মহাকাশ অবস্থিতি করিতেছে; বাহির হইতে যেমন আমরা খণ্ড আকাশ—জড়াকাশ—প্রাপ্ত হই, অশরীরী আত্মা হইতে সেইরূপ আমরা মহাকাশ—বিশুদ্ধ আকাশ—জ্ঞানাকাশ—প্রাপ্ত হই; এবং যে বৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত হই তাহা অন্তর্ম্মুখী বৃত্তি—প্রত্যক্-বোধ।

দেহাকাশ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটতম আকাশ তেমনি বর্ত্তমান গতি-মুহূর্ত্ত সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটতম গতি-মুহূর্ত্ত; দেহ বা তাহার কোন ইন্দ্রিয়ে গতি-ক্রিয়া উপস্থিত না হইলে কোন প্রকার গতিই আমাদের অনুভবায়ত্ত হয় না; সুতরাং দেহাকাশাশ্রিত গতি-ক্রিয়া ভিন্ন আর কোন গতি-ক্রিয়া সাক্ষাৎ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমাদের জ্ঞান-গোচর হয় না। আলোক দ্বারা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ে গতি উপস্থিত হইলে তবে ভূতকালে সে আলোক কোথায় ছিল সে বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান যায়; হস্ত দ্বারা চক্ষু কর্ণ আবরণ-করিলে আলোক ও শব্দ আটক পড়িয়া যায় তাই আমরা স্থির করি যে, তাহা আবরণকারী হস্তের ও দিক্ হইতে আসিয়াছে সুতরাং বহিরাকাশ হইতে আসিয়াছে। বর্ত্তমান গতিমুহূর্ত্ত যদিও আমাদের নিকটতম গতিমুহূর্ত্ত কিন্তু তাহা দ্রুত-বেগে আমাদের জ্ঞানের হস্ত এড়াইয়া যায়; নিখুঁত বর্ত্তমান গতিক্রিয়া আমাদের জ্ঞান-চক্ষে ধরা দেয় না; আমরা অতীত ক্রিয়ার সহিত বর্ত্তমান ক্রিয়া মিশ্রিত করিয়া সমস্তটাকে বর্ত্তমান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি—বিশুদ্ধ (অর্থাৎ অমিশ্র) বর্ত্তমান ক্রিয়া আমাদের জ্ঞানায়ত্ত নহে। একটা শলাকায় আগুন ধরাইয়া তাহাকে দ্রুত বেগে ঘুরাইলে প্রতিমুহূর্ত্তে একটা জ্বলন্ত চক্র দৃষ্ট হইবে, কিন্তু আসল ধরিতে গেলে প্রতি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে একটি মাত্র জ্বলন্ত বিন্দুই যা কেবল আমাদের চক্ষে পড়ে—জ্বলন্ত চক্র তাঁহার পরের কথা। আমাদের সম্বন্ধে আমাদের শরীরই গতি-ক্রিয়ার নিকট-তম ক্ষেত্র,—এই নিকটতম ক্ষেত্র-বিরহে নিকটতম গতিক্রিয়া অশরীরী

আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না ;—যখন নিকটতম গতি-ক্রিয়া স্পর্শ করিতে পারে না তখন দূরবর্ত্তী গতিক্রিয়া সকলের ত কথাই নাই ; এমন-কি দূর নিকট শব্দই তাঁহার সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক যথা "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্বৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং।" অতএব অনাদি অনন্তকালের গতিক্রিয়ার মধ্যে কোন্‌টি নিকটতম অর্থাৎ বর্ত্তমান কালাশ্রিত, কোনটি বা ভূতকালাশ্রিত এপ্রকার জিজ্ঞাসা শরীরী আত্মা সম্বন্ধেই খাটে—অশরীরী আত্মা-সম্বন্ধে নহে। কাল-পরিমাপক গতি-ক্রিয়া নহে—পরন্তু মহাকাল ব্যাপী এক অবিচলিত জ্ঞান-ক্রিয়া যাহা সর্ব্বকালে সমান, তৎ সহকারেই অশরীরী আত্মা অসীম মহাকাশে পরিব্যাপ্ত—প্রত্যেক বিন্দু আকাশে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রবিষ্ট—রহিয়াছেন।

পূর্ব্বপক্ষ। আমাদের অন্তঃকরণের যত গুলি বৃত্তি আছে প্রত্যেকেরই দ্বারা আমরা কোন না কোন প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি; কিন্তু প্রত্যক্-বোধ দ্বারা আমরা কি উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি? একটা সীমাবদ্ধ ভূমি পাইলে তাহা আমাদের কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু অসীম আকাশে আমাদের কি কাজ দেখে?—কিছুই ত নহে ; মহাপণ্ডিত কঁৎ (Comte) সেই জন্য বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের পরিধি সৌর জগৎ পর্য্যন্ত হইলেই যথেষ্ট হয়, তাহার ওদিকে হাত বাড়ানো নিতান্ত নির্ব্বোধের কাজ; কেননা তাহা পৃথিবীর কোন উপকারে লাগিতে পারে না।

উত্তর পক্ষ। তুমি যে অতি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ! বুদ্ধি-বৃত্তির যৎকিঞ্চিৎ যা' কিছু সঙ্গতি আছে তাহা সে খাটাইয়া খুটাইয়া আপনার এবং অন্যের যথাসাধ্য উপকার করিতেছে, কিন্তু প্রত্যক্-বোধের অসীম ভাণ্ডার কৃপণের ধনের ন্যায় সমস্তই বিফলে নষ্ট হইয়া যাইতেছে,—এ কেমন ধারা কথা! প্রকৃতির আর কোনোখানেই ত এরূপ দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বপক্ষ। প্রকৃতির কোনখানে ওরূপ দৃষ্ট হয় কি না হয়, সে কথা লইয়া মাথা বকাইবার প্রয়োজন দেখি না; যে কথা চলিতেছে তাহাই চলুক,—অনাদ্যনন্ত কাল, অসীম আকাশ, অশরীরী আত্মা—এ-সব আমাদের এই ক্ষুদ্র শরীরী আত্মার কি কাজে লাগে আমাকে দেখাইয়া দেও—তাহা হইলেই বিবাদ মিটিয়া যাইবে।

উত্তর পক্ষ। আকাশ অসীম—কাল অনন্ত, এই সত্যটি দ্বারা যদি আর কোন কাজই না হয়, তবু এটা ত বলিতে হইবে যে অনন্ত কাল উন্নত লোক হইতে উন্নত লোকে উত্থান করিবার ইচ্ছা উৎপাদন করাটি তাহা কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। আত্মা চিরকালই বিশেষ একটি আকাশ-পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিতে চায় না যে,সে কেবল ঐ সত্যটি জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী বিষয় বলিয়া তাহারই প্রসাদাৎ। কিন্তু সেই যে অসীম আকাশ তাহার মূল কোথায়? ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ পরিমিত আকাশ যেমন আমাদের মনের একটা অবয়ব-বিশেষ—মনকে ছাড়িয়া তাহা কিছুই নহে কেবল শূন্য-মাত্র, অশরীরী আত্মাকে

ছাড়িয়া সেইরূপ মহাকাশ কিছুই নহে, কেন না মহাকাশ ইন্দ্রিয়-মনের অগম্য—অশরীরী আত্মা হইতেই তাহা প্রত্যক্ বোধে সংক্রমিত হয়। এক মহাকাশ সকল আত্মারই সাধারণ বিষয়—সুতরাং সেই মহাকাশের মূলীভূত এক অশরীরী আত্মাও সকল আত্মার সাধারণ কেন্দ্র-স্থান। লোকেরা যে স্ব স্ব শরীরী আত্মাকে কেন্দ্রস্থান মনে করে তাহা আর কিছু নহে—পৃথিবীকে কেন্দ্রস্থ এবং সূর্য্যকে পরিধিস্থ মনে করা।

অশরীরী মহান্ আত্মার সহিত শরীরী আত্মা সকলের সম্বন্ধ একটা আছেই তাহার আর ভুল নাই—সম্বন্ধ না থাকিলে তিনি প্রকাশ পাইবেন কেন? কিন্তু তাহা কিরূপ? আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ যদি আকাশ ঘটিত সম্বন্ধের ন্যায় হইত তবে বলিতে পারা যাইত যে মহাকাশের সহিত খণ্ড আকাশের যেমন সম্বন্ধ উহা তা' অপেক্ষা অধিক কিছুই নহে। অর্থাৎ মহাকাশ যেমন খণ্ড-আকাশের মূলাধার, অশরীরী মহান্ আত্মা সেইরূপ শরীরী আত্মার মূলাধার—তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই নহে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে প্রকাশ পাইবে যে, অশরীরী আত্মার সহিত শরীরী আত্মার আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ ত আছেই (কেননা শরীরী আত্মা দেহ-বদ্ধ হইয়াই পরিমিত হইয়াছে—যত দেহ-মুক্ত হইবে ততই অশরীরী আত্মার দিকে—মূল আশ্রয়ের দিকে—অগ্রসর হইবে—অশরীরী আত্মা এখনো যেমন পরেও তেমনি চিরকালই তাহার মূলাধার আছেন ও থাকিবেন) কিন্তু উভয়ের মধ্যে উহা অপেক্ষা উচ্চতর আর একটি সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে—আত্মার সহিত আত্মার যেরূপ সম্বন্ধ সেইরূপ এক আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। আমাদের প্রত্যক্-বোধে অশরীরী আত্মার যে আবির্ভাব তাহা যে নিরর্থক—আছে এই পর্য্যন্ত তাহা দ্বারা কোন কাজ হয় না, ইহা ত হইতেই পারে না; কিন্তু কাজ যাহা হয় তাহা ভৌতিক নিয়মানুসারে হয় না, আধ্যাত্মিক নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক রাজ্য বন্ধনের রাজ্য নহে—মুক্তির রাজ্য; সে রাজ্যের নিয়ম বলের নিয়ম নহে কিন্তু জ্ঞানের এবং প্রেমের নিয়ম; যাহার যেরূপ আন্তরিক ইচ্ছা—আন্তরিক প্রার্থনা—ভালবাসার সহিত আন্তরিক প্রার্থনা (মুখস্থ প্রার্থনা নহে) সে রাজ্যে তাহা পূরণ হইবেই হইবে; কেমন করিয়া কখন যে কাহার মনে এক উচ্চ ভাব হইতে আর এক উচ্চ ভাবের আবির্ভাব হইবে—তাহা সে না জানে না-ই জানিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার ইচ্ছার টান যখন উন্নতির দিকে লাগিয়াই আছে, তখন এক না এক সময়ে তাহা অনিবার্য্য; কেবল একটা উপলক্ষ-মাত্রের প্রয়োজন—ব্যক্তি-বিশেষের গ্রহণ-ক্ষমতা বুঝিয়া তাহা চক্ষের সামনে উচ্চ ভাবের একটা আদর্শ ক্ষেপণের কেবল প্রয়োজন। কত পরিমাণ উচ্চতার আদর্শ কোন অবস্থার উপযোগী আমরা তাহা ঠিক ঠাক না জানিতে পারি, কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিয়ম-পুস্তকে

সে-সমস্তই ধরা-বাঁধা রহিয়াছে। আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা আমাদের কার্য্যে যেমন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, কথাতে ততটা নহে; কিন্তু কথাতে যে আদবেই প্রকাশ পায় না তাহা নহে। আত্মার গভীর প্রদেশ হইতে সম্যক জ্ঞান-প্রেম ইচ্ছার সহিত কায়মনোবাক্যে যিনি যত কার্য্য করিবেন ততই স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে যে, তাঁহার আত্মার টান উচ্চের দিকে, ও তাঁহার প্রার্থনা আন্তরিক; প্রার্থনা আন্তরিক হইলে আধ্যাত্মিক নিয়মে তাহা পূরণ হইবেই হইবে। ফল কথা এই যে, সমস্ত জগতের টান আত্মার দিকে আত্মার টান পরমাত্মার দিকে; কিন্তু অনন্ত উন্নতি সোপানের একধাপ হইতে আর এক ধাপে আরোহণ করিবার যে একটা নিয়ম বাঁধা আছে—তাহার কখন ব্যত্যয় হইতে পারে না। পরমাত্মার প্রতি আত্মার আকর্ষণই আত্মার স্থায়িত্বের নিদান। আত্মার স্থায়িত্বের এমন একটি পাকা দলিলকে অকার্য্যকর বলিয়া ফেলিয়া দিলে কাজে-কাজেই আত্মার উন্নতির প্রতি আমাদের যত্ন শৈথিল্য হয়—অনন্ত কালের জ্ঞানোন্নতি এবং প্রেম-স্ফূর্ত্তির বিনিময়ে ক্ষণিক সুখ উপার্জ্জন করিতে করিতে সার-শূন্য পদার্থ-শূন্য নিঃসম্বল হইয়া আমাদের আত্মা মৃত্যুবৎ হইয়া পড়ে।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বাঙ্গালী যুবকের পত্র।

ভারি কাজে ব্যস্ত। হাই তোলবার সময় নেই। সময় যদি নিলেমে বিক্রি হয়, তা হোলে যত ব্যস্ত লোক সংসারে আছে, আমি সকলের চেয়ে চড়াদাম ডাকি। এত কাজ। এমন অবস্থায় তোমাদের চিঠি লেখা সামান্য কথা? এত ব্যস্ত অবস্থায় লিখতে বোস্‌লে কি বিপদ ঘটে জান? মনের বাক্সের চাবি পকেট হাৎড়ে খুঁজে পাওয়া যায় না, যদি বা বাক্স খোলা গেল, তাড়াতাড়ি, ব্যস্ত সমস্ত ভাবে, হাঁস্‌ ফাঁস কোরতে কোরতে, হুটপাট কোরে, যেখানে যত ভাব গোছানো ছিল, খুঁজতে গিয়ে সমস্ত ওলট্‌ পালট্‌ বিপর্য্যস্ত কোরে ফেলি; এটা তুল্‌চি, ওটা তুল্‌চি কিন্তু যেটা আবশ্যক সেইটে পাওয়া যায় না। লিখতে গেলে কথা পোড়ে যায়। তাড়াতাড়িতে কর্ত্তার আগে ক্রিয়াকে আসন দেওয়া হয়, ও কর্ত্তা জায়গা না পেয়ে হয় ত কর্ম্মের পিছনে হতবুদ্ধি হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আজকেরকার চিঠিতে এই রকম নানা ত্রুটি হবার সম্ভাবনা আছে, তবু কোন প্রকারে আজকের মধ্যে চিঠীটা লিখতেই

হবে। মনে আছে, তিন চার মেল আগে তোমাকে লাইন দশেকের যে একটি চিঠি লিখেছিলেম, তাতে তোমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেম যে "শীঘ্রই তোমাকে একখানি বড় চিঠি লিখ্‌ব।" "লিখব" ভবিষ্যৎ কাল-বাচক ক্রিয়া। আজ থেকে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের সীমা। 'তা' ছাড়া যেমন একটি বাঁধা নিয়ম আছে যে, পয়সা চৌষট্টিটা হোলেই টাকায় পরিণত হয়; তেমন কোন শাস্ত্রেই এমন একটা ধরাবাঁধা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নেই "যাতে অবিসম্বাদে বলা যায় যে, "শীঘ্র" এত আনার হোলে "দেরী" টাকায় পরিণত হয়। অতএব তোমাদের এমন একটা অনিশ্চিত অনির্দ্দিষ্ট আশায় আর বেশী দিন ফেলে রাখতে চাই নে। Christmas ফুরোলো, আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর একটা উৎসব এসে পোড়ল। আজ নূতন বর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু তার জন্যে কিছুই গোলমাল দেখতে পাচ্চিনে। নূতন বৎসর যে এখানে এমন নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে আস্‌বে তা জানতেম না। শুনেছি ফ্রান্সে লোকে নতুন বৎসর-কে খুব সমাদরের সঙ্গে আবাহন করে। কাল পুরাতন বৎসরের শেষ রাত্রে আমাদের প্রতিবেশীরা বাড়ির জানলা খুলে রেখে-ছিল। তার কারণ এই হোতে পারে যে, পাছে পুরাণো বৎসর ঘরের মধ্যে আট্‌কা পোড়ে থাকে, তার চোলে যাবার ব্যাঘাত হয়; আর পাছে নতুন বৎসর এসে জান্‌-লার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তার ঘরে ঢুকতে বিশেষ কষ্ট হয়। এখেনে শীতে জান্‌লা দরজা সমস্ত বন্ধ থাকে কিনা, সুতরাং দরজা খুলে না দিলে নতুন বৎসর ঘরেঢুক্‌তে পান না, বাইরে দাঁড়িয়ে স-র্দ্দিতে মারা যান। আর পুরোণো বৎসরের বাড়ি যাবার সময় হোয়েছে, তাকে যদি অমন দরজা বন্ধকোরে রাখ, তবে সে ব্যক্তি দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে 'বাড়িময় দাপা-দাপি কোরে বেড়াতে থাক্‌বে। কিন্তু দুর্দ্দ-শার কথা কি বোল্‌ব, আমরা হচ্চি ঘোর-তর অসভ্য অজ্ঞান লোক; আমাদের বাড়ির জানলা কাল রাত্রে খুলে রাখা হয় নি, আ-মাদের চিমনির (ধোঁয়ার নলের) ভিতর দিয়ে ছাড়া পুরাতন বৎসরের আর বেরো-বার জায়গা ছিল না। আজ সকালে উঠে এই কথাটা আমাদের হঠাৎ মনে পোড়ল। মনে পোড়ে অবধি আমরা অনুতাপে সারা হচ্চি। মনে কর প্রতি বাড়িতে ১৮৮০ খৃস্টাব্দ, আমাদের বাড়িতে ১৮৭৯। মনে কর যদি আমরা আর বাড়ির জানলা দরজা একেবারে না খুলি. তাহোলে আর পঁচাত্তর বৎসর বাঁচলেও ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে মরি। কিম্বা যদি চিত্রগুপ্তের খাতায় ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে তাঁর প্রভুর আলয়ে আমার শুভ পদার্পণ নির্দ্দিষ্ট থাকে, তা'হোলে সে শুভদিন আমার ভাগ্যে একেবারেই আসে না, চিরকালই আমি ১৮৭৯-তে থাকি। মন্দ কি? চিরকালই যদি ১৮৭৯ এ থাকতে পারি সে ত বেশ হয়। কিন্তু রোস, একটু ভেবে দেখি। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দ এমনিই কি আমার সুখের বৎসর গিয়েছে? আহা! এর আগে এমন কত বৎসর গিয়েছে, যাদের ধোরে

রাখ্‌তে পারলে চির জীবন ধোরে রাখ্‌তুম। যা' হোয়ে গেছে, তাতো হোয়ে গেছে। এখন, আমার কুষ্টিতে লেখা আছে, যে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আমার "ধন রত্নানি" একটি ভার্য্যা ও অনেক মিত্র লাভ হবে; মনে কোর্‌চি, ১৮৮২ কে আর ঘরে ঢুক্‌তে দেব না। যা' হোক্, নতুন বৎসরকে অনেক ক্ষণ ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হোয়েছিল, আস্‌বা মাত্রেই তাঁকে আবাহন কোর্ত্তে পারিনি, তার জন্যে আমরা তাঁর কাছে শত শত ক্ষমা চাচ্চি। নতুন বৎসরের আগমনে আজকের দিনের মুখশ্রী বড় উজ্জ্বল হোয়ে ওঠেনি। আজ ভারি মেঘ ও অন্ধকার কোরে আছে। নতুন বৎসরের উপক্রমণিকা যদি এই রকম অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তবে এর উপসংহার না জানি কি রকম হবে। টর্কি থেকে বহু দিন হোল আমরা আবার লণ্ডনে এয়েছি। টর্কিতে বসন্তের সঙ্গে প্রকৃতির ফুলশয্যা দেখেছিলেম। সেই উৎসব থেকে লণ্ডনের এই ব্যস্ত ভাবের মধ্যে এসে পোড়ে বড় ভাল লাগ্‌বে না। এখন আমি Mr K. র পরিবারের মধ্যে বাস করি। Mr K., Mrs, K., তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী, আমি ও Toby বোলে এক কুকুর হোচ্চে এই বাড়ির জন সংখ্যা। Mr K. হোচ্চেন এক জন ডাক্তার। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি প্রায় সমস্ত পেকে গিয়েচে। বেশ বলিষ্ঠ ও সুশ্রী দেখ্‌তে। যেমন অমায়িকস্বভাব তেমনি অমায়িক মুখশ্রী। তাঁর পরিবারের সকলেই বড় ভাল লোক। আমার সঙ্গে অল্প দিনের আলাপেই বেশ বন্ধুত্ব হোয়েছে। Mrs K. আমাকে আন্তরিক যত্ন করেন। শীতের সময় আমি বিশেষ গরম কাপড় না পেরিলে তাঁর কাছে ভৎর্সনা খাই। খাবার সময় যদি তাঁর মনে হয়, আমি কম 'কোরে খেয়েছি, তা হোলে যতক্ষণ না তাঁর মনের মত খাই, ততক্ষণ পীড়াপীড়ি করেন। বিলেতে লোকে কাশীকে বড় ভয় করে; যদি দৈবাৎ আমি দিনের মধ্যে দুবার কেশেছি তা' হোলেই, তিনি জোর কোরে আমার স্নান বন্ধ করেন, আমাকে দশরকম ওষুধ গেলান্, শুতে যাবার আগে আমার পায়ে খানিকটা গরম জল ঢালবার বন্দোবস্ত করেন তবে ছাড়েন। বাড়ির মধ্যে সকলের আগে বড় Miss K. ওঠেন। তিনি নীচে এসে ব্রেক্‌ফাস্ট তৈরি হোয়েচে কি না তদারক করেন; অগ্নিকুণ্ডে দু চার হাতা কয়লা দিয়ে ঘরটি বেশ উজ্জ্বল কোরে রাখেন। খানিকক্ষণ বাদে সিঁড়িতে একটা দুদ্দাড় পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বুড়ো K. শীতে হিহি কোর্ত্তে কোর্ত্তে খাবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি আগুনে হাত, পা, পিট, বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাবার টেবিলে এসে বোসলেন। তাঁর বড় মেয়েকে চুম্বন কোরলেন, আমার সঙ্গে সুপ্রভাত অভিবাদন হোল। লোকটা ভারি প্রফুল্ল। আমার সঙ্গে খানিকটা হাসি তামাসা হোল, খবরের কাগজ থেকে এটা ওটা পোড়ে শোনাতে লাগ্‌লেন। তাঁর

এক পেয়ালা কফি শেষ হোয়ে এসেছে, এমন সময়ে তাঁর আর দুটি মেয়ে এসে তাঁকে চুম্বন কোরলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্দোবস্ত ছিল যে, তাঁরা যে দিন Mr K. র আগে উঠ্‌বেন, সে দিন Mr K. তাঁদের পাঁচ সিকে দেবেন, আর যে দিন Mr K. তাঁদের আগে উঠ্‌বেন, সে দিন Mr K. কে তাঁদের চার আনা দিতে হবে। যদিও এত অল্প দিতে হোত, তবু Mr K. র তাঁদের কাছে প্রায় দু তিন পাউণ্ড পাওনা হোয়েছে। রোজ সকালে Mr K. তাঁর পাওনার জন্যে দাবী করেন। কিন্তু তাঁর দেনদাররা হেসেই উড়িয়ে দেন। Mr K. বলেন "এ ভারি অন্যায়!" তিনি আমাকে মাঝে মাঝে মধ্যস্থ মেনে বলেন "আচ্ছা, Mr T. তুমিই বল,এরকম debt of honour ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রতা।" যাহোক্ রোজ রোজই Mr K. র পাওনা বাড়চে। তার পরে Mrs K. এলেন। আমাদের ব্রেকফাস্ট প্রায় সাড়ে নটার মধ্যে শেষ হয়। Mr K. র বড় ছেলে আমাদের আগেই খাওয়া সেরে কাজে গিয়েচেন। আর Mr K. র ছোট ছেলেটি ও ছোট মেয়েটি অনেকক্ষণ হোল খাওয়া শেষ কোরেচে। এক জনের কথা বোলতে ভুলে গিয়েছি। Toby কুকুরটি অনেকক্ষণ হলো এসে আগুনের কাছে আরামে বোসে আছে। ছোট্ট কুকুরটি। তার ঝাঁকড়া ঝঁকড়া রোঁয়া। রোঁয়াতে চোক মুখ ঢাকা। বুড়ো হোয়েছে আর তার একটা চোক কানা হোয়ে গেছে। আদর পেয়ে পেয়ে এই ব্যক্তির কতক গুলি নবাবী চাল হোয়েছে। Drawing room ছাড়া অন্য কোন ঘরে তার মন বসে না। কথা নেই বার্ত্তা নেই, ঘরের সকলের চেয়ে ভাল কেদারাটিতে অম্লান বদনে লাফিয়ে উঠে বসা হয়; ঘরে একঘর লোক হয় ত বোসে আছে, এক ব্যক্তির হয় ত বসবার জায়গা হোচ্চে না, কিন্তু Toby র তাতে আসে যায় না, সে কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ দৃক্‌পাত না কোরে দিব্যি আরামে চৌকিতে যুৎ কোরে বোসে নেয়। তাঁর আবার গুমর কত। যে চৌকিতে তিনি বোসেচেন, তার এক পাশে যদি আর কেউ এসে বসে, অমনি তিনি মহা বিরক্ত হোয়ে দর্পে সে চৌকি থেকে উঠে গিয়ে তৎক্ষণাৎ পাশের কৌচটির ওপরে গিয়ে বোসে পড়েন। সকাল বেলায় ব্রেকফাস্টের সময় তাঁর তিনটি বিস্কুট বরাদ্দ আছে। সে বিস্কুট গুলি নিয়ে সে খাবার ঘরে বোসে থাকে, যতক্ষণ না আমি গিয়ে সেই বিস্কুট গুলি নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা খেলা করি, একবার তার মুখের থেকে কেড়ে নিই, একবার গড়িয়ে দিই, ততক্ষণ তার খাওয়া হয় না। আমি খেলা না কোরলে সে কোন মতেই খেতে রাজি হয় না। আমাকে সে বড় ভাল বাসে। আগে আগে যখন আমার উঠতে দেরী হোত; সে তার বরাদ্দ বিস্কুট নিয়ে আমার শোবার ঘরের কাছে বোসে ঘেউ ঘেউ কোরত। কিন্তু গোল কোরলে আমি বিরক্ত হোতুম দেখে সে এখন আর ঘেউ ঘেউ করে না। আস্তে আস্তে পা দিয়ে দরজা ঠেলে; যতক্ষণ না

আমি দরজা খুলে দিই চুপ কোরে বাইরে বোসে থাকে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরলেই সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লেজ নেড়ে সুপ্রভাত সম্ভাষণ করে; তার পরে একবার বিস্কুটের দিকে চায়, একবার আমার মুখের দিকে চায়। মনোগত ভাবটি এই যে, "প্রাতঃকৃত্য সারা হোয়েছে? তা' বেশ হোয়েছে। এখন আমার বিস্কুটটি একবার গড়িয়ে দেও; আমার বড় খেলা করবার ইচ্ছে গিয়েছে।" এক এক সময় সন্ধে-বেলায় পেছন দিকের দুটো পা গুটিয়ে সুমুখের দুটো পায়ের ওপর ভর দিয়ে মহা চিন্তিত ভাবে রুদ্ধ আগুনের দিকে এক দৃস্টে চেয়ে থাকে। আধ ঘণ্টা যায়, এক ঘণ্টা যায়, Tobyর হুঁস নেই, তখন তাকে আদর কোর্ত্তে যাও, মাথায় হাত বুলোও, মহা অসন্তুষ্ট ভাবে গোঁগোঁ করে, মাথা নাড়ে। "বিরক্ত কর কেন? ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ঘুরে যাচ্চে এখন উনি আমার মাথায় হাত বুলোতে এলেন!" এ ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে কি ছিল বল দিকি? অ্যারিস্টট্‌ল ছিল না, কি? যাহোক, সাড়ে ন টার মধ্যে আমাদের ব্রেক্‌ফাস্ট শেষ হয়। তার পরে Mrs K. হাতে দস্তানা পোরে দাসীদের নিয়ে চৌতলা থেকে একতল পর্য্যন্ত, জিনিষ পত্র গোছানো, ঘর দ্বার পরিষ্কার করানো ও সমস্ত গৃহকার্য্য তদারক কোরে উঠানাবা করেন। একবার রান্না ঘরে যান, সেখেনে শাকওয়ালা, রুটিওয়ালা, মাংস ওয়ালার বিল দেখেন, যাকে যার চুকিয়ে দেবার দেন। মাঝে মাঝে ওপরে এসে Mr K. র সঙ্গে গৃহ-কার্য্যের পরামর্শ হয়। রান্না ঘরের উপকরণ পরিষ্কার আছে কিনা ও যথা স্থানে আছে কিনা দেখেন, ভাল মাংস এনেছে কি না, ওজনে কমবেশী হোয়েছে কিনা সে সব দেখেন। রাঁধুনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে রান্নাতে যোগ দেন। এই রকম ব্রেকফাস্টের পর থেকে প্রায় বেলা একটা দেড়টা পর্য্যন্ত তাঁকে নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে তাঁর বড় মেয়ে যোগ দেন। মেজ মেয়ে Miss J. দেখি, প্রত্যহ একটি ঝাড়ন নিয়ে Drawing-room সাফ করেন। দাসীরা ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়, আর জিনিষ পত্রে যা' কিছু ধুল লাগে তা' তিনি নিজের হাতে ঝেড়ে ঝুড়ে সাফ করেন। এখানকার অনেক ভদ্র পরিবারেই Drawing roomএর জিনিষ পত্র সাফ করবার ভার বাড়ির মেয়েরাই নেন। দাসীদের হাতে পাছে জিনিষ পত্র ভেঙ্গে যায় বা ভালরূপে পরিষ্কার না হয়। তৃতীয় মেয়ে Miss A. বালিষের আচ্ছাদন, আসন, মোজা, কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ সেলাইয়ে নিযুক্ত হন, চিঠি পত্র লেখেন, এক একদিন বাজনা ও গান অভ্যেস করেন। বাড়ির মধ্যে তিনিই গাইয়ে বাজিয়ে। আজ কাল স্কুল বন্ধ, ছোট ছেলেটি ও মেয়েটি ভারি খেলায় মগ্ন। দেড়টার সময় আমাদের Lunch খাওয়া আছে। Lunch সমাপন কোরে আবার যিনি যাঁর কাজে নিযুক্ত হোলেন। এই সময়ে Visitorদের আসবার সময়। হয়ত Mrs K. Mr K. র

এক জোড়া ছেঁড়া মোজা নিয়ে। চসমা পোরে Drawing room এ বোসে সেলাই কোরচেন। Miss A. একটি পশমের জামা তাঁর ভাইপোর জন্যে তৈরি কোরে দিচ্চেন। Miss J. একটু অবসর পেয়ে আগুনের কাছে বোসে হয়ত Green's History of the English People পোড়তে নিযুক্ত হোয়েছেন। বড় Miss K. হয়ত তাঁর কোন আলাপীর বাড়িতে Visit কোরতে গিয়েচেন। তিনটের সময় হয়ত একজন Visitor এলেন। দাসী Drawing roomএ এসে বোল্লে "Mr ও Mrs A.।" বোলতে বোলতে ঘরের মধ্যে Mr ও Mrs A এলেন। মোজা জামা রেখে বই মুড়ে Mrs K. ও তাঁর কন্যারা আগন্তুকদের অভ্যর্থনা কোরলেন। Weather ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত কোরলেন। Mrs A. বোল্লেন, Mr X. এর ৩ বৎসর তিন মাস বয়সে হাম হয়। হাম হয়েছিল বোলে তিনি চার দিন আপিশে যেতে পারেন নি। কাল আফিশে গিয়েছিলেন। তাঁর হাম হোয়েছিল বোলে আফিশের লোকেরা তাঁকে নির্দ্দয় রূপে ঠাট্টা কোরতে আরম্ভ কোরেচে। Miss J. বোল্লেন, অমন ব্যামো হোলে কি দুর্দ্দশা। একেত ব্যামোর কষ্ট; তার ওপর কারো মমতা পাবার যো নেই; শুধু তাই নয়, ব্যামো হোলে আবার তাই নিয়ে হাসি তামাসা ঠাট্টা খেয়ে বেড়াতে হয়। এই কথা থেকে ক্রমে হাম রোগের বিষয়ে যত কথা উঠতে প্যারে উঠল। Miss A. বোল্লেন, Mr Z-এর তৃতীয় ছেলেটির. হাম হোয়েছে। তার থেকে কথা উঠল যে, Mr Zর যে এক Cousin Miss Y. অষ্ট্রেলিয়ায় আছেন, তাঁর Captain W-র সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেছে। এই রকম খানিক ক্ষণ কথোপকথন হোলে পর তাঁরা চোলে গেলেন। বিকেলে হয়ত আমরা সবাই মিলে একটু বেড়াতে গেলুম। বেড়িয়ে এসে সাড়ে ছটার সময় আমাদের ডিনার খাওয়া হয়। ডিনার খেয়ে ৭টার সময় আমরা সবাই মিলে Drawing-room এ গিয়ে বসি। আগুন জোল্‌চে। ঘরটি বেশ গরম হোয়ে উঠেচে। আমরা আগুনের চার দিকে ঘিরে বোস্‌লুম। এক এক দিন আমাদের গান বাজনা হয়। আমি ইতি মধ্যে অনেক ইংরাজি গান শিখেছি। জাঁক করতে চাই না কিন্তু তবু সত্যি কথা বল্‌তে কি এখানকার লোকে আমার গলার বেশ প্রশংসা করে। আমি গান করি। Miss A. বাজান। Miss A. আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধে বেলায় আমাদের একটু আধটু পড়াশুনা হয়। আমরা পালা কোরে ৬-দিনে ছ রকমের বই পড়ি। বই পোড়তে পোড়তে এক এক দিন প্রায় ১১॥।১২ হোয়ে যায়। ছেলেরা এখন শুতে গেছে।

ছেলেদের সঙ্গে আমার ভারি ভাব হোয়ে গেছে। তারা আমাকে Uncle Arthur বলে। Ethel ছোট মেয়েটি আমাকে ভারি ভাল বাসে। তার ইচ্ছে যে, আমি কেবল একলা তারই

Uncle Arthur হই। তার ভাই Tom যদি আমাকে Uncle Arthur বলে তবেই তার ভারি কষ্ট উপস্থিত হয়। একদিন Tom তার ছোট বোনকে রাগাবার জন্যে একটু বিশেষ জোর দিয়ে বোলেছিল, "He is my Uncle Arthur." এইত Ethel আমার গলা জড়িয়ে ধোরে, তার ছোট ঠোঁট্ দুটি ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিলে। কত কোরে তাকে থামাই। Tom একটু অস্থির, কিন্তু ভারি ভাল মানুষ। খুব মোটাসোটা। মাথাটা খুব প্রকাণ্ড। মুখটা খুব ভারি ভারি। সে এক এক সময়ে আমাকে এমন এক একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে যে কি বোলব। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা কোরছিল, "আচ্ছা, Uncle Arthur, ইন্দুররা কি করে?" Uncle Arthur বোল্লেন "তারা রান্না ঘর থেকে চুরী কোরে খায়।" সে একটু ভেবে বোল্লে, "চুরী করে? আচ্ছা, চুরী করে কেন?" Uncle বোল্লেন, "তা'-দের ক্ষিদে পায় বোলে।" শুনে Tom-এর বড় ভাল লাগল না। সে বরাবর শুনে আসচে যে," জিজ্ঞাসা না কোরে পরের জিনিষ নেওয়া অন্যায়। আর একটি কথা না বোলে সে চোলে গেল। যদি তার বোন কখনো কাঁদে. সে তাড়াতাড়ি এসে সান্ত্বনার স্বরে বলে, "Oh, Poor Ethel, don't you cry! Poor Ethel!" এমন মজা কোরে বলে যে সে হাসি চেপে রাখা দুঃসাধ্য। Ethelএর মনে মনে জ্ঞান আছে যে, সে একজন Lady। সে কেমন গম্ভীর ভাবে কেদারায় গিয়ে ঠেসদিয়ে বস্বে। Tomকে এক এক সময়ে ভৎ‌র্সনা কোরে বলা হয়, "আমাকে বিরক্ত কোর না।" এক দিন Tom পোড়ে গিয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে বল্লেম "ছি! কাঁদতে আছে।" অমনি Ethel আমার কাছে ছুটে এসে জাঁক কোরে বোল্লে "Uncle Arther, Uncle Arther, আমি একবার ছেলে বেলায় রান্না ঘরে পোড়ে গিয়ে ছিলেম, কিন্তু কাঁদিনি।" উঃ! বয়স কত?

Mr N ডাক্তারের আর এক ছেলে বাড়িতে থাকেন, কিন্তু তাঁকে প্রায় দেখতে পাই নে। তিনি সমস্ত দিন আফিশে থাকেন। কিন্তু আফিশ থেকে এলেও তাঁর বড় একটা দেখা পাওয়া যায় না। তার কারণ কি জান? তিনি Miss I. এর সঙ্গে Engaged। তাঁদের দুজনে কোটশিপ চোলচে। রবিবার দুবেলা তাঁকে নিয়ে তাঁর চর্চ্চে যেতে হয়। যখন বিকেলে একটু অবসর পান, তাঁর বাড়িতে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধে বেলা তাঁদের বাড়িতে তাঁর নেমন্তন্ন আছে। এই রকমে তাঁর সময় ভারি অল্প। উভয়ে পরস্পরকে নিয়ে এমন সুখী আছেন যে, অবসর কাল কাটাবার জন্যে অন্য কোন জীবের সঙ্গ তাঁদের আবশ্যক করে না। শুক্রবার সন্ধে-বেলায় যদি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে তবু Mr N. পরিষ্কার কোরে চুলটি ফিরিয়ে, পমেটম মেখে, কোট brush কোরে, ফিট্‌ফাট হোয়ে, ছাতা হাতে কোরে বাড়ি থেকে বেরো-

কেন্নই। একবার খুব শীত পোড়েছিল, আর তার ভারি কাশি হোয়ে ছিল; মনে কোরলেম, আজ বুঝি বেচারীর আর যাওয়া হয় না। কি আশ্চর্য্য! ৭টা বাজতে না বাজতেই দেখি তিনি ফিটফাট হোয়ে নেবে এসেচেন। তাঁর বাপ, মা, বোনরা, সবাই বোল্লে "It is very foolish of you, N." কিন্তু বোল্লে হয় কি? "নদী যবে চলে সিন্ধুপানে, কার সাধ্য রোধে তার গতি।" নদী ত বাপ মা, বোনের উপরোধের শিলা-বাধা লঙ্ঘন কোরে, কাশি হাঁচি ও রুমালে সর্দ্দিঝাড়ার কল স্বর কোরতে কোরতে সিন্ধুর উদ্দেশে চোল্লো। (উপমা কেমন হোল বল দেখি!) তখন বৃষ্টি পোড়চে বরফ পোড়চে রাস্তায় কাদা জোমেচে। তার পর দিন সকালে সর্দ্দিতে বেচারী মাথা তুলতে পারে না। এমন যন্ত্রণা।

যা হোক, আমার এই K. পরিবারের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হোয়ে গেছে। সে দিন Miss N. আমাকে বোলছিলেন, যে, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে, একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস কোরতে আসচে, তাঁদের ভারি ভয় হোয়েছিল। "ব্যক্তিটা কি রকম হবে, না জানি। তার সাক্ষাতে আবার কি রকম আদবকায়দা রেখে চোলতে হবে? আমাদের কথা সে ভাল কোরে বুঝতে পারবে কি না, ও তার কথা আমরা ভাল কোরে বুঝতে পারব কি না"—এই রকম নানাবিধ ভাবনায় তাঁদের ত রাতে ঘুম হয় না। যে দিন আমার আসবার কথা ছিল, সেই দিন Miss A ও Miss J. তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি। তার পরে হয়ত যখন তাঁরা শুনলেন যে, একটা পোষ মানা জীব তাঁদের বাড়িতে এসেচে, সে ব্যক্তির চেহারা দেখে বোধ হয় না যে, তার কখনো মানুষের মগজের লাড়ু, মানুষের ঠ্যাংএর শিক্‌কাবাব বা খোকা খুকী ভাজা খাওয়া অভ্যেস ছিল, মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলঙ্কার পরে না, তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। Miss J. বলেন যে প্রথম প্রথম এসে যদিও আমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কোয়ে ছিলেন তবু ও দুদিন পর্য্যন্ত আমার মুখ দেখেন নি। হয়ত তাঁর ভয় হোয়েছিল যে, কি অপূর্ব্ব ছাঁচে ঢালা মুখই না জানি দেখবেন। তার পরে যখন আমার মুখ দেখলেন—তখন? তখন কি? আমার ত বিশ্বাস, তখন তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তোমরা হয়ত বিশ্বাস কোরবে না, যে, এই মুখ দেখে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির মাথা ঘুরতে পারে। কিন্তু সেটা তোমাদের ঘোরতর কুসংস্কার। ওইত সুমুখের আয়নায় আমার মুখটা দেখ্‌তে পাচ্চি। কেন, কি-মন্দ? এ মুখ দেখে তোমাদের কারো মাথা ঘোরে নি সত্যি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মাথা আছে?

যা হোক্, এই পরিবারে আমি বেশ সুখে আছি। সন্ধে বেলা বেশ আমোদে কেটে যায়। গান বাজনা, বই পড়া। সকলের সঙ্গে ভারি বন্ধুত্ব হোয়েছে। আর Ethel তার Uncle Arthur কে মুহূর্ত্ত ছেড়ে থাক্‌তে চায় না।

সম্পাদকের বৈঠক।

বাঙ্গালির সত্যনিষ্ঠতা।—হুগলী নদীর পরপারে য়ুরোপীয়দের জন্য একটা হাঁসপাতাল আছে। এই হাঁসপাতালের লাগাও কবর-স্থানে আমি একটি অল্প-বয়সে মৃত য়ুরোপীয় নাবিকের গোর দেখিতে পাইয়া এক জন দরিদ্র দেশী মালিকে সেই গোরের উপর ফুলের গাছ রোপণ করিতে নিযুক্ত করি। মালী বরাবর ঐ কাজ করিয়াছিল। তার পর শেষ বার কলিকাতা ছাড়িয়া আসিবার সময় আমি মালীকে বলিয়াছিলাম যে তাহার সঙ্গে আমার আর দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই এবং আগেকার মতন ঐ কাজ করিবার জন্য তাহাকে কিছু টাকা দিয়া আসি। মালী নিয়মিত রূপে কাজ করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এবং সে সম্পূর্ণ রূপে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ছিল। দুই বৎসর পরে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইয়া দেখিলাম যে আমি থাকিলে মালী যে রকম নিয়মিত রূপে ফুলের গাছের কেয়ারি করিত আমার অনুপস্থিতি-কালেও ঠিক সেই রকমই করিয়াছিল। আমার ভারি সন্দেহ আছে যে আমি ও রকম উচ্চ দরের আচরণ ইংলণ্ডে দেখিতে পাইতাম কি না।

Routtedge's British Rule in India

বিজয়ী বীর।—একটা টিনের পাত্র লেজে বাঁধা কুকুর যখন ভয়ে পাগলের মতন দৌড়ে বেড়ায় তখন সেটা ঠিক এক-জন বিজয়ী বীরের উপমা-স্থল। অধৃষ্য বীরের অন্তরে প্রতিভা ও পাগলামি এই দুই উপকরণ মিশাইয়া তাহার লেজে একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষার টিন পাত্র বাঁধিয়া দেয়। বীরপুরুষ যতই বেগে দৌড়িতে থাকে ততই এই টিন পাত্রের শব্দ তাহাকে পাগলের মতন দিগ্বিদিক শূন্য ভাবে চালাইয়া দেয়।

Carlyle

প্রকৃতি।—ঈশ্বরের জীবন্ত পরি-দৃশ্যমান পরিচ্ছদের নাম প্রকৃতি।

Goethe

স্ত্রীলোক।—স্ত্রীলোকেরা নিয়তির যাজক। পুরুষ উচ্চ কার্য্য কল্পনা করিতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোকে তাহাকে সেই উচ্চ কার্য্যে পৌছাইয়া দেয়। পুরুষ বলিতে পারে যে "আমি উচ্চ হইব" কিন্তু স্ত্রীলো-কের স্নেহ মমতাই সাধারণতঃ তাহাকে উন্নত করে।

Earl of Beaconsfield.

মূল জ্ঞান।—প্রত্যেক বস্তুকে অ-পরাপর সকল বস্তুর সঙ্গে মিলাইয়া দেখাই জ্ঞানের মূল।

ঐ

প্রতিভা-শালী ব্যক্তি।—এটি অ-ত্যন্ত ভুল যে এক জন প্রতিভাশালী ব্যক্তি পৃথিবীর প্রতিদিনের কার্য্য করিতে অক্ষম।

যে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে পারে সে মনে করিলে ডাকের সঙ্গে দৌড়িতে পারে; বড়টা হইলে ছোটটা তাহার ভিতর আছেই আছে। কিন্তু বৃদ্ধা পৃথিবী এতবার পারা মাখান-পয়সাকে টাকা বলিয়া ভুল করিয়াছে যে সে আর কখনো সাধারণ তামা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে বিশ্বাস করিতে পারে না।

Carlyle.

প্রেম।—স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক তাড়িতাকর্ষণকে আমরা সচরাচর প্রেম বলি।

ঐ

অত্যন্ত উন্নত অবস্থাতেও প্রেম একটা বিভ্রম মাত্র, অজ্ঞান কোন একটা কিছুর নিয়মে ইহা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছে। আর এই বিভ্রমের দ্বারা একটা অত্যন্ত গুরুতর কার্য্য সাধিত হয়; সে কার্য্য জীব-শ্রেণীর স্থায়িত্ব।

Goethe

মানুষের দেহ।—পৃথিবীতে একটি মাত্র পূজার মন্দির আছে এবং সেই মন্দির মনুষ্যের দেহ। পৃথিবীতে মানুষের উন্নত আকৃতি অপেক্ষা আর কিছুই অধিক পবিত্র নাই। মানুষের নিকটে অবনতজানু হওয়া আর রক্তমাংসের দেহে প্রকাশিত ঈশ্বরের উপাসনা করা একই। মনুষ্যের শরীরে হাত দেওয়া ও স্বর্গ স্পর্শ করা একই।

Novalis.

স্বর-রহস্য।

স্বর-বিন্যাসের পরিপাট্যে গীতের পরিপাট্য হয় ইহা সকলেই জানেন—কিন্তু কোন্ প্রকার স্বরের পর কোন্ প্রকার স্বর বসাইলে সাধারণতঃ গীতের পারিপাট্য হয়, ও কেন হয়, ইহা আমাদের দেশের বড় বড় ওস্তাদও হয় ত বলিতে পরাস্ত মানিবেন। এ জন্য সংক্ষেপে স্বর-বিন্যাসের কতিপয় মূলতত্ত্ব (ক খ-গ-ঘ-মাত্র) প্রদর্শন করা যাইতেছে।

নিম্ন লিখিত এই আটটি স্বর দৃষ্টি কর

সা০০০০রে০০০গ০০ম

প০০০০ধ০০০নি০০সা

এক এক করিয়া ক্রমান্বয়ে নীচু স্বর হইতে উঁচু স্বরে উত্থান-পূর্ব্বক নীচের সা হইতে এক-সপ্তক উপরের সা পর্য্যন্ত ওঠা হইল।

উক্ত স্বরাষ্টকের কাহার কাহার মধ্যে কি-মাত্রা ব্যবধান, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য, চারি-চারিটি স্বর করিয়া ঐ যে দুইটি পংক্তি তাহার প্রথম স্বর-দ্বয়ের মধ্যে চারিটি বিন্দু, তাহার দ্বিতীয় স্বরদ্বয়ের মধ্যে তিনটি বিন্দু, তৃতীয় স্বরদ্বয়েব মধ্যে দুইটি বিন্দু সন্নিবিষ্ট হইল; ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, সা এবং রে তথা পা এবং ধা দুয়ের মধ্যে ষোলো আনা ব্যবধান, রে এবং গ তথা ধা এবং নি দুয়ের মধ্যে বারো আনা ব্যবধান, গা এবং মা তথা নি এবং সা দুয়ের মধ্যে আট আনা ব্যবধান।

প্রথম সপ্তকের সা যদি বীণায় ঝঙ্কারিত হয় তবে দ্বিতীয় সপ্তকের পা এবং তৃতীয় সপ্তকের গা তাহার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম-স্বরে অনুরণিত হইয়া উঠে। এজন্য সা গা এবং পা এই তিন স্বর সম্বাদি বলিয়া উক্ত হইতে পারে (আমাদের দেশীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে গা সম্বাদি বলিয়া পরিগণিত হয় না কিন্তু তাহা লইয়া বাদানুবাদ করা এখানকার উদ্দেশ্য নহে—স্বদেশ বিদেশ নিরপেক্ষ সাধারণ-স্থলে দাঁড়াইয়াই এ-

খানে কথা কহা হইতেছে)। কোন যন্ত্রে ঐ তিন স্বর একত্রে বাজাইলে তাহাদের মধ্য হইতে দিব্য একটি ঐকতান ভাব ফুটিয়া বাহির হইবে—তেমনটি আর কোন স্বর ত্রয়ের মধ্যে সম্ভবে না; উপরে যাহা বলা হইল ঐটি স্বর-রহস্যের বীজ-রহস্য; পরে যাহা কিছু আসিবে তাহা উহারই শাখা-প্রশাখা।

এখন, কেবল সা গা পা, গা পা সা, পা গা সা উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া বাজাইলে শুনিতে ভাল লাগে বটে কিন্তু বৈচিত্র-বিরহে তাহা সর্ব্বাঙ্গীন একটি গীতোচ্ছ্বাস বলিয়া গণ্য হইতে পাবে না; চিত্র-কর্ম্মে যেমন আলোক এবং ছায়া উভয়ের সঙ্ঘাত আবশ্যক গীত-কার্য্যে সেইরূপ সংবাদী-এবং বিবাদী স্বরের ঘাত-প্রতিঘাত চাই—তবেই গীতের সর্ব্বাঙ্গীনতা হয়। এখন বিবাদী স্বর কাহাকে বলে, তাহা দেখা যাইতেছে।

বিবাদী-স্বর বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে স্বর-সপ্তকের গ্রাম-নির্ব্বাচন করা আবশ্যক অতএব প্রথমে তদ্বিষয়ে একটু প্রণিধান করা হউক্।

সাত স্বরকে ভাঙিয়া বারো স্বরার্দ্ধে পরিণত করিলে তাহাতে কাজের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না; তবে খুব একজন বিচক্ষণ-সমজদার ব্যক্তি বলিলেও বলিতে পারেন যে উহা ঠিক্ ব্যাকরণ-শুদ্ধ হইল না; কিন্তু সঙ্গীতের ক-খ-শিক্ষা স্থলে ও-সকল বিচারাড়ম্বরে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা এইখানেই পুঁথি পাঁজি বদ্ধ করাই শ্রেয়। সাত-স্বরকে এইরূপ করিয়া বারো ভাগে বিভাগ কর যে, গা মা তথা নি সা উভয়ের মধ্যে যেরূপ আট আনা ব্যবধান, উক্ত বারো স্বরের প্রত্যেক স্বর দ্বয়ের মধ্যে সেইরূপ আট-আনা ব্যবধান থাকিবে; যথা,—

(১) সা
(২) সা॥৹—অর্থাৎ কোমল রে
(৩) রে
(৪) রে॥৹—অর্থাৎ কোমল গা
(৫) গা
(৬) মা
(৭) মা॥৹—অর্থাৎ কড়ি মধ্যম
(৮) পা
(৯) পা॥৹—অর্থাৎ কোমল ধা
(১০) ধা
(১১) ধা॥৹—অর্থাৎ কোমল নি
(১২) নি

এখানে বলিতে পার যে সা এবং রে উভয়ের মধ্যে ষোলো আনা ব্যবধান কিন্তু রে এবং গা উভয়ের মধ্যে বারো আনা বই নয়; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ব্যবধানকে অর্দ্ধা অর্দ্ধি বিভাগ করিলে যদিচ আট আনা ব্যবধান পাওয়া যায় কিন্তু শেষোক্ত ব্যবধানকে অর্দ্ধা-অর্দ্ধি বিভাগ করিলে ছ-আনা মাত্র পাওয়া যায় তাহার অধিক নহে। ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, ষোলো আনা এবং বারো আনা ব্যবধানের পরিবর্ত্তে উভয় ব্যবধানকে গড়ে সমান করিয়া পরিণত করিলে—যোলো আনা এবং বারো আনার মাঝামাঝি চৌদ্দ আনায় পরিণত করিলে—বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় না, এবং তাহাদিগকে অর্দ্ধা অর্দ্ধি বিভাগ করিলে আট আনা ব্যবধান না হউক সাত আনা ব্যবধান পাওয়া যায়, তাহাই যথেস্ট;—এক আনা ব্যবধানের ইতর বিশেষে কাজের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। আসল কথাটা এই যে সাত-স্বর ভাঙিয়া উপরি উক্ত রূপ বারো স্বরে পরিণত করিলে এত সুবিধা হয় যে, তাহার ভিতরকার ক্ষুদ্র দোষ-গুলি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। অতঃপর গ্রাম-নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়া বিবাদী স্বর কিরূপ তাহা দেখা যাইতেছে।

ক্রমশঃ।

হৃদয় মন্থন।

জনৈক সন্যাসী প্রেরিত।

আমি আপনাদিগকে অনেক দিবস হইল কোন পত্রই লিখি নাই; তাহার দুইটি কারণ আছে—প্রথমতঃ আমি ভাবিয়াছিলাম যে একজন সমাজ-পরিত্যাগী সন্ন্যাসীর মনোভাব প্রচার করিয়া সমাজের কোন উপকার নাই, ব্যক্তি বিশেষেরও কোন উপকার নাই; দ্বিতীয়তঃ হরিদ্বারের মেলা দর্শনের জন্য আমাদিগকে এতদূর ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে ইচ্ছা থাকিলেও তোমাদিগকে পত্র লিখিবার সময় পাই নাই। তোমরা ত জানই যে দ্বাদশ বৎসর অন্তে বৃহস্পতি গ্রহ কুম্ভ রাশিস্থ হয়েন, এবং বৈশাখ মাসের সেই সময়ে "সুরধুনি মুনিকন্যাতে" স্নান করা অপেক্ষা অধিকতর পুণ্য আর কিছুতেই নাই। এই সময়েই জনতা উপলক্ষে হরিদ্বারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন লোক—ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়িক, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন সন্ন্যাসী, ও ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী একত্রে সম্মিলিত হয়। কোথাও বৈষ্ণবে ও শাক্তে একত্র হইয়া, কোথাও বৌদ্ধে ও তান্ত্রিকে মিলিত হইয়া শাস্ত্রের নানা প্রকার তর্ক তুলিয়াছে; কোথাও সঙ্কল্পিত ব্রতধারীর সহিত আজন্ম সন্ন্যাসীর হৃদয়োচ্ছ্বাস তরঙ্গিত হইতেছে; আবার অন্য দিকে গান্ধারের অশ্ব সমূহ, কাশ্মীরের বিচিত্র শাল, জয়পুরের শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত বাসন রাজি, উড়িষ্যার রজত-নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি, বঙ্গদেশের তাল তমাল কাষ্ঠাদি, বারানসীর স্বর্ণতন্তুবিশিষ্ট বসনাদি এবং বম্বাই প্রদেশের হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত ক্রীড়া-সামগ্রী স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে এই স্থানে তোমরা ভারতবর্ষের সকল জাতীয় লোককে দেখিতে পার। এখানে এক দল উলঙ্গ বঙ্গদেশবাসী; ওখানে একদল পরিচ্ছন্ন মহারাষ্ট্রীয়, এখানে একদল ভীরু উড়িষ্যাবাসী, ওখানে একদল বীর্য্যবান রাজপুত। নানা প্রকার দেহের গঠন, নানা প্রকার ভাষার বৈচিত্র্য, নানা প্রকার পরিচ্ছদের বৈষম্য, এবং নানা ভাবের তারতম্য দেখিয়া মনে হয় যে, এই ক্ষুদ্র হরিদ্বার আজ বৈশাখ মাসে সমস্ত পৃথিবীর আদর্শভূত—সমস্ত পৃথিবীর বিনোদ-সম্মিলন-ক্ষেত্র। এই হরিদ্বার তীর্থে আসিবার জন্য আমরা এত দিন পর্য্যন্ত এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিলাম যে তোমাদিগকে পত্রাদি লিখিতেও বিস্মৃত হইয়াছিলাম। বহু কষ্টে ও বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শেষে হরিদ্বার তীর্থে উপনীত হইতে পারিয়াছি।

কিন্তু এই মহাতীর্থ স্থানে আসিয়াও আমি ভাল করিয়া মেলাটি দেখিতে পাইলাম না। ইচ্ছা ছিল যে এই বৈশাখী

মেলার সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার সকল বৃত্তান্ত পুংখানুপুংখরূপে তোমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইব। কারণ, এই মেলাকে আমি নিতান্ত আমোদের চক্ষে দেখি না,— আমি জানি যে এই প্রতিষ্ঠিত মেলা জাতীয় সম্মিলনের একটি প্রধান গ্রন্থি—ধর্ম্ম-উৎসাহের একটি প্রধান উত্তেজক—দেশহিতৈষিতার একটি প্রধান মন্ত্র এবং গৌরব-সমৃদ্ধির একটি প্রধান সোপান। ভারতবর্ষের অনন্ত মহিমার চির-সাক্ষী-স্বরূপ এই দিগন্ত-প্রসারিত হিমালয়ের চরণতলে সমস্ত বৎসরের মধ্যে একদিনও যে আমরা ধর্ম্মের উদ্দেশে, সম্মিলনের অভিলাষে একত্র হই, বা একত্র হইতে পারি, ইহা সামান্য উত্তেজনার কথা নয়। সত্য কালের বর্ণনায় কবিরা যেমন বলেন যে, সে সময়ে এক উৎস হইতে নিরীহ হরিণ শিশু ও ভীষণ শার্দ্দূল উভয়ই একত্র জল পান করিত ও ময়ূরে এবং সর্পে অকৃত্রিম প্রণয়-ভাবে কুঞ্জে কুঞ্জে নৃত্য করিত, এখানেও সেইরূপ ঘোর তান্ত্রিকের সহিত বৈষ্ণবেরা মিশিতেছে, এবং দারুণ শাক্তের সহিত সর্ব্বত্যাগী বৌদ্ধেরাও একাসনে বসিয়া আহার করিতেছে। জাতীয় সম্মিলনের অমোঘ আবর্ত্ত-স্বরূপ এই বৈশাখী হরিদ্বারমেলায় যে কেহ পড়ে, সেই দেখিতেছি বিঘূর্ণিত হইয়া জাতীয়ত্বের গভীর গহ্বরে আকর্ষিত হয়। কিন্তু এই সম্মিলনের সুখদ দৃশ্য, এই জনতায় উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-তুফান আমি মনের সহিত এক দিনও দেখিতে পাই নাই। আমি পুণ্যবতীকে লইয়া বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। হরিদ্বারের উত্তরে ভাগীরথীর ক্রোড়-দেশে যে এক বিকট অরণ্য আছে, তাহা এই জনতার রঙ্গভূমি হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। এই মেলার সময় সেখানে জনপ্রাণী যাতায়াত করে না, কারণ সকলেই মেলার দৃশ্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে ভাল বাসে, কিন্তু আমাদের পুণ্যবতী সেই বিকট ও বিজন বনের মধ্য হইতে একদিনও বাহির হইতে চাহে নাই। যখনি আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম, তখনই দেখিতাম যে তিনি সেই ভয়-সমাকীর্ণ অরণ্যে গঙ্গার অঙ্কস্থ একটি নিভৃত প্রদেশে বসিয়া মহামায়ার পূজায় ঘোর নিমগ্ন। কখন দেখিতাম যে পুণ্যবতী অর্দ্ধ মুদিত নেত্রে ঊর্দ্ধকণ্ঠে

"দেবি, প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোখিলস্য"

বলিয়া অরণ্যানী বিকম্পিত করিয়া গিরি-বালিকার উপাসনা করিতেছেন, কখন বা দেখিতাম তিনি নিমীলিত নেত্রে অজস্র অশ্রুধারে দেবী শৈলনন্দিনীর চরণযুগল প্লাবিত করিতেছেন। আহা, পুণ্যবতীর সেই ধ্যানের মূর্ত্তি আমি আমরণ কখনই ভুলিতে পারিব না। যখন দেখিতাম সেই স্বর্ণকান্তিময় শীর্ণ শরীরখানি ছিন্ন ভিন্ন গেরুয়া বসনে অর্দ্ধাবৃত, ও নিবিড় জলদ-জাল-সদৃশ আলুলায়িত কেশরাশি অবাধে স্কন্ধে, কপোলে, বক্ষে অসংযত ভাবে বায়ু-হিল্লোলে ইতস্ততঃ তরঙ্গিত হইতেছে, যখন দেখিতাম যে,

সেই ঈষৎ-নিমীলিত নলিনীনয়ন হইতে বর্ষার স্রোতের মত মর্ম্মভেদী অশ্রুলহরী উৎসারিত হইতেছে এবং দেখিলেই বোধ হইত যে পুণ্যবতীর মন সপ্তম স্বর্গের দূর দিগন্ত বিচরণ করিয়াও যেন পরিতৃপ্ত হইতেছে না, তখন মহামায়াকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যবতীকেই উপাসনা করিতে এই দুর্ব্বল হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা জন্মিত। পুণ্যবতীর এই গভীর ধ্যানের এক অবস্থাতেই আমি তাহাকে দেখিলাম, দেখিয়া আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। স্থির দৃষ্টে—সেই ধ্যানমগ্না নবীনা যোগিনীর উজ্জ্বল-মধুর দেবী-প্রতিমাখানি দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে তাহার ধ্যান সমাপ্ত হইল; গেরুয়া বসনের অঞ্চল দিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়ন-যুগল মুছিয়া দেখিতে পাইল যে আমি প্রস্তর-মূর্ত্তির মত তাহার দিকেই চাহিয়া আছি; আমাকে দেখিয়া পুণ্যবতী জিজ্ঞাসা করিল "দেব! এ সময়ে আপনি যে আজ এখানে অধিষ্ঠান?"

আ। পুণ্যবতি! আজ মেলাতে বিশেষ সমারোহ হইয়াছে। সেই জন্য তোমাকে ডাকিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আসিয়া দেখিলাম যে তুমি কঠোরব্রতধারিণী গিরিবালিকার মত গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, সেই জন্য তোমাকে বিরক্ত করিতে আর সাহস হইল না। কিন্তু, পুণ্যবতি, আজ আমাকে মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিতে দাও—যে তুমি আমাদিগকে লজ্জা দিয়াছ; তোমার পূজার প্রণালী, তোমার ধ্যানের গভীরতা, তোমার ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া মনে হয় যে তোমারই সার্থক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম, তোমারই সার্থক সংসার-বৈরাগ্য—তোমারই সার্থক দেবতা-ভক্তি।

পুণ্য। দেব! আমাকে আর উপহাস করিবেন না। আমি মর্ম্মের স্তরে স্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাইভস্ম হইয়াছি, আমাকে আর উপহাস করিবেন না। আমি ঘোর পাতকিনী।

আ। বৎসে! আমি তোমাকে উপহাস করি নাই—আমি তোমাকে ঘোর পাতকিনীও ভাবি নাই।

পুণ্য। কি? আপনি আমাকে কি আজও ঘোর পাতকিনী ভাবেন নাই? দেব! যদি এ পর্য্যন্ত তাহা না ভাবিয়া থাকেন তবে অন্তত আজ হইতে তাহাই ভাবিবেন। প্রবঞ্চনা করিয়া এই বিকট বিজনের কঠোর মাহাত্ম্যের আমি অপমান করিতে চাহি না, এই সম্মুখে প্রবহমানা পবিত্রসলিলা জাহ্নবীকে আমি কলঙ্কিত করিতে চাহি না, এই হরিদ্বার তীর্থের গৌরব আমি লোপ করিতে চাহি না, সত্য কথা বলিতেই হইবে, এবং সত্য কথাটি এই যে, আমি ঘোর পাতকিনী। আমি আপনাদিগকে ক্রমাগতই প্রবঞ্চনা—করিয়া আসিতেছি।

আ। সে কি পুণ্যবতি! তুমি কি রূপে আমাদের প্রবঞ্চনা করিলে? তোমার বিগত জীবনের সকল ঘটনাই ত আমরা জানি এবং তোমার সন্ন্যাসিনী-জীবনের সকল দিনই ত আমাদের সহিত

অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু প্রবঞ্চনা কোথায়?

পুণ্য। প্রবঞ্চনা কোথায়? প্রবঞ্চনা আমার হৃদয়ে, আমার মর্ম্মের স্তরে স্তরে—প্রবঞ্চনা আমার এই বিগলিত অশ্রুবারিতে। আমি সুরেন্দ্রকে—

আ। কি আশ্চর্য্য! এখনও তুমি তোমার সুরেন্দ্রকে ভুলিতে পার নাই? এই এত ত্যাগস্বীকার, এত কঠোর ব্রত, যোগ-ধ্যানে এত দূর আত্ম-বিসর্জ্জন, কিছুতেই কি তুমি আজও তোমার সেই বাল্য-সখাকে ভুলিতে পারিলে না?

পুণ্য। দেব! আমার তপ-জপ, আমার আত্ম বিসর্জ্জন সকলই মিথ্যা। আমি যোগিনী হইয়াছি বলিয়া মনকে যতই প্রবোধ দিই না কেন, আমি উদাসিনী হইয়াছি বলিয়া যতই আত্ম-প্রতারণা করি না কেন, আমি হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে মহামায়াকে যতই ভক্তিভাবে প্রতিষ্ঠা করি না কেন, কিন্তু এই দুর্ব্বল রমণী-হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে কাহার প্রতিমা সততই জাজ্বল্যমান? আমি ত মনে মনে শত সহস্রবার প্রতিজ্ঞা করি যে সে প্রতিমা আর দেখিব না, দেব-ভক্তিরূপ হোমাগ্নির ঘন ঘোর ধূমাবরণে সে মূর্ত্তি আবরিত রাখিব, কিন্তু, দেব, এখন দেখিতেছি যে রমণীর প্রতিজ্ঞা কিছুই নয়, প্রণয়েতে অভিমানের প্রতিজ্ঞা কিছুই নয়, যোগিনীর যোগী-প্রতিজ্ঞাও কিছুই নয়!

আ। তবে তোমার সন্ন্যাসিনী-ব্রতে দীক্ষিত হওয়াই অন্যায় হইয়াছিল। তুমি যখন প্রণয়-ভঙ্গের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে সুরেন্দ্রকে বিস্মৃত হইবার ব্রতে ব্রতী হও নাই, তখন সন্ন্যাসিনী হইবামাত্রই কি রূপে তাহাকে বিস্মৃত হইতে পার? যোগিনী হইলেই হৃদয় পাষাণ হইয়া যায় না, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই সাংসারিক বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয় না।

পুণ্য। দেব! আপনি আমাকে অকারণ তিরস্কার করিতেছেন। যখন আমি প্রথমেই দেখিলাম যে তিনি আমার সংসর্গ হইতে ইন্দ্রাণীর সংসর্গে অধিকতর সুখী হইতেন এবং নানা প্রকারে আমাকে প্রতারণা করিয়া ইন্দ্রাণীর পাশে যাইয়া বসিতে ব্যাকুল হইতেন, তখনি জানিয়াছিলাম যে আমাদের প্রেমের অবসান ঘটিয়াছে। প্রথমে অবশ্যই দারুণ মর্ম্ম-যাতনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর হৃদয়কে এই বলিয়া বুঝাইলাম যে, "আমার প্রেম নিঃস্বার্থ প্রেম, সুতরাং সুরেন্দ্র যাহাতেই ভাল থাকেন, তাহাই ভাল—আমি তাহাতে কষ্ট পাইব কেন?" কিন্তু এই মর্ম্মান্তিক প্রশ্নের উত্তর আমি আপনি দিতে পারিলাম না। কষ্ট যে কেন পাই,—তাহা কোন মতেই বুঝিতে পারিলাম না,—চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না, কেবল এই মাত্র জানিতাম যে ইন্দ্রাণীর জন্য সুরেন্দ্রের ব্যাকুলতা দেখিয়া আমার হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। তাহার পর এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, উহাদের আদর-সম্ভাষণ বা প্রেম-দৃশ্য আর দেখিব না। দেখিয়াই

যদি এত কষ্ট, ত তাহা আর স্বচক্ষে দেখিব না, বা অন্যের মুখে সে কাহিনী শুনিব না। কিন্তু রমণী-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতই হউক, ঈর্ষার স্বাভাবিক প্রভাবেই হউক, অভাগিনীর কপালের দোষেই হউক, আমি ছলে বলে কৌশলে তাহার প্রেম-রহস্য জানিবার জন্য মনে মনে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পড়িতাম—তাহাদের প্রেম দৃশ্য দেখিয়াও যেন দেখিতাম না, অথচ গভীর গূঢ়ভাবে নিজের মনেতেও আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতাম। চক্ষুর প্রমাণ কষ্টকর মনে করিয়া চক্ষু মুদিত করিতে চাহিতাম বটে, কিন্তু তাহাতে কল্পনার চক্ষু উন্মীলিত হইয়া বিকট বিভীষিকার দৃশ্যে আমাকে অহোরাত্র জ্বলন্ত আগুণে যেন দাহন করিত, সুতরাং আমি কি করিব?—তাহাদের প্রেম-অভিনয় দেখিলেও ভয়ানক মর্ম্মান্তিক যাতনা, না দেখিলেও কল্পনার প্রভাবে অধিকতররূপে সেই যাতনা! দেব! আপনি মনে করিতে পারেন যে, আমি অত্যন্ত স্বার্থপর, অত্যন্ত হীনমনা, অত্যন্ত সুখাভিলাষী। কিন্তু আমি মনে জানি যে আমি—কিন্তু সেকথায় আর কাজ কি। প্রকৃত ঘটনা সকল ত আপনাকে খুলিয়া বলিলাম, এখন আপনি আমাকে যাহা মনে করিতে হয় করিতে পারেন। আমার স্থূল কথা এই যে, যখন দেখিলাম ইন্দ্রাণীই সুরেন্দ্রের চক্ষুর আনন্দ এবং আমিই তাঁহার চক্ষুর শূলস্বরূপ, যখন দেখিলাম ইন্দ্রাণীই তাঁহার মস্তকের মণি ও আমিই তাহার চরণের কণ্টক প্রায়;—আমি কেবল তাঁহার ঔদাস্যের পাত্রী নহি, তাঁহার বিরক্তির কারণ, তখন—তখনই আমি দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সন্ন্যাসিনী ব্রতে দীক্ষিত হইলাম। যখন দেখিলাম যে দেবতার আশ্রমে থাকিয়া হৃদয়কে শত সহস্ররূপে বুঝাইয়া সুঝাইতে পারিলাম না, যখন সুরেন্দ্রকে ভুলিবার জন্য বিপুল যত্ন করিয়াও কোন মতেই তাঁহাকে ভুলিতে পারিলাম না, যখন দেখিলাম যে ইন্দ্রাণীর প্রতি সুরেন্দ্রের একটী সোহাগের কটাক্ষ দেখিয়া বা আমার প্রতি ইন্দ্রাণীর একটি ভ্রুকুটী-সন্ধান দেখিয়া হৃদয় যে স্তরে স্তরে কি এক ভয়ানক যাতনায় দগ্ধ হইয়া যাইত, তখনই আমি সন্ন্যাসিনী-ব্রতে দীক্ষিত হইলাম। যখন দেখিলাম যে সুরেন্দ্রকে ভুলিয়া যাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাঁহাকে অন্তরাল হইতে একটীবার দেখিয়া লইতেও জ্বলন্ত অভিলাষ হইত, আবার একটিবার দেখিলে সমস্ত মন আলোড়িত হইত এবং সমস্ত ভালবাসা জ্বলিয়া উঠিত, তখনই আমি সন্ন্যাসিনী ব্রতে দীক্ষিত হইলাম; যখন দেখিলাম যে নিতান্তই সুরেন্দ্র আমার আরাধনার দেবতা, সেই দেবতাই আমার সকল যাতনার কারণ, সেই যাতনাই আমার সংসারের সর্ব্বস্ব, তখনই আমি সন্ন্যাসিনী ব্রতে দীক্ষিত হইলাম। কিন্তু সন্ন্যাসিনী ব্রতে দীক্ষিত হইয়াই বা আমার কি হইল? এখন সুরেন্দ্রকে চর্ম্ম-চক্ষুতে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু জাগ্রতে মানস চক্ষুতে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে তাঁহাকে

অহোরাত্রই দেখিতে পাই। জাগ্রতে কল্পনার প্রভাবে তাঁহাকে ইন্দ্রাণীর সহবাসে অনন্ত সুখে সুখী দেখিয়া যেমন মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পাই, ঘুমন্ত অবস্থায় আবার কখনো কখনো স্বপ্নে তেমনই আমার নিজস্ব প্রণয়ীরূপে দেখিয়া, আমি ত সুখী হই, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে সাধের কুসুম-কানন বিকট শ্মশানে পরিণত হইয়া উঠে। মনের যাতনায়, মনের বৈরাগ্যে, মহামায়াকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই ছার, দুর্ব্বল মর্ম্ম তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করিতে চাই—এই ছার, দুর্ব্বল মর্ম্ম তাঁহারি নিকটে বলিদান দিতে চাই, কিন্তু সমস্ত পূজা-ধ্যান সমাপ্ত না হইতে হইতেই মহামায়ার প্রতিমা তিরোহিত হইয়া সুরেন্দ্রের প্রতিমা যেন আপনা আপনি—অবাধে—স্বপ্নবৎ—মন্ত্রবলে সেই মহামায়ার বেদীতে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই—মন্ত্রবলে আমিও যেন সন্ন্যাসিনী ব্রত ভুলিয়া যাই—মোহমন্ত্রে আমি তখন অভিভূত হইয়া হৃদয়ের নিভৃত উৎস হইতে উৎসারিত অশ্রুজলে মহামায়ার চরণ ছাড়িয়া সুরেন্দ্রের চরণই প্লাবিত করিতে থাকি।

সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ের ভিতর যে কি বিপ্লব হইতেছে তাহা কে বুঝিবে? সুরেন্দ্রের উপরে আমার যে যে বিষয়ে অভিমান হইয়াছিল, সেই সকল স্মরণ করিয়া হৃদয় কখন গভীর বৈরাগ্য-ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িতেছে—কখন বা ইন্দ্রাণীর সুখের অবস্থা ভাবিয়া হৃদয় যাতনায় ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, আবার কখন বা এই সকল পার্থিব চিন্তার দ্বারা পবিত্র সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছি বলিয়া প্রাণ-মন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। এক এক দিন সুখের স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গে এই বলিয়া নিজেকেই তিরস্কার করিয়াছি—'হায় কেন আমি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হিমালয়ের এই নিভৃত কন্দরে লুকাইয়া রহিয়াছি? কেন আমি সুরেন্দ্রের আশে পাশে থাকিয়া তাঁহাকে দেখিয়াই স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিবার যত্ন করিলাম না? ইন্দ্রাণীর না হয় সুখেরি কপাল, কিন্তু আমি চিরদুঃখিনী হইয়াও সুরেন্দ্রকে কেবল দেখিয়াই সুখী হইতে চাহিলাম না কেন?—তিনি হয় ত আমাকে দেখিয়া বিরক্ত হইতেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখা না দিয়া কেবল তাঁহাকে দেখিবার আশাতেই সংসারে রহিলাম না কেন? এই বিকট শূন্য প্রদেশে আত্মবলিদান দিবার আবশ্যকতা কোথায়?—এই রূপ ভাবিতেছি, এমন সময় হয় ত আপনাদের সকলের সম্মিলিত ভগবতী-উপাসনার জলদগম্ভীর নিনাদ সপ্তম স্বর্গের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়া এই অভাগিনীর কর্ণে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইত—অমনি আমার মোহ ভঙ্গ হইত, অমনি যেন ঐ সকল পার্থিব চিন্তা কর্পূরের মত উবিয়া যাইত, শেষে কষ্টে, অনুতাপে, ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইয়া বিকম্পিত হৃদয়ে আপনাদের উপাসনায় যোগ দিবার চেষ্টা করিতাম। স্বীকার করিতেই হইবে যে সে উপাসনার সময়

আমার হৃদয় যে রূপ একটি বিমল আনন্দ উপভোগ করিত, সেরূপ বিমল আনন্দ পৃথিবীর আর অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। সে সময়ে অভাগিনীর এই ক্ষুদ্র হৃদয়ও হিমালয়ের মত উন্নত ও সাগরের মত প্রসারিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর এক জন মনুষ্যের প্রেম-ভিখারী বলিয়া আপনাকে অনুভবই করিতে পারিত না। সেই উপাসনার সময় আমি আপনিই বুঝিতে পারিতাম সেই সঙ্গীতময় উপাসনার প্রভাবে আমার প্রাণমন পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ পরিধি ছাড়িয়া সংসারের ঘূর্ণায়মান আবর্ত্ত ছাড়িয়া কোন্ এক জ্যোতির্ম্ময় লোকে যাইয়া আপনাতে আপনহারা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু জানি না, মাটীর পৃথিবীর আকর্ষণ বশতই হউক, রমণী-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতই হউক, মন্দভাগিনীর অদৃষ্টের দোষেই হউক, বা প্রেমের কঠোর অত্যাচারেই হউক,—এ পোড়া প্রাণমন অধিক ক্ষণ সেই জ্যোতির্ম্ময় লোকে বিচরণ করিতে পারিত না, পলকেই ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গনীর ন্যায় ধূলিময় পৃথিবীতে পড়িয়া ধূলায় ধূসরিত হইত।—দেব, এই আমার প্রকৃত অবস্থা,—এই আমার নরক-যন্ত্রণা। আমি আশ্রম-বাসিনী হইয়া আশ্রমের সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম, আবার সন্ন্যাসিনী হইয়া বৈরাগ্য শিখিতে পারিলাম না। আমার দেব-আরাধনাতে পার্থিব সুখ-অভিলাষের কলঙ্ক—আবার পার্থিব সুখাভিলাষে বৈরাগ্যের প্রতিজ্ঞা।—আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়া, বিস্তর কঠোরতা সহ্য করিয়া, বিস্তর ত্যাগ স্বীকার করিয়া আজ এই সর্ব্বসাক্ষী-রূপী হিমালয়ের চরণতলে দাঁড়াইয়া, পবিত্র-সলিলা জাহ্নবীর পুলিন দেশে দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে এই বলিতেছি যে, অভিমানের দায়ে যদি কেহ কখন প্রণয়ের সামগ্রীকে একেবারে ভুলিতে চাহেন' তিনি শূন্যেও দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে যত্ন করিতে পারেন। এবং তাহার একটি বিশেষ কারণও আছে। বিস্তর যত্নে, বিস্তর কঠোর ত্যাগ-স্বীকার দ্বারা প্রণয়ের সামগ্রীকে ভুলিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াও ভুলিতে অনেক সময় ইচ্ছা হয় না। ভুলিবার জন্য কঠোর প্রতিজ্ঞা করিতেছি' অথচ পাছে একেবারে ভুলিয়া যাই—এই দুই বিরোধী বাসনার প্রতিকূল স্রোতে হৃদয়-মন যে কি বিপর্য্যস্ত হয়, তাহা প্রণয়ী ব্যতীত আর কেহই বুঝিতে পারিবে না। যাঁহার চরণে আমি প্রাণমন উৎসর্গ করিয়াছি, যাঁহার প্রতিমা আমার মর্ম্মের প্রত্যেক উপশিরাতে পর্য্যন্ত গ্রথিত রহিয়াছে, যাঁহার ক্ষণেকের সহবাসেও আমি স্বর্গের সুখ উপভোগ করিয়াছি, যাঁহার সকল কথাই আমার মর্ম্মের গীতিময় কাব্য-বিশেষ, তাঁহাকে একেবারে ভুলিতে কখনই প্রাণের ভিতর হইতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবই যাইব বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারি, অভিমানের মান রাখিতে পারি, উৎপীড়িত প্রেমের গৌরব রক্ষা করিতে পারি, কিন্তু তবুও "তিনি কি আমার ভুলিবার ধন"-রূপ গভীর যাতনাময় ভাবটী ফল্গু

নদীর মত সকল প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম ভেদ করিয়া অলক্ষিত ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু তবুও সেই—”

এই সময়ে সহসা মেলার দিকে একটি ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইল। আমি ও পুণ্যবতী, দুজনেই সেই দিকে চমকিত ভাবে চাহিয়া রহিলাম,—উভয়েরই মুখে কোন কথা নাই,—কোলাহল ক্রমে ক্রমে আরও—আরও—আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল,—দূর হইতে দেখিতে পাইলাম যে জন-তরঙ্গ ক্রমে আমাদের এই নিভৃত প্রান্তরের দিকেই তরঙ্গিত হইয়া আসিতেছে। আমি পুণ্যবতীর জীবন-ভয়ে পুণ্যবতীকে সেইখানে একেলাই রাখিয়া জন-কোলাহলের দিকে দৌড়িয়া যাইলাম। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ না যাইতে যাইতেই শুনিতে পাইলাম যে এক দল দস্যু আসিয়া মেলার ব্যাপারীদের সকল সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে ও এক জন মনুষ্য পর্য্যন্ত হত হইয়াছে।—দূর হইতে দেখিলাম যে জন-সমারোহের মধ্যে দস্যুদের কৃপাণ শূন্যে শূন্যে ঝলকিতেছে, “মার মার” শব্দ দিগন্তে গর্জ্জিতেছে—শূন্যে শূন্যে বিপক্ষদের লাঠী ও দণ্ড হস্তী-শুণ্ডের মত আস্ফালন করিতেছে—মহা কোলাহল, মহা বিপ্লব—আমি সাহসে নির্ভর করিয়া সেই বিপ্লবের আবর্ত্তে যাইয়া প্রবেশ করিলাম,—দেখিলাম যে ইংরাজ কোতোয়ালীর প্রভাবে শরৎকালের মেঘের মত দস্যুদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়নপর হইয়াছে—পূর্ব্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরে লোকেরা দস্যু উদ্দেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

এই কোলাহল কিঞ্চিৎ শমিত হইলে আমি ধীর পদক্ষেপে এদিক ওদিক করিতেছি, এমন সময় একটি নিভৃত নদী গহ্বর হইতে মানুষের যাতনা-নিঃসৃত অর্দ্ধ-রুদ্ধ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। সেই খানে যাইয়া দেখিলাম একটি লোক অত্যন্ত আহত হইয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছে। তাহার যাতনা দেখিয়া আমি তাহার সেবা করিবার সঙ্কল্পে গঙ্গা হইতে জল আনিতে উদ্যত হইতেছি, এমন সময় সে ব্যক্তি আমাকে কহিল যে “মহাশয়! আপনি সন্ন্যাসী আপনার নিকট হইতে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, সুতরাং আপনাকে আমি মুমূর্ষু অবস্থায় এই অনুরোধ করিতেছি যে আপনি আমার সেবা সুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য আর এক ব্যক্তির সেবা করিলে আমি নিতান্তই আপনার নিকটে বাধিত হইব। আমি ঐ দস্যুদিগের মধ্যে এক জন প্রধান দস্যু—আপাততঃ আহত হইয়া পড়িয়া আছি। কিন্তু আমি নিজের জন্য কাতর নহি—আমাদের নেতা ও নায়ক ধৃত হয়েন নাই—তিনি নিদারুণ রূপে আহত হইয়া ঐ উত্তর দিকে গঙ্গার ক্রোড়স্থ অরণ্যের ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াছি—তাঁহাকে একবার দেখুন।”—এই বলিয়া আহত দস্যু নীরব হইল, আমিত ভাবিলাম যে পুণ্যবতী ঐ অরণ্যের নিরালয়ে একেলাটী আপনার ধ্যানে নি-

মগ্ন রহিয়াছে সুতরাং দস্যু-প্রধান কর্ত্তৃক তাহার ধ্যানের কোন বিঘ্ন না হয় তাহা দেখা নিতান্তই আবশ্যক। এই ভাবিয়া আমি আহত দস্যুটীকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অরণ্যের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভয়ে ভয়ে রুদ্ধশ্বাস পুণ্যবতীর সেই নির্জ্জন লতামণ্ডপের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইল।—দেখিলাম নিদারুণ রূপে আহত দস্যু-নায়ক মূর্চ্ছিত হইয়া পুণ্যবতীর ক্রোড়ে শয়ান রহিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন আজ আমূল উৎপাটিত তমাল বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াও বেষ্টিত মাধবীলতার মর্ম্মান্তিক আলিঙ্গনে সংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সেই দৃশ্য দেখিবামাত্রই আমি যেন তাড়িৎ প্রভাবে চমকিত হইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম—কি, আজ এক জন দস্যুর দেহস্পর্শে পুণ্যবতীর পবিত্র দেহ কলঙ্কিত হইবে? পুণ্যবতী আমাদেরই পুণ্যবতী, আর দস্যু-নায়ক দস্যুদেরই নায়ক, সুতরাং পুণ্যবতীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিতে কিরূপে সে স্পর্দ্ধিত হইতে পারে?—আবার, পুণ্যবতী?—পুণ্যবতী কেন নিজ গেরুয়া বসনের অঞ্চলদ্বারা তাহার ক্ষত-প্রবাহিত শোণিত-ধারা মুছাইয়া দিবে?—কেন তাহার সেই অবসন্ন মুখের দিকে স্থির নয়নে চাহিয়া বিগলিত অশ্রুধারায় তাহার শরীর প্লাবিত করিবে? কেনই বা তাহার বিজড়িত কেশরাশি গুছাইতে গুছাইতে মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে আপনার মস্তকের স্খলিত জটাজাল তরঙ্গিত করিয়া তুলিবে?—উঃ দস্যু-নায়কের কি স্পর্দ্ধা! পুণ্যবতীর কি অন্যায়!—কিন্তু আমিত সন্ন্যাসী!—

—না, না, দস্যু নায়ক ত মূর্চ্ছাগ্রস্ত আর পুণ্যবতীওপর-দুঃখ-কাতরা! কিন্তু পর-দুঃখ-কাতরা হইলেও পুণ্যবতীর মুখে ওরূপ দীন ভাব কেন, শরীরে ওরূপ অবসন্ন ভাব কেন? আবার দেখ, দস্যু-নায়কের মৃতকল্প মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পুণ্যবতী সেই মুখ নিজ মৃণাল-হস্তে সযত্নে ধরিয়া তাহা আবার নিজ বক্ষের দিকে টানিয়া লইতেছে, সেই মুখ যেন কোথায় রাখিবে খুঁজিয়া পাইতেছে না, হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে যেন লুকাইয়া রাখিতে কঠোর যত্ন করিতেছে—উঃ কি অন্যায়!—কিন্তু আমি সন্ন্যাসী! ভাবিলাম পুণ্যবতী সন্ন্যাসিনী হইয়াও রমণী-হৃদয়ের দুর্ব্বলতার সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই, পার্থিব প্রবৃত্তির শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারে নাই,—নহিলে দস্যুর প্রতি এত অনুরাগের ভাব কেন? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে কি যেন একটা বৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল—কিন্তু আমি ত সন্ন্যাসী! ভাবিলাম, যে আমি সন্ন্যাসী না হইয়া যদি ঐ দস্যুনায়ক হইতাম, দস্যুনায়ক হইয়া যদি ঐরূপে আহত হইতাম, ঐরূপে আহত হইয়া যদি এই নিভৃত প্রদেশে আসিয়া পড়িতাম,—এই নিভৃত প্রদেশে আসিয়া যদি পুণ্যবতীর ক্রোড়ে অবসন্ন মস্তক রাখিতে পারিতাম, অবসন্ন মস্তক রাখিয়া—কিন্তু আমি ত সন্ন্যাসী!

অথচ এই পার্থিব হইতে পার্থিবতর দৃশ্য দেখিয়া স্বর্গ-সুখের জলস্তম্ভ হইতে কেন আমার হৃদয় মর্ত্তালোকের আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইয়া পড়িল?—সন্ন্যাসীর শ্মশান হৃদয়ে এ আবার কি সাংঘাতিক চিন্তানল জ্বলিয়া উঠিল?—আমি কি এত দিন পর্য্যন্ত পুণ্যবতীকে প্রেমের ভালবাসা বাসিয়া আসিতেছিলাম?—নহিলে হৃদয়ের আজ এ বিপ্লব কেন উপস্থিত হইল? কিন্তু এ বিপ্লব ত কিছুই নয়!—পুণ্যবতী পুণ্যবতীর মত কর্ম্ম করিতেছে না দেখিয়াই আমার মর্ম্মে এত আঘাত লাগিতেছে—আর ত কিছুই নয়! পুণ্যবতী যদি আজ দয়ার প্রভাবে ঐ নিকৃষ্ট পাষণ্ড দুরাত্মা দস্যুনায়ককেই যত্ন করে, তাহাতে আমার কি এল গেল—পুণ্যবতীর নিজেরই পুণ্যের অবমাননা করিতে বসিয়াছে, আমি তাহার কি করিব, কারণ আমি ত সন্ন্যাসী।

ক্রমে যখন দেখিলাম দস্যুনায়কের সুদীর্ঘ নয়নদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতেছে, অথচ কোথায় রহিয়াছে সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, কেবল থাকিয়া থাকিয়া নিজের যাতনা মৃদুস্বরে প্রকাশ করিতেছে, দস্যুর এই অবস্থায় দেখিলাম যে পুণ্যবতী কি এক উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রভাবে সেই দস্যুর কপোল যেন আত্মহারা হইয়া প্রগাঢ় ভাবে চুম্বন করিল, তখন আর আমি থাকিতে পারিলাম না, তখন পুণ্যবতীর সম্মুখে যাইয়া সুতীব্র স্বরে কহিলাম 'পুণ্যবতী! দস্যু নায়ককে এরূপ নির্জ্জন স্থানে চুম্বন করা কি তোমার কঠোর ব্রত রক্ষা করা—না সন্ন্যাস ধর্ম্মের সম্মান রাখা, না রমণী-হৃদয়ের গৌরব প্রচার করা।" এই কথা শুনিয়া ও আমাকে দেখিয়া পুণ্যবতী কিয়ৎ ক্ষণ নিস্পন্দ থাকিয়া ঊর্দ্ধফণা ফনিনীর ন্যায় সদর্পে দাঁড়াইয়া দৃঢ়তাব্যঞ্জক, গম্ভীর স্বরে কহিল

"দেব! ইনিই আমার সুরেন্দ্র!"

ক্রমশঃ

হিয়োন-সাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ।

চতুর্থ ভাগ, ২ সংখ্যা ৭৫ পৃষ্ঠার পর।

তবকত ই-নেছরি গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক মেজর রেভারটী সাহেব, এই বর্দ্ধন কোট নগরের স্থাননির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। বরং তিনি ভ্রম ক্রমে সিকিমের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী কোন নগর বিবেচনা করিয়াছেন। ৩৭ বিজ্ঞবর ইলিয়ট সাহেব ও তদ্রূপ বর্দ্ধন কোটের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা

৩৭ Major Raverty's Tabavat-i-Naciri page 562. কিন্তু পশ্চাৎ তিনি

করেন নাই। ৩৮ মৃত মহাত্মা ব্লুকমান সাহেব বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব সংগ্রহে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ব্লুকমান অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। তল্লিখিত যবনশাসিত বঙ্গের পুরাতত্ত্ব অসম্পূর্ণ হইলেও তুলনারহিত। তিনি এই নগর সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেন "বৰ্দ্ধনকোট বা বৰ্দ্ধনকোটী নগরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি করতোয়া নদীর তীরে দৃস্ট হয়। এই স্থানটী বগুড়ার ঠিক উত্তর দিকে গোবিন্দগঞ্জের নিকটবর্ত্তী। ইহার উত্তর অক্ষান্তর ৮৯ অংশ ২৪ কলা, পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ২৫ অংশ ৮৬½ কলা।" ৩৯ মানচিত্রে এই স্থানটী "রাজবাড়ী" নামে পরিচিত।

বিজ্ঞবর মিত্র মহোদয়ের মতে দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহি মালদহ ও ত্রিহুত প্রভৃতি লইয়া প্রাচীন পৌণ্ড্র বৰ্দ্ধন রাজ্য সংগঠিত হইয়াছিল। ৪০ ত্রিহুত (মিথিলা) পৌণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্নিবিস্ট ছিল, আমরা এইরূপ অনুমান করিতে পারি না। কনিংহাম সাহেব পৌণ্ড্র রাজ্যের এইরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "পূর্ব্বদিকে তিস্তা (ত্রিস্রোতা) ও ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে গঙ্গা (পদ্মা) পশ্চিমে মহানন্দা।" ৪১ ফারগিউসন সাহেব বলেন, পৌণ্ড্র বৰ্দ্ধন রাজ্য কৌশীর পূর্ব্বতীর হইতে ব্রহ্মপুত্রাবধি বিস্তৃত ছিল। ৪২ ওয়েষ্টমেকট সাহেব, ফারগিউসন সাহেবের মতানুসরণ করিয়া, অতিরিক্ত বক্তব্যস্থলে ব্যক্ত করেন, যে এই রাজ্য দক্ষিণ দিকে পদ্মাতীর হইতে পর্ব্বতাবধি প্রসারিত ছিল। ৪৩ বারেন্দ্র ভূমিই পৌণ্ড্র রাজ্য এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতমণ্ডলী বারেন্দ্র বিভাগের পূর্ব্ব সীমান্তে করতোয়া নদীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে পৌণ্ড্র রাজ্য এক দিকে ত্রিপুরার সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তিব্বত দেশীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার তারানাথ লিখিয়াছেন যে, পৌণ্ড্র বৰ্দ্ধন রাজ্যের উত্তর-

---

আত্মভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। See Journal As-So-Bengal Vol XLV part 1 page 346.

৩৮ Elliots History of India Vol II page 310.

৩৯ Prof H. Blockmann's contributions to the Geography and History of Bengal—(I. A. S. B.)

৪০ "Tarhut, Malda. Rajshahi. Dengapore, Rangpore and Bagura, which constituted the ancient Kingdom of Pundr Vardhan." J. A. S. B. XLVII para I. p 396.

৪১ Cunningham's anccent Georaphy of India. page 481.

৪২ Journal R. As Society (N. S.) Vol VI page 255.

৪৩ The Kingdom of Pundra Varddhan extended from the Kosi in Purneah to Burmaputra, and from the Ganges to the Hills—(Westmacott.)

পূর্ব্ব ৪৪ সীমান্তে "কামরূপ, আসাম ৪৫ ও ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্য অবস্থিত। হিয়োন-সাঙ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের পরিধি অনূ্যন ৬৬৭ মাইল লিখিয়াছেন। মোগল সম্রাট-আকবরের অধিকার-কালে তাহার রাজস্ব সংক্রান্ত সুপারগ মন্ত্রী রাজা তোড়ল মল্ল বাঙ্গলা উনবিংশ সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একটু বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে তন্মধ্যে তাজপুর, পাঁজরা, ঘোড়াঘাট ও বারবকাবাদ (সন্তোষ) প্রভৃতি ৪টী সরকার পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের এক একটী অংশ মাত্র।

হিয়োনসাঙ বলেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে ২০ টী মঠ, কিন্তু দেবমন্দিরের সংখ্যা তাহার পঞ্চগুণ অধিক অর্থাৎ ১০০ শত। রাজধানীর সন্নিকর্ষে মহারাজ অশোকের একটী স্তুপা ও ইহার ৩।৪ মাইল দূরে "পুষ্পাশ্রম" নামক একটী বিখ্যাত মঠ ছিল। হিয়োনসাঙের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ বোধ হয় বাঙ্গলায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের জ্যোতি সর্ব্বতোভাবে বিকসিত হয় নাই। শ্রীধর্ম্মাশোকের সময়েও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী জনৈক (নিগ্রন্থা) পণ্ডিত এক খানি চিত্রপটে নিজ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া, সেই মূর্ত্তির পদতলে ভগবান সাক্যসিংহের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া, সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন। সত্য বটে পাল রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা হিন্দু দেব দেবীর সেবা পূজার জন্য ভূমিদান ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। (৪৬) হিয়োনসাঙের ভারত ভ্রমণ সময়ে কোন্ বংশীয় নরপতি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন সিংহাসনের গৌরববর্দ্ধন করিতেছিলেন, তাহার নির্ণয় নাই। পাল বংশের অভ্যুদয় ইহার পরবর্ত্তী অনুমিত হয়।

হিয়ানসাঙ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যটী মধ্য ভারতের অন্তর্গত লিখিয়াছেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বাসীগণ গৌরবর্ণ। ইহাদের চরিত্র সৎ, পূর্ব্বভারতবাসীদিগের ভাষার সহিত ইহাদের ভাষা পৃথক, ইহাদের আচার ব্যবহারও সম্পূর্ণ পৃথক। বাঙ্গলার অন্যান্য প্রদেশ, কামরূপ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি লইয়া হিয়োনসাঙের "পূর্ব্বভারত" সংগঠিত হইয়াছিল।

কামরূপ।

(Kia-mo-leu-po-)

পরিব্রাজক হিয়োন সাঙ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কিঞ্চিদধিক ১৫০ মাইল (৯০০ লি) গমন

---

৪৪ তারানাথের গ্রন্থের যে অনুবাদ অংশ অবলম্বন করিয়া আমরা এতদ্বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে "কামরূপ, আসাম ও ত্রিপুরা," পৌণ্ড্রাজ্যের উত্তর দিকস্থ রাজ্য লিখিত আছে। অনুবাদের অনুবাদ ভ্রমশূন্য নহে, এ বিবেচনায় আমরা "উত্তরের" পরিবর্ত্তে উত্তর পূর্ব্ব লিখিলাম এবং ইহাই সঙ্গত।

৪৫ জাতীয় নাম "আহুম" অর্থ অসম। অসম হইতে আসাম নামের উৎপত্তি।

৪৬ পাল বংশীয়দিগের সম্বন্ধে আমাদের অনেক বলিবার আছে। তাহা প্রবন্ধান্তরে অবতারিত হইবে।

করিয়া কামরূপ রাজধানী প্রাপ্ত হন্। ৪৭ পথিমধ্যে তাঁহাকে একটী বৃহৎ নদী অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কনিংহাম সাহেব বলেন, পরিব্রাজক পৌণ্ড্‌বর্দ্ধন হইতে উত্তর দিকে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু হিয়োনসাঙের পথপ্রদর্শক চীনদেশীয় প্রাচীন ভারত মানচিত্রে দৃষ্ট হইতেছে, পরিব্রাজক প্রায় পূর্ব্বাভিমুখেই গমন করিয়াছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলীও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। কনিংহাম সাহেব বলেন,—"কামরূপের রাজধানী গোহাটী প্রাচীন কিন্তু চীন পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ যখন কামরূপে উপনীত হন, সে সময়ে "কোমতাপুর" নামক বিখ্যাত নগরে সেই দেশের রাজপাট সংস্থাপিত ছিল। পর্য্যটক যে স্রোতস্বতী অতিক্রম করেন; তাহা "তিস্তা" ব্রহ্মপুত্র নহে। বিজ্ঞবর কনিংহাম সাহেবের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমরা বলিতেছি তিনি ভ্রমে পতিত ৪৮ হইয়াছেন। হিয়োন সাঙের ভারতভ্রমণের অন্যূন ছয় শত বৎসর অন্তে "কোমতাপুর" রাজা নীলধ্বজ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছিল। নীলধ্বজের পৌত্র নীলাম্বরের রাজ্যশাসনকালে ৯০৩ হিজিরি শকে (১৪৯৮ খৃঃ অঃ) গৌড়েশ্বর হুসন সাহ কোমতাপুর ধ্বংশ করিয়াছিলেন। কোমতারাজবংশের অধঃপাত দ্বারা কুঁচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশের আদি পুরুষ বিশ্বসিংহের মাতামহ হাজুর রাজ্য সংস্থাপনের উপায়দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এই সকল ঘটনা যবন ও আসাম দেশীয় ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। কোমতাপুর সংস্থাপনের সময় অবধারণ করিতে গিয়া প্রতি পুরুষে গড়ে ২০।২৫ বৎসরের স্থলে ১০০ বৎসর ধরিয়া ১৪৯৮ হইতে তিন পুরুষে ৩০০ বৎসর বিয়োগ করিলে ও আমরা ঐ ঘটনা ১১৯৮ খৃস্টাব্দের পূর্ব্বতন বলিয়া কোন ক্রমেই নিরূপণ করিতে পারি না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের বিবেচনায় শকাব্দার চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোমতাপুর নগরী সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব আমরা লিখিতে পারি হিয়োনসাঙ নিশ্চয়ই নদরাজ লৌহিত্য ৪৯ অতিক্রম করিয়া গোহাটী

৪৭ এস্থলে আমরা বিজ্ঞবর উইলসন ও তন্মতাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে আর একটী কথা না বলিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। বর্দ্ধমানকে পৌণ্ড্‌বর্দ্ধন ধরিয়া লইলে হিয়োনসাঙ সমসূত্রে রেখায় ৩০০ মাইল গমন করিয়াও কামরূপ রাজধানী প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

৪৮ কনিংহাম সাহেব পশ্চাৎভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে তিনি প্রমাদমার্গে পাদবিক্ষেপ করেন নাই। তিনি সেই সময় লিখিয়াছেন— The distance mentioned by Hewon-Thsang points to the neighbourhood of Gohati as the position of the capital—

J-A-S-B XV part II page 40.

৪৯ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ব্রহ্মপুত্রের নাম "লৌহিত্য" লিখিত। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। কামরূপের বর্ণন স্থলে

নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান গোহাটী প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ পুরের একটী অংশমাত্র ৫০। নরক নরপতির অধিকার হইতে কোমতেশ্বরদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বাবধি কামরূপের রাজাসন অটল ভাবে গোহাটীতে সংস্থাপিত ছিল। তাহার প্রাচীন উন্নতির চিহ্ন অদ্যাপি ভূগর্ভে সমাহিত রহিয়াছে। গোহাটী, বর্দ্ধনকোটের কিঞ্চিৎন্যূনাধিক ১৫০ মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। বর্দ্ধনকোট হইতে ঠিক উত্তর দিকে গমন করিলে পরিব্রাজক সিকিমস্থ তামলং নগরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব ভাগে উপনীত হইতেন। বর্দ্ধন কোট হইতে কোমতাপুর ৭৫ মাইল অপেক্ষা দূরবর্ত্তী হইবে না। অদ্যাপি কোমতাপুরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত ডাক্তর বকলন এই নগরের পরিধি ১৯ মাইল নির্ণয় করিয়াছেন। তাহার মতে চৈনিক প্রথানুসারে কোমতেশ্বরদিগের রাজপ্রাসাদ নগরের মধ্যস্থলে ছিল। এই নগর শত্রুর দুরাক্রম্য, ইহা কেবল অতীতসাক্ষী ইতিহাস আমাদিগকে বলিতেছে এমত নহে। ৫১ কোমতেশ্বরদিগের "শ্মশানক্ষেত্র" দর্শন করিলে অদ্যাপি প্রাচীন বাঙ্গালিদিগের বীরত্ব স্মৃতির নেত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোমতাপুর দর্লানদীর পূর্ব্ব তীরে। দর্লা একটী উপনদী ; আসামের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া (কুঁচ) বিহার নগরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া মহাল "ভিতরবন্দ"কে "বাহেরবন্দ" হইতে পৃথক রাখিয়া, বাগুয়া নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

হিয়েনসাঙের ভ্রমণকালে কুমারভাস্কর বর্ম্মা কামরূপ শাসন করিতেছিলেন। পরিব্রাজক বলেন "এই নরপতি ব্রাহ্মণ-কুলজ ও নারায়ণ হইতে উৎপন্ন। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ কুমার উপাধির সহিত প্রায় সহস্রাব্দাবধি কামরূপ রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন।" কনিংহাম সাহেব বলেন, "ব্রাহ্মণ-বংশজ ভাস্করবর্দ্ধা গোঁড়া বৌদ্ধ। তিনি ৫৬৫ শকাব্দে চক্রবর্ত্তী হর্ষবর্দ্ধনের সহিত ধর্ম্মোৎসবে. পাটলীপুত্র হইতে কানাকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। ৫২

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—"অত্রাস্তি নদরাজোয়ং লৌহিত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।' কবিচূড়ামণি কালিদাস লিখিয়াছেন "বিজয়ী রঘু লৌহিত্য পার হইলে প্রাগজ্যোতিষেশ্বর কম্পিত হইলেন।" (চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন প্রাগজ্যোতিষেশ্বরঃ।) আফ্রিকা দেশীয় পর্য্যটক ইবন বতোতিয়া ব্রহ্মপুত্রকে "নীলনদ" লিখিয়াছেন।

৫০ The modern Gowhati is on the sovthbank ; but the ancient capital called Prazjoitishpore occupied a vast area on both banks (Col. E. T. Dalton C. S. I.) গুৱাহাটীক পুরাণত প্রাগ্জ্যোতিষ পুর বোলে।" (আসামিভাষা)

বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া প্রণীত, আসাম বুরঞ্জী, ৬ পৃষ্ঠা।

৫১ হুসন সাহার কোমতাপুর অধিকার কেবল চক্রান্ত ও কৌশলমূলক। ইহা যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

৫২ Cuningham's ancient Geography of India 1 page 501.

কিন্তু কাওয়েল সাহেবের অনুবাদ ইহার সহিত সম্পূর্ণ বিসংবাদী। তিনি বলেন,—"কামরূপবাসীগণ বৌদ্ধ নহে। এই রাজ্যে একটীও মঠ নাই। ৫৩ কিন্তু শত শত দেবমন্দির দৃষ্ট হয়। রাজা ব্রাহ্মণ, নাম ভাস্কর বর্মা, উপাধি কুমার। তিনি সৌগত না হইয়াও হিয়োনসাঙকে সম্মান ও আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।" ৫৪ পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তর শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর স্বয়ং ফরাসী পণ্ডিত জোলিয়ানকৃত হিয়োন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমাকে যেরূপ বুঝাইয়াদিয়াছেন, তদ্দ্বারা কাওয়েল সাহেবের লিখার অধিকাংশ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

হিয়োনসাঙ বলেন—এই রাজ্যের ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বর। কাঁঠাল ও নারিকেল এস্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অধিবাসীগণও এই দুইটী ফলের বড় আদর করে। এই রাজ্যের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর। অধিবাসীগণ খর্ব্ব, কৃষ্ণবর্ণ, বলবান ও ভীষণদর্শন। কিন্তু ইহারা সচ্চরিত্র ও বিদ্যোৎসাহী, ইহাদের ভাষা মধ্যভারত হইতে পৃথক। কামরূপেশ্বর ও তাঁহার প্রজাবর্গ সকলেই (হিন্দু) দেবোপাসক। এই রাজ্যে একটী মাত্র মঠ আছে। শ্রমণগণ তাহাতে যাইয়া বুদ্ধের উপাসনা করেন। রাজা অতি সচ্চরিত্র, তিনি বিধর্ম্মী বলিয়া ইহাদের প্রতি কোন অত্যাচার করেন না। অত্রত্য শ্রমণগণ নালন্দায় যাইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। অত্রত্য হিন্দুগণও বুদ্ধদেবকে মান্য করেন।

পরিব্রাজক বলেন—কামরূপের রাজধানীর পরিধি ৩০ লি (৫—৬ মাইল।) রাজ্যের পরিধি ১০০০০ লি (১৬৬৬—২০০০ মাইল) আমাদের প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের মতে—এই রাজ্য শত যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিকোণ। ৫৫ হিয়োনসাঙ বলেন "কামরূপ রাজ্যের পূর্ব্ব সীমান্তে চৈনিক "সু" জাতি বাস করে। রাজধানী হইতে সীমান্ত প্রদেশে গমন করিতে দুই মাসের প্রয়োজন। পথ অতি দুর্গম। কামরূপের পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমান্ত বন্য হস্তীতে পূর্ণ।

সমতট।

(San-mo:ta-cha)

হিয়োনসাঙ কামরূপ হইতে ১২০০—১৩০০ লি (২০০—২৬০ মাইল) দক্ষিণ দিগভিমুখে গমন করিয়া সমুদ্র তীরবর্ত্তী রাজধানী সমতটে উপনীত হন। "সমতট" প্রাচীন বঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছুই অনুমান করা যাইতে পারে না। তবে "সমতট" নামটী কোথাহইতে আসিল? প্রাচীন গ্রন্থ রামায়ণে বঙ্গের উল্লেখ আছে। কিন্তু মহাভারতে "বঙ্গ" বিশদরূপে পরিচিত। তৎ-

৫৩ প্রকৃত পক্ষে একটী মাত্র মঠ ছিল।

৫৪ Elphinstone's History of India, (Cowels 6th ED.) page 294.

৫৫ করতোয়াং সমাসাদ্য যাবৎ শিখর বাসিনীং, শতযোজনবিস্তীর্ণং ত্রিকোণং সর্ব্বসিদ্ধিদং।

(তন্ত্র চূড়ামণি, পীঠ নির্ণয়।)

পর ঊনবিংশ শতাব্দী অতীত হইলে কালিদাস গঙ্গা ও লৌহিত্যের স্রোতোমধ্যবর্ত্তী দ্বীপ পুঞ্জময় দেশকে বঙ্গ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ৫৬ শালিবাহন-প্রচলিত অব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে "সমতট' নামের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রয়াগনগরে গুপ্ত বংশীয় চতুর্থ নরপতি "মহারাজ অধিরাজ শ্রীসমুদ্র গুপ্তের " ৫৭ যে "লাট" প্রস্তর আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে "সমতট "আড়বক্র" "কামরূপ" "নেপাল" ও "ত্রিপুরা" প্রভৃতি প্রত্যন্ত নরপতিগণকে সম্রাটের করদ শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। ৫৮ বৃহৎ সংহিতা প্রণেতা বরাহমিহির "সমতট" নামটী জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু তিনি সমতটকে বঙ্গ হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। ৫৯ কোলব্রুক সাহেবের মতে

---

৫৬ বোধ হয় কালিদাস পৌণ্ড্র ও তাম্রলিপ্তকে বঙ্গ হইতে পৃথক করেন নাই। তিনি কামরূপ, সুহ্ম (ত্রিপুরা) ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জময় দেশকে সাধারণত বঙ্গ আখ্যাদান করিয়াছেন।

৫৭ আমরা সমুদ্র গুপ্তকে দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক বিবেচনা করি। প্রফেসার লাসেনের মতে ইনি ২৩০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। কনিংহাম সাহেব প্রথমত বলেন যে ইনি ৩৮০ খৃঃঅঃ জীবিত ছিলেন। (I. A. S. B. XXX. 146.) কিন্তু তাহার মতের স্থিরতা নাই; কারণ তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন যে সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। (J. A. S. B. XXXIV 1. 221.)

৫৮ 'সমতটাড়বক্র কামরূপ নেপাল কত্রিপুরাদি * প্রত্যন্ত নৃপতিভি র্মালবার্জ্জুনায়ন যৌধর মাদ্রকাভীর প্রার্জ্জুন সনকানীক কাকখর পরিকাদিভিশ্চ সর্ব্বকরদানাজ্ঞাকরণ প্রণামোগমন।" লোট প্রস্তাবের ১৯ পংক্তি। See J. A. S. B. V1. 971. and the Pholozinograph of the plate পুরাতত্ত্বজ্ঞ মৃত মহাত্মা প্রিনসেপ সাহেব ভ্রমক্রমে "সমতটাড়বক্র" হইতে "সমতা" ও "তরবক্র" দুইটী অসংলগ্ন নাম পাঠ করিয়াছেন।

* প্রিনসেপ সাহেব "কর্ত্তৃপুরাদি" পাঠোদ্ধার করিয়া মন্তব্য স্থলে ইহাকে "ত্রিপুরা'ই স্থির করিয়াছেন।

(৫৯) বৃহৎ সংহিতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়টী ভারতের প্রাচীন ভূগোল বিবরণ। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর কর্ণ (Dr. Kern.) লিখিয়াছেন, Interesting for the Geography of India is an entire chapter which Varaha mihera, only changing the form, but leaving the matter almost in tact has given in the 14th chap of the Brh. sanheta, উক্ত অধ্যায়ে বরাহ মিহির ভারতবর্ষ নয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা মধ্য, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, অগ্নি, বায়ু, নৈঋত। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্লোকে পূর্ব্ব ভাগস্থ দেশ সমূহের নাম। তন্মধ্যে লৌহিত্য তীরস্থ প্রাগ জ্যোতিষ ও খস পর্ব্বত হইতে বাঙ্গালা বিহারের কতক অংশ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশ সকল লইয়া পূর্ব্বভাগ হইয়াছিল। "সমতট" ইহার অন্তর্গত। মিথিল সমতটোড়্রাশ্ববদনদন্তুরকাঃ। ৬ শ্লোকের দ্বিতীয়চরণ।) অষ্টম, নবম ও দশম শ্লোকে পূর্ব্ব দক্ষিণ (অগ্নি কোণ) বিভাগস্থ দেশ সমূহের নাম। এই বিভাগে বঙ্গের নাম দৃষ্ট হয়। (কলিঙ্গ বঙ্গোপবঙ্গ জঠরাঙ্গাঃ। ৮ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ।) এই

বরাহমিহির ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে (৩৬০০ কলি-গতাব্দে ৪২১ শকাব্দে) জীবিত ছিলেন।(৬০) ডাক্তার হণ্টারের অনুমোদিত উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে বরাহ মিহির ৪২৭ শকে (৫০৫—৬ খৃঃ অঃ) জীবিত ছিলেন। (৬১) ডাক্তর ভাঁওদাজীর মতে বরাহ মিহির ৫৮৭ খৃষ্টব্দে জীবলীলা সংবরণ করেন। (৬২) ভাওদাজী অমর রাজের মতানুসরণ করিয়াছেন এবং আমাদের বিবেচনায় ইহাই সঙ্গত। (৬৩) এতাবতা স্থির হইতেছে যে বরাহ মিহির, হিয়োনীসাঙের ভারতে পঁহুছিবার ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে জীবালীলা সংবরণ করেন। (৬৪) শকাব্দের দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীতেও আমরা "সমতটের" অস্তিত্ব অবগত হইতেছি। তৎপর ষষ্ঠ শতাব্দীতে আমরা চৈনিক পরিব্রাজক হইতে সমতট নাম শ্রবণ করিতেছি। শকাব্দের নবম শতাব্দীতেও "সমতটের" অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ভাগলপুরে গৌড়েশ্বরনারায়ণ পালের যে তাম্রফলক আবিষ্কৃত হয়, শ্রদ্ধাস্পদ রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। সেই শাসন-খোদকের জন্মভূমি সমতট বলিয়া লিখিত হইয়াছে; "শ্রীমতা মদ্য দাসেন শুভ দাসস্য সূনুনা। ইদং শাসনমুৎকীর্নং সৎ সামতট জন্মনা॥" রাজেন্দ্র বাবুর মতে নারায়ণ পাল ৯৩৫ খৃঃ অঃ (৮৫৭ শকাব্দ) জীবিত ছিলেন। তৎপর খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিনহাজ সিরাজ বাঙ্গালার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেন। তিনি স্বীয় "তবকতই নসরি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিলে রায় লক্ষ্মণ সেন দেব সমতট (সকনট ৬৫) বঙ্গাভি মুখে পলায়ন

ভাগ গুলি যে ভ্রম প্রমাদ হইতে এক কালে বিমুক্ত তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ উড়ু দেশ পূর্ব্ব বিভাগে সন্নিবেশিত করিয়া বঙ্গ উপবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যগুলি পূর্ব্ব দক্ষিণ বিভাগে সন্নিবেশিত করা নিতান্তই ভ্রমের কার্য্য।

৬০ Colebrook's Algebra of the Hindoo's page XLIV.

৬১ Colebrook's Essay's Vol II page 461.

৬২ Journai, Royal, As Society (N. S.) Vol I art XIV pape 408.

৬৩ ব্রহ্ম গুপ্ত প্রণীত খণ্ডখাদ্যের টীকায় অমররাজ লিখিয়াছেন,—"নবাধিক পঞ্চশত সংখ্য শাকে বরাহ মিহিরাচার্য্যোদিবং গতঃ।"

৬৪ পাঠকগণ এস্থলে বিস্মিত হইতে পারেন যে আমরা বরাহ মিহিরকে কালিদাসের পরবর্ত্তী লিখিলাম। কিন্তু যদি কোন পাঠক "রঘুবংশ" ও "বৃহৎসংহিতা" অবলম্বনে দুই খানি ভারত-ভূগোল রচনা করিয়া পরস্পর তুলনা করেন, তবে আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, তিনি অবশ্য আমাদের মত পোষণ করিবেন। এই দুই খানি গ্রন্থ কখনই ভারতের এক সময়ের চিত্রপট নহে।

৬৫ তবকত ই নসরির ইংরেজি অনুবাদক মেজর রেভার্টি ও ইলিয়ট সাহেব লিখিয়াছেন যে হস্তলিখিত গ্রন্থ গুলিতে এই নামের সমতা পরিলক্ষিত হয় না, কোনটীতে "সকনট" কোনটীতে "সনকট"

করেন। তৎপর আর আমরা সমতটের নাম শুনিতে পাই নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এইক্ষণও বলিতেছি যে চৈনিক পরিব্রাজক রাজধানীর নাম দ্বারা রাজ্যের নামকরণ করিয়াছেন। সেন রাজগণ ইহাকেই বিক্রমপুর আখ্যাদান করেন। সেন বংশের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইলে বিক্রমপুর "রাজপুর" নামে খ্যাত হইয়াছিল। অধুনা এই স্থানটী "রামপাল" নামে পরিচিত। (৬৬) রামপাল, ঢাকার প্রায় ৮ মাইল দূরে, ধলেশ্বরী নদীর তীরস্থ "রিকাবি বাজার" ও "ফেরিঙ্গি বাজারের" নিকটবর্ত্তী। গৌহাটী হইতে রামপালের দূরতা অনধিক ২২০ মাইল হইবে। ঢাকা (প্রাচীন বঙ্গ) বিভাগ লইয়া যে প্রাচীন হিয়োনসাঙের সমতল রাজ্য সংগঠিত হইয়াছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ফারগিউসন সাহেব, সমতট পার্ব্বত্য রাজ্য বিবেচনায় ত্রিপুরাও তদন্তঃপাতী লিখিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই উক্তি পোষণ জন্য সমুদ্র গুপ্তের প্রস্তর ফলকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ফারগিউসন সাহেব, প্রিনসেপ সাহেবের প্রদর্শিত ভ্রমমার্গে পাদ বিক্ষেপ করিয়াছেন। (৬৭) ত্রিপুরা চিরস্বতন্ত্র রাজ্য, সমতটের অধীন নহে।

পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ সমতট রাজ্যের পরিধি ৫০০—৬০০ মাইল (৩০০০ লি) লিখিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় আধুনিক নদীয়া, ২৪ পরগনা, কলিকাতা, সুন্দরবন, যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ঢাকার কিয়দংশ লইয়া সমতট রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেন বংশের বিভাগ অনুসারে "বঙ্গ" ও বাগ্‌ড়ি" ইহার অধীন। কনিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন—ভাগীরথী ও

কোনটীতে "সনকনট" ইত্যাদি ইত্যাদি লিখিত রহিয়াছে। বোধ করি সমতটই "তিন নকলে আসল খাস্ত" হইয়া গিয়াছে। ইহা যে সম্ভব ও বিশ্বাসযোগ্য অনুমান তাহা অপভ্রংশ নামটী পাঠ করিলেই বোধ হইবে একটী বিন্দুর (নকতা) দ্বারা পারস্যভাষায় অর্থের ও শব্দের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

৬৬ আমরা আধুনিক "রামপাল" (বা বল্লালবাটী) নামক স্থানই "সমতট" নির্দ্দেশ করিলাম। অন্যান্য পণ্ডিত মণ্ডলীও ঢাকা ও সুবর্ণগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে "সমতটের" স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এক মাত্র কনিংহাম সাহেব যশোহর নগরী অনুমান করেন। তিনি বলেন, "তাম্রলিপ্ত হইতে ইহার দূরতা গণনা করিলে, হরিণঘাটা নদীর তীর হইতে বাখরগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে এই রাজধানী ছিল এরূপ অনুমিত হয়।"

৬৭ বিজ্ঞবর প্রিনসেপ সাহেব, সমুদ্র গুপ্তের প্রস্তর ফলকের উনবিংশ পংক্তির "প্রত্যন্ত নৃপতি" পদের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"The kings of the neighbouring hilly countries." "প্রত্যন্ত" শব্দের "পার্ব্বত্য" অর্থ সঙ্গত নহে। "প্রত্যন্ত" শব্দের অর্থ—(বিশেষ্যে) ম্লেচ্ছ দেশ, (বিশেষণে) প্রান্তবর্ত্তী হইয়া থাকে। অতএব "প্রত্যন্ত নৃপতি" পদের ম্লেচ্ছ দেশাধিপতি কিম্বা প্রান্তবর্ত্তী দেশাধিপতি অর্থই বিশুদ্ধ ও সঙ্গত।

পদ্মার মধ্যবর্ত্তী "ব" কারাকৃতি প্রদেশই প্রাচীন "সমতট রাজ্য"। আকবর বাদসাহের সময়ে এই "ব" কার প্রদেশ ৫টী সরকারে বিভক্ত ছিল।

হিয়োনসাঙ বলেন "সমতটবাসীগণ খর্ব্বকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর কিন্তু বিদ্যোৎসাহী। এই রাজ্যে ৩০টী মঠ আছে, তাহাতে প্রায় ২০০০ সহস্র বৌদ্ধ স্থবির বাস করেন। দেব মন্দিরের সংখ্যা এক শত। হিন্দুগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে নিগ্রর্ন্থ সম্প্রদায়ীর সংখ্যাই সর্ব্বাধিক।

বঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানগুলি বাণিজ্যোন্নত, সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও জনপূর্ণ ছিল। হিয়োনসাঙ যদিও সমতট প্রভৃতি (বঙ্গ দেশস্থ) রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন; তথাপি তাহার শত বৎসরের কনিষ্ঠ আরব দেশীয় পর্য্যটক সুলেমানের সাক্ষ্যে আমাদের উক্তির সত্যতা পোষণ করিতেছে। ক্রমাগত ঝড় ও জলপ্লাবনে দক্ষিণ বঙ্গের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রতীরবর্ত্তী সম্পন্ন অবশিস্ট নগর গুলির চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

শকুন্তলা সমালোচনার সমালোচনা।

মিরান্দার সহিত শকুন্তলার তুলনা করিয়া বঙ্কিম বাবু শকুন্তলাকে কেমন নীচু করিয়াছেন তাহা গত বারে দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই, তিনি আর একবার শকুন্তলাকে তৌল করিয়া দেখিয়াছেন যে, দেস্‌দেমোনা অপেক্ষা শকুন্তলা ওজনে অনেক কম। কিন্তু তাঁহার তুলা-যন্ত্র যে ঠিক—তাহা যে একদিক্ ঝোঁকা নহে ইহা আমরা বলিতে সাহস করি না। বঙ্কিম বাবু শকুন্তলাকে এই বলিয়া দোষ দিয়াছেন যে, সে দুষ্মন্ত-কর্ত্তৃক সহস্র অপমানিত হইয়া থাকিলেও তাঁহাকে অনার্য্য সম্বোধন করিয়া যে ভৎর্সনা করিয়াছিল সে-টি তাহার ভাল কাজ হয় নাই; দেস্‌দেমোনাকে ত অনেক ভাল বলিতে হইবে যে, ওথেলো তাহাকে যার পর নাই কটূক্তি ও অপমান (চপেটাঘাত পর্য্যন্ত) করিতে ক্রটি করে নাই অথচ দেস্‌দেমোনা সমস্তই অকাতরে সহ্য করিয়াছিল; ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, শকুন্তলার প্রেম স্বল্প-প্রাণী—একটু আঘাত সহ্য করিতে পারে না, দেস্‌দেমোনার প্রেম অন্তঃসারে পরিপূর্ণ, সুতরাং উহা অপেক্ষা ইহা উচ্চ অঙ্গের বস্তু। বঙ্কিম বাবুর এ বিচারটি কেমন—না একই রকমের জল যদি দুইটি

কাচ-পাত্রে রাখা হয়, আর যদি একটি কাচ-পাত্র শুভ্র ও অপরটি কালো হয়, তবে কালো কাচ-পাত্র-স্থিত জল দেখিয়া বিচারক-মহাশয় বলিতে পারেন যে, ও জল অপেক্ষা এ জল অতীব অপরিষ্কার—ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; অপরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইবে না কেন—কাচ-পাত্র যে কালো, জলের কি দোষ? শকুন্তলা দুষ্যন্তকে প্রাণ-তুল্য ভাল বাসিত তবুও তাঁহাকে অনার্য্য সম্বোধন পূর্ব্বক ভৎসনা করিয়াছিল—করিবে না কেন? দুষ্যন্ত রাজা কি তখন দুষ্যন্ত রাজা ছিলেন—শকুন্তলার চক্ষে তিনি যে পিশাচ অপেক্ষাও অধম হইয়াছিলেন,—হইয়াছিলেন যে, সে দৈবের বিপাকে—শকুন্তলার কি দোষ? কিন্তু ওথেলো দেস্‌দেমোনার প্রতি যেরূপ কুব্যবহার করিয়াছিল তাহাকে পিশাচবৎ ব্যবহার—কদর্য্য নীচ ব্যবহার—বলিয়া কাহারো মনে হইতে পারে না, এই শুধু মনে হইতে পারে যে, এ খাম-খেয়ালি লোকের মত ব্যবহার—পাগলের মত ব্যবহার—বড় জোর নয় গোঁয়ারতামি ব্যবহার; ওথেলোর রকম সকম দেখিয়া হঠাৎ এক জন লোক বলিতে পারে যে, "এ ব্যক্তি বলে কি, কয় কি, করে কি, এ লোকটার দেকৃচি মাথার ঠিক নেই।" যথা,

Lodovico. * * How does lieutenant Cassio?
Iago. Lives, sir.
Desdemona. Cousin, there's fallen betwoen him and my lord
An unkind breach: but you shall make all well.
Othello. Are you sure of that?
Desdemana. My Lord?
Othello. (*Reading*) "This fail you not to do, as you will—"
Lodovico. He did not call: he's busy in the paper.
Is there division, twixt my lord and Cassio?
Desdemona. A most unhappy one: I would do much
To atone them, for the love I bear to Cassio.
Othello. Fire and brimstone!
Desdemona. My lord?
Othello. Are you wise?
Desdemona. What, is he angry?
Lodovico. May be, the letter moved him;
For, as I think, they do command him home,
Deputing Cassio in his government.
Desdemona. Trust me, I am glad on't.
Othello. In deed?
Desdemona. My lord?
Othello. I am glad to see you mad.

Desdemona. How, Sweet Othello?

Othello. Devil! [*striking her*]

ওথেলোর এই রূপ ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের মনে কি রূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাহা নিম্নে দেখা যাইতেছে।

Lodovico. 'Are his wits safe? [is he not light of brain?

... ...

Is it his use?

Or did the letters work upon his blood,

And new-create this fault?

দেস্‌দেমোনা নিজে কিরূপ ধন্দে পড়িয়াছিল তাহা দেখা যাউক্।

Othello. Pray, chuck, come hither.

Desdemona. What is your pleasure?

Othello. Let me see your eyes; Look in my face.

Desdemona. What horrible fancy's this.

... ...

Upon my knees what doth your speech import?

I understand a fury in your words,

But not the words.

... ...

Othello. O Desdemona! away! away! away!

Desdemona. Alas the heavy day;—Why do you weep

Am I the occasion of these tears, my lord?

If, haply, you my father do suspect

An instrument of this your calling back,

Lay not your blame on me.

ইহাতে কি প্রকাশ পাইতেছে? বিকারগ্রস্ত স্বামীর প্রলাপ বাক্য শুনিয়া কোন্ স্ত্রী তাঁহাকে ভৎসনা করে,—ওথেলোর কথার রকম-সকম দেখিতে শুনিতে কি ঠিক প্রলাপের মত নহে? তাহাতে দেস্‌দিমোনার মনে ক্রোধের উদয় হওয়া দূরে থাকুক দুঃখেরই উদ্রেক হইতে পারে ও তাহাই হইয়াছে;—দেস্‌দেমোনার মনে হইয়াছিল—"হয় ত কি একটা অশুভ সংবাদ আসিয়াছে তাই ওঁর মন খারাপ হইয়া গিয়াছে, আর কিছু নয়, আমার পিতা শক্রতা করিয়া যাহাতে উনি অপদস্থ হ'ন তাহার কোন একটা কুচক্র করিয়াছেন;" ইহাতে দেস্‌দেমোনার মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইতে পারে—এই যা,'—ক্রোধ হইবে কেন? কিন্তু শকুন্তলাকে দুষ্যন্ত কেমন ধীর গম্ভীর হাস্যরসাত্মক ভাবে ঠিক ঠাক্ কথার উত্তর দিয়া—বাক্য-ছুরিকার উপর বাক্য-ছুরিকা চালনা করিয়া—অম্লানবদনে অব্যথিত-হৃদয়ে অবিচলিত-চিত্তে তাহার মর্ম্ম নিকৃন্তন করিয়াছেন; ইহাতে শকুন্তলা দুষ্যন্তকে উন্মাদও মনে করিতে পারে না—দৈব-গতিকে দুষ্যন্তের মনোমধ্যে

সহসা কোন বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে ইহাও মনে করিতে পারে না; এই কেবল মনে করিতে পারে যে, "অত বড় রাজার এমন ধারা কদর্য্য মন! সমস্তই জানিতেছেন অথচ এমনি ভান করিতেছেন যেন কিছুই জানেন না! আমি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া হরিণ শিশুর কথাটি পর্য্যন্ত স্মরণ করাইয়া দিলাম, তাহাও অরণ্যে রোদন হইল—রাজার ভালবাসাকে ধিক্!" শকুন্তলার ইহাই মনে হইতেছে যে, দুষ্যন্ত পূর্ব্বে তাহাকে এত যে ভালবাসা জানাইয়াছিলেন সমস্তই মৌখিক, তাহা কেবল আপন অভীষ্ট সাধনের উপায়, তা' ভিন্ন আর কিছুই নহে। যতক্ষণ শকুন্তলার মনে রাজার স্মৃতি-ভ্রংশ মাত্র আশঙ্কা হইয়াছিল ততক্ষণ তাহার কেবল দুঃখই হইয়াছিল যথা,

"ইমং অবত্থন্তরং গদে তারিসে অণুরাএ কিংবা সুমরাবিদেন। অত্তা দাণিং মে সোঅণীও ববসিদং।"

কিন্তু যখন সে মনে করিল যে, দুষ্যন্ত তাহাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছেন, তখনই তাহার সতী-সুলভ তেজ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। শকুন্তলার মত ওরূপ অবস্থায় পড়িলে দেস্‌দেমোনা যদি ওথেলোকে ভৎর্সনা না করিত তাহা হইলে বুঝিতাম বটে,—বুঝিতাম যে তাহার এমনি গণ্ডার-চর্ম্মী প্রেম যে কোন ছুরিকাঘাতই তাহাকে চেতাইতে পারে না; অথবা প্রেমই নাই আঘাত লাগিবে কিসে,—শিরোনাস্তি শিরঃ পীড়া।

ওরূপ মর্ম্মান্তিক আঘাতে স্ত্রীলোকের ভালবাসা যে একেবারেই ধ্বংস হইয়া যায় তাহা নহে,—তবে এই হয় যে, ভালবাসার পাত্রের নীচত্ব-দোষ সেই ভালবাসাতে সংক্রমিত হওয়াতে সেই ভালবাসার প্রতি ধিক্কার জন্মে—তেমন অযোগ্য পাত্রের উপর ভালবাসাকে কখনও সে মনে স্থান দিয়াছিল বলিয়া নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মে; আর ভালবাসার এই রূপ যে একটা দারুণ অপমান ইহাতে করিয়া মনে এমনি এক অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয় যে, তাহা আর সকল মনোবৃত্তিকে ছাপাইয়া উঠিয়া সমস্ত মনো-রাজ্য অশ্রুজলে উতপ্লুত করিয়া ফেলে; এরূপ অবস্থায় প্রেমের যে একটি স্বাভাবিক সৌকুমার্য্য তাহা চলিয়া যায়; প্রেম মহাপ্রলয়ের রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করে—গৌরী মূর্ত্তি কালী মূর্ত্তিতে পরিণত হয়।

ওথেলো ডেস্‌ডেমোনাকে বধ পর্য্যন্ত করিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার ভালবাসা অটুট ছিল; দেস্‌দেমোনাকে বধ করিবার পূর্ব্বে ওথেলো তাহাকে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাপ-মুক্ত হইতে বলিয়াছিল। ভালবাসা অতিশয় সংক্রামক বস্তু—ভিতরে ভিতরে কার্য্য করে; দেস্‌দেমোনা ওথেলোর কার্য্য দেখিয়া যদিও তাহার কোন অর্থই খুঁজিয়া পাইতে ছিল না, কিন্তু এ বিষয়ে তাহার কোন দ্বিধা ছিল না যে, ভালবাসার অভাব-বশত নহে—একটা দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ ওথেলোর মন বিকল হইয়া গিয়াছে।

বঙ্কিম বাবু একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এ রাগ, "এ অভিমান, এ ব্যঙ্গ

দেস্‌দেমোনায় নাই;" আমরা বলি ও-শ্লোকটি কালিদাসের শকুন্তলায় নাই; তবে যদি কোন বঙ্গদেশীয় পুঁথিতে থাকে তাহার জন্য কালিদাস দায়ী নহেন। বঙ্কিম বাবুর অভিপ্রায় এই যে, প্রেম ও সতীত্ব পূর্ণ মাত্রায় থাকিলে কোন অবস্থাতেই রাগ, অভিমান বা ঐ দলের আর কোন মনোবৃত্তি সেখানে ঘেঁসিতে পারে না। মনুষ্যের মন যদি এমনি একটা সহজ-পাঠ্য গ্রন্থ হইত যে, ব্যাকরণের সাদা সীধা দুই একটি নিয়ম-অনুসারে তাহার শ্লোকের অন্বয় করিলেই হইতে পারে—যদি এরূপ হইত যে, প্রেম যেখানে—সেখানে কেবল প্রেমই থাকিবে, আর কোন বৃত্তি তাহার চতুঃসীমায় স্থান পাইবে না, তাহা হইলে কবি হওয়া অতি সহজ হইত—তাহা হইলে কালিদাস সেক্‌সপিয়র পৃথিবীতে আর ধরিত না। এ বিষয়ে আর বাহুল্য না করিয়া সংক্ষেপে এই টুকু বলিলেই বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে, ডেস্‌ডেমোনা ওথেলোর মনের ব্যতিক্রম দেখিয়া তাহাকে নীচ প্রকৃতির লোক মনে করে নাই, এই পর্য্যন্ত মনে করিয়াছিল যে তাহার মনে সহসা কি এক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে—পাগলের মত হইয়াছে, ইহাতে ক্রোধ বা অভিমান বা মর্ম্মান্তিক অপমানের জ্বালা এ সকলের প্রসঙ্গই আসিতে পারে না; কিন্তু শকুন্তলা রাজার এক একটি মর্ম্মভেদী শ্লেষোক্তির জ্বলনির জ্বালায় এমনি অধীর হইয়া পড়িয়াছিল যে, শেষে সাম্‌লাইতে না পারিয়া দুষ্যন্তকে অনার্য্য-প্রভৃতি বলিয়া ফেলিল,—তাও সে এমনি সরল ও সহজ-শোভন ভাবে যে, যেমন শকুন্তলা তেমনিই তাহার রাগ-প্রকাশ—তাহার একটুও ইদিক্ উদিক্ হয় নাই।

বঙ্কিম বাবু দেস্‌দেমোনার সহিত শকুন্তলার আর একটি বিষয়ে যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন তাহাও ঠিক্ হয় নাই; সে বিষয়টি গুরুজনের প্রতি উপেক্ষা। দেস্‌দেমোনা গুরুজনের অভিপ্রায়ের নিতান্ত প্রতিকূলে ওথেলোকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল, এমন কি দেস্‌দেমোনার পিতা তাহার বিবাহ-বার্ত্তা শুনিবামাত্র একেবারে আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু শকুন্তলা কণ্ব-মুনির অভিপ্রায়ের প্রতিকূলে দুষ্যন্তকে আত্ম-সমর্পণ করে নাই—কণ্বমুনির অমত হইবে-না জানিয়াই তাহা করিয়াছিল, কণ্বমুনিও বিবাহ-বৃত্তান্ত অবগত হইবামাত্র তাহাতে অনুমোদন করিয়াছিলেন; অতএব উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অধিক না বৈসাদৃশ্য অধিক ইহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা হোক্।

কথা প্রসঙ্গে আমরা আমাদের গম্য পথ হইতে একটু সরিয়া পড়িয়াছি এরূপ মনে হইতে পারে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, আমরা নূতন একটা পথ দিয়া গম্য-স্থানের দিকে অগ্রসর হইয়াছি এই পর্য্যন্ত; এখন পূর্ব্ব-পথে প্রত্যাগমন করিয়া যত শীঘ্র পারি, যাত্রা-সমাপনের চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

ক্রমশঃ

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বাঙ্গীয় যুবকের পত্র।

গর্ম্মি কাল। আজ অতি সুন্দর সূর্য্য উঠেছে। এখন দুপর দুটো বেজেছে। আমাদের দেশের শীতকালের দুপর বেলা-কার বাতাসের মত বেশ একটি মিষ্টি বাতাস বইচে, রোদ্দুরে চার দিক ঝাঁ ঝাঁ কোরচে। এমন ভাল লাগচে, আর এমন একটু কেমন উদাস ভাব মনে আসচে যে কি বোল্‌ব। মনের Sentimental অবস্থায় যে যে লক্ষণ হোয়ে থাকে, তা' আমার সব হোয়েচে—যথা নিশ্বাস পোড়চে, একটু চুপ চাপ হোয়ে আছি, মুখটা একটু গম্ভীর হোয়ে গেছে—ইত্যাদি। কিন্তু আজকের রোদ্দুরে, গরমে, চারদিকের গাছ পালায়, বসন্তের বাতাসে, পাখীর ডাকে, যদি আমার এ রকম ভাব হোয়ে থাকে তা' হোলে কি "লোকটা দেখ্‌চি নিতান্তই কবি হোয়ে গিয়েছে" বোলে আমার একটা বদ্‌-নাম হবার সম্ভাবনা আছে? দেশে যদি আমার "কান্ত" থাক্‌ত, তা' হোলে আজ হয়ত এই দুরন্ত বসন্তে একান্ত প্রাণান্ত, ও "ন্ত" অক্ষর-বিশিষ্ট আরো অসংখ্য ঘটনা ঘোট্‌ত। এদেশে "বসন্ত" বোলে বাস্তবিক একটা পদার্থ আছে। আমাদের দেশে বসন্ত নেই কেবল বসন্ত বসন্ত কোরে বিরহীগুলো ভারি গোলমাল করে; বলে, মলয় বাতাসে তা'দের গা দগ্ধ হয়, আরে হবে না কেন? সে চৈত্রি মাসের মলয় বাতাসে সহজ মানুষের গা পুড়ে যায়, তা'দের ত তবু অনেক দিনকার একটা বাঁধা দস্তুর আছে! সেই বিরহী-গণ একবার এখানে আসুন্‌ দেখি—দেখি কেমন কোরে চন্দন আর পঙ্ক মাখেন, আর নলিনী-পত্রের বাতাস খান!

আমরা এখন Devon-Shire এর অন্তর্গত টর্কী (Torquay) বোলে এক নগরে আছি। এমন সুন্দর জায়গা আমি কখনো দেখি নি। সমুদ্রের ধারে। চার দিকে পাহাড়। অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কোয়াশা নেই, অন্ধকার নেই; চারি দিক হাস্য ময়। চারি দিকে সবুজ বর্ণ, চারিদিকে গাছ পালা, চারিদিকে পাখী ডাক্‌চে, ফুল ফুটচে। যখন Funbridge Wells এ ছিলুম, তখন ভাবতুম, এখেনে যদি মদন থাকে, তবে সে ব্যক্তি তার ফুল শর তৈরি করবার জন্যে এত ফুল পায় কোথা? অনেক বন বাদাড়, ঝোপ ঝাপ, কাঁটা গাছ হাতড়ে দু চারটে বুনো ফুল নিয়েই কাজ চালাতে হয়। কিন্তু Torquayতে মদন যদি গ্যাট্‌লিংএর কামানের মত এমন একটা বাণ উদ্ভাবন কোরে থাকে, যার থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা কোরে তীর ছোঁড়া যায়, আর

সেই বাগ দিন রাত যদি কাজে ব্যস্ত থাকে. তবু মদনের ফুল শরের তহবিল এখেনে দেউলে হবার কোন সম্ভাবনা নেই'। এত ফুল। যেখানে সেখানে, পথে ঘাটে, ফুল। ফুল মাড়িয়ে চোল্‌তে হয়। আমরা রোজ পাহাড়ে বেড়াতে যাই। গরু চোর্‌চে, ভেড়া চোর্‌চে। এক এক জায়গায়, রাস্তা এত ঢালু যে, উঠ্‌তে নাব্‌তে কষ্ট হয়। এক এক জায়গা খুব সঙ্কীর্ণ পথ, দুধারে গাছ উঠে আঁধার কোরে আছে, ওঠ্‌বার সুবিধের জন্যে জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা সিঁড়ির মতন আছে, পথের মধ্যেই লতা গুল্ম উঠেছে, ফুল ফুটে রোয়েছে। চার দিকে এমন মধুর রোদ্দুর, (হাস্‌চ কি! রোদ্দুর মধুর হোতে পারে কি না, এখেনে এসে একবার দেখে যাও দিকি!) এত অগণ্য ফুল, যে মনের মধ্যে বসন্ত জেগে ওঠে, মলয় বাতাস বইতে থাকে। এখানকার বাতাস বেশ গরম। ভারতবর্ষ মনে পড়ে। এই টুকু গরমেই লণ্ডনের প্রাণীদের চেয়ে এখানকার জীব জন্তুদের কত নির্জ্জীব ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘোড়া গুলো আস্তে আস্তে যাচ্চে, মানুষগুলোর তেমন ভারি ব্যস্ত ভাব নেই, গড়িমসি কোরে চোলেছে। আমি আজ কাল এমন আলস্য চর্চ্চায় ব্যস্ত আছি যে তোমাদের একটু ভাল কোরে চিঠি লেখ্‌বার সময় পেয়ে উঠিনে। দিনের মধ্যে তিন শো হাই উঠ্‌চে, এক একটা বই খুল্‌চি ও তার ওপরে আধ ঘণ্টা চোক বুলিয়ে দু ঘণ্টা চোক বোজবার বন্দোবস্ত কোরে নিচ্চি, দোয়াতে কলম ডুবিয়ে কালী তুলে লেখা সমুদ্র মন্থনের মত একটা ঘোরতর ব্যাপার বোলে মনে হোচ্চে, চোখের পাতা ফেল্‌তে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পরিশ্রম বোধ হোচ্চে! তুমি এখেনে এলে বড় আরামেই থাক। এখানকার মত দৃশ্য, নদীর ধার, মাঠ, পড়বার বই, গল্প করবার সময়, গান করবার নির্জ্জনতা, পর নিন্দা করবার অবসর আর যদি কোথাও আছে।

এখানকার সমুদ্রের ধার আমার বড় ভাল লাগে। যখন জোয়ার আসে, তখন সমুদ্রতীরের খুব প্রকাণ্ড পাথর গুলো জলে ডুবে যায়, তাদের মাথা বেরিয়ে থাকে। খুব ছোট ছোট দ্বীপের মত দেখায়। জলের ধারেই ছোট বড় কত পাহাড় উঠেছে। ঢেউ লেগে লেগে পাহাড়ের নীচে সব গুহা তৈরি হোয়ে গেছে; যখন ভাঁটা পড়ে যায়, তখন আমরা এক এক দিন এই গুহার মধ্যে গিয়ে বোসে থাকি। বেশ নির্জ্জন। সুমুখে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। গুহার মধ্যে জায়গায় জায়গায় অতি পরিষ্কার একটু একটু জল জোমে রোয়েছে, ইতস্তত Sea-weeds সমুদ্র উদ্ভিদ প্যোড়ে রোয়েছে, সমুদ্রের এক রকম স্বাস্থ্য-জনক গন্ধ প্যাওয়া যাচ্চে, চার দিকে পাথর ছড়ানো আছে। আমরা সবাই মিলে এক এক দিন সেই পাথর গুলো ঠেলাঠেলি কোরে নড়াবার চেষ্টা করি, নানা শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি। এক একটা পাহাড় সমুদ্রের জলের ওপর খুব ঝুঁকে পোড়েছে; আমরা প্রাণপণ কোরে এক এক দিন সেই অতি

দুর্গম পাহাড় গুলোর ওপর উঠে বোসে নীচে সমুদ্রের ঢেউয়ের উত্থান পতন দেখি। সমুদ্রের একটা হু হু শব্দ উঠছে, জলে এক একটা ছোট ছোট নৌকা পাল তুলে চোলে যাচ্চে, চার দিকে রোদ্দুর হাসচে মাথার ওপর এক একটা ছাতা খোলা রোয়েচে, পাথরের ওপর মাথা দিয়ে আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প কোরচি। আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা আর পাবে? তুমি যে Thomson এর Castle of Indolence পড়েছ এখানটা তার একটা জীবন্ত ছবি। এক এক দিন পাহাড়ে যাই, আর পাথর দিয়ে ঘেরা ঝোপঝাপে ঢাকা একটি প্রচ্ছন্ন জায়গা দেখলে সেই খানটিতে গিয়ে একটি বই নিয়ে পোড়তে বসি। কিন্তু অতি এক-মনে বই পড়বার জায়গা টর্কী নয়। মনের এমন শিথিল অলস অবস্থায় অত মনোযোগ দেওয়া পোষায় না। তাই যদি পারবে তবে একদিকে এমন হরিত প্রান্তর, আর একদিকে এমন সুনীল সমুদ্র কি কোরতে, এমন রোদ্দুর উঠেছে কেন, এমন অতি পরিষ্কার আকাশ কি জন্যে? দুছত্র বই পোড়বে, আর দুদণ্ড সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকবে, চেয়ে থেকে থেকে সাত শ ভাবনা ভাববে, অথচ ভাবচ কি না ভাবচ তা' বিশেষ মনোযোগ না দিলে টের পাওয়া যাবে না, হঠাৎ বইয়ের দিকে চোক পড়বামাত্র আবার পড়া আরম্ভ করবার জন্যে খুব দৃঢ় সঙ্কল্প কোরবে, কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রের একটা কমা পর্য্যন্ত যেই পৌঁচেছ অমনি মনটা অলক্ষিত ভাবে তোমার হাত ফোসকে এমন একটা অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে হাজির হবে, যে জায়গার বিষয় ইতিপূর্ব্বে তুমি কখনো ভাবও নি। মনটা সমস্ত দিন এই রকম লুকোচুরী খেলে বেড়ায় একটা বইয়ের দেড় পাতা পোড়তে আড়াই দিন লাগে।

আমি বড় বাজে কথা বোকে যাচ্চি, এ কিন্তু টর্কীর বাতাসের গুণে। মনের ভিতর হাজারটা কথা চলাফেরা কোরে বেড়ায়, কিন্তু কথা গুলো হাত ধরাধরি কোরে আসে না, পরস্পরের মধ্যে চেনা শুনো নেই, খাপছাড়া, দল ছাড়া কথা গুলো মনের বড়রাস্তা দিয়ে খুব ঘেঁসাঘেঁসি কোরে চোলেছে, কিন্তু পথিকদের মত কেউ কারো কোন এলাকা রাখে না। এমন ভাঙ্গাচোরা কথার জোড়াতাড়া চিঠি পোড়তে কি তোমাদের ভাল লাগ্‌চে?

তুমি যদি এখানে আসতে ভাই, তা' হোলে সমুদ্রের শব্দ শুনতে শুনতে, সমুদ্রের ঢেউ গুণতে গুণতে, ফুলের রাশে মাথা রেখে, ফুলের রেণু গায়ে মেখে, ফুলের মালা গেঁথে গেঁথে, ফুলের মধু খেতে খেতে, সন্ধে বেলায় সাগর বেলায়, দুজনেতে গলায় গলায়, ঘাসের পরে গাছের তলায়, গল্প হোত, হাসি হোত, ঠাণ্ডায় যদি কাশী হোত বাড়ি যেতেম, চা খেতেম, হেসে খেলে দিন কাটাতেম। কেমন! লোভ হোচ্চে কি? আমি ভাই কবি নই, একটা ঘোরতর কাজের লোক। তবে যে, এ জায়গাটা খুব ভাল লাগচে বলচি, তার কারণ হোচ্চে বরাবর শুনে আস্‌চি ভাল জায়গা দেখলে

লোকের ভাল লাগা উচিত। না ভাল লাগলে বড় লজ্জার বিষয়। তুমি হোচ্চ কবি মানুষ, ছড়া টড়া লিখে থাক, তুমি এখানে এলে বাস্তবিক তোমার লাগত ভাল।

একটা গল্প বলি শোন। আমাদের এখেনে দিন কতক Miss H ও Miss N ছিলেন। Miss H একজন চিত্রকরী। তাঁর বড় সুন্দর ছবি আঁকা আসে। তিনি প্রায় প্রত্যহ breakfast খেয়েই সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে ছবি আঁকতে বেরোতেন। Miss N ক্রমিক কবিতা ও নভেল পড়েন, ও তিনিও না কি শুনেছি কাগজে খুব ভাল ভাল Sonnet মাঝে মাঝে লিখে পাঠান। মাঝে মাঝে আমরা তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেম। কোনখানে একটা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, কোথাও বা একটা ভাঙ্গাচুরো বেড়া, কোথাও বা খানিকটা বনজঙ্গল ঝোপঝাপ, কখনো বা এক খণ্ড মেঘের বিশেষ একটা রং দেখে তাঁরা মুগ্ধ হোয়ে যেতেন, ও শত মুখে ব্যাখ্যা কোরতেন। আমার ত ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যেত, আমি তাদের বিশেষ সৌন্দর্য্য বড় একটা বুঝতে পারতেম না; ঝট কোরে একটা মত ব্যক্ত কোরতে বড় ভয় কোরত। দ্বিরুক্তি মাত্র না কোরে তাঁদের মতে সায় দিয়ে যেতেম। রোজ রোজই ত এই রকম ব্যাপার হোত, রোজ রোজই আমি অতি ভাল মানুষটির মত তাঁদের প্রতি কথায় বিনীত ভাবে সায় দিয়ে যেতেম। শেষ কালে আমার বড় লজ্জা বোধ হোতে লাগ্‌ল। একদিন বেড়াতে বেরোবার সময় প্রতিজ্ঞা কোরলেম, "আজ আমি নিজে হোতে প্রকৃতির একটা কিছু সৌন্দর্য্য বের কোরে আগে থাকৃতে তাঁদের দেখাব, তাঁদের মুখ থেকে বাহবা নিতেই হবে।" এই পণ কোরে ত বেরোনো গেল। চারদিকে নজর কোরে দেখতে দেখতে চোলেছি। চার দিকে ফুল আছে, গাছ পালা আছে, পাহাড় পর্ব্বত আছে, কিন্তু সে সব ত পুরোণো, একটা নতুন কিছু বের কোরতে হবে। খানিক দূর গিয়ে দেখি, একজনদের বাড়ির সুমুখে তারা একটি বাগান তৈরি কোরেছে, গাছ গুলোর ডাল পালা কেটে নানাবিধ আকারে পরিণত করা হোয়েচে। কোনটা গোল, কোনটা বা অস্ট কোণ, কোনটা মন্দিরের চূড়োর মত। দেখেত আমার তাক্‌ লেগে গেল। পাছে তাঁরা আগে থাকৃতে কিছু বোলে ফেলেন এই ভয়ে তাঁরা মুখ খুলতে না খুলতে তাড়াতাড়ি আমি চেঁচিয়ে উঠেছি, How beautiful!" Miss H.-কে তার একটা ছবি নিতে অনুরোধ কোরলেম। Miss H ও Miss N ত একেবারে হেসে আকুল, তাঁরা বোলে উঠলেন, "Oh! Mr T.! Surely you are joking! Mr T.ত কাল বিলম্ব না কোরে তাড়াতাড়ি হেসে উঠলেন; যেন তিনি ঘোরতর একটা ঠাট্টা কোরে নিয়েচেন ও তার জন্যে মনে মনে ভারি তৃপ্তি ও গর্ব্বের উদ্রেক হোয়েচে। ভাল কোরে সামলাতে পেরেচি কি না বোলতে পারিনে। কিন্তু বড় লজ্জা হোল! "যাবৎ কিঞ্চিৎ" বাক্যব্যয় না কোরে ছিলেম,

"ভাবচ্চ" যথা কথঞ্চিৎরূপে শোভা পেয়েছিলেম, কিন্তু প্রথম যে দিনই মুখ খুললেম সেই দিনই এই রকম হাস্যভাজন হোতে হোল। আমি কিন্তু Miss H ও Miss N. এর ভাব আজ পর্যান্ত বুঝতে পারলেম না; তাঁরা একটা যা'চ্ছেতাই বন বাদাড় দেখলে হাঁ কোরে চেয়ে থাকৃতেন, আর অমন সুন্দর নানা আকৃতিতে ছাঁটা গাছ পালা তাঁদের পছন্দসই হোল না। সে দিন একটা ভিক্ষুক একটা ছেঁড়া টুপি পোরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ তাঁদের খেয়ালে কেমন লেগে গেল, তৎক্ষণাৎ তাকে আট গণ্ডা পয়সা (এক শিলিং) দিয়ে দাঁড় করিয়ে ছবি নেওয়া হোল, আর রাস্তা দিয়ে কত মহা মহা সুন্দরী চোলে যায়, যাদের এক দিন দেখলে তিরিশ দিন মলয় সমীরণ ও চাঁদের কিরণে দগ্ধ কোরতে থাকে তাদের সম্বন্ধে তাঁরা একটি কথাও কন না। কেন বল দেখি? যাহোক অপ্রস্তুত হোয়ে বাড়ি গিয়েই একটা বাঙ্গালা কবিতা লিখতে বোসলেম। Miss N. আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, আমি কি বাড়িতে চিঠি লিখচি? আমি বিনয় সহকারে হাসতে হাসতে বোল্লেম যে, "আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে চেষ্টা কোরে থাকি, তাই দুই এক ছত্র কবিতা লিখচি।" শুনে অবধি Miss Nএর আমার প্রতি ভারি ভক্তি হোয়েছে। তিনি মনে কোরলেন, লোকটা খুব ভাবুক হবে। তিনি তাঁর লেখা দুই একটা Sonnet আমাকে শোনাতে আরম্ভ কোরলেন। কবিতা পোড়তে পোড়তে যেখানটা ভাল লাগত আমাকে চেঁচিয়ে শোনাতেন। আমার উচ্ছ্বাস দেখে কে! 'আমার পূর্ব্বকৃত কোন ত্রুটি তাঁর আর মনে রৈল না। ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ভারি পরিপক্ক হোয়ে উঠতে লাগল। এতদূর পর্যন্ত যে, একটা ফুসফাস উঠল। ম—সন্দেহ কোরলেন যে Miss Nএর নেত্র, রূপ ও বাক্য-বাণ-বর্ষণের মধ্যে পোড়ে আমার বুকটা দু তিন টুকরো হোয়ে গেছে। আমি তাঁকে বোঝাতে গেলেম, "মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। আমি একটা হৃদয়-হীন শীতলশোণিত জীব। আমার হৃদয় দগ্ধও হয় না, ভস্মও হয় না, হারায়ও না, ভাঙ্গেও না চূরেও না। অমন একটা বিষম নটখোটে পদার্থের আমি কোন সম্পর্কই রাখিনে।" তিনি ত বিশ্বাসই কোরলেন না। তিনি বোল্লেন, Courtship চালাও। আমার মত চুপচাপ লাজুক মানুষ কি Courtship চালাবার উপযুক্ত নাবিক? আমি কি মশায় তার দিকে হাঁ কোরে চেয়ে ফোঁস ফোঁস কোরে নিশ্বেস ফেলতে পারি! ডিনার টেবিলে আমার দিকে একটা লবণ দানী সরিয়ে দিলে অমনি অতিমাত্র কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হোয়ে ঢল ঢল নেত্রে অত্যন্ত কোমল ভাবপূর্ণ হাস্য-রসে মুখ খানা টসটোসে কোরে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা কি আমার কর্ম্ম? বায়রণ থেকে বেছে বেছে এমন কবিতা পোড়ে শোনানো, যাতে আমার মনের ভাব ব্যক্ত হয়, পোড়তে পোড়তে বিশেষ একটা

লাইনে থেমে অতিশয় করুণ-রসের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা, সে সব কি আমার পোষায়? আমি কি হাঁটু গেড়ে বোলতে পারি "সুন্দরি ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং?" তোমরা কবি মানুষ তোমরা হোলে পারতে। কিন্তু এ কথা নিয়ে আর বেশী ঠাট্টা উচিত নয়, বিষয়টি গুরুতর, একটা মনুষ্য মনের সুখশান্তি নিয়ে কথা হোচ্চে। আমার আলাপী অনেক লোকের মুখেই এই রকম একটা গুজব শুনতে পাচ্চি যে, আমি ভালবাসায় পোড়েচি ও সেই জন্যে মনে মনে আমার অত্যন্ত কষ্ট হোচ্চে, সংবাদটা অত্যন্ত ভাবনা-জনক এবং শুনে অবধি আমি ভারি চিন্তিত আছি। কি কোরব্ বল দিকি? বিবাহের প্রস্তাব কোরব কি? অবিশ্যি, লোকের মুখে এক কথা শুনেই আমি তাড়াতাড়ি কোরে বিয়ে কোরতে যাচ্চি নে, আমি প্রথমতঃ তদারক কোরব যে, আমি ভাল বাসায় পোড়েচি কি না, তার পরে যদি প্রমাণ হয় তা হোলে তোমাদের এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শ নিয়ে যা' হয় স্থির করা যাবে। কি বল? তার পরে গল্পের শেষ দিকটা শোন। সেই বাঙ্গালা কবিতাটা লিখ্‌ছিলেম। চতুর্থ ছত্রে লাইনের শেষে ডেজি (Daisy) কথাটা পোড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার আর কোন মিল না পেয়ে সেই খেনেই কবিতাটা বন্ধ থাকে। এ দিকে Miss N. রোজই আমাকে পীড়াপীড়ি করেন, বলেন, তোমার কবিতাটা অনুবাদ কোরে শোনাও। আমি ত আজ কাল কোরে রোজই স্থগিত রাখি। পরশু দিন তাঁরা এখান থেকে লণ্ডনে চোলে গিয়েচেন, ও আমাকে বিশেষ কোরে অনুরোধ কোরে গিয়েচেন "কবিতাটা অনুবাদ সমেত লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।" কি করা যায় বলত! ভারি মুস্কিলেই পোড়েচি। আমি বলি কি, তুমি ভাই আমার হোয়ে যত শীঘ্র পার একটা কবিতা লিখে পাঠাও। বিষয়টা কি জান? টর্কীর বর্ণনা। টর্কী না দেখে টর্কীর বর্ণনা কি অসম্ভব মনে কোরচ? কিচ্ছুই না। ভাল জায়গা মাত্রেরই যে রকম বর্ণনা করা হয়, সেই রকম কোর্‌লেই চুকে যাবে। অর্থাৎ, ফুল ফুট্‌চে, পাখী ডাক্‌চে, বাতাস বয়, জ্যোৎস্না ওঠে। যত প্রকার মিষ্টি জিনিষ আছে, কোন প্রকারে কবিতাটার মধ্যে গুঁজে দেওয়া। গাছ পালার বর্ণনা সমাপ্ত কোরে যদি কোন রকম কোরে খানিকটা অশ্রুজল, হৃদয় ভাঙ্গাভাঙ্গী, নিরাশা, প্রিয়তমা, নিবিড় কুন্তল, সুদীর্ঘ নয়ন বসাতে পারো, তা হোলেই জিনিষটা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হবে। দেখ, Nightingale, Violet, Forget-me-not Hyacinth প্রভৃতি কথা গুলো বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে ভাল শোনাবে না। কিন্তু তার জন্যে বেশী ভেবো না। তুমি ত, কোকিল, পাপিয়া, মালতী, মল্লিকা, চামেলি, চম্পা লিখে দিও, তার পরে অনুবাদ কোরে দেবার সময় আমি যা হয় একটা উপায় কোরে দেব।

সমস্ত গল্পটা কি নিতান্ত আজগুবি

মনে হোচ্চে? তবে আসল কথাটা খুলে বোল্‌চি। এটা আমার কথা নয়। এক ব্যক্তি তাঁর নিজের ঘটনা চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন, তাঁর চিঠি থেকে আমি উদ্ধৃত কোরে দিলেম। ব্যক্তিটি কে শুন্‌বে? না; কাজ নেই বাপু; তোমরা আবার দশ জনের কাছে গল্প কোরে বেড়াবে! তোমাদের পেটে যদি একটি কথা থাকে! ভারি কৌতূহল হোচ্চে? আচ্ছা তাঁর নামের প্রথম অক্ষর লিখ্‌চি। শ। বুঝেছ?

ক্রমশঃ।

বাঙ্গালা কবিতা।

পেনু যদি আজ ভারতী সঙ্গ,
অভিনব কিছু দেখাব রঙ্গ।
বীণা বাদিনীর সাধের তনয়
কেমনে সাজায় কবিতা অঙ্গ।
কেমনে কি ভাবে, কি রসে কি ভাবে
কবিতা লতায় ছাইল বঙ্গ।
বিবিধ বরণ বরণ গুলি,
কেমনে তাহারা টানয় তুলী,
কেমনে ফলায় বিবিধ রং,
কেমনে গড়ায় বিবিধ ঢং,
কেমনে তাহার সাজায় বেশ,
কেমনে তাহায় মজায় দেশ,
কেমনে তাহায় প্রদানে প্রাণ,
কেমনে তাহায় গাহায় গান,
তাই আজ দীন দেখাবে তোমায়
নলিন নয়নে দেখ মা চেয়ে,
কবি কল্পনায়, পাতায় লতায়
কেমনে বাঙ্গালা গিয়েছে ছেয়ে!
অনুকরণের আভাস ছটা,
অনুপ্রাস খাষ ভাষার ঘটা,
ভাবের অভাব ভাবনা তাই,
বোলের বাঁধনে বেলয় নাই,
চাকচিক জাঁক জমক সাজ,
ভিতরে ভুয়া উপরে কাজ;
কবির কাহিনী-কুহক জাল,
কবিতা কাননে কাটায় কাল;
দুখিরে দেখায় দেবের সুখ,
ধনী সে ধেয়ানে দীনের দুখ;
হাপুতী হেরয় তনয় চাঁদ,
বিরহী ভাঙ্গয় বিরহ বাঁধ;
কত যে আজব ঘটনা ঘটে,
কত যে আজব রটনা রটে,
কত যে খেয়াল ক্ষণেকে হয়,
ক্ষণেকে উদয় ক্ষণেকে লয়;
তাই মাত আজ দেখাব তোমায়,
এসো মা, বসো মা, মম রসনায়;
পুরাতে মানস সাধিব কাজ,
হারি জিনি, তায় কিসের লাজ?
চল মা, আজকে হেরিব গোকুল,
হেরিব বিলাসী ব্রজ বধূ কুল।

অথ বৃন্দাবন—প্রাতঃ দৃশ্য।

তরুণ অরুণ সিঁদুর রেখা,
উষার ললাটে দিয়াছে দেখা।
বিভুর বিভব বিভার মেয়ে,
হেরিছে ত্রিলোক হরষে চেয়ে।
নিশী নাশি আসি ভাসিল ভাস,
ভরিল ভুবন মধুর হাস।
পাখী শাখা পরে গাহিছে গান,
জগত জনের জুড়ায়ে প্রাণ।
উষার অরুণ উদয় জানি,
জাগে জগতের যতেক প্রাণী।
উঠিল আরাব এ চারিধার,
ছুটিল কাজেতে এবে যে যার।
অই দেখ বাছা বারেক চেয়ে,
শোভে সরোবরে শতেক মেয়ে।
চিকন কাঁকালে কলসী কারু,
দ্বিগুণ বাড়ায় চেহারা চারু।
চটুল চরণে চুট্‌কী রাজে।
ঝমর ঝমর ঘুমুর বাজে।
ঝট্‌ পট সব সারিছে পাট,
সরসী ঘাটে রে চাঁদের হাট।
তরাসি তাবত যে যার কাজে,
ঘস্‌ ঘস্‌ ঘস্‌ বাসন মাজে।
দুল্‌ দুল্‌ দুল্‌ নোলক নড়ে,
চমকি চমকি পলক পড়ে।
তাবিজ বাজুর দুলিছে ফুল,
দুলিছে কাণের দোলনী দুল।
উড়ি উড়ি পড়ে বয়ন বাস,
অলকা অলিকা তাহে প্রকাশ।
কিরণ মালায় চপলা ছটা,
মৃদু মৃদু তায় হাসির ঘটা।
আলি আলি মেলি আলাপে কেউ,
সদা উঠে তায় সুধার ঢেউ।
আঁখি আঁখি তায় তাড়িত তার,
বহিছে নিমেষে খবর ভার।
শীতল সলিলে ঢালিয়া দেহ,
সারয় সিনান সেয়ানী কেহ।
ওই শুন বাছা পাতিয়া কাণ,
বাদিত বাদন ধ্বনি মহান।
ধেনেনা ধেনেনা নবত বোল,
তাকিটি ধাকিটি বাজায় ঢোল।
ন্যাংনা নেন্যাং বাজিল কাঁসী,
পোঁও পোঁও পোঁও ধরিল বাঁশী।
ঘাঁকড় কাঁকড় বাজিল কাড়া,
মাতিল ব্রজের গোয়াল পাড়া।
টুনু টুনু টুনু ঘণ্টা মাঝে,
ঢং ঢং ঢং কাঁসর বাজে।
ভোঁপ্‌পো ভোঁপ্‌পো বাজিল ভেরি,
ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ বাজে ঝাঁঝেরী।
উঁছিয়ে চেঁচিয়ে বাজায় ঢাক,
জুড়ীদার তার সাগর শাঁখ।
উঠিল ভীষণ বাদন রোল,
থর করতাল মাদল খোল।
হরি হরি হরি হরির ধ্বনি,
কাঁপায়ে গগন উঠে তখনি।
মধুর মধুর মধুর গান,
কার না তাহায় জুড়ায় প্রাণ?
হেন সুসময় পূজার ছলে,
গোকুল বাসিনী গোপিনী দলে।
সহ সহচরী আভিরী আলি,
ক্ষীণ কটিতটে ফুলের ডালি।
ডানি করে চারু জলের ঝারি,

পূরিত পতিত-পাবনী বারি।
একে রসবতী রস আধার,
বাড়িল দ্বিগুণ এ গুরু ভার।
তাই তনু খানি ঈষৎ বাঁকা,
আধ রাকা চাঁদ জলদে ঢাকা।
আধই জলদে বিজলি খেলে,
আধই জলেতে কুমুদী মেলে;
আধই কমল নীলীম সরে,
মিঠুর মারুতে মাতি বিহরে।
পেখম ধরিয়া ময়ুর দলে,
তুটী তুটী নাচে হেম অচলে।
মণিচূণী ময় বিবিধ বরণ,
বর বপু বেড়া চারু আভরণ।
মানিনী ফণিনী গরব নাশা,
চিকন চাঁচর চিকুর খাষা।
ঘেরি চারু ফুলে নয়ন লোভা,
দ্বিগুণ বাড়ায় দেহের শোভা।
থমকে থমকে ফেলই পা,
দলমল করি ঢুলই গা।
রুণু রুণু রুণু ঘুমুর বাজে,
(মল ছিল না কি সেকেলে সাজে ?)
ঝটিত চরণে ছাড়িয়া বাট,
মন্দির মাঝার পশিল ঝাট।
নিমিলি নলিন নয়ন দুটী,
চারু-চাঁপা কর কমল পুটি,
ভকতি ভরেতে গলায় বাস,
তদগত প্রাণ মন উদাস।
জানু পাতি ভূমে রয়েছে বসি,
জনু সুধাময় শারদ শশী।
অথবা অচল চপলা বালা,
কর পদ্মে ধরি কিরণ মালা
নভে নীরধরে নীরবে বসি,
তপ নিমগনা নব তাপসী।
দেবীর চরণে চাহিয়া বর,
চলে ব্রজ বালা যে যার ঘর।
হৈ হৈ হৈ রাখাল রব,
হম্বা হম্বা রবে গোপাল সব,
সমান সমান বাছিয়া জুটে,
দড় বড় করি দউড়ে ছুটে,
ফন্ ফন্ ফন্ ঘুরায় লেজ,
বদন হইতে বাহিরে তেজ,
হরষে বাছুর ধাইয়া আসে,
আপন আপন জননী পাশে।
লাফায় ঝাঁপায় অধীর দেহ,
লেহনি লেহনে জানায় লেহ,
আনন্দ আসারে অমনি মা,
চপ্ চপ্ চপ্ চাটিছে গা,
মায়ের মতন মমতা মরি,
আর কার আছে ভুবন ভরি ?
জগতে জীবের জননী সার,
স্বরগ হতেও গরিমা তাঁর।
ঝট পট পাখী ঝাড়িছে পাখা,
মর্ মর্ মর্ নড়িছে শাখা,
শর শর শর করিয়া রব,
ঝর ঝর পাতা ঝরিছে সব,
ঘন ঘটাকারে উড়ায়ে ধূলী,
ছুটিল গোপের গোপাল গুলি,
গাহিল গোপাল গোপের গান,
শীতলি পরাণ, জুড়ায়ে কাণ,
পদ মদ ভরে কাঁপায়ে ধরা,
যে যাহার কাজে ধাইল ত্বরা।

সাঃ—নেঃ।

সম্পাদকের বৈঠক।

জুলিয়স সীজর।

(অ্যাণ্টনির বক্তৃতার অনুবাদ।)

রোমে যুদ্ধ বিগ্রহ, গৃহ বিচ্ছেদ থামিয়া গিয়াছে। সীজর এখন রোম সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা। সুখ শান্তি লাভ করিয়া প্রজারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। কেবল কতকগুলি ব্যক্তি, যাহারা পূর্ব্বে সীজরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু সীজর জয়লাভের পর যাহাদের মার্জ্জনা করিয়া উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহারা আজো হিংসায় জ্বলিতেছে। মার্জ্জনা পাইলে যে, লোকে সকল সময়ে কৃতজ্ঞ হয় তাহা নহে; অনেক সময়ে দণ্ডের অপেক্ষা মার্জ্জনা লজ্জা, রোষ ও প্রতিহিংসা উদ্রেক করে। Cassius, Trebonius, Tullins Cimber প্রভৃতি কতকগুলি পদমর্য্যাদাবান্ ব্যক্তিরা সীজরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে Marcus Brutus লিপ্ত আছেন; লোকে বলে অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের ন্যায় ব্রুটসের কোন প্রকার দুরভিসন্ধি ছিল না; তিনি সত্যই মনে করিতেন, যে, সীজরের প্রতাপ যে রূপ দিনে দিনে বাড়িতেছে, তাহাতে সাধারণতন্ত্র রোমের স্বাধীনতা অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে কি না সন্দেহ। ব্রুটস, কোটোর ভগ্নী সর্ভিলিয়ার (Servilia) পুত্র। লোকে কানাকানি করে যে, সর্ভিলিয়া সীজরের উপপত্নী, এমন কি ব্রুটস্ সীজরের ঔরসজাত। তাহা সত্য না হউক সীজর ব্রুটস্কে অত্যন্ত ভাল বাসেন, এবং ব্রুটস্ও সেই জন্য সীজরের প্রতি অনুরক্ত। ষড়যন্ত্রের মধ্যে আর একটি ব্রুটস্ আছেন, তাঁহার নাম Decimus Brutus; তাঁহার পরেও সীজরের যার-পর-নাই অনুগ্রহ।

Ides of march অর্থাৎ পনরই মার্চ্চ নিকটবর্ত্তী। সীজর শীঘ্রই পার্থিয়া আক্রমণ করিতে যাইবেন। কিন্তু একটি দৈববাণী হইয়াছে যে, রাজা নহিলে আর কেহ পার্থিয়দিগকে জয় করিতে পারিবে না; জুলিয়স্ সীজর রাজা নহেন, তিনি রোমের সাধারণ লোকদের প্রতিনিধি মাত্র; কিন্তু যাহা হউক, সীজর যুদ্ধে যাইবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহার যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে ১৫ই মার্চ্চ একটি সভা বসিবে, সকলে কহিতেছে, সেই সভায় পুরোহিতগণ তাঁহাকে রাজ-মুকুট পরাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। এদিকে বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র পরিপক্ক হইয়া উঠিতেছে। দুই এক জন জানিতে পারিয়া সীজরকে সাবধান করিতে লাগিল; কিন্তু সীজর সাবধান হইলেন না। দৈবজ্ঞেরা অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে

লাগিল। ১৪ই মার্চ্চে সন্ধ্যাকালে সীজর লেপিডসের বাড়িতে ভোজে গিয়াছিলেন। সে দিন নিমন্ত্রণ সভায় একবার কথা উঠিয়াছিল, যে, কিরূপ মৃত্যু ভাল। সীজর তখন কাগজে নাম সই করিতেছিলেন, সহসা মুখ তুলিয়া বলিলেন "হঠাৎ-মৃত্যু!"

আজ ১৫ই মার্চ্চ। আজ একটি সভা বসিয়াছে। সভাগৃহ লোকে পূর্ণ। বিদ্রোহীরা তাহাদের কাগজ পত্রের মধ্যে ছুরিকা লুকাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। সকলেই সীজরের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় কথা উঠিল, সীজর আজ আসিবেন না। অনেক প্রকার কুলক্ষণ দেখা দিয়াছে; সীজরের মহিষী Calpurnia কুস্বপ্ন দেখিয়াছেন, এবং অকারণে সীজরের মন খারাপ হইয়া আছে। বিদ্রোহীরা কুফল আশঙ্কা করিতে লাগিল। তখন তাহাদের মধ্য হইতে সীজরের প্রিয় বান্ধব ডেসিমস ব্রূটস্ সীজরের নিকট গেলেন, ও নানা প্রকার যুক্তি দেখাইয়া তাঁহাকে সভাগৃহে লইয়া আসিলেন। আসিবার কালে এক জন সীজরের হস্তে এক খানি কাগজ দিল, তাহাতে বিদ্রোহের বিবরণ ও বিদ্রোহীদের নাম ধাম লেখা ছিল, সীজরকে সে ব্যক্তি সেই মুহূর্ত্তেই পড়িতে অনুরোধ করিল, সীজর পড়িলেন না।

সীজর সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, আসন গ্রহণ করিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল কেহ বা গল্প বলিতে লাগিল, কেহবা একটা কিছু প্রার্থনা করিতে লাগিল। Tullius Cimber তাঁহার কাছে এক বিষয় লইয়া আবেদন করিল, তিনি অস্বীকার করিলেন। ক্রীড়াচ্ছলে Cimber তাঁহার কাঁধ হইতে চাদর সরাইয়া দিল; কেশিয়স্ পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, সে অমনি তাঁহার কাঁধে এক ছুরি বিঁধাইয়া দিল। সীজর চীৎকার করিয়া উঠিয়া কেশিয়সের হাত ধরিলেন। অমনি তাঁহার বক্ষে আর একটি ছুরিকা বিদ্ধ হইল, তিনি চারিদিকে চাহিলেন—চারিদিকেই ছুরিকাগ্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না—অমনি সীজর তাঁহার মুখের উপর কাপড় টানিয়া দিলেন ও একটি কথা না বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ব্রূটস্ সীজরের রক্তে ছুরিকা ডুবাইয়া সেই ছুরী বাগ্মী সিসিরোর দিকে কাঁপাইয়া কহিলেন—স্বাধীনতা প্রত্যাহৃত হইল।

সীজরের মৃত্যুতে লোকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। সীজরের বন্ধু অ্যাণ্টনি Froumএ সীজরের মৃত দেহ আনয়ন করিলেন, সীজরের বস্ত্র এখনো বদলানো হয় নাই, সেই রক্তমাখা ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্র এখনো তাঁহার মৃতদেহের উপর নিপতিত আছে। প্রথমে অ্যাণ্টনি সীজরের উইল সমাগত লোকদিগের মধ্যে পাঠ করিলেন। ইহাতে লিখিত আছে, যে, "প্রত্যেক রোমবাসীই সীজরের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত আছে, তিনি প্রত্যেককে ৭৫ drachma (ইংরাজি ৩ পাউণ্ড, প্রায় চল্লিশ টাকা) দান করিলেন। টাইবরের তীরস্থ তাঁহার বাগান সাধারণের বিনোদের

জন্য রাখিয়া গেলেন। অক্টেভিয়স্ তাঁহার উত্তরাধিকারী, তদভাবে ডেসিমস্ ব্রুটস্।”

সীজর তাহাদের ৭৫ ড্র্যাক্‌মা রাখিয়া গিয়াছেন, ও যে ডেসিমস্ ব্রুটসকে তিনি আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন সেই তাঁহার হত্যাকারীদের মধ্যে একজন ছিল, শুনিয়া রোমীয় শ্রোতারা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। অ্যাণ্টনি সময় বুঝিয়া সীজরের গুণ গান করিতে লাগিলেন, তিনি কহিলেন।

ক্ষমতাপ্রাপ্তি অনেক মানুষের দোষ বাহিরে প্রকাশ করিয়া দেয়, কিন্তু ক্ষমতা সীজরের গুণগ্রামই প্রকাশ করিয়াছে। উন্নতি তাঁহাকে অহঙ্কৃত করিয়া তুলে নাই, কারণ ইহা তাঁহার মত মহান্ মানব মনের ক্রীড়া করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র। * * তাঁহার অন্তরে কেমন একটি স্বাভাবিক সততা বিরাজ করিত। সর্ব্বদাই তাঁহার সমান অবস্থা, কখন ক্রোধে হতজ্ঞান হইতেন না কখনো কার্য্যসিদ্ধিতে গর্ব্বিত হইয়া উঠিতেন না। অতীতে কেহ দোষ করিলে তিনি তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিতেন না, এবং বিপদে পড়িয়া ভবিষ্যতে তাহার জন্যে অতিমাত্র সাবধান হইতেন না। যাহারা পরিত্রাণ চায় তাহাদের মুক্তি দেওয়াই তাঁহার একমাত্র চেষ্টা ছিল। * * * তোমরা তাঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য করিতে, উপকারীর ন্যায় ভাল বাসিতে, তোমরা তাঁহাকে রাজ্যের অধিপতি করিলে, কেন? না তাঁহার উপকার সমূহের সম্পূর্ণ প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও তোমাদের যথাসাধ্য করিবার জন্য। দেবতাদের তিনি পুরোহিত ছিলেন, তোমাদের তিনি প্রতিনিধি ছিলেন, সৈন্যদের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন ও তাঁহার দেশ-শত্রুদের তিনি শাসয়িতা ছিলেন। এক কথায় তিনি পিতাদের পিতা ছিলেন। এই তোমাদের পিতা, পুরোহিত, বীর, যাঁহার দেহ স্পর্শাতীত পবিত্র বলিয়া গণ্য ছিল, তিনি আজ মৃত পড়িয়া; পীড়ায় নহে—বয়সে নহে—যুদ্ধে নহে;---কিন্তু এই খানে—তাঁহার স্বদেশে, তোমাদের পুরভিত্তির মধ্যেই এই নিরস্ত্র বীর, এই ন্যায্যবিচারক তাঁহার বিচারাসনে বসিয়া, এই শান্তিরক্ষক তাঁহার শত্রুদের সম্মুখে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থাতে সভাগৃহ মধ্যে নিহত হইলেন। যাঁহাকে কোন বিদেশীয় শত্রু পরাভূত করিতে পারে নাই; তিনি তাঁহার আপনার স্বদেশীয় লোকদের দ্বারা নিহত হইলেন! সে লোক কাহারা? যাহাদের তিনি কত দয়া দেখাইয়াছেন, কত বার ক্ষমা করিয়াছেন! হা সীজর—মানুষদের প্রতি প্রেম এখন আর তোমার কোথায় রহিল? তোমার পবিত্র-জীবনই বা কোথায় রহিল? তোমার প্রচলিত রাজনীতি সমূহই বা কোথায় রহিল? আজ এই ফোরমে তোমার মৃতদেহ পড়িয়া আছে, ইহার মধ্য দিয়া কত বার তুমি বিজয়-গৌরবে মালা গলায় দিয়া চলিয়া গিয়াছ? হায়—আজ তোমার রক্তে অভিষিক্ত শুক্ল-কেশ, এই ছিন্ন বসন দেখিয়া মায়া হয়!

আমরা সেক্‌স্‌পিয়র-রচিত জুলিয়স্‌ সীজর নাটক হইতে অ্যাণ্টনির বিখ্যাত বক্তৃতা অনুবাদ করিয়া দিতেছি, এবং তদুপলক্ষে ইতিহাস হইতে সীজরের মৃত্যু-বর্ণনা লইয়া ভূমিকা রচনা করিলাম।

অ্যাণ্টনির বক্তৃতা।

অ্যাণ্টনি—

বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, শুনগো তোমরা,
সীজরে সমাধি দিতে আসিয়াছি আমি,
মহিমা গাহিতে তাঁর আসিনি হেথায়!
লোকে যা' কুকর্ম্ম করে, মৃত্যুর পরেও
বাঁচিয়া রহেগো তাহা; কিন্তু ভাল কাজ
ধূলায় মিশায়ে যায় মৃত-দেহ সাথে!
সীজরের অদৃষ্টেও ঘটুক তাহাই!
মহাত্মা ব্রূটস্‌ মুখে শুনেছ তোমরা
দুরাকাঙ্ক্ষী অতিশয় ছিলেন সীজর,
সত্য যদি, তবে তাহা ঘোর দোষ বটে;—
পেলেন তেমনি তার ঘোর প্রতিফল!
এসেছি হেথায় আমি সমাধি-বেলায়
বলিতে দু এক কথা সীজরের হোয়ে;
ব্রূটস্‌ ও তাঁর যত সহকারীগণ
দিয়াছেন অনুমতি অনুগ্রহ করি,
কারণ, ব্রূটস্‌ অতি মহাশয় লোক,
তাঁরা সকলেই অতি মহাশয় লোক!
সীজর ছিলেন মোর পরম বান্ধব
বিশ্বাসী, সদয়; কিন্তু ব্রূটসের মতে
দুরাকাঙ্ক্ষী অতিশয় আছিলেন তিনি,
তা' হবে, ব্রূটস্‌ অতি মহাশয় লোক!
কত শত বন্দী তিনি আনিলেন রোমে,
অর্থ যাহা দিল তারা মুক্তি লাভ তরে
সাধারণ ধনাগারে রাখিলেন তাহা,
সীজরের দুরাকাঙ্ক্ষা এরেই কি বল'?
দরিদ্রের অশ্রু হেরি সীজরের আঁখি
বরষিত অশ্রুধারা, কিন্তু জেনো ইহা
দুরাকাঙ্ক্ষীদের মন এ হোতে কঠিন!
তথাপি ব্রূটস্‌ কন দুরাকাঙ্ক্ষী তাঁরে,
তা' হবে, ব্রূটস্‌ অতি মহাশয় লোক!
জান ত তোমরা সবে লুপার্কলে তাঁরে
তিন বার দিয়েছিনু মুকুট পরায়ে
তিন বার তুচ্ছ করি দিলেন ফেলিতা'
এরেই কি দুরাকাঙ্ক্ষা বল গো তোমরা?
তথাপি ব্রূটস্‌ ক'ন দুরাকাঙ্ক্ষী তাঁরে,
তা' হবে ব্রূটস্‌ অতি মহাশয় লোক!
আসি নি হেথায় আমি ব্রূটসের কথা
প্রতিবাদ করিবারে, যাহা জানি আমি
তাহাই এসেছি হেথা জানাতে সবারে।
তোমরা সকলে ভাল বাসিতে তাঁহারে
এক কালে, অকারণে নহে তা' কথনো,'
তবে কি কারণে এবে করিবে না শোক
সেই সীজরের তরে? হায়, ধর্ম্ম, তুমি
পশুদের হৃদয়েতে গিয়াছ পালায়ে,
মানুষেরা হারায়েছে বুদ্ধি তাহাদের!
ক্ষমা কর, আর আমি পারি না বলিতে;
সীজরের মৃতদেহে হৃদয় আমার
কোরেছে প্রবেশ, আগে আসুক সে ফিরে!

প্রথম পুর-বাসী—

আমার ত মনে হয় বলিলেন যাহা,
অনেকটা সত্য বটে।

দ্বিতীয়— ভেবে দেখ যদি,
হোয়েছে অন্যায় করা সীজরের পরে।

তৃতীয়—কে জানে আসিবে কোন্‌ দুরাত্মা
আবার

সীজরের পদে এবে।
চতুর্থ— শুনেছ ত ভাই,
রাজা হোতে সীজরের ছিল না লালসা
তবে কেন দুরাকাঙ্খী বলিব তাঁহারে ?
প্রথম— সত্য যদি হয় ইহা, এর ফল তবে
তাদের ভুগিতে হবে।
দ্বিতীয়— আহা বেচারীর
কেঁদে কেঁদে আঁখি দুটি গেছে রাঙা হোয়ে!
তৃতীয়—অমন মহাত্মা লোক অ্যাণ্টনির মত
রোমে দুটি নাই আর।
চতুর্থ— রোস, শোন এবে,
আবার কি বলিবেন শোন মন দিয়া!
এণ্টনি—কালিকে একটি তাঁর কথায়,ইঙ্গিতে
কাঁপিত সমস্ত ধরা ; আজ তিনি হোথা!
এক জনো তাঁরে আজি করে না ভ্রূক্ষেপ!
ও গো পৌর জন, যদি তোমাদের হৃদে
বিদ্রোহ জ্বালাই আমি, ব্রুটসের কাছে,
কেশ্যসের কাছে আমি হব অপরাধী ;
জানত তাঁহারা সবে মহাশয় লোক!
চাহি না তাঁদের পরে করিতে অন্যায় ;
মৃত মানুষের পরে, তোমাদের পরে,
বরঞ্চ নিজের পরে করিব অন্যায়,
তবুও অমন সব মহাশয় লোক
অন্যায় তাঁদের প্রতি চাহিনা করিতে।
সীজরের বক্ষ হোতে পাইয়াছি আমি
এই যে লিখন তাঁর সাক্ষর সহিত,
ইহা তাঁর দান-পত্র অন্তিম কালের ;
একবার শোন যদি, এখনি তা হোলে
সীজরের প্রতি ক্ষত করিবে চুম্বন,
ভিজাবে বসন ওই পবিত্র শোণিতে,
চির কাল স্মরণেতে রাখিতে তাঁহারে
একটি মাথার কেশ মাগিবে তাঁহার,
অবশেষে সেই কেশ মরিবার কালে
মহা মূল্য এক খানি রত্নের মতন
পুত্র পৌত্রদের তরে যাইবে রাখিয়া;
কিন্তু ক্ষমা কর, তাহা চাহিনা বলিতে।
চতুর্থ—পড় পড় দানপত্র, পড়গো অ্যাণ্টনি!
সকলে—দানপত্র, দানপত্র, শুনিব আমরা!
এণ্টনি—ক্ষম মোরে, কখনই পড়িবনা ইহা,
তোমাদের কত ভাল বাসিত সীজর
জেনে কাজ নাই তাহা। নহত তোমরা
নিৰ্জ্জীব পাষাণ, কাষ্ঠ ; তোমরা মানুষ
রক্ত মাংসে গড়া ; তাই বলি, শোন যদি,
একবার সীজরের দানপত্র এই,—
জ্বলিয়া উঠিবে, হবে উন্মাদের মত!
তোমরাই বিষয়ের অধিকারী তাঁর
একথা যে জাননা তা' হোয়েছে ভালই
একবার জানিলে কি হইত না জানি!
চতুর্থ—পড় দানপত্র মোরা শুনিব অ্যাণ্টনি,
সীজরের দানপত্র, পড়-পড়-পড়!
এণ্টনি—
দাঁড়াবে কি মোরে? ধৈর্য্য ধরিবে একটু ?
হয়ত এতটা বলা ভাল হয় নাই
তাই ভাবিতেছি আমি, ভয় করি পাছে
সেই সব মহাশয় লোকদের কাছে
অপরাধী হই আমি, সীজরের বুকে
বিঁধায়ে দিয়াছে যারা ছুরিকা তাদের!
চতুর্থ—মহাশয় লোক! নানা পাষণ্ড তাহারা!
সকলে—পড় পড় দানপত্র—পড় দানপত্র!
দ্বিতীয়—খুনী তারা, নরাধম। পড় সে লিখন,
এণ্টনি—নিতান্তই দেখিতেছি হইল পড়িতে!
এস তবে সবে মিলে দাঁড়াও ঘিরিয়া

সীজরের মৃতদেহ। দেখাই তাঁহারে
এ পত্র রচনা যাঁর। নামিব কি তবে?
অনুমতি দিবে কি আমারে?
অনেকে— এস এস—
দ্বিতীয়—নেমে এস, নেমে এস—
তৃ— দিনু অনুমতি।
(অ্যাণ্টনি অবতরণ করিলেন।)
চতুর্থ—সকলে দাঁড়াও ঘিরে!
প্রথম— মৃতদেহ হোতে
সরিয়া দাঁড়াও!
দ্বি— স্থান দাও এণ্টনিরে!
এণ্টনি—গায়েতে পোড়না ঝুঁকে দাঁড়াও
সরিয়া!
অনেকে—সোরে যাও—স্থান দাও—পিছে
এস সবে।
এণ্টনি—অশ্রুজল থাকে যদি চক্ষে তোমাদের
এখনই তবে তাহা কর বরষণ!
তোমরা সবাই চেনো এ বসন তাঁর;
প্রথম যে দিন তিনি পরেন এ বাস,
স্পষ্ট মনে আছে তাহা। শিবিরে তাঁহার
এক দিন নিদাঘের অপরাহ্ণ-কালে
পরেন এ বস্ত্র খানি, যে দিন তাঁহার
নর্ভিয়স্ শত্রুদের করিলেন জয়।
এই হেথা ক্যাশিয়স্ বসায়েছে ছুরি;
কতখানি ছিন্ন হোয়ে গেছে দেখ, আহা
ক্যাস্কার অস্ত্রের ধারে; হেথায় ব্রূটস,
সীজরের প্রিয়তম, মারিয়াছে ছুরী,
দারুণ সে ছুরী যবে লয়েছিল টানি—
অমনি কত না রক্ত উঠিল উচ্ছ্বসি,
যেন দ্বার হোতে তারা ছুটিয়া আসিয়া
দেখিতে আইল, একি ব্রূটসের কাজ?

জানত তোমরা সবে আছিল ব্রূটস্
সীজরের প্রিয়তম পরম বান্ধব;—
দেবগণ! তোমরাই কর গো বিচার—
সীজর কত না ভাল বাসিত ব্রূটসে!
এই যে আঘাত হেথা দেখিছ তোমরা,
এ হোতে নিষ্ঠুরতর নাইক আঘাত;
মহান্ সীজর্ যবে দেখিলা ব্রূটস্
বিঁধাইল ছুরী তাঁরে তখনি অমনি
বিদ্রোহীর ছুরী চেয়ে তীক্ষ্ণ কৃতঘ্নতা
একেবারে অভিভূত করিল তাঁহারে!
'মহান্ হৃদয় তাঁর হইল শতধা!
বসনে বদন তাঁর ঢাকিয়া অমনি
পম্পির মূরতি তলে পড়িলা সীজর—
কি দারুণ পতন সে ওগো ভ্রাতৃগণ!
সেই সাথে সকলের, তোমার, আমার,
সমস্ত দেশের এই, হইল পতন,
রক্তাক্ত বিদ্রোহ শুধু তুলিল মস্তক!
কাঁদিছ তোমরা এবে, দেখিতেছি আমি
তোমাদের হৃদয়েতে জন্মিয়াছে দয়া!
পবিত্র এ অশ্রু বারি! কাঁদিছ তোমরা
দয়ার্দ্র হৃদয় সবে, হেরিয়া কেবল
সীজরের এই বসনের ছিদ্র গুলি;—
কিন্তু দেখ এই দিকে—হেথা তিনি নিজে
বিদ্রোহীর অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন কায়া!
প্রথম— কি দারুণ দৃশ্য!
দ্বিতীয়— আহা মহাত্মা সীজর!
তৃতীয়— হায় কি দুর্দ্দিন!
চতুর্থ— হারে পাষণ্ড পিশাচ!
প্রথম— একি ভয়ানক!
দ্বিতীয়— এর প্রতিশোধ চাই!
সকলে—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, চল, মার, কাট,

লাগাও আগুন—তবে কর ছারখার !
একটি পাষণ্ড যেন নাহি পায় ত্রাণ !
এণ্টনি— স্থির হও বন্ধুগণ !
প্রথম— থাম—থাম সবে
শোন কি বলিতে চান মহাত্মা এণ্টনি !
দ্বিতীয়—যাহা কিছু বলিবেন শুনিব আমরা,
যেথায় যাবেন লোয়ে যাইব সেথাই—
থাকিয়া উঁহারি পাশে মরিব সকলে !
এণ্টনি—বন্ধুগণ ! ভ্রাতৃগণ ! মোর কথা শুনি
সহসা বিদ্রোহে যেন উঠোনা মাতিয়া !
যাঁদের একাজ তাঁরা মহাশয় লোক !
সীজর যে কি তাঁদের কোরেছেন হানি
কিছুই জানি না আমি, শুধালে তাঁদের
কারণ কিছুনা কিছু দেখাবেন তাঁরা—
কেন না তাঁহারা বিজ্ঞ মহাশয় লোক !
হেথায় আসিনি আমি মন তোমাদের
লইতে হরণ করি। ব্রুটসের মত
বাগ্মী-শ্রেষ্ঠ নই আমি ; জানত তোমরা
আমি অতি শাদাশিদা স্পষ্টবক্তা লোক;—
বন্ধুরে আমার আমি ভাল বাসি বড় ;
যাদের আদেশ লোয়ে এসেছি হেথায়,
সে কথা জেনেও তারা দেছে অনুমতি
বলিতে দু এক কথা সে বন্ধুর হোয়ে !
কেন না তাহারা জানে,নাই বুদ্ধি মোর—
নাইকো পদার্থ কিছু, নাই বাক্য-বল,
অথবা নাইক হেন বক্তৃতা শকতি
যাহে মানুষের মন হয় উত্তেজিত !
যাহা মুখে আসে বলি ; তোমরা যা' জান
তার চেয়ে বেশী আমি বলিনি কিছুই !
সীজরের ক্ষত-চিহ্ন কর অনাবৃত !
তাহারা নীরব কণ্ঠে কবে মোর হোয়ে !

আমি যদি হতেম ব্রুটস্, আর যদি
ব্রুটস অ্যাণ্টনি হোত, তাহোলে অ্যাণ্টনি
সীজরের শরীরের প্রতি ক্ষত হোতে
বাহির করিত হেন অগ্নিময়ী ভাষা
রোমের পাষাণ শুদ্ধ জাগিয়া উঠিয়া
মাতিত বিদ্রোহ মদে।
সকলে— মাতিব আমরা।
প্রথম—আগুন লাগায়ে দিব ব্রুটসের ঘরে !
তৃতীয়—এস, চল,যাই তবে, খুঁজিগে তাদের
এণ্টনি—ধৈর্য্য ধর বন্ধুগণ শোন মোর কথা !
সকলে-থাম,শোন,কি বলেন মহাত্মা এণ্টনি !
অ্যাণ্টনি—বন্ধুগণ করিছ কি ? কি জন্য সীজর
হোয়েছেন প্রণয়ের পাত্র তোমাদের
এখনো জাননা তাহা ! বলি তবে শুন—
এ দানপত্রের কথা গিয়াছিনু ভুলে !
সকলে—ঠিক বটে,দানপত্র,পড়, শুনি তাহা
এণ্টনি—সীজরের সাক্ষরিত দানপত্র এই।
প্রত্যেক পুরবাসীরে দিয়াছেন তিনি
এক শত রৌপ্য মুদ্রা।
দ্বিতীয়— মহাত্মা সীজর !
প্রতিশোধ নিতে হবে তাঁর মরণের !
তৃতীয়—আহা উদার সীজর !
এণ্টনি— শোন ধৈর্য্যধরি !
সকলে—থাম, থাম সবে !
এণ্টনি— রাখিয়া গেছেন তিনি
প্রমোদ কানন তাঁর তোমাদের তরে,—
বংশ পরম্পরা তাহা তোমরা সকলে
পারিবে করিতে ভোগ। এই সীজরের
যোগ্য বটে ! এমন কি হবে আর ত্রুটি ?
প্রথম—কখন না ! এস চোলে,পুণ্যস্থানে নিয়ে
করিব অনল দান এ পবিত্র দেহে।

সেই চিতানল দিয়ে জ্বালাব আমরা
বিদ্রোহীদিগের ঘর !
দ্বিতীয়— যাও আন অগ্নি
তৃতীয়— টেনে আন কাষ্ঠাসন গুলা
চতুর্থ— ভেঙ্গে আন
জানালা দরজা !
অ্যাণ্টনি— এখন যা হয় হোক্
কাল শনি ! এবে তুই উঠিলি জাগিয়া—
যে পথে বাসনা তোর কর্ বিচরণ !

ইংলণ্ডে স্বাধীনতার উন্নতি।

আজকাল আমাদিগের মধ্যে স্বাধীনতার একটা ধুয়া উঠিয়াছে। পুত্র পিতার অবাধ্য হইয়া স্বাধীন হইতে চাহে, শিষ্য গুরুকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইতে চাহে, স্ত্রী স্বামীর শাসন কঠোর মনে করিয়া স্বাধীন হইতে চাহে। বাঙ্গালী জাতি "নাকে মুখে গুঁজে দুটো আলু ভাতে ভাত"সভার সমর-অঙ্গনে কথার তোপে ইংরাজদিগকে উড়াইয়া ভারত উদ্ধার করেন। তাঁদের যুক্তি প্রণালী এইরূপ—

ইংরাজ মানুষ
ইংরাজ স্বাধীন
বাঙ্গালী মানুষ

অতএব বাঙ্গালী কেন না স্বাধীন ?—

কিন্তু ইংরাজেরা যে কত যুগযুগান্তর হইতে যুঝাযুঝি করিয়া কত রক্তপাতের পর অল্পে অল্পে সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া তবে স্বাধীনতা-শিখরে আরোহণ করিয়াছেন তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া দেখি না—আমরা বালকের ন্যায়, বাতুলের ন্যায় এক লম্ফে তদুপরি আরোহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি, সুতরাং জগতের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ি। ইংরাজদিগের ন্যায় স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে কি করিয়া তাঁহারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলেন তাহা আমাদিগের আলোচনা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এবং এই প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয় আলোচনা করিব।

আধুনা ফ্রান্সদেশের ইতিহাস, ইতর লোকদিগের অপরিমিত আধিপত্যেরই ইতিহাস উহা স্বাধীনতার ইতিহাস নহে, পক্ষান্তরে সেইরূপ ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রকৃতরূপে স্বাধীনতারই ইতিহাস, ইতর লোকদিগের যথেচ্ছাচারের ইতিহাস নহে। রাজ্যের প্রাচীন তন্ত্র উচ্ছিন্ন না করিয়া কিরূপে সাধারণ প্রজাগণ নিজস্ব অধিকার ক্রমশঃ অর্জ্জন, রক্ষণ ও বর্দ্ধন করিয়াছে তাহা ইংলণ্ডের ইতিহাসে জাজ্বল্যরূপে প্রকাশ পায়। ইংলণ্ডের ইতিহাস সংস্কারের ইতিহাস, তাহা বিপ্লবের ইতিহাস

নহে।(১) ইংলণ্ডের ইতিহাস এক-নায়ক তন্ত্রের ইতিহাস, কিন্তু এই এক-নায়ক তন্ত্রের অধীনে প্রজাবর্গ সাধারণ-তন্ত্র-সুলভ সমস্ত স্বাধীনতাই অর্জ্জন করিয়াছে।(২) যে দেশে একরাজতন্ত্র, সম্ভ্রান্ততন্ত্র ও সাধারণ তন্ত্রের প্রণালী এরূপ ভাবে মিলিত করা হইয়াছে যে তাহা আর কুত্রাপি দেখা যায় না, সেই দেশের ইতিহাসের নামই ইংলণ্ডের ইতিহাস।(৩)

স্বয়ং প্রকৃতিই ইংলণ্ডকে বণিক ও নাবিকের আবাসভূমি করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডদ্বীপে এই জন্য উহার অধিবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই সমুদ্রের সহিত পরিচিত এবং উহার উপকূলে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসাগর, খাড়ি ও স্বাভাবিক বন্দর সকল অবস্থিত, যে তাহা নাবিকতার পক্ষে আশ্চর্য্য রূপ অনুকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূগোল মধ্যে ইংলণ্ডের যেরূপ স্থান-সন্নিবেশ তাহাতে অনেক জাতির সহিত বিস্তৃত বাণিজ্য সম্বন্ধ হইবার সুগমতা আছে। ইংলণ্ড পূর্ব্বদিকে নেদরল্যাণ্ড ও উত্তর য়ুরোপের দিকে প্রসারিত, দক্ষিণ দিকে ফ্রান্স ও স্পেনদেশের উপকূলের নিকটবর্ত্তী, পশ্চিমদিকে বিশাল আটলাণ্টিক মহাসাগর, পৃথিবীর বাণিজ্য-পথ তাহার জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছেন।

ইংলণ্ডের বায়ু যদিও ফ্রান্সের ন্যায় তত সুমধুর নয়, কিন্তু উহা নাতি শীতোষ্ণ স্বস্থ্যকর এবং বলপ্রদ। যদিও ইংলণ্ডের বায়ু পরিবর্ত্তনশীল, আর্দ্র এবং অনেক সময় দারুণ কষ্টপ্রদ কিন্তু তথাপি অতিরিক্ত শীত অতিরিক্ত গ্রীষ্ম হইতে একেবারে বিবর্জ্জিত। যে সকল বলবান জাতি বিভিন্ন সময়ে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে, তত্তাবতেরই বল, শক্তি, উদ্যম উহার আব হওয়া গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে—এই উত্তরদেশীয় ভূমি আরাম ও বিলাসের আবাস-ভূমি রূপে সঙ্কল্পিত হয় নাই—উহা যুদ্ধ, শীকার, সাহস, কষ্ট, বলবিক্রম, মনুষ্য ও প্রকৃতির সহিত যুঝাযুঝি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অটল বিশ্বাস, এবং পুরুষোচিত স্বাধীন ভাবের আবাস-স্থান রূপে সৃষ্ট।

ইংলণ্ডের মৃত্তিকা সাধারণতঃ উর্ব্বর।

(১) Il en est de meme dans tout le cours de l'histoire d'Angleterre : Jamais aucun element ancien ne perit completement, Jamais aucun element nouveau ne triomphe tout-a-fait, Jamais aucun principe special ne parvient a une domination exclusive. I ly a toujours developpement semultané des defferentes forces, transactions entre leurs pretentions et leurs interets—Guizot, Hist. de la Civ. 335.

(২) M. Thiers, speaking in the National Assembly, at Mersailles, on June 8.1871. declared that he found greater liberty existing in London than in Washington.—Times, June 10, 1871. In a recent political satire, the constitutional monarchy has been irreverently described as a democratic republic, tempered by snobbism and corruption—Prince Florestan.

(৩) M. le Play says, England is patriarchal in the home, demorcratic in the parish, aristocratic in the country, and monarchical in the state—La constitution d'Angleterre. 1876.

যদিও ফ্রান্সের ন্যায় ইহার ক্ষেত্র সকল বিচিত্র প্রাচুর্য্যে ভারাক্রান্ত নহে তথাপি পশু-পালনের জন্য বিশেষতঃ অশ্বের বংশোন্নতির (horse-breeding) জন্য প্রসিদ্ধ। কৃষকের পরিশ্রম ও পটুতায় দিব্য ফসল উৎপন্ন হয় কিন্তু যেরূপ আমাদের দেশে প্রকৃতির বদান্যতার উপর আরামের সহিত সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করা যায়, সেখানে সে জো নাই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিলে তবে কৃষক ফললাভ করিতে পারে। পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য সকল অতীব বিচিত্র এবং মনোহর, ক্ষুদ্র পর্ব্বত, উপতাকা, বনভূমি, ঘূর্ণমান নদী, বিচিত্র বিচিত্র মাঠ, এবং বায়ু-সেবিত Downs ও Common, এই সকল সেখানকার বিশেষ লক্ষণ। যে জাতি গ্রাম্য জীবনের আরাম উপভোগ করিতে পারে ইংলণ্ডকে প্রকৃতি দেবী সেই জাতির উপযুক্ত আবাস করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এক জন ফরাসী নগরে থাকিয়া যেরূপ সুখী হয় এরূপ আর কোথাও হয় না,—এক জন ইংরাজ রাস্তায় মুমূর্ষু হইয়া পড়ে কিন্তু পর্ব্বত-পার্শ্বে, নদী এবং সমুদ্রের উপকূলের মুক্ত বায়ুতে যেন নূতন জীবন পায়, এবং ইংরাজদিগের এই চিরন্তন স্বাভাবিক পল্লী-প্রেম ইংলণ্ডের সমাজ ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ইংলণ্ডের আর একটি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ তাহার খনিগর্ভ-ঐশ্বর্য্য—মৃদঙ্গার, লৌহ, টিন, দস্তা, তাঁবা প্রভৃতি ইংলণ্ডে যেরূপ প্রচুর এরূপ য়ুরোপের আর কোন দেশেই নহে। প্রকৃতি দেবী ইংলণ্ডকে যেমন একদিকে সমুদ্র-বাণিজ্যের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন তেমনি আবার তাহাকে সর্ব্বপ্রকার শিল্পের আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বিনা পরিশ্রমে, বিনা কষ্টে, নিরাপদে এই খনিগর্ভ-ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার জো নাই। যেরূপ সমুদ্র-গর্ভে সেই রূপ খনিগর্ভে নানা প্রকার ভয়ানক বিপদ; কি সমুদ্রে কি ভূগর্ভে ব্যবসায়ের উদ্দেশে তাহাদিগকে কতই না পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, কতই না কস্ট সহ্য করিতে হয়, এমন কি সময়ে সময়ে প্রাণ ও স্বাস্থ্য অকাতরে বিসর্জ্জন করিতে হয়। আর দেখা যায় যে ইংরাজদিগের স্বাভাবিক শারীরিক বল ও দৃঢ়তা তাহাদিগকে য়ুরোপীয় সমস্ত শ্রমজীবীদিগের মধ্যে প্রধান করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রকার শারীরিক ও নৈতিক বল থাকা প্রযুক্তই বৃটিস জাতি সভ্যতা, সামাজিক উন্নতি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিকে ক্রমিকই স্থির ভাবে অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে।

রোমীয়দিগের রাজত্ব-কাল হইতে ইংলণ্ড কি করিয়া ক্রমশঃ স্বাধীনতা শিখরে আরোহণ করিল তাহা সবিস্তরে বর্ণনা করিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়, এই স্বল্পায়তন পত্রিকা তাহার উপযোগী নহে। এই উনবিংশতি শতাব্দির মধ্যে ইংলণ্ডে কি কি আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে ও তাহার ফল কি হইয়াছে তাহাই সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বিবৃত করা

যাইতেছে। আমাদিগের এক্ষণে আন্দোলনের কাল উপস্থিত হইয়াছে। নানা বিষয়ে আন্দোলন করিয়া ইংলণ্ডে কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিবার ঠিক এই সময় উপস্থিত।

তৃতীয় জর্জের রাজত্বকাল হইতে ইংলণ্ড দ্রুতগতি উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতেছে। আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন এবং নেদরল্যাণ্ডের বাণিজ্য হ্রাস হওয়া অবধি ইংলণ্ড নাবিকতা, বাণিজ্য এবং শিল্প কার্য্যে ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিতেছিল। কিন্তু এই উনবিংশতি শতাব্দির আরম্ভ হইতে ইংলণ্ডের উন্নতি আরও জাজ্বল্যমান-রূপে পরিলক্ষিত হয়। লোক-সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল(১) (প্রধানত নগর ও উপনগরে); কৃষি-বিদ্যা উৎসাহিত হইল এবং কৃষি-কার্য্য উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিল। কিন্তু বাণিজ্য ও শিল্প কৃষিকার্য্যকে ছাড়াইয়া উঠিল (২)। পূর্ব্বে ভূমিই ধনাগমের প্রধান উপায় এবং প্রজাবর্গের প্রধান উপজীবিকা ছিল, এক্ষণে ভূমির তত আদর অনেকটা খর্ব্ব হইল। অল্প সময় মধ্যে বিস্তৃত নগর উপনগর সকল সমুথিত হইতে লাগিল লণ্ডনের লোকসংখ্যা সমস্ত স্কটলণ্ডের সমান হইয়া উঠিল। Liverpool Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield এবং Glasgow বৃহৎ বৃহৎ রাজ্যের রাজধানীর ন্যায় প্রাধান্য লাভ করিল। সূতাকাটার কল (spinning jenny) এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের আবির্ভাবে পশম এবং তুলা-জাত দ্রব্যের কারখানা সকল প্রভূত উদ্যম ও উত্তেজনা লাভ করিল এবং সেই সকল দ্রব্য ইংলণ্ড সমস্ত পৃথিবীকে যোগাইতে লাগিল। লৌহ প্রভৃতি ধাতু এবং যন্ত্রের কারখানায় খুব কাজ চলিতে আরম্ভ হইল। এই সকল শ্রমজ শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খনি-খননের উন্নতি হইল।

খাল খনন দ্বারা নাব্য নদীর উন্নতি সাধন ও উৎকৃষ্ট রাজপথ নির্ম্মাণ এবং বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয় পোতের আবির্ভাবে আভ্যন্তরিক গতিবিধি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের যৎপরোনাস্তি সুবিধা হইল।

Arkwright Watt এবং Stepheason ইংলণ্ড ও পৃথিবীর শিল্পরাজ্যে মহাবিপ্লব আনয়ন করিয়া সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিলেন। ধনী সদাগর, পোতাধিকারী এবং কারখানাওয়ালারা ঐশ্বর্য্যে ও মান মর্য্যাদা বিষয়ে জমিদারদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র ব্যবসাদার উন্নতিশীল প্রজাগণের বিবিধ অভাব মোচন করিয়া ধনী হইয়া উঠিল এবং কৃষকের সংখ্যা অপেক্ষা শিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। সামাজিক পরিবর্ত্তনের এই খানেই সীমা নহে। ক্রমাগত মূলধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার একদল স্বাধীন সম্ভ্রান্ত লোক এবং আর এক দল নূতন মধ্যম শ্রেণীর ভদ্র লোকের উৎপত্তি হইল। ইঁহারা জমিদারও নহে বণিকও নহে; কিন্তু তথাপি রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জো নাই। Bath, Cheltenham, Leamington, Brighton, Hastings, এবং লণ্ডনের উপনগর সকল তাহাদিগের সংখ্যা ও ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান

(১) In 1801 the population of Great Britain was 10,942,854, in 1831, it had increasod to 16, 539, 378. Population Return of 18018 1831; Porter, Progres of the Nation. Chap I.

(২) In 1811,895, 998 families were employed in agriculture in Great Britain, and 129,049 in trade and manufactures; 'in 1831, 961,134, families were employed in the former aand 1 434,873 in the latter. In 1841, 14 80, 785 persons were employed in agriculture and 3,092,787 in trade and manufactures.—Porter, Chap 1.

করে। দেশের সাধারণ উন্নতিতে জমিদার-গণও পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ধনী হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগের পদোচিত কর্ত্তব্য সাধন পূর্ব্বক তাহাদিগের চিরাগত স্থানিক আধিপত্য রাখিয়া ছিল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগের আর অবিসম্বাদিত প্রাধান্য রহিল না। এই সকল সামাজিক পরিবর্ত্তন ৪র্থ জর্জের রাজত্বকালে বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়, এবং ইহা আবহমান কাল ক্রমাগত চলিতেছে। এই সময়ে সামাজিক উন্নতি অপেক্ষা রাজনৈতিক উন্নতি আরও জাজ্বল্যরূপে লক্ষিত হয়।

যেমন একদিকে বণিকদলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া জমিদারদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইতে লাগিল তেমনি আবার রাজাধিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আর একাধিপত্য রহিল না। Restoration এর পর Puritan সম্প্রদায় একেবারে পদদলিত ও নির্মূলিত হয়, এবং ১৯শ শতাব্দির প্রাক্কালে Non-confomists Churchmenদিগের ন্যায় নিদ্রাভিভূত হয়। পূর্ব্বকালের ভীষণ ধর্ম্ম-বিবাদের পর কিয়ৎকাল শান্তির অধিষ্ঠান হইল। তার পরে আবার Wesley এবং Whitfield একটি নূতন ধর্ম্ম-আন্দোলন উপস্থিত করিলেন।—প্রতিবাদ-সম্প্রদায় (Dissenters) দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। Wales রাজ্য-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের প্রায় একেবারে অধিকারচ্যুতি হইল; কারখানাওয়ালা নগরের অসংখ্য অধিবাসীগণ প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের দলভুক্ত হইতে লাগিল। এইরূপে রাজ্যপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দির অপেক্ষা প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। যদিও প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় স্বকীয় চিরাগত বৈধ অধিকার ও নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হয় নাই তথাপি সাধারণ প্রজাদিগের উপর আর তাহার একাধিপত্য রহিল না। তাহার পর Presbyterian সম্প্রদায় দলভুক্ত Scotland এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত Irelandএর যখন সম্মিলন হইল তখন রাজ্যপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের পদবী আরও বিচলিত হইয়া উঠিল।

ভূম্যধিকারী ও রাজ্যপালিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় উভয়ই উভয়ের চির-সহায়। এই উভয়েরই আধিপত্যের হ্রাস হইল। বিধর্ম্মীর অধিকার-চ্যুতি, সংকীর্ণ নির্ব্বাচন-প্রণালী, ভয়ানক কঠোর ফৌজদারি দণ্ড-বিধি, অসমান ও দুর্ব্বহ কর স্থাপন, বাণিজ্য ও সাধারণ প্রজাবর্গের খাদ্য সামগ্রী ও পরিশ্রম বিষয়ে নানা প্রকার হানি-জনক ও বাধাজনক নিয়ম স্থাপন—এই সকল অত্যাচার ও কুনিয়ম এই উভয় দলের পরস্পর সহায়তায় বরাবর অবাধে চলিয়া আসিতে ছিল। এক্ষণে সমাজের রক্ষণশীল ও পরিবর্ত্তনশীল এই দুই দলের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। পল্লীগ্রাম নগরের বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিল এবং ক্যাথলিক ও সর্ব্বপ্রকার প্রতিবাদী খৃষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য-পালিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বদ্ধপরিকর হইল। বাহ্য সুখ সমৃদ্ধি ও সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতিসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষারও উন্নতি হইতে লাগিল। পার্লামেণ্ট সভার বাদানুবাদ সকল সাধারণের নিকট মুক্তভাবে প্রকাশ করা তাহার একটি প্রধান কারণ বলিতে হইবে। দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোক তাহাদিগের বাদানুবাদের ন্যায় অন্যায় বিচার করিবে এই ভরসায় সভার মধ্যে কোন সভ্য-দল সংখ্যায় হীন হইলেও সাহস পূর্ব্বক মন খুলিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে পারিল। এই রূপে সর্ব্ব সাধারণ মতের একটি স্বতন্ত্র প্রভাব ও আধিপত্য সৃষ্ট হইল। এই সাধারণ মতের নিকট রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ দলকেও নতশির হইতে হইল। যদি মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে আর

কোনও উপকার না হইয়া থাকে, অন্ততঃ এই উপকারটি হইয়াছে, মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। প্রজা সাধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা আরও অনেক উন্নতি সাধিত হইয়ছে। যদিও তখন নানা প্রকার কঠোর নিয়মে মুদ্রাযন্ত্র বদ্ধ ছিল, তথাপি উহার প্রভাব ক্রমশই বিস্তৃত হইতে লাগিল। সাধারণ সমাজ যেমন জ্ঞানানুশীলনে উন্নত হইতে লাগিল সেই সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক সাহিত্য-পত্র ক্ষেত্রে উচ্চ দরের লোক সকল আকৃষ্ট হইতে লাগিল। *

অধ্যাত্ম-বিদ্যার প্রথম প্রস্তাব।

যে বিদ্যা-দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্য উপার্জ্জন করা যায় তাহাই অধ্যাত্ম-বিদ্যা নামের বাচ্য। আধ্যাত্মিক সত্য—কি না আত্মা-বিষয়ক সত্য। এ সত্য অনেকে জানিতে চাহেন না—তাঁহারা বলেন "তাহাতে কোন লাভ নাই, তা'-চেয়ে ভৌতিক সত্য জানিলে তাহাতে অনেক ফল দর্শে। তাহাতে অন্ন বস্ত্র গৃহ এবং আর আর নানা বিধ উপকরণ সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধনের উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে।"

উত্তর পক্ষ। "কিন্তু সে উৎকর্ষ সাধন কাহার জন্য?—যাহার জন্য এত কাণ্ড তাহাকে কি জানিতে ইচ্ছা করে না? অন্ততঃ সে স্থায়ী কি অস্থায়ী এটাও ত জানা প্রয়োজন। একটা বাড়ি যদি দৈবগতিকে তোমার অধিকারায়ত্ত হয়, তবে তাহার দলিল কাঁচা কি পাকা তাহা জানিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না? যদি জানিতে পার যে, দু দিন পরেই সে বাড়ির উপরে আর তোমার কোন স্বত্ব থাকিবে না তবে তাহার উৎকর্ষ সাধনে তোমার প্রবৃত্তি হয় কি?"

পূর্ব্বপক্ষ। "বাড়ির দলিল কাঁচা কি পাকা তাহা জানিতে ইচ্ছা হইলে হইবে কি? যতক্ষণ না দলিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় ততক্ষণ করা যায় কি? আপাততঃ বাড়ির উপর যে অধিকার-টুকু আমার বর্ত্তিয়াছে তাহাই যথালাভ মনে করিয়া সন্তোষ অবলম্বন করাই শ্রেয়; বাড়ির দলিল পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যে বাড়ি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে সত্য,—যদি আমার চিরস্থায়িত্বের একটা পাকা দলিল পাওয়া যায়, তবে তাহার মত সুখের বিষয় আর কিছুই নাই। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় কই? আত্মাকে জানিতে খুবই ইচ্ছা করে কিন্তু জানিতে পারা যায় কই?

উত্তর পক্ষ। জানিতে পারা যায় না কি? তুমি যে কোন বস্তু দেখো, শোনো, বা স্পর্শ কর তাহার সঙ্গে ত এটা জান যে তুমিই দেখিতেছ শুনিতেছ স্পর্শ করিতেছ? না তা'ও জান না?

পূর্ব্বপক্ষ। অনেক সময় বাহ্য বিষয়ে আমাদের মন এরূপ মগ্ন থাকে যে তখন আপনার প্রতি আমাদের আদবেই লক্ষ্য

* এই সময়ে Edinburgh Review Quarterly Review এবং Westminster Review প্রকাশিত হয়—ব্রুম, বেন্থাম, মিল প্রভৃতি বড়বড় লোক লেখক ছিলেন।

থাকে না, তখন আমরা আপনাকে ভুলিয়া থাকি; তবে আর কিরূপে বলিব যে, সে অবস্থাতেও বাহ্য-বিষয় জানিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে তাহার জ্ঞাতা বলিয়া জানিয়া থাকি? তখন ত বহির্বিষয়েতেই মন ষোলো আনা মগ্ন থাকে—আপনাতে এক আনাও ত অবস্থিতি করে না।

উত্তর পক্ষ। এই কি ঠিক্? তোমরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ভক্ত, পরীক্ষা না করিয়া কোন একটা কথা ঠিক্ কি অঠিক্ তাহা বলিতে চাও না—আন্দাজে কোন কথা বলিতে চাও না; আমারও সেই মত। তোমার ও-কথাটা একবার তৌল করিয়া না দেখিয়া তাহা যে, ঠিক্, তাহাও বলিতে পারি না, অঠিক্, তাহাও বলিতে পারি না; পরীক্ষায় যাহা দাঁড়াইবে তাহাই ঠিক। পরীক্ষায় কি দাঁড়ায় তাহাই দেখা যা'ক। তুমি অনন্য-মনে একটা উপন্যাস পাঠ করিতেছ—তোমার মতানুসারে সেই উপন্যাসের প্রতি তোমার মন ষোলো আনা, তোমার আপনার প্রতি এক আনাও নহে। তোমার মতানুসারে তুমি উপন্যাসই পাঠ করিতেছ কিন্তু তুমিই যে তাহা করিতেছ, তাহা তোমার মনের অগোচর। তাহার পরে পাঠ সাঙ্গ করিয়া তুমি যখন উঠিয়া আইলে তখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

"ও ঘরে এতক্ষণ কে ছিল?"

উত্তর। "আমি ছিলাম"

প্রশ্ন। "তুমি কি করিতেছিলে?"

উত্তর। "আমি উপন্যাস পড়িতেছিলাম?"

প্রশ্ন। "তুমি না আর কেহ?"

উত্তর। "আর কেহ নহে আমিই পড়িতেছিলাম।"

প্রশ্ন। "তোমার বেস্ স্মরণ হইতেছে যে তুমি পড়িতেছিলে?"

উত্তর। "এই মাত্র আমি পাঠ সাঙ্গ করিয়া উঠিয়া আসিতেছি—স্মরণ আর হইবে না?"

এখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে, যে কথা পূর্ব্বে কোন সময়েই জ্ঞানের গোচর ছিল না, তাহা কি পরে স্মরণে উদিত হইতে পারে? মনের অভ্যন্তরে জ্ঞাত-পূর্ব্ব বিষয়ের অনুবৃত্তির নামই না স্মরণ,—জ্ঞাত-পূর্ব্ব বিষয়ের সহিত সম্পর্ক-রহিত স্মরণ কি কেহ কখন স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারে? আজ আমার স্মরণ হইতেছে যে, গত কল্য আমি মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়াছিলাম কিন্তু ও-বৃত্তান্তটি গত কল্য আমার জ্ঞানের অগোচর ছিল—ইহাও কি কখন হইতে পারে? অতএব ইহা আর বলিয়া বুঝাইবার কথা নহে যে জানা-বিষয়েরই স্মরণ হয়, ও যত অধিক জানা বিষয় হয় তত তাহা অধিক স্মরণ-গম্য হয়, যত অল্প জানা বিষয় হয় তত তাহা অল্প স্মরণ-গম্য হয়, এ ভিন্ন ঐকান্তিক অজানা বিষয় কোন মতেই স্মরণ-গম্য হইতে পারে না। তবে,—তুমি উপন্যাস পাঠ করিতেছ কিন্তু তুমিই যে তাহা করিতেছ ইহা তোমার একেবারেই জ্ঞানের অগোচর, এ কথাটি পরীক্ষায় টেঁকিল না;—পরে যখন তোমার স্মরণ হইয়াছে যে তুমিই পাঠ করিতেছিলে, তখন, পাঠ-কালেও তোমার জ্ঞান ছিল যে, তুমিই পাঠ করিতেছ; কেন না স্মরণ নূতন কোন বিষয়ের কথা বলে না, পূর্ব্বে যাহা জানা হইয়াছে তাহাই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র; পূর্ব্বে কোন কালে যদি সাক্ষাৎ জ্ঞান না হইয়া থাকে তবে স্মরণ কাহার কথা পুনরাবৃত্তি করিবে? যদি সূর্য্যই না থাকে তবে চন্দ্র কাহার জ্যোতি প্রতিফলিত করিবে? অতএব ইহা অকাট্য যে, যখনই আমরা কোন বিষয় দেখি বা শুনি বা কোন প্রকারে জানি, তখনই আমরা জানি যে, আমিই দেখিতেছি, শুনিতেছি, জানি-

তেছি—সকল জানার সঙ্গেই আত্ম-জ্ঞান (অর্থাৎ আপনাকে জানা) লাগিয়া থাকে। জ্ঞানের সহিত অন্য কোন বিষয় (যেমন হাতি বা ঘোড়া) যুক্ত থাকিতেও পারে বিযুক্ত থাকিতেও পারে; কিন্তু জ্ঞানের সহিত আত্মজ্ঞান নিরন্তরই যুক্ত রহিয়াছে,—তবে তুমি কেমন করিয়া বল যে, আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে বটে কিন্তু জানিতে পারা যায় না। এ বস্তু যখন দেখিতেছ তখনও তুমি আপনাকে জানিতেছ যে, আমিই ইহার দ্রষ্টা; এ বস্তু না দেখিয়া যদি ও-বস্তু দেখ তখনও তুমি আপনাকে জানিবে যে, আমিই উহার দ্রষ্টা; যখন চক্ষু মুদিয়া কোন বস্তু চিন্তা করিতেছ তখনও আপনাকে ধ্যাতা বলিয়া জানিতেছ;—জ্ঞান-মাত্রেরই সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর জানিতেছ;—তবে আর কোন্ লজ্জায় বল যে, আত্মা তোমার জ্ঞানের অগোচর,—সাত কাণ্ড রামায়ণ পাঠ করিয়া কোন্ লজ্জায় বল "সীতা কাহার ভার্য্যা ?"

পূর্ব্ব পক্ষ। ভাল, পরীক্ষায় তোমারই কথা যেন বলবৎ রহিল, কিন্তু তাহা যদি হইল—জ্ঞান-মাত্রেরই সঙ্গে নিরন্তর আমরা আত্মাকে জানিয়া থাকি এ যদি সত্য হইল—তবে কেন মনে হয় যে, বাহ্য-বিষয়-সকল যেমন আমরা জানি আত্মাকে তেমনটি জানি না, এমন-কি এক এক সময়ে বাহ্য-বিষয়ের টানে পড়িয়া আপনাকে ভুলিয়া ছিলাম বলিয়াও মনে হয়।

উত্তর পক্ষ। ওরূপ যে হয় তাহার কারণ স্পষ্টই ত পড়িয়া আছে। বেশী-মাত্রা ঘনিষ্ঠতা অবজ্ঞার উৎপাদক (Familiarity breeds contempt)। আমরা যা' যখন জানি তা'রই সঙ্গে নাকি আত্মাকে জানি তাই আত্মজ্ঞান বিশেষ-কোন-কিছু বলিয়া আমাদের চক্ষে ঠেকে না। পঞ্চদশী-গ্রন্থে আছে যে এক-এক-জন করিয়া দশজন নদীর পরপারে নীত হইলে-পর প্রত্যেকে গননা করিয়া নয়জন বই আর দেখিতে পাইল না—কেননা সকলেই আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে। আর এক কথা এই যে, যখন তদ্‌গদ চিত্তে উপন্যাস পাঠ করা যায় তখন সেই উপন্যাসের প্রতি মনের বেগ ষোলো আনা না হউক—বেশী মাত্রা যায়, এজন্য মোটামুটি এক প্রকার বলিতে পারা যায় যে, আপনাকে তখন আমরা ভুলিয়া আছি। কিন্তু ধরিতে গেলে তখনও আপনার প্রতি আমাদের কতক না কতক মাত্রা মনের লাগ থাকেই থাকে; এমন কি উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে আপনার সঙ্গে একাত্মা পাতানো হইয়া থাকে,—আর সেই গতিকে আমরা আমাদের সাংসারিক অবস্থা ভুলিয়া থাকি—সত্য বটে, কিন্তু তা' বলিয়া তখন ত আর আমরা আপনাকে একেবারেই ভুলিয়া নাই—কল্পনা-রাজ্যে তখন আপনাকে খুবই জাগ্রত দেখিতেছি। পাঠ সাঙ্গ হইলে উপন্যাস-হইতে মন যখন প্রত্যাবৃত্ত হয় তখন স্মৃতি-পটে, পঠিত উপন্যাস এবং পাঠক আপনি এ দুই জ্ঞান অপেক্ষা-কৃত সাম্যে পরিণত হয়; এজন্য তখন আত্মজ্ঞান অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতা প্রাপ্ত হয়; পূর্ব্বে নয় বারো আনা উপন্যাস-জ্ঞান চারি আনা আত্ম-জ্ঞান ছিল, এখন নয় আট আনা উপন্যাস-জ্ঞান আট আনা আত্মজ্ঞান বা তাহার একটু এদিক্ ওদিক্ হইল—এই যা' কেবল; কিন্তু এমন কোন জ্ঞান হইতে পারে না যাহার সহিত একেবারেই আত্মজ্ঞানের কোন সংশ্রব নাই।

ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, তুমি আত্মাকে জান কিন্তু বলিতে চাহ না যে, তুমি জান; তোমার অভিপ্রায় এই যে, তোমার সে জানা অতি যৎসামান্য—তাহা কোন কাজের নহে। কিন্তু তোমার জানা উচিত যে মনুষ্য প্রথমে জঙ্গলা ভুমি পায়, পরে চাস আবাদ করিয়া তাহাকে সুন্দর

শস্য-ক্ষেত্র ও ফল-পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে; লোকে জঙ্গলা ভূমিতে অধিকার পাইলে তাহাতে বড় যে একটা লাভ মনে করে তাহা নহে কিন্তু অভাব-পক্ষে তাহাই তাহার যথা-লাভ; কেন না সে জঙ্গলা-ভূমিকে মূল্যবান শস্য-ক্ষেত্র করিয়া তোলা তাহার আপনারই হাত। কেবল---তাহাতে যত্ন চাই। যে আত্মজ্ঞান অযত্ন-সুলভ তাহার মূল্য যে অতি সামান্য মনে হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে; বায়ু আমাদের সাক্ষাৎ জীবন, কিন্তু তাহার মূল্য আমাদের নিকটে কিছুই নহে,—কেন না তাহা অযত্ন-সুলভ; কোন কল-কৌশল দ্বারা যদি কোন স্থানের বায়ুকে এমনি নির্ম্মল করিয়া গড়িয়া তোলা যায় যে, সেখানে দিন দুই বাস করিলেই শরীর সকল-প্রকার ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়,—তখন তাহার কত না মূল্য হয়!—কেন? না তখন তাহা প্রভূত যত্ন-সম্ভূত। আধ্যাত্মিক চর্চ্চায় যত্ন অতি অল্প লোকের দেখা যায় বটে—শুধু কেবল এখনকার কালে নহে, সর্ব্ব কালেই,—প্রাচীন কালের ভগবদ্গীতা বলেন

"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে"

সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে একজন যদি কেহ যত্ন করে—তাহার অধিক নহে। কিন্তু যত্ন করিলে যে, কিছুই ফল লাভ হইবে না এ কথা কথাই নহে। এ বিষয়ে রামমোহন রায়ের আমলের একটি গান আছে,

চিত্ত ক্ষেত্র পবিত্র করিয়ে ওরে মন
আত্ম-উপাসনা বীজ কররে বপন।
প্রযত্ন-সেচনী ধরি, বিবেক বৈরাগ্য বারি
প্রাণ-পণে প্রতিক্ষণে কররে সেচন।
হবে বৃক্ষ মোক্ষময় নিত্যজ্ঞান ফলোদয়
নিশ্চিত অমৃত লাভ সে ফল ফলিলে;
ইহাতে হইলে মতি ঘুচিবে দুঃখ দুর্গতি
পাইবে পরম গতি নিত্য সুখী হবে মন॥

আত্ম-উপাসনা শব্দের অর্থ এখানে পরমাত্মার উপাসনা—কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্র পবিত্র করা তাহার একটি প্রধান আয়োজন এবং তাহা করিতে হইলে আত্মার প্রতি দৃষ্টি চাই। চিত্রক্ষেত্র পবিত্র করা কাহাকে বলে? না আত্মাকে বিষয়ের আধিপত্য হইতে মুক্ত করা, বিষয়াকর্ষণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আত্মাকে সিংহাসনস্থ করা। আমরা যদি জাগ্রত জীবন্ত আত্মার ন্যায় কার্য্য করি তাহা হইলেই জাগ্রত জীবন্ত আত্মা বলিয়া আপনাকে জানিতে পারি;—তাহাতে আমরা যত কৃতকার্য্য হইব ততই আমাদের আত্মজ্ঞানে মূল্য বর্ত্তিবে—, তখন আর আত্মজ্ঞানকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে না। এখন যে, আত্মজ্ঞানকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, সে কেবল—দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানা যায় না—এই গতিকে; কেননা আমাদের আত্মজ্ঞান যদি চলিয়া যায় তবে আমাদের কোন জ্ঞানই থাকে না, কিছুই থাকে না। ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে এই যে, সুপরিস্ফুট আত্মজ্ঞান যত্ন-সাপেক্ষ—কাল-সাপেক্ষ, কিন্তু তা বলিয়া তাহা আমাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত বা অধিকার-বহির্ভূত নহে, আর অপারিস্ফুট আত্মজ্ঞান অযত্ন-সুলভ জঙ্গলা ভূমি বটে কিন্তু তা বলিয়া তাহা অকিঞ্চিৎকর ত্যজ্য বস্তু নহে।

দুদিন।

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহার জাল
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুল পত্র হীন ;
অর্দ্ধমৃত পৃথিবীর মুখের উপরে
বিষাদে প্রকৃতি-মাতা,শুভ্র বাষ্পজালে গাঁথা
কুজ্ঝটি-বসন খানি দেছেন টানিয়া ;
পশ্চিমে গিয়াছে রবি স্তব্ধ সন্ধ্যাবেলা,
বিদেশে আসিনু শ্রান্ত পথিক একেলা।

রহিনু দুদিন
এখনো রোয়েছে শীত—বিহঙ্গ গাহেনা গীত
এখনো ঝরিছে পাতা পড়িছে তুহিন।
বসন্তের প্রাণ-ভরা চুম্বন পরশে
সর্ব্ব অঙ্গ শিহরিয়া পুলকে আকুল হিয়া
মৃত শয্যা হোতে ধরা জাগেনি হরষে।
এক দিন দুই দিন ফুরাইল শেষে
আবার উঠিতে হোল চলিনু বিদেশে।

এক খানা ভাঙ্গা লঘু মেঘের মতন
কত গিরি হোতে গিরি বেড়াতেছি ফিরিফিরি
যে দিকে লইয়া যায় অদৃষ্ট পবন।
আসিলাম একবার শুভদৈব বলে
ফুলে ফুলে ভরা এক হরিত অচলে।

রহিনু দুদিন—
সাঁঝের কিরণ পিয়া—নির্ঝরের জলে গিয়া
ইন্দ্রধনু নিরমিয়া খেলিলাম কত,
ডুবে গেনু জোছনায়, আঁধার পাখার গায়
বসালেম তারা শত শত।

ফুরালো দুদিন—
সহসা আরেক দিকে বহিল পবন
দুদিনের খেলা ধূলা ফুরালো আমার
আবার—আরেক দিকে চলিনু আবার।

এই যে ফিরানু মুখ চলিনু পূরবে,
আর কি গো এ জীবনে ফিরে আসা হবে ?
কত মুখ দেখিয়াছি দেখিব না আর—
ঘটনা ঘটিবে শত, বরষ বরষ কত
জীবনের পর দিয়া হোয়ে যাবে পার ;
হয় ত গো এক দিন অতি দূর দেশে
আসিয়াছে সন্ধ্যা হোয়ে,বাতাস যেতেছে বোয়ে
একেলা নদীর তীরে রহিয়াছি বোসে,
হুহু কোরে উঠিবেক সহসা এ হিয়া,
সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া
একটি অস্ফুট রেখা, সহসা দিবেক দেখা
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া,
একটি গানের ছত্র পড়িবেক মনে
দুয়েকটি সুর তার উদিবে স্মরণে !
অবশেষে একেবারে সহসা সবলে
বিস্মৃতির বাঁধগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া ফেলি
সে দিনের কথা গুলি বণ্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন।

পাষাণ মানব মনে সহিবে সকলি।
ভুলিব, যতই যাবে বর্ষ বর্ষ চলি—
কিন্তু আহা দুদিনের তরে হেথা এনু,
একটি কোমল হৃদি ভেঙ্গে রেখে গেনু।

তার সেই মুখ খানি কাঁদো কাঁদো মুখ,
এলানো কুন্তল জালে ছাইয়াছে বুক,
বাষ্পময় আঁখি ছুটি, অনিমিষ আছে ফুটি
আমারি মুখের পানে ; অঞ্চল লুটিছে—
থেকে থেকে উচ্ছ্বসিয়া কাঁদিয়া উঠিছে,
সেই সে মুখানি, আহা করুণ মুখানি—
সুকুমার কুসুমটি—জীবন আমার—
বুক চিরে হৃদয়ের হৃদয় মাঝার
শত বর্ষ রাখি যদি দিবস রজনী
মেটেনা মেটেনা তবু তিয়াষ আমার ;—
শত ফুল দলে গড়া সেই মুখ তার
স্বপনেতে প্রতিনিশি হৃদয়ে উদিবে আসি
এলানো কুন্তল জাল আকুল নয়ন।
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে—
নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে
নক্ষত্র তারার মাঝে উঠিবেক ফুটে
ধীরে ধীরে রেখা রেখা সেই মুখ তার
নিঃশব্দে মুখের পানে চাহিয়া আমার।
চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুম ঘোরে
"যাবে তবে ? যাবে" সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে।
সাহারার অগ্নিশ্বাস একটি পবনোচ্ছ্বাস
স্নিগ্ধচ্ছায়া সুকুমার ফুল বন পরে
বহিয়া গেলাম চলি মুহূর্ত্তের তরে—
কোমলা যূথীর এক পাপড়ি খসিল
ম্রিয়মান বৃন্ত তার নোয়ায়ে পড়িল।
ফুরালো ছুদিন—
শরতে যে শাখা হোয়েছিল পত্র হীন
এ ছুদিনে সে শাখা উঠেনি মুকুলিয়া।
অচল শিখর পরি যে তুষার ছিল পড়ি
এ ছুদিনে কণা তার যায় নি গলিয়া,
কিন্তু এ ছুদিন মাঝে একটি পরাণে
কি বিপ্লব বাধিয়াছে কেহ নাহি জানে !—
ক্ষুদ্র এ ছুদিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া !
ছুদিনের পদ চিহ্ন চিরকাল তরে
অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে !

শ্রী দিক্ শূন্য ভট্টাচার্য্য।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

আমরা এখন লণ্ডন ত্যাগ কোরে এসেছি। লণ্ডনের জন-সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা খেলে তা' জান ? বসন্তের আরম্ভ থেকে গর্ম্মির কিছুদিন পর্য্যন্ত লণ্ডনের জোয়ার অর্থাৎ Season ; এই সময়ে লণ্ডন উৎসবে পূর্ণ থাকে, থিয়েটার, নাচ, গান, প্রকাশ্য ও পারিবারিক "বল," আমোদ প্রমোদে চারদিক ঘেঁসাঘেঁসি ঠেসাঠেসি। ধনীলোকদের বিলাসিনী মেয়েরা রাতকে দিন কোরে তোলে। আজ তাদের নাচের নেমন্তন্ন, কাল ডিনারের নেমন্তন্ন, পর্শু থিয়েটরে যেতে হবে, তর্শু রাত্তিরে ম্যাডাম প্যাটির গান শুনতে যেতে হবে, দিনের চেয়ে রাত্তিরের ব্যস্ত ভাব। সুকুমারী

মহিলা, যাঁরা দু-পা চোল্লে হাঁপিয়ে পড়েন, দুটো কাজ কোরলে চোক উল্‌টে চৌকিতে এলিয়ে পড়েন, একটু গরম হোলে অবসন্ন হোয়ে পাখার বাতাস খেয়ে খেয়ে সারা হন, যাঁদের সুখ শান্তির জন্য শত শত মহিলা-সেবকেরা দিন রাত্রি প্রাণ পণ কোরচেন; চৌকিটা সরিয়ে দেওয়া, প্লেটটা এগিয়ে দেওয়া, দরজাটা খুলে দেওয়া, মাংসটা কেটে দেওয়া, পাখাটা কুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি উপায়ে যাতে কুসুম-সুকুমার-তনু অবলাদের তিলমাত্র শ্রম স্বীকার না কোর্ত্তে হয়, তার চেষ্টা কোরচেন, তাঁরা রাত্তিরের পর রাত্তির নটা থেকে ভোর চারটে পর্য্যন্ত গ্যাসের ও মানুষের নিশ্বাসে গরম ঘরের মধ্যে অবিশ্রান্ত নৃত্য কোরচেন; সে আবার আমাদের দেশের মত অলস নোড়ে চোড়ে বেড়ানো বাইনাচের মত নয়, অনবরত ঘুরে ঘুরে দৌড়ে বেড়ানো; একে শ্যাম্পেনের তরঙ্গ মাথায় গিয়ে আবর্ত্ত তুলেছে, তা'তে আবার এই অবিশ্রাম ঘুরপাক, এতে মহা মহা জোয়ান পুরুষের মাথা ঘোরবার কথা, (পুরুষদের আবার দুরকম মাথা ঘোরে, শ্যাম্পেন ও ঘুরপাকে বাইরের মাথা ও পার্শ্বস্থ সুন্দরী সহনর্ত্তকীর মধুর হাসির প্রভাবে ভিতরের মাথা ঘুরে যায়) এ রকম স্থলে ললিতা বালিকারা কি রকম কোরে টিঁকে থাকেন, আমি তা'ই ভাবি; এ পরিশ্রমটা তাঁদের নিজে কোর্ত্তে হয়, কোন মহিলা-ভক্ত পুরুষ তাঁদের হোয়ে নেচে দেয় না। এই ত গেল আমোদ প্রমোদ, তা' ছাড়া এই সময়ে পার্ল্যামেণ্টের অধিবেশন হয়; ব্যাণ্ডের একতান স্বর, নাচের পদশব্দ, ডিনার টেবিলের হাস্যালাপ-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটা political কোলাহল লণ্ডনের প্রাসাদারণ্য ধ্বনিত কোর্ত্তে থাকে। আমরা নির্জ্জীব পর-রাজ্যবাসী জাতি, এখানকার political উত্তেজনা না দেখলে হয় ত বুঝতে পারিনে। রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল দলভুক্তরা প্রতি রাত্রের পার্ল্যামেণ্টের রাজনৈতিক-মল্লযুদ্ধের বিবরণ কি আগ্রহের সঙ্গে পোড়তে থাকে, (এমন কি দোকানদার ও গাড়োয়ান পর্য্যন্ত), এক একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে কত সভার সৃষ্টি হয়, ও কত তুমুল সংগ্রাম বাধে, Conservative ও Liberal রা দুই পক্ষেই দুই-পক্ষের দুর্ব্বল স্থান কি যত্নের সঙ্গে দিনরাত্রি অনুসন্ধান ও আক্রমণ কোরচে, সে ভাব আমাদের উত্তেজনা-শূন্য ঝিমন্ত দেশে দুই প্রহরের রৌদ্রে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে হাই তুলতে তুলতে কল্পনা করা একেবারে অসম্ভব। Season এর সময় লণ্ডন এই রকম নানা প্রকার উত্তেজনায় সরগরম থাকে। তার পরে আবার ভাঁটা পোড়তে আরম্ভ হয়, লণ্ডনের কৃষ্ণপক্ষ আসে। তখন লণ্ডনের আমোদ কোলাহল বন্ধ হোয়ে যায়, লোকজন চোলে যায়; কেবল অল্প স্বল্প লোক, যা'দের শক্তি নেই বা দরকার আছে, বা বাইরে যাবার ইচ্ছে নেই তারাই লণ্ডনে পোড়ে থাকে। যখন লণ্ডনে season নয়, তখন লণ্ডন থেকে চোলে যাওয়া একটা fashion। আমি একটা বইয়ে (Sketches and Travels in London

Thackeray) পোড়েছিলুম, যে এক পরিবার বাড়ির সুমুখে দরজা জানলা সব বন্ধ কোরে বাড়ির পেছন দিকের ঘরে লুকিয়ে চুরিয়ে বাস কোর্ত্ত, তার কারণ, অন্য লোকেরা তা'হোলে মনে কোরবে যে Season-এর সঙ্গে সঙ্গে তারা লণ্ডন ছেড়ে চোলে গেছে। Season ফুরিয়ে গেলে লণ্ডনে মুখ দেখাতে হয়ত অনেকের লজ্জা করে, সুতরাং লণ্ডন শূন্য-প্রায় হোয়ে আসে। South Kensington বাগানে যাও; ফিতে, টুপি, পালক, রেশম, পশম ও গাল-রং-করা-মুখের সমষ্টিরা চোক ঝোলসে প্রজাপতির ঝাঁকের মত বাগান আলো কোরে বেড়াচ্চে না; মহা মহা সুন্দরীরা অশ্ব ও রথের উপর থেকে পদাতিকদের প্রতি কটাক্ষের শতঘ্নী বর্ষণ কোরচেন না, কুঞ্জচ্ছায়ায় প্রণয়ী যুগল ফুস ফুস কোরে কথা কইতে কইতে আপনাদের তুলনায় পৃথিবীর আর সকল লোককে হতভাগা মনে কোরচে না; বাগানে তেমনি সবুজ আছে, সেখেনে তেমনি ফুল ফুটছে কিন্তু তা'র জীবন্ত শ্রী চোলে গিয়েছে। গাড়ি ঘোড়া লোকজনের হিজিবিজি ঘুচে গিয়ে লণ্ডনটা পরিষ্কার হোয়ে গেছে।

সম্প্রতি লণ্ডনের Season ভেঙ্গে গেছে, আমরাও লণ্ডন ছেড়ে Tunbridge Wells বোলে একটা পাড়াগাঁর মত জায়গায় এসেছি। অনেক দিনের পর পাড়াগাঁয়ের বাতাস খেয়ে বাঁচা গেল। লণ্ডনের বাতাসের মত বাতাস কোথাও দেখলেম না। হাজার হাজার chimney অর্থাৎ ধূম-প্রণালী থেকে অবিশ্রান্ত পাথুরে কয়লার ধোঁয়া ও কয়লার গুঁড়ো উড়ে উড়ে লণ্ডনের বাতাসের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ কোরেছে। দুদণ্ড লণ্ডনের রাস্তায় বেড়িয়ে এসে হাত ধুলে সে হাত-ধোয়া জলে বোধ করি কালীর কাজ করা যায়, কয়লার গুঁড়োয় বাতাস এমন ভরপুর। নিশ্বেসের সঙ্গে অবিশ্রান্ত কয়লার গুঁড়ো টেনে মাথায় এক-স্তর কয়লা জোমে যায়; ও মাথার ঘিয়ে ও কয়লার গুঁড়োয় মাথাটা বোধ হয় অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ হোয়ে দাঁড়ায়। অনেক দিনের পরে এখানকার সূক্ষ্ম বাতাস টেনে লণ্ডনের ভার-গ্রস্ত বাতাসের প্রভেদ বুঝতে পারচি। Tunbridge Wells অনেক দিন থেকে তার লৌহ-পদার্থ মিশ্রিত স্বাস্থ্যকর উৎসের জন্যে বিখ্যাত। এই উৎসের জল খাবার জন্যে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। আমরা এখেনে এসে কল্পনা কোরলেম উৎসটা না জানি কি সুন্দর দৃশ্য হবে। চার দিকে পাহাড় পর্ব্বত গাছপালা থাকবে, "সারস-মরাল-কুলকূজিত, কনক-কমল-কুমুদ-কহ্লার বিকসিত সরোবর" "কোকিল কূজন," "মলয়-বীজন" "ভ্রমর গুঞ্জন" দেখতে ও শুনতে পাব, ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে বসন্ত-সখার পঞ্চশরের প্রহার খেয়ে ও এক ঘটি জল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসবো! ও হরি! গিয়ে দেখি, একটা হাটের মধ্যে একটা ছোটো গর্ত্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো, সেখেনে একটু একটু কোরে জল উঠছে, একটা বুড়ি একটা কাঁ-

চের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে !—একটা বুড়ি !—একটি গজেন্দ্র-গমনা, বিম্বোষ্ঠী, কম্বুকণ্ঠী, শুকচঞ্চু-নাসা, কেশরী-মধ্যা, কোকিল-ভাষিণী, মধুর হাসিনী, বিলাসিনী ষোড়শী-নলিনী পত্রের ঠোঙা হাতে কোরে দাঁড়িয়ে নেই, ("ঠোঙা" কথাটা বড় 'গ্রাম্য' হোয়ে পোড়ল, ওর সংস্কৃতটা কি ?) একটা গাউন জুতো পরা বুড়ি এক এক পেনী নিয়ে কাঁচের গেলাসে কোরে জল বিতরণ কোচ্চে ও অবসর মতে একটা খবরের কাগজে গত রাত্রের পার্ল্যামেণ্টের সংবাদ পোড়ছে। চার দিকে দোকান বাজার ; গাছ পালার কোন সম্পর্ক নেই ; সুমুখেই একটা কশাইয়ের দোকান, সেখেনে নানা চতুস্পদ ও দ্বিপদের মধ্যে, "হংস মরাল কুলের" ডানা ছাড়ানো মৃত দেহ দড়িতে ঝুলচে ; এই সব দেখে আমার মন এমন চোটে উঠ্‌লো যে, আমার কোন মতে বিশ্বাস হোল না যে, এ জল খেলে আমার কোন প্রকার রোগ নিবারণ হবে বা শরীরের কোন প্রকার উন্নতি হবে।

Tunbridge Wells কতকটা পাড়াগাঁয়ের মত। এটা একটা পাহাড়ে জায়গা। এখেনে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এখানকার আকাশ মুখ-গোঁ-করা নয়, বাড়ি গুলো অনাতিথ্য ভাব-সুচক নয়, পথিকদের মুখ ঘোরতর ব্যস্তভাবময় নয়, রাস্তা গুলো ঘর্ঘর-ধ্বনিত পাষাণ-হৃদয় নয়। আসল সহরটা খুব ছোটো, দুপা বেরোলেই গাছ পালা মাঠ জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়। সহরটা অবিশ্যি কতকটা লণ্ডনের ছাঁচে গড়া। বাড়ি গুলো লণ্ডনের মত থামবারন্দা শূন্য, ঢালু-ছাত ওয়ালা সারি সারি এক ঘেয়ে ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে ; অত্যন্ত শ্রীহীন দেখতে। দোকান গুলো তেমনি সুসজ্জিত,পরিপাটী,কাঁচের জানলা দেওয়া। কাঁচের ভিতর থেকে সাজানো পণ্য দ্রব্য দেখা যাচ্চে ; কসাইয়ের দোকানে কোন প্রকার কাঁচের আবরণ নেই, চতুষ্পদদের আস্ত আস্ত শ্রীচরণ ঝুলচে, ভেড়া, গরু, শুওর বাছুরের নানা অঙ্গ নানা প্রকার ভাবে চোখের সামনে টাঙ্গিয়ে রাখা হোয়েছে, হাঁস প্রভৃতি নানা প্রকার বিচিত্র মরা পাখী লম্বা লম্বা গলাগুলো নীচের দিকে ঝুলিয়ে আছে, আর খুব একটা জোয়ান ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তি হাতে একটা প্রকাণ্ড ছুরি নিয়ে কোমরে একটা আঁচলের মত কাপড় (apron) ঝুলিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বিলেতের ভেড়া গরুগুলো তাদের মোটা সোটা মাংস চর্ব্বিওয়ালা শরীরের জন্যে ও সুস্বাদের জন্য বিখ্যাত, যদি কোন মানুষ-খেগো সভ্য জাত থাকৃত, তা' হোলে বোধ হয় বিলেতের কসাই গুলো তাদের হাটে অত্যন্ত মাগ্গি দামে বিকোত ; আমি একটা কসাই রোগা দেখিনি, এমন জোয়ান মোটা ভীষণাকার জানোয়ার খুব অল্প আছে। এখানকার কসাইয়ের দোকান গুলো দেখ্‌লে আমার গা শিউরে ওঠে, এখানকার সূক্ষ্ম স্নায়ু বিশিষ্ট বিবিরা এ দৃশ্য কি কোরে সহ্য করেন, বোলতে পারিনে। অনেক বিবি ইচ্ছে কোরে বাজার কোর্ত্তে আসেন। ফলের

দোকানে বা তরকারীর দোকানে সক্ কোরে বাজার কোর্ত্তে পারা যায়; কিন্তু কশাইয়ের দোকানের মত অমন নিষ্ঠুর জায়গায় ভদ্রলোকদের কোমল-হৃদয়া মেয়েরা কি কোরে সাধ কোরে আসেন আমি তাই ভাবি; সকলি অভ্যেস। এক জন বিবি বল্লেন যে, কশাইয়ের দোকান দেখ্লে তাঁর মনে বেশ তৃপ্তি হয়; তাঁর মনে হয় যে, দেশে আহারের অপ্রতুল নেই, দেশের পেট ভরবার মত খাবার প্রচুর আছে, দুর্ভিক্ষের কোন সম্ভাবনা নেই। ইংরেজদের খাবার টেবিলে যে রকম আকারে মাংস এনে দেওয়া হয়, তাতেও কেমন অহৃদয়তা প্রকাশ পায়; কেটে কুটে মস্‌লা দিয়ে মাংস তৈরি কোরে এনে দিলে এক রকম ভুলে যাওয়া যায় যে, একটা সত্যিকার জন্তু খেতে বোসেছি; কিন্তু মুখ পা বিশিস্ট একটা আস্ত প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে একটা জীবন্ত প্রাণীর মৃত দেহ খেতে বোসেছি বোলে গা কেমন কোর্‌তে থাকে। কশাইয়ের দোকানের ওপর অনেক কথা বল্লুম, কেননা বিলেতে এসে অবধি আমার ঐটের ওপর অত্যন্ত ঘৃণা আছে, সেই ঝাল ঝাড়্‌তে গিয়ে কথাটা অত্যন্ত বিস্তৃত হোয়ে পোড়্‌ল। নাপিতের দোকানের জানলায় নানা প্রকার কাঠের মাথায় নানা প্রকার কোঁক্‌ড়ানো পরচুলো বসান রোয়েছে, দাড়ি গোঁফ ঝুল্‌চে, শত শত মার্কা মারা শিশিতে টাক-নাশক চুল উঠে যাওয়া-নিবারক শত প্রকার অব্যর্থ ওষুধ রোয়েছে; দীর্ঘকেশী মহিলারা এই দোকানে গেলে সেবকেরা (সেবিকা নয়) তাঁদের মাথা ধুয়ে দেবে, চুল বেঁধে দেবে, চুল কুঁক্‌ড়ে দেবে, এবং এই রকম নানা প্রকার বাহার কোরে দিতে পারে। এখেনে মদের দোকান গুলোই সব চেয়ে জম্‌কালো দেখ্‌তে, সন্ধ্যের সময় সে গুলো আলোয় আলোয় আলাকীর্ণ হোয়ে যায়, বাড়িগুলো প্রায় প্রকাণ্ড হয়, ভিতরটা খুব বড় ও সাজানো, ও খোদ্দেরের ঝাঁক দোকানের বাইরে ও ভিতরে সর্ব্বদাই বিশেষতঃ সন্ধে বেলায় লেগে থাকে। দরজীর দোকানও মন্দ নয়। নানা ফেষানের কোট্ প্যাণ্ট্‌লুন কাঁচের জানলার ভিতর থেকে দেখা যাচ্চে, বড় বড় কাঠের মূর্ত্তিকে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হোয়েছে; মেয়েদের কাপড় চোপড় এক দিকে সাজানো; সে সকল নানা প্রকার সাজ সজ্জা টুক্‌রো টাক্‌রা আমার মত এক জন বিদেশী Bachelorএর কাছে ঘোরতর রহস্য, তার মধ্যে দন্তস্ফুট করা আমার সাধ্য নয়; এই খানে যে কত লুব্ধ নেত্র দিন রাত্রি তাকিয়ে আছে তার সংখ্যা নেই; সাজ সজ্জার দিকে সকল দেশের মেয়েদেরই সমান টান। এখানকার বিলাসিনীরা, যাদের নতুন ফেষানের দামী কাপড় কেন্‌বার টাকা নেই, তারা দোকানে এসে দামী কাপড়গুলো ভাল কোরে দেখে যায়, তার পরে বাড়িতে গিয়ে সস্তায় নিজের হাতে তৈরি করে। এখানকার দোকান বাজার গুলো এই রকম লণ্ডনের

ছাঁচে তৈরি। আমাদের বাড়ির কাছে একটা খোলা পাহাড়ে জায়গা আছে; সেটা Common অর্থাৎ সরকারী জায়গা; চারদিক খোলা, বড় গাছ খুব অল্প; ছোট ছোট গুল্মের ঝোপ, ও ঘাসে পূর্ণ, চারদিক সবুজ, বিচিত্র গাছ পালা নেই বোলে কেমন ধূধূ কোরচে, কেমন বিধবার মত চেহারা, উঁচু নিচু জমী, কাঁটাগাছের ঝোপ ঝাপ, জায়গাটা আমার বেশ লাগে; মাঝে মাঝে এই রকম কাঁটা খোঁচা এবড়ো খেবড়োর মধ্যে এক এক জায়গায় একরকম ছোট ছোট নীল ফুল ঘেঁসাঘেঁসি ফুটে সবুজের মধ্যে স্তূপাকার নীল রং ছড়িয়ে রেখেছে, কোথাও বা ঘাসের মধ্যে শাদা শাদা ডেজি ও হোল্‌দে বাটার্-কপ্ এক রাশ্ ফুটে রোয়েছে, চারদিকে এই রকম একটা অনুর্ব্বর সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাচ্চে। মাঝে মাঝে ঝোপ ঝাপের মধ্যে ও গাছের তলায় এক একটা বেঞ্চি রোয়েছে, এইটে সাধারণের বেড়াবার জায়গা। কি ভাগ্যি গাছ পালা বসিয়ে এটা বাগান কোরে তোলা হয় নি, "আশ্রম-বাসিনী" প্রকৃতিকে সাজিয়ে গুজিয়ে "শুদ্ধান্ত" যোগ্যা কোরে তোলা হয় নি। এখানে মানুষ এত অল্প ও জায়গা এত বড়, যে মানুষের ঘেঁসাঘেঁসি নেই, লণ্ডনের বড় বড় বেড়াবার বাগানের মত যে দিকে চাই সেই দিকেই ছাতা-হস্ত, টুপি-মস্তক চোক-ধাঁধক ভিড়ের চারদিক থেকে আনা গোনা নেই; দূর দূর বেঞ্চীর মধ্যে নিরালা যুগলমূর্ত্তি রোদ্দুরে এক ছাতার ছায়ায় বোসে আছে; কিম্বা হাত ধরাধরি কোরে নিরিবিলি বেড়াচ্ছে, পাছে পাশের লোক শুনতে পায় বোলে গলা নাবিয়ে কথা কইতে হোচ্চে না কিম্বা প্রাণ খুলে হাসির ব্যাঘাত হোচ্চে না। যাঁরা বলেন, গাছ পালা লতা পাতা ঘাস গুল্ম কেবল ছাগল গরুদের কাছেই আমোদ জনক, আরক্ত কপোল, আকর্ণ চক্ষু, আকুঞ্চিত কুন্তলের দিকেই যাঁদের আন্তরিক টান, তাঁরাও যে এখেনে এসে নিতান্ত নিরাশ হবেন, তা'নয়; তাই বল্‌চি সবশুদ্ধ জড়িয়ে Common জায়গাটা খুব উপভোগ্য। এখনো গর্ম্মিকাল শেষ হয় নি। এখেনে গর্ম্মিকালে সকাল ও সন্ধে অত্যন্ত সুন্দর। গর্ম্মির পূর্ণ যৌবনের সময় রাত দুটো তিনটের পরে আলো দেখা দিতে আরম্ভ করে, চারটের সময় রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ কোর্ত্তে থাকে ও রাত্রি নটা দশটার আগে দিনের আলো নেভে না। আমি একদিন ৫ টার সময় উঠে Common এ বেড়াতে গিয়েছিলুম। উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর একটা গাছের তলায় গিয়ে বোস্‌লুম, দূরে ছবির মত সহর দেখা যাচ্চে, একটি লোকও তখন ওঠে নি, একটুও কোয়াষা নেই, চারদিক অত্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্চে। ঘুমন্ত সহরটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তার নির্জ্জন রাস্তাগুলি, গির্জ্জের উন্নত চূড়া, রৌদ্র-রঞ্জিত বাড়িগুলি নীল আকাশের পটে যেন একটি অতি স্পষ্ট ছবির মত আঁকা! খুব ভাল লাগ্‌চে বটে কিন্তু ভাল লাগার প্রধান কারণ হোচ্চে, একটা

সহরের ঘুমন্ত ভাব কল্পনা করা! একটা ঘুমন্ত গ্রামের চেয়ে একটা ঘুমন্ত সহরের গাম্ভীর্য্য আছে; পরিশ্রম,নড়া চড়া, ও যুঝাযুঝি বোলে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য অসহায় শিশুটির মত ঘুমিয়ে আছে, তার কপাল থেকে ভাবনার ভ্রূকুঞ্চন মিলিয়ে গেছে; মুখের একটা দৃঢ় ভাব চোলে গিয়েছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো শিথিল হোয়ে এলিয়ে পোড়েছে। দিনের বেলায় আফিসের মূর্ত্তিতে যাঁকে খারাপ দেখাচ্ছিল এই ঘুমন্ত অবস্থায় তা'র মুখেই একটু সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে দেখে আমার ভাল লাগে, নইলে আসলে এই সহরটা কিছুই ভাল দেখতে নয়, এখানকার বাড়িগুলো আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে। জানলা-কাটা-কাটা চারটে দেয়াল, একটা ঢালুছাত ও তার ওপরে ধোঁয়া বেরোবার কতকগুলো কুশ্রী নল হোচ্চে এখানকার বাড়ির বাহ্য আকার; এ আর কি ভাল দেখাবে বল। ক্রমে ক্রমে যতই বেলা হোতে লাগল শত শত chimney থেকে অমনি ধোঁয়া বেরোতে লাগল, ধোঁয়াতে ক্রমে সহরটা অস্পষ্ট হোয়ে এল, রাস্তায় ক্রমে মানুষ দেখা দিলে, গাড়ি ঘোড়া বেরোতে আরম্ভ হোল, হাতগাড়ি কিম্বা ঘোড়ার গাড়িতে কোরে দোকানীরা মাংস রুটি তরকারী বাড়িতে বাড়িতে বিতরণ কোরে বেড়াতে আরম্ভ কোরলে, (এখানে দোকানীরা বাড়িতে বাড়িতে জিনিষ পত্র দিয়ে আসে,) ক্রমে Commonএ লোক জোমতে আরম্ভ হোল, আমি বাড়ি ফিরে এলেম।

আমার এখানে একটি সাধের বেড়াবার জায়গা আছে আমি সেখেনে রোজ বিকেলে বেড়াতে যাই। সেটা একটা পাড়াগাঁর রাস্তা, পাথর দিয়ে বাঁধানো কিম্বা খুব সমতল করা নয়, গাড়ির চাকার দাগে এবড়ো খেবড়ো উঁচু নিচু পাহাড়ে রাস্তা, দুধারে blackberrey ও ঘন লতা গুল্মের বেড়া, বড় বড় গাছে ছায়া কোরে আছে, রাস্তার আশে পাশে ঘাস উঠেছে, ও ঘাসের মধ্যে daisy প্রভৃতি বুনো ফুল ফুটে আছে, পাড়াগাঁয়ের ছোট্‌লোকেরা ধুলো কাদা মাখানো ময়লা কোট প্যাণ্টলুন ও ময়লা মুখ নিয়ে আনাগোনা কোরচে (বর্ণনার এ অংশটা বড় romantic হোল না,) ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলো তাদের লাল লাল ফুলো-ফুলো মুখে বাড়ির দরজার বাইরে কিম্বা রাস্তায় খেলা কোরচে, এমন মোটাসোটা গোলগাল ছেলে কোন দেশে দেখিনি; তাদের গাল দুটোর অযথা প্রাদুর্ভাবে নাক ও চোক নিতান্ত হীন অবস্থায় উপত্যকার অন্ধকারে পোড়ে আছে,হাত পা গুলো অত্যন্ত মোটা, গাল দুটো অত্যন্ত লাল, এক একটা জীবন্ত মাংসের ঢিবি আর কি। এক একটা বাড়ির কাছে ছোট ছোট পুকুরের মত আছে, সেখেনে পোষা হাঁস গুলো ভাসচে; মাঠ গুলো যদিও পাহাড়ে উঁচু নিচু, কিন্তু চসা জমী এমন সমতল ও পরিষ্কার যে, আমাদের দেশের কোন সমভূমিতে এমন দেখিনি; ঘাসগুলো অত্যন্ত সবুজ ও তাজা, এখানে রৌদ্র তেমন তীব্র নয় বোলে ঘাসের রং আমাদের দেশের মতন হেজে যায় না, তাই জন্যে এখানকার মাঠের

দিকে চেয়ে থাকতে অত্যন্ত ভাল লাগে, অজস্র সবুজ রঙ্গে চোক যেন ডুবে যায়, উঁচু নিচু পাহাড়,যতদূর দেখা যাচ্চে ঘাসের সবুজ প্লাবনে প্লাবিত, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ ও শাদা শাদা বাড়িগুলো দূর থেকে ছোট ছোট দেখাচ্ছে, এই রকম শূন্য মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে এক একটা প্রকাণ্ড পাইন (pine কেলু) গাছের অরণ্য পাওয়া যায়, ঘেঁসা ঘেঁসি pine গাছে অনেক দূর জুড়ে অন্ধকার কোরে আছে, সে খুব গম্ভীর দেখতে। বাড়ি গুলো আমাদের দেশের কুঁড়ে ঘরের মত গরিবানা ও গাছ পালা ঘাস মাঠের মধ্যে থাকবার উপযুক্ত সুন্দর দেখতে না, সোজা, খাড়া, পরিপাটি দোতালা বাড়ি, বাস কোর্ত্তে খুব আরামের বটে, কিন্তু গাছ পালার মধ্যে দেখতে ভাল লাগে না, তবে এক একটা বাড়ি আপাদ মস্তক লতা ও ফুলে ঢেকে গিয়ে খুব ভাল দেখতে হোয়েছে।

বর্ণিমা নিয়ে আর বেশী বকাবকি কোরব না। তুমি হয়ত এত ক্ষণ মনে করচ যে, এব্যক্তি কোথা থেকে আকাশ-থেকে-পড়া গোটাকতক কথা পেড়ে তাই নিয়ে অনর্গল বোকে যেতে লাগ্‌ল। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করেনি, কেউ জান্‌তে চায় নি, অথচ গায়ে পোড়ে ধোরে বেঁধে কতকগুলো লম্বা চৌড়া Information দিতে আরম্ভ কোরলে। যা হোক্—এখন আমি ছেড়ে দিলুম তুমি কেঁদে বাঁচ।

ক্রমশঃ

হিয়োন সাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ।

কপিলবাস্তুর সাক্যবংশীয় রাজকুমার সিদ্ধার্থ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ২৪২২ বৎসর অতীত হইল (অর্থাৎ ৬২১ পূর্ব্ব শকাব্দে ১) মানব-লীলা সম্বরণ করেন ২। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ভারত মাতার কুলতিলক নন্দন দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী শ্রীধর্ম্মাশোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল,সে পর্য্যন্ত

১ আমরা খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তে শালিবাহনাব্দ ব্যবহার করিব।

২ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থানুসারে বিগত কল্পে এক সহস্র বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৯৯৭ জনের নাম দুষ্প্রাপ্য। পরবর্ত্তী তিনজন বুদ্ধ বিপশ্চিত, শিক্ষী, ও বিশ্বভূ। প্রচলিত কল্পেও এক সহস্র বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিবেন। তন্মধ্যে চারিজন ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া "নির্ব্বাণ" লাভ করিয়াছেন। ৯৯৬ জন অবশিষ্ট। লব্ধনির্ব্বাণ বুদ্ধদিগের নাম

প্রথম ক্রকচ চন্দ্র

দ্বিতীয় কঙ্কমুনি

তৃতীয় কশ্যপ

চতুর্থ সিদ্ধার্থ। (সাক্যসিংহ বা সাক্যমুনি।)

পঞ্চম বুদ্ধ "মৈত্রেয়" নামে খ্যাত হইবেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ উন্নতি হয় নাই। "জম্বুদ্বীপপতি," "চক্রবর্ত্তী" অশোক মগধেশ্বর সুবিখ্যাত চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুষীমকে জয় করিয়া ২৮০ বৌদ্ধাব্দে (৩) বা ৩৪১ পূর্ব্ব শকাব্দে অশোক মগধের রাজাসন অধিকার করেন। তিনি প্রথমত বৈদিক ৪ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু রাজ্যাভিষেকের তিন বৎসর পরেই বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার অধিকার-কালে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের মহাসভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। সেই সভার অনুমত্যনুসারে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল। অদ্যাপি সিংহল, পূর্ব্বোপদ্বীপ, চীন, জাপান, তাতার, সাইবেরিয়া, নরওয়ে ও গ্রীষ প্রভৃতি দেশে তাঁহাদের কৃত কার্য্যের চিহ্ন অল্প বা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্দ্দিক হইতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মানবগণ ধর্ম্মশিক্ষা, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তীর্থ দর্শন জন্য ভারতে উপনীত হইত। ফাহিয়ান নামক চীন দেশীয় জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মযাজক শকাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি ৩২১—৩৩৫ শকাব্দে (৩৯৯—৪১৩ খৃঃ অঃ) সিন্ধুনদের তীর ভূমি হইতে গঙ্গাসাগর-তীরস্থ তাম্রলিপ্তাবধি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গ্রন্থখানির অধিকাংশই তীর্থস্থানের বর্ণনাতে পূর্ণ। তৎপাঠে ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি অল্পই জ্ঞাত হওয়া যায়। চীন দেশীয় দ্বিতীয় পর্য্যটক সংজুন ৪২৪ শকে কাবুল ও পঞ্জাবের কিয়দংশ মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন।

চীন দেশীয় তৃতীয় পর্য্যটক শ্রমণ হিয়োন সাঙ। ইনি শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্রমে পঞ্চদশ বৎসর ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই জন শিষ্য "তদীয় ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" চীন ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞবর ফরাসী স্টানিস্লাস জোলিয়ান কুড়ি বৎসর পরিশ্রম করিয়া সেই গ্রন্থখানি অতি দক্ষতার সহিত ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ বিস্তৃত, তিন খণ্ডে সমাপ্ত। এই গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য তাঁহাকে সংস্কৃত ও চীন ভাষা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। বিজ্ঞবর উইলসন ৫ কাওয়েল ৬ কনিংহাম ৭ ও ফারগিউসন

৩ সাক্যসিংহ ২৫৫৭ কলিগতাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমাতে-জীবলীলা সংবরণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ সেই দিবস হইতে তাহাদের ধর্ম্মশক (Religious Era) গণনা করিয়া থাকে। ইহাই বৌদ্ধাব্দ।

৪ সুবিখ্যাত টোমাস সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে অশোক প্রথমত জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

৫ Travels in India of Heown Thsang By Professor H. H. Wilson Journal, Royal As. Society Vol XVII —Page 206 to 137.

৬ Elphinstone's History of India (Cowell's 6th Ed) Chinese Buddhist Pilgrims in India Page 287 to 299.

৭ Verification of the travels

৮ প্রভৃতি যশস্বী পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-মণ্ডলী হিয়োন সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইংরেজি ভাষায় আংশিক অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহ ফরাসী লেখক মহোদয়কৃত ভ্রমণ বৃত্তান্তের সবিস্তার ও সর্ব্বাঙ্গীন অনুবাদ নহে, কিন্তু তাহার সমালোচন মাত্র। বিজ্ঞবর লেড্‌লে ও বিল সাহেব দ্বয় "ফাহিয়ানের—ভ্রমণবৃত্তান্ত" ইংরেজি ভাষায় লিখিয়াছেন ৯। লেড্‌লে ও বিল সাহেবের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা "হিয়োন সাঙের বাঙ্গলা ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

৫৫১ শকাব্দে হিয়োন সাঙ ভারত-ভ্রমণাভিলাষে গৃহত্যাগ করিয়া, ৫৫২ শকাব্দের বর্ষারম্ভে কাবুলে উপনীত হন। সেই অব্দের বসন্ত প্রভাতে তিনি ওহিন্দ নামক স্থানে সিন্ধু অতিক্রম করিয়া তক্ষশিলায় পদার্পণ করেন। সেস্থানে কতিপয় মাস অবস্থিতি করিয়া তিনি তক্ষশিলার নিকটবর্ত্তি তীর্থস্থান সকল দর্শন করিলেন। তৎপরে পর্য্যটক কাশ্মীরে যাইয়া দুই বৎসরকাল সংস্কৃত পাঠ করিয়াছিলেন। কাশ্মীর হইতে সঙ্গলায় যাইয়া তিনি তত্রত্য প্রাচীন অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দর্শন করেন এবং সেস্থান হইতে গমন করিয়া চীনাবতীতে চৌদ্দ মাস ও জালন্ধরে চারি মাস বাস করেন।

৫৫৬ শকাব্দের শরৎ ঋতুতে পরিব্রাজক মথুরায় উপনীত হন। তথা হইতে তিনি পুনর্ব্বার লাহোরে গমন করিয়াছিলেন। তৎপর লাহোর হইতে যমুনা অতিক্রম করিয়া শ্রুঘ্নায় ১০ও তথা হইতে গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার) দিয়া উত্তর পঞ্চালের (রোহিলখণ্ড) রাজধানী অহিচ্ছত্রে ১১ পদার্পণ করেন। তৎপরে তিনি দক্ষিণ পঞ্চালস্থ (দোয়াব) সাঙ্কাস্যা ১২ কান্যকুব্জ ও কৌ-

---

of Heown Thsang By A Cunningham—Journal As. Society, Bengal of 1648 page 13 to 60 Cunningham's Archological servey Report. Cunningham's Ancint Geography of India. I.

৮ বিজ্ঞবর ফারগীউসন সাহেব হিয়োন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত মূলক কএকটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী মাত্র বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত সম্পর্ক বিশিষ্ট। Heown Thsang's journey from Patna to Ballabhi By J. Ferguson D. C. L Journal Royal As. Society (N. S.) Vol VI. art IX. Page 213 to 289.

৯ লেড্‌লে সাহেবের গ্রন্থে তাহার নাম প্রকাশ নাই। এই গ্রন্থখানি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাস্থ বেপটিস্ট মিসন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেমোয়েল বিল সাহেবের গ্রন্থ অনুবাদের অনুবাদ নহে। তিনি চীন ভাষা হইতে একবারে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করিয়াছেন।

১০ শ্রুঘ্না, মইস্যুরীর ১৫ মাইল পশ্চিম দিকে খালসির নিকটবর্ত্তি স্থানে অবস্থিত ছিল।

১১ ইহার প্রাচীন অপর নাম "অহিক্ষেত্র"। কিন্তু অধুনা অহিচ্ছত্র বা রামনগর নামে পরিচিত।

১২ সাঙ্কাস্যা, মইনপুরি ও ফতেগড়ের

শাম্বী ১৩ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিব্রাজক ফাহিয়ান মথুরা হইতে এককালে সাঙ্কাস্যা হইয়া কানোজে উপনীত হন। হিয়োন সাঙের ভারত-ভ্রমণ-কালে জগৎ-বিখ্যাত বৈশ্য (Sei-she) বংশজ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কানোজের রাজাসন উজ্জ্বল করিতে ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্য প্রাপ্ত হন। কিরণসুবর্ণের অধিপতি বৌদ্ধদ্রোহী মহারাজ শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্দ্ধন জীবলীলা সংবরণ করেন। কামরূপ হইতে কাম্বোজ অবধি তাঁহার বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে দণ্ডস্থাপন করিতে পারেন নাই; চিরপরাক্রান্ত মহারাষ্ট্র জাতির নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন সম্ভবত ৫৩০ শকাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মতে তিনি ৪৬ বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। কনিংহাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজ্যশাসন কাল ৩০—৩৫ বৎসর মাত্র নির্দ্ধারণ করেন। ১৪

তৎপরে হিয়োন সাঙ অযোধ্যা, শরাবতী ও টণ্ডা ১৫ প্রভৃতি দর্শন করিয়া ভগবান সাক্য সিংহের জন্মভূমি কপিলবাস্তুতে উপনীত হন। তদনন্তে তিনি কৌশি ও বারাণসী ১৬ দর্শন করিয়া বিশালায় ১৭ গমন করেন। বিশালা বিস্তৃত ব্রিজি প্রদেশের একটী অংশ মাত্র। পরিব্রাজক তথা হইতে নেপাল দর্শন করিয়া ব্রিজির প্রান্তবাহিনী গঙ্গা অতিক্রম পূর্ব্বক জগদ্বিখ্যাত রাজধানী পাটলীপুত্রে উপনীত হন। পাঠনা হইতে তিনি পুণ্যপুণ্যকীর্ত্তিপূর্ণ বৌদ্ধগয়ার যাইয়া তীর্থ সমূহ দর্শন করিয়া ছিলেন। তৎপরে তিনি কোষগৃহ ও

মধ্যে অবস্থিত। ইহা বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান তীর্থ। ভগবান সাক্যসিংহ এস্থানে দেবলোক হইতে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই স্থানে সাতটী বিখ্যাত স্তুপা ছিল। মহারাজ অশোক এই স্থানে ৭০ ফিট উচ্চ একটী উপলস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

১৩ কৌশাম্বী, আলাহাবাদ হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তি, যমুনা তীরে অবস্থিত। প্রাচীন হস্তিনা নগরী নদীগর্ভে প্রবিষ্টা হইলে সুবিখ্যাত মহারাজ নেমীচক্র কৌশাম্বী নগরে চন্দ্রবংশীয়দিগের প্রাচীন রাজপাঠ সংস্থাপন করেন।

১৪ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর বীরসিংহ নামক নরপতি কানোজ শাসন করেন। বোধ হয় ইনিই বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রেরক "বীরসিংহ"। তাহা হইলে আদিশূর শকাব্দের ৫৭১—৫৮৯ মধ্যে জীবিত ছিলেন।

১৫ বুদ্ধদেব কশ্যপের জন্মস্থান।

১৬ সরনাথ বৌদ্ধ বারাণসী। ইহা বর্ত্তমান কাশীর ৩ মাইল দূরবর্ত্তী।

১৭ গণ্ডক বা নারায়ণী নদীর তীরবর্ত্তি ত্রিহুতের অন্তঃপাতি বর্ত্তমান বোক্‌রাই প্রাচীন বিশালা রাজধানী অনুমিতি হইয়াছে। বিশালা পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের অতি আদরের স্থান। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে "বিশালা" একটী পরাক্রমশালী সাধারণতন্ত্র রাজ্য Republican government ছিল। চীন পরিব্রাজকগণ ইহার প্রাচীন সমৃদ্ধির চিহ্নমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন।

রাজগৃহ দর্শন করিয়া নালন্দায় ১৮ গমন করেন। বৌদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর বসতিস্থান বলিয়া নালন্দা এক সময়ে জগদ্বিখ্যাত ছিল। ন্যায়দর্শন প্রভৃতি শিক্ষার জন্য এই স্থানে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সংস্থাপিত ছিল। হিয়োন সাঙ তথায় পাঁচ বৎসর বাস করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কনিংহাম সাহেব পাঁচ বৎসরের পরিবর্ত্তে পোনর মাস লিখিয়াছেন। নালন্দা অবস্থিতি কালে তিনি সর্ব্বদা দার্শনিকদিগের সহিত তর্কাহবে লিপ্ত হইতেন। সাঙ্খ্য ও বৈশেষিকগণই তাঁহার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল। কনিংহাম বলেন "পরিব্রাজক ৫৬০ শকাব্দের (৬৩৮ খৃঃ অঃ) অন্তভাগে মদগগিরি দর্শন করিয়া অঙ্গ দেশের রাজধানী চম্পানগরে উপনীত হন।" চম্পা আধুনিক ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী। ইহার সহিত বাঙ্গলার নৈকট্য সম্পর্ক আছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে চন্দ্রবংশজ রাজা বালীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ, স্বনামখ্যাত অঙ্গ-রাজ্য-স্থাপয়িতা। অঙ্গের উত্তরাধিকারী ও তাঁহা হইতে নবম পুরুষে অবতীর্ণ রাজা চম্প স্বনামখ্যাত নগরী (চম্পা) নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। রামায়ণে অঙ্গ নামকরণের অন্য কারণ লিখিত হইয়াছে—যথা "এই প্রদেশে কাম হরকোপানলে ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহা অঙ্গদেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ১৯।" কর্ণ অঙ্গ দেশের অধিপতি ছিলেন; তজ্জন্য এই রাজধানী "কর্ণপুর" নামেও পরিচিত ছিল ২০। রাজস্থানের ইতিহাসবেত্তা কর্ণেল টড্ সাহেবের নির্দ্দেশ অনুসারে চম্পা সূর্য্যবংশীয়দিগের স্থাপিত রাজধানী ২১। পালিগ্রন্থকারদিগের মতানুসারে মগধের রাজগণ দীর্ঘকাল অঙ্গপতিদিগের অধীন ছিলেন। বোধ হয় কবিগুরু বাল্মীকি ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী; এজন্যই তিনি গঙ্গা ও সরযুর সঙ্গমস্থল অঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম সীমা

১৮ বিহার উপবিভাগের অন্তর্গত বর্ত্তমান বড় গাঁও। অদ্যাপি ইহার অর্দ্ধভগ্ন মন্দির ও প্রাচীন অট্টালিকাদির রাশীকৃত ভগ্নাবশেষ দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়! See Brodlo's Paper Journal As. So. Bengal of 1872 part 1 No 111 and 1V পিপসাহেব লিখিয়াছেন—Burragaon. There is no place in this district where the rains are so extensive, or on such a large scale * * The place is the site of the ancient Nalanda, * * where the greatest monastery in all India existed.

১৯ অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তদা প্রভৃতি রাঘব। স চাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ। রামায়ণ, বালকাণ্ড, ত্রয়োবিংশসর্গ, ১৪ শ্লোক।

২০ অঙ্গপতি "কর্ণ" ও কৌন্তেয় 'কর্ণ'কে অভিন্ন বিবেচনা করা হইয়া থাকে কিন্তু সুবিখ্যাত ডাক্তর বকনন, অঙ্গপতিকে অঙ্গবংশজ জৈনধর্ম্মাবলম্বী কর্ণ স্থির করিয়াছেন। See Marten's Eastern India Vol 11 pp 32, 46.

২১ See Tod's Rajasthan (Mukerjee's Ed) Vol 1 pp 29 33.

নির্দ্দেশ করিয়াছেন ২২। প্রায় সার্দ্ধ চতুর্ব্বিংশতি শতাব্দী পূর্ব্বে মগধেশ্বর মহাপদ্ম ভুজবলে স্বদেশের স্বাধীনতা সংস্থাপন করেন। হিয়োন সাঙ বলেন,—"চম্পা (অঙ্গ) রাজ্যের পরিধি ৬৬৬—৮০০ মাইল (৪০০০ লি); এই রাজ্য গ্রীষ্মপ্রধান, ইহার ভূমি উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। রাজধানী গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত, ইহার পরিধি ৮ মাইল। রাজধানীতে কতকগুলি ভগ্ন মঠ ছিল, তাহাতে প্রায় ২০০ যতি বাস করিতেন।" হিয়োন সাঙের ভ্রমণকালে চম্পানগরের প্রান্তবাহিনী গঙ্গা বোধ হয় পূর্ব্ববাহিনী ছিল। পরিব্রাজক চম্পার অনতিদূরবর্ত্তী গঙ্গাবক্ষস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। ২৩

---

২২ রামায়ণ, বালকাণ্ড, ত্রয়োবিংশসর্গ দেখ।

(২৩) ১২৮৫বঙ্গাব্দের ৩রা অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশ পত্রে কহঁলগাওঁর (কাহালগ্রামের) ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হয়। উক্ত ইতিবৃত্ত লেখক বলেন—"এখনকার গঙ্গার ঠিক তীরে ৯০।৯৫ ফীট উর্দ্ধ ওকেবল প্রস্তরাবলিবিশিষ্ট মোচাগ্রবৎ পরস্পর সন্নিহিত দুইটি পাহাড় আছে। অল্প দিবস পূর্ব্বে ইহারা গঙ্গার ঠিক্ মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় গঙ্গাদেবী দ্বিধা বিভক্ত ও সঙ্কীর্ণ ছিলেন, * * * গঙ্গা * * আর দ্বিধা বিভক্ত নাই। এখন পাহাড়দ্বয় গঙ্গার এক পার্শ্বে পড়িয়া যাওয়াতে গঙ্গা একধারবিশিষ্টা হইয়াছেন। প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার বকনন ও এইস্থানে গঙ্গাবক্ষে কয়েকটী পর্ব্বত-শৃঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। (See Marten's Eastern India Vol II page 37.)

হিয়োন সাঙ চম্পা হইতে পূর্ব্ব মুখে কিঞ্চিদধিক ৬৭ মাইল (৪০০ লি) গমন করিয়া গঙ্গাতীরস্থ "কঙ্কজোল" বা "কুজঘিরা" প্রাপ্ত হন। কনিংহাম কঙ্কজোলকে আধুনিক "কহঁলগাওঁ" বিবেচনা করেন। কাওয়েল ও ফারগিউসন সাহেব ইহাকে "কুজ ঘিরা" লিখিয়াছেন। যদি ইহাঁদের বর্ণবিন্যাস সঙ্গত হয়, তবে নিশ্চয়ই এই স্থানটী "কুব্জগৃহ" বা "কুব্জগিরি" নামে পরিচিত ছিল। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে কনিংহাম ইহাকে "কচ্ছুবেত্র,"—"কচ্ছুগৌড় বা অগণ্যগৌড়" বর্ণবিন্যাস করিয়া বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী "গৌড়" স্থির করিতে প্রয়াস পাইযাছিলেন। কুব্জগৃহের বর্ত্তমান স্থিতিস্থান নির্ণয় করা সুকঠিন। ফারগিউসন ও ওয়েস্টমেকট সাহেব এই স্থানটী আধুনিক রাজমহল বা তন্নিকটবর্ত্তী অনুমান করেন। এস্থানে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত দেখা যাইতেছে, কুব্জগৃহ গঙ্গার পশ্চিম তীরে ছিল। পূর্ব্বদিকযাত্রিকে দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা, উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

হিয়োন সাঙ কুব্জগৃহের ভগ্নাবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "কুব্জগৃহ স্বাধীনতা হারাইয়া উচ্ছিন্ন হইয়াছে ও তত্রত্য অধিবাসীগণ নগর ছাড়িয়া গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে। এইস্থানে ৬।৭টী মঠ ও ১০টী দেবমন্দির আছে।" সে সময় কুব্জগৃহ একটী পরাধীন রাজ্য। পরিব্রাজক বলেন "ইহার পরিধি ৩৩৩ মাইল (২০০০লি)' কনিংহাম বলেন "বোধ হয় স্বতন্ত্রাবস্থার

এই রাজ্য রাজমহলের দক্ষিণদিকস্থ পর্ব্বত হইতে—মুরশিদাবাদের প্রান্তবাহিনী গঙ্গা তীর অবধি বিস্তৃত ছিল২৪।" হিয়োন সাঙের নির্দ্দেশ অনুসারে সে সময়ে রাজমহল ও তাহার নিকটবর্ত্তি পার্ব্বত্য প্রদেশে বন্য হস্তী পাওয়া যাইত। কুজ্জগৃহের প্রান্ত-বাহিনী গঙ্গা অতিক্রম করিয়া, পরিব্রাজক অনূ্যন ১০০ মাইল পূর্ব্বাভিমুখে গমন করত "পোন্নাফাটন্না" রাজধানী প্রাপ্ত হন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

(Pun-na-fa-tau-na)

ফরাসী পণ্ডিত স্টানিসলাস জোলিয়ান, হিয়োন সাঙ লিখিত "পোন্নাফাটন্না" কে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নির্ণয় করিয়াছেন। পণ্ডিতবর ভাইডেল ডি মাটিন ইহাকে বর্দ্ধমান বিবেচনা করেন। প্রফেসার উইলসন মাটিনের মত অনুসরণ করিয়াছেন। কনিংহাম সাহেব ইহাকে পাবনা বিবেচনা করেন। মাটিন ও কনিংহামের মত অভ্রান্ত বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

মনুসংহিতায় "পৌণ্ড্র" নামক একটী অনার্য্য জাতির উল্লেখ আছে। মহাভারতে লিখিত আছে, বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের বিরোধকালে নন্দিনীর ফেন হইতে ম্লেচ্ছ পৌণ্ড্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই 'পুণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্র' জাতির বসতিস্থানই 'পৌণ্ড্র দেশ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে ২৫ চন্দ্রবংশজ রাজা বালীর পাঁচজন ক্ষেত্রজ পুত্র পাঁচটী রাজ্য স্থাপন করেন। জ্যেষ্ঠ অঙ্গ "অঙ্গ" রাজ্যস্থাপয়িতা; অঙ্গরাজ্যের বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কুমার বঙ্গ, "বঙ্গ" রাজ্য স্থাপন করেন। তৃতীয় কুমার উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী স্থানে স্বনামখ্যাত কলিঙ্গরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন২৬। চতুর্থ কুমার সুহ্ম "সুহ্ম রাজ্যের" স্থাপনকর্ত্তা ২৭। পঞ্চম বা সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমার পুণ্ড্র "পৌণ্ড্র রাজ্য" স্থাপন করেন। মহাভারতে পৌণ্ড্র রাজ্যের উল্লেখ আছে। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকারাভিধানপ্রবন্ধ লেখক বলেন ২৮ "এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা

২৪ একটু বিবেচনা করিলে প্রতিপন্ন হইবে; যবনাধিকার হইতে কুজ্জগৃহ রাজ্যটি বাঙ্গলার অন্তর্গত ছিল। এই প্রদেশের অধিকাংশ ভূমি লইয়া "লক্ষ্মণাবতী" বা "জান্নতাবাদ" সরকার সংস্থাপিত হইয়াছিল।

২৫ See Wilson's Vishnu Puran, Book IV Chp. XVII1 Page 444. বরদাপ্রসাদ বসাক প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, ১৮ অঃ ১৮৭—১৯১ পৃষ্ঠা।

২৬ কালিদাসের বর্ণনানুসারে উড়িষ্যার দক্ষিণ পশ্চিমদিকস্থ সমুদ্রউপকূল (উত্তর সরকার) কলিঙ্গ নির্ণীত হইতেছে। শক্তি সঙ্গমতন্ত্র ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ;—"জগন্নাথাৎ পূর্ব্ব ভাগাৎ কৃষ্ণাতীরান্তগঃ শিবে। কলিঙ্গদেশঃ সংপ্রোক্তো—" কিন্তু উইলসন বঙ্গ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে কলিঙ্গ লিখিয়াছেন।

২৭ ত্রিপুরা। টীকাকার হল সাহেব ত্রিপুরা ও অরাকাণকে সুহ্ম অবধারণ করিয়াছেন।

২৮ বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা; (১২৮০ সাল, ভাদ্র।)

যায় তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌণ্ড্র নামে খ্যাত ছিল। যে অংশ মধ্যে কলিকাতা, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ তাহা সেই অংশের অন্তর্গত। যাহারা সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা উইলসন কৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদের প্রদেশতত্ত্ব বিষয়ক পরিচ্ছেদটী দেখিবেন। ২৯ * * * চীন পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ ভারতবর্ষে এই পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র দেশে আসিয়াছিলেন। * * * জেনেরল কনিঙহাম বলেন, যে আধুনিক পাবনাই প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্র বর্দ্ধন। বোধ হয় মালদহের অন্তঃপাতী পাণ্ডুয়া নামক গ্রামের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন। এই পাণ্ডুয়া যে পৌণ্ড্র বর্দ্ধন এমত বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ আছে। ” মার্টিন, উইলসন ও উক্ত প্রবন্ধ লেখক প্রভৃতির প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমরা বলিতেছি—তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রাজমহল, কঁহলগাওঁ কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ৬০০ লি (১০০—১২০ মাইল) গমন করিলে ৩০ কি বর্দ্ধমান বা পণ্ডুয়ায় উপ-

---

২৯ উইলসন সাহেব “ওরিএণ্টেল কোয়াটার্লি মেগেজিন” নামক সাময়িক পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে, তিনি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, ভবিষ্যৎপুরাণ ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া পৌণ্ড্রদেশ সম্বন্ধে যাহা লিখেন, তৎপ্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণের টীকায় তাহার সময়কে বিবৃত করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের উক্ত প্রবন্ধ লেখক তাহাই পাঠ করিতে পাঠকদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; প্রবন্ধ লেখকের উক্তির সহিত মূলের কতদূর ঐক্য আছে তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন।—

Pundra—The Western Provinces. of Bengal, or as sometimes used in a more comprehensive sense, it includes the following districts—Rajshahi, Dinajpure, Rangpure, Nodia, Beerbhoom, Burdowan, parts of Midnapure and Jungle mahals, Ramgar Pachat, Palamo and part of Chunar."

Wilson's Vishnu Purna, Vol. II. P. P. 170-171. Hall's Ed—
P. Page 160. of 1848 (Ed)

—যদিচ হল সাহেবকে আমরা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, তথাপি লেখককে জিজ্ঞাসা করি—তিনি কি রূপে কলিকাতা পৌণ্ড্রের অন্তর্গত লিখিলেন। প্রকৃত পক্ষে গঙ্গা বক্ষস্থিত “ব” দ্বীপের সহিত পৌণ্ড্রের কোন সম্পর্ক নাই।

৩০ From Kankjol the pilgrim crossed the ganges and travelling for 600 *li* or 100 miles he reached thd kingdom of *Punnafatanna* (Cunnigham's Ancient Geograply of India Buddhist period, Vol. I. page 480—

"After crossing the river, the Chinaman went 600 li or from 100 to 120 miles eastward and found himself in the kingdon of Pundra Vardhan—Westmacott's note on For-

স্থিত হইতে হয় ? কখনই নহে। রাজমহলের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীর হইতে ১০০ কিম্বা ১২০ মাইল গমন করিলে দিনাজপুর, রঙ্গপুরের দক্ষিণ ও বগুড়ার উত্তর প্রান্তে উপনীত হইতে হয়।

পৌণ্ড্রের রাজধানী "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন" নামে খ্যাত হইয়াছিল। তদনুসারে চীন পরিব্রাজক সেই রাজ্যের নামই "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন" লিখিয়াছেন। চীন ও পূর্ব্বোপদ্বীপবাসিগণ প্রায়ই রাজধানীর নাম দ্বারা রাজ্যের নামকরণ করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞবর ফারগিউসন সাহেব উইলসন সাহেবের প্রাচীন প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বলেন ৩১; যে পৌণ্ড্র দেশের নিবৃত্তি বিভাগে (আধুনিক দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও কুঁচবিহার এই বিভাগের অন্তর্গত) বর্দ্ধন কোট, কচ্ছপ ও শ্রীরঙ্গ বা বিহারিকাই প্রধান নগরী। যবনদিগের ভারত প্রবেশ কালে বোধ হয় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন "বর্দ্ধন কোট" ৩২ নামেই পরিচিত ছিল। পাল গৌড়েশ্বরদিগের অধঃপতনের সহিত ইহার নামটিও বিকৃত হইয়াছিল। বিখ্যাত যবন ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজ, আজ্জার্জদ্দিন অবুল কাতত্ত্বগল তুগন খাঁর বঙ্গ শাসন কালে, ৬৪০ হইতে ৬৪২ হিজিরি শক মধ্যে, আপন গ্রন্থ "তবকত-ই-নেছরি" সংকলন করেন। তিনি বলেন, বিজযোন্মত্ত মহম্মদ বখতিয়ার যখন তির্ব্বত আক্রমণাভিলাষে লক্ষ্মণাবতীর রাজধানী হইতে উত্তরদিকে গমন করেন, তখন জনৈক মেঁচ ৩৩ সরদারের সহিত তিনি বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত সরদার তাঁহাকে প্রথমত বর্দ্ধন কোট নগরে লইয়া যান।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানী সম্বন্ধে বিজ্ঞবর ওয়েস্টমেকট সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই আমরা সঙ্গত বিবেচনা করি। তিনি গোবিন্দ গঞ্জের নিকটবর্ত্তী "রাজবাটি" অনতি প্রাচীন "বর্দ্ধন কোট" বা "বর্দ্ধন কোটা প্রাচীন "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন" নির্ণয় করিয়াছেন। ৩৪ যশস্বী পুরাতত্ত্ববিদ ডাক্তর শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরও ওয়েস্টমেকট সাহেবের নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ৩৫

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

---

ban dighee copper plate Journ As. Soc. Beng Vol XLV1 part 1 page 7.

৩১ Quarterly Oriental magazine Vol IV page 190.

৩২ কায়স্থ কৌস্তুভ প্রণেতা গৌড় রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নাম "বর্ত্ত কোট" লিখিয়াছেন। বোধ হয় ইহা বর্দ্ধন কোটের অপভ্রংশ।

৩৩ মেঁচ জাতির সম্বন্ধে পাঠকগণ অল্পই অবগত আছেন। কুঁচ ও মেঁচগণ এক মূল হইতে উৎপন্ন। বিশেষতঃ কুঁচ বিহারের রাজবংশ মেঁচজাতি সম্ভূত। মহারাজ শিবসিংহের পিতা দুর্ভাগা "হরুয়া" বা "হরিদাস" কে তৎবংশধর গণ "পিতৃ" পদ প্রয়োগ করিতে সঙ্কুচিন হন।

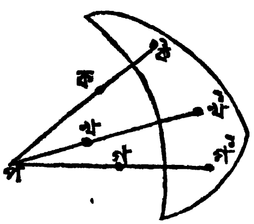
৩৪ Traces of Buddhism in Dinagepore By E. V. Westmacott. J. A. S. B. XLVII part 1 page 188.

৩৫ Journal. As. Society of Bengal Vol XLVII part 1 pp. 375 396.

জ্যোতিষিক পরিভাষা।

সংখ্যা এবং পরিমাণ দ্বারা নিশ্চিত সূর্য্য, গ্রহ, কেতু ও নক্ষত্রাদির গতিপ্রতিপাদক শাস্ত্রকে জ্যোতিষ শাস্ত্র কহে।

দর্শকের চক্ষু যে গোলকের কেন্দ্র এবং যাহার ব্যাসার্দ্ধ অতি বিস্তীর্ণ তাহাকে খগোলক কহে। এই গোলকের উপরিদেশে গগনবিহারীগণ প্রক্ষিপ্ত প্রতীয়মান হয়। যথা ১ম চিত্রক্ষেত্রে যদি 'চছজ'



দ্বারা গোলকের কিয়দংশ 'প' দ্বারা উহার কেন্দ্র অথবা দর্শকের চক্ষু, এবং 'ক' 'খ' 'গ' দ্বারা জ্যোতিষ্কগণ বিজ্ঞাপিত করা যায়, এবং 'প' হইতে 'ক' 'খ' এবং 'গ' দিয়া রেখা টানা যায়; এবং তিনটী রেখা যদি যথাক্রমে 'ক১,' 'খ১,' এবং 'গ১' নামক বিন্দুতে গোলক স্পর্শ করে, তাহা হইলে এই রেখাত্রয় দ্বারা উক্ত গগনবিহরীগণ গোলকে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলা যায়।

কোন ব্যক্তি তিমিরাচ্ছন্ন কিন্তু মেঘশূন্য রজনীর নিশীথ সময়ে দক্ষিণ মুখে দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে তাঁহার বোধ হইবে যে তাঁহার অপসব্য দিকস্থ জ্যোতিষ্কগণ ঈষদ্বক্র ভাবে গমন করতঃ ক্ষিতিজবৃত্তের নিম্ন দেশে অন্তর্হিত হইতেছে, এবং তাঁহার বাম দিক হইতে পূর্ব্বাদৃষ্ট জ্যোতিষ্কগণ আকাশকক্ষার উপরিভাগে প্রকাশ হইতেছে এবং সকল জ্যোতিষ্কই সমান্তর মণ্ডলাকার পথে বিচরণ করিতেছে।

তিনি যদি উত্তরদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে যদিও কতকগুলি জ্যোতিষ্ক ক্ষিতিজবৃত্তের নিম্ন দেশে অদৃশ্য হইতেছে, অপর গুলি এই বৃত্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগের আবর্ত্তনের অধঃসীমা প্রাপ্ত হইয়া গগন মণ্ডলের উপরিদেশে প্রত্যাগমন করিতেছে। এই জ্যোতিষ্কগণও সমান্তর মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করিতেছে প্রতীয়মান হইবে। যে সকল জ্যোতিষ্ক কখনও অদৃশ্য হয় না তাহাদিগের মধ্যে একটী জ্যোতিষ্ক গতিবিহীন এবং গমনশীল জ্যোতিষ্কগণের মধ্যস্থিত উপলব্ধি হইবেক। এই স্থির * জ্যোতিষ্কের নাম ধ্রুবতারা। য়ুরোপীয়রা ইহাকে পোলারিস্ অথবা মেরুসন্নিহিত নক্ষত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

যদিও জ্যোতিষ্কগণ এই রূপে নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে, তত্রাচ সাধারণতঃ তাহাদিগের পরস্পরের দূরতার কখনই

* সাধারণত এই সকল নক্ষত্রকে "স্থির" বলা হইল কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোন নক্ষত্রই স্থির নহে কিন্তু ইহারা এত দূরস্থিত যে প্রায়ই পৃথিবী হইতে ইহাদের গতি অনুভূতহয় না। সং

ব্যতিক্রম হয় না। তজ্জন্য পর্য্যবেক্ষণ স্থান এবং ধ্রুবতারা সন্নিহিত কোন, বিন্দু সংযোগী রেখা অবলম্বন করিয়াই যেন গগনমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছে প্রতীয়মান হইবেক। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পৃথিবী কৌণিক সমবেগে নিরন্তর আবর্ত্তন করিতেছে বলিয়াই এই রূপ অনুভূত হইয়া থাকে।

নক্ষত্র এবং গগনবিহারীর ন্যায় পৃথিবীর প্রতি ও জ্যোতির্ব্বিদগণের সবিশেষ মনো-যোগ করা আবশ্যক; কারণ এই পৃথিবী হইয়া আমরা গগনবিহারীগণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগের স্থানসন্নিবেশ এবং তাহাদিগের পরস্পরের এবং আমাদিগের হইতে তাহাদিগের দূরতা নির্ণয় করি।

গগনবিহারীগণের মধ্যে পৃথিবীকে গণ্য করাতে এবং এরূপ বিসদৃশ পদার্থ সকল একই ধর্ম্মাক্রান্ত বলাতে আপাততঃ আ-শ্চর্য্য জ্ঞান হইতে পারে। কারণ পৃথিবী দৃশ্যতঃ অসীম এবং অমেয়, কিন্তু জ্যোতি-ষ্কগণ বিন্দুবৎ আয়তনবিহীন। পৃথ্বী তমসাবৃত এবং নিস্প্রভ, কিন্তু গগনবিহারী গণ স্বত উজ্জ্বল। পৃথিবীর কোন রূপ গতিই আমাদিগের উপলব্ধি হয় না; কিন্তু নভোবিহারীগণ নিয়তঃ স্ব স্ব স্থান পরি-বর্ত্তন করিতেছে দেখিতে পাই। সুতরাং প্রাচীন পণ্ডিতেরা পৃথিবী এবং অন্যান্য গগনবিহারীর পরস্পর কোন সৌসাদৃশ্য নাই বিবেচনা করিতেন। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির প্রকৃত অবস্থা না জানিতে পারিলে এই ভ্রম কখনই দূরীভূত হইবার নহে।

গগনবিহারীদিগের বিষয় যাহা কিছু আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহা তাহা-দিগের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মাত্র। অতএব জ্যোতিষ্কগণের পর্য্যবেক্ষণ স্থান, পর্য্যবে-ক্ষক এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ সমূহ গতিবিহীন কি না, অথবা গতিবিশিষ্ট হইলে তাহাদিগের গতিই বা কিরূপ তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। কতকগুলি পদা-র্থের পরস্পর সম্বন্ধে দৃশ্যমান স্থান-সন্নি-বেশ পর্য্যবেক্ষকস্থানের উপর নির্ভর করে। সুতরাং পর্য্যবেক্ষকের অজ্ঞাতসারে এই পর্য্যবেক্ষণস্থানের পরিবর্ত্তন হইলে, দৃষ্ট পদার্থগুলিই স্ব স্ব স্থান পরিবর্ত্তন করি-য়াছে প্রতীয়মান হইবেক। নক্ষত্রগণের গতি দৃশ্যমান গতি মাত্র; প্রকৃত গতি নহে। পর্য্যবেক্ষক স্থানের গতি বশতই জ্যোতিষ্কগণের এইরূপ গতি অনুভূত হইয়া থাকে।

য়ুরোপীয় ইদানীন্তন জ্যোতির্ব্বিদেরা প্রায় এক প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল নক্ষত্রের আলোক "মিট-মিট" করে তাহারা এক এক সূর্য্যসম অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় বৃহদাকৃতি, নিজে তেজোময়,এবং এক এক জগতের কেন্দ্রীভূত। সূর্য্যের অত্যুগ্র-কিরণে নক্ষত্রগণের মৃদুল জ্যোতি অদৃশ্য হওয়াতে আমরা দৌরবীক্ষণিক অনুসন্ধান ব্যতিরেকে ইহাদিগের সম্বন্ধে সূর্য্যের প্র-কৃত স্থান নিরূপণে সমর্থ হই না। নক্ষত্র-গণ মধ্যে সূর্য্যের গতি ঋজু, অর্থাৎ সূর্য্য পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে। ইহার প্রমাণ এই যে যখন

পশ্চিমাকাশস্থিত কোন জ্যোতিষ্ক সূর্য্যাস্তের অল্পকাল পরেই অস্তমিত হইতে দেখা যায়, তখন উক্ত জ্যোতিষ্ক সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে থাকে; এবং ক্ষিতিজবৃত্তের উপর ইহার স্থিতি কালের দৈর্ঘ্যের প্রতিদিন হ্রাস হইতে থাকে, এবং অবশেষে সূর্য্যালোকে অদৃশ্য হইয়া যায়; এবং অল্পকাল মাত্র অদৃশ্য থাকিয়া পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পুনরায় আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। ক্রমশ এই নক্ষত্রের উন্নতি, এবং ইহার উদয় ও সূর্য্যোদয় ব্যবহিত সময় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব প্রমাণ হইল যে সূর্য্য জ্যোতিষ্কের পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে আসিয়াছে। সুতরাং স্থির জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সূর্য্যের গতি ঋজু স্বীকার করিতে হইবে। স্থির জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সূর্য্যের গতির অপর একটী প্রমাণ আছে তাহা এই যে সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক উন্নতি পরিবর্ত্তনশীল। সৌর মাধ্যাহ্নিক উন্নতি (Meridian attitude) গ্রীষ্মকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং শীতকালে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। সুতরাং সুমেরু হইতে সূর্য্যের দূরতা শীতকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং গ্রীষ্মকালে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। পৃথিবীর প্রকৃত গতিই সূর্য্য এবং গগনমণ্ডলের দৃশ্যমান গতির কারণ।

কতকগুলি গগনবিহারী, যথা চন্দ্র এবং গ্রহগণ, স্থির জ্যোতিষ্কগণ সম্বন্ধে স্ব স্ব স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে।

চন্দ্র এত দ্রুতবেগে গমন করে যে অল্পকাল মধ্যেই আমরা ইহার পূর্ব্বস্থান চ্যুতি অনুধাবন করিতে পারি। খগোলকে চন্দ্রকক্ষ অঙ্কিত করিলে উহা খগোলকের একটী বৃহদ্বৃত্ত হইবে। এই উপগ্রহ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে (অর্থাৎ ইহার দৃশ্যমান গতির বিপরীত দিকে) গমন করে। গ্রহ অথবা উপগ্রহগণের পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে যে গতি তাহাকে ঋজুগতি, এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে যে গতি তাহাকে বক্রগতি কহে। সুতরাং স্থির জ্যোতিষ্কগণ সম্বন্ধে চন্দ্রের গতি ঋজু। *

চন্দ্রকক্ষ বৃত্তাভাসাকার। চন্দ্রের মধ্য দূরতা প্রায় ১২০,০০০ ক্রোশ, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের প্রায় ৬০ গুণ। চন্দ্রের দৃশ্যমান ব্যাস ২৯ কলা হইতে ৩৩কলা পর্য্যন্ত আয়ত। চন্দ্র আপন মেরুদণ্ড অবলম্বন

---

* সূর্য্য সিদ্ধান্তে গ্রহগণের অষ্ট প্রকার গতি উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্যথা—

১ বক্র (Decreasing retrograde motion)

২ অতিবক্র Increasing retrograde motion)

৩ বিকল৷ (Stationary)

৪ মন্দ (Increasing direct motion less than the mean motion)

৫ মন্দতর (Decreasing direct motion less than the mean motion)

৬ সম (Mean motion)

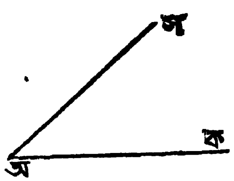
৭ শীঘ্রতর বা অতিশীঘ্র (Increasing direct motion greater than the mean motion)

৮ শীঘ্র (Decreasing direct motion greater than the mean motion) ইহাদিগের মধ্যে ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮ ঋজুগতি।

করিয়া পরিভ্রমণ করে; এবং ২ ⅙ দিবসে একবার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া জ্যোতিষ্কগণ মধ্যে স্বস্থান পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

পৃথিবী স্বরূপতঃ গোলক নহে। একটী বৃত্তাভাস ellipseকে তাহার লঘিষ্ঠ ব্যাসের উপর ঘুরাইলে তাহার যেরূপ আকৃতি হয় পৃথিবীর আকৃতিও সেইরূপ। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ব্যাস প্রায় ৩৯৫০ ক্রোশ, এবং ইহার বৃহত্তম ব্যাস প্রায় ৩৯৬৪ ক্রোশ। অর্থাৎ পৃথিবীর গরিষ্ঠ ব্যাস লঘিষ্ঠ ব্যাসাপেক্ষা প্রায় ১৪ ক্রোশ বৃহৎ। কিন্তু সাধারণতঃ পৃথিবী গোলাকার বলা যাইতে পারে।

খগোলকে স্থিরজ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কোন বিন্দুর অবস্থান দ্বারা কোন রেখার দিঙ্‌ নির্ণয় হইতে পারে। কারণ পর্য্যবেক্ষক হইতে সেই বিন্দু পর্য্যন্ত কোন রেখা টানিলে পর উক্ত রেখা পর্য্যবেক্ষক স্বস্থান পরিত্যাগ করিলেও প্রথমোক্ত দিকে দেখা যাইবে। 'অ' পর্য্যবেক্ষণ স্থান (২য় চিত্র



ক্ষেত্র) এবং 'স' জ্যোতিষ্ক কল্পনা করিয়া 'অস' রেখা টানা যাউক; এবং বোধ কর যে পর্য্যবেক্ষক স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠে স্থানান্তর আশ্রয় করিলেন। পর্য্যবেক্ষকের পূর্ব্বস্থান হইতে কোন রেখা টানিলে তাহা যে দিকস্থ হইত, এই নূতন স্থান হইতে রেখা টানিলে তাহাও সেই দিকস্থ হইবেক। কারণ স্থির জ্যোতিষ্কগণ পৃথিবী হইতে এত দূরবর্ত্তী যে পৃথিবীর ব্যাস ও তাহাদিগের কাহার ও সহিত কোন অনুমেয় কোণোৎপাদন করে না।

পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আপন কক্ষ নিষ্কাশিত করে। কিন্তু অচল নক্ষত্রগণ পৃথিবী হইতে এরূপ অন্তরস্থিত যে এই কক্ষের ব্যাস ও তাহাদিগের সহিত কোন অনুভবনীয় কোণ উৎপন্ন করে না। সুতরাং পৃথিবীর গতি বশতঃ 'অস' রেখার দিকের কোন ব্যত্যয় হয় না। সুতরাং পর্য্যবেক্ষকের চক্ষু হইতে জ্যোতিষ্ক পর্য্যন্ত আয়ত কোন রেখা নিয়তই আপন সমান্তর থাকিবে।

পর্য্যবেক্ষণের স্থান 'অ' হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে 'অক' রেখা টানা যাউক। পৃথিবীর গতি বশতঃ দর্শক নিয়তই স্বস্থান পরিবর্ত্তন করিতেছেন; সুতরাং 'অক' শূন্যে কোন নির্দ্দিষ্ট দিকস্থিত বলিয়া কল্পনা কর। 'অস' দিক অপরিবর্ত্তনীয় হওয়াতে 'সঅক' কোণ নিত্য হইবে।

অতএব 'অক' নামক কোন রেখা সকল সময়েই আপন সমান্তর থাকাতে ইহা গতিবিহীন নক্ষত্রগণ সম্বন্ধে কোন স্থির বিন্দুতে খগোলক ছেদ করিবে। পৃথিবীর আবর্ত্তন শলাকা ইহার উদাহরণ স্থল। এই আবর্ত্তন শলাকা সূর্য্য পরিভ্রমণ কালে পৃথিবীর সমান্তর থাকে। ইহা যে দুই বিন্দুতে খগোলক স্পর্শ করে তাহাদিগকে গগনমণ্ডলের মেরু (Pole) কহে। এই মেরুদ্বয় স্থির জ্যোতিষ্কগণ সম্বন্ধে গতিবিহীন। নিরক্ষ বৃত্তের সমতল, (Plane of Earth's Orbit) পৃথিবীর আবর্ত্তন সময়ে ইহার সমান্তর

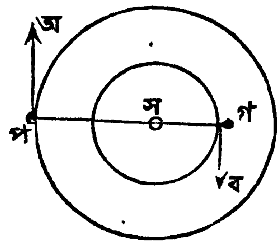
থাকে, এবং নক্ষত্রগণ সম্বন্ধে গতিবিহীন কোন বৃহদ্বৃত্তে খগোলক স্পর্শ করে। পৃথিবীর আবর্ত্তন শলাকার দিক নিত্য নহে, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তন অতি সামান্য।

সূর্য্য পরিভ্রমণ বশতই গ্রহগণের গতির বিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে যশোজীবিত কোপার্নিকস্ এই মত প্রচার করেন। গ্রহগণ আকাশমণ্ডল সমতলে পরিভ্রমণ করে। সকল গ্রহই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে, অর্থাৎ নভোমণ্ডলের দৃশ্যমান দৈনন্দিন গতির বিপরীত দিকে গমন করে।

গ্রহ এবং পৃথিবীর গতি বশতই গ্রহগণের গতি কখন ঋজু এবং কখন বক্র প্রতীয়মান হয়; এবং এই কারণেই তাহারা এক স্থানে স্থিরভাবে রহিয়াছে অনুভূত হইয়া থাকে। সূর্য্যস্থিত পর্য্যবেক্ষক গ্রহগণের গতির নিয়ম অতি সামান্য বিবেচনা করিবেন, কারণ সূর্য্য গ্রহগণের মধ্যবর্ত্তী। কিন্তু গ্রহগণের গতি পৃথিবীস্থ পর্য্যবেক্ষকের পক্ষে অতিশয় দুরূহ হইবে; কারণ প্রথমতঃ, পৃথিবী গ্রহগণের মধ্যস্থিত নহে, এবং দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীও অপরাপর গ্রহের ন্যায় সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছে।

কি জন্য গ্রহগণ কখন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে এবং কখন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে, এবং কি জন্যই বা কখন কখন এক স্থানে স্থিরভাবে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা নিরূপণ করিতে হইলে, সূর্য্য পৃথিবী এবং গ্রহগণের সাপেক্ষ স্থান সন্নিবেশ পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

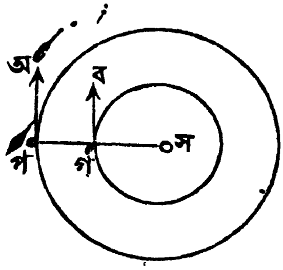
প্রথমতঃ, একটী কনিষ্ঠ গ্রহ (inferior planet যাহার কক্ষ সূর্য্য ও পৃথিবীর কক্ষের মধ্যস্থিত) যথা বুধ অথবা শুক্রের বিষয় বিচার করা যাউক। শুক্র গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা দ্রুতবেগে সূর্য্য পরিভ্রমণ করিবে; কারণ যে গ্রহ যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী তাহার বেগ ততই অধিক। ৩য় ক্ষেত্রে বোধ কর



'প' দ্বারা পৃথিবী, 'স' দ্বারা সূর্য্য এবং 'গ' দ্বারা গ্রহের অবস্থান বিজ্ঞাপিত হইতেছে। শরচিহ্ন দ্বারা পৃথিবী এবং গ্রহের কক্ষ পরিভ্রমণের দিঙ্ নির্দ্দেশিত হইতেছে। শুক্র যে পরিমিত সময়ে আপন কক্ষে ১০ ক্রোশ গমন করিবে, পৃথিবী সেই পরিমিত কালে ৮½ ক্রোশ মাত্র গমন করিবে; পৃথিবীর গতির বেগ ও শুক্রের গতির বেগের সমানুপাত ৮½ = ১০।

পৃথিবী ৮½ ক্রোশ গমন করাতে শুক্র ৮½ ক্রোশ গমন করিয়াছে অনুভূত হইবে; কিন্তু শুক্রের দৃশ্যমান গতি শুক্রের প্রকৃত গতিতে (১০ ক্রোশ) সংযোগ করিলে 'ব' শরচিহ্ন দিকে শুক্রের ১৮½ ক্রোশ গতি প্রতিপন্ন হইবে।

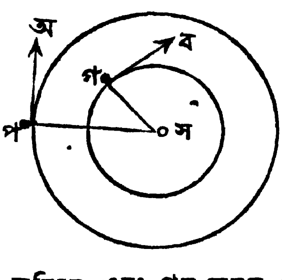
দ্বিতীয়তঃ, ৪র্থ চিত্রক্ষেত্রে 'স' সূর্য্য 'গ' গ্রহ, এবং 'প' পৃথিবী কল্পনা কর



পৃথিবীর গতি বশতঃ গ্রহ 'ব' শরচিহ্নের বিপরীত দিকে ৮½ ক্রোশ গমন করিয়াছে প্রতীয়মান হইবেক। শুক্র 'ব' শরচিহ্ন দ্বারা বিজ্ঞাপিত দিকে ১০ ক্রোশ গমন করিতেছে। সুতরাং এক্ষণে প্রকৃত গতি হইতে দৃশ্যমান গতি বিয়োগ করিলে 'ব' শরচিহ্নের দিকে ১½ ক্রোশ মাত্র গতি অবশিষ্ট থাকিবে।

সুতরাং শুক্র ৩য় ক্ষেত্রে যদ্রূপ তদ্রূপ অবস্থিত হইলে পৃথিবীস্থ পর্য্যবেক্ষকের প্রতীয়মান হইবে যে উহা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আপন প্রকৃত গতির দ্বিগুণ বেগে গমন করিতেছে। কিন্তু ৪র্থ ক্ষেত্রে যথা তথা অবস্থিত হইলে শুক্র আপন প্রকৃত বেগের এক পঞ্চমাংশ মাত্র বেগে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিতেছে অনুভূত হইবে।

তৃতীয়তঃ, সূর্য্য গ্রহ এবং পৃথিবী ৫ম চিত্রক্ষেত্রে



যথা তথা সন্নিবেশিত হইলে গ্রহ এবং পৃথিবীর গতি পরস্পর নিরাকরণ করিবে, এবং গ্রহ অচল প্রতীয়মান হইবে।

বহিস্থ গ্রহগণের (Superior Planet) গতির নিয়মও প্রায় এইরূপ।

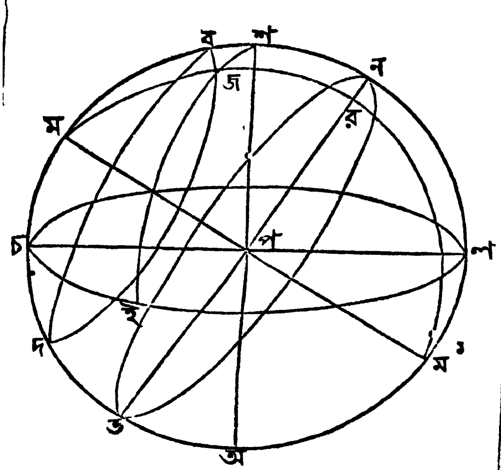
কোন বস্তু পৃথিবীর উপর হইতে নিক্ষেপ করিলে উহা সরল রেখা ক্রমে প্রায় পৃথ্বী কেন্দ্রে পতিত হয়। পৃথিবী প্রকৃত গোলক না হওয়াতে নিক্ষিপ্ত পদার্থ ঠিক্ ভূমধ্যে পতিত হয় না। পৃথিবীর আকর্ষণই পতনশীল পদার্থের এইরূপ গতির কারণ। পতনশীল পদার্থ যে সরল রেখা ক্রমে পতিত হয়, তাহাকে লম্বক কহে। কোন গুরুভার পদার্থ, যথা শীষকখণ্ড রজ্জুবদ্ধ করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে লম্বক রেখা নির্ণীত হইবে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারাই লম্বক রেখার দিক্ নিশ্চিত হয়।

যে সমতলের উপর লম্বক রেখা লম্বভাবে পতিত হয় তাহাকে চক্রবালীয় (Horizontal) সমতল কহে। জল, পারদ প্রভৃতি তরল পদার্থের স্থিরাবস্থাপন্ন পৃষ্ঠদেশ চক্রবালীয় সমতলের উদাহরণ স্থল।

লম্বক রেখা যে সমতলের অন্তর্গত অথবা চক্রবালীয় সমতলের উপর লম্বভাবে পতিত সমতলকে লম্বক সমতল (Vertical) কহে।

গগন মণ্ডলের যে বিন্দু ঠিক আমাদিগের মস্তকোপরিস্থ তাহার নাম শিরোবিন্দু; (Zenith) এবং যে বিন্দু আমাদিগের পদতলের অধোদিকস্থ তাহার নাম অধোবিন্দু। (Nadir) অথবা কোন স্থির তরল পদার্থের উপরিভাগ হইতে একটী সরলরেখা লম্বভাবে টানিলে পর সেই সরল রেখা যে দুইটী বিন্দুতে খগোলক স্পর্শ করে তাহাদিগকে

শিরোবিন্দু এবং অধোবিন্দু বলে। যথা ৬ষ্ঠ চিত্রক্ষেত্রে 'শ' এবং 'অ'।

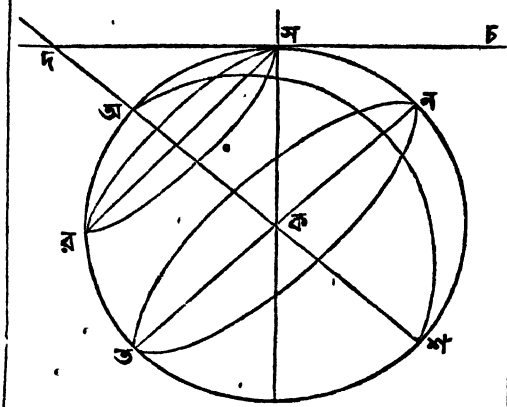


শিরোবিন্দু হইতে কোন জ্যোতিষ্কের দূরতাকে উহার শিরোবিন্দু অন্তর কহে। যথা ৬ষ্ঠ চিক্ষেত্রে 'জ' জ্যোতিষ্ক হইলে 'শজ' শিরোবিন্দু অন্তর হইবে।

যে বৃহদ্বৃত্তে চক্রবালীয় সমতল খগোলক ছেদ করে তাহাকে আকাশ কক্ষা, অথবা চক্রবাল অথবা দিগ্বলয় (Horizon) কহে।

অতএব আকাশকক্ষা খগোলকের একটি বৃহদ্বৃত্ত। ∴ শিরোবিন্দু এবং অধোবিন্দু এই বৃত্তের মেরু; এবং ইহার প্রত্যেক বিন্দু শিরোবিন্দু হইতে ৯০ অংশ অন্তর।

যে বৃত্তপরিধি আমাদিগের দৃষ্টিপথের সীমাসূচক, অর্থাৎ পরিষ্কার দিবসে যে বৃত্তের পরিধিতে নভোমণ্ডল এবং পৃথিবী সংলগ্ন বোধ হয়, সেই বৃত্তকে দৃশ্যমান চক্র বলে; যথা, ৭ম চিত্রক্ষেত্রে 'দচ' সমতল।



উক্ত দৃশ্যমান চক্রবালের সমস্তের একটী সমধরাতল পৃথিবীর কেন্দ্র সংলগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে গগন মণ্ডলকে স্পর্শ করে এরূপ কল্পনা করিলে, সেই কল্পিত বৃত্তকে প্রকৃত (Rational চক্রবাল কহে।

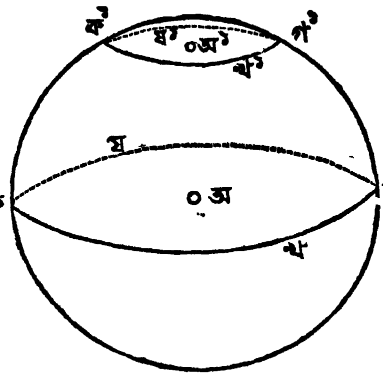
যে বৃহদ্বৃত্তে খগোলকে এবং প্রকৃত চক্রবাল পরস্পর স্পর্শ করে তাহার নাম খগোলক চক্রবাল। যথা, ষষ্ঠ চিত্রক্ষেত্রে 'চল'।

আকাশকক্ষা অথবা অম্বরান্তের সমান্তর রেখার নাম অম্বরান্ত রেখা।

যে পরিধির প্রত্যেক বিন্দু মধ্য বিন্দু হইতে সমান্তর তাহার নাম গোলক।

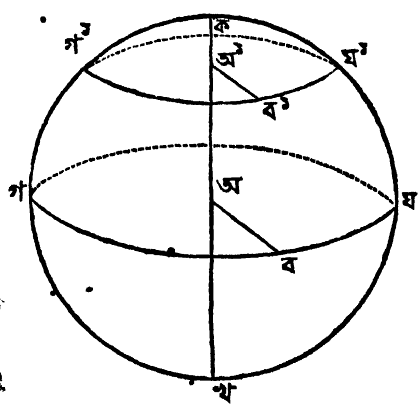
যে সকল বৃত্ত গোলক দুই সমান অংশে বিভক্ত করে, এবং যাহাদিগের কেন্দ্র এবং ব্যাস ও গোলকের কেন্দ্র এবং ব্যাস অভিন্ন তাহাদিগকে গোলকের বৃহদ্বৃত্ত কহে। যথা আকাশ কক্ষা, নিরক্ষবৃত্ত ইত্যাদি।

যে সকল বৃত্ত গোলক দুই সমান অংশে বিভক্ত করে না, এবং যাহাদিগের কেন্দ্র এবং ব্যাস ও গোলকের কেন্দ্র এবং ব্যাস বিভিন্ন, তাহাদিগকে গোলকের ক্ষুদ্রবৃত্ত কহে। যথা ৮ম চিত্রক্ষেত্রে 'কখগঘ' দ্বারা



১১১১
একটী বৃহদ্বৃত্ত, এই কখগঘ দ্বারা একটী ক্ষুদ্রবৃত্ত. 'অ' দ্বারা 'কখগঘ' বৃত্তের এবং
১　　১১১১
গোলকের কেন্দ্র, এবং 'অ দ্বারা 'কখগঘ বৃত্তের কেন্দ্র জ্ঞাপিত হইতেছে।

৯ম ক্ষেত্রে 'অ' গোলকের কেন্দ্র। 'ক'



এবং 'খ' বিন্দুদ্বয়ে, গোলক পরিধি ছেদ করে এরূপ একটী রেখা গোলকের কেন্দ্র দিয়া টানা যাউক; এবং 'অ' বিন্দু দিয়া 'কখ' রেখার লম্বভাবে 'অব' রেখা টানা যাউক। 'অব' 'ব' বিন্দুতে গোলক স্পর্শ করিতেছে।

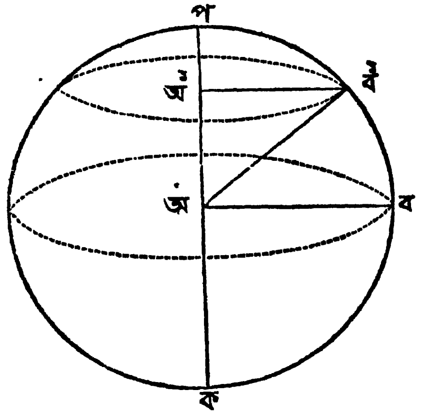
'কখ' আবর্ত্তন শলাকা এবং 'অব' ইহার লম্ব রেখা কল্পনা করা যাউক। 'কখ' র আবর্ত্তন দ্বারা 'ব' 'গবঘ' নামক বৃহদ্বৃত্ত (কারণ 'অ' ইহার কেন্দ্র) নিষ্কাশিত করিবে।

১১
'অবকে 'কখ' আবর্ত্তন শলাকার অপর
১
একটী লম্বরেখা কল্পনা করিলে 'ব বিন্দু
১১১
দ্বারা 'গবঘ নামক একটী ক্ষুদ্র বৃত্ত (কারণ ইহার কেন্দ্র এবং গোলকের কেন্দ্র বিভিন্ন) অঙ্কিত হইবে। 'ক' এবং 'খ' বিন্দু দ্বয়কে এই বৃত্তদ্বয়ের মেরুদ্বয় কহে।

সাধারণ মেরু বিশিষ্ট বৃত্ত সকলকে সমান্তর-বৃত্ত কহে। যথা 'গবঘ' এবং
১১১
'গবঘ।

বৃহদ্বৃত্তের প্রত্যেক বিন্দু ইহার মেরু হইতে ৯০অংশ (degrees) অন্তর; কিন্তু ক্ষুদ্র বৃত্তের এরূপ নহে। ক্ষুদ্র বৃত্তের প্রত্যেক বিন্দুর দূরতা এক মেরু হইতে ৯০ অংশের অধিক, এবং অপর মেরু হইতে ৯০ অংশের ন্যূন হইবে।

১০ ম চিত্রক্ষেত্রে 'পবক' বৃত্তার্দ্ধ, 'পক'



বৃত্তের ব্যাস, 'অ' কেন্দ্র, 'ব^{১}অ^{১}' এবং 'ব অ' 'পক' র উপর লম্বভাবে পতিত হইয়াছে। 'পবক' বৃত্তার্দ্ধ 'পক' রেখা অবলম্বন করিয়া আবর্ত্তন করে কল্পনা করিলে, 'পবক' একটী গোলাকার পরিধি নিষ্কাশিত করিবে, এবং 'ব' একটী বৃহদ্বৃত্ত এবং 'ব^{১} একটী ক্ষুদ্রবৃত্ত অঙ্কিত করিবে। 'অ' এবং 'অ^{১} যথাক্রমে এই বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্র কল্পনা করা যাউক। এই বৃত্তদ্বয়ের সাপেক্ষ আয়তন তুলনা করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ যত বৃহত হইবে, বৃত্তপরিধি তদনুসারে বৃহৎ হইবে। যদি কোন বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ অপর বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধের দ্বিগণ হয়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত বৃত্তের পরিধি শেষোক্ত বৃত্তের পরিধির দ্বিগুণ হইবে, যদি তিন গুণ হয় তিন গুণ হইবে; ইত্যাদি। অতএব 'অ^{১}ব^{১} এবং 'অব' যে অনুপাতীয় হইবে ক্ষুদ্রবৃত্ত যাহার ব্যাসার্দ্ধ 'অ^{১}ব^{১} এবং বৃহদ্বৃত্ত যাহার ব্যাসার্দ্ধ 'অব' তাহাও সেই অনুপাতীয় হইবে।

'পব^{১} গোলীভুজ দ্বারা 'প' মেরু হইতে ক্ষুদ্রবৃত্তের প্রত্যেক বিন্দুর দূরতা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। 'পব^{১} ভুজকে সচরাচর ক্ষুদ্র বৃত্তের মেরু দূরতা কহে।

যে সকল বৃহদ্বৃত্ত আকাশ কক্ষের সমান্তর এবং খমধ্য যাহাদিগের সাধারণ মেরু তাঁহাদিগের নাম দৃশ্বত অথবা দৃঙমণ্ডল। যথা ৬ষ্ঠ ক্ষেত্রে 'শজই'। এই সকল বৃত্ত দ্বারা আকাশ কক্ষের উপর জ্যোতিষ্কগণের উন্নতি নির্ণীতি হয়।

উন্নতি দুই প্রকার (১) প্রকৃত (২) দৃশ্যমান। পৃথিবীর কোন স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে জ্যোতিষ্কগণের যে উন্নতি প্রতীয়মান হয় তাহার নাম দৃশ্যমান উন্নতি। কিরণ বক্রীভবন এবং লম্বন বশতঃ উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ ভ্রমাত্মক হইয়া থাকে। এই ভ্রম সংশোধন করিলে প্রকৃত উন্নতি নিরূপিত হয়।

যে বৃত্ত জ্যোতিষ্কের দৈনন্দিন পৃথিবী প্রদক্ষিন দ্বারা উৎপাদিত হয় তাহাকে অহোরাত্র বৃত্ত কহে যথা ৬ষ্ঠ ক্ষেত্রে 'দব'।

যে কল্পিত ব্যাস অবলম্বন করিয়া পৃথিবী প্রতিদিন পরিভ্রমণ করে তাহার নাম পৃথিবীর মেরুদণ্ড। যথা, ৭ম চিত্রক্ষেত্রে 'অশ'। এই আবর্ত্তন শলাকার এক প্রান্তকে উত্তর মেরু এবং অপর প্রান্তকে দক্ষিণ মেরু কহে।

মেরু হইতে কোন জ্যোতিষ্কের দূর-

ন্তাকে উহার মেরু অন্তর কহে। যথা ৬ষ্ঠ ক্ষেত্রে 'মজ'।

উত্তর মেরু অথবা সুমেরু হইতে যে অন্তর তাহাকে সুমেরু অন্তর,(N. P. D.) এবং দক্ষিণ মেরু অথবা কুমেরু হইতে যে অন্তর তাহাকে কুমেরু অন্তর (S. P. D.) কহে।

শ্রী নীঃ -

শকুন্তলা সমালোচনার সমালোচনা।

শকুন্তলার চরিত্র-সম্বন্ধে লেখক খুঁজিয়া পাতিয়া এমনি একটি সূক্ষ্ম বাহির করিয়াছেন যে, তাহা জন-সাধারণের বুদ্ধির অগোচর—স্বপ্নের অগোচর—বড় একটি অদ্ভুত রহস্য! সেটি এই যে,মানব-প্রকৃতির বিষয়টা কালিদাসের বড় একটা জানা শুনা ছিল না! লেখকের অসাধারণ সাহস বলিতে হইবে যে, তিনি কালিদাসকে মানব প্রকৃতির নিগূঢ় মর্ম্ম শিক্ষা দিতে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছেন—কালিদাসের মহা অপরাধ যে, লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে তিনি শকুন্তলাকে মিরাণ্ডা কিংবা পর্ডিটার মত করিয়া গঠন করেন নাই! তবে, ইতর ভাষায় একটি প্রবাদ আছে "মারি ত গণ্ডার—লুটি ত ভাণ্ডার," তাই উচ্চতা শিক্ষা দিতে হইলে হিমালয়কেই দেওয়া উচিত, বিস্তার শিক্ষা দিতে হইলে সমুদ্রকেই দেওয়া উচিত, মানব-প্রকৃতি শিক্ষা দিতে হইলে কালিদাসকেই দেওয়া উচিত, একথা লেখক বলিতে পারেন এবং তদুত্তরে আমরাও বলিতে পারি যে, তবে তিনি এক জন অসামান্য বীর পুরুষ তাহার আর সন্দেহ নাই! যখন জগৎ-শুদ্ধ সকলেই শকুন্তলার কবিত্ব-রস-মাধুর্য্য শত সহস্র মুখে ঘোষণা করিয়াও তৃপ্তি মানিতেছে না, তখন তাহার নিগূঢ় মর্ম্মটা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা কর, তাহা নহে—কালিদাসের বিরুদ্ধে লেখনীর লৌহ মুদ্গার হস্তে করিয়া কোমর বাঁধিয়া দাড়ানো—কি সর্ব্বনাশ! আশ্চর্য্য এই যে, বঙ্কিম বাবু আমাদের দেশের এক জন সুপ্রসিদ্ধ লেখক, তিনি যেমন কৃতবিদ্য তেমনি রসজ্ঞ, যেমন গুণী তেমনি গুণ-গ্রাহী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত,—আশ্চর্য্য এই যে তিনিও কালিদাসের উপর লেখনীর ঠোকর দিতে ছাড়েন নাই! কালিদাস যদি জুলিয়স্ সীজার হইতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন "Et tu Brute"—এটা যেন আমরা চক্ষের সামনে দেখিতে পাইতেছি! বলিতে কি আমাদের মনে এইরূপ একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, বুঝিবা তাঁহারই দেখা-দেখি লেখক কালিদাসের উপর

কলম চালাইতে সাহসী হইয়াছেন—সাহস এবং স্পর্দ্ধার কথা ধরিতে গেলে চেলা গুরুকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুরও পূর্ব্বে কবিকুল-চূড়-মহোদয় মাই-কেল মধুসূদন ইঙ্গিতচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে তিনি কালিদাসকে এক ঘুসিতে পাড়িয়া ফেলিতে পারেন! শকুন্তলার চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু গোটা-ভুক্তিন কথা যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে জোর-জবর্দস্তির কিছু-মাত্র অপ্রতুল নাই বরং তাহা মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু যুক্তির বাঁধুনি তেমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার সমা-লোচনার প্রথমেই তিনি শকুন্তলা এবং মিরান্দা উভয়ের অবস্থা-সাদৃশ্য দেখাইয়া তাহাদের মধ্যে কোন্ খানটায় অমিল তাহা দেখাইতেছেন—

"শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিত নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরান্দার সেরূপ নহে। মিরান্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ?

Lord! how it looks about! Believe me Sir,
It carries a brave form;—but 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা;

I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা. তাহা মিরন্দার অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরান্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরান্দা বলিতেছে,

O dear father
Make not too rash a trial of him, for
He's gentle, and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,

My affections
Are then most humble; I have no ambitions
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরান্দা সংস্কার বিহীনা, কিন্তু মিরান্দা পরদুঃখ-কাতরা, মিরান্দা স্নেহশালিনী; মিরান্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।"

বঙ্কিম বাবুর উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে ছাঁট ছোঁট দিয়া এইটুকু কেবল আমরা শিরোধার্য্য করিতে পারি যে, "শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিত নহেন" ও "সমাজ-প্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরান্দার তাহা কিছুই নাই;" শকুন্তলা মিরন্দা অপেক্ষা শিক্ষিতা ইহাতে আর সন্দেহ নাই, কেননা এক ত বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে উভয়ের কেহ যে কাহারো ন্যূন ছিল ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, তদ্ব্যতীত লৌকিক আচার-ব্যবহার শিক্ষা মিরান্দার অবস্থা-সুলভ ছিল না সুতরাং সে বিষয়ে শকুন্তলা অনেক অগ্রগামী; এ যেন হইল,—কিন্তু মাঝে মাঝে গ্রন্থকার অকাট্য সিদ্ধান্তের ভঙ্গী করিয়া এমনি এক একটি আজগুবি কথা গুঁজিয়া রাখিয়াছেন যে, রকম সকম দেখিয়া হঠাৎ লোকে ভড়্কিয়া যায়,—মনে করে, যে-সব সেপাই সান্তিরি পাহারা দিতেছে ওখানে এগোনো দায়! কিন্তু একটু কাছে গিয়া দেখ অমনি তোমার ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে—দেখিবে যে, সিপাই-গুলি তালপাতার সিপাই হইতে অধিক কিছুই নহে। "মিরান্দা এত সরলা যে তাহার লজ্জাও নাই" এ কথাটি বঙ্কিম বাবু কিসের জোরে বলিতেছেন? কোন্ শাস্ত্রে বলে—কোন যুক্তিতে বলে যে, স্ত্রীজাতি-সুলভ নৈসর্গিক লজ্জা সরলতার অভাব জ্ঞাপন করে; এ রকম অকাট্য-ভানের বচন-গুলি দেখিলে আমাদের মনে হয় যে, যুক্তির হালে পানি পাইতেছে না—অথচ লেখনীর দাঁড় টানিতে কসুর করা হইতেছে না—ভরষা কেবল যা' এক গায়ের-জোর-কাণ্ডারী! "মিরান্দার লজ্জা নাই" এ কথাটির মর্ম্ম-খানা কি একবার ভাবিয়া দেখা যা'ক;—এক প্রকার জাল-লজ্জা আছে বটে যাহা প্রকৃত পক্ষে লোকাচারেরই কন্যা, তবে কি না মানব-প্রকৃতির সঙ্গে তাহার সহবাসের ঘনিষ্টতা দেখিয়া লোকে জানেযে, তাহা মানব প্রকৃতিরই গর্ব্ভজাত কন্যা। বড়-ঠাকুরকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া পলায়ন করা ঐ দলের লজ্জা—মনে হইতে পারে যে স্ত্রীলোকের পক্ষে উহা স্বাভাবিক কিন্তু বাস্তবিক তাহা লোকাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। লজ্জা-শব্দে শুদ্ধ যদি কেবল ঐরূপ লজ্জা বুঝাইত তবে বঙ্কিম বাবু উপরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণ-শিরোধার্য্য করিতাম। ইহা আমরা খুবই স্বীকার করি যে, মিরান্দা তাহার পিতার সমক্ষে ফর্ডিনাণ্ড উপলক্ষে স্বচ্ছন্দে যেরূপ আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল, শকুন্তলা হইলে কখনই তাহা পারিত না—লোকাচার-জ্ঞান লজ্জা-বেশে উপস্থিত হইয়া তাহার মুখে চাবি দিয়া রাখিত। কিন্তু ও একরূপ লজ্জা আর শিশুদের স্তন্য-পান-প্রবৃত্তির ন্যায় যাহা মনুষ্যের, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির, স্বভাব-সিদ্ধ—এ একরূপ লজ্জা। এরূপ লজ্জা মিরান্দার আছে ইহা বঙ্কিম বাবু কোন স্থানেই বলেন নাই; তিনি বলিয়াছেন বটে যে, "মিরান্দার লজ্জা নাই কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা তাহা আছে;" কিন্তু পবি-

ব্রতা কিছু আর লজ্জার নামান্তর নহে—লজ্জা মাত্রই ত আর অপবিত্র নহে,—এক জন স্বৈরচারিণী স্ত্রী যদি এক জন সরলা সুশীলা অবগুণ্ঠনবতী কুল-বধূকে অপবিত্র বলিয়া তিরস্কার করে, তবে কোন্ সহৃদয় শ্রোতা তাহা ঘাড় পাতিয়া লইতে পারে? বঙ্কিম বাবু যদি বলিতেন যে, মিরান্দার অশিক্ষা-সুলভ নৈসর্গিক লজ্জা আছে, লোকজনের-দেখিয়া-শেখা লজ্জা নাই, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের আর কোন কথা বলিবার থাকিত না। এই টুকু পর্য্যন্ত কেবল আমরা স্বীকার করি যে, মিরান্দা তাহার পিতা প্রস্পেরোর নিকটে আপনার মনের সকল কথা অসংকোচে ব্যক্ত করাতে এটি খুব প্রকাশ পাইয়াছে যে, লোকাচার-নিবন্ধন লজ্জা যে কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না; কিন্তু মিরান্দা যখন ফর্ডিনাণ্ডের নিকট আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছিল, তখন যে স্ত্রীজাতি-সুলভ নৈসর্গিক লজ্জা তাহার মনে অধিকার পায় নাই ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না;—বিশেষতঃ যখন দেখা যায় যে পশুরাও ওরূপ লজ্জায় সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত নহে—পুরুষ-পশুর ভাব-পূর্ণ আহ্বানে স্ত্রী-পশু স্বভাবতই সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়া থাকে। মিরান্দার মনে যদি লজ্জার উদয় না হইবে তবে "Hence bashful cunning" এ কথা বলিয়া কাহাকে সে দূর করিয়া দিতে ইচ্ছা করিল? যদি বল যে, মিরান্দার লজ্জা একেবারেই নাই যে তাহা নহে—তবে কি না শকুন্তলার যত লজ্জা তত তাহার নাই; তবে তাহাও সকল পক্ষে খাটে না,—শুদ্ধ কেবল লোকাচার-মূলক লজ্জার পক্ষেই খাটে; কেননা নৈসর্গিক লজ্জা মিরাণ্ডাতেও যেমন শকুন্তলাতেও তেমনি—দুই পক্ষেই সমান প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়, তবে প্রেম নাকি তাহা অপেক্ষা আরো প্রবল এজন্য উভয়ের কাহারো তেমন-ধারা লজ্জা প্রেমের হস্তে নিস্তার পাইতে পারে নাই। নিম্নে এবিষয়টা একটু বিবৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

ভালবাসার পাত্রের নিকট মনের ভাব আগা-গোড়া সমস্তই খুলিয়া বলিতে স্বভাবত ইচ্ছা যায় সত্য কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে তবে কেন তাহা একেবারে খুলিয়া বলিতে বাধো-বাধো ঠেকে? ইহার কারণ স্পষ্টই পড়িয়া আছে,—এক কথায় এই যে, দু'হাত নহিলে তালি বাজে না; নায়িকা যে নায়কের নিকট আপনার মন খুলিয়া দেখাইতে পারিলেই বাঁচে তাহার এক কারণ—মনের ভার-লাঘব করিবার ইচ্ছা, আর এক কারণ মনের বিনিময়ে মন পাইবার ইচ্ছা—এই দ্বিতীয় কারণ স্থলটি লজ্জা শঙ্কা প্রভৃতি অনেক গুলি গুহাশয় জন্তুর বাসস্থান; শঙ্কা এই যে, মনের বিনিময়ে মন না পাইয়া যদি শুদ্ধ কেবল কপট ভালবাসা পাই তবেই ত সর্ব্বনাশ! লজ্জা এই যে, মনের বিনিময়ে মন না পাইয়া যদি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা তিরস্কার পাই তবে ত' আর আমি নাই! কিন্তু প্রেমের তোড়ের মুখে লজ্জা কত

-কাল টেঁকিয়া থাকিতে পারে? মিরাণ্ডার মনে যে-মাত্র লজ্জা উদয় হইয়াছে— প্রেম আসিয়া অমনি তাহাকে এক ধমক "Hence bashful cunning;" "cunning" শব্দটি প্রেমের স্বাভাবিক cunning-ত্ব "অশিক্ষিত-পটুত্ব" ব্যক্ত করিতেছে; লজ্জার সঙ্গে চাতুরি শব্দটি যুড়িয়া না দিলে লজ্জাকে ভৎর্সনা করিবার সুবিধা পাওয়া যায় না বলিয়া প্রেম অলক্ষিত ভাবে "চাতুরি" শব্দটি গুঁজিয়া দিল; কেননা লজ্জা ভৎর্সনার যোগ্য নহে,চাতুরিই কেবল ভৎর্সনার যোগ্য, তবে যে লজ্জা ওখানে চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছে সে কেবল চাতুরি-শব্দের অসাধু-সঙ্গ বশতঃ;—অতএব আর কিছু না লজ্জাকে তাড়াইবার জন্য প্রেম অলক্ষিত ভাবে তাহার ললাটে চাতুরি-শব্দের ছাপ মারিয়া দিল,—মিরান্দা তাহাতে ভুলিয়া মনে করিল "আপনার মনকে গোপন করা এক রূপ চাতুরী খেলা"। মিরান্দার মনে অমঙ্গল আশঙ্কাও যে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল তাহা পরের কতিপয় পংক্তিতেই জ্বল্ জ্বলাট্ যথা,

"I am your wife,if you will marry me
—If not, I die your maid: to be [your fellow
You may deny me, but I will be [your servant
Whether you will or no."

ফর্ডিনাণ্ডের নিকট মন অনাবৃত করিলে ফর্ডিনাণ্ড তাহা অগ্রাহ্য করিলেও করিতে পারে এই এক শঙ্কা এবং উপযাচক হইয়া প্রেম জ্ঞাপন করা এই এক লজ্জা,—দুইই মিরাণ্ডার মনে যথেস্ট পরিমানে ছিল তথাপি প্রেমের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া আপনার মনকে এই রূপ প্রবোধ দিতে গিয়াছে যে, মন গোপন করাটা চাতুরি খেলা—চাতুরি-খেলাটা একরূপ প্রতারণা করা—প্রতারণা করাটা একরূপ মিথ্যা কথা কহা —মিথ্যা কথা বলাটা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য! এত গুলি কথা কিছু আর তাহার মনে আনুপূর্ব্বিক গ্রথিত হইয়া আইসে নাই—হয় ত অমন-ধারা একটা কথাও তাহার মনে লিপি-বদ্ধ হয় নাই—তবে কিনা ভাবটা ঐ। মন গোপন করাটাই যে আশঙ্কিত বিপদ হইতে—আশঙ্কিত অপমান তিরস্কার লাঞ্ছনা গঞ্জনা ইত্যাদি হইতে—নিস্তার পাইবার এক মাত্র উপায়, এ কথা তখন আমলেই আইল না—মনো-গোপনের মন্দ দিক্‌টাই নেত্র-পথে আবির্ভূত হইল। দারুণ বিরহাবস্থায় পড়িয়া শকুন্তলারও মনে বিলক্ষণ ভয় হইয়াছিল যে, চাই কি রাজা তাহার প্রার্থনা একেবারেই অগ্রাহ্য করিতে পারেন; শকুন্তলা তখন ভাবিতেছে,"এমনেও গিয়াছি নয় অমনেও যাইব, ভাগ্যে যা আছে তাই হইবে—উপায়ের মধ্যে এক যা উপায় দেখিতেছি রাজাকে একখানা পত্র লেখা"; এই রূপ বিষম এক উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া তবে শকুন্তলা রাজাকে এই পত্র খানি লিখিয়াছিল।

"তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ কামো দিবাবি রত্তিম্পি।

নিগ্‌ঘিণ তবেই বলিঅং তুই বুত্ত মনোর-
হাই অঙ্গাইং ॥"

শকুন্তলার মনে ভয়-লজ্জা যেরূপ ঢেউ খেলিতেছে তাহাতে, "তুজ্ঝ ণ আণে হি অঅং" "তোমার হৃদয় আমি জানি না" (কিন্তু আমার এইরূপ অবস্থা) একথাটি কি ঠিক্ জায়গায়ই বসিয়াছে! মিরান্দা অতগুলি কথাতে যে আশঙ্কাটি প্রকাশ করিয়াছে গরিব বেচারী শকুন্তলা "তোমার হৃদয় আমি জানি না কিন্তু" ইত্যাদি গোটা দুই কথাতে সমস্তই বলিয়া চুকিয়াছে; ঐ কথাটি যদি শ্লোকের গোড়াতেই না বসিত তাহা হইলে উহার মনোহারিত্ব মারা পড়িয়া যাইত; "তোমার হৃদয় আমি জানি না" এই কথাটিকে মুখপাত করিয়া আপনার হৃদয়ের অবস্থা জ্ঞাপন করাতে প্রেমের মুন্সিগিরির চূড়ান্ত প্রকাশ পাইয়াছে—তাহাতে বলা হইয়াছে যে, তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করিতে পার, আমাকে তিরস্কার করিতে পার, আমাকে ভৎসনা করিতে পার, আমার আস্পার্দ্ধার কথা শুনিয়া হাস্য করিতে পার—সবই তুমি পার ইহা আমি জানি, কিন্তু তথাপি আমার অবস্থা এরূপ নিদারুণ যে, তোমার নিকট মন খুলিয়া বলা ভিন্ন আর আমার গতি নাই!" পত্র-খানি শঙ্কা-পূর্ব্বক হওয়াতেই এত মনোহর হইয়াছে; এক জন নিকৃষ্ট কবির হাতে পড়িলে শকুন্তলা আগে আপনার মনের অবস্থার কথা লিখিয়া পরে রাজার মনের অবস্থার কথা জানিতে চাহিত—আগে ন্যায়-শাস্ত্রের পদ্ধতি-অনুসারে জানা কথাটা ব্যক্ত করিয়া অজানা কথার মীমাংসা চাহিত—কিন্তু কালিদাস কি জায়গাটিতেই ঐ নির্দোষ সরল হৃদয়ের সদ্যোজাত আশঙ্কাটি কয়েকটি কম্পিত-স্বরে শব্দিত করিয়াছেন—ইহাতেও আজিকার কালের কোন কোন ব্যক্তি এ কথা মুখে আনিতে লজ্জা বোধ করেন না যে, কালিদাস মানব প্রকৃতি বুঝিতেন না! অতএব আর অধিক বলা বাহুল্য যে, নৈসর্গিক লজ্জা শকুন্তলারও যেমন মিরাণ্ডারও তেমনি, উভয়েরই সমান তবে কি না প্রেমের তাড়া খাইয়া দুটার কাহকেও বেশী ক্ষণ তিষ্ঠিয়া থাকিতে হয় নাই। বঙ্কিম বাবু এক জায়গায় লৌকিক লজ্জার কথা উল্লেখ করিয়াছেন যথা "মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়-লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে।" লৌকিক লজ্জা জানে না—তবে যেন সে আর কোন রকমের জানে লজ্জা জানিলেও জানিতে পারে ইহাতে বঙ্কিন বাবুর কোন আপত্তি নাই—কিন্তু তাহা তিনি কোন স্থানে ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করেন নাই; বঙ্কিম বাবু ক্রমাগতই বলিয়া আসিতেছেন মিরান্দার লজ্জা নাই, তাহাতে আবার বলিতেছেন যে "তাহার প্রণয়-লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে;" অপেক্ষাকৃত' পরিস্ফুট হইবে এই যে কথা ইহা নৈসর্গিক লজ্জা পক্ষে খাটে না,—কেন না সে-পক্ষে শকুন্তলা অপেক্ষা মিরান্দা কোন অংশে ন্যূন নহে; উভয়েরই নৈসর্গক লজ্জা যথেষ্ট রহিয়াছে

এবং উভয়েই প্রেম-সমক্ষে সে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়াছে। বঙ্কিম বাবু মিরান্দার "Hence bashful cunning" এ কথাটি শুদ্ধ কেবল তাহার লজ্জা-হীনতার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—তাহার লজ্জা হইতেছে ও সে-তাহার-লজ্জাকে সে ভৎর্সনা করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে—ইহার উপর বঙ্কিম বাবুর আদবেই চক্ষু পড়ে নাই,— বঙ্কিম বাবুর যুক্তি এই যে, ফর্ডিনাণ্ডের সমক্ষে Hence ইত্যাদি কথা বলিতে মিরান্দার যথন লজ্জা করে নাই তখন সে লজ্জা-হীনা; এস্থলটিতে তাঁহার দেখা উচিত ছিল যে, " দূর হও লজ্জা-বেশী চতুরতা " ইত্যাদি, কথা গুলি প্রেমের শিখাইয়া দেওয়া কথা; কিন্তু তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিতে অবশ্যই তাহার লজ্জা করিতেছে—নৈসর্গিক লজ্জা অবশ্যই তাহার আছে, তা' নহিলে *H*ence ইত্যাদি কথাগুলির সমস্ত তাৎপর্য্যই মাঠে মারা যায়—Hence বলিয়া যাহাকে তাড়াইবে তাহারই অভাব হইয়া যায়। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "স্বভাব-দত্ত স্ত্রী-চরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লর্জ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরান্দার অভাব নাই," বঙ্কিম বাবুর এ কথাটির যে কি অর্থ তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না; মিরান্দা বলিয়াছে

"Hence bashful cunning :
—And prompt me, plain and
holy innocence."

মিরান্দা এখানে লজ্জা-বেশী চতুরতা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পবিত্রতার শরণাপন্ন হইতেছে—সুতরাং পবিত্রতা এখানে লজ্জার বিরোধী পক্ষ তবে আর তাহা কেমন করিয়া লজ্জা শব্দের বাচ্য হইবে, অন্ধকার কেমন করিয়া আলোক শব্দের বাচ্য হইবে? অতএব বঙ্কিম বাবুর ও জায়গাটা এইরূপে পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়,— স্বভাবদত্ত স্ত্রী-চরিত্রের যে লজ্জা,যাহা লৌকিক লজ্জা অবিদ্যমানেও রমনী-হৃদয়ে আধিপত্য করে, তাহা মিরান্দার অভাব নাই। আর বঙ্কিম বাবু যে, বলিয়াছেন " তাহার (অর্থাৎ মিরান্দার) প্রণয় লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষা-কৃত পরিস্ফুট হইবে " ইহাও নৈসর্গিক লজ্জা-পক্ষে খাটে না;—শকুন্তলার প্রণয়-লক্ষণ "তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং" ইত্যাদি বাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে, এবং মিরান্দার প্রণয়-লক্ষণ "Hence" ইত্যাদি বাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে, ইহাতে উভয়ের কাহারো লজ্জা-হীনতা প্রকাশ পাইতেছে না—প্রকাশ পাইতেছে তবে কি? না লজ্জার সহিত প্রেমের যোঝাযুঝি এবং অন্তে প্রেমের জয় লাভ—এই যা' কেবল।

বাঙ্গালা সাহিত্য-রাজ্যে আজকাল গোঁজা-মিলনের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব তাহা আমরা জানি কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বঙ্কিম বাবুর ন্যায় এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তিও সে দোষ হইতে সম্পূর্ণ রূপে নির্ম্মুক্ত নহেন। বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে,

"যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহার হৃদয় প্রণয়-সংস্পর্শ-শূন্য

ছিল; কেননা শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই।"

মিরন্দা এবং শকুন্তলার মধ্যে অবস্থা সাদৃশ্য ঘনীভূত করিবার জন্য বঙ্কিম বাবু উপরে ঐ যে কথাটি বলিলেন, যে, শকুন্তলা ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই—উহা গোঁজা মিলনের একটি সুন্দর উদাহরণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু ঐ চোরা চালটিতে করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার কোন উপকার হওয়া দূরে থাকুক, লাভের মধ্যে তিনি এক পা বাড়াইতেই কিস্তিমাত হইয়া পড়িয়াছেন; তিনি একটু পরেই বলিতেছেন যে "শকুন্তলা সমাজ-প্রদত্ত সংস্কার সম্পন্না;" "ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই" এমন যে শকুন্তলা তিনি কি না "সমাজ-প্রদত্ত সংস্কার-সম্পন্না"! ঐ যে সমাজ-প্রদত্ত সংস্কার উহা শকুন্তলা কি যোগ-বলে পাইয়াছিল না স্বপ্নে পাইয়াছিল? ইহার পরেই বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থে আসিতেছে।

"উভয়েই তপোবন মধ্যে—এক স্থানে কণ্বের তপোবন—অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন।"

প্রস্পেরোর উপদ্বীপকে তপোবন বলিয়া স্বচ্ছন্দে চালাইয়া দেওয়া, লোকালয়ের সহিত একেবারেই সম্পর্ক-শূন্য ইন্দ্রজাল-গুপ্ত অগম্য উপদ্বীপকে লোকালয়ের অনতিদূরবর্ত্তী স্বচ্ছন্দ-গম্য তপোবন বলিয়া অনায়াসে চালাইয়া দেওয়া গোঁজা মিলন প্রদানের আর একটি সুন্দর উদাহরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

প্রকৃত কথা এই যে, রাজ-পুরুষেরা প্রায়ই ঋষিদিগের তপশ্চর্য্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তপোবনে যাতায়াত করিত; কেননা মনুতে পাওয়া যায় যে ঋষিদিগের তপস্যা যাহাতে নিষ্কণ্টকে চলে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা রাজাদের একটা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অত কেন—শকুন্তলাতেই ব্যক্ত আছে যে, "যঃ পৌরবেন রাজ্ঞা ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্তঃ সোঽহং অবিঘ্ন ক্রিয়োপলম্ভায় ধর্ম্মারণ্যং ইদং আয়াতঃ।" তপস্যার কুশলাদির তত্ত্বাবধারকদিগের তপোবনে যাওয়া আসা এমনি একটা চল্‌তি ব্যাপার যাহা মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে, এরূপ না হইলে দুষ্মন্ত রাজা সহসা ওরূপ একজন তত্ত্বাবধারকের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে কখনই সাহসী হইতেন না; তা' ভিন্ন তপোবন অবারিত-দ্বার—সেখানে প্রবেশ করিতে কাহারো নিষেধ নাই এ অবস্থায় সেখানে মধ্যে মধ্যে লোকের গমনাগমন হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি—তপোবন ত আর প্রস্পেরোর উপদ্বীপ নয় যে, তাহা দুস্তর সমুদ্র এবং ততোধিক দুস্তর মায়া-মন্ত্র দ্বারা লোকালয় হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, নানা শ্রেণীর লোককে ভট্টাচার্য্যদিগের চতুষ্পাঠীতে যাইতে ত

দেখা যায়, তবে তপোবনের ঋষিদিগের নিকট লোকের গমনাগমন অসম্ভব হইবে কেন? সশিষ্যে এবং সপরিবারে ঋষিরা তপোবনে বাস করিতেন; শরীর-শোষণ-কারী লোকদ্বেষী কঠোর তপস্যা কথন যে তপোবনে আচরিত হইত এ রূপ বোধ হয় না; ইহার প্রমাণের জন্য দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই—কণ্বমুনির চরিত্রই উহার যথেষ্ট প্রমাণ; কণ্বমুনিকে কেহ স্বপ্নেও মনে করিতে পারে না, যে তিনি হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করিয়া চতুরগ্নি বেষ্টিত হইয়া জীর্ণ শীর্ণ দেহে উর্দ্ধ-পদে দিন রাত্রি তপস্যা করিতেছেন—লোক জন দিগের তাঁহার কাছে যাইতে নিষেধ। তপোবনের অর্থ আর কিছুই নয়—পৃথিবীর ঝঞ্ঝাট্ হইতে দূরে থাকিয়া স্বাভিমত ব্যক্তিগণের সহিত পারমার্থিক চর্চা করিবার স্থান এবং তাহার সঙ্গে—যেমন কাশীরাম দাস বলিয়াছেন—"পড়িবে পড়াবে যজ্ঞ করিবে ব্রাহ্মণ" ইহারই উপযোগী এমন একটি নিভৃত নিবাস যেখানে লোকালয়ের কোলাহল প্রবেশ পাইতে পারে না। কণ্ব-মুনির ন্যায় ব্যক্তিরা অবশ্য পৃথিবীর দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত,—কিন্তু তা' বলিয়া এমন নয় যে তাঁহারা একেবারে পৃথিবী-ছাড়া লোক; এমন সুবিধা থাকিতে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা শান্তি করিরার জন্য লোকেরা যে মধ্যে মধ্যে তপোবনের সাধু সঙ্গে আপনাদের দেহ মন পবিত্র করিয়া আসিবে তাহা ত হইতেই পারে—না হওয়াই বিচিত্র।

বঙ্কিম বাবু এক স্থানে বলিয়াছেন "দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ এক প্রকার লুকাচুরি খেলা। সখি রাজাকে ধরিয়া রাকিস্ কেন? (!) তবে আমি উঠিয়া যাই, (!!) আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই (!!!) শকুন্তলার এ সকল বাহানা আছে মিরান্দার সে সকল নাই।" উপরি-উদ্ধৃত তিনটি কথার গাত্রে পরপর বিস্ময়-চিহ্নের সংখ্যা-বৃদ্ধি দেখিয়া কেহ আশ্চর্য্য হইবেন না, কেননা প্রথম কথাটির আর সব রহিয়াছে কেবল মাথাটি নাই, রাজার সহিত নির্জ্জন প্রেমালাপের সময় দ্বিতীয় কথাটি শকুন্তলা মূলেই বলে নাই শুদ্ধ কেবল উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল; তৃতীয় কথাটির ছায়ামাত্রও শকুন্তলা-গ্রন্থে কুত্রাপি নাই। প্রথম কথাটি শকুন্তলা-গ্রন্থে এই রূপ আকারে রহিয়াছে

শকুন্তলা॥ প্রিয়ম্বদামবলোক্য॥ হলা কিং অন্তেউরবিরহপজ্জুস্সুঅস্স রাএসিণো উবরোহেন।

ওলো, রাজর্ষি অন্তঃপুর বিরহে উতলা ওঁরে আর উপরোধ কেন?

শকুন্তলার এ কথাটির শেষ ভাগের দু-রকম অর্থ করা যাইতে পারে; এক অর্থ এই—ওঁরে ধরো রাখিস্ কেন? আর এক অর্থ এই যে, উপরোধের প্যাঁচে ফেলে রাজাকে আমাদের মনের মত কথা বলাচ্চিস কেন? বঙ্কিম বাবু উদ্ধৃত অংশটি প্রথম অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন—তাহা করুন, তাহাতে আমরা তত দোষ দেখিতেছি না, কিন্তু রাজার মনের ভিতরের কথাটা শুনিবার জন্য

শকুন্তলা যে অন্তঃপুর বিরহের কথা উল্লেখ করিল, বঙ্কিম বাবু তাহার আভাস পর্য্যন্তও দেন নাই—ইহাতে আমাদের সবিশেষ আপত্তি আছে। বিশেষ কোন কারণ নাই শুধু শুধু "সখি ওঁকে ধরিয়া রাখিস্ কেন" বলিলে কি যেন একটা গায়ে পড়া গোচের কথা—এই রূপ তাহা কাণে শুনায়; কিন্তু তাহা ত নয়;—যা'র জন্যে এখন শকুন্তলার মন একান্তই আঁকু বাঁকু করিতেছে তা' এই যে, রাজার মনের সটীক সংবাদটি রাজা আপন-মুখে ব্যক্ত করিলে বাঁচা যায়; রাজার মন অন্তঃপুরের জন্য ছট্ ফট্ করুক্ আর না-ই করুক্, অন্তপুর বাসিনীদিগের অ-পেক্ষা রাজা শকুন্তলাকে অধিক ভালবাসেন কি না, এইটি অবিতথ রূপে জানিবার জন্য শকুন্তলার মন খুবই ছট্ ফট্ করি-তেছে; তাই শকুন্তলার মুখ হইতে অন্তঃ-পুরের কথাটা আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়িয়াছে;—এটা নিতান্তই মনের মর্ম্মান্তিক কথা—উহার মধ্যে "বাহানা", কথার ছল, কিংবা দোকান-দারীর নাম গন্ধও নাই; যা'ক,—কিন্তু আর একটা কথা হচ্চে এই যে, "রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন" এরূপ প্রশ্ন আশপাশের কথাবার্ত্তার সঙ্গে আদ-বেই জোড় খায় না; রাজা ভাবে-মস্‌গুল্ হইয়া বসিয়া আছেন—উঠিয়া যাইবার কোন প্রসঙ্গই নাই—তবে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার কথাই আসিবে কেন? হই-য়াছে এই যে, প্রিয়ম্বদা এমনি ভাবে রাজার নিকট শকুন্তলার মনের অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে যে, তাহা শু'নয়া শকু-ন্তলার প্রতি রাজার যেন দয়ার উদ্রেক হয়; রাজা তাহা শুনিয়া বলিলেন যে, তোমার সখীর যেমন ভালবাসা আমার প্রতি, আমারও তেমনি তোমার সখীর প্রতি। ইহা শুনিয়া শকুন্তলার মন তৃপ্ত হইল না—শকুন্তলা ভাবিল প্রিয়ম্বদা অত করিয়া আমার কষ্টের অবস্থা জানাইল—রাজা ভালবাসা না জানাইয়া করেন কি? শকুন্তলার মনোগত অভিপ্রায় এই যে, কাহারো কর্ত্তৃক কোন অংশে উপরুদ্ধ না হইয়া রাজা আপনা হইতে মনের কথাটা যতক্ষণ না খুলিয়া বলিতেছেন ততক্ষণ তিনি যতই কেন আমার মন-যোগানে কথা বলুন না, আমার মনে তাহা আমল পাইবে না; যদি এমন হয় যে, রাজা অন্তঃপুর অপেক্ষা আমাকে ভাল বাসেন না—চক্ষু লজ্জার দায়ে পড়িয়া আমার প্রতি লোক-দেখানে ভাল বাসা জানান, কিংবা দয়া করিয়া আমার কষ্ট নিবারণ মানসে আমার প্রতি ভাল বাসা জানান, ইহার কিছুই আমি চাই না। শকুন্তলা যাহা মুখে বলিয়াছে তাহার ভিতরের কাথা এই "কই রাজা ত আপনা হইতে বলিতেছেন না যে, অন্তঃপুর অপেক্ষা তিনি আমাকে অধিক ভাল বাসেন, তবে তোমরা সখি ধরিয়া-বাঁধিয়া পেড়াপিড়ি করিয়া রাজাকে ভালবাসা স্বীবার করাইয়া লইতেছ কেন—উপরোধে আবশ্যক কি? আমরা যাহা বলি-লাম তাহা সত্য কি মিথ্যা কালিদাসের পুঁথি খুলিয়া দেখিলেই প্রকাশ পাইতে পারে—তথাপি পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা

শকুন্তলার আবশ্যকীয় অংশের সমস্তটা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;

"প্রিয়ম্বদা। আবন্নস্‌স বিসঅবাসিণো জনস্‌স অত্তি-হরেণ রণ্ণা হোদব্বংত্তি এসো বো ধম্মো।

রাজা। নাস্যাৎপরং

প্রিয়ম্বদা। তেণ হি ইঅং ণো পিয়সহী তুমং উদ্দিসিঅ ইমং অবত্থন্তরং ভঅবদা মঅণেণ আরোবিদা। তা অরুহসি অব্‌ভু-ববত্তীএ জীবিদং সে অবুলম্বিদুং।

রাজা। ভদ্রে! সাধারণোয়ং প্রণয়ঃ। সর্ব্বথানুগৃহীতোঽস্মি।

শকুন্তলা॥ প্রিয়ম্বদামবলোক্য॥ হলা কিং অন্তেউর বিরহ পজ্জুসুস্সুঅস্‌স রাএ সিণো উবরোহেণ।

ইহার মধ্যে "বাহানা" ই বা কোন্‌ খানে, কথার লুকাচুরিই বা কোন্‌খানে, হাব ভাব প্রকাশই বা কোন্‌খানে, কিছুই ত আমরা দেখিতে পাইতেছি না ; এখানে শকুন্তলার যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে তবে তাহা এই যে, রাজা যদি অন্তঃপুর অপেক্ষা আমাকে ভাল না বাসেন তবে যেন তিনি অনুরোধে পড়িয়া আমার প্রতি প্রেম প্রদর্শন না করেন,—আমার জন্য রাজা অতটুকুও কস্ট পা'ন—মন যাহা বলিতে চাহে না ভদ্রতার খাতিরে তাহা বলিয়া কস্ট পা'ন ইহা আমি চাহি না" এই তা'র মনে হইয়াছিল।—এ সব খাঁটি সোনাকে সোনার গিল্‌টি করা অতি যৎসামান্য ধাতুর সহিত তুলনা করা—হৃদয়ের গূঢ়তম কথা-একটিকে "বাহনা"র সহিত তুলনা করা আর দেবালয়ে মূত্র ত্যাগ করা উভয়েই সমান।

এই ত গেল "সখি রাজাকে ধরিয়া রাখিস্‌ কেন ?" তাহার পরে আসিতেছে "তবে আমি উঠিয়া যাই", এ কথাটা শুনিলে মনে হয় যে, রাজার সহিত শকুন্তলার অনেক দিন হইতে সখীত্ব চলিয়া আসিতেছে—অর্থাৎ "তবে ভাই আমি উঠিয়া যাই" বলিলেও যেন বলিতে পারিত ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই ও-কথা শকুন্তলা বলেই নাই, শকুন্তলা কেবল বলিয়াছে

"ণ মাণনীত্রস্থ অত্তাণং অপরাহইস্‌সং"

"মাননীয় ব্যক্তির কাছে আমি আপনাকে অপরাধ-গ্রস্ত করিব না"

ইত্যুত্থায় গন্তু মিচ্ছতি

এই বলিয়া উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছে।

বঙ্কিম বাবু শকুন্তলার মুখ নিঃসৃত অতকটি শব্দের বদলে কেবল এক "তবে" শব্দ দিয়াই সারিয়াছেন, আর শকুন্তলা যেখানে কথা শেষ করিয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত সেখানে তাহার মুখে"আমিউঠিয়া যাই"কথাটি গুঁজিয়া দিয়াছেন, ইহাতেই দাঁড়াইয়াছে "তবে আমি উঠিয়া যাই।" আমাদের শাস্ত্রে পতি গুরুজনের সামিল ; মিল্‌টন সেক্সপিয়র প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজি পুঁথিতেও পতি Lord বলিয়া সম্বোধিত হইতে দেখা যায় ; প্রেম-জনিত দুই হৃদয়ের প্রগাঢ় ঐক্য সত্ত্বেও শকুন্তলা দুষ্মন্তকে গুরুলোক বলিয়া জানিতেছে ; সুতরাং দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার আরাম সাধনার্থে তাহাকে বাতাস

করিতে ও তাহার পায়ে হাত বুলাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল, 'তখন সত্য-সত্যই শকুন্তলার মনে যাহা হইল তাহাই সে বলিল; কি? না মাননীয় ব্যক্তির কাছে আমি আপনাকে অপরাধ-গ্রস্ত করিব না,— এই বলিয়া উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা করিল। শকুন্তলার এরূপ সরলতা-পূর্ণ সাধু ব্যবহারকে একটা নর্ত্তকী-মুখোচিত বাক্‌চপলো পরিণত করা—"তবে আমি উঠিয়া যাই" এই রূপ একটা মানের ভানে পরিণত করা —বড় যে একটা কঠিন কার্য্য তাহা নহে; সুন্দর একটি দুর্গাঠাকুরাণীর প্রতিমার নাশিকায় জোরে এক ঘা লাঠি মারিলেই তাহাকে স্পূর্পনখা রাক্ষসী করিয়া তোলা যাইতে পারে। এই ত গেল দ্বিতীয় কথা; ইহার পর আসিতেছে "আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই" এ কথা শকুন্তলা যে কোনস্থানে বলিয়াছেন—আমরা এত চেষ্টা করিলাম কিছুতেই খুঁজিয়া পাইলাম না; শেষে এই স্থির করিলাম যে, এক জায়গায় শকুন্তলা রাজাকে বলিয়াছেন

"ততক্ষণ গাছের আড়ালে লুকাও" তবে বুঝি বঙ্কিম বাবু ভুল ক্রমে ব্যাকরণের মধ্যম পুরুষকে উত্তম পুরুষ করিয়া ফেলিয়াছেন! শকুন্তলার সে জায়গাটি এই

"শকুন্তলা॥ সসম্ভ্রমং॥ পোরব। অসংসঅং মম সরীর বুত্তন্তোবলম্ভস্‌স অজ্জা গোদমী ইদো এব্ব আঅচ্ছদি দাব বিড়বন্তরিদো হোহি।"

বঙ্কিম বাবু কালিদাসের শকুন্তলার উপর এইরূপ কতক গুলি শ্লেষোক্তির ছিটা গুলি বর্ষণ করিয়াই মার্ মার্ শব্দে যুদ্ধের মাঝ খানে গিয়া পড়িয়া নিম্ন লিখিত-রূপে লেখনী অস্ত্র চালাইয়াছেন;

"ইহার (অর্থাৎ মিরাণ্ডার) অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলার চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত স্পূর্য্য-সমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল, ছি ছি, কেবল লুকাচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা "অদ্ধপধে স্মরিঅ এদস্‌স হত্থব্ভংসিণো মিণাল বলঅস্‌স কদে পড়িণিবুত্তম্হি।" ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দুষ্মন্তের মুখে "নম্নু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?"—এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দ্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য, অকৃতকীর্ত্তি —অপ্রথিতযশাঃ কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয় সম্ভাষণ প্রণয় সম্ভা-

.যণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম করা রূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্তমাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

"যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন তিনি শকুন্তলা চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে জলনিসেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম; রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা, দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয় থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয় "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল "অনার্য্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?"—সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেস্টের কবি হইতে হীন প্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।"

বঙ্কিম বাবু উপরে যে কথা-গুলি বলিলেন তাহার মধ্যে এক আধ জায়গার নয় অনেক স্থানেরই গাঁথুনি কম-মজবুত—এক এক জায়গার ভিত এমনি কাঁচা যে, একটু ঠোকর দিলেই ঘর দরজা সব শুদ্ধ হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায়। প্রথমতঃ বঙ্কিম বাবু কালিদাসের শকুন্তলারই সমালোচন করিতেছেন—যদি তাহা না করেন তাহা হইলে তাঁহার সমলোচনার মূল্য এত কমিয়া যায় যে তাহা বৃথা কেবল পণ্ডশ্রম হইয়া দাঁড়ায়। "অসন্তোসে উণ কিং করেদি" ইত্যাদি যে-কয়টি বচন তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন অনেক বঙ্গবাসী ব্যক্তি সে-গুলিকে কালিদাসের বলিয়া জানেন ইহা আমরা জানি, ইহাও জানি যে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটিকেও অনেকে কালিদাসের বলিয়া জানেন

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভো রাজন্ মুখং প্রক্ষালয়স্ব টঃ। প্রভাতে ভাষতে কুক্কু চ বৈতুহি চ বৈতুহি॥

এই যে অপূর্ব্ব শ্লোক ইহার প্রসব দ্বারা যে, কোন জন্মে কালিদাসের লেখনী কলঙ্কিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই—তবুও যদি জনশ্রুতির দোহাই দিয়া জোর করিয়া বলিতে চাও যে, উহা কালিদাসেরই বটে তাহা হইলে কাজেই আমাদিগকে চুপ করিয়া যাইতে হয়—কেননা আমাদের হস্তেও এমন কোন দলিল নাই যাহা জনশ্রুতির বিরুদ্ধে আমাদের কথা সপ্রমাণ করে; কিন্তু শকুন্তলার উপরি-উদ্ধৃত কথাগুলি যে কোন জন্মে কালিদাসের নহে তাহার আমরা যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারি। কি আশ্চর্য্য—একে কালিদাস তাহাতে আবার তাঁহার আর কোন গ্রন্থ নয় শকুন্তলা—সেই শকুন্তলার সমালোচনা করা হইতেছে, অথচ এতটুকুও আয়াস স্বীকার নাই যে, একবার একটু যাচাই করিয়া কালিদাসের আসল জিনিস্‌টার মূল্য ঠিক্ করিয়া ল'ন! তাহা দূরে যা'ক্—বিজ্ঞাপন দ্বারা আসল জিনিস্ এবং নকল জিনিস দুয়ের একই মূল্য ঘোষণা করিয়া বেড়াইয়াছেন! বিজ্ঞাপনের বাগাড়ম্বর দেখিয়া পাঠকেরা পাছে ভুলেন এ জন্য অধ্যাপক মোনিয়ার উইলিয়মস্ কর্ত্তৃক গ্রন্থবদ্ধ শকুন্তলার ভূমিকা হইতে নিম্ন লিখিত অংশটুকু সবিস্তরে উদ্ধৃত করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিলাম; মোনিয়র উইলিয়মস্ কি বলেন শুনা যা'ক

The various manuscripts separate themselves into two groups or classes: the one class embracing all those in Devanagari writing, which, without perfect uniformity, had still a community of character; the other, all those in Bengali.

German scholars distinguish these two classes of manuscripts by the names "Devanagari recension" and "Bengali recension," which terms may conveniently be adopted. The Devanagari recension is the older and purer: the Bengali however, must have existed at least 400 years since it is followed by the "Sahitya-darpana," one MS. of which bears the date 1504 of our era. The MSS. of the Devanagari class are chiefly found in the Upper Provinces of India, where the great demand has produced copyists without scholarship, who have faithfully transcribed what they did not understand and therefore, would not designedly alter. On the other hand, the copists in Bengal have been Pandits, whose *cacoethes* for emending, amplifying, and interpolating, has led to the most mischievous results. The bold and nervous phraseology of Kalidasa has been either emasculated or weakened, his delicate expressions of refined love clothed in a mere-

tricious dress, and his ideas, -grand in their simplicity, diluted by repeti tion or amplification. Many examples might be here adduced : but I will only refer the student to the third Act of the Bengali recension, where the love-scen between the King and Sakuntala has been expanded to five times the length it occupies in the MSS. of the Devanagari recension, and the additions are just what an indelicate imagination might be expected to supply. Even the names of the dramatis-personæ have been tampered with: the King Dushyanta is changed into Dushmanta : Anasuya into Anusuya Vatayana into Parvatayana Sanumati into Misrakesi : Taralika into Pingalika : Dhanamitra into Dhanavriddhi ; Markandeya into Sankochana.

Unfortunately it was a MS of this recension, and not a very good specimen of its class, that Sir W. Jones used for his translation.

কালিদাসের যথার্থ পাঠ কি জানিতে হইলে মোনিয়র উইলিয়ম্‌সের পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য—তিনি যে কিরূপ আয়াসে কালিদাসের প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশ পাইতেছে

In regard to the text of the preasent drama, if 1 have succeded in producing a more correct edition of the Devanagari recension than that of Dr. Boehtlingk, the merit is due to the more ample materials at my command, I have taken care to avail myself of Dr. Boehtlink's correctiens of himself, and his after-thought at the end of his work, as well as of such critical remarks as coincided with my own views. Often working independently of him, I have arrived at similar results, because I have had access to all the materials whence his *Apparatus Criticus* was composed. More than this: Dr. Boehtlingk tells us that his edition was not prepared from original MSS, but that Professors Brockhaus and Westergard having more or less carefully collated certain MSS. in the East-India House Library, and in the Bodleian at Oxford, and made only partial extracts from three native commentaries, handed over the results of their labours to him. All these MSS. and Commentaries have been placed at my dispesal, and most of them left in my possession until the completion of my work. Not a

passage has been printed without a careful collation of all of them., and the three Commentaries have been consultad from begining to end.

The MSS. which I have principally used, are:—

1 A MS. from the Colebrook collection, and, therefore. from the Eastern side of India, unmbered 1718.

2 A MS. from the Mackenzie, collection, and therefore from Southern India numbered 2696,

3 A MS. from the Taylor collection, and therefore from Western India, numbered 1858, dated Saka, 1784.

All these belong to the East-India House Library, gnd represent the three Indian Presidencies respectively.

4 A copy of a very good MS. at Bombay, presented to me by Mr. Shaw, of the Bombay Civil Service.

5 An old Bengali MS. belonging to the Library of the East India House, numbered 1060.

6. A very old Cengali MS. from Professor Wilson's collection in the Bodleian.

I have from time to time consulted other Bongali MSS., but have rarely admitted readings from them, unless subported by some one of the Devanagari.

মোনিয়র্ উইলিয়ম্সের গ্রন্থ হইতে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার নির্জ্জন প্রেমালাপ, যাহা লইয়া এত ধস্তাধস্তি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

প্রিয়ংম্বদা ॥ সদৃষ্টিক্ষেপং ॥ অণস্থএ। জহএসো ইদো দিণ্ণদিট্ঠী উস্সুও মিঅপোদও মাদরং অণ্ণেসদি। এহি। সজ্জোএম ণং ॥ ইত্যুভে প্রস্থিতে ॥

শকুন্তলা। হলা। অসরণহ্মি। অণ্ণদরা বো আঅচ্ছদু।

উভে। পুহবীএ জো সরণং। সো তুহ সমীবে বট্টই ॥ ইতি নিষ্ক্রান্তে।

শকুন্তলা। কহং গদাও এব্ব।

রাজা। অলম্ আবেগেন। নন্বয়ম্ আরাধয়িতা জনস্ তব সমীপে বর্ত্ততে।

কিং শীতলৈঃ ক্লমবিনোদিভির্ আর্দ্রবাতান্
সঞ্চারয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ।
অঙ্কে নিধায় করভোরু যথাসুখং তে
সংবাহয়ামি চরণাব্ উত পদ্মতাম্রৌ ॥৭৪

শকুন্তলা। ণ মাণণীএসু অত্তাণং অবরাহইস্সম্ ॥ ইত্যুৎথায় গন্তুম্ ইচ্ছতি।

রাজা। সুন্দরি। অপরিনির্ব্বাণো দিবসঃ। ইয়ং চ তে শরীরাবস্থা।

উতসৃজ্য কুসুমশয়নং নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণং।

কথম্ আতপে গমিষ্যসি পরিবাধাপেলবৈর্ অঙ্গৈঃ ॥

শকুন্তলা। পোরব রক্‌খ বিণঅং। মঅণসন্তত্তাবি ণ হু অত্তণো পহবামি।

রাজা। ভীরু। অলং গুরুজনভয়েন। দৃষ্ট্বা তে বিদিতধর্ম্মা তত্রভবান্ নাত্র দোষং গ্রহীষ্যতি কুলপতিঃ। অপি চ

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যো রাজর্ষিকন্যকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্ তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ॥

শকুন্তলা। মুঞ্চ দাব মং। ভুওোপি সহীজণং অণুমাণইস্‌সং।

রাজা। ভবতু। মোক্ষ্যামি।

শকুন্তলা। কদা।

রাজা

অপরিক্ষতকোমলস্য তাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে
সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য ॥ ৭৭

॥ ইতি মুখম্ অস্যাঃ সমুন্নময়িতুম্ ইচ্ছতি। শকুন্তলা পরিহরতি নাটোন ॥

নেপথ্যে। চক্কবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং। উবট্‌ঠিদা রঅণী।

শকুন্তলা ॥ সসম্ভ্রমং ॥ পোরব। অসংসঅং মম সরীরবুত্তন্তোবলম্ভস্‌স অজ্জা গোদমী ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। দাব বিড়বন্তরিদো হোহি।

রাজা। তথা। ইত্যাত্মানম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

উপরের উদ্ধৃত অংশের মধ্যে যদি বঙ্কিম বাবু "কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই কেবল লুকোচুরি—একটু একটু চাতুরী * * একটু অগ্রগামিনীত্ব" দেখিয়া থাকেন দেখুন কিন্তু আমরা উহার মধ্যে স্বতন্ত্র আর একটা ব্যাপার দেখিতেছি—আমরা দেখিতেছি, বড় ছি ছি নয়, "হৃদয়ের কূল-প্রান্ত-প্রঘাতী-টল টল-চঞ্চল-বীচি-মালা 'র আকম্পিত প্রকম্পিত ব্যাপার;—বড় লুকাচুরি নয়—হৃদয় হইতে, কথা হইতে, আচরণ হইতে, অকৃত্রিম ভালবাসা স্পষ্টাক্ষরে ফুটিয়া বাহির হইতেছে; বড় যাই যাই নয়---একটু চক্ষের আড়াল হইলেই প্রাণের যায় যায় দশা উপস্থিত হইবার কথা;—চাতুরিও নয় অগ্রগামীণীত্বও নয়,—কালিদাসের যাহা স্বপ্নেরও অগোচর সেই-সকল ভাবভঙ্গীর কথা রসিক চূড়ামণি বঙ্গপণ্ডিতগণ শকুন্তলার মুখে গুঁজিয়া দিয়াছেন, তাই বঙ্কিম বাবু শকুন্তলাকে চতুরা এবং অগ্রগামিনী দেখিয়াছেন,—এমন যে নিসর্গ সুন্দরী বনলতা—শকুন্তলা, তাহাতে উদ্যানলতার কৃত্রিম শোভা আরোপ করিয়াছেন! কালিদাস কোন সমালোচকের চক্ষের মধ্য দিয়া অন্ধকারে মানেব-প্রকৃতি হাতড়াইয়া বেড়াইতে যা'ন নাই—তিনি তাঁহার পরিষ্কার হৃদয়-দর্পণ একেবারে মানবপ্রকৃতির মুখের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাটকের মধ্যে মনুষ্যের যে অবস্থায় যেটি ঘটে সেই অবস্থায় ঠিক্ তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে। কালিদাস যদি সমালোচকগণের মতানুসারে চলিতেন

তবে যাহা হইত তাহা আমরা বিলক্ষণই বুঝিতে পারিতেছি; আর কিছু না—উদোর ঘাড়ে বুধোর বোঝা রাশীকৃত হইয়া অমন সুন্দর নাটক খানির রস-কস সমস্তই রবিষ-চাপা পড়িয়া মারা যাইত। শকুন্তলা জানে যে, রাজার অন্তঃপুর বড় একটা সাধারণ ব্যাপার নহে—অর্থচ কোন সমালোচকের মতানুসারে যদি তাহার মুখে এরূপ আশ-ঙ্কার কথা একবারও বাহির না হইত যে, "আমার কি গুণ যে,তাহাদের ফেলিয়া রাজা আমাকে ভালবাসিবেন" তবে শকুন্তলাকে হয় একটি কাঠের পুতুল নয় একটি কচি খুকি মনে হইত,—মিরান্দা যে এমন লোক-চরিত্র-জ্ঞান-বর্জ্জিত সে-ও ফর্দিনাণ্ডের মনের ভাল-বাসা বিষয়ে নিজের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল।

শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্ত রাজার প্রেমা-লাপে বঙ্কিম বাবু এক দিকে বিপুল পরা-ক্রম রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপ, আর এক দিকে ভয়াতুর ক্ষুদ্র বালিকার জড় সড় ভাব, এই যা কিছু দেখিয়াছেন; যেন নবাব সিরাজুদ্দৌলা এক জন বাঁদীকে ক্ষ-ণেকের জন্য প্রেম-বিতরণ করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন—যেন শকুন্তলার প্রেমের নি-জের কোন মূল্য নাই, তাহার যাহা কিছু মূল্য সকলই রাজ-অনুগ্রহ প্রসাদাৎ। কিন্তু এ বিষয়ে দুষ্মন্ত রাজার নিজের মতটা কি একবার শুনা যা'ক—

"পরিগ্রহ বহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্যমে।
সমুদ্র রসনা চোর্ব্বী সখীচ যুবয়ো রিয়ং॥"

রাজার নিকট সসাগরা পৃথিবীর আধি-পত্য অপেক্ষা শকুন্তলার প্রেম কোন অংশে ন্যূন নহে। সখীদিগের একটি গুরু-তর সন্দেহ ভঞ্জনার্থ রাজা ঐ কথাটি বলিয়া আপনার মনের যথার্থ ভাবটি অকপটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তা'-বই দুষ্যন্তের ন্যায় অমন ধর্ম্মভীরু রাজর্ষি যে, খেলা খেলিবার মানসে ওরূপ কথা বলিবেন,ইহা হইতেই পারে না; তাহা যদি হইত তাহা হইলে খোয়া-যাওয়া অভিজ্ঞান-অঙ্গুরী দর্শনে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইত না—সহসা তাঁহার হৃদয়ে কি যেন এক দারুণ শেল বিঁধিল এরূপ ছট্‌ফটানি হইত না। কিন্তু রাজার ঐ হলফনামায় কি আসে যায়,—বঙ্কিম বাবু তেজ-কলমে বলিতেছেন যে,সসগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্র-সখ দুষ্যন্তের কাছে শকুন্তলা কে? শকুন্তলা উগ্রতপা প্রবল পরাক্রম রাজর্ষি-কন্যাই হো'ন, আর অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্যের প্রতিমাই হো'ন, আর অমানুষী প্রভা-তরল জ্যোতি-রূপিনীই হো'ন—দুষ্যন্তের নিকট তিনি কে? দুষ্য-ন্তের কাছে শকুন্তলার মূল্য যদি এতই অল্প তবে অত বড় রাজা অমন নিঃসহায়া অবলা যুবতীর জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হই-তেছেন তবুও দু চারি পা অগ্রসর হইয়া যে তাহার নিকট আপনার মন খুলিয়া বলি-বেন এ সাহস তাঁহার হইতেছে না—ইহার মীমাংসাটা না জানি কিরূপ? বঙ্কিম বাবু নিজেই বলেন যে "রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃত-কীর্ত্তী অপ্রথিত-যশা;" কিন্তু এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ন্যায়ই "সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্র-সখ দুষ্মন্ত" আড়াল থেকে প্রেয়সীর

মনের কথা-গুলি গ্রাস করিতে কিছু মাত্র হেয়-জ্ঞান করেন নাই, আসল কথাটা এই যে দুষ্মন্ত মহেন্দ্র সখ সসাগরা পৃথিবীপতি হইয়াও শকুন্তলার সম্বন্ধে তিনি আর কিছু না—এক জন দীন হীন ভিখারী—প্রেমের ভিখারী। অতএব বঙ্কিম বাবুর এই যে এক জোরালো উপমা-প্রয়োগ, যে, দুষ্মন্ত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিণী-কোর-ককে শুণ্ডে তুলিয়া বন-ক্রীড়ার সাধ মিটা-ইতেছেন, নলিনী তা'তে ফুটিবে কি?" ইহার কোন অর্থ নাই; ফুটিবে না কেন? সূর্য্যের ন্যায় দুষ্যন্ত প্রথম প্রথম পূর্ব্বদিকের পর্দার আড়াল থেকে তাহার প্রতি রাগ-লাঞ্ছিত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া শেষে যখন তাহার সমক্ষে আপনাকে অনাবৃত করিলেন—তখন সে কি আর না ফুটিয়া বাঁচিতে পারে? ফুটে নাই তবে কখন্? যখন বিরহ-মেঘ দোঁহার মাঝখানে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন এক দিক্ হইতে সংশয়ের কুজ্ঝটিকা উঠিয়া আর একদিকের ভালবাসার জ্যোতিকে স্পষ্ট করিয়া দে-খিতে দিতেছে না; যখন শাপ-রাহু-গ্রাসে সে জ্যোতি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; সেই সেই সময়ে নলিনীকোরকটি মুষড়িয়া পড়ি-য়াছে—তাহা ত হইবেই। এক চিড়িয়া-খানায় যদি ব্যাঘ্র এবং মৃগ পাশাপাশি রক্ষিত হয়, তবে মৃগ নির্জীববৎ হইয়া থাকে এই আমরা জানি কিন্তু যদি শক্ত সমর্থ সহকার বৃক্ষ ও সুকোমল ও মাধবী লতা উভয়ে এক জায়গায় থাকে তবে উপযুক্ত সময়ে মাধবীলতার ফুল ফুটিবে না ত আর কি হইবে? বঙ্কিম বাবু কিছু পরে বলিতেছেন

"প্রণয়াসক্ত শকুন্তলার বালিকার চা-ঞ্চল্য, বালিকার ভয় বালিকার লজ্জা দেখি-লাম, কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য্য রমণীর স্নেহ কই?"

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে প্রেমের নবোন্মেষের সময় চাঞ্চল্য, ভয়, লজ্জা, আপনা হইতেই আসিয়া তাহার সঙ্গ গ্রহণ করে;—তা' সে বালিকারই হউক্ আর যুবতীরই হউক্—শকুন্তলারই হউক্ আর মিরান্দারই হউক্। রমণীর গাম্ভীর্য্য কথাটা বঙ্কিম বাবু যে কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় না; প্রেম-জনিত অধীরতাকে যদি গাম্ভীর্য্যের অভাব বলিয়া ধরা যায়, তবে তাহা ত নূতন প্রেমি-জন মাত্রেরই ঘটিয়া থাকে—শকুন্তলা একা কি দোষ করিল; কিন্তু পূর্ব্বে শকুন্তলা এবং রাজার মিথঃপ্রেমালাপের সমস্ত অংশটাই আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার মধ্যে কোন্ খানটায় শকুন্তলার অশোভন চাপল্য

তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না—চাপল্য যেটুকু আছে তাহা প্রেমের নৈসর্গিক অধীরতা মাত্র—যাহা স্বয়ং ব্রহ্মা আইলেও খণ্ডন করিতে পারেন না।

তবে এক এই বলিতে পারা যায় যে, প্রেমের-অধীরতা স্নেহে দৃষ্ট হয় না; স্নেহ, প্রেম-অপেক্ষা স্থির ও গম্ভীর; মিরান্দার মনে স্নেহের যখন সঞ্চার হইয়াছিল তখন অবশ্য তাহাতে অপেক্ষা-কৃত গাম্ভীর্য্য বর্ত্তি-য়াছিল—কিন্তু সে শুধু অবস্থার গতিকে, তাহাতে চরিত্র-গৌরবের এমন কোন কিছু বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না; শকুন্তলার সহিত রাজার যে কয়েকটি বার মিলন হইয়াছিল—তাহা অতি অল্প কা-লের জন্য—মিরাণ্ডা ফর্ডিনাণ্ডে প্রেমের সূত্রপাত হওয়া অবধি বিরহ কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই; তাহা-দের পরস্পরের গাঢ় সংস্রব বশত পর-স্পরের প্রেম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছিল; বিশেষতঃ ফর্ডিনাণ্ডের কা-ঠের বোঝা বহিবার কষ্ট দেখিয়া এক জন কোমল হৃদয়া অবলার মনে স্নেহের সঞ্চার হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? এরূপ অনুকূল-অবস্থা বিরহে শকুন্তলার মনে স্নেহের আবির্ভাব কিরূপে হইবে? যদি হইত, তবে তাহা একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড হইত। ভালবাসা "থিতিয়ে" গিয়ে ঠাণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিলে তাহা স্নেহের দিকে অব-নত হয় সত্য কিন্তু ভালবাসার প্রথম উদ্রেকে সে ভাব প্রত্যাশা করা—মানব প্রকৃতি-বিষয়ে কিছু যাঁহাদের বোধ আছে তাঁহাদের কার্য্য নহে। কালিদাস শকুন্তলার এমন কোন অবস্থাই বর্ণনা করেন নাই যেখানে প্রেমের গাত্রে স্নেহের রঙ ধরিতে পারে। শকুন্তলার যেরূপ প্রেমাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রেমের সবে নূতন উদ্রেক, তাহার মধ্যে স্নেহের ভাব দেখা দিলে—শিশুর মুখে যেমন দাড়ি গোঁপ হইলে হয়—তেমনি একটা অসময়োচিত সুতরাং অস্বাভাবিক ব্যাপার হইত। বঙ্কিম বাবুর আর একটি সুবিচারের উদাহরণ দেখাইয়া এবারকার পালা সাঙ্গ করিব। বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন

"যে শকুন্তলা ইহার কয় মাস পরে পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল অনার্য্য আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ? সে শকুন্তলা যে লতা মণ্ডপে বালিকাই রহিল তাহার কারণ কুলকন্যা সুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ দুষ্যন্তের চরিত্র বিস্তর।" ইহার যদি কিছু অর্থ থাকে তবে তাহা এই যে, শকুন্তলা বাস্তবিক বালিকা নহে (অর্থাৎ

তাহার স্বভাব বালিকার মত নহে) কিন্তু দুষ্যন্তের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সান্নিধ্য বশতঃ শকুন্তলা কুঁকড়িয়া শুঁকড়িয়া বালিকাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে যে-দুষ্যন্ত রাজা তপস্যার বিঘ্ন-কারী রাক্ষসদিগকে বধ করিয়াছিলেন এবং তৎপরে দেবাসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রের পক্ষে যোগ দিয়া তাঁহাকে জয়ী করিয়াছেলেন সেই দুষ্যন্ত রাজা এক জন অরণ্য পালিতা অবলা বালাকে স্বীয় প্রতাপে অভিভূত করিলে তাঁহার চরিত্রের কি যে মাহাত্ম্য বাড়ে তাহা বুঝিতে পারি না। ইহার অব্যবহিত পরেই বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন।

"যখন শকুন্তলা সভাস্থলে পরিত্যক্তা তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃ-পদে আরোহণোদ্যতা সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,—তপস্বী কন্যা,* রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী (?) এখানে শকুন্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র।" অর্থাৎ শকুন্তলা লতা-মণ্ডপেও "রমণী" সভামণ্ডপেও "রমণী" কিন্তু লতা-মণ্ডপে রাজার প্রতাপে জড় সড় হইয়া তাহার রমণী-ভাব কিছুই স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে নাই, সভামণ্ডপে তাহার রাজ্ঞীত্ব এবং মাতৃত্ব মিলিয়া তাহার অনৈসর্গিক বালিকাত্ব ঘুচাইয়া তাহাকে রমণী পদে উঠাইয়া দিল। ইহার অর্থ যদি এই টুকু মাত্র হয় যে, সভানীতা শকুন্তলার মন পুত্রবতী কুলবধূচিত অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল—তবে তাহা ত হইতেই পারে; কিন্তু শকুন্তলা পূর্ব্বে "রাজ-প্রসাদের অনুচিত অভিলাসিনী" ছিলেন এখন তিনি তাহা ন'ন এ বলিয়া যে তাহার মনের ঐ ভাব-পরিবর্ত্তনটি হইয়াছে ইহা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না। কেন না শকুন্তলা রাজার পাণি-গ্রহণের ঠিক্‌ উপযুক্ত পাত্রী এ বিষয়ে শকুন্তলার সখীদ্বয় যার পর নাই নিশ্চিন্ত —শকুন্তলার মনে সে জন্য কিন্তু আসিবার কোন কারণ নাই, কেননা শকুন্তলা শুদ্ধ যে কেবল ঋষিকন্যা তাহা নহে—মস্ত একজন রাজর্ষির কন্যা। চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভের সর্ব্ব প্রথমেই অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকে সম্বোধন করিয়া এই ভাবে বলিতেছে যে শকুন্তলা অনুরূপ ভর্ত্তৃ-গামিনী হইয়াছে বাঁচা গিয়াছে কিন্তু একটা চিন্তার বিষয় এই যে রাজর্ষি অন্তঃপুর-সমাগত হইয়া এখানকার বৃত্তান্তটা পাছে ভুলিয়া গিয়া থাকেন। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শকুন্তলা যে

* নেহাৎ তপস্বী কন্যা নহে—রাজর্ষি-কন্যা,—যে সে রাজর্ষি নহে, স্বর্গমর্ত্ত্য ওলট-পালট কারী বিশ্বামিত্র!

অনুরূপ ভর্ত্তৃগামিনী—এবিষয়ে অনুসূয়ার লেশ-মাত্রও সংশয় নাই,—সংশয় যা হইয়াছিল, তা সম-দুঃখসুখ সখী জনের হইতেই পারে ;—এমন ত কোন ছোট খাটো মাম্‌লা নয়—রাজ প্রাসাদের অন্তঃপুর। সেখানে যদি রাজার মন কারাবদ্ধ হইয়া গিয়া থাকে, তবে আর উপায় কি ? শকুন্তলা যদিই বা নীচ-কুলোদ্ভবা হইত, তথাপি প্রেম তাহাকে উচ্চ করিয়া লইত—প্রেমের শাস্ত্রে জাতি-জাত্যের বিচার নাই। এইরূপ—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাজা-দুষ্যন্তের নিকট শকুন্তলার সংকোচের কারণ আর কিছুই নহে, কেবল—মন বিনিময় করিবার সময় প্রেমার্থিনীদের স্বাভাবিক ভয়-লজ্জা ; এ বিষয়ে পূর্ব্বে আমরা বিস্তর বলিয়াছি—আর বলা অনাবশ্যক।

ক্রমশঃ



মাসিক সমালোচনী পত্রিকা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত

চতুর্থ খণ্ড

১৮০২ শক।

কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৩৷০ মাশুল সমেত ৪ টাকা।

সূচি পত্র।

ভারতী

ভানুসিংহের কবিতা।

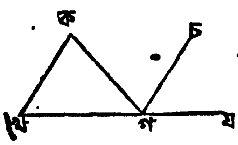
দেখলো স্বজনী, চাঁদনি রজনী,
সমুজল যমুনা গাওত গান,
কানন কানন করত সমীরণ
কুসুমে কুসুমে চুম্বন দান।
কাহে লো যমুনা জোছন ঢল ঢল
সুহাস সুনীল বারি?
আজু তোঁহাবই উজল সলিল পর
নয়ন সলিল দিব ডারি।
কাহে সমীরণ লুটই কুসুম-বন
অলসি পড়সি যমুনায়?
তোঁহার চম্পক-বাসিত লহরে
মিশাব নিশাস বায়।
জনম গোঁয়ায়নু রোযত রোয়ত
হম তর কোই ত কাঁদল না!
জনম গোঁয়ায়নু সাধত সাধত
হমকো কোই ত সাধল না!
সকল তয়াগনু যো ধন আশে
সো বি তয়াগল মোয়
অপন ছোড়ি সব, অপন করনু যোয়
সো বি স্বজনি পর হোয়!
যমুনে হাস হাস লো হরখে
হম তর রোয়বে কে?
তোঁহারি সুহসিত নীল সলিল পরি
রাধা সঁপবে দে!
এক দিবস যব মাধ হমারা
আসবে কিনার তোর,—
যব সো পেখবে তোঁহার সলিলে
ভাসত তনুয়া মোর—
তব কি শ্যাম সো মানস পাশে
তিল দুখ পাওবে না?
শ্যামক নয়নে বিন্দু নয়ন জল
তব কি আওবে না?
নিশায় কুঞ্জে আসবে যব সখি,
শ্যাম হমারই আশে,
ফুকারবে যব রাধা রাধা
মুরলী উরধ শ্বাসে,
যব সব গোপিনী আসবে ছুটই
যব হম আসব না;
যব সব গোপিনী জাগবে চমকই
যব হম জাগব না,
তব কি কুঞ্জ পথ হমারি আশে
হেরবে আকুল শ্যাম?
বন বন ফেরই সো কি ফুকারবে
রাধা রাধা নাম?
না যমুনা, সো এক শ্যাম মম
শ্যামক শত শত নারী;
হম যব যাওব শত শত রাধা
চরণে রহবে তারি!
তব সখি যমুনে, যাঁই নিকুঞ্জে,
কাহ তয়াগব দে?
রাধিকার তর এ ব্রজ ধামে
সখিলো রোয়বে কে?
ভানু কহে চুপি 'মান ভরে রহ
আও বনে ব্রজ নারী,
মিলবে শ্যামক শত শত আদর
শত শত লোচন বারি!

জ্যামিতির নূতন সংস্করণ।

সরল-সীমক ক্ষেত্রধ্যায়।

(২১) যে কোন ক্ষেত্র-খণ্ড তিন বা ততোধিক সরল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা সরল-সীমক বলিয়া উক্ত হয়; তাহার মধ্যে যাহা ত্রিসীমক তাহা ত্রিকোণ এবং যাহা চতুঃসীমক তাহা চতুষ্কোণ বলিয়া উক্ত হয়। ত্রিকোণের কিংবা চতুষ্কোণের সীমা প্রদেশস্থিত রেখাকে সেই ত্রিকোণ কিংবা চতুষ্কোণের ভুজ কহে।

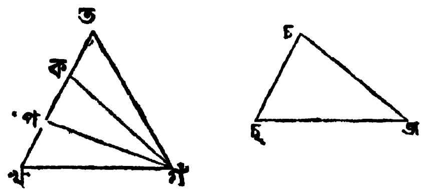
৯। ত্রিকোণের কোণত্রয় একটি সমসূত্র কোণের সমান।



মনে কর কখগ একটা ত্রিকোণ তাহা হইলে কখগ-কোণ+খগক-কোণ+গকখ-কোণ=সমসূত্র-কোণ। কেননা,——

খগ-রেখাকে ঘ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর, এবং মনে কর গচ-রেখা খক-রেখার সমান্তর; তাহা হইলে (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) চগঘ কোণ=কখগ কোণ এবং চগক কোণ=খকগ কোণ, অতএব কোণ-সমষ্টি কখগ+খকগ=চগঘ+চগক সুতরাং কখগ+খকগ+কগখ=চগঘ+চগক+কগখ=সমসূত্র কোণ। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

১০। যদি দুই ত্রিকোণের একটির কোন কোণদ্বয় এবং তাহাদের সাধারণ ভুজ ক্রমান্বয়ে আর একটির কোন কোণদ্বয় এবং তাহাদের সাধারণ ভুজের সমান হয়, তাহা হইলে ত্রিকোণ-দ্বয় সমান হইবে এবং উভয়ের যে যে ভুজ সমান কোণ-দ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী তাহারা পরস্পর সমান হইবে।

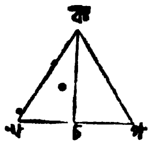


মনে কর কখগ এবং চছজ ত্রিকোণদ্বয়ের কখগ, কগখ, এই দুটিকোণ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ খগ ক্রমান্বয়ে=চছজ, চজছ কোণদ্বয় এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ ছজ, তাহা হইলে কখগ ত্রিকোণ=চছজ ত্রিকোণ এবং কখগ কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ কগ=চছজ কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ চজ, এবং কগখ কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ কখ=চজছ কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ চছ। কেন না,—

চছজ ত্রিকোণের ছ বিন্দুকে খ স্থানে বসাও এবং ছজ রেখাকে খগ স্থানে বসাও

তাহা হইলে যেহেতু ছজ রেখা = খগ রেখা এজন্য জ বিন্দু গ স্থানে বসিবে এবং যেহেতু চছজ কোণ = কখগ কোণ এজন্য চছ-রেখা কখ-রেখার স্থান জুড়িয়া বসিবে, সুতরাং চ-বিন্দু হয় কখগ-ত্রিকোণের ভিতর-প্রদেশে— যেমন প-প্রদেশে, কিংবা তাহার বহিঃ প্রদেশে—যেমন ত প্রদেশে, কিংবা ক-স্থানে বসিবে; চ বিন্দু প-প্রদেশে বসিলে চজছ কোণ (= পগখ কোণ) কগখ কোণ অপেক্ষা ছোট হইয়া দাঁড়ায়, এবং উহা ত-প্রদেশে বসিলে চজছ কোণ (= তগখ কোণ) কগখ কোণ অপেক্ষা বড় হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু চজছ কোণকে কগখ কোণের সমান বলিয়া ধরা হইয়াছে এজন্য উক্ত দুই পক্ষের কোনটীই হইতে পারে না—সুতরাং চ বিন্দু ক-স্থানেই বসিবে, এবং পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, জ বিন্দু গ স্থান-স্থিত সুতরাং (১ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) চজ রেখা = কগ রেখা এবং উভয়েই সমান কোণ-দ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী, আর (২ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) চজ-রেখা কগ-স্থানে বসিতে চায়, এবং পূর্ব্বে প্রমাণ হইয়াছে যে চছ-রেখা কখ-স্থানে বসিয়াছে সুতরাং (৪ * স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) চছ-রেখা = কখ রেখা, এবং উভয়েই সমান-কোণ-দ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী; আর যেহেতু ছচ এবং চজ-রেখা, ক্রমান্বয়ে খক এবং কগ-স্থানে বসিয়াছে এজন্য (৩ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) খকগ-কোণ = ছচজ-কোণ সুতরাং কখগ-ত্রিকোণ সর্ব্বাংশে = চছজ-ত্রিকোণ। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

১১। কোন ত্রিকোণের দুই কোণ যদি সমান হয় তবে তাহার অবশিষ্ট কোণের ভুজদ্বয় সমান হইবে।



মনে কর কখগ ত্রিকোণের কখগ কোণ = কগখ কোণ তাহা হইলে কখ = কগ।

কেন না,—

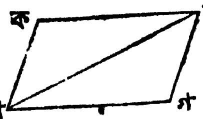
মনে কর খকগ-কোণ-কচ রেখা কর্ত্তৃক অর্দ্ধা-অর্দ্ধি বিভক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ খকচ কোণ = গকচ কোণ, তাহা হইলে কোণ-সমষ্টি খকচ + কখচ = গকচ + কগচ এবং (৯ সিদ্ধান্ত অনুসারে) কোণ সমষ্টি খকচ + কখচ + কচখ = গকচ + কগচ + কচগ অতএব কচখ = কচগ।

ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, কখচ এবং কগচ এই দুই ত্রিকোণের একটির কচখ-কোন, খকচ-কোণ এবং তাহাদের সাধারণ ভুজ কচ-রেখা ক্রমান্বয়ে = আর একটির কচগ কোণ, গকচ কোণ এবং তাহাদের সাধারণ ভুজ কচ রেখা অতএব (১০ সিদ্ধান্তে অনুসারে) কচখ কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ কখ = কচগ কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ কগ। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণী-কৃত হইল।

* ভুল ক্রমে উপর্য্যুপরি দুইটি বিভিন্ন স্বতঃসিদ্ধ বচনকে ৩ সংখ্যা-দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এজন্য এখানে তাহা সংশোধন পূর্ব্বক প্রথমটিকে ৩ সংখ্যা দ্বারা এবং দ্বিতীয়টিকে ৪ সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইল।

(২২) যে চতুষ্কোণ এরূপ যে, তাহার কোন কোণ-কৃৎ ভুজদ্বয় স্ব স্ব সম্মুখবর্ত্তী ভুজদ্বয়ের সমান্তর, তাহা সমান্তরিক বলিয়া উক্ত হয়। এবং তাহার কোন কোণ-চূড়া হইতে তাহার সম্মুখবর্ত্তী কোণ-চূড়া পর্য্যন্ত সরল রেখা টানিলে সেই সরল রেখা তাহার ব্যাস বলিয়া উক্ত হয়।

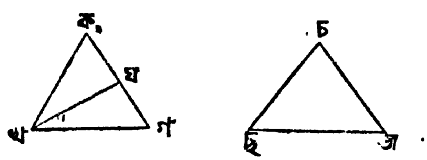
১২। সমান্তরিকের প্রত্যেক ভুজ এবং কোণ ক্রমান্বয়ে তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ এবং কোণের সমান। এবং সমান্তরিকের ব্যাস সমান্তরিককে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে।



মনে কর কখগঘ ক্ষেত্রটি সমান্তরিক তাহা হইলে কখ = গঘ, কঘ = খগ, খকঘ কোণ = খগঘ কোণ, কখগ কোণ = গঘক কোণ; এবং কখঘ ত্রিকোণ = খগঘ ত্রিকোণ; কেন না,—

খ হইতে ঘ পর্য্যন্ত খঘ সরলরেখা টানো তাহা হইলে (২২ সংজ্ঞানুসারে) খগ রেখা যেহেতু কঘ রেখার সমান্তর অতএব (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) ঘখগ কোণ = খঘক কোণ এবং (২২ সংজ্ঞানুসারে) কখ রেখা যেহেতু গঘ রেখার সমান্তর এজন্য (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) কখঘ কোণ = গঘখ কোণ; ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, কখঘ এবং খগঘ ত্রিকোণদ্বয়ের একটির কোণ-দ্বয় ঘখগ গঘখ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ খঘ = আর একটির কোণ-দ্বয় খঘক, কখঘ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ খঘ, অতএব (১০ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সমান কোণ-দ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ দ্বয় কঘ, খগ সমান, তেমনি আবার ঐরূপ ভুজ-দ্বয় কখ, গঘ সমান এবং কখঘ ত্রিকোণ = খগঘ ত্রিকোণ। পুনশ্চ রেখা-দ্বয় কঘ, কখ, যেহেতু ক্রমান্বয়ে খগ, গঘ রেখাদ্বয়ের সমান্তর, এজন্য (৬ সিদ্ধান্ত-অনুসারে) খঘক কোণ = ঘখগ, কোণ গঘখ কোণ = কখঘ কোণ অতএব কোণ সমষ্টি খঘক + গঘখ = ঘখগ + কখঘ অতএব কখগ কোণ = গঘক কোণ। অমনি করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে যে খকঘ কোণ = খগঘ কোণ। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

১৩। যদি দুই ত্রিকোণের একটির কোন কোণ এবং সেই কোণের ভুজদ্বয় ক্রমান্বয়ে আর একটির কোন কোণ এবং সেই কোণের ভুজ দ্বয়ের সমান হয় তবে উক্ত ত্রিকোণ-দ্বয়ের সমান ভুজ-দ্বয়ই-মাত্রে সম্মুখবর্ত্তী কোণ দ্বয় সমান হইবে, ত্রিকোণ-দ্বয়ের অবশিষ্ট ভুজদ্বয় সমান হইবে, এবং ত্রিকোণ-দ্বয় সমান হইবে।

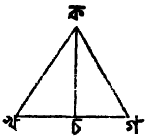


মনে কর কখগ এবং চছজ ত্রিকোণ-দ্বয়ের খকগ কোণ = ছচজ কোণ, এবং কখ, কগ রেখাদ্বয় ক্রমান্বয়ে = চছ, চজ রেখাদ্বয়, তাহা হইলে কগ কখ রেখাদ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী কখগ, কগখ কোণদ্বয় ক্রমান্বয়ে

= চজ, চছ রেখাদ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী চছজ, চজছ কোণদ্বয়; এবং খগ = ছজ, এবং কখগ ত্রিকোণ = চছজ ত্রিকোণ। কেন না,—

যদি বল যে, কখগ কোণ চছজ কোণের সমান নহে, তাহা হইলে উক্ত কোণদ্বয়ের একটি অবশ্য আর একটি অপেক্ষা বড়, মনে কর যেন কখগ কোণ চছজ কোণ অপেক্ষা বড়, ও মনে কর খ হইতে ঘ পর্য্যন্ত খঘ সরল রেখা টানিলে কখঘ কোণ = চছজ কোণ হইয়া দাঁড়ায়; তাহা হইলে যেহেতু কখ রেখা = চছ রেখা ও খকঘ-কোণ কখঘ কোণ ক্রমান্বয়ে = ছচজ-কোণ চছজ-কোণ, এজন্য (১০ সিদ্ধান্ত অনুসারে) কঘ রেখা = চজ রেখা কিন্তু কগ রেখাকে ইতি পূর্ব্বে চজ রেখার সমান বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে কগ রেখা = কঘ রেখা কিনা বড় = ছোটো, ইহা অসম্ভব, অতএব কখগ কোণ অপেক্ষা চছজ কোণ ছোটা হইতে পারে না; ঐরূপ আবার প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, কখগ-কোণ চছজ-কোণ অপেক্ষা ছোট হইতে পারে না; সুতরাং কখগ-কোণ = চছজ কোণ; ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, কোণদ্বয় কখগ, খকগ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ কখ ক্রমান্বয়ে = কোণদ্বয় চছজ, ছচজ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ চছ এজন্য (১০ সিদ্ধান্ত অনুসারে) খগ = ছজ, কোণদ্বয় কখগ, কগখ ক্রমান্বয়ে = কোণদ্বয় চছজ, চজছ, এবং ত্রিকোণ কখগ = ত্রিকোণ চছজ। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

১৪। সমদ্বিভুজ ত্রিকোণের সমভুজদ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী কোণদ্বয় সমান।



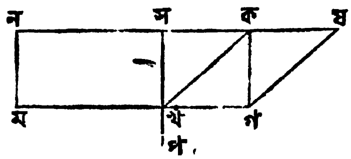
মনে কর কখগ ত্রিকোণের কখ ভুজ = কগ ভুজ তাহা হইলে কগখ কোণ = কখগ কোণ, কেন না,—

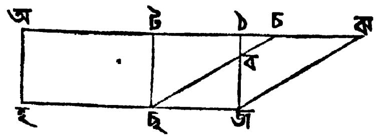
মনে কর খকগ কোণ অর্দ্ধাংশে বিভক্ত হইয়াছে ও তাহার একার্দ্ধ খকচ কোণ এবং অপরার্দ্ধ চকগ কোণ সুতরাং খকচ কোণ = চকগ কোণ, ইহাতে এইরূপ দাড়াইতেছে যে, কখচ এবং কগচ এ দুটি ত্রিকোণের খকচ কোণ = চকগ কোণ এবং খকচ কোণের ভুজদ্বয়, কচ, কখ ক্রমান্বয়ে = চকগ কোণের ভুজদ্বয় কচ, কগ, অতএব ১৩ সিদ্ধান্ত অনুসারে) কচ ভুজের সম্মুখবর্ত্তী কখগ কোণ = ঐ ভুজের সম্মুখবর্ত্তী কগখ কোণ। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণী কৃত হইল।

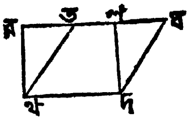
(২৩) যদি কোন সমান্তরিকের কোন ভুজের (বা সেই ভুজের সমসূত্র প্রবাহের) আড়-কোণে সম্মুখবর্ত্তী ভুজ (বা তাহার কোন সমসূত্র প্রবাহ) পর্য্যন্ত সরল রেখা টানা যায় তবে সেই সরল রেখা উক্ত সমান্তরিকের লম্ব বলিয়া উক্ত হয় এবং যে ভুজের গাত্র হইতে লম্ব উত্থিত হয় তাহা উক্ত সমান্তরিকের ভূমি বলিয়া উক্ত হয়। ত্রিকোণের কোন কোণ হইতে তাহার সম্মুখবর্ত্তী ভুজের আড়ে সরলরেখা পাত করিলে সেই রেখা উক্ত ত্রিকোণের লম্ব এবং উহার যে ভুজের উপর লম্বপাত করা

যায় তাহা উক্ত ত্রিকোণের ভূমি, বলিয়া উক্ত হয়।

১৫। দুই সমলম্ব এবং সমভূমি সমান্তরিক সমান।







মনে কর কন-রেখা কখগঘ সমান্তরিকের কঘ ভুজের সমসূত্র-প্রবাহ এবং খম রেখা উহার খগ ভুজের সমসূত্র প্রবাহ এবং নম উহার একটি লম্ব, তেমনি অচ-রেখা চছজঝ সমান্তরিকের চঝ ভুজের সমসূত্র প্রবাহ এবং ইছ রেখা উহার ছজ ভুজের সমসূত্র প্রবাহ, এবং অই রেখা উহার একটি লম্ব আর মনে কর যে, লম্ব নম=লম্ব অই ও ভূমি খগ=ভূমি ছজ, তাহা হইলে সমান্তরিক কখগঘ=সমান্তরিক চছজঝ।

খগ ভুজের খ এবং গ প্রান্ত হইতে দুইটি লম্ব টানো, তাহা হইলে গ প্রান্তোত্থিত লম্ব হয় সম্মুখবর্ত্তী ক কোণে ঠেকিবে, নয় তাহা কখগঘ ক্ষেত্রের বাহিরে পড়িবে, যেমন চছজঝ সমান্তরিকের জঠ লম্ব তাহার বাহিরে পড়িয়াছে, নয় সম্মুখবর্ত্তী ভুজের কোন প্রান্তেতর বিন্দুতে ঠেকিবে যেমন, তৃতীয় চিত্র-গত তথদধ সমান্তরিকের দল লম্ব ল স্থানে ঠেকিয়াছে।

প্রথমতঃ মনে কর যেন তাহা (অর্থাৎ কখগঘ সমান্তরিকের গ-বিন্দু হইতে উত্থিত যে লম্ব—তাহা) ক-কোণে ঠেকিয়াছে, তাহা হইলে (১ সিদ্ধান্তের উপসিদ্ধান্ত-এবং ২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) কগখ কোণ=সখগ কোণ=মখপ কোণ অতএব (৭ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সখ রেখা কগ রেখার সমান্তর; ও সক রেখা যেহেতু খগ রেখার সমান্তর এজন্য) ১২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সখগক একটি সমান্তরিকের ত্রিকোণ সকখ=ত্রিকোণ কখগ ও কখগঘ সমান্তরিকের ত্রিকোণ কগঘ=ত্রিকোণ কখগ; অতএব ত্রিকোণ সকখ=ত্রিকোণ কগঘ সুতরাং ত্রিকোণ কখগ+ত্রিকোণ সকখ=ত্রিকোণ কখগ+ত্রিকোণ কগঘ; সুতরাং সমান্তরিক সকগখ=সমান্তরিক কখগঘ

দ্বিতীয়তঃ মনে কর যে গ প্রান্তোত্থিত লম্ব ক কোণে ঠেকে নাই মনে কর যে প্রথম সমান্তরিকের নম, সখ, এবং কগ লম্ব ত্রয়ের ন্যায় দ্বিতীয় সমান্তরিকের অই, টছ, ঠজ লম্বত্রয় টানা হইয়াছে, কিন্তু জ প্রান্তোত্থিত জঠ লম্ব চ কোণে না ঠেকিয়া চছজঝ সমান্তরিকের বহির্দ্দেশে ঠ বিন্দুতে ঠেকিয়াছে তাহা হইলে (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে ইছট আড় কোণ=ছটঠ কোণ এবং ছজঠ আড় কোণ=জঠঝ কোণ সুতরাং ছটঠ কোণ=জঠঝ কোণ এবং চছ-রেখা যেহেতু জঝ-রেখার সমন্তর এজন্য (৬সিদ্ধান্ত অনুসারে)=টচছ-কোণ চঝজ-কোণ এবং

(১২ সিদ্ধান্ত অনুসারে টঠ রেখা = ছজ রেখা = চঝ রেখা, সুতরাং টঠ রেখা + ঠচ রেখা = চঝ রেখা + ঠচ রেখা অর্থাৎ টচ রেখা = ঠঝ রেখা অতএব দাঁড়াইতেছে এই যে, ছটচ এবং জঠঝ এই দুই ত্রিকোণের একটির ছটচ কোণ, ছচট কোণ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ টচ ক্রমান্বয়ে = আর একটির জঠঝ কোণ জঝঠ কোণ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ ঠঝ; অতএব (১০ সিদ্ধান্ত অনুসারে) ছটচ ত্রিকোণ = জঠঝ ত্রিকোণ সুতরাং ছটচ ত্রিকোণ—ঠবচ ত্রিকোণ + ছবজ ত্রিকোণ = জঠঝ ত্রিকোণ—ঠবচ ত্রিকোণ + ছবজ ত্রিকোণ অর্থাৎ ছচঠজ সমান্তরিক = চছজঝ সমান্তরিক।

তৃতীয়তঃ গ প্রান্তোত্থিত লম্ব যদি সম্মুখবর্ত্তী ভুজের কোন প্রান্তেতর বিন্দুতে ঠেকে, যেমন তৃতীয় চিত্রের দল-লম্ব তধ-রেখার ল-বিন্দুতে ঠেকিয়াছে, তাহা হইলেও থর এবং দল লম্ব দ্বয়ের মধ্যগত রথদল সমান্তরিক = তথদধ সমান্তরিক; কেন না,

পূর্ব্ব প্রদর্শিত কারণে থরত কোণ = দলধ কোণ, (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) থতর কোণ = দধল কোণ ও পূর্ব্ব প্রদর্শিত কারণে রল রেখা = থদ রেখা = তধ রেখা সুতরাং রল রেখা—তল রেখা = তধ রেখা—তল রেখা অতএব রত = লধ অতএব (১০ সিদ্ধান্ত অনুসারে) থতর ত্রিকোণ = দধল ত্রিকোণ সুতরাং থতর + তথদল ক্ষেত্র = দধল + তথদল ক্ষেত্র অর্থাৎ রথদল সমান্তরিক = তথদধ সমান্তরিক অতএব প্রমাণ হইল যে, কোন সমান্তরিকের ভুমির প্রান্তদ্বয় হইতে লম্বদ্বয় টানা হইলে সেই লম্বদ্বয়াবচ্ছিন্ন সমান্তরিক = পূর্ব্বোক্ত সমান্তরিক। এখন ছ হইতে ঠ পর্য্যন্ত একটা সরলরেখা টানো * তাহা হইলে (১২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সখ রেখা (= লম্ব নম = লম্ব অহ) = লম্ব টছ এবং (১২ সিদ্ধান্ত অনুসারে সক রেখা (= ভূমি খগ = ভূমি ছজ) = টঠ রেখা অতএব (১৩ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সকখ ত্রিকোণ = টঠছ ত্রিকোণ এবং (১২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সকখ ত্রিকোণ = ½ সকগখ সমান্তরিক এবং টঠছ ত্রিকোণ = ½ টছজঠ সমান্তরিক অতএব সমান্তরিক সকগখ = সমান্তরিক টছজঠ এবং ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, সমান্তরিক সকগখ = সমান্তরিক কখগঘ এবং সমান্তরিক টছজঠ = সমান্তরিক চছজঝ অতএব সমান্তরিক কখগঘ = তাহার সমলম্ব এবং সমভুমি সমান্তরিক চছজঝ অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

* এখানকার চিত্রে ঠছ রেখা ভুল ক্রমে টানা হয় নাই, পাঠক তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

সাশ্রু সম্প্রদান।

গাথা।

প্রভাত পরশে হাসিছে হরষে
কুসুম-কানন খানি,
মৃদুল মৃদুল মলয়ের বায়ে
কাঁপিছে সরসী রাণী।
জলেতে রাখিয়ে রাঙ্গা পা দু'খানি
নলিনী, নলিনী-মেয়ে,
ঢল ঢল ঢল দুলিছে কমল,
দেখিছে তাহাই চেয়ে।
হোথায় অদূরে যুবক একটি
কাননে তুলিছে ফুল,
মল্লিকা তুলিছে মালতী ভাবিয়া,
এমনি মনের ভুল।
তুলিবারে গিয়া কামিনী কুসুম
ফেলিছে নিশ্বাস তায়,
সে ঘায়ে অমনি খসে দল গুলি—
চমক ভাঙ্গিয়ে যায়।
তুলিতে চামেলী পাতার উপরে
ফুঁ দেয় ভ্রমর বলি;
কে জানে কোথায় মনটি তাহার,
পাতায় ভাবিছে অলি।
মাধবী লতাটি ফুলে ফুলে ভরা,
খুজে না একটি পায়,
বারে বারে স্থধু সরসীর পানে
ফিরিয়ে ফিরিয়ে চায়।

হোলো অবশেষে ফুল তোলা তার;
আসিয়ে সরসী তীরে
সোপান উপরে নলিনীর কাছে
রাখিল কুসুম ধীরে।
বারেক তাকায়ে দেখি যুবকেরে,
বারেক কুসুমে হেরে,
আবার নলিনী নলিনী-নয়ন
রাখিল নলিনী পরে।
বালিকা চাহিয়ে নলিনীর পানে,
যুবক হেরিছে তাই,
মোহময় প্রাণ, অবশ হৃদয়,
নয়নে পলক নাই।
মৃদুল সমীরে চলিয়ে চলিয়ে
চপল অলক রাশি
চুমিছে কেমন বালার কপোল,
অজিত দেখিছে হাসি।
ফুটন্ত গোলাপ লাল দুটি গাল
মধুপ অলক তায়,
মরি কি সেজেছে মধুর মধুর,
আঁখি কি ফিরান যায়?
কেমন-কেমন কি একটি ভাবে
শোভিত ও-আঁখি দুটি
মানস সরসে সোনার নলিনী
থাকে কি অমন ফুটি?

দেখি দেখি যুবা অনিমেষ চোকে
লইয়ে একটি ফুলে
বালার কুন্তলে দিল পরাইয়ে
যেন, রে, আপনা ভুলে।

অমনি সে বালা তুলি আঁখি দু'টি,
একটু বিষাদে হেসে
বলিল,—"অজিত, ফুল-আভরণ
সাজে কি আমার কেশে ?"

তুলি সে ফেলিল মাথা হতে ফুল,
যুবক পাইল ব্যথা,
তা' না দেখি বালা দেখে শতদল
আনত করিয়ে মাথা।

আহাহা ! যুবক হইলে নলিনী
থাকিত সরসে ভেসে,
অমনি সোহাগে দেখিত বালিকা,
অমনি ভালই বেসে।

জলেতে নামিয়ে অধীর যুবক,
না জানি কি ভাব ভরে,
তুলিয়ে ফুলটি না ভাঙ্গিতে মোহ
সঁপিল বালার করে।

নিল সে হরষে দেখিয়ে যুবক
বলিল, হরষ-হৃদি—
"বলিলে না কেন তুলিতাম আগে,
এতই সাধের যদি ?"

হাসিয়ে একটু চুমি সে কমলে
বলিল নলিনী বালা,—
"ভাল বাসি ইহা ছেলেবেলা হ'তে
ছিল এ বালিকা-খেলা।"

—শুনিয়ে উদিল যুবকের মুখে
ঈষৎ হাসির ধার,
কি যেন একটি আশার-আভাস
ভাতিল হৃদয়ে তার।

দুরু-দুরু হিয়া, সুধাতে বাসনা
কি আর একটি কথা,
ফুটে ফুটে তবু ফুটিছে না মুখ
অথচ হৃদয়ে গাঁথা ;

কি শুনিতে সাধ, তবুও কেমন
ভয়ে না ফুটিছে মুখ ;
থাকিতে অথচ পারিছে না যেন,
উথলি উঠিছে বুক।

আশ্বাসি মরমে ভয়ে ভয়ে ভয়ে
বলিল যুবক পরে ;—
"বল, গো নলিনি, আর একটি কথা,
ভাল কি বাসগো মোরে ?"

"ভাল বাসি কিনা ?—ও কেমন কথা,
ভাল কি বাসিনা আর ?"
থেকে থেকে থেকে বলিল নলিনী
মুখেতে ভাবনা ভার ;

"ভাল কি বাসি না ?"—ও কেমন সুরে
বলিল বালা ও কথা,
কেন গো উহাতে পাগল হৃদয়ে
বাজিল দারুণ ব্যথা ?

"যা' শুনিতে সাধ তাই তো শুনিনু
জুড়াল না কেন হিয়া ?
প্রতিধ্বনি কেন বহিয়া না গেল
হৃদয়-শোণিত দিয়া ?

ভাবের তরঙ্গ কই ও-কথায়,
জীবন উহাতে কই ?
তবে ও কেবল কথার কথা কি,
নয় কিছু তাহা বই ?

তবে কি, তবে কি, হৃদয়-প্রতিমা
বাসে না আমায় ভাল ?
দায়ে পড়ামত লজ্জার খাতিরে
ও-কথা বলিয়ে গেল ?"

আঘাত পাইয়ে মরমে তাহার
বলিল যুবক পুন—
"তোমারি হাতেতে জীবন মরণ
শুনলো, নলিনি, শুন;

যে দিন হইতে দেখিছি তোমায়
হয়েছি পাগল প্রায়,
সে দিন হইতে প্রেমের তুফান
হৃদয়ে উথলি যায়।

পিতামাতা তব বিবাহে সম্মত,
তাহাতে নাহিক ডর,
সুখ মোর, বালা, নাই আর কোন,
তুমি না হইলে পর।"

কি উত্তর দিবে বাধে যেন কথা
কি বলিবে বালা তায়,
জানে যে বালিকা ভাঙ্গিবে তা'হ'লে
যুবার হৃদয়, হায়!

নব-বিকশিত নব-অনুরাগ,
নতুন এ প্রেম তার,
অশিক্ষিত হৃদি শিখেছে নতুন
জানেনা কিছুই আর।

কেমনে কেমনে ভাঙ্গিবে ও-হিয়া
বলিয়ে আসল কথা ?
কিন্তু তবু, হায়! বলিতে হইবে
ঘুচাবার নহে ব্যথা।

বলিল বালিকা থেমে থেমে যেন—
"কোরনা বিয়ের আশা,
যদিও তোমায় ভালবাসি আমি
বোনের সে ভালবাসা।"

বাসনা-কামনা আশা-সুখ-সাধ
একটি কথাতে, হায়!
গেল মন হ'তে চলিয়া যুবার
রহিল স্তম্ভিত প্রায়।

একটি আলো যে যতনে জ্বালিয়ে
রেখেছিল হৃদিমাঝ,
ভীষণ আঁধারে ফেলিয়ে তাহারে
নিভিল সেইটি আজ।

আঁখি হতে জল পড়ে পড়ে তবু
বহিতে না দিয়া ধারা,
নিরাশার বলে বল আনি পুন
বলিল পাগল পারা ;—

"না যদি বাস গো ভাল সেকথা বলোনা মোরে
কি ফল জাগায়ে বল সুখী যদি ঘুম ঘোরে ?
এই স্বপ্নে ভর করি জীবন রয়েছি ধরি—
স্বপ্নই জীবন মম, নিঠুর বালিকা ওরে!

না, না, লো, ভাঙ্গি এহৃদি সুখী কিছু হও যদি,
বল, বল, যা বাসনা, বারণ করি না তোরে।
কিছু না চাহিব আর, দাও সুধু অধিকার,
নীরবে বাসিতে ভাল হৃদয় পরাণ ভ'রে;

চাহিবনা ভালবাসা, রাখিবনা কোন আশা,
ভালবেসে সুখী রব,তা'তে কি বাজিবে তোরে?

দেখিয়ে যুবকে দারুণ আকুল
বালারো বাজিল তা'তে,
মুছি বিন্দু অশ্রু বলিল নলিনী
হাতটি রাখিয়া হাতে,—

"একটি শৈশব সখাকে আমার
বরণ করেছি মনে,
গিয়াছে বিদেশে, আসে যদি হবে
বিবাহ তাহারি সনে;

কিন্তু এই হাতে হাত রাখি তব
বলিনু শপথ করে,—
সখা বলি হৃদে রাখিব যতনে
বাঁচিব যদিন তরে।"

* * * * *

না ফুরাতে কথা কে ছবিটি ঐ
সমুখে উদয় হইল তার?
"প্রাণেশ আমার"—বলি একবার
না ফুটিল কথা বালার আর।

হরষে বিহ্বল নীরব বালিকা,
আধা জ্ঞান আধা চেতনা হারা,
অত সুখ-রাশি সহিবে কেমনে?
কাঁদিল সে ভারে আকুল পারা।

অজিত বুঝিল কে যুবাটি ওই
কা'রে দেখি বালা বিহ্বল মন,
পারিল না আর দাঁড়ায়ে দেখিতে—
কেমনে তা' দেখে তাড়িত জন।

নিঃশব্দে সে চলি গেল সেথা হ'তে
প্রণয়ি-যুগলে রাখিয়া একা,
বালিকা তখন উঠি জল হ'তে
আসিয়ে দাঁড়াল যেথায় সখা।

কিন্তু এ কি, হায়! হরিষে বিষাদ
কেন সে যুবার মু'খানি ম্লান?
কত দিন পরে মিলন দু'জনে
কই তার সুখে উথলে প্রাণ?

দারুণ বাজিল বালার বুকেতে,
অভিমানে বালা দুখের ভরে
নীরবে রহিল, যুবক তখন
বলিল সুধীরে বিষাদ-স্বরে—

"এই তো মিলন, সখি, হইল আবার
এই সেই বন স্থল, এই সে অশোক তল,
এই সে পাপিয়া ঢালে অমৃতের ধার।

এই তো মলয় বায় মৃদুল বহিয়ে যায়
দোলাইয়ে ঢুল-ঢুল অলক তোমার।
এই সে সরসী মাঝে প্রফুল্ল নলিনী সাজে,
এই সেই থেকে থেকে ভ্রমর ঝঙ্কার;

এই সব এই সব; সখি ওলো, সেই সব
সেই সব, চপলে লো, বলনা আবার,
কই সে এলান কেশ, সেই পাগলিনী বেশ,
প্রেমের স্বপনময়ী ছায়া সে তোমার?

কই সেই অশ্রুময় ঢুলু ঢুলু আঁখিদ্বয়
থেকে থেকে জ্বলে ওঠে জ্বলন্ত সোহাগে?
কই সে অবশ বানী, কই সেই মুখ খানি
শুকানো অথচ দীপ্ত দীপ্ত অনুরাগে?

আর তো তেমন করে,তেমন সোহাগ ভরে,
হাসিতে নয়ন দুটি নাহি উথলায়

আর তো তেমন করে সে মধুর ভাবভরে
কহিছনা কত কথা নীরব ভাষায়।
দু'দিনেই সখি কি লো, সকলি সে ফুরাইলো
শুনিছি আবার হবে বিবাহ তোমার,
বুঝেছি যুবক ওই তোমার প্রণয়ী, সই,
থাক সুখে প্রবাসেতে চলিনু আবার।"

বালার নয়নে উথলিল জল
"একি অবিশ্বাস—একি রে কথা?
যার লাগি সব দিনু বিসর্জ্জন
সেই দোষে পুন—সে দেয় ব্যথা।

যে প্রতিমাখানি ধ্যান করে শুধু
কেঁদেই জনম কাটিয়ে গেল,
সেই অশ্রু আজো ঘুচিল না, হায়!
দয়া করে নাথ যদি বা এল।"

উত্তর কি দিবে, কি আর বলিবে
নীরব বালিকা মনের দুখে,
যুবক আবার বলিল তখন
কত কথা পুন উথলে বুকে।

"নতুন প্রেমের ভোরে আছিলে মোহের ঘোরে
কাঁদানু আসিয়ে আমি, হায়!
আমাকে দেখিয়ে তব হৃদয়-প্রণয়ী নব
চলি গেল ফেলিয়ে তোমায়।

সোহাগে"প্রাণেশ"বলি ডাকিলে,সে গেল চলি
আমিই সাধিনু সুখে বাদ—
আমিই ঘটানু তব হরিষে বিষাদ।

যাওগোথেকোনা কাছে,সে বেদনা পায় পাছে
বিরহ বেদনা পাছে বাজে;—
উঠক হিমাদ্রি শৃঙ্গ আমাদের মাঝে।

ভাল যে বাসিতে মোরে,ভুলে যাও একে বারে
ভুলে যাও প্রিয় সম্বোধন,
কর হে জন্মের শোধ, করিতেছি অনুরোধ,
সে প্রেমের ব্রত উদযাপন,

নব সুখে হয়ে সুখী থাক তুমি, বিধুমুখি,
দিবনা আরলো বাধা তায়,
চলিনু জন্মের মত, আর দেখা হবে না তো
অভাগার শেষ এ বিদায়।"

বলিল বালিকা না পারিয়ে আর
যাইতে উদ্যত দেখিয়ে তারে
"যেয়োনা, যেয়োনা, হৃদয়ের ধন,
তোমা ছাড়া যেগো জানিনে কারে।"

তোমা বই আর জানিনে কাহারে—
অথচ দু'দিনে হইবে বিয়ে!
হাসির একটু রেখার মতন
গেল যুবকের-অধর দিয়ে।

"বিশ্বাস আমারে করিল না, হায়!
হাসিল, নিঠুর ঘৃণার হাসি?"
আলোড়িত হৃদে নতশিরে বালা
বলিল নয়ন-সলিলে ভাসি,—

"দেখিয়ে এ অশ্রুরাশি হেসোনা ঘৃণার হাসি,
মাথা খাও দুখিনীর,—হেসোনা ও হাসি,
যদি মুহূর্ত্তেরি তরে ভাল বেসে থাক মোরে,
তাহারি, তাহারি দিব্য হেসোনা ও-হাসি।

তুমিই তো সাক্ষী,সখে,তুমিতো দেখেছ চোখে,
কত যে ঝটিকা ঝঞ্ঝা সহেছি কি করে,
কিন্তু ও-ঘৃণার হাসি—জ্বলন্ত গরল রাশি—
দুখিনী কেমনে সবে বলতো আমারে?

আমারে ভুলিয়ে গিয়ে ছিলে যে নিশ্চিন্ত হয়ে
—তাওতো সহিয়ে আছে এ হৃদি-পাষাণ,
কিন্তু অবিশ্বাস তব হায়! কি করিয়ে স'ব
সে কথা! ভাবিতে গেলে বিদরে পরাণ।

পাতিয়ে দিতেছি হৃদি, বাসনা থাকে, গো, যদি,
মার মার ছুরি তাহে, দেখ কত সয়,
কর ইচ্ছা যা তোমার, কিন্তু গো ভেবনা আর
ছলনার অশ্রু এ যে, মরমের নয়।

তাও ভাল ছিল, সখে, স্মৃতির আলেখ্য থেকে
মুছিতেছে দুখিনীর নাম চিহ্ন যদি,
কিন্তু যে ঘৃণার সনে এ নাম পড়িবে মনে
উঃ! কি জ্বলন্ত দাহে জ্বলে ওঠে হৃদি।"

শেষ করি কথা করুণ-দৃষ্টিতে
আনত মুখানি তুলিল ধীরে,
কিন্তু, হায়! কই যুবক কোথায়?
গেছে চলি সে কি আসিবে ফিরে?

---

(২)

কত মাস বর্ষ কত হয়েছে, হয়েছে, গত
কতই ঘটনা গেছে মানুষে দলিয়া;
আজি এ সাগর-তীরে, মহেশের মন্দিরে
কে রূপসী সন্ন্যাসিনী ধ্যানেতে বসিয়া?

নিরিবিলি এ প্রদেশ, নাহি হেথা দ্বেষাদেষ,
উল্লাস সুখের হাসি হেথা না সঞ্চরে,
বাহিরে বিনয় ছটা, অন্তরে গরল ঘটা,
রাক্ষস-মানুষ হেথা নাহিক বিচরে।

বিশাল তমাল তাল বিছায়ে বিমানে ডাল
আটকি রেখেছে হেথা শশাঙ্ক তপন;
নাহি যেন শব্দ-লেশ, গভীর নিস্তব্ধ দেশ,
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিক শ্মশান মতন।

কেবল বায়ুর স্বনে মর্ম্মরিছে বৃক্ষগণে,
গরজিয়া সিন্ধু-বুকে খেলিছে তুফান;
দিগন্তের সীমাঢাকি নিবিড় নীলিমামাখি
অনন্তে অসীম সিন্ধু ঢেলেছে পরাণ।

হেথায় মন্দির মাঝে, যৌবনে যোগিনী সাজে
শিবের সমুখে বালা উমার সমান,
বদ্ধ কর দুটি যেন শোভে পদ্মকলি হেন
মুদিত রয়েছে দু'টি নলিনী-নয়ান,

ধেয়ায় মুদিয়ে আঁখি,—কাহার মূরতি দেখি
প্রতিক্ষণে উঠিতেছে চমকি যেমন?
সংযত করিয়ে মনে, আবার বসিছে ধ্যানে
তবু না মিলায় ছবি দেয় দরশন।

সহসা স্তিমিত অঙ্গ, সহসা সে ধ্যান ভঙ্গ
কে গাহিছে সেই স্বরে হেথায় বিজনে?
নিরাশ ভগন স্বর উঠিছে গগন পর
আবার গগনে পুনঃ মিশাইছে ক্ষণে;—

"কবে রে কবে রে হইবে সে দিন
যে দিন আহা এ অভাগা দুখী,
মরণের স্নিগ্ধ শীতল কোলেতে
মাথাটি রাখিয়ে হইবে সুখী?

ভাঙ্গিবে না কভু যে গভীর ঘুম
ফেলিতে কেবল যাতনা-শ্বাসে,
পারিবে না কভু পিশাচী ধরনী
যে মোহ ভাঙ্গিতে বিকট হাসে!

দেখিতে দেখিতে পলকে পলকে
একটি একটি একটি করি,
ছেলেবেলাকার সুখের স্বপন
সকলি তো আহা পড়িল ঝরি।

এ জীবন্ ফুল পড়িল শুকায়ে
একটুকু নাহি ফুটিতে, হায়!

মরমের সাধ মরমে মিশিল
মরমে আগুন জ্বলিল তায়।
শিথিল হয়েছে দেহের বাঁধুনি,
ভুলিছে বহিতে শোনিত ধার,
ফুরায়ে এসেছে নয়নের জল,
এক ফোটা নাহি ফেলিতে আর।
কেবল কেবল জ্বলিছে অনল
হিয়ার যতেক মরম-গাঁটে
তবু কেন, হায়! এ পাপ হৃদয়
শতধা শতধা নাহিক ফাটে!
বলেদে, বলেদে, বলেদে, আমারে
কত দিন আর এমন করি,
পুষিয়া রাখিব এচিতা-অনল
মরমের এই শ্মশান ভরি?
সে সুখের দিন হইবেরে কবে
যে দিন অভাগা জনম-দুখী
মরণের শান্ত শীতল কোলেতে
ঘুমায়ে পড়িবে মাথাটি রাখি?"
ফুরালো বালার ধ্যান, সব শক্তি অবসান,
আবার পুরানো স্মৃতি করিল দংশন,
আবার নিঝর পারা ছুটিল সলিল ধারা,
হইল হইল মিছে সন্ন্যাসিনী পণ।
দেখিতে দেখিতে শেষে কে হেথা দাঁড়াল এসে?
নয়নে নয়নে ওই হোল সম্মিলন,
"নলিনী, নলিনী হেথা"?—আরনা ফুটিল কথা
দোঁহারে দেখিয়া দোঁহে যেন অচেতন!

---

(৩)

বিজন একটি বনের মাঝারে
কালের কালিমা মাখিয়ে গায়,
দাঁড়ায়ে একটি কালিকা মন্দির
অনিত্যের স্থির প্রতিমা প্রায়।
ভেঙ্গে গেছে তার শিখর প্রদেশ
ঝর ঝর ইট পড়িছে খসি,
বট অশথের গভীর শিকড়
রয়েছে তাহার মরমে পশি।
ভিতরে কালিকা—করাল মূরতি
সিঁদুরে কপাল ঢেকেছে তাঁর,
চন্দন চর্চ্চিত ভীষণ কপাল,
গলায় দুলিছে জবার হার।
আঁধার সে বনে মন্দির মাঝারে
নিভ-নিভ এক প্রদীপ জ্বলে,
লক্ষ্য করি তায় যুবক যুবতী
বহু দূর হতে আসিছে চলে।
বহু পথ হাঁটি, বহু শ্রম করি,
বহু সাধ আশা করিয়া মনে,
শ্রান্তি ক্লান্তিময় নলিনী ও যুবা
পশিল সেই সে গভীর বনে।
যোগিনীর সাজ ফেলেছে খুলিয়ে
কুসুমে সাজান নলিনী কায়,
তবুও এখনো বিভূতির চিনা
মাঝে মাঝে দেখা দিতেছে তায়।
জটিল কেশেতে বেঁধেছে কবরী
তাহাতে শোভিছে কুসুম কুল
যোগিনী সেজেছে কুলের রমনী—
শ্মশানে যেন রে ফুটেছে ফুল।
পশিল দোঁহে সে বনের মাঝারে
অলসে অবশ নলিনী-কায়,
মাথাটি রাখিয়ে যুবকের কাঁধে
অধীরে সকল দিকেতে চায়।

কহিল যুবক,—"কে আছ হেথায়,
কে পূজক তুমি ধেয়ানে রত?
উঠ এক বার, বিবাহ শিকলে
বাঁধ আমাদের জনম মত।"

উঠিল পূজক পূজা সমাপিয়া,
চাহিল যে দিকে উভয়ে ছিল,
আধো ছায়া-ছায়া আঁধারে আলোকি
নিভ-নিভ দীপ উজলি দিল।

চকিতে নেহারি যুবা যুবতীরে
থমকিয়া গেল পূজক-বর,
তখনি আবার মুদিল নয়ন
আবার চাহিল ক্ষণেক পর।

দীপের আলোকে উজলিত মুখ
পূজক আবার দেখিল মোহে,
আবার তখনি নত করি আঁখি
বিবাহ বাঁধনে বাঁধিল দোঁহে।

মন্ত্র পাঠ করি পরাইয়ে মালা
বালার হাতটি স্ব-হাতে নিয়ে,
সম্প্রদান তাহা করিল যুবারে,
বিধি মতে দিল তাদের বিয়ে।

একবার সুধু আটকিল কথা
একবার হিয়া কাঁপিল তাতে,
এক ফোটা তার আঁখি-জল শুধু
পড়িল সেকালে বালার হাতে।

রুসিয়া প্রবাসীর পত্র।

আপনার নিকট ক্রমাগত কয়খানি পত্র লিখিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এক খানিরও উত্তর পাইলাম না। * * * গত পত্রে এখানে থাকিয়া পরীক্ষা দেবার কথা যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম তাহা এখন ব্যর্থ হইল। কারণ ইতিমধ্যে নানা কারণে বাধ্য হইয়া অবশেষে রাজমন্ত্রীর সহিত—কার্য্যতঃ, তাঁহার চরের সহিত—সকল প্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছি। তিনিই প্রথমে আমার অধ্যাপকতা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এখন আর আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, এখন আবার আকাশের পাখীর ন্যায় স্বাধীন—যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারি যাহা ইচ্ছা করিতে পারি। যদিও রুসিয়ায় থাকা হইল না—ঈপ্সিত ভাষাগুলি ও ভাষাতত্ত্ব শিখিয়া পরীক্ষা দেওয়া হইল না—তবুও নানা কারণে এই ঘটনায় আরাম ও সন্তোষ লাভ করিতেছি। এখানে আসা অবধি এই অধ্যাপকতা লইয়া গত এক বৎসর কি ভয়ানক গোলযোগ চক্রেই ছিলাম। শিক্ষা বিভাগের রাজমন্ত্রী (যাহা দ্বারা আমি আহূত হই) তিনি বলেন এক কথা, বিশ্ববিদ্যালয় বলেন আর এক কথা—উচ্চ পরিবারস্থ

বন্ধুগণ বলেন "ইহা করিলেই তোমার অধ্যাপকতা লাভ হইবে", অধ্যাপক ও আচার্য্যগণ বলেন "উহা করিলে কিছুই হইবে না।"

এস্থানীয় সমাজ নানা দলে বিভক্ত—দলীয়গণের পরস্পরের প্রতি কুকুর বিড়ালের অনুরাগ। একদলে যাহা বলিবেন ও করিবেন, অপরদলে তার যতদূর প্রতিকূল আচরণ করিতে পারেন করিবেনই—নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। যদি ইহার এক দলের পক্ষাবলম্বী অথবা এমন কি পক্ষপাতীও হইয়া-পড়, তবে বিপক্ষ দল তোমার অনিষ্ট করিতে জীবন মরণে ব্রতী, ইহারা তোমার নামে নিন্দাবাদ প্রচার করিতে, তোমার যাহাতে প্রতিপত্তি ক্ষয় হইতে পারে তার জন্য সমস্ত অর্পণ করিতে প্রস্তুত। ঘোর অবিশ্বাস পরনিন্দা, পরানিষ্ট-চিন্তা অশ্রাব্য চরিত্র-দোষের (স্ত্রীগণের এবিষয়ে হয়ত প্রাধান্য!) সংযোগে এই রুসিয় রাজধানী পুরাকালীন সোডম, রোম, পম্পায়ি অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর বেরসাইয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যাহাদিগকে নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হয় তাহাদিগকেও মন খুলিয়া সকল ভাব ও চিন্তা বলা যায় না—কাফে (Cafe) ও রেস্তোরাঁর (Restaurant) ত কথাই নাই—সেখানে যে অর্ব্বাচীন রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি অথবা সমাজ-নীতি সম্বন্ধে আলাপ করিবে তার সত্বরে শ্বেতদ্বীপকূলস্থ কোন চিরবরফাবৃত নির্জ্জন কারাবাস দর্শন সম্ভব। মানব-চিত্ত যে সমুদায় প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্ক ও অলোচনা করিয়া ক্রমশঃ মনুষ্যত্ব ও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহা যখন ঘুণাক্ষরেও অসম্ভব তখন সে নগরে, সে দেশে, ভয়ানক অশ্রুতপূর্ব্ব লম্পটতা নিয়ম হইবে আশ্চর্য্য কি? যেখানে স্বজাতিহন্তা পশুবৎচরিত্র যোদ্ধৃগণের অথবা নর্ত্তকী—কামেদিয়েনগণেরই—পশার, যেখানে গুপ্তচর অথবা মানব হৃদয়ের প্রিয়তম আশা ভরসার ধ্বংশকারী পামরগণই Star দ্বারা বিভূষিত হয়, যেখানে উচ্চপরিবারের বালকগণ শৈশবাবধিই Diplomacy শিক্ষা করে এবং বালিকাগণ ফরাসী ও জর্ম্মান্ রাজ্যের নীতি আদর্শানুসারে চরিত্র গঠন করিতে থাকে, সেখানে যে পূর্ব্বতন পম্পায়ি নগরের খেলা পুনরায় খেলিত হইবে না তা কি সম্ভব হয়? সোডম মরুসাগরে, পম্পায়ি বিসুভিয়স্ গর্ভে; আমার কখন কখন মনে হয় যেন সেণ্টপিটরস্বর্গও সেই রূপে কোন দিন অকস্মাৎ উত্তরমহাসাগরের তুষার পর্ব্বতের দ্রবসম্ভূত জলপ্লাবনে "মাতা ইরাব" গর্ভে স্বকীয় পাপ কলঙ্কিত মুখ লুক্কায়িত করিতে বাধ্য হইবে।

আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আহূত না হইয়া মন্ত্রী কর্ত্তৃক আহূত হই। আসিবা মাত্রই দেখিলাম মন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরস্পর কি সম্বন্ধ—কাজে কাজেই অধ্যাপকগণ আমায় প্রথম হইতেই এক জন মন্ত্রী-চর রূপে দেখিতে লাগিলেন এবং আমি যাহাতে এখানে কোনরূপে কোন প্রতিপত্তিলাভ করিতে না পারি তার জন্য একতার সহিত কাজ করিতে লাগিলেন। আমি কোন

দলের পক্ষপাতী নহি—আমি বিদ্যার্থী ও স্বদেশহিতার্থী; জাতি ও শিক্ষা অনুসারে আমি স্বভাবতই জ্ঞানী ও শাস্ত্রী Noblesse-এরই বরং পক্ষপাতী ইত্যাদি রূপ সরলভাবে বলিলেও কি হইবে? অধ্যাপকগণ আমায় ত্যাগ করিতে লাগিলেন—শুধু তাহাই নহে—প্রকাশ্যেও গোপনে বিদ্বেষাচরণ করিতেও ক্রটী করিলেন না। তাঁহাদের সমাজে ভুক্ত হইবার আমার লালায়িত আকাঙ্ক্ষা বরং আমার প্রতি অধ্যাপকগণের সন্দেহ উদ্ঘাটন করিতে লাগিল—বিশেষতঃ তাঁহারা পড়িয়াছেন যে ব্রাহ্মণজাতি চতুরতায় চিরপ্রসিদ্ধ। এই চতুরতাতেই ভারতবর্ষে তাঁহারা স্বকীয় Hierarchy স্থাপন করিয়াছেন যাহা হিমাচলের ন্যায় অনন্তকাল হইতে তথায় স্থির-গম্ভীর ভাবে শিরোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে—আর কি? চাণক্য, নন্দকুমার, নানা সাহেবও এই জাতীয়; অতএব এই ব্রাহ্মণকে কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়? আমার সামাজিক প্রকৃতি এইরূপে এক স্থানে রুদ্ধ-দ্বার দেখিয়া স্থানান্তর অন্বেষণ করিল—অতএব বড় একটা সহানুভূতি থাক্ আর নাই থাক্ আহূত অধ্যাপক বলিয়া স্থানীয় ফরাসীভাবাবাদী ও ফরাসী-নীতি-আদর্শ-গঠিত-চরিত্র Aristocratগণের সহিত পরিচয় হইতে লাগিল। সেই অবধি স্থানীয় কয়েকটী প্রধান প্রধান পরিবারেই আমার যাতায়াত—এখানে আমি এই দলভুক্ত বলিয়াই পরিচিত। Nihilistগণের এক খানি হত্যা খাতা খুঁজিয়া পাইলে হয়ত লিষ্টের মধ্যে একটী ব্রাহ্মণবধের আদেশ পাওয়া যাইতে পারে। ইহাঁরা পড়িয়াছেন ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর Aristocratএর Aristocrat, অতএব একটা ব্রাহ্মণ হত্যা করিলে অন্ততঃ অসংখ্য অসংখ্য পারিয়ার দুঃখের কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ লওয়া হইবে। "বিশেষতঃ এখানে আসিয়াও এই চাণক্য-পুত্র কেবল রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যেই ফেরাফিরি করে—এ ভারতবর্ষ নয়, আমরা পারিয়া নই, একবার দেখা যাবে।"

সে যাহা হউক, এখন কিছু দিনের মধ্যেই এই সমস্ত ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে। আমার গম্য পথ অতি সরল—পুনরায় জর্ম্মাণিতে গিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষা দেওয়া ও উপাধি গ্রহণ। * * * এখন এই উপাধিটী গ্রহণের জন্য আমার আর বড় অধিক সময় ও ক্লেশ ব্যয় করিতে হইবে, বোধ হয় না। শুধু একটী প্রবন্ধ লেখার দরকার। এই প্রবন্ধটী লিখিতে হয়তঃ আমার ছয় মাসের অধিক লাগিবেক না। আমি এখন দুইটী প্রবন্ধ লিখিতে বাসনা করিতেছি। একটী ভারতীয় পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে—(লিখিবার কতই আছে)! দ্বিতীয়টী ভারতীয় নব আর্য্যভাষা অবলম্বন করিয়া (যাহা আমার স্থানীয় অধ্যাপকতালাভের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।) উভয় সম্বন্ধেই আমি গত তিন বৎসরে অনেক পাঠ, অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণা করিয়াছি। পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু অবসরের অভাব বশতঃ

এতদিন বিশেষ কিছুই লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। এত শিখিতে হইয়াছিল—ভাষার পর ভাষা, সাহিত্যের পর সাহিত্য, জানিবার জন্য চিত্ত সর্ব্বদা এত ব্যাপৃত থাকিত যে রচনা-বন্ধন জন্য চিন্তা করিবার সময় হয় নাই। এখন অবসর পাইলাম বলিয়া মনে আনন্দ জন্মিতেছে; ফলতঃ, যদিও সেণ্টপিটর্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা লাভ রূপ হৃদয়ের একটী অতি যত্ন-পোষিত বাঞ্ছা জলবুদ্বুদ আকার ধারণ করিল, যদিও যে বিশেষ উদ্দেশে গত তিন বৎসরে এত আয়াশ স্বীকার করিলাম (স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত দুর্ব্বল করিলাম) তাহা মরীচিকার ন্যায় আমার সতৃষ্ণ উদ্বেলিত চিত্তকে বঞ্চনা করিল, তবুও এই অধ্যাপকতা ব্যপদেশে তিন বৎসরে আমি যত শিখিয়াছি, যত দেখিয়াছি,যত উচ্চ সুখভোগ করিয়াছি, তাহা জীবনে আর কখনো হইবে কি না সন্দেহ। জর্ম্মণির প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান নগর পরিদর্শন করিলাম, পারী নগরে সাধারণ মেলার বৎসরে কত দেখিলাম, কত শিখিলাম, তৎপরে এই পিটর্সবর্গে, ভাল হউক মন্দ হউক, কত কত অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয় শুনিলাম, কত কত অকল্পনীয় বস্তু প্রত্যক্ষগোচর করিলাম,ইয়োরোপীয় রাজা-রাজড়ার অর্থাৎ Aristocracyর রীতি নীতি কেমন তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনেকটা অবকাশ পাইলাম। ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় আর্য্য-ধর্ম্ম-নিয়োজিত জাতি-প্রথার মধ্যে কতদুর প্রভেদ তাহার প্রতিলব্ধি জন্মিল। তাহার পর পারীতে অধ্যাপক গারসেঁ দেতাসী ও রেণা হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত কত কত সুবিজ্ঞ ও সুবিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় লাভে কৃতার্থ হইলাম—ফরাসি ভাষাও ইতিমধ্যে ইংরেজী ও জর্ম্মণের ন্যায় শিখিবার অবকাশ পাইলাম এবং আর ২।৩ মাস এখানে থাকিলে রুসিয়ভাষাও সেইরূপ শেখা হইবে, স্থিরচিত্তে এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে কি বাধ্য হইব না যে রুসিয়ার প্রস্তাবিত অধ্যাপকতা আমার বিশেষ অনুকূলই হইয়াছে? গোলাপেও কণ্টক, তবে আমার ভাগ্য একেবারে সাধারণ-নিয়ম বর্জ্জিত হইবে কিরূপে আশা করা যায়? গত তিন বৎসরের মধ্যে ভারতের, অতীত ও বর্ত্তমান বিষয় সম্বন্ধে দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া আমি যে সমস্ত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি—তাহার ফল আমার বাস্তবিক জীবনে এখনই দৃষ্ট হইতেছে এবং ভাবী জীবনে যে আরো কত হইবে তাহা কল্পনা করা অসম্ভব। * * *

আমি খৃীস্ট-ব্রাহ্ম হইয়া দেশ ছাড়িয়াছিলাম। খৃীষ্টিয়গণের মধ্যে ৭।৮ বৎসর থাকিয়া হিন্দু ব্রাহ্ম হইয়া, প্রকৃত ভট্টাচার্য্য হইয়া, প্রকৃত ছান্দোগ্য-ব্রহ্মচারী হইয়া দেশে ফিরিব। "ভবিতব্যানি ভবন্তি সর্ব্বত্র।" * * *

প্রবন্ধ ব্যতীত উপাধিলাভের জন্য আরো দুইটী অন্যান্য বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষা দুইটীর জন্য আমি হয়ত পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাস ও সাধারণ সাহিত্য-ইতিহাস নির্ব্বাচন করিব। কিন্তু প্রথম কথা প্রবন্ধ—প্রবন্ধ প্রস্তুত ও

গৃহীত হইলে অপর বিষয় দ্বয়ের চিন্তা করিবারই নিয়ম। অতএব দেখিতেছি সমুদায়ে আমার এই সমস্ত বৎসরটী (১৮৮০) লাগিবে। * * *

ইয়োরোপে শিক্ষা ও মানসিক উন্নতিলাভ করিব বাসনায় ১৮৭৩ সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ভারতবর্ষ ত্যাগ করি * * প্রথমে লাইপ্‌সিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া উপাধিগ্রহণের পরীক্ষা দিবার আয়োজন করিতেছিলাম * এমন সময়ে কোন কারণ বশত সেখানে থাকার অসুবিধা হওয়ায় আমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে (হিন্দু-সাহিত্য, বৌদ্ধধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে) প্রকাশ্য সভায় জর্ম্মাণ ভাষাতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। এই শীতে (১৮৭৬-৭৭) যখন আমি নানা স্থানে বক্তৃতা করিতেছিলাম—এবং যখন বক্তৃতাগুলি প্রথমতঃ আংশিক তৎপরে সম্পূর্ণ আয়তনে সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইতেছিল—তখন ঐ স্থানীয় মন্ত্রীচর লাইপসিকে উপস্থিত হন—এবং আমার ভারতীয় নব্য আর্য্য ভাষাগণের অধ্যাপকতা প্রস্তাব করেন। তাহার পর কি কি ঘটিয়াছে তাহা বোধ হয় জানেন। এ পর্য্যন্ত সেই প্রস্তাব অনুসারে এক রকম চলিতেছিল, পুনরায় আবার অদৃষ্ট-চক্রের নূতন পরিবর্ত্তন হইল। আমার অতীত ও বর্ত্তমান জীবন আলোচনা করিলে অনেকটা স্বপ্ন ও উপন্যাসের ন্যায় বোধ হয়; আমার জীবন এখনও অনেকটা অন্ধকার—কবে আলো হইবে তাহা কে বলিবে? * * *

আগামী বৎসর হইতে আমাকে কেবল এক খণ্ড করিয়া "ভারতী" পাঠাইবেন। কারণ আমার ছাত্রগণ বাঙ্গালা পড়া ত্যাগ করিয়াছেন। শুনিলাম অধ্যাপক মিনায়ফ ভারতবর্ষে গিয়াছেন। এখানে এখন ভারতবর্ষীয়েরা বর্ত্তমান আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে কি মনে করেন—সাধারণ বিদ্রোহ অথবা উত্থানের চক্রান্ত আছে কি না—তাহা জানিতে অশেষ কৌতূহল। আমাকে কত প্রধান প্রধান ডিপ্লোমাট এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এখানে Diplomacy কাহাকে বলে তাহা চূড়ান্ত দেখা যায়, কত খবরই প্রকাশ—কত হুজুকই উঠান হয়, যাহার প্রকৃত ঘটনার সহিত লেশমাত্রও সম্বন্ধ নাই। কিছুদিন হইল এস্থানীয় একজন রাজপুত্র ও আর একজন রাজপত্নী দৃঢ়তার সহিত আমাকে বলিলেন "আপনি কি জানেন না যে আপনার স্বদেশীয় নানাসাহেবের ভ্রাতস্পুত্র এখন কাবুলে?" "বটে! কাগজে ত দেখি নাই, হইতে পারে।" এদিকে তার দিন দুই পরে রামচন্দ্র (যে মহারাষ্ট্রীয়ের কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছি) আসিয়া আমার ঘরে উপস্থিত "Good morning, how do you do?" বলিলাম, "আমি মনে করিতেছিলাম তুমি আজ কাবুলে—ইয়াকুব খাঁয়ের শিবিরে রুসিয়ার সংযোগে ভারতীয় ব্রিটিশ রাজ্যের উচ্ছেদ করিতে প্রাণপণ করিতেছ। কি আশ্চর্য্য! একি স্বপ্ন না কি? একি তুমি, না যুদ্ধে আহত তোমার প্রেতাত্মা? রামচন্দ্র সত্বরে দুই এক অশ্রুত

যুক্তি দ্বারা আমার সন্দেহ ভঞ্জন না করিলে, অর্থাৎ স্বকীয় আত্মতা (personal identity) বিশেষরূপে প্রমাণ না করিলে, আমি হয়ত ডেনমার্কের রাজকুমারের দশায় পতিত হইতাম। এই রাজ পরিবারগণের উক্ত রূপ বলিবার বিশেষ কারণ আছে; ইহাঁরা মনে করেন যে ইহাঁরা যা যা বলেন তাহাই আমি বেদবাক্য জ্ঞানে দেশে লিখিয়া পাঠাইব। যেন আমি এতদিন ইয়োরোপে থাকিয়া ইয়োরোপীয়গণের চরিত্রের Diplomacyর অন্তর্ব্বাহ্য কিছুই জানি না।

* * *

অদ্য এখানেই বিদায় লই। গত "ভারতীতে" "শকুন্তলা" সম্বন্ধে প্রস্তাবটি পড়িয়া দুঃখ ও হাস্য উভয়ই জন্মিল। সময় থাকিলে লেখকের সঙ্গে এমন ঝগড়া করিতাম কিন্তু তিনি ঝগড়ার উপযুক্ত কি না সন্দেহ হয়; কারণ তিনি গই-টীর উক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার ও অন্যান্য ভারতবর্ষীয়গণের মনে তাহা পড়িয়া ঠিক বি'রীত ভাবের উদয় হইয়াছে। গইটী যদি অনুবাদের অনুবাদ না পড়িয়া (যাহা লেখকও স্বীকার করেন) কালিদাসের অমৃত মধুর সংস্কৃত রচনাই (যাহা লেখ-কও স্বীকার করেন) পড়িতে পারিতেন তবে না জানি কত কি বলিতেন। শুধু গইটীই নন, সমগ্র জর্ম্মণ ও ইয়োরোপীয় সাহিত্য খুঁজিলে "শকুন্তলা" পড়িয়া বিমো-হিত হইয়াছেন এমন মহাকবি ও মহা পণ্ডিতগণের সংখ্যা এত অধিক যে লেখক এক ভয়ানক মেজরিটীর বিপক্ষে দাঁড়াই-বেন। লেখকের স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে কালিদাস হিন্দু কবি, শকুন্তলা হিন্দু মেয়ে। অতএব কবির ভাব, বর্ণনা ও আদর্শ হিন্দু হওয়া চাই। লেখককে কে বলিল হিন্দুমতে বহু বিবাহ ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ দূষণীয়? তিনি কি বেদ বেদান্ত, মনু যাজ্ঞবল্ক্য, রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি পাঠ করেন নাই? ভগবান মনু বলিয়াছেন।

"ষড়ানুপূর্ব্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।
বিট্‌শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্ম্যান্ন রাক্ষসান্॥"

মনু। ৩ অধ্যায়। ২৩

বহু বিবাহ সম্বন্ধে কেবল এই বলিলেই হইবে যে শুধু ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজগণই একের অধিক পত্নী গ্রহণ করিতেন—এমন নহে কিন্তু যাঁহারা পরমার্থ-চিন্তায় জীবন কাটাইতেন এমন বিখ্যাত মুনি ঋষিগণেরও কখন কখন বহু পত্নী থাকিত, বেদান্তে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার দুই পত্নীর উল্লেখ দেখা যায়; তন্মধ্যে মৈত্রেয়ীর সহিত আলাপটী জগৎবিখ্যাত। এ স্থানে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-নীতির আদর্শ অথবা ভাবানুসারে উক্ত সামাজিক প্রথাদ্বয় ভাল কি মন্দ তাহার কথা হইতেছে না। কালিদাস কবি—তিনি সমাজ যেরূপ সেইরূপ চিত্র করিয়াছেন কিনা তাহা দেখা আবশ্যক।

স্বীকারই যেন করিলাম যে শকুন্তলা নাটকের "ঘটনা সকল সামান্য যেরূপ সচ-রাচর হইয়া থাকে সেইরূপ; যে তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য অথবা মনোহারিত্ব নাই।" কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই ছিল যে, যে

কবিরত্ন এরূপ "সামান্য ঘটনা—যেরূপ সচরাচর হোয়ে থাকে"—লইয়া এরূপ মনোহর নাটক রচনা করিতে পারেন তাঁহাকে পৃথিবীর অতি প্রধান কবি অথবা "উচ্চ-শ্রেণীর নাটককারদিগের মধ্যে পরিগণিত" করা উচিত। লেখকও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং সেক্সপীয়র, স্কট্, মিল্‌টন ও দান্তেকে তজ্জন্য প্রশংসা করিয়াছেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে অবসর থাকিলে লেখকের প্রত্যেক অযৌক্তিক কথা ধরিয়া ঝগ্‌ড়া করিবার অনেক ছিল। কিন্তু তিনি শকুন্তলার চরিত্র সম্বন্ধে যে কয়েকটী, বিশেষতঃ একটী দোষারোপ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া চক্ষু বুজিতে পারি না। "সরল স্বভাব স্নেহময়ী, মুগ্ধা" হিন্দুবালার প্রথম প্রেমে যেরূপ লঘুতা (বস্তুতঃ আমি শব্দটী অন্যায় মনে করি) প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক, শকুন্তলার আচরণে তাহা হইতে অধিকতর লঘুতা প্রকাশ পায় নাই। হিন্দু বালা বলি কেন, জগতের প্রধান প্রধান নাটককারগণের রচনায় তদবস্থাপন্না নায়িকাগণের চরিত্রে কি উক্ত রূপ লঘুতা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয় না? সেক্সপীয়রের জুলিয়েট্ অথবা গইটীর মারগেরীটা কি শকুন্তলার ন্যায়ই অধীরা নহেন? অনেকে হয়তঃ ইহাদিগকে শকুন্তলা হইতেও অধিকতর "অধীরা" বলিতে বাধ্য হইবেন। প্রেমমুগ্ধা, সরলা বালার নিকট লেখক কিরূপ ধীরতা—সক্রেটীস, না এপিকূটটীসের ধীরতা——আশা করেন তাহা আমরা জানি না। যেমন প্রকৃত ঘটনায় বাস্তবিক হইয়া থাকে কালিদাস তাঁহার নায়িকা তেমনি বর্ণন করিয়াছেন। কি হওয়া উচিত তাহা তাঁহার কার্য্য নহে। শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহ উল্লেখ করিয়া লেখক যে কয়েকটী অপ্রাসঙ্গিক অন্যায্য বাক্য বলিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ক্ষমার অযোগ্য। "শকুন্তলা" কতদূর "চমৎকারিত্ব" এবং "ঔৎসুক্য" জন্মাইতে পারে তাহা আমি ইয়োরোপে অনেক সময়ে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কারণ আমি নিমন্ত্রিত পরিবারে অনেক সময়ে শকুন্তলার আখ্যায়িকাটী বলিতে আহূত হইয়া বলিবার সময় শ্রোতৃগণ যে রূপ অসাধারণ "ঔৎসুক্যের" সহিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছেন তাহা দেখিলে লেখক কখনই ওরূপ বলিতেন না। তিনি হেমলেট অথবা ওথেলোর আখ্যায়িকা অত ঔৎসুক্যের সহিত পড়িয়াছেন তাহার কারণ এই যে তিনি উক্ত নাটকদ্বয়ের আখ্যায়িত বিষয় সম্পর্কে বিদেশী, পক্ষান্তরে শকুন্তলা হিন্দু আখ্যায়িকা এবং হয় ত মহাভারতে পূর্ব্বেই পড়িয়াছেন।

সেণ্টপিটর্শবর্গ
১২ জানুয়ারী } শ্রী নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

সুখ-দুঃখ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা মনুষ্য জীবনের সহিত সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ ও সুখ-দুখের পরস্পর সম্পর্ক দেখাইতে ও তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যত্নশীল হইয়াছি, এবং সুখ-দুঃখের প্রকৃতি কিরূপ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান ও তাহার পরবর্ত্তী প্রস্তাবে সুখ-দুঃখ বিষয়ে প্রধান প্রধান দার্শনিকদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। পূর্ব্বোক্ত সত্যগুলি হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কিম্বা সত্যের অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া জীবন যাত্রার নিয়ম স্থির করিলে বিষম ভ্রমে উপস্থিত হইতে হয়। এই কারণ বশতঃ অধিকাংশ দর্শনে ভ্রম পৌঁছিয়াছে।

মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থাতে, যখন অসভ্য মনুষ্যকে প্রতিদিনের আহার সংগ্রহ করিবার জন্য যারপর নাই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইত, তখন মনুষ্যের ভাবিবার সময় হইত না। তখন মানুষ অন্যান্য জন্তু হইতে নিজের বিশেষ কোন প্রভেদ দেখিতে পাইত না—চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু অপেক্ষা নিজের যে কোন মহত্ত্ব আছে একেবারে অনুভব করিতেই পারিত না, তাহার অন্তরে উন্নত হইবার যে ক্ষমতা নিহিত আছে তাহা একবারো তাহার মনের উপর দিয়া চমকিয়াও যাইত না। উপস্থিত অবস্থাতেই সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকিত,—নিজের অবস্থাতে তাহার অসন্তুষ্ট হইবার সময়ই হইত না। সে আজন্ম যে অবস্থা দেখিতেছে তাহার যে পরিবর্ত্তন হইতে পারে—একথা স্বপ্নেও তাহার মনে আসিত না। পার্থিব কষ্টে তাহার মন যেরূপ পরিপ্লুত থাকিত তাহাতে আত্মার অভাব দূরে থাকুক শরীরের বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের অভাব নিবারণ করা ব্যতীত অন্য কোন কথা কখনো তাহার মনে আসিত কি না সন্দেহ। পরে সময়ক্রমে যখন কোন একজাতি মনুষ্যকে শরীরের সামান্য অভাব মোচনের জন্য দিনরাত্র উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত না, যখন মানুষ কিছুক্ষণ চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় পাইত, তখন সে দেখিতে পাইত, যে শরীরের সকল অভাব দূর হইলেও তাহার কি এক অভাব অনুভূত হইত যাহা সে সহস্র পার্থিব সুখেও নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইত না। তখন সে আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিল, আত্মার অভাব দেখিতে পাইয়া তাহা মোচন করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। যতই শরীরের অভাব মোচন করা অল্পায়াস-সাধ্য হইতে লাগিল ততই মানুষের আধ্যা-

ত্মিক অভাবের দিকে অধিক দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। যেদেশে যত শীঘ্র আহারদ্রব্য সুলভ হইয়াছে সেই দেশে তত শীঘ্র দর্শনশাস্ত্রের উদয় হইয়াছে। অন্যান্য দেশের সভ্যতা অপেক্ষা ভারতবর্ষের সভ্যতাও যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শনও সেই রূপ অন্য দেশের দর্শন হইতে প্রাচীন। প্রাচীন দর্শন মাত্রেরই মুখ্য উদ্দেশ্য মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অভাব মোচন করিয়া সুখ লাভ। অবশ্য এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আনুষঙ্গিকরূপ অনেক বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। সুখ লাভ করাই দর্শনের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের দেশের সকল দর্শনেরই উদ্দেশ্য শরীর হইতে আত্মার মুক্তি লাভ করিয়া চির সুখ উপভোগের অধিকারী হওয়া। তবে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক এই কার্য্য সিদ্ধি করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু যত প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে বেদান্ত দর্শনের প্রদর্শিত উপায়ই আমাদের দেশের লোকসাধারণের মনকে বদ্ধমূল ভাবে অধিকার করিয়াছে। অতএব সর্ব্বাগ্রে সংক্ষেপে এই দর্শনের মত প্রকাশ করিয়া তাহার সমালোচনায় আমরা অবতরণ করিতেছি—বেদান্ত দর্শনের মতব্যাখা করিবার সময় যতদূর সম্ভব পারিভাষিক শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে, সাধারণ লোক যাহাকে বেদান্তের মত বলিয়া গ্রহণ করে তাহাই আমাদের বিশেষ সমালোচ্য, কেন না তাহার দ্বারাই একটা বিস্তৃত ফল হইয়াছে।

পৃথিবীতে কোন বস্তুই নিশ্চিতরূপ জানিতে পারা যায় না—কোন বস্তুরই অস্তিত্বের স্থিরতা নাই—সকল বস্তুই সন্দেহ-মগ্ন। চিন্তা দ্বারা কোন একটা এমন সুদৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যায় না যাহার উপর আমরা যুক্তি দ্বারা কোন মত স্থাপন করিতে পারি, কিম্বা যাহাকে ভর করিয়া আমরা জ্ঞান বাড়াইতে পারি—সকল বস্তুই অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু বস্তুর অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহ দ্বারাই একটী বস্তুর অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে, আমরা সকল বিষয়েই সন্দেহ করিতে পারি কিন্তু এই সন্দেহের ভিতর যে এমন এক বস্তু আছে যে সন্দেহ করিতেছে ইহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না—সন্দেহকারীর অস্তিত্ব আর সন্দেহের অধিকার-অন্তর্ভূত থাকে না। বেদান্ত দর্শনের মূলে এই প্রধান সত্য—এই সত্যটিকেই দেকার্ত্ত এই বিখ্যাত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন—Cogito ergo sum (আমি ভাবিতেছি অতএব আমি আছি।) তাহার পর আমি ব্যতীত অন্য বস্তুর (Non-egoর) অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ পাই না, আর কোন কালে যে পাইব তাহার সম্ভাবনাও নাই অতএব আমি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই এই প্রমাণীকৃত হইল। যাহাকে আমরা অন্য কোন বস্তু মনে করি তাহা বস্তু নহে, বস্তুর ভান মাত্র। বারকলি এই রূপ বলেন ঈশ্বর-ইচ্ছা আমাদের মনের উপর এমন ভাবে কার্য্য করে যাহাতে আমাদের মনে এরূপ পরি-

বর্ত্তন উৎপন্ন হয় যে তাহাতে আমাদের বাহ্য-বস্তুর-অস্তিত্ব-রূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। বেদান্ত-দর্শন স্বীকার করে না, যে বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের মন সংশ্লিষ্ট হইয়া Perception উৎপন্ন করে। অবিদ্যাকেই ভিত্তিহীন বাহ্য-বস্তু জ্ঞানই বেদান্ত দর্শনে মায়া নামের বাচ্য। কিন্তু এখন মায়া শব্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইল তাহা সম্পূর্ণ নহে—তাহাতে অব্যাপ্তি দোষ আছে। মায়ার আর একটি উপকরণ আছে তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।

ইহা ব্যতীত আর একটি সিদ্ধান্ত লইয়া বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি নির্ম্মিত। প্রত্যুকাম পরমাত্মা হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি, এখন বিবেচ্য এই যে পরমাত্মাতে ও আমি বলিয়া যে আত্মাকে জানি তাহার সম্বন্ধ কি। বেদান্ত দর্শনের পরব্রহ্মের জ্ঞান বেদ বা উপনিষদ হইতে সংগৃহীত। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" বোধ হয় এই বৈদিক সূত্র অনুসরণ করিয়া বেদান্ত দর্শন আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। আমরা নিশ্চিতরূপ অবগত নহি যে কি যুক্তি অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রাচীন বৈদান্তিকেরা এই সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু আধুনিক বৈদান্তিক য়ুরোপীয়দিগের যুক্তি আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি। প্রকলাস, পর ফাইরী প্রভৃতি Neo Platonist গণ ও মুসলমান দার্শনিক Avicenna দ্বারা য়ুরোপে বেদান্ত ঈষৎ ছদ্মবেশে প্রচারিত হইয়া নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে*। আধুনিক য়ুরোপীয় বৈদান্তিকেরা বলেন যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে জগতে যত শক্তি আছে তাহার সমষ্টি সকল সময়েই এক—কখন তাহার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। ইহার অন্যথা হইলে কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের নিত্য সমভাব রক্ষিত হইতে পারে না। অতএব আত্মারূপ শক্তিবিশেষও ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী হইবে। এখন দেখা যাইতেছে যে একটি মানুষ জন্মাইলে তাহার আত্মাও উৎপন্ন হয়। যদি প্রত্যেক নূতন মানুষের জন্য ঈশ্বরকে নূতন আত্মা সৃজন করিতে হয় তাহা হইলে ক্রমিকই আধ্যাত্মিক শক্তির সমষ্টি বৃদ্ধি হইতে থাকে—যাহা অসম্ভব। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বটেন কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান অর্থে এরূপ নহে যে ঈশ্বর আত্মঘাতী হইতে পারেন। আমরা আরো দেখিতেছি যে, শক্তি কেবল অবস্থান্তরিত হইতে পারে সুতরাং শক্তির মূলাধার ঈশ্বরের অংশ বিশেষ অবস্থান্তরিত হইয়া মানুষের আত্মা রূপে পরিণত হইয়াছে।" যদি কেহ এরূপ বলে যে জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা তুল্য, অতএব মৃত মানুষের আত্মা লইয়া ভূমিষ্ঠ মানুষের আত্মা সৃজিত হইতে পারে কিন্তু এরূপ যুক্তি অতীব অমূলক। বাস্তব পক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে উত্তরোত্তর পৃথিবীর লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। য়ুরো-

* Draper's Conflict between Science and Religion গ্রন্থ দেখ।

পীয় বৈদান্তিকেরা আরো দেখান যে যখন সৃষ্টি থাকিবে না—অর্থাৎ যখন প্রলয় উপস্থিত হইবে তখন আত্মা ও পরমাত্মার ভিতর কোন প্রভেদই থাকিবে না—কেননা প্রভেদ থাকিলেই কার্য্য থাকিবে অর্থাৎ সৃষ্টি চলিতে থাকিবে; ইহা হইতে স্পষ্টই আসিতেছে যে ঈশ্বর ও আত্মা অভেদ; শঙ্করাচার্য্যের অহং ব্রহ্মের ইহাই অর্থ। ঈশ্বরের ইচ্ছা বশতঃ এই একত্ব আমি অনুভব করিতেছি না, ইহাও মায়া। মায়ার পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞার যে টুকু অসম্পূর্ণ ছিল তাহাতে এই অংশ যোগ করিয়া দিলে তাহার সে দোষ খণ্ডিত হইবে। সংক্ষেপে এই রূপ বলা যায় যে আমাদের মনের অর্থাৎ ঈশ্বরের অংশ-বিশেষের উপর ঈশ্বরের ইচ্ছার ক্রিয়ার সকল ফলের নামই মায়া।

এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বেদান্তদর্শন দুইটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ম্মিত —একটি এই যে ঈশ্বর ও আমি অভেদ, এবং অপরটি এই যে আত্মা ব্যতীত আর সকলই মায়া। মায়া দ্বারা মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন হইতেছে বলিয়া মায়া মানুষের আত্মার দুঃখের কারণ, কেন না মায়াই মানুষের অসীম-প্রত্যাশী আত্মাকে অসীম হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। এই মায়া খণ্ডন করাই মানুষের কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই মানুষ অক্ষয় সুখে সুখী হইতে পারিবে। অবশ্য এ বিষয়ে কেহ বিসম্বাদী হইবে না যে,যাহা বেদান্ত দর্শনের কল্পিত আত্মার চরম সুখ বাস্তবিকই তাহা ঐ রূপ। এখন দেখা যাউক বেদান্তদর্শন মায়া হইতে মুক্ত হইবার কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে।

বেদান্ত স্থির করিল যে বিশ্বসংসার সকলই মায়া—স্নেহ প্রেম ভক্তি সকলই মায়া—আর এই মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া যোগাদি দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার একত্ব অনুভব করা ব্যতীত সংসারের দুঃখ ও কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। মায়ার ধ্বংশ করিতে পারিলে মানুষের অসীম-প্রত্যাশী আত্মা অসীম পরমাত্মাকে পাইয়া ভূমানন্দ লাভ করে। কাজে কাজেই পৃথিবীর বিষয়ে অর্থাৎ মায়াতে মন যত আকৃষ্ট হইবে ততই আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে অধিক বিচ্ছিন্ন হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অতএব পৃথিবীকে ও যাহাকে আমরা পৃথিবীর সুখ মনে করি সেই সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত দর্শনের প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিলে ক্রমে ক্রমে আমরা চিরস্থায়ী সুখের অধিকারী হইতে পারি। পৃথিবীর বিষয় চিন্তা করিয়া সময় ক্ষেপণ করিবার আমাদের কোন আবশ্যকতাই নাই; বরঞ্চ ঐরূপ চিন্তা আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে আরো দূরে লইয়া যায় বলিয়া উহা মহা পাপ। পরমাত্মার সহিত অদ্বৈত ভাব উপলব্ধি করিবার এক প্রধান উপায় হইতেছে শরীর ও মনের নিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা। বেদান্ত-প্রদর্শিত-পথানুসারী লোকের পৃথিবীর সম্বন্ধে মনের ভাব যে ঠিক প্রাচীন Lotos-eater-

দের ঔদাস্যের মত তাহা নহে; ইহারা শুধু পৃথিবীর বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া ক্ষান্ত হইত না—ইহাদের আবার নিজের শরীর ও মনকে ইচ্ছা করিয়া কষ্ট দেওয়াটা অধিক ছিল; এই উপায়ে ইহারা পৃথিবী হইতে উচ্চ হইতে প্রত্যাশা করিত। একেত আমাদের দেশের জল বায়ুর দোষ লোক-দিগকে যেরূপ কার্য্যে পরাঙ্মুখ করিয়া ফেলে তাহাতে যে এই নিশ্চেষ্ট ধ্যান-প্রধান বেদান্ত মত আমাদের এত হৃদয়গ্রাহী হইবে—তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক, কি সাধু কি অসাধু কি ইতর কি ভদ্র কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর আবাল বৃদ্ধ বণিতার অস্থিমজ্জায় বেদান্তের এই নিশ্চেষ্ট ও ঔদাস্য ভাব প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহাই জাতীয় তৌলযন্ত্রে ভারতবর্ষের ক্রমাবনতির এক প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই নিজের নিজের আত্মা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত এবং পৃথিবীর বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, কাজেই এই হতভাগ্য দেশকে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে শত্রু-পদানত হইতে হইয়াছে। অবশ্য এই দুর্ঘটনাটি আমাদের জল বায়ুর দোষই বলিতে হইবে; কেন না য়ুরোপীয় বৈদান্তিকেরা বেদান্তের এই মতটা গ্রহণ করেন নাই।

বেদান্ত দর্শনের এই মায়াসংক্রান্ত মতটী আমাদের সাধারণ লোকের ভিতর যে রূপ অবস্থাতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া কাহারো আত্মহত্যায় প্রবৃত্তি হয় না কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না; তবে এই এক কারণ আমাদের মনে উপলব্ধি হইতেছে যে, বেদান্তের মত এ নহে যে, শরীর হইতে স্বতন্ত্র হইলেই আত্মা মুক্তি লাভ করে; দেহ হইতে মুক্ত হইলেও যদি দৈহিক সুখের প্রতি আত্মার আসক্তি থাকে তাহা হইলেই সে আত্মা পুনর্জ্জন্মের দায়ে পড়িবে; আর দেহের মধ্যে থাকিয়াও যদি আত্মা দেহাভিমান শূন্য হয় ও পরব্রহ্মের জ্ঞান অপরোক্ষ লাভ করে তাহা হইলেই সে আত্মা জীবন্মুক্তির আনন্দ উপভোগে কৃতার্থ হয়। অবশ্য আত্মা পরমাত্মাকে লাভ করিলে যে অক্ষয় অখণ্ড আনন্দ লাভ করে ইহা অপেক্ষা কোন সত্যই অধিক সত্য নয়। বেদান্তের মতে দেহ এই আনন্দ উপভোগের বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী নহে।

পুনর্জ্জন্মের বিষয় একটুকু বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিতে হইবে। এই দুঃখময় পৃথিবীতে আমাদিগকে প্রেরণ করিবার জন্য অনেকের ঈশ্বরের ন্যায়-পরায়ণতার বিষয়ে সন্দেহ জন্মাইতে পারে বলিয়া, কল্পনা করা হইল যে, আমি পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত দুষ্কৃতির জন্য পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মিয়াছি; আমার নিজের পাপাচরণের শাস্তি ভোগ করিবার জন্যই আমার জন্ম গ্রহণ করা। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ যুক্তির ভ্রম দেখিতে পাওয়া যাইবে। মনে কর, বর্ত্তমান জন্মেই আমি পূর্ব্ব জন্মের পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করিতেছি কিন্তু যখন সর্ব্বপ্রথমে জন্ম হয় অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে, আমি কি পাপের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম? আমার

আত্মা ঈশ্বরের অংশ; অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার দ্বারা কোন পাপ আচরিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না তাহা হইলে ঈশ্বরকেও সেই পাপের অংশ গ্রহণ করিতে হয়—যাহা অসম্ভব। ইহাতে কেহ এইরূপ উত্তর করিতে পারেন যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবী এপ্রকার দুঃখময় স্থান ছিল না। কিন্তু একথাও সারগর্ভ নহে। প্রথমতঃ, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না যাহাতে ওরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। এবং তাহার বিপরীতে আমরা প্রথম প্রস্তাবে প্রমাণ করিয়াছি যে অসীমকে সীমাবদ্ধ করিলেই তাহার দুঃখ উৎপন্ন হয়। আর সৃষ্টি করিতে হইলেই আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবেই; কেন না সৃষ্টি করিতে হইলেই স্রষ্টা ও সৃষ্টের আবশ্যক; এখন সৃষ্ট (আত্মা) স্রষ্টা পরমাত্মার অংশমাত্র, সৃষ্টির পূর্ব্বে উভয়েই এক ছিল পরে সৃষ্টির সময় উভয়ের মধ্যে প্রভেদ উৎপন্ন হইয়াছে অতএব সৃষ্টির সময় আত্মা ও পরমাত্মার একত্বের লোপ হইয়াছে—অসীম আত্মা সীমাবদ্ধ হইয়াছে—কাজে কাজেই আত্মা দুঃখের অধীন হইয়াছে। কোন পাঠক ই,বোধ হয়, ইহা হইতে মনে করিবেন না যে,এখানে আমরা ঈশ্বর সৃষ্টির অভিপ্রায়ের সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতেছি। সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি,আমরা বিশেষরূপ বুঝিতে অক্ষম কিন্তু এরূপ নিশ্চিত বলিতে পারা যায় সে সৃষ্টি ও দুঃখ অবিচ্ছেদ্য। *

এবং আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, আত্মার উন্নতি দ্বারা সৃষ্টিজনিত বাধা অতিক্রম করিয়া চিরস্থায়ী বিশুদ্ধ সুখ লাভ করা আমাদের জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য। যাহা হউক আমরা এখন দেখিতেছি যে যদি সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতায় দোষ পৌঁছায় ত তাহা পুনর্জন্মের অবতারণার দ্বারা রক্ষিত হয় না। পুনর্জন্মকে আমাদের দেশের দর্শনে যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন প্রয়োজন নাই; এবং আমরা উপরে দেখাইলাম যে, পুনর্জন্মের দ্বারা সে কার্য্য সাধিত হইতেছে না। আদৌ পুনর্জন্ম সম্ভব কি না, শক্তি একবার রূপান্তরিত হইলে তাহা আবার পূর্ব্বরূপ ধারণ করিতে পারে কি না—সে সকল বিষয়ের সমালোচনা করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত নহে।

আমরা এখন বেদান্ত দর্শনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া তাহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে যত্নশীল হইব। বেদান্ত দর্শনে বলে যে আত্মা ব্যতীত আর সকলই মায়া। বাহ্য বস্তুর বাস্তবিক কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি যাহাকে আমরা বাহ্য বস্তু মনে করি তাহা আমাদের মনের উপর অন্য এক শক্তির (ঈশ্বরের ইচ্ছার) ক্রিয়ার ফলমাত্র-ইহা কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই আর কোন কালেও যে কেহ ইহার মীমাংসা করিতে পারিবে এরূপ বোধ

* "Unity in Nature" by the Lord Bishop of Carlisle in a recent number of the *Nineteenth Century.*

হয় না। কিন্তু ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই এরূপ সপ্রমাণ হইতেছে না যে বাহ্য বস্তু নাই। সে যাহা হউক যদিও আমরা জ্ঞানের দ্বারা বাহ্য বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না, কিন্তু তথাপি আমাদের মনের গঠন এমনি যে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই এরূপ আমরা ভাবিতে পারি না। যখন "আমি"—এইটা আমি ভাবি, তখনই সেই ভাবনার আর একটা উপকরণ আমার মনে থাকে, এই যে "আমি" ব্যতীত আর কিছু যাহা হইতে "আমি" ভিন্ন। পৃথিবীতে শুধু কেবল একটি বস্তু থাকিলে চিন্তা অসম্ভব হইত—"চিন্তা নিত্য দ্বিত্ববাহিনী।" কোন একটা বস্তু থাক্, আর নাই থাক্, যখন তাহার অস্তিত্বের বিষয়ে আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস আছে তখন আমার পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই আছে। একজন পাগল মানুষ মনে করিত যে তাহার পৃষ্ঠদেশ কাচের দ্বারা নির্ম্মিত—এব্যক্তিকে অপর কোন বিষয়ে কেহ কখন পাগল বলিয়া সন্দেহ করে নাই। চিকিৎসক উক্ত ব্যক্তির সহজ জ্ঞানের দ্বারা এই ভুল ভাঙ্গাইবার জন্য একটু বল পূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠে একটা কঠিন বস্তুর দ্বারা আঘাত করিলেন। পাগল যথার্থই কাচ-নির্ম্মিত পৃষ্ঠদেশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। বিখ্যাত চিন্তাশীল কবি কোলরিজ এইরূপ একটি ঘটনা চাক্ষস করিয়া ছিলেন।* যখন দেখা যাইতেছে যে মানুষের উপর বিশ্বাসের এতদূর ক্ষমতা আছে তখন আমাদের পৃথিবী যথার্থ একটা কিছু এই ভাবিয়াই জীবনযাত্রার নিয়ম স্থির করিতে হইবে। যদি কেহ সম্মুখে প্রস্তর স্তম্ভ দেখিয়া তাহাকে কেবল মায়া-প্রসূত মনে করে এবং সজোরে তাহাতে মস্তক আহত করে তবে অবশ্যই তাহার প্রাণ বিনাশ হইবে। অতএব বিশ্বসংসার মায়া হইলেও একেবারে আমাদের তাচ্ছিল্যের সামগ্রী হইতে পারে না।†

আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবে বলিয়াছি যে মানুষ দুইটি পরস্পর-বিরোধি-স্বভাবাপন্ন পদার্থের সমষ্টি। তাহার মধ্যে একটিকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিয়া শুধু অন্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবন নির্ব্বাহের নিয়ম স্থির করিলে কিরূপ ভ্রমে পড়িতে হয় কতক পরিমাণে উপরে প্রদর্শিত হইল। আমাদের সদা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে আমাদের জন্ম হওয়া কোন একটা ভ্রম হইতে উৎপন্ন নহে, আর কেবল সেই কল্পিত ভ্রম সংশোধন করিতে চেষ্টা করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নহে। পৃথিবীতে আমরা চারিদিকে যাহা পাই আমাদের আত্মা তাহাদের ক্ষমতা হইতে একেবারে স্বাধীন থাকিতে পারে না। সুতরাং আমরা শরীরকে একেবারে চক্ষের অন্তরাল করিয়া ফেলিতে পারি না। যদি আমরা পৃথিবীর সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল

* Coleridge's Table talk—p.97 *et Seq.*

† বিখ্যাত সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকার বলেন যে মূল বেদান্তে মায়ার উল্লেখ নাই—উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কল্পনা।

সন্ন্যাস ধর্ম্মের চর্চ্চা করি তাহা হইলে সম্ভবতঃ পৃথিবীর উপভোগ্য সুখের পরিবর্ত্তে আমরা কেবল হৃদয়ের মধ্যে এক অসহনীয় অভিমানকে পাইব।

ভগবান মনু সকল আশ্রমের উপর গার্হস্থ্য আশ্রমকে স্থাপিত করিয়া নিজের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, যে

"ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

এই শ্লোকটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। ইহাতে মানুষের প্রকৃতি অতি সুন্দররূপ বুঝিয়া মানুষকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দেওয়ান হইয়াছে। মনু বুঝিয়াছিলেন যে জ্ঞানকে সহায় করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিলে তাহাতে আত্মার উন্নতি ব্যতীত অবনতির কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি আরো বুঝিয়া ছিলেন যে একেবারে আধ্যাত্মিক বিষয়ে অন্ধ হইয়া কেবল পৃথিবীর সুখের অনুসন্ধানে অনুরক্ত থাকিলে আত্মার যতদূর সম্ভব অবনতি হইবেই হইবে এবং পৃথিবীকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেও যে কি কি দোষের উৎপত্তি হয় তাহাও তিনি বিশেষরূপ বুঝিয়া ছিলেন। সেই জন্য তিনি বলিয়াছেন যে মনুষ্য গৃহস্থ হইবে এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণও হইবে। পৃথিবীতে লোককে দুঃখ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না; দুঃখ আত্মার উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক এবং অযাচিত হইয়াও সকল স্থানেই তাহা উপস্থিত হইবে। প্রথম প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে যে জীবনের সত্তা ও দুঃখের সত্তা অবিচ্ছেদ্য। সংসার ত্যাগ করিয়া দুঃখের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলে কেবল কষ্ট ভোগই সার হয়। মনুর আদেশের অর্থ এই যে যদি আমরা তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থিতি করি তাহা হইলে পৃথিবীর সুখে স্বর্গের সুখের ছায়া দেখিতে পাইব এবং পৃথিবীর দুঃখ ভোগ করিয়া মানুষের আত্মা স্বর্গের উপযুক্ত হইবে।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে আমার ঝগড়াটা নিতান্তই চল্‌ল দেখ্‌চি। কিন্তু সে ত এক প্রকার সুখেরি বিষয়। বিষয়টা গুরুতর; সে সম্বন্ধে দু পক্ষের মতামত ব্যক্ত হোয়ে একটা আন্দোলন হওয়াই প্রার্থনীয়। কিন্তু কথাটা যতই গুরুতর ও সারবান হোক্ না, আমার গলার দোষে মারা যায় বা! অর্থাৎ সম্পাদক মহাশয় পাছে তাঁর অত্যুচ্চ অট্টহাস্যের প্লাবনে আমার ক্ষীণ-কণ্ঠের কথাগুলো একেবারে ভেঙ্গে চুরে, উল্‌টে পাল্‌টে, তোল পাড় কোরে ভাসিয়ে নিয়ে যান, কথাগুলো একেবারে পাঠকদের কানে ভাল কোরে না পৌঁছোয়! এখেনে একটা

সেখেনে একটা তাঁর ছুঁচোলো নোটের হাস্য-বিষাক্ত খোঁচা খেয়ে খেয়ে আমার গরীব ভাল মানুষ মত গুলি প্রানের দায়ে উর্দ্ধশ্বাসে দেশ ছাড়া হয় বা! পাঠক মহাশয়েরা আমার কথাটা একবার অবধান করুন; আর কিছু নয়, লেখক মহাশয় আমার কথাটা আপনাদের ভাল কোরে শুনতে দিচ্চেন না। আমি একটি কথা বোল্‌তে মুখ খোল্‌বার উপক্রম কোরেছি কি, অমনি তিনি দশটা কথা কোয়ে একটা ঘোরতর কোলাহল উত্থাপন কোরেছেন, আর আমার কথাটা একেবারে মাথা তুলতে পারে নি। পাঠক মহাশয়েরা যদি এক পক্ষের কথা শুনতে না পান ও গোলেমালে একটা ভুল বুঝে যান্ তবে বড় দুঃখের বিষয় হবে।

লেখক মহাশয়ের নোটের বিরুদ্ধে আমার প্রধান নালিশ ছিল এই যে, আমি যে কথা বলিনি, সেই কথা আমার মুখে বসানো হোয়েছে। তার উত্তরে তিনি বলেন যে, "লেখক কি ভাবে কি কথা বলিয়াছেন তাহার প্রতি তত আমাদের লক্ষ্য নহে যত পাঠকেরা তাঁহার কথা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহার প্রতি!" দোহাই পাঠক মহাশয়দের, আমি এক কথা বোল্লে আপনারা আর এক কথা যদি শোনেন তবে আমি গরীব মারা যাই কেন? আমি যদি বলি, বিশ্বম্ভর দাদার দুই পা আর আপনাদের মধ্যে কেউ শোনেন, বিশ্বম্ভর দাদার চার পা, তা হোলে যদি সম্পাদক মহাশয় আমার চুলের ঝুটি ধোরে বিধি মতে নিগ্রহ করেন, ও দশটা শাস্ত্র থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত কোরে, দশ জন পশু-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মত নিয়ে আমাকে দশ ঘণ্টা ধোরে গম্ভীর ভাবে বোঝাতে আরম্ভ করেন যে, বিশ্বম্ভর দাদার দুই পায়ের অধিক পা হবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নেই; শুদ্ধ তাই নয়, তাই নিয়ে হাসি টিট্‌কিরি কোরে, ঠাট্টা মস্‌করা কোরে দশ জন ভদ্র লোকের কাছে আমাকে বিধি মতে অপদস্থ করেন যদি, তবে আমি সহ্য করি কি কোরে বলুন দেখি? শাশুড়িরা যে ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেন, তাতে যে অনেক সময়ে অনেক উপকার হয় সে বিষয়ে আমি দ্বিরুক্তি করিনে, কিন্তু আপনারা কি অস্বীকার কোর্ত্তে পারেন যে, উপকারটা বউয়ের হোক কিন্তু যদি কারু পিঠে বেদনা হয় ত সে ঝিয়েরি! আচ্ছা ভাল—আমার পিঠ বেকার অবস্থায় পোড়ে আছে, আর সম্পাদক মহাশয়ের মুষ্টির যদি আর কোন কাজ না থাকে তবে আমার নিরীহ পিঠের ওপর যথেচ্ছাচার করুন কিন্তু এটা যেন মনে থাকে, সে কিল গুলো প্রাপ্য আপনাদের, * কেবল সম্পাদক মহাশয়ের অপূর্ব্ব

* "মোকদ্দমার শুনানির দিন বিচারকের নিকট বাদী যদি এরূপ কতকগুলি কথা বলেন যে, তলাইয়া দেখিলে তাহার মধ্যে অনেক গুলি মার্-প্যাঁচ দেখিতে পাওয়া যায়; আর যদি প্রতিবাদী বিচার কর্ত্তাকে সেই গুলি খুলিয়া দেখান, তাহা হইলে বিচারালয়ের প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশ হেতু তাহাকে

বিচারে সে কিল ভার যিশুখৃষ্টের মত আপনাদের হোয়ে সমস্ত আমাকেই বহন কোরতে হোচ্চে!

লেখক মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা বিবাদ ছিল এই যে, তিনি স্বাধীনতা অর্থে বেহায়ামো, অবিনয়, অসরলতা, উচ্চের প্রতি অভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অদয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি ঠাউরেছেন কেন? তার উত্তরে তিনি যা' বলেন, তার ভাবটা হোচ্চে এই যে, পাছে পাঠকেরা তাই ঠাউরে থাকেন, এই কারণ বশতঃ আর কিছু নয়! কিন্তু আমার অপরাধ? তাঁর ভাসাটা উদ্ধৃত কোরে দিই। "লেখক বিলাতি বিবিদের চাল চোল ধরণ ধারণের আনুষঙ্গিক রূপে স্ত্রী স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, এজন্য বিলাতানভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকের মনে এইরূপ একটা কুসংস্কার জন্মিতে পারে যে, কার্য্যতঃ স্ত্রীস্বাধীনতা আর কিছু নহে, কেবল বিবিদিগের চাল চোল ধরণ ধারণ ইত্যাদি। ইহা একটি লোক-বিখ্যাত বিষয় যে, বিবিদের Shoppingএর জ্বালায়, নির্দোষ (?) আমোদাসক্তির জ্বালায়, তাহাদের স্বামীরা ধনে প্রাণে মারা যায়, অথচ স্ত্রীস্বাধীনতার একটু কোথাও পাছে আঁচড় লাগে, এই ভয়ে তাঁহারা সকল অত্যাচার ঘাড় পাতিয়া ল'ন, সকল বিষ হজম করিয়া ফেলেন।" ইত্যাদি। এর থেকে অনেক কথা উঠ্‌তে পারে। প্রথমতঃ সম্পাদক মহাশয় তা হোলে এই কথা বলেন যে, বিবিদের চাল্ চোল্ ধরণে অবিনয়, অসরলতা, বেহায়ামো, উচ্চের প্রতি অভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অদয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ পায়; দ্বিতীয়তঃ যেন আমি বিবিদের অবিনয়, অসরলতা, বেহায়ামো প্রভৃতির আনুষঙ্গিক স্বরূপেই স্ত্রী স্বাধীনতা উল্লেখ কোরেছিলুম? সম্পাদক মহাশয় যে কেন বলেন, বিবিরা অবিনয়ী, অসরল, উচ্চের প্রতি তাদের ভক্তি নেই, নীচের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য নেই তা' সম্পাদক মহাশয়ই জানেন; এক মাত্র Shoppingএর উদাহরণ দিয়ে তিনি ইংরেজ-মহিলাদের স্কন্ধে অত গুলো পাপের বোঝা চাপিয়েছেন। আমি ইংলণ্ডে যতই বেশী দিন থেকেছি ততই সেখানকার ইংরেজ পরিবারের মধ্যে ভাল কোরে মিশেছি; আমি যতদূর জানি তাতে একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি (অনেক পাঠক মহাশয়ের অযথা দেশানুরাগে হয় ত আঘাত লাগ্‌তে পারে) যে, সম্পাদক মহাশয় ইংরাজ-মহিলাদের প্রতি যতগুলি দোষারোপ কোরেছেন তার কোনটা সত্য নয়। কোন ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ অভিধানে যদি বিনয় অর্থে যথাসাধ্য কথার উত্তর না দিয়ে ঘোমটা টেনে সঙ্কোচে নিতান্ত ম্রিয়মান হোয়ে বোসে থাকা না হয়, তা' হোলে ইংরেজ ভদ্র মহিলারা বিনয়ের আদর্শ। ইংরাজ পরিবারের মধ্যে এমন কত শত বালিকা

কি দণ্ডনীয় হইতে হয়? প্রতিবাদী জজের নিকট কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে বলিয়াই কি সে ফরাকাবাদের হরসহায়! সং

(আমাদের দেশের পূর্ণ-যৌবনা) দেখা যায় যারা সরলতার প্রতিমা, যারা তুষারের মত, নিজের শুভ্র ললাটের মত নিষ্কলঙ্ক; নিষ্কলঙ্ক অর্থে শুদ্ধ কার্য্যতঃ নিষ্কলঙ্ক নয়, তাদের মন বিশুদ্ধ; ছেলেবেলা থেকে তা'দের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস স্ফূর্ত্তি পেয়েছে, দাসীদের কাছ থেকে বা অসৎমনা সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে বিয়ের কথা, বরের কথা, সংসার ধর্ম্মের কথা বা কোন রকম অসৎ কথা একটিমাত্র শোনেনি; সর্ব্বদা হাস্যোচ্ছ্বাসময়ী। উচ্চের প্রতি ভক্তি মত্তা যদি বল তবে তা ইংলণ্ডে যেমন আছে, এমন অন্যত্র সচরাচর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যেখেনে Carlyleকে গাড়ি চোড়ে যেতে দেখ্‌লে কত শত রাস্তার লোক টুপি খুলে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটেছিল; যেখানে কোথায় Shakespeare একটা গাছ পুঁতেছিলেন, কোথায় Addison এর একটা চৌকি আছে, সে সমস্ত, লোকে একেবারে তীর্থস্থান কোরে তুলেছে; যেখেনে একজন কবির পাণ্ডুলিপি, একজন খ্যাত ব্যক্তির নিজের হাতের নাম সই পেলে লোকে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে, সেখেনে উচ্চের প্রতি ভক্তি-মত্তা নেই কি কোরে বোলব; আর সেই উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা হোতে সেখানকার স্ত্রীলোকেরাই যে, বিশেষ বঞ্চিত এমন নয়? একথার উত্তর তেমন আর কিছু হোতে পারে না যেমন, একটিবার বিলেতে যাওয়া। কেননা আমি বলব 'না,' সম্পাদক মহাশয় বোলবেন 'হাঁ' আবার আমি বোলব 'না' আবার তিনি বোলবেন 'হাঁ;' এমন কোরে যতক্ষণে না হাঁপিয়ে পড়া যায় ততক্ষণ। হয়ত 'হাঁ' 'না" চালানো যেতে পারে। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ এ বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়ের আমার চেয়ে ঢের বেশী অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং এমন স্থলে আমার চুপ কোরে থাকাই শাস্ত্র-সম্মত; কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের মতে যা'ই হোক্ আমি কখনো বিবিদের অবিনয়, অসরলতা ইত্যাদির আনুষঙ্গিকরূপে স্ত্রী-স্বাধীনতার উল্লেখ কোরেছি কি না সেইটি বিবেচ্য স্থল। বিলেতে নিমন্ত্রণ-সভায় স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করে, একটা নতুন ভাল বই উঠলে সে বিষয়ে পরস্পর আপনাদের মতামত ব্যক্ত করে, একটা নতুন যন্ত্র উঠ্‌লে গৃহকর্ত্তা তাই নিয়ে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে দেখান, গৃহকর্ত্রী রোমে গিয়েছিলেন সেখানকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের যে সকল ফোটগ্রাফ নিয়েছিলেন তাই দেখিয়ে সকলকে আমোদে রাখেন ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপলক্ষে কথায় কথায় আমি স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করি; এর থেকে যদি কোন বিলাতানভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে কোরে থাকেন যে, Shoppingকরাকেই স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে, বা বিলাতের মহিলারা যা কিছু মন্দ-আচরণ করেন (সত্যই হোক্ আর জন-শ্রুতিই হোক্) তারই নাম স্ত্রী-স্বাধীনতা, তাহোলে (বেয়াদবি মাপ কর্ব্বেন) তাঁদের মস্তিষ্কের দোষ জন্মেছে একথা স্বীকার কোর্ত্তেই হয়।

সত্য সত্য যা কিছু দোষ করি একে ত তার জন্যই আমরা ইহকালে পরকালে দায়ী কিন্তু যে দোষ করিনি তার জন্যেও যদি কৈফিয়ৎ দিতে হয় তা' হোলে সংসারের পায়ে গড় করি! সম্পাদক মহাশয় মহা খাপা হোয়ে চক্ষু রাঙিয়ে বোলচেন; "য়ুরোপ ভিন্ন আর কোথাও যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই এমন নহে—জাপানে আছে, বোম্বাইয়ে আছে, কিন্তু সে সকল নিয়ে আন্দোলন করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে—সর্ব্বদেশসম্মত স্ত্রী-স্বাধীনতার বিশুদ্ধ আদর্শ নিয়ে আলোচনা করাও লেখকের উদ্দেশ্য নহে, ইংলণ্ডে যেরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত তাই যা' কেবল লেখকের এক মাত্র আলোচ্য বিষয়; এরূপ যখন—তখন ইংলণ্ডের প্রচলিত স্ত্রী-স্বাধীনতা যে কি ভয়ানক বস্তু তাহা যে শত সহস্র স্থানে নামে স্বাধীনতা কাজে স্বৈর-চারিতা—লেখক সে সকল কথার উল্লেখ না করাতে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে বিবিদের অনুকরণ করিলেই আমাদের কুল-রমণীরা স্বাধীনতা পথে বিচরণ করিতে পারিবেন।" ইংলণ্ডে ধান ভান্‌তে গিয়ে আমি জাপানের বা বোম্বায়ের শিবের গান তুলব, সম্পাদক মহাশয় যদি কখনো এরকম আশা কোরে থাকেন, তাহোলে বলা বাহুল্য আমার মত প্রকৃতিস্থ লোকের কাছে সে আশা করা দুরাশা! আমি চোখে চষমা এঁটে, চাপকান পোরে, জগতের অজ্ঞান-তিমির-মোচন আমার নিতান্ত মহামূল্য মতগুলি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠকদের বিতরণ করছিলুম না; আমি বৈঠকখানায় বোসে তামাক খেতে খেতে পাঠক মশায়দের সঙ্গে দুদণ্ড গল্প স্বল্প করছিলুম। একটা গল্প থেকে আর একটা গল্প ওঠে! একটা নিমন্ত্রণ-সভা বর্ণনা কোরে হঠাৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা আমার মনে এল, সে বিষয়ে আমার যা' কিছু বক্তব্য ছিল সব বোলে ফেল্লেম। আমার সে বক্তব্যের মধ্যে ইংলণ্ডের স্ত্রী-স্বাধীনতার উল্লেখমাত্র ছিল না, আর, সত্যের খাতিরে সম্পাদক মহাশয়ের কাছে নিতান্ত লজ্জার সহিত স্বীকার কোরতে হোচ্চে, জাপানের ও বোম্বায়ের স্ত্রী-স্বাধীনতা আমার মনেও আসেনি! মনে আসেনি! অপরাধ হোয়েছে বটে! তা' সম্পাদকীয় বেত্রাঘাতে মনে না আস্‌বার জন্যে যথেষ্ট শাস্তিও পেয়েছি। আচ্ছা, না হয়, এবার থেকে আমি যখনি স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা ভাব্‌ব, তখনি জাপান ও বোম্বায়ের কথা মনে কোরতে ভুলব না। সে কথা যাক্, আমার মত হোচ্চে এই—যে, বুট জুতো পরাকেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না, গৌণ পরাকেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না, আর মটন দিয়ে রাই খেলেও স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যত্যয় হয় না। যদি কোন পাঠক এমন বুঝে থাকেন যে, বিবিরা যা' করে তা'ই স্ত্রী-স্বাধীনতা, ও সেই জন্যে আমার প্রতি মহা রুক্ষ হোয়ে থাকেন, তা'হোলে তাঁকে আমার বিনীত-নিবেদন এই যে, এই ভুল-বোঝা সম্বন্ধে যদি কারু কোন দোষ থাকে ত সেটা তাঁর বুদ্ধির! তাঁর কানের যদি এমন একটা সৃষ্টি ছাড়া রোগ, হোয়ে

থাকে যে, যা তাঁকে বলা যায়নি তা তিনি শোনেন, তা'হোলে সে কান দুটো যতক্ষণে না বিশেষরূপে মেরামত করা হয় ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে আমার মত লেখক কোন এলাকা রাখেন না! যাহোক্—আমি যদি বলি যে, ইংরাজ বিবিয়ানাকে স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না (কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলি, জাপান-বিবিয়ানা বা বোম্বাই-বিবিয়ানাকেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না) তা হোলেই বোধ করি সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে ও সম্বন্ধে আমার বিবাদটা চুকে গেল। কেননা সম্পাদক মহাশয় এক প্রকার স্বীকারই কোরেচেন যে বিবিদের বিষাক্ত (!) অশোভন (!!) স্বাধীনতা পরিত্যাগ কোরে যদি "নির্ব্বিষ শোভন" স্বাধীনতা লেখক প্রচার করেন তা'হোলে তিনি তা' আদরের সহিত গ্রহণ কোর্ব্বেন। অনর্থক একটা ভুল বোঝা'র দরুণ গোড়াতেই তিনি তা' কোরতে পারেন নি; ভাল এখন ত সব মিট্‌মাট হোয়ে গেল তবে এখন স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক স্বাগত সম্ভাষণ কোরে আমার মতটিকে আদরের সহিত ঘরে নিয়ে যাওয়া হোক্—দরজা থেকেই হাঁকিয়ে না দেওয়া হয়!

সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে সাধারণ বিষয়ে ত এক রকম ঐক্য হোল, এখন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এমনি ভালয় ভালয় মতের মিল হোয়ে গেলে বড় খুসী হওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় ত বোল্লেন, "নির্ব্বিষ" স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে তাঁর কোন মনান্তর নেই; এখন কাকে তিনি "নির্ব্বিষ স্ত্রী-স্বাধীনতা" বলেন, সেইটে মীমাংসা হোয়ে গেলেই আর অধিক বক্তব্য থাকে না। সম্পাদক মহাশয়ের লেখা দেখে বোধ হয়, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে আলাপ মাত্র হওয়া তাঁর মতে প্রার্থনীয় নহে, (১) কেননা "তাহাতে পাছে কুলোকে কুভাবে; সুলোকে কুভাবে ও স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়।" তা' যদি হয়, তা'হোলে বাইরের কিছু দেখবার জন্যে মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে বের হওয়াও প্রার্থনীয় নয় কেননা পাছে তাতে কোরে "কুলোকে কুভাবে, সুলোকে কুভাবে, ও স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পাবার কোন কারণ ঘটে! (২)

---

১ ইহা কোন কালেই আমাদের অভিপ্রেত নহে,—আমরা প্রখর স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী—এই পর্য্যন্ত। প্রখর স্ত্রী-স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। সং

২ আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই সুতরাং স্ত্রী-স্বাধীনতাকে কতরূপে যে মারপাঁচ হইতে বাঁচাইয়া চলিতে হয় সে-বিষয়েও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই, এমত স্থলে যদি "স্ত্রী-স্বাধীনতা চাই-ই-চাই" এই ভাবটি তাঁহাদের মনের ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে খেপাইয়া তোলা হয়, তবে যাঁহারা ঐ মতানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতার যে একটি ভাল আদর্শ আছে তাহা অমান্য করিয়া প্রখর-স্ত্রী-স্বাধীনতার দিকেই আপনাদের সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি বল পৌরুষ প্রয়োগ করিবেন ইহা সম্ভব বোধ হয়; এই জন্য আমরা বলিতে চাই যে, যখনই স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে মেলা মেশার কথা উত্থাপন করা হয়, তখনই এই বিষয়ে পাঠককে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে,

তা' হোলে দাঁড়াচ্চে এই যে 'আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তা'ই "নির্ব্বিষ" স্বাধীনতা। কেন, তাঁদের ত নিশ্বাস ফেলবার স্বাধীনতা আছে, সেটা একটা "নির্ব্বিষ স্বাধীনতা ;" হাই তোলবার ও পান সাজবার স্বাধীনতা আছে, সেটা আর একটা "নির্ব্বিষ স্বাধীনতা ;" আহার করবার স্বাধীনতা আছে, যদি কেউ আড়ি কোরে তা'তে বিষ না মিশিয়ে দেয়, তাহোলে সেটাও একটা "নির্ব্বিষ স্বাধীনতা!" তা'হোলে ত আমাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল, আর কিছু করবার নেই। কিন্তু সেইটে গোড়ায় বোল্লেই ত হোত। এটা কি রকম হোল জান? করুণরসে নিতান্ত উচ্ছসিত হোয়ে একজন গরীবকে বলা হোল, "আমার পকেটে যা' আছে বাপু, সব তুই নে!" অথচ পকেটে একটি সিকি পয়সা মাত্র নেই। ভাগ্যি ছিল না, তাইত এতটা করুণ রসের কথা শোনা গেল। "পাছে কুলোক কুভাবে, ও সুলোক কুভাবে এই জন্যেই কোন স্ত্রীলোকের কোন পরপুরুষের সহিত মেশা অবৈধ" এর চেয়ে অযৌক্তিক কথা সচরাচর শোনা যায় না। এমন কি কাজ করা যেতে পারে যা' কুলোকে কু না ভাবতে পারে, এমন কি, সুলোকের কু ভাবতে আটক-নাই থাকে। বল না কেন, আহার করা অবৈধ; দুধেতে প্রসিক আসিড মেশানো থাকতে পারে, মাছের ঝোলে খানিকটা আফিম গোলা থাকতে পারে, আর ভাতের মধ্যে খানিকটা ষ্টোর্ক্নেল থাকাও নিতান্ত অসম্ভব নয়। যদি সম্পাদক মহাশয় বোলতেন, পরপুরুষের সঙ্গে এমন কোরে মেশা কর্ত্তব্য নয় যা'তে কোরে সাধারণতঃ প্রকৃতিস্থ লোকে স্বভাবতই কু-ভাবতে পারে সে এক স্বতন্ত্র কথা হোত, কিন্তু পাছে লোকে কু ভাবে এই জন্যে একেবারে পর পুরুষের সঙ্গে মেশাই কর্ত্তব্য নহে এ যে বড় ভয়ানক কথা! যদি বল এমন স্থলে সাবধানে আহার করা উচিত, যেখানে খাদ্যে বিষ থাকবার যথার্থ সম্ভাবনা আছে, তা হোলে কথাটা মানি, কিন্তু খাদ্যে বিষ থাকা অসম্ভব নয় বোলে আহার বন্ধ কোর্ত্তে পরামর্শ দিলে আর যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা' পালন করুন না কেন আমি করিনে। (৩) পাছে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়," এ সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত কথাটা খাটে; অর্থাৎ পর-পুরুষের সহিত যদি এমন কোরে মেশা যায়, যা'তে কোরে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পাবার সম্ভাবনা থাকে তা হোলে তার থেকে হানি হোতে পারে, নতুবা নয়! সম্পাদক মহাশয় বলেন "স্বামীর হয়ত এইরূপ একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত আছে যে, পরপুরুষের

স্ত্রীস্বাধীনতা মাত্রা অতিক্রম করিলে তাহা ঘোরতর বিষাক্ত হইয়া উঠে। সং

৩ স্ত্রী-স্বাধীনতা মাত্রা অতিক্রম করিলে তাহা দোষাক্রান্ত হয় ইহা লেখক স্বীকার করেন সে মাত্রা যে কতটুকু তাহা গড়ে জন সাধারণে বিদিত আছে—তাহার কোন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্ভবে না। সং

সহিত স্ত্রীলোকের এইটুকু মেলামেশাই ভাল তাহা অপেক্ষা বেশী ঘনিষ্ঠতা ভাল না, যে স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসে সেই স্ত্রী সেই মাত্রাটি অতিক্রম করিয়া স্বামীর মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হইবে না ত কে হইবে ?" সত্যইত! সচরাচর ত এমন হো- য়েই থাকে। Jealous স্বামীরা পাছে মনে আঘাত পায় এই জন্যে ত য়ুরোপে অনেক হতভাগ্য রমণী ইচ্ছা কোরেই হোক বা শাসন-ভয়েই হোক্ সমাজে মেশে না। এখানেও অনেক সময়ে তাই ঘোট্‌বে। রমণীদের জীবন পর্য্যন্ত যখন স্বামীর ওপর নির্ভর করে তখন স্বামীর মন যুগিয়ে চল্‌বার জন্যে প্রাণ-পণ কোর্‌তে ভালবা- সায় না হোক্ দায়ে প্োড়ে হয়। সম্পাদক মহাশয় বলেন "সে মাত্রা (মেলা মেশার মাত্রা) কতটুকু স্বামীই তাহা জানে, স্ত্রী তাহা জানে না ; " সে কি কথা ? স্ত্রী তাহা জানে না এমনো হয় ? হোতে পারে, কোন স্ত্রী-বিশেষ কোন স্বামী-বিশে- ষের মনের ভাব ভাল কোরে বুঝতে পারে নি ; কি করা যাবে বল ? তার জন্যে তা'কে কষ্ট সইতেই হবে। কিন্তু তাই বোলে চুলটা কাট্‌তে মাথাটা কাট্‌বে কে বল ? দু চার জনের জন্যে সকলে কষ্ট পাবে কেন ? অন্তঃপুর-বদ্ধ এমন ত অনেক স্ত্রীলোক আছে যারা স্বামীর মনের ভাব ভাল কোরে আয়ত্ত কোর্ত্তে পারে নি বোলে পদে পদে কষ্ট পায়, তবে কি তুমি বিবাহটা একেবারে উঠিয়ে দেবে! অতএব কথা হোচ্চে এই যে, পর পুরুষের সহিত এমন কোরে মেশা উচিত নয় যা'তে কোরে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায় ও সাধারণতঃ প্রকৃতিস্থ কুলোক বা সুলোকে ন্যায্য-রূপে কু ভাব্‌তে পারে। এতেও একটা "কিন্তু" আছে। লোকের কু ও সু ভাবা অনেক সময়ে আবার দেশাচারের ওপর নির্ভর করে। এক জন স্ত্রীলোক অতি ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে সাড়ি পোর্‌লে কুলোকেও কু ভাবে না, সুলোকেও কু ভাবে না, স্বামীর মনেও কু আশঙ্কা স্থান পায় না, কিন্তু সে যদি সেই ফিন্‌ফিনে সাড়িতে দৈবাৎ ঘোম্‌টা দিতে ভুলে যায়, তা হোলে কুলোকেও কু ভাবে, সুলোকেও কু ভাবে, আর স্বামীর মনেও হয়ত কু-আশঙ্কা স্থান পায়! অতএব নির- র্থক দেশাচারের পান থেকে একটু চুন খোস্‌লে যদি কু বা সুলোকে কু ভাবে, তা' হোলে সেটা গ্রাহ্য করা যাবে না। আজ আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে খোলা গাড়িতে একটু হাওয়া খেয়ে এলুম বোলে যদি লোকে কু বলে তা' তারা বলুক, কিন্তু যদি আমার স্ত্রী কোন একক পুরু- ষের বাড়িতে সমস্ত দিন বা রাত্রি যাপন কোরে আসে, তা হোলে লোকে যদি কু ভাবে তা হোলে সে কু ভাবাকে যথার্থ একটু সমীহ কোরে চোল্‌তে হয়!

সম্পাদক মহাশয় নানা উদাহরণ প্র- য়োগ কোরে, রাজকীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে যা বোল্লেন, সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতের ঐক্য হয়। উদ্ধত, গর্ব্বিত, বিকৃত নীচ-স্বভাব অ্যাঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ানরা আমাদের

যে রকম নীচু নজরে দেখে, তাঁ'রা যে আপনাদের স্বজাতি-প্রচলিত গেল্যান্‌ট্রি আমাদের পুরস্ত্রীদের প্রতি প্রয়োগ না কর্‌বে তা' আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তা'তে বিশেষ কি এল গেল? স্ত্রী পুত্র পরিবার সমেত লাঙ্গুল নাড়্‌তে নাড়্‌তে একটা গর্ব্বস্ফীত অ্যাঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ানের পা চাট্‌তে যাবার প্রয়োজন কি? অধীনতার প্রতি আমাদের যে রকম অনুরাগ, খোসামোদ আমাদের যে রকম উপজীব্য হোয়ে উঠেছে, তা'তে হয়ত আমাদের অনেকে স্ত্রী কন্যাগণকে স্বচ্ছন্দে এক জন শ্বেত-বদনের কাছে নিয়ে যাবেন, যদিও হয়ত নিজের কৃষ্ণ-চর্ম্ম বন্ধুর কাছে বের কোর্‌তে কুণ্ঠিত হবেন! সে রকম স্থলে তাঁরা ঠেকে শিখ্‌বেন। যদি আপনাদের নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করবার বল না থাকে তা হোলে না হয় ট্রেণে প্রভৃতি যাবার সময় বন্ধ সন্ধ কোরে নিয়ে যাবেন, অ্যাঙ্গ্লোইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে সহস্র হস্ত দূরে থাক্‌বেন। আমি বলি কি, আমাদের আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষে পরস্পর মেলা-মেশা আলাপ-পরিচয় হোক্। নিমন্ত্রণ সভায় স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকুন! যেখানে নানা প্রকার বিষয় আলোচনা চোল্‌চে সেখেনে তাঁরাও যোগ দেন। এই প্রকারে সঙ্কীর্ণ-স্থান-বদ্ধ তাঁদের কুঞ্চিত মন বিস্তার লাভ করুক্, স্বাধীন মুক্ত বায়ু সেবনে স্বাস্থ্য উপভোগ করুন।

ক্রমশঃ।

শকুন্তলা সমালোচনার সমালোচনা।

শকুন্তলার চরিত্র-সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন—

"আমরা বলিয়াছি যে রাজার চরিত্র সম্বন্ধে কালিদাসের কোন দোষ ঘটে নাই কিন্তু শকুন্তলার স্বভাব বর্ণনাতে তাঁহার ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে দুষ্যন্ত রাজার বেলায় কালিদাসের গুণ যা কিছু দেখা যায় তাহা প্রকৃত পক্ষে গুণ নহে তাহা দোষের অভাব মাত্র, কিন্তু শকুন্তলার বেলায় তিনি একেবারে ঢলাইয়াছেন—কি আক্ষেপ! লেখক বলিতেছেন—

"শকুন্তলা অতি সরল-স্বভাবা ও স্নেহময়ী কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি লঘু।"

লেখকের এ কথাটি সর্ব্বতোভাবে সত্য না হউক্—কতকটা সত্য ইহাতে আর ভুল নাই—এইটুকু সত্য যে, শকুন্তলা ধৈর্য্যে বসুমতী নয়, গাম্ভীর্য্যে রত্নাকর নয়, বিজ্ঞতায় নবদ্বীপের টোলাধিপতি নয়—সে বেচারী একটি বনের ফুল—নূতন বসন্তের

বাতাস লাগিয়াছে তাই একটু বিচলিত হইয়াছে—এই তার অপরাধ! লেখকের হইয়া কেহ বলিতে পারেন যে, শকুন্তলার চরিত্র যেমন লঘু, তাহার ও-অপরাধটি তেমনি গুরু, কিন্তু শকুন্তলার হইয়া আমরা এইটুকু বলিতে ইচ্ছা করি যে, সে বেচারী দুষ্যন্ত রাজার বিচারে যথেষ্ট দণ্ডিত হইয়া শেষে নির্দ্দোষী সাব্যস্তে খালাস পাইয়াছে—তাহার চরিত্র-বিষয়ে কোন্ কালে একটা যে দোষের কথা উঠিয়াছিল সমস্তই চুকিয়া গিয়াছে—এখন ভারতে বিদিত যে শকুন্তলার বাস্তবিক কোন চরিত্র-ঘটিত দোষ ছিল না, প্রত্যুত শকুন্তলা "মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া," তবে কেন পুনরায় আবার সে বেচারীকে বিচার-কর্ত্তার হুজুরে হাজির করিয়া এমন সুকুমার পুষ্পটির উপর এই এক নিদারুণ বজ্রাঘাত করা হয় যে, "তাহার প্রকৃতি অতি লঘু;" স্ত্রী-লোকদের লঘু-প্রকৃতি বড় ত ভাল কথা নহে; তবে যদি "লঘু-প্রকৃতি" শব্দটির অর্থ এরূপ হয় যে সে প্রকৃতি প্রেমের বশে পড়িলেই তাহাতে বিকৃতি উপস্থিত হয়, তা' যদি বল তবে প্রেমাসক্ত চিত্ত লঘু ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না; এ বিষয়ে সেক্স্পিয়রের রোমীও কি বলিতেছেন শোনা হোক্

"*Romeo.* with love's light wings did
I o'erperch these walls."

লেখকের বিচার-নৈপুণ্যের বিশেষ একটি চমৎকারিতা এই যে, তিনি করিতে চা'ন একটি—হইয়া দাঁড়ায় আর একটি—অথচ তাহাতে তাঁহার ভ্রুক্ষেপ নাই যথা,—তিনি প্রথমে বলিয়াছেন "শকুন্তলার স্বভাব বর্ণনাতে তাঁহার (কি না কালিদাসের) ত্রুটি হইয়াছে।" কেমন যে ত্রুটি হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন যে, "শকুন্তলা অতি সরলস্বভাবা ও স্নেহময়ী কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি লঘু" ইহাতে পাঠকের অবশ্য মনে হইতে পারে যে শকুন্তলার ঐ যে লঘু প্রকৃতি উহা একটা অতি বিশ্রী সামগ্রী; কিন্তু লেখক তাহার পরেই বলিতেছেন—না—তাহা নহে—শকুন্তলার লঘু-প্রকৃতি হওয়াই স্বাভাবিক; লেখকের অভিপ্রায় কালিদাসের ত্রুটি প্রদর্শন করা, কিন্তু ভুল-ক্রমে কালিদাসের বিচক্ষণতা দর্শন করিয়া ফেলিয়াছেন, যথা—

"রাজাকে দেখিবা-মাত্র শকুন্তলার মনে তপোবন-বিরোধী এক ভাব উদিত হইল। ইহাতে আমরা কোন দোষ দেখিতেছি না কারণ ইহা অসম্ভব নহে এবং ইহা দ্বারা শকুন্তলার সরলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সরলা বালার হৃদয় অতিশয় কোমল, তাহাতে প্রেম শীঘ্রই বদ্ধমূল হইয়া থাকে। এখানে আমরা ফর্ডিন্যাণ্ড ও মিরাণ্ডার কি ঘটিয়াছিল তাহা স্মরণ করিব। মিরাণ্ডা ফর্ডিন্যাণ্ডকে দেখিয়াই একবারে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল,(১)। শকুন্তলার স্বভাব প্রায় মিরা-

(১) ভাগ্যে ফর্ডিনাণ্ড প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল—তাই রক্ষে, নহিলে শকুন্তলার ঐ বিষয়টি—অর্থাৎ যে দেখা আর সেই প্রেমে মজিয়া যাওয়া ব্যাপারটি—তাঁহার

ণ্ডার মত, পর্ডিটার মতও বলা যাইতে পারে (২)। বস্তুতঃ শকুন্তলা, মিরাণ্ডা, পর্ডিটা ইহাদের তিন জনেরই স্বভাব ও অবস্থা এক প্রকার। শকুন্তলা জন্মাবধি ঋষিদের কর্ত্তৃক তপোবনে প্রতিপালিতা ; মিরাণ্ডাও শৈশবাবধি তাহার ঋষিকল্প পিতা প্রস্পেরো কর্ত্তৃক লালিতা, এবং পর্ডিটা অতি সরলচিত্ত রাখালদের গৃহে আজন্ম কাল বর্দ্ধিতা হইয়াছিল। আবার আরও একটী চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে, তিন জনেই উচ্চ বংশোদ্ভবা, কিন্তু তিন জনই হীনাবস্থায় পতিত। ইহাদের চরিত্রের মধ্যে যে সামান্য প্রভেদ আছে তাহা প্রত্যেকের অবস্থানুরূপ (৩)। মিরাণ্ডা তাহার পিতা ও এক অদ্ভুত ভৃত্য ব্যতীত আর জগতের কাহাকেও দেখে নাই এ জন্য তাহার সরলতাও বালিকাস্বভাব শকুন্তলা অপেক্ষা অধিক। পর্ডিটা ফ্লোরিজেলের সহিত পলায়ন করিল, কিন্তু আবশ্যক হইলে শকুন্তলাও করিত, কারণ যখন পিতৃআজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া রাজাকে পতিত্বে বরণ করিল তখন যে পলায়ন করিবে ইহা ত সামান্য কথা (৪) অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইহাদের স্বভাব এক প্রকারের।”

এই খানটা পাঠ করিয়া শকুন্তলার সম-দুঃখ-সুখী লোকদিগের মুখে ভয় দুঃখের বাদল কাটিয়া গিয়া হর্ষের চিহ্ন যেমন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—যেমন মনে হইয়াছে যে, তবে বুঝি অবলা বালাটি এ যাত্রায় নিষ্কৃতি পাইল, এই যেই মনে হওয়া—আর, কি ভয়ানক—অমনি-কি বিকট 'মুখ-ব্যাদান' করিয়া মহাবল-পরাক্রম এক কিন্তু আসিয়া উপস্থিত! দেখিয়া আশার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, হর্ষের অন্তঃকরণ দমিয়া গেল ; ভয়ে তাহারা থরহরি কম্প ; কিন্তু-টা এই

“কিন্তু কালিদাস এমন মুগ্ধা সরলা বালার বর্ণনা যাহা করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় নহে, এমন কি—শকুন্তলার স্বভাব-বিরুদ্ধ।”—বাঃ।

যদি “প্রশংসনীয় নহে” তবে ইতি-পূর্ব্বেই বলা হইল কেন যে, “রাজাকে

লঘু প্রকৃতির গুরুতর একটি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত সন্দেহ নাই! সং

(২) এমন ধারা? তবে শকুন্তলার সাত খুন মাপ! সং

(৩) ইহাতে বুঝাইতেছে যে,প্রত্যেকের অবস্থা স্বতন্ত্র, কিন্তু উপরে লেখক বলিয়াছেন যে, “তিন জনের স্বভাব ও অবস্থা একই প্রকার”—কোন্‌টা ঠিক? সং

(৪) উপযুক্ত পাত্রে শকুন্তলা সমর্পিত হয় ইহা কণ্বমুনির একান্ত বাসনা—শকুন্তলা তাহা জানিত—তাহাতে আবার অন্য কেহ নয় রাজা দুষ্যন্ত—সোনার উপর সোহাগা, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে শকুন্তলার মনে “কিন্তু” উপস্থিত হইবে—কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত পলায়ন করিতে কিছুমাত্র বাধা মনে হইবে না—এরই নাম সেই মানব-প্রকৃতি যাহা লেখক অতি উত্তম জানেন, আর কালিদাস আদবে জানিতেন না। সং

দেখিবামাত্র শকুন্তলার তপোবন-বিরোধী এক ভাব উদিত হইল ইহাতে আমরা কোন দোষ দেখিতেছি না কারণ ইহা অসম্ভব নহে এবং ইহা-দ্বারা শকুন্তলার সরলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সরলা বালার হৃদয় অতি কোমল তাহাতে প্রেম শীঘ্রই বদ্ধমূল হইয়া থাকে” ইত্যাদি। লেখকের অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে ভাল গুণ গুলি অন্যবিধ গুণের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে অহাদের উল্‌টা শ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তিনি বলেন—

“প্রথম অঙ্কে শকুন্তলাকে মুগ্ধা সরলা স্নেহময়ী দেখা যায়, চতুর্থ অঙ্কে যখন শকুন্তলা সকলের নিকট বিদায় লইতেছে তখন অবিকল সেই স্বভাব এবং পঞ্চম অঙ্কেও সেই রূপ; ইহাতে কবির যা অভিপ্রায় তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সে অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ আচরণ অনেক স্থলে বিশেষত তৃতীয় অঙ্কে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শকুন্তলা যখন রাজাকে ছাড়িয়া যাইতেছে তখন তাহার আচরণ সরলার ন্যায় নহে। কুশ দ্বারা চরণ ক্ষত হইয়াছে বলিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিল এবং শাখাতে বল্‌কল লগ্ন হইয়াছে এই ছলে রাজার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এই সকল ব্যাপার চতুরা প্রগল্‌ভা রমণীর শোভা পায় কিন্তু শকুন্তলার পক্ষে অত্যন্ত মন্দ। শকুন্তলা ও তাহার সখীগণ নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রেম কি বস্তু তাহা কতক বুঝিয়াছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ পরিপক্কতা পাইয়াছে ইহা নিতান্ত অসম্ভব। হিন্দুমহিলারা শালীনতার জন্য জগতে প্রসিদ্ধা। কালিদাসের বর্ণনাতে, সেরূপ শালীনতা নাই শকুন্তলা যেন লজ্জার মাথা খাইয়াছে।”

ইহার ভিতরকার কথাটি আমরা তবে একটু খুলিয়া দিই,—“শকুন্তলার মনে প্রেম হইয়াছে প্রেমই হইয়াছে, প্রেম লইয়া দিব্য আরামে ঘরে চলিয়া যাক্, তা নয়—রাজার দিকে ফিরে চাহিতেছে, তা-ও আবার চাহিতেছে কি চাহিতেছে না তাহা বুঝা ভার, যদি চাহিতে হয় ত স্পষ্ট করিয়া চা—না চাহিতে হয় চলিয়া যা—সরলা বালার মত কাজ কর্; সাধ করিয়া শাখায় বস্ত্র বাধানো, কুশে চরণ বিঁধানো—এ সব ত চতুরা রমণীর কাজ।” প্রেম-বিষয়ে লেখকের যেরূপ ব্যুৎপত্তি, এই ত তাহা আমরা দেখিলাম—সেক্সপিয়র ও-বিষয়টা কিরূপ বুঝিতেন তাহা নিম্ন-দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে—

Juliet. By whose direction found'st thou out this place?

Romeo. By love who first did prompt me to enquire
He lent me counsel and I lent him eyes

ইউরোপীয় কন্দর্প অন্ধ তাই রোমীওর এ কথাটি খুব ঠিক্ বসিয়াছে; উহার অর্থ এই যে, কন্দর্প আমাকে তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়াছেন আমি কন্দর্পকে আমার চক্ষু-দুটি দিয়াছি; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি আপনার বুদ্ধিতে চলিলে এখানে আসিতে পারিতাম না, আমি কন্দর্পের মন্ত্রণা-অনুসারে

এখানে আসিয়াছি,সে মন্ত্রনা এমনি কার্য্য-কারী যে আমার চক্ষুতে আর আবশ্যক হয় নাই; আমার চক্ষু আমি কন্দর্পকে দিয়াছি, সে-ই আমার নেতা হইয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে; আমি এক প্রকার চক্ষু বুজিয়া আসিয়াছি তাই আমার সম্মুখস্থিত বিঘ্নরাশি আমি দেখিয়াও দেখি নাই—চক্ষু মেলিয়া দেখিলে হয় ত আমি ভয়ে আসিতে পারিতাম না। লেখক এইটি ভাল করিয়া বুঝুন যে, প্রেমের মন্ত্রনা-অনুসারে রোমীও পাঁচিল টপ্‌কাইয়াছিল—আপনার বুদ্ধিতে নহে; তেমনি প্রেমের মন্ত্রনা-অনুসারে শকুন্তলা ওরূপ শাখা-কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইল, কুশ দ্বারা ক্ষত-চরণ হইল,—বড় যে একটা চতুরা রমণী তাহা বলিয়া নহে;—প্রেম বৃহন্নলা সারথী, শকুন্তলা কেবল উত্তর বেচারা; যেমন বৃহন্নলা-সারথী যুদ্ধ জয় করাতে উত্তরের যুদ্ধজয় করা হইয়াছিল, তেমনি প্রেম-মন্ত্রী কল-কৌশল খেলাতে শকুন্তলার কল-কৌশল খেলা হইয়াছে—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু ইহাতে আর ভুল নাই যে, উত্তরও যেমন যোদ্ধা পুরুষ, শকুন্তলাও সেইরূপ প্রগল্‌ভা রমণী। আসল কথাটা এই,—শকুন্তলা যখন রাজাকে ছাড়িয়া যায় তখন শকুন্তলার মনে প্রেমের নিদারুণ একাধিপত্য—রাজাকে তাহার কত কি কথা বলিবার আছে—মুখে তাহা ব্যক্ত করা নিতান্ত প্রগল্‌ভতার কার্য্য, এজন্য চোখে চোখে কথা কহিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে—ইচ্ছা হইতেছে যে যদি কাপড়টা গাছে বাধিয়া যায় ত ভাল হয়,—শকুন্তলা তাহার সেই প্রবল ইচ্ছার টানে পড়িয়া গাছে কাপড় বাধাইয়া ফেলিল, এই যা' কিছু,—একজন চতুরা স্ত্রীর ন্যায় কৌশল খেলিয়া রাজার মন বশ করিতেও যায় নাই, আর হাব-ভাব প্রদর্শনের দোকানদারী দ্বারা আপনার রূপ-লাবণ্যের মূল্য চড়াইতেও যায় নাই। লেখক বলিয়াছেন যে "ফুৎকারের ভয়ে যেমন তৃণখণ্ড উড়িয়া যায়, শকুন্তলা সেইরূপ অল্পতেই অধীরা হয়" ইহার উত্তর এই যে, প্রেমের বল বড় অল্প নহে—দেখিতে ফুৎকার কিন্তু ঝটিকা তাহার নিকট পরাভব মানে, রোমিওকে এমনি উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল যে তাহাকে বলিতে হইয়াছে

"With love's light wings did I o'er-perch these walls:"

ইহার নাম যদি হয় "ফুৎকারের ভয়ে উড়িয়া যাওয়া" তবে সেক্ষপিয়রের গ্রন্থ হইতে তাহার এক উত্তর এই পাওয়া যায় "He jests at scars who never felt the wound." লেখকের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিও চমৎকার, তিনি বলেন,

"শকুন্তলার বর্ণনাতে আরও একটী মহৎ দোষ আছে। গোপনে শকুন্তলা রাজার পাণিগ্রহণ করিয়া অভীস্ট সিদ্ধ করিল। ইহা দ্বারা তাহার চরিত্র হেয় জ্ঞান হয়। সরলচিত্ত লোকেরা গুপ্তকার্য্য পাপ বলিয়া জ্ঞান করে; শকুন্তলা অসঙ্কুচিতচিত্তে যে এরূপ গুরুতর গুপ্তকার্য্য করিল ইহা স্বভাব-বিরুদ্ধ এবং আজন্মকাল তপোবনে সাধুসঙ্গে

থাকিয়া শকুন্তলা যে নীতিশিক্ষা পাইয়াছিল তাহারও বিরুদ্ধ। ইহাতে আমরা স্পষ্ট রূপে দেখিতেছি যে কালিদাস মানব হৃদয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই।”

শকুন্তলার ইহা ধ্রুব-জ্ঞান ছিল যে, কণ্ব মুনি তাহাকে যেরূপ উপযুক্ত পাত্রে সমর্পন করিবার জন্য অভিলাসী দুষ্যন্ত-রাজা তাহার একটি অসামান্য আদর্শ, তাহাতে আবার শকুন্তলার হৃদয়ে প্রেমের পরাকাষ্ঠা আবির্ভূত, এরূপ স্থলে দুষ্যন্ত রাজার পাণিগ্রহণে যদি শকুন্তলাকে বঞ্চিত হইতে হয় তবে শকুন্তলার পক্ষে তাহা মৃত্যু তুল্য। শকুন্তলা এমনি এক বিষম দায়ে পড়িয়াছে যে, রাজার নিকট অচিরাৎ আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করা ভিন্ন তাহার আর উপায়ান্তর নাই—তাহা হইলে আপাতত সংশয়ের দোলা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও ত বাঁচে,—তাহার যেমন রাজার প্রতি মন গিয়াছে, রাজার তেমনি তাহার প্রতি মন গিয়াছে কিনা ইহা জানিয়াও ত সুস্থির হয়। শকুন্তলার মন যদিও আশার দিকেই অধিক ঝুঁকিয়া রহিয়াছিল কিন্তু তথাপি দৈবাৎ যদি অভীষ্ট সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত উৎপন্ন হয় তবে তাহার জীবন-সংশয় উপস্থিত হইবে, এই কারণে তাহাকে অতীব শঙ্কিত চিত্তে থাকিতে হইয়াছিল,—তাহার সাক্ষী

“শকুন্তলা। হলা চিন্তেমি অহং। অবহীরণভীরুকং পুণো বেবই মে হিয়য়ং।

(সংস্কৃত) হলা চিন্তয়ামি অহং। অবধীরণ-ভীরুকং পুনর্ব্বেপতে মে হৃদয়ং।

গঙ্গা নদীতে ভাঁটার সময় দক্ষিণা বাতাসের ঝড় উঠিলে যেমন তুমুল তরঙ্গ-উত্থিত হয়, শকুন্তলার মনে সেইরূপ এক দিকে আশার একটানা স্রোত আর এক দিকে শঙ্কার বিষম উদ্‌বেগ দুয়ের কোস্তাকুস্তিতে বিপর্য্যয় তুফান বাধিয়াছে, রাজার সহিত মিলন ব্যতীত এ রোগের আর দ্বিতীয় ঔষধি নাই। রাজার সহিত যখন মিলন হইল তখন রাজা আপনি গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, সে প্রস্তাবে শকুন্তলা কেন যে সম্মত না হইবে, এবং সম্মত হইয়াছিল বলিয়া কেন যে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ইহার অর্থ বুঝা ভার। পাত্র যদি উপযুক্ত হয় এবং দুই পক্ষের প্রেম যদি সমান হয়, তাহা হইলে বিবাহ করিতে দোষ কি—তা সে গোপনেই হউক্ আর প্রকাশ্যেই হউক। বিবাহ শুভ কার্য্য—আনন্দের ব্যাপার, তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে করা হইবে না—অতীব সঙ্কুচিত চিত্তে করিতে হইবে—ইহারই বা অর্থ কি? তবে যদি লেখক বলেন যে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ বিবাহই নহে—সে কথার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। বিবাহ বৈধ হয় কিসে? দেশের আইন অনুসারে বিবাহ হইলে লোকতঃ তাহা বৈধ—এবং দুই পক্ষের পরস্পর যথার্থ প্রেমাসক্তি সত্ত্বে উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহ হইলে ধর্ম্মতঃ তাহা বৈধ; সুতরাং দুষ্যন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার ঐ যে বিবাহ উহা লোকত ধর্ম্মত—সর্ব্বতই—বৈধ; তবে লেখকের মতে গোপনে বিবাহ করাটা

অন্যায় হইয়াছে—কেন না "সরল চিত্ত লোকেরা গুপ্ত-কার্য্য পাপ বলিয়া জ্ঞান করে," লোকে বলে বিবাহ শুভ-কার্য্য কিন্তু হইলে হইবে কি—তাহা যে গোপনে নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে তাহা পাপ কার্য্য; এই সিদ্ধান্তটি আজিকের কালের অনেক রাজা রাজড়ার কাজে লাগিতে পারে; তাঁহারা অনেককে অনেক অর্থ দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা গোপনে সেরূপ কার্য্য করিতে নিতান্ত নারাজ—অতীব সরল-চিত্তে তাঁহারা তাঁহাদের দান-কার্য্য সংবাদ পত্রে ঘোষণা করিয়া থাকেন; ইহাঁরা এখন অবধি এই বাক্যটি বেদবাক্য মনে করিবেন্ সন্দেহ নাই যে, যাঁহারা গোপনে দান ধ্যান তপস্যা বা অন্য কোন শুভ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অতি অসরল-চিত্ত লোক এবং তাঁহাদের সে কার্য্য পাপকার্য্য! শকুন্তলার আজন্ম কাল হইতে না হউক, যৌবন কালের প্রথম উন্মেষ হইতে কণ্ব-মুনি এবং অন্যান্য আশ্রম বাসিদিগের মধ্যে একথাটির বিলক্ষণই আন্দোলন চলিয়াছে যে শকুন্তলা যেমন রূপবতী গুণবতী এবং উচ্চ-বংশীয়া কন্যা, তেমনি একটি উপযুক্ত পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিতে হইবে, দুষ্মন্ত-রাজার সহিত শকুন্তলার সখীদ্বয়ের প্রথম আলাপ স্থলেই কণ্ব মুনির উক্ত মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে, সুতরাং কণ্ব মুনির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা দূরে থাকুক, তাঁহার সাধের আশাটিকে শকুন্তলা চিরাভিলষিত ফলে ফলবতী করিয়াছে; যদি শকুন্তলা কণ্ব মুনির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিত, অথবা লোকতঃ কিম্বা ধর্ম্মতঃ অবৈধ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত তাহা হইলে লেখকের এই যে মহা শাসন বাক্য—যে "শকুন্তলা অসঙ্কুচিত চিত্তে যে এরূপ গুরুতর গুপ্ত-কার্য্য করিল ইহা স্বভাব-বিরুদ্ধ এবং আজন্মকাল তপোবনে সাধু সঙ্গে থাকিয়া যে নীতি-শিক্ষা পাইয়াছিল তাহারও বিরুদ্ধ" ইহার একটা অর্থ আছে বুঝিতাম। আর যে তিনি বলিয়াছেন যে, কালিদাস মানব প্রকৃতি জানেন না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার অত আয়াস পাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না—কেননা কালিদাসের আপনার কথাতেই আপনি ধরা পড়িয়াছেন—তিনি শকুন্তলা-গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন যে,—"বলবদপি শিক্ষিতানাং আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ" অতিমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের চিত্তেরও আপনার প্রতি প্রত্যয় হয় না; কিন্তু লেখক যথেষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও আপনার কথার উপর পাঁচ কাহন প্রত্যয় বর্ত্তমান,—তিনি জানেন যে, তিনি ঐ যে মস্ত কথাটা মুখে উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার একটুও লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই; ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে কালিদাস সে-কালের মানব প্রকৃতি যতই জানিয়া থাকুন না কেন, এ কালের মানব প্রকৃতির—নিকটেও তিনি ঘেঁসিতে পারেন নাই। কালিদাস যদি মানব প্রকৃতি বুঝিতেন তাহা হইলে শকু-

ন্তলার প্রেম তাহাকে (শকুন্তলাকে) ওরূপ জ্বালাইয়া তুলিত না, রাজার সহিত যদি বা তাহার মিলনেচ্ছা হইত কিন্তু তৎপরে অমনি আবার এইরূপ একটা "কিন্তু" উদয় হইত, যথা—

"কিন্তু রাজার সহিত মিলন প্রার্থনীয় নহে," এবং এইরূপ একটি জ্ঞানগর্ব্ব যুক্তি ঐ কিন্তুটির পোষকতা করিত, যথা— "তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই; সবে এই প্রথম বারের দেখা, এই রূপ আর দশ-বিষ বার দেখা সাক্ষাৎ হইতে হইতে যখন এমন সুসময় আসিবে যে, স্বচ্ছন্দে সকলকে বলিয়া কহিয়া বিবাহ করিবার আর কোন বাধা থাকিবে না, সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে সময়টি আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবনা চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া পূর্ব্বেকার ন্যায় সুখে কাল-যাপন করা ভাল;"— এরূপ শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোক-গোচের প্রেম যে, মানব-প্রকৃতিতে সম্ভবে ইহা কালিদাস জানিতেন না, তাই তিনি একটা চঞ্চল অধীর হাড়-জ্বালানিয়া প্রেমকে আসরে নাবাইয়াছেন—জানিলে তিনি কখনই ওরূপ করিতেন না, অতএব তাঁহাকে আর বেশী কিছু বলিয়া কাজ নাই,— হাজার হো'ক তিনি এক জন বড় কবি ত বটেন—অন্ততঃ জগতের লোকে ত তাঁহাকে এক জন প্রধান কবি বলিয়া জানে— এস্থলে ক্ষমাই বিধি। লেখক অতঃপর বলিতেছেন

"সেক্সপিয়ার এরূপ দোষে লিপ্ত নহেন। মিরাণ্ডার মনে প্রেমের সঞ্চার প্রথমেই হইয়াছিল বটে কিন্তু পিতার আজ্ঞা পাইয়া তবে ফর্ডিন্যাণ্ডকে পতিত্বে বরণ করে; পর্ডিটা ফ্লোরিজেলের সঙ্গে পলায়ন করিয়াও বিবাহ করে নাই। ইহাদের প্রেমের ভাব শকুন্তলা অপেক্ষা কতদূর উন্নত এবং রমণীয় তাহা সহৃদয় মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এখানে আমরা দেখিতেছি যে মিরাণ্ডা ও পর্ডিটার অপেক্ষা শকুন্তলার সাহস অধিক। ইহার কারণ যে শকুন্তলা প্রেমে একেবারে উন্মত্তা ও অধীরা হইয়াছিল। ঐ উন্মত্ততা বশতঃ সে রাজার প্রেমে অসংকুচিতচিত্তে আত্মবিসর্জ্জন করিল, ইহা নিতান্ত গর্হনীয় এবং আমাদের হৃদয়গ্রাহি নহে। কালিদাসের প্রেম কি রূপ তাহা আমরা কিছু সবিস্তরে বলিব সে জন্য এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।"

মিরাণ্ডার মনে প্রথমেই প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল অতএব শকুন্তলার মনে প্রথমেই সঞ্চার হওয়াটা খুব ভাল হইয়াছে,—কিন্তু তা'ও বলি, দৈবক্রমে যদি মিরাণ্ডার মনে একটু দেরিতে প্রেমের সঞ্চার হইত তাহা হইলে শকুন্তলার ঐ যে প্রেম, যাহা এখন সোনার দরে বিকাইতেছে তাহা মাটির দরেও বিকাইত না; মিরাণ্ডার মনের উপর প্রস্পেরোর জাদু মন্ত্রের চাবুক না পড়িলে হয় ত ঐরূপ বিপদ ঘটিত— ঘটিত না যে তাহা কে বলিতে পারে? সরস্বতীর চরণে কোটি কোটি প্রণাম যে, তিনি সেক্সপিয়রের মাথায় প্রস্পে-

রোর যাদু-ব্যাপারটা নিঃশ্বসিত করিয়া দিয়া কালিদাসকে ঐ একটি মহাবিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন—সেক্সপিয়র তাঁহার যেমন প্রিয়পুত্র কালিদাসও ত সেই রূপ বটেন—মাতার স্নেহ কোথায় যাইবে! তবে কি না ইহার মধ্যেও একটা কিন্তু আছে, যথা, "কিন্তু পিতার আজ্ঞা পাইয়া তবে ফর্ডিনাণ্ডকে পতিত্বে বরণ করে;" লেখকের মত এই যে, যে প্রেম মনুষ্যকে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করে, সে প্রেম মহাকবির লেখনীর উপযুক্ত নহে—সেক্সপিয়র সেরূপ দুর্ব্বিনীত প্রেমের সহিত কোন কারবার রাখেন নাই; লেখক যখন এরূপ বলিতেছেন তখন তাঁহারই কথা অবশ্য ঠিক্; কত যে ঠিক্ তাহা নিম্ন লিখিত সেক্সপিয়রের কয়েকটি পংক্তিতে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইবে যথা—

Ferdinand * * * what is your name?

Miranda-Miranda.—O my father! I have broke your hest to say so."

শকুন্তলা যদিও তাহার পিতার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলাচরণ করে নাই, কিন্তু লেখকের মতে তাহাতে বিশেষ কিছু আইসে যায় না; শকুন্তলা যখন কণ্ব মুনির বাচনিক আদেশ পায় নাই—অথচ দুষ্যন্ত রাজার সহিত বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে—তখন তা' অপেক্ষা কবিত্ব-দোষ আর কি হইতে পারে? এই জায়গাটায় সরস্বতী বোধ হয় মনে করিয়া থাকিবেন যে, পিতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া বরং তাহার অনুমোদিত পথে পদার্পণ করা আজ্ঞা পালনেরই সামিল—কিন্তু ওরূপ বৃথা প্রবোধ-বাক্যে লেখক ভুলিবার পাত্র নহেন। কণ্ব-মুনিকে তীর্থ পর্য্যটনে পাঠানটাই কালিদাসের অন্যায় হইয়াছে—কেন না কণ্ব-মুনি আশ্রমে উপস্থিত থাকিলে সরস্বতী আগে ভাগে তাঁহার বাচনিক আজ্ঞাটার জোগাড় করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে সরস্বতীর যতটুকু সাধ্য তাহাই তিনি করিয়াছেন—যা' হোক্ গতস্য শোচনা নাস্তি। মিরাণ্ডা যদি আর একটু বুদ্ধিমতী হইত—সে যদি তাহার পিতার মনোগত অভিপ্রায়টি অবগত হইত—আর সেই অভিপ্রায়ানুসারে ফর্ডিনাণ্ডকে পতিত্বে বরণ করিত—পিতার বাচনিক আজ্ঞার অপেক্ষা না করিত—তাহা হইলে কি যে ভাল হইত- তাহা বলা যায় না, তাহা হইলে কালিদাস একেবারেই বেকসুর খালাস পাইতেন—যা' হো'ক এখন যে তাঁহার পক্ষে চারি-আনা ডিক্রী বারো আনা ডিস্‌মিস্ হইয়াছে ইহাই কালিদাসের পরম সৌভাগ্য। শকুন্তলা যদি দুষ্যন্ত-রাজাকে বিবাহ না করিয়া তাঁহার সহিত পলায়ন করিত তাহা হইলে শকুন্তলার শালীনতা বলো, নীতিজ্ঞান বলো, মনের ধীর-প্রকৃতি বল, প্রেমের উচ্চ আদর্শ বল, সকল দিকই রক্ষা পাইত; যদি কারণ জিজ্ঞাসা কর—উত্তম,—কারণ যা' তা' একটি বই দুটি নয় কিন্তু তাহার গুরুত্ব অপরিসীম,—কারণ শুধু এই যে, পর্ডিটা ফ্লোরিজেলের সহিত বিবাহ না করিয়,

তাহার সহিত পলায়ন করিয়াছিল। পর্ডিটা ফ্লোরিজেলের সহিত পলায়ন করিতে সাহসী হইয়াছিল, কিন্তু—তাহার সাহস শকুন্তলা অপেক্ষা অনেক কম, পর্ডিটার প্রেম শুধু হইয়াছিল মাত্র—কিন্তু সে প্রেমে সে অধীরাও হয় নাই, উন্মত্তাও হয় নাই, তবে কি না সচরাচর লোকের মন যেমন-ধারা দেখা যায়, তা' অপেক্ষা তার মনের নাড়িটা কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়াছিল, তাই সে ফ্লোরিজেলের সঙ্গে পলায়ন না করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে নাই,—কিন্তু!—সে অধীরা হয় নাই! শকুন্তলা ঠিক্ পর্ডিটা কিংবা মিরাণ্ডার মত হইলে আর তাহাকে অধীরা বলিবার জো থাকিত না; কিন্তু হইলে হইবে কি শকুন্তলা-বেচারীর উভয়-সংকট; ও-বেচারী যদি লেখকের লেখনী-বাণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চায় তবে দুষ্যন্তকে পাইবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়, আর যদি দুষ্যন্তকে পাইতে চায়, তবে লেখকের বাণ-বর্ষণ হইতে আর কিছুতেই নিস্তার নাই— এরূপ বিপদে মানুষেও পড়ে! প্রকৃত কথা এই যে ফ্লোরিজেলের সহিত পর্ডিটার যখন তখন দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে ও কথা-বার্ত্তা চলিতেছে; তাহারা এবিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে যে, আর যাহা কেন, হউক্ না দোঁহার প্রতি দোঁহার প্রেম কখনই ঘুচিবার নহে; কিন্তু শকুন্তলা দুষ্মন্ত রাজাকে আর কখন দেখিতে পাইবে কি না তাহা সে কিছুই জানে না; এ অবস্থায় শকুন্তলা বেচারী অধীরা না হইয়া করে কি? শকুন্তলা কি এই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে যে, "কালে ভদ্রে আবার যদি কখনো রাজার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি আমাকে ভাল বাসেন কিনা ও আমার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হ'ন কি না তাহা জানা যাইবে, এখন তা' ভেবে আর হ'বে কি—কাজ কর্ম্ম করিগে যাই।" প্রকৃত কথা এই যে, শকুন্তলার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে রাজার মুখে এই কথাটি একবার সোনে যে, রাজার প্রতি তাহার যেরূপ তাহার প্রতিও রাজার সেইরূপ আন্তরিক আসক্তি হইয়াছে, প্রেমের সঙ্গে এইরূপ একটা উদ্বেগ লাগিয়া থাকাতে শকুন্তলার মন অশান্তির চরম্ সীমায় পৌঁছিয়াছে; দাবানলের সঙ্গে প্রবল বায়ু লাগিয়া-থাকাতে যেমন বনের মধ্যে একটা তুমুল কাণ্ড হইতে থাকে, শকুন্তলার মনের মধ্যে সেইরূপ হইতেছে; এ অবস্থায় কোন্ মানব-প্রকৃতি-বিদ্যার বৃহস্পতি শকুন্তলাকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিতে পারেন? রাজার সহিত মিলনের ইচ্ছা শকুন্তলার মনে এমনি বলবতী হইয়াছে যে তাহা শকুন্তলাকে চিটি পর্য্যন্ত লিখাইয়াছে—প্রেম বলিতেছে "হয় চিটি লেখো নয় দুষ্যন্তকে পাইবার আশায় জলাঞ্জলি দেও" শকুন্তলা চিটি না লিখিয়া করে কি? যদি লেখকের সুবিজ্ঞ রুচি সেখানে উপস্থিত থাকিত তবে সে শকুন্তলাকে নিষেধ করিয়া বলিত" কর কি? রাজাকে পাইবার আশায় জলাঞ্জলি দিলেই-বা তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি নাই কিন্তু চিটি লেখা

কোন মতেই হইতে পারে না। কিন্তু হায় এ সকল অতিবৃদ্ধ পিতামহের জ্ঞান-গর্ব্ব উপদেশ শুনে কে? ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে "Wisdom cries in the streets but nobody hears it." কি করা যায়—মানব প্রকৃতি! রোমীও যখন পাঁচিল ডিঙাইতে যাইতেছে তখন কি তাহার মনের এক কোণেও এ কথাটি স্থান পাইয়াছিল যে, ছি ছি ছি কি অভদ্র আচরণেই আমি প্রবৃত্ত হইতেছি, চোরের মত এক জন গৃহস্থের বাড়িতে লুকাইয়া প্রবেশ করিতেছি—কি লজ্জাকর কার্য্য! রাজার সহিত যখন শকুন্তলার মিলন হইল যখন শকুন্তলা জানিতে পারিল যে রাজা তাহাকে যথার্থই ভাল বাসেন ও গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে রাজা তাঁহাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিবেন, তখন তাহার অধীরতার বিষটুকু চলিয়া গেল, পরে যে অধীরতাটি অবশিষ্ট রহিল তাহা সেই মিষ্ট রকমের অধীরতা যাহার নাম প্রেম, সে অধীরতা পডিটারও হইয়াছিল মিরাণ্ডারও হইয়াছিল—মানব-প্রকৃতিতে ওরূপ হইয়া থাকে, পাষাণ প্রকৃতিতে উহা আমল পায় না। লেখক দিব্য একটি টিপ্‌পনি দিয়াছেন, যথা—

" অনেকে বলেন যে সেক্‌সপেয়ারের কোন কোন নায়িকা এই রূপ। জুলিয়েটের সহিত শকুন্তলার সাদৃশ্য আছে। জুলিয়েট এই রূপে ধৈর্য্যশূন্য হইয়া কায়মনোবাক্যে রোমিওর ভাবনাতে মগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এখানে বক্তব্য যে জুলিয়েটের অবস্থা এবং শকুন্তলার অবস্থাতে অনেক প্রভেদ আছে। জুলিয়েট যখন নির্জ্জনে রোমিওর কথা আন্দোলন করিতেছিল তখন অতি গোপনে অলক্ষিত ভাবে রোমিও শুনিতে পাইয়া দুষ্মন্তের ন্যায় আত্ম প্রকাশ করে। কিন্তু শকুন্তলা আবার কামাতুরা জুলিয়েটকে জিনিয়াছে। কারণ রাজার নিকট লিপি পাঠাইতে উদ্যতা হইয়াছিল। "

লেখকের যুক্তির দৌড়টা কোন্ দিকে তাহা এতক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম, যথা,—পডিটা এবং মিরাণ্ডার সহিত শকুন্তলার কোন কোন অংশে সাদৃশ্য আছে অতএব প্রমাণ হইল যে, তাহাদের সহিত শকুন্তলার কোন অংশে অবস্থা-বৈচিত্র সম্ভবে না। সুতরাং পর্ডিটা এবং মিরাণ্ডা বা তদবস্থাপন্ন অন্য কোন রমণী ভিন্ন আর কাহারো সহিত শকুন্তলার কোন অংশে অবস্থা-সাদৃশ্য সম্ভবে না; কিন্তু লেখকের এইটি জানা উচিত যে পর্ডিটার সহিত ফ্লোরিজেলের বিশেষরূপ আলাপ পরিচয় হইয়াছে, উভয়ের মন উভয়ের নিকট জানা শুনা হইয়াছে, দুষ্যন্তের সহিত শকুন্তলার এখনো তেমন-ধারা ঘনিষ্টতা হয় নাই—এই গেল পর্ডিটার সহিত শকুন্তলার অবস্থা-বৈষম্য; আর মিরাণ্ডা ও ফর্ডিনাণ্ডের পরস্পরের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হওয়া অবধি তাহারা ক্রমাগত একত্রে রহিয়াছে বলিলেই হয়, ও তাহাদের যথেষ্ট মন খোলাখুলি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু শকুন্তলা এখনো রাজার মন বুঝিতে পারে

নাই, কেন না রাজার সহিত মন খোলা-খুলি করিয়া কথাবার্ত্তা কহে—এখনো তা-হার অবসর পায় নাই; মিরাণ্ডার সহিত শকুন্তলার মিলে না,—যৎকিঞ্চিৎ যা মিলে তা' জুলিয়েটের সহিত, কেন না জুলিয়েটও রোমীওর সহিত এখনো (অর্থাৎ তাহাদের দ্বিতীয় বারের মিলনের পূর্ব্বে) মনখোলাখুলি করিতে পারে নাই; জুলিয়েটও পুনর্ম্মিলনের জন্য নিদ্রা তন্দ্রা বর্জ্জিত, শকুন্তলাও তাহার জন্য একেবারে যায় যায় অবস্থা প্রাপ্ত; জুলিয়েটের সহিত শকুন্তলার এইরূপ অ-বস্থা-সাদৃশ্য; কিন্তু লেখকের মতে তাহা সঙ্গত নহে;—একবার যখন তাঁহার লেখনী হইতে এই কথাটি বাহির হই-য়াছে যে, কতক-গুলি বিষয়ে শকুন্তলার সহিত মিরাণ্ডা এবং পর্ডিটার মিল আছে, তখন সেই লেখনী দিয়া আবার কেমন করিয়া বাহির হইবে যে, প্রেমের বাধা-প্রাপ্তি এবং তজ্জনিত তাহার অধীর পরা-ক্রম—এ বিষয়ে শকুন্তলার অবস্থা জুলিয়ে-টের ন্যায়,—এ ত হইতে পারে না, অতএব শকুন্তলা পর্ডিটা এবং মিরাণ্ডা তিন জনের অবস্থা এক ছাঁচে ঢালা ইহার একটুও ব্যত্যয় হইতে পারে না! লেখক এতই যদি ঐ তিন নায়িকার সাদৃশ্য-প্রিয় তবে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পরিবর্ত্তে ফর্ডিনাণ্ড-মিরাণ্ডা কিম্বা ফ্লোরিজেল্-পর্ডিটা বসাইয়া শকুন্তলার একটা নূতন সংস্করণ করিলেই ত ভাল হয়, কালিদাসের শকুন্তলার একটা কোন প্রকার গতি করা ত উচিত! লেখক শকুন্তলার প্রতি তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়া গতব্যথ হইয়াছেন আগামী বারের ভারতীতে আমরা তদ্বিষয়ে আমা-দের মতামত প্রকাশ করিতে মানস করি।